॥ श्रीहरिः ॥

1901

সাধন সমর
বা
দেবী মাহাত্ম্য

(साधन समर, बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সাধন সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য

(সাধন সমর, বাঁংলা)

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

Books are also available at—

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road,
   Kolkata—700 007
   Phone: 2268-6894 / 0251
2. **Howrah Station**
   (a) (P.F. No. 5) Near Tower Clock
   (b) (P.F. No. 18) New Complex
3. **Sealdah Station**
   (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No. 1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No. 5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 3)

Second Reprint 2016 5,000
Total 15,000

❖ **Price : ₹ 130**
(One Hundred and Thirty Rupees only)

Printed & Published by :

Gita Press, Gorakhpur—273005 (INDIA)
(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)
Phone - (0551) 2334721, 2331250; Fax : (0551) 2336997
web : **gitapress.org** e-mail : **booksales@gitapress.org**
Visit gitapressbookshop.in for online purchase of Gitapress publications.

॥শ্রীহরিঃ॥

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব রচিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা **'সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য'** বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। গ্রন্থকর্তার নিজ সাধনায় উপলব্ধ সত্যানুভূতির অনুপম বিবৃতি এই গ্রন্থটিকে একদিকে যেমন মহতী মর্যাদা দান করেছে, অপরদিকে যাঁরা নিজ জীবনে ধর্মতত্ত্ব তথা আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করতে ইচ্ছুক, তাঁদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরূপে এটির অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঠকসমাজে যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ইদানীং এই মহাগ্রন্থটি প্রায় দুর্লভ তালিকার অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ কলেবরের বিপুলতা হেতু বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এটিকে সাধারণ পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার অসম্ভাব্যতাই প্রকাশকদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে নিরুৎসাহ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূবর্তন প্রকাশকের পক্ষ থেকে গীতা প্রেসের কাছে এটিকে পুনঃপ্রকাশের জন্য অনুরোধ আসে। অতঃপর গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রসাররূপে ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির হিসাব বুদ্ধিবর্জিত সুলভমূল্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ফলশ্রুতিরূপে আমাদের প্রকাশিত অমূল্য ধর্মগ্রন্থাবলীর মধ্যে নবতম সংযোজন এই অসাধারণ গ্রন্থটি পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করে আমরা আনন্দিত, আশা করি তাঁরাও সেই আনন্দের অংশীদার হবেন।

—প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

তৃতীয় খণ্ড

ক্রমাঙ্ক বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং কেবলং জ্ঞান-মূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

গুরো ! বহুরূপধারী-নারায়ণ-মূর্তি তোমার সেবার জন্য এ আয়োজন তোমারই ! তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও ! লীলা-কল্পিত অজ্ঞানতা ও আনন্দহীনতার ভাণ পরিত্যাগ করিয়া, একবার তোমার সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় মূর্তিতে দাঁড়াও। সেবা সফল হউক ! সেবক ধন্য হউক !

উদ্বোধন

মাতৃস্নেহ

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

হে অমৃতের বরপুত্র স্নেহের দুলাল বৎসগণ ! কে কোথায়—আর্ত, দীন, দুঃস্বপ্ন-পীড়িত—অজ্ঞানের—মিথ্যার গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ! পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ-শোক-অনুতাপের মর্ম্মন্তুদ উৎপীড়নে, চঞ্চলতার ঘোর আবর্তনে মথিত দলিত ছিন্নমর্ম হইয়া, হতাশের উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ ! এস, ছুটিয়া এস, পুত্র ! সন্তান ! এই দেখ—তোমাদের জন্য আমার বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া, তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি । তোমরা মা বলিয়া ডাকিবে—তোমাদের কমনীয় শিশুকণ্ঠ-বিনির্গত সুধাময় মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহারা হইব, তোমাদিগকে আত্মহারা করিব। তোমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিব, তোমরা অমর হইবে, তাই মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি—এস বৎস ! এস পুত্র ! একবার নয়ন উন্মীলন কর। আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকাল কাঙ্গাল সাজিয়া থাকিবে। দেখ মুহূর্তের জন্য আমি তোমাদিগকে অঙ্কচ্যুত করি নাই। তোমরা আমারই গর্ভে জাত, আমারই অঙ্কে ধৃত, আমারই স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছ । দুঃখ আর ত্রিতাপ বলিয়া কিছু নাই, জন্ম বা মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, নৈরাশ্য বা উৎপীড়ন বলিয়া কিছু নাই, যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইতেছ, উহা আমারই স্নেহস্তন্য।

অই শোন ! সত্যের বিজয় ঝঙ্কার উঠিয়াছে, সত্যালোকের শুভ্র জ্যোতি দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছে, মধুময় মাতৃ-আহ্বানে ব্যোমমণ্ডল মুখরিত হইতেছে, বসুন্ধরা প্রাণময় সত্য-আহ্বানে জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, সলিলরাশি সত্য-নিনাদে উদ্বেলিত হইতেছে, বায়ু সত্যধ্বনির অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে, অন্তরীক্ষ সত্যের পূত প্রণব-নাদে পরিপূরিত হইতেছে ; এখনও তুমি সুপ্ত থাকিবে ? এখনও মিথ্যার কালিমা মুখে মাখিয়া দীনতার দুঃস্বপ্নে উৎপীড়িত হইবে ? আর না, বৎস ! একবার এস, একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, একবার মুখটি ফিরাও,আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া কত যুগ যুগান্তর অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু ! অমৃতের সঞ্জীবনী ধারায় অভিষিক্ত হও। শান্তির—আনন্দের বিমল সলিলে অবগাহন কর। মায়ের কোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রাহ্মীস্থিতির উপলব্ধি করিয়া অমর হও। তোমাদের শিরে শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ বর্ষিত হউক ! তোমরা ধন্য হও।

দেবীসূক্ত—আমি কে ?

অম্ভৃণ নামক মহর্ষির বাক্‌নাম্নী এক কন্যা ব্রহ্মবিদুষী হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও ঋষি । ইনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া, যে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই দেবীসূক্ত নামে কথিত । ইহাতে

আটটি মন্ত্র আছে। এই দেবীসূক্তই চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য ইহারই বিশ্লেষণমাত্র। দেবীসূক্ত বেদ ; ইহা আপ্তকাম ভ্রম-প্রমাদশূন্য ঋষির সম্বেদন ; সুতরাং অপৌরুষেয়। চণ্ডীতে যে শব্দরাশি আছে, তাহা কোন মহর্ষির মুখে উচ্চারিত হইলেও, উক্ত শব্দরাশি যে জ্ঞান ও যে ভাবের প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। সর্বকালে, সর্বশ্রেণীর সমুন্নত সাধক মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে ঐ একই জ্ঞান ও একই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কেবল দেশ, কাল, পাত্র ও ভাষাগত বিভিন্নতা হেতু উক্ত অপৌরুষেয় জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশক ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। দেবীমাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে কিংবা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক বলা যায় মাত্র ; কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা জানেন— আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা —তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই,সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মাই দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়ারূপেই অভিবর্ণিত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব যথাস্থানে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

সকল ধর্মশাস্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মজ্ঞান। আত্মবস্তু—জাতি , বর্ণ, সম্প্রদায়গত অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নভাবে সর্বজীবে তুল্যরূপে বিদ্যমান। 'আমি' কে ? ইহা যথার্থরূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। জীবমাত্রই এই আপনার স্বরূপটি জানিবার জন্য লালায়িত। যতদিন ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীবমাত্র। যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন লোকে তাহাকে সাধক, ভক্ত ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে।

মানুষ যখন এই আত্মাভিমুখী গতি উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার বাহ্যিক যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাই নিবৃত্তিমার্গ বা সাধনা নামে কথিত হয়। ঐ লক্ষণগুলিই ধর্মশাস্ত্রে বিধিনিষেধ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই সাধক এবং আত্মস্বরূপের অনুভূতিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সর্ববিধ সাধনাই অসম্যক্ ফলপ্রদ। যতক্ষণ 'আমি' ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করা হয়, ততক্ষণ বস্তুগত্যা একমাত্র আমিই উপাসিত হইলেও (কারণ আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই) উহা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত ; সুতরাং মুক্তিরূপ মহাফল প্রদানে অসমর্থ। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে আত্মভাবশূন্য সকল সাধনাই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। আবার আত্মানুসন্ধানযুক্ত আহার-বিহারাদি জাগতিক কর্মগুলিও সাধনা-পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই আত্মাই —আমি—মা। আমাকে চেনা —মাকে পাওয়া ও আত্মসাক্ষাৎকার করা, এই তিনই একই কথা। দেবীসূক্তে 'অহং' রূপে যে তত্ত্ব প্রকাশিত, চণ্ডীতে তাহাই মহামায়ারূপে অভিবর্ণিত হইয়াছে। দেবীসূক্তে যাহা আত্মা, চণ্ডীতে তাহাই মা। সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডী যে কেবল শাক্ত সম্প্রদায়েরই পাঠ্য, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক কথা।

জীব যাহাকে চায়— জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবের যাহা যথার্থ অভীষ্ট বস্তু, তাহার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান সর্বপ্রথমে একান্ত আবশ্যক ; নতুবা অভীষ্টলাভের পথ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তাই, দেবীসূক্ত না জানিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমরা জগতে যে অধিকাংশ সাধককে প্রায় বিফলমনোরথ হইতে দেখি, তাহার একমাত্র কারণ উদ্দেশ্যহীনতা। ভগবৎস্বরূপ না জানিয়া—অমৃতের সন্ধান না লইয়া, সাধনাপথে অগ্রসর হইলে, পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি ? সে যাহা হউক, চল সাধক ! আমরা প্রথমে মায়ের স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইবার জন্য দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হই।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥

অনুবাদ । আমি (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা) রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি । মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি ধারণ করি ।

ব্যাখ্যা । অহং 'আমি' ; সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মাই 'আমি' । যদিও সাধারণতঃ 'আমি' বলিলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জননমরণধর্মী সুখদুঃখচঞ্চল একটি সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র বুঝি তথাপি একটু ধীরভাবে 'আমি'র স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের 'আমি' দেখিতে পাই । এস পিপাসিত সাধক ! আমরা মায়ের নাম নিয়া অগ্রসর হই !

সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, 'আমার দেহ'। ইহাতে আমরা কি বুঝি — দেহ হইতে আমি পৃথক একজন । আমার সত্তায় দেহের সত্তা । আমি দেখিতেছি, তাই দেহ আছে । আমি দেহ নই ; আমাতে দেহ আছে । এইরূপে আমরা দেহ হইতে 'আমি'কে সম্পূর্ণ পৃথক-রূপে বুঝিতে পারি । এখন ক্রমে অগ্রসর হওয়া যা'ক্ — 'আমার প্রাণ' 'আমার মন' 'আমার জ্ঞান' 'আমার আনন্দ' এই যে শব্দগুলি আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, উহা যে একেবারেই না বুঝিয়া বলি, তাহা নহে ; তবে বুঝিয়াও যেন বুঝি না এমনই একটা ভাব । আচ্ছা থাক যখন বুঝি না তখন না-ই বা বুঝিলাম, এখন বুঝিতে বসিয়াছি, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব । এই যে দেহ হইতে পৃথক, প্রাণ হইতে পৃথক, মন হইতে পৃথক, জ্ঞান হইতে পৃথক, আনন্দ হইতে পৃথকরূপে একটি 'আমি'র সন্ধান পাইতেছি, ঐটি-ই না দেহাদি পাঁচটি আবরণের ভিতর দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে ! আমার গৃহখানিকে যেরূপে 'আমি গৃহ' বলিয়া বুঝি না, সেইরূপ 'আমি দেহ' 'আমি মন' এরূপ প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না । তবে গৃহখানি ভাঙিয়া গেলে যেরূপ আমি দুঃখিত হই, গৃহখানি সুসজ্জিত হইলে যেরূপ আমি সুখী হই, ঠিক সেইরূপই দেহ, প্রাণ, মন ইত্যাদির সহিত 'আমি' সুখ-দুঃখের সম্বন্ধবিশিষ্ট । দেহাদির সুখ-দুঃখে 'আমি' সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে মাত্র । কেন করে, তাহা পরে বলিব । বস্তুতঃ 'আমি' কিন্তু সুখ-দুঃখশূন্য দেহাদিশূন্য একজন ।

এইরূপে আমরা যাহাকে যথার্থ অন্বেষণ করি, সেই প্রকৃত বস্তুটির সন্ধান পাইলাম । এইবার আমরা উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি । এতক্ষণ আমরা বিচারবুদ্ধির সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, এইবার শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্য লইতে হইবে ; কারণ যথার্থ আত্ম-স্বরূপ জ্ঞান তাঁহার কৃপা ব্যতীত হইবার উপায় নাই ; তবে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা যতটুকু ধারণা করা যাইতে পারে, ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ?

আচ্ছা, ঐ যে দেহাদি হইতে পৃথক একটি 'আমি'র সন্ধান পাওয়া গেল, আমরা যদি উহার স্বরূপটি বলিতে বা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিব বা বুঝিব—অচিন্ত্য অব্যক্ত সর্বেন্দ্রিয়াগম্য কিন্তু 'সত্য' । চিন্তা করিয়া ঐ 'আমি' কে, তাহা ধরিতে পারি না, বাক্য দ্বারা বলিতে পারি না, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করিতে পারি না ; কিন্তু সে জিনিষটি যে সত্যই আছে, তাহা বুঝিতে পারি । কোনরূপেই 'আমি' নাই, ইহা প্রতীতি গোচর হয় না । এই যে সত্য 'আমি', আমরা সর্বদাই ইহার উপলব্ধি করিতেছি, অথচ বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা থাক, এই 'আমি'র নাম রাখ সত্য বা আত্মা ।

শাস্ত্র বলেন, এই আত্মার স্বরূপ আনন্দ । আনন্দ বস্তুটির বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সত্য-জ্ঞান-আনন্দ অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ । সৎ একটি সত্তা — একটা কিছু আছে । চিৎ ঐ সত্তাটি চৈতন্যময়, সেই যে আছে বলিয়া একটা প্রতীতি হয়, উহা শুধু সত্তা নহে —উহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং ঐ জ্ঞানময় সত্তাটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় । আরও একটু সরলভাবে আলোচনা করা যাউক । —'আমি' আছে, আমি বুঝিতেছি যে, 'আমি' আছে এবং ঐ 'আমিটিই' আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু ; সুতরাং আনন্দময় । এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই 'আমি' । এই 'আমিই' সত্য । এই সত্যলাভই জীবমাত্রের উদ্দেশ্য, কারণ, ওখানে—ঐ আমিতে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না কিছুই নাই, অথচ পূর্ণ আনন্দ আছে । পার্থিব সুখ এবং এই আনন্দ কিন্তু ঠিক এক জিনিষ নয় । এ জগতে অভীষ্ট বস্তু পাইলে আমার সুখ হয়, তদ্বিপরীতে দুঃখ হয় ; 'আমি' কিন্তু এমনই একটি ক্ষেত্র, যেখানে অভীষ্ট-অনভীষ্ট, পাওয়া বা না

পাওয়া কিছুই নাই অথচ সর্বদা আনন্দ রহিয়াছে। এক কথায় উহাতে অপর কোনও ভাব, যথা—দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ধর্ম, অধর্ম, সুঃখ, দুঃখ, জীব, জগৎ ইত্যাদি কোনও ভাবই নাই। ঐ যে সর্বভাববিনির্মুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, উনিই হইতেছেন 'আমি'। উনিই সত্য। উঁহাতে নিত্যযুক্ততা-উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি। স্থূলকথায় এই 'আমি' বস্তুটিকে সর্বদা ধরিয়া থাকাই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে মানুষ আমি কে, তাহা জানে না, সে পশু ; ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। এই 'আমিই' সাধকের ইষ্টদেব। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, আল্লা, গড প্রভৃতি ইঁহারই বিভিন্ন পর্যায়মাত্র। যে সাধক তাহার ইষ্টদেবের যত অধিক নিকটবর্তী সে-ই তত উন্নত, তত সুখী ; কারণ, সুখ বা আনন্দই তাহার স্বরূপ। পরে এই সকল তত্ত্ব বহুস্থানে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা এই আত্মতত্ত্বটি বেশ বুঝিয়া লইয়া তবে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে। অম্ভৃণঋষির দুহিতা বাক্ যখন এই সত্যে—এই আমিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীসূক্ত। তিনি বলিতেছেন— **'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি'** আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি।

একাদশ রুদ্র—'রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্র'। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলিয়াছেন—অন্তকালে যিনি সকলকে কাঁদাইয়া থাকেন, তিনি রুদ্র। চক্ষু, কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ রুদ্র। ইহারাই জীবের জন্ম-মৃত্যুর হেতু ; সুতরাং কাঁদাইবার কর্তা। আমরা যে ইন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি করিতেছি, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ 'আমি'—আত্মা ; অন্য কেহ নয়। 'আমিই' ইন্দ্রিয়পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। 'আমি যে আছেন', ইহা আমরা ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা প্রতিনিয়ত বোধ করিতেছি। যখন ইন্দ্রিয় ও মন সুপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসত্তার উপলব্ধি করিতে পারি না ; সুতরাং আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করি এবং মনে যাহা কিছু ভাবি, সকলই সত্যস্বরূপ আত্মা। সাধক ! বেদের এই সকল বাণী হৃদয়ে অতি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রাখিও, চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া যেন ভুলিয়া যাইতে না হয়।

অষ্টবসু—ধন বা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ! অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যরূপে ঐ সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। অথবা ভাগবতে বসু শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হইলে, সাধকের পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি অষ্টবিধ বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাই ভক্তগণের বসু বা ঐশ্বর্য। এই অষ্টবসুরূপেও 'আমি'—সত্যস্বরূপ আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন।

অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ—আমিই দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেববৃন্দরূপে প্রকাশমান। আদিত্য—অদিতি হইতে সঞ্জাত। অদিতি—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ী। বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও মন ; এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত। অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় আবার গুণত্রয়ের সংযোগ তারতম্যবশতঃ দ্বাদশ ভেদবিশিষ্ট হয়। যথা সত্ত্ব-গুণাত্মক বুদ্ধি, রজো-গুণাত্মক বুদ্ধি এবং তমো-গুণাত্মক বুদ্ধি। এইরূপ মন, চিত্ত ও অহঙ্কার ত্রিগুণে গুণিত হইয়া দ্বাদশপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হয় ; ইহারাই আদিত্য নামে অভিহিত। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণরূপে একমাত্র 'আমি'—সত্য স্বরূপ আত্মাই প্রকাশমান।

মনকে একবার রুদ্র বলিয়া আবার আদিত্য বলায় কোন দোষ হয় নাই। মনের যে অংশ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়াভিমুখী বা ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, তাহাই রুদ্র—দুঃখদায়ক। আর যে অংশ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের অভিমুখী, তাহাই আদিত্য অর্থাৎ মনের সেই অংশে চৈতন্যের প্রকাশ ধর্ম অধিক আছে।

বিশ্বদেব—যে চৈতন্য এই বিশ্বরূপে বিরাজিত তাহাই বিশ্বদেব। এই বহু নাম-রূপ ও ব্যবহারবিশিষ্ট হইয়া যে চৈতন্য-সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, উহারই নাম বিশ্বদেব। নাম, রূপ ও ব্যবহারভেদে ঐ চৈতন্যাংশের অসংখ্য ভেদ পরিলক্ষিত হয় ; তাই বিশ্বদেব বহু। এই বিশ্বদেব মূর্তিতেও 'আমি'—আত্মাই নিত্য প্রকাশিত ; সুতরাং জগদ্রূপে যাহা আমাদের প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—**'যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্'**। এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কর—বোধ কর সকলই সত্য। সাধক ! মনে রাখিও—এই পরিদৃশ্যমান

বিশ্বরূপে একমাত্র সত্য 'আমি'রই প্রকাশ । এই জগৎ প্রপঞ্চই—'আমি'র ব্যক্তস্বরূপ । এ সকল তত্ত্ব দেবী-মাহাত্ম্যে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইবে ।

অহং মিত্রাবরুণৌ—মিত্র সূর্যের অন্য নাম । দ্বাদশাদিত্য মধ্যে ইনি প্রধান । অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণাত্মক প্রকাশের নাম মিত্র । এক কথায় ধর্মই মিত্র । ধর্মই যথার্থ বন্ধু ; কারণ, মৃত্যুর পরও ধর্ম সঙ্গে গমন করে ও আনন্দ প্রদান করে । বরুণ—জলাধিপতি । জীবকে অনন্ত কালের জন্য সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন করে বলিয়া অধর্মই এস্থলে বরুণ শব্দের অর্থ । অতএব **'মিত্রাবরুণৌ'—'ধর্মাধর্মৌ'** ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে ।

ইন্দ্রাগ্নী— সুখ-দুঃখে । ইন্দ্র—ঐশ্বর্যশালী অর্থাৎ সুখস্বরূপ ; অগ্নি—দাহজনকত্বহেতু দুঃখস্বরূপ ; সুতরাং ইন্দ্রাগ্নী শব্দের অর্থ—সুখ এবং দুঃখ । এইরূপ **অশ্বিনৌ —প্রাণাপানৌ ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ** । প্রাণ এবং অপান বায়ুকে অশ্বিনীকুমার কহে । মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্রাগ্নী এবং অশ্বিনৌ ; ইহারা উভয়াত্মক দেবতা ; ইহারাই দ্বন্দ্ব । স্থূলজগতে এই সকল দেবতা ধর্মাধর্ম, সুখ-দুঃখ এবং প্রাণ-অপানরূপে প্রকাশিত । এই ধর্মাধর্ম এবং তজ্জন্য সুখ-দুঃখ ও তাহার ভোগস্থান অপানসহকৃত প্রাণরূপে একমাত্র 'আমি'—বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশিত । প্রাণ একটি জড়বায়ুমাত্র নহে ; অনুভূতি-স্থান । অপানের সহচারিত্ব নিবন্ধনেই প্রাণের ভোগ নিষ্পন্ন হয় ।

'উভৌ বিভর্মি' শব্দের অর্থ—উভয়কে ধারণ করি । আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ নাই ; সুতরাং তিনিই ঐ সকলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই সকল বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াও তাঁহার স্বীয় বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্য সত্তার বিন্দুমাত্র বিকার হয় না । একমাত্র আত্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ; সুতরাং তিনি—আমি এক অথচ বহুভাবে বিরাজিত ; সুতরাং বহুভাবের ধারণকর্তা । সেইজন্য মন্ত্রে **'বিভর্মি'** পদটির প্রয়োগ হইয়াছে ।

এইখানে বলিয়া রাখি—রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল নামে কোন দেবমূর্তি নাই । রুদ্রাদি শব্দ যে বিশিষ্ট চৈতন্যের প্রকাশক, সেই বিশেষ ভাবাপন্ন চৈতন্যাংশের নামই দেবতা । উঁহারা সর্বত্র বিরাজিত । ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া কৃপাপূর্বক বিশিষ্ট মূর্তিতে উঁহারাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন । ভক্তগণের স্ব স্ব সংস্কারানুরূপ ঐ সকল মূর্তির প্রকাশ হয় । তাহাই পুরাণাদিশাস্ত্রবর্ণিত দেবমূর্তি । দেবতাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে ।

অহংসোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্ ।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২॥

অনুবাদ । আমি শত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে ধারণ করি । যাহারা দেবতাগণের উদ্দেশে প্রচুর হবির্যুক্ত সোমযাগাদি অনুষ্ঠান করে, সেই যজমানগণের যজ্ঞফল আমিই ধারণ করি।

ব্যাখ্যা । আহনস্ শব্দের অর্থ শত্রুহননকারী । সোম শব্দের অর্থ সোমযাগ । দুর্জয় কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে নির্জিত করিবার জন্য সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করা হয় । পক্ষান্তরে, সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র । চন্দ্র মনের অধিপতি দেবতা । মন যখন কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপ রিপুগণকে বশীভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে আহনস্ সোম বলা যায় ।

ত্বষ্টা—বিশ্বকর্মা । যিনি এই বিশ্বকে গঠন করেন । অর্থাৎ যে চৈতন্যকর্তৃক বিশ্ব বহুবিধ নামে ও রূপে ব্যাকৃত হয়, তিনিই ত্বষ্টা ।

পূষণ্— সূর্য । পক্ষান্তরে পুষ্টিরূপা চেতনা । যে চৈতন্য দৈহিক এবং মানসিক পুষ্টিরূপে প্রকাশিত তাঁহারই নাম পূষণ্ ।

ভগ—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব । সর্ববিধ অভ্যুদয় ও ইচ্ছার অনভিঘাতরূপে যে চৈতন্য প্রকাশিত, তিনিই ভগ নামে কথিত হন ।

এই সকলকে অর্থাৎ শত্রুহননকারী সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে **'অহং বিভর্মি'** আমিই ধারণ করি । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা আমিই ঐ সকল রূপে আত্মপ্রকাশ করি ।

অহং দধামি দ্রবিণং—আমি দ্রবিণকে ধারণ করি ।

কেবল সোমযাগাদিরূপ কর্মকাণ্ডকেই যে ধারণ করি তাহা নহে, কর্মকাণ্ডের যাহা দ্রবিণ তাহাও আমাকর্তৃক পরিধৃত। শাস্ত্রবিহিত কর্মকাণ্ড যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে তজ্জন্য একটি অপূর্ব অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট উপচিত হয়। কালে ঐ অপূর্ব যথোক্ত ফল প্রসব করে। এই অপূর্বকে দ্রবিণ বলে।

হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে—যজমানগণ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতৃগণ দেবতাগণের উদ্দেশে প্রচুর হবির্যুক্ত যে সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ঐ সকল যাগাদির যাহা দ্রবিণ, তাহা কালান্তরভাবি ফলের জন্য যজমানগণের নিমিত্ত আমিই ধারণ করিয়া থাকি।

একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমিই যাবতীয় কর্মরূপে, কর্মসংস্কাররূপে এবং কর্মফলরূপে বিরাজ করি। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

———o———

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥৩॥

অনুবাদ। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিশ্বরী। আমি পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। আমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপা সম্বিদ্ বা জ্ঞানরূপা। এই জ্ঞানই যাবতীয় উপাসনার আদি। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা। আমি ভূরিভাবে অনন্তজীবে প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে আমাকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে অহং পদটি স্ত্রীলিঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে। অহং অলিঙ্গক, সর্বলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। একটি গানেও শুনিয়াছি,—'তুমি পুরুষ নারী চিন্‌তে নারি, কোনও যুক্তিশাস্ত্রে মিলে না'। এই মন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এবং অন্যান্য মন্ত্রেও শক্তিরূপে চৈতন্যের বিকাশ দেখিয়াই বোধ হয় প্রাচীন আচার্যগণ এই বেদমন্ত্রগুলিকে দেবীসূক্ত আখ্যা দিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি—'অহং' অব্যক্ত অনির্দেশ্য। বাক্যের মধ্যে আসিলেই তিনি শক্তিরূপে প্রকাশিত হন। রাম, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর, দুর্গা, কালী, রাধা ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর কিংবা ব্রহ্ম প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবে ইহা স্থির, যতক্ষণ তিনি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কিংবা ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া প্রকাশিত, ততক্ষণ তিনি শক্তিরূপেই প্রত্যক্ষীভূতা।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা মন্ত্রটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। **'রাষ্ট্রী'** শব্দের অর্থ প্রপঞ্চরূপে বিরাজিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্রী ; এক কথায় জগদীশ্বরী। 'বসু' শব্দের অর্থ ধন। পার্থিব গো-হিরণ্যাদি এবং অপার্থিব জ্ঞানবিদ্যাদি, এতদুভয় ধনের একমাত্র সঙ্গময়িত্রী অর্থাৎ সর্ববিধ-ধনদায়িনী 'আমি'। পূর্বে বলা হইয়াছে, ধনরূপে আমি প্রকাশমান ; এখন বলিতেছেন সেই ধনের প্রাপয়িত্রীও আমি।

'চিকিতুষী' শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা জীব 'আমি'র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সেই জ্ঞান-স্বরূপা 'আমি'—মা। **'প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্'**—এই জ্ঞানই যজ্ঞাঙ্গসমূহের মধ্যে প্রথম। 'আমি'র স্বরূপ কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া, যজ্ঞাদি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ; নতুবা ঐ সকল কর্ম অবৈধ হইয়া থাকে। তাই **'চিকিতুষী'** সমস্ত উপাসনার আদি। ইহা দ্বারা বুঝা গেল—উপাসনা, উপাসনার ফল এবং উপাসনার আদি বা কর্মকাণ্ডের মূলীভূত জ্ঞানরূপেও একমাত্র 'আমি'রূপী চৈতন্যসত্তাই বিরাজিত।

'ভূরিস্থাত্রা' শব্দের অর্থ বহুভাবে অবস্থিতা। **'ভূরি আবেশয়ন্তী'** শব্দের অর্থ বহুভাবে প্রবিষ্টা। অনন্তভাবে অবস্থিতা আমি। আবার অনন্তভাবের মধ্যে আমিই নিত্য-প্রবিষ্টা। **'তাং মা দেবা ব্যদধুঃ'**—এইরূপ 'আমি'-কে—আত্মাকে দেবতাগণ ভজনা করে। দেবতাগণ—উন্নতজ্ঞান-বীর্যসম্পন্ন সন্তানগণ এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগদ্রূপে প্রকাশমান 'আমি'কে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ যেখানে যাহা কিছু দেখে, যেখানে যাহা কিছু পায়, তাহাই যে 'আমি'—তাহাই যে সত্য আত্মা, এইরূপ জ্ঞান নিয়া সরল শিশুর ন্যায় আমাকে আত্মা বলিয়া—মা বলিয়া ডাকে। ইহাই ত' দেবতাদিগের লক্ষণ।

———o———

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ ৪॥

অনুবাদ । জীব যে অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, দর্শন করে এবং প্রাণধারণ করে, এই সকল ক্রিয়া আমাকর্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । যাহারা আমাকে এইরূপ (সর্বকর্মের ভিতর দিয়া) দেখে না, বুঝিতে পারে না, তাহারাই সংসারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । হে সৌম্য ! তোমায় এই যে সকল তত্ত্ব বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর ।

ব্যাখ্যা । অন্ন শব্দের অর্থ আহার্য দ্রব্য । স্থূল দেহ রক্ষার জন্যই হউক, অথবা মনোময়াদি সূক্ষ্ম দেহ পুষ্ট করিবার জন্যই হউক, জীব যে আহার বা বিষয় আহরণ করে, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা 'আমিই' নির্বাহ করিয়া থাকি ।

বিপশ্যতি—দর্শন করে । কি জ্ঞান-নেত্রে, কি বহিশ্চক্ষুতে জীব যে প্রত্যক্ষ করে, ঐ প্রত্যক্ষ করা রূপ ক্রিয়াটিও 'আমি' কর্তৃক নির্বাহিত হয় ।

যঃ প্রাণিতি—ঐ যে প্রতিনিয়ত শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণন-ক্রিয়া দ্বারা জীবগণ জীবিত রহিয়াছে, উহারও একমাত্র কর্তা আমি ।

যঃ শৃণোতি—ঐ যে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা জীবগণ শব্দ গ্রহণ করিতেছে, উহারও কর্তা একমাত্র 'আমি' ।

এইরূপ সর্ববিধ কর্মই যে 'আমি' কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা যাহারা মানে না—বিশ্বাস করে না, তাহারাই **'মাং অমন্তবঃ'** । মানুষ দিবারাত্র যে পুরুষকার বলিয়া চীৎকার করে, যে অহংবোধ নিয়া জগতে বেড়ায়, সেই পুরুষটি কে ? সেই অহং-এর স্বরূপ এবং কার্য কি ? একটু লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারে ; অথচ যাহারা ইচ্ছা করিয়া ইহা বুঝিতে চায় না, তাহারাই 'আমি'কে উপেক্ষা করে, অবমাননা করে । ঈশোপনিষদে — এইরূপ মনুষ্যকেই আত্মহন্ বা আত্মঘাতী পুরুষ বলা হইয়াছে । এইরূপ যাহারা সত্যকে—আত্মাকে অবমাননা করে, **'ত উপক্ষীয়ন্তে'** তাহারাই সংসারে নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে ।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপ ধর্মটি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় । জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে এই ধর্মের বিকাশ না থাকিলে তাহাকে পশু অপেক্ষাও হীন মনে করা অন্যায় নহে । কার্যতঃ, জগতেও সে সকলের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে । মনে কর, তুমি পথিমধ্যে এমন এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছ যে, সামান্য একটিমাত্র পয়সার জন্য লাঞ্ছিত হইতেছ, নিজ বাড়িতে আসিলে একটি পয়সা কেন, একশত টাকার জন্যও তোমার অভাববোধ হয় না ; কিন্তু আজ তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একটি পয়সার অভাবে অসম্মানিত হইতে বসিয়াছ । এমন সময় কোন অপরিচিত লোক অযাচিতভাবে তোমাকে একটি পয়সা দিয়া উপকার করিল । তুমি বাড়ি আসিয়া পয়সাটির বিনিময়ে তাহাকে শত টাকা দিলে ; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তোমার বুকের ভিতর একটা কৃতজ্ঞতার ভাব—একটা অবনত ভাব ফুটিয়া উঠিবেই, যদি তুমি মানুষ হও । আর —যিনি আমাদিগের সর্বকর্মের প্রেরক, যাঁহার আলোক-সম্পাতে আমাদের এই জগদ্ভোগ, যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন, যে প্রাণ আমাদের সর্বস্ব, সেই প্রাণরূপে যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সর্ববিধ ভোগ-বাসনা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁর দিকে একবারও আমরা সম্পূর্ণ সরলভাবে একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না ; আমরা যদি সংসারে উপক্ষীণ না হই, তবে কে হইবে ? তাই আত্মা—সত্য । মা আমার গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—'হে শ্রুত ! হে সৌম্য ! **তে বদামি শ্রদ্ধিবং শ্রুধি**' । তোমায় আত্মস্বরূপ যাহা প্রকটিত করিতেছি, তাহা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর । 'আমি'কে অশ্রদ্ধা করিও না । উহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, উঁহাকে পূজা কর, উঁহার মহত্ত্ব দর্শন কর ।

জীব ! দেখ ! তোমার আহার বিহার প্রভৃতি জাগতিক কার্য, এমনকি অতি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসটি হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষলাভ পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মের ভিতর দিয়া চৈতন্যরূপে, বোধরূপে, জ্ঞানরূপে, অনুভূতিরূপে কে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ! দেখ, কোথা হইতে কর্মগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে । দেখ, সর্বকর্মের নিয়ন্তা কে ? আর কেহ নয়— তোমার সর্বদা অনুভূত তিনি, তোমার অতি প্রত্যক্ষ তিনি,

তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি মুহূর্তার্দ্ধকালও থাকিতে পার না। তাঁহাকে দূরে মনে কর, তাই দূরে ; নতুবা নিকট হইতে নিকটে তিনি। তিনি তোমার 'আমি'— সর্বেন্দ্রিয়াগম্য অথচ সত্য। শরণ লও তাঁহার চরণে।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫॥

অনুবাদ। আমি স্বয়ংই এই সকল তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকি ; দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক ইহাই পরিসেবিত। 'আমি' যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্বাপেক্ষা উন্নত পদ প্রদান করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, তাহাকে আত্মজ্ঞানধারণোপযোগিনী মেধা প্রদান করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা। বাস্তবিকই 'আমি'র তত্ত্ব আমি ব্যতীত আর কে বলিতে পারে ? কারণ, আমি বেদ্য, আমি বেত্তা, আমিই সকল জানেন, 'আমি'কে জানিবার দ্বিতীয় কেহ নাই, তাই বলিতেছেন —'**অহমেব স্বয়মিদং বদামি**'। আর এই তত্ত্ব আত্মস্বরূপাবগতি দেবতা ও মনুষ্যগণের একান্ত প্রার্থিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রমুখ দেবতাবৃন্দ অনন্তকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, ইহা তোমরা পুরাণ-প্রসঙ্গে শুনিতে পাও। তাঁহারা অত উচ্চপদ পাইয়াও কোন্ বস্তুর অন্বেষণ করেন, এইবার তাহা বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ঐ 'আমি'—ঐ সত্য যেখানে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই নাই। তাঁহারা সেই ভাবাতীত নিত্য-নিরঞ্জন আত্মা—'আমি'রই সন্ধান করিতেছেন। আর মনুষ্যগণ ত' করিবেই।

'**জুষ্টং**' শব্দের অর্থ সেবিতও হইতে পারে। 'ক্ত' প্রত্যয়টি বর্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়। দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 'আমি'রই সেবা করিতেছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা জীবভাবাপন্ন 'আমি'র সেবা করে, যাহারা জ্ঞানী তাহারা সর্বভাব-বিনির্মুক্ত 'আমি'র সেবা করে। আমি একজন— **একোঽহং**। জীবভাবের মধ্য দিয়াই হউক, বা দেবভাবের মধ্য দিয়াই হউক, অথবা সর্বভাব-বিরহিতই হউক, এক আমি— সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই বিরাজিত।

যং কাময়ে— আমি যাহাকে (উন্নত করিতে) ইচ্ছা করি, তাহাকে উন্নত করি। 'আমি'রই ইচ্ছায় জীব সর্বাপেক্ষা উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়। উন্নতি দ্বিবিধ— পার্থিব এবং অপার্থিব। পার্থিব — সুখ, সমৃদ্ধি, যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ করিয়া কেহ মনে করিও না— তোমরা দৃঢ় প্রযত্ন ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উহা লাভ করিয়াছ। ঐ উন্নতির, ঐ অভ্যুদয়ের, ঐ পুরুষকারের একমাত্র হেতু পুরুষরূপী 'আমি'র ইচ্ছা। তারপর অপার্থিব। ইহা তিন প্রকারে প্রকাশ পায়—সুমেধা, ঋষি ও ব্রহ্মা। সচ্চিদানন্দরূপী 'আমি'র ইচ্ছায় জীব যখন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আস্বাদ পায়, তখন সে সুমেধা হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী বুদ্ধি লাভ করে। যতদিন এই ধারণাবতী মেধা লাভ না হয়, ততদিন '**শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ**' বহুবার এই জ্ঞান এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারে না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সূচনায় জীব সুমেধা হয়। তারপর ঋষিত্ব লাভ করে। '**ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ**'। যিনি সর্বত্র সর্বাবস্থায় ব্রহ্ম-সম্বেদনে, আত্মানুভূতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার সেই বেদন বা অনুভূতিগুলি যখন ভাষার আকারে বাহিরে আসে, তখন উহাই মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকই ঋষি। এক কথায় সর্বত্র আত্মদর্শীই যথার্থ ঋষি। ইহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় স্তর। তারপর ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ, জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কেন্দ্র-স্থান। সেইস্থানে জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। যতদিন পরান্তকাল বা ব্রহ্মলীলার অবসান না হয়, ততদিন জীবকে ব্রহ্মলোকেই বাস করিতে হয়। এই যে অপার্থিব ত্রিবিধ উন্নতি—ইহাও একমাত্র আত্মা— 'আমি'রই কামনা। 'আমি'রই ইচ্ছায় এই সকল সংঘটিত হয়।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥৬॥

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী বিনাশযোগ্য

রুদ্রকে (একাদশ ইন্দ্রিয়কে) হনন করিবার জন্য প্রণব-রূপী ধনুতে আত্মরূপ শর যুক্ত করিয়া থাকি এবং এইরূপে আমিই জনসমূহের জন্য যুদ্ধ করি। আমি স্বর্গ, মর্ত—উভয়লোকে সর্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট।

ব্যাখ্যা। রুদ্র—দশ ইন্দ্রিয় ও মন (প্রথম মন্ত্র দেখ), ইহারাই ব্রহ্মদ্বিষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। এস্থলে 'রুদ্র' শব্দে একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে ; যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ মনেরই অন্তর্গত। মনের সত্তায় ইন্দ্রিয়সত্তা, মনের লয়ে ইন্দ্রিয়েরও লয় হয়। মনই একমাত্র শরব্য অর্থাৎ বিনাশ্য। শরপাতযোগ্য স্থানকে শরব্য বলে। যকারলোপ ছান্দস।

সায়নাচার্য **'শরবে'** শব্দের অর্থ করিয়াছেন, হিংস্র। সে অর্থও এস্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে। মন ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী ; সুতরাং মনকে হিংস্র বলা যায়। ধনু শব্দের অর্থ প্রণব—ওঁঙ্কার অথবা মন্ত্রমাত্র। আতনোমি শব্দের অর্থ—শর যোজনা করি। উপনিষদ্ বলেন — **'প্রণবো ধনু শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে'**। প্রণব ধনুঃ, শর আত্মা (জীবাত্মভাব), ব্রহ্মই লক্ষ্য। প্রণব বা মন্ত্ররূপ ধনুতে জীবাত্মবোধরূপী শর যোজনা করিয়া ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহার ফল হয়—মনের লয়। এই মনই রুদ্র। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। এই মনই 'আমি'কে—অখণ্ড চৈতন্যকে, খণ্ড-জ্ঞানে জগদাকারে পরিণত করে, তাই মন হিংস্র অর্থাৎ শরব্য ; ইহাকে **'হন্তবৈ'** হনন করিবার জন্য যে ধনুঃশরসংযোজনা অর্থাৎ যোগ, ধারণা, সমাধি কিংবা পূজা, হোম, প্রার্থনা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হয় ; সেই উপায় সকলও **'আমিই'**। সাধনারূপেও 'আমি'ই প্রকাশমান।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে—রুদ্ররূপে 'আমি' বিরাজিত। এখানে আবার সেই রুদ্রকে হনন করিবার জন্যও 'আমি'ই উদ্যত। ইহাই 'আমি'র কার্য—জীবরূপে, জগৎরূপে, বন্ধনরূপে 'আমি'। আবার এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবার জন্য—অখণ্ড 'আমি' হইবার জন্য যে যোগসাধনাদি উপায়, তাহাও 'আমি'। বন্ধন 'আমি', বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় 'আমি', আবার মুক্তিও 'আমি'।

এখানে বলিয়া রাখি—এই মন্ত্রটি পূর্বোক্ত পাঁচটি মন্ত্রের পরে উক্ত হওয়ারও একটু রহস্য আছে—যাঁহারা সর্বভাবে আত্মাকে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন অর্থাৎ **'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা'** এই বেদমন্ত্রের সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারাই রুদ্র বা মনের বিনাশ করিবার জন্য আত্মার ধনুশর-সংযোজনরূপ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাই প্রথম পাঁচটি মন্ত্রে সর্বভাবে আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে সেই সর্বভাব-বিলয়পূর্বক একাত্মপ্রত্যয়মাত্রের সাধনরূপেও 'আমি' বা আত্মাই যে উদ্যত, তাহা ব্যক্ত হইল। বুদ্ধিযোগীর পক্ষে এ সকল অবস্থা প্রায় অযত্নলভ্য বলিয়াই মনে হয়।

অহং জনায় সমদং কৃণোমি—'আমি'—বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জীবের জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকেন। যখন জীবের প্রাণ আত্মরাজ্যস্থাপন করিতে উদ্যত হয়, তখন সে দেখিতে পায়, মন কর্তৃক সর্বস্ব অপহৃত। প্রাণ চায় ভগবৎচরণে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইতে, মন চায় সংসার বাসনায় আবদ্ধ রাখিতে। তখনই জীব-জীবনের শুভ সন্ধিক্ষণ, তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কুরুক্ষেত্রে—কর্মক্ষেত্রে এইরূপে যে সমর সংঘটিত হয় এবং তৎপর বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে যে দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হয়, (যাহা চণ্ডীতত্ত্বে বর্ণিত) তাহাও 'আমি'ই করিয়া থাকি। সুতরং কি সাধনাক্ষেত্রে, কি বিষয়ক্ষেত্রে —সর্বত্র সর্বকর্মের একমাত্র নিয়ন্তা 'আমি'—আত্মা।

অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ—আমি দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশ করিয়া সর্বত্র সম্প্রবিষ্ট। দেবলোক বিজ্ঞানময় কোষ। এই স্থানে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তার দর্শন হইয়া থাকে। ভূলোক—অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহ। অন্যান্য কোষগুলি উক্ত উভয় লোকের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক উল্লিখিত হয় নাই। আত্মার অন্নময় কোষ—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। প্রাণময় কোষ—সৃষ্টিস্থিতি-ক্রিয়াশক্তি। মনোময় কোষ—বহুভাবে ব্যক্ত হইবার সঙ্কল্প। বিজ্ঞানময় কোষ—যে জ্ঞানে এই বহুত্ব সঙ্কল্প ধৃত হইয়া আছে। আনন্দময় কোষ—যে স্থলে আত্মার স্বরূপ কেবলানন্দময়। এই স্থানে জগতের বীজ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। এই সমষ্টি বা বিরাট্ বিজ্ঞানময় কোষই স্বর্গলোক। জীবভাবীয় ব্যষ্টি বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলেই এই স্বর্গলোকে

অনায়াসে গতিশীল হওয়া যায় এবং অসংখ্য দেবদেবীমূর্তিদর্শন — নানারূপ আত্মবিভূতি লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব এই বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা—ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। প্রত্যেক মানুষই ইচ্ছা করিলে এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে; ধ্রুব সত্য।

———○———

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম
যোনিরপ্ স্বন্তঃসমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বোতা-
মূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭॥

অনুবাদ। আমি জগৎপিতাকে প্রসব করি। ইহার উপরিভাগে আনন্দময় কোষভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় কোষে আমার কারণ-শরীর অবস্থিত। আমি সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতা। ঐ যে দূরবর্তী স্বর্গলোক তাহাও আমি স্বকীয় শরীরদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি।

ব্যাখ্যা। জগৎপিতা হিরণ্যগর্ভ; যাহা হইতে এই জীবজগৎ জাত। পূর্বে বলিয়াছি, ইহা পরমাত্মার মনোময় কোষ বা সমষ্টি মন। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের আদি—আকাশ বা ব্যোমতত্ত্ব। এই ব্যোমতত্ত্বের উপরে মন আছে। মনের আকাশাদি ভূতসমূহের সঙ্কল্প থাকে। আমরা যেমন মনে নানারূপ কল্পনা করি, সেইরূপ সমষ্টি বা বিরাট মনের কল্পনা— এই ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের মনের কল্পনাগুলি ক্ষণস্থায়ী ও অন্যের অদৃশ্য; কিন্তু মনোময় আত্মার সঙ্কল্প ঘন, দীর্ঘ কালস্থায়ী ও সর্ব জীবের ভোগ্য। এই বিরাট্ পুরুষের নাম হিরণ্যগর্ভ —ইনিই জগতের পিতা। ইঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা —'আমি' প্রসব করিয়া থাকি। এক কথায় আমি—জগৎপিতারও জননী।

অস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিঃ—ইহার উপরে আমার কারণদেহ অবস্থিত। অপ্সু অন্তঃসমুদ্রে—সমুদ্রের মধ্যস্থিত জলে। সমুদ্র শব্দের অর্থ আনন্দ। শ্রুতিতেও আছে—এই সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবান অর্থাৎ আনন্দময়। ধাতুপ্রত্যয়ের অর্থ দ্বারাও সমুদ্র শব্দে আনন্দ পাওয়া যায়— সম্ পূর্বক ক্লেদনার্থক উদ্ ধাতু হইতে সমুদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। সম্যক্ প্রকারে ক্লিন্ন অর্থাৎ রসার্দ্র করে বলিয়াই ইহার নাম সমুদ্র। আনন্দই জীবকে রসার্দ্র করে, তাই সমুদ্র আনন্দ। আচার্য সায়নদেবও ইহার অর্থ করিয়াছেন —পরমাত্মা। পরমাত্মা ও আনন্দ একই কথা। অপ্ শব্দের অর্থ — ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি; ইহা সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। ধীবৃত্তির অন্য নাম বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরমাত্মার পঞ্চ কোষের বিবরণ প্রকটিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝিলাম— আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানময় কোষই হিরণ্যগর্ভের উপরে অবস্থিত—উহাই **'মম যোনিঃ'** পরমাত্মার কারণ শরীর। জীবের কারণ-শরীর যদিও আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত, তথাপি কেবল আনন্দময় কোষই কারণ নহে, তন্মধ্যস্থ বিজ্ঞানই হইতেছে প্রকৃত কারণ। বিজ্ঞানেই এই জগৎ পরিধৃত, উহা উদাসীন সাক্ষিবৎ দ্রষ্টামাত্র। উহারই ঈক্ষণে বা আলোক-সম্পাতে এই প্রকৃতিরূপী মন অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতেছে। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ জগৎপিতার উপরেই 'আমার'—আত্মার কারণ-শরীর অবস্থিত।

ততোবিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বা—অতএব সমস্ত ভুবনে 'আমি'ই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছি। **'উত অমূং দ্যাং বর্ষ্মণাউপস্পৃশামি'** ঐ যে সাধারণ জীবের পক্ষে দূরবর্তী স্বর্গলোক—যাহা বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই স্থানেও আমি স্বকীয় শরীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই 'আমার' —সচ্চিদানন্দের শরীর; তবে দ্যুলোকে আরোহণ করিতে পারিলেই বিশেষভাবে 'আমার' স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায়; ইহাই এই বাক্যের বিশেষ তাৎপর্য।

———○———

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যার-
ভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সম্বভূব॥৮॥

অনুবাদ। আমি যখন বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই, তখনই এই সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই স্বর্গ, মর্ত্যের পরেও আমি বর্তমান। ইহাই আমার মহিমা।

ব্যাখ্যা। বায়ুর ন্যায় প্রবাহশীল কথাটি ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক। ভূতজাতের মধ্যে আকাশ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও

সর্বাধার। কিন্তু বায়ু প্রবাহরূপ ক্রিয়াশক্তিময়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—**'যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্। তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়'**। যেরূপ সর্বত্রগামী ও মহান বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সর্বভূত আত্মায় অবস্থিত। জীব যখন এই আত্মবস্তু-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ইহাকে ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টই দর্শন করে। যতক্ষণ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আত্মসমীপস্থ হইতে হয়, ততক্ষণ যথার্থই ইনি বায়ুর ন্যায় প্রবাহশীলই বটে। তাই বেদান্তসূত্রে **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যাঁহাতে অবস্থিত এবং যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই 'আমি'। 'আমি'কে যাঁহারা জানিতে চাহিবেন, ঐ একটি কথাই তাহার উত্তর—**জন্মাদ্যস্য যতঃ**। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় সরল উত্তর নাই। এই যে জগৎ-প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং সংহন্ত্রী, শক্তিরূপা জননী, ইনিই 'আমি'। তাই মন্ত্রেও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—**'আরভমাণা'**। ইনিই সর্বজীবের সাধ্য এবং উপাস্য। এই বিশ্বভুবন যতদিন আছে, ততদিন ইনি **'বাত ইব প্রবামি'** অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তিরূপা—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। নির্গুণভাবেই হউক আর পুরুষভাবেই হউক, উপাসনা ব্যাপার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আত্মা ক্রিয়াশক্তি বা মহামায়া রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত 'আমার' আর একটি অবস্থা আছে——তাহাও উপসংহারে বলিতেছেন— **'পরো দিবা পর এনা পৃথিবী এতাবতী মহিমা'**। এই যে দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী এবং দ্যুলোকরূপী 'আমি'র স্বরূপ প্রকটিত করা হইল, ইহার উপরেও 'আমি' আছেন; উহা বাক্য এবং মনের অগোচর; উহাই জীবের গম্য এবং লক্ষ্য। জগদতীত নিরঞ্জন-স্বরূপে তাঁহার কোন মহিমার বিকাশ নাই। 'আমি'র মহিমা—এই জগৎ, এই দ্যু-ভূ-ব্যাপী বিরাট্ দেহ। বেদান্তসূত্রেও ইহা উক্ত আছে। কিরূপে নিত্য নিরঞ্জনস্বরূপটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, 'আমি'—মা আমার স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন জীব-জগৎ-আকারে বিরাজিত হয়েন, ইহাই বিস্ময়কর এবং ইহাই যথার্থ 'আমি'র মাহাত্ম্য।

এই মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হইবে। তাই চল সাধক, চল জীব, আমরা এতক্ষণ যে 'আমি'কে দেখিতেছিলাম, এইবার দেখি, তাঁহার মাতৃ-স্বরূপের অসীম উদার স্নেহবিকাশ, অনির্বচনীয় সন্তানবৎসলতা ও অভূতপূর্ব অলৌকিক মাহাত্ম্য আমাদের মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়।

———০———

অর্গলা—মাতৃমুখী গতি

অর্গল শব্দের অর্থ খিল। যেরূপ গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ থাকিলে সহসা কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; সেইরূপ দেবীমাহাত্ম্যপাঠের পূর্বে অর্গলা স্তোত্র পাঠ করিয়া লইলে, বাহ্য বিষয়সমূহ চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। বহির্মুখ বা একান্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ দুরূহ; তাই পরম কারুণিক পূর্বাচার্যগণ চণ্ডী পাঠের পূর্বে, চিত্তের বৃত্তিগুলিকে কথঞ্চিৎ মাতৃমুখী করিবার জন্য, এই অর্গলা, কীলক ও দেবীকবচপাঠের বিধান করিয়াছেন। মন্ত্রচৈতন্য না হওয়া পর্যন্ত স্তোত্রাদি পাঠের ফল অতি সামান্য মাত্র। দেবী-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মস্তোত্রে মন্ত্র-চৈতন্য ব্যাখ্যাত হইবে।

এই স্তোত্রে প্রথমেই—**'জয় ত্বং দেবী'** ইত্যাদি বাক্যে জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক চিত্তবৃত্তিকে মাতৃমুখে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। উক্ত স্তুতির প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করা হইল না; কারণ চণ্ডী-ব্যাখ্যাবসরে উহার প্রায় সকল পদেরই ব্যাখ্যা করা হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা বিশেষ কঠিন নহে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই উহা বুঝিতে পারিবেন। **'মধুকৈটভ-বিধ্বংসি'**, মহিষাসুর নির্নাশি ইত্যাদি শব্দের অর্থ যথাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই স্তোত্রের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেরই শেষার্দ্ধ—**'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি।'** এই অংশের ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন।

রূপং দেহি—(১) মা আমায় সুন্দর আকৃতি দাও, স্বাস্থ্যবান কর।

(২) মা! তোমার রূপটি আমায় দেখিতে দাও।

(৩) মা! জগৎময় যে তোমারই রূপ, তাহা বুঝিতে দাও।

(৪) মা ! আমার যে রূপের অভাববোধ আছে, তাহা দূর কর ।

এস্থলে দেহি শব্দের অর্থ 'অভাবং পূরয়'—অভাব পূর্ণ করার জন্যই 'দেহি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

(৫) মা ! একমাত্র নিরূপণীয় বস্তু পরমাত্মা ; আমাকে তাহার স্বরূপ বুঝিতে দাও । **'রূপ্যতে নিরূপ্যতে ইতি রূপং তচ্চ পরমাত্মবস্তু ।'** ইহাই রূপশব্দের অর্থ ।

জয়ং দেহি—(১) মা আমায় জয় দাও ।

(২) মা ! আমি যেন সাধন-সমরে জয়লাভ করিতে পারি ।

(৩) মা ! আমায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ে অধিকারী কর ।

(৪) মা ! জয়স্বরূপা তুমি আমার হও অর্থাৎ জয়রূপিণী তোমাতে আমার মতি হউক ।

(৫) মা ! আমায় সত্য-প্রতিষ্ঠ কর । এস্থলে জয় শব্দের অর্থ সত্য । উপনিষদ্ বলেন— **'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'** একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত, মিথ্যার জয় হয় না । সত্যই জয় । একমাত্র 'সত্যই' যে সর্বত্র সর্বভাবে বিরাজিত—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই যথার্থ জয়লাভ ।

যশো দেহি—(১) মা ! আমাকে কীর্তিমান কর ।

(২) মা ! 'আমি যে তোমার পুত্র' এই যশ আমাকে দাও ।

(৩) মা ! আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশ দাও ।

(৪) মা ! যশের ন্যায় নির্মল শুভ্র সত্ত্বগুণ উদ্‌বোধিত কর ।

(৫) মা ! আমায় নিত্য— চিরস্থায়ী যশ (পরমাত্ম-বস্তু) দাও, অর্থাৎ আমায় অমর কর—মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে নিয়ে চল । শাস্ত্রেও আছে — **'কীর্তির্যস্য স জীবতি'** যাঁহার যশ আছে, তিনি চিরজীবী —অমর । চিরজীবন লাভ করা, অমর হওয়া ও মুক্তিলাভ করা একই কথা । যাঁহারা জাগতিক কোন প্রসিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় হয়েন, তাঁহারা বাস্তবিকই অমর নহেন, দীর্ঘকাল স্মরণযোগ্যমাত্র । কিন্তু যাঁহারা অমৃতস্বরূপ আত্মবস্তু লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের আর মৃত্যুই হয় না । **'ইহৈব লীয়তে'** ইতি শ্রুতিঃ ।

দ্বিষোজহি—(১) মা ! আমার শত্রুদিগকে হনন কর !

(২) মা ! আমার কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে নাশ কর ।

(৩) মা ! আমার সাধনার বিরোধী ভাবসমূহ দূরীভূত কর ।

(৪) মা ! আমার ত্রিবিধ কর্মফল ধ্বংস কর ; কারণ, উহারাই আমার যথার্থ শত্রু, ব্রাহ্মীস্থিতির দুর্জয় অন্তরায় । উহারা আমাকে মায়ের কোল হইতে টানিয়া নামায় ।

(৫) মা সর্বই আমার শত্রু—মুক্তিমার্গের পরিপন্থী ; অতএব সর্বজ্ঞান—সর্বধর্মরূপ মহাশত্রু বিনাশ কর ।

প্রয়োজন বোধে আরও দুই একটি স্থানের অর্থ করা যাইতেছে—

'দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্'—(১) মা ! আমায় সৌভাগ্যবান কর এবং আরোগ্য দান কর ।

(২) মা ! তোমাকে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাকে দাও ।

(৩) মা ! সংসার-সমুদ্র পার হওয়াই যথার্থ সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্য আমাকে দাও । আমার এই ভবরোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু দূর করিয়া চির আরোগ্য প্রদান কর ।

'বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ'—(১) মা ! আমায় শারীরিক বল দাও ।

(২) মা ! আমায় চিত্তের বল দাও ।

(৩) মা ! আমায় পরমাত্মবস্তুলাভের উপযুক্ত বল প্রদান কর । শ্রুতিতে আছে — **'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'** বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না ; সুতরাং আমায় এমন বল দাও, যেন মা ! তোমায় লাভ করিতে পারি ।

'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্'—

(১) মা ! আমার মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন, এমন মনোরমা পত্নী দাও ।

(২) মা ! আমার পত্নীকে আমার মনোরমা ও অভিপ্রায়ানুসারিণী সহধর্মিণী কর ।

(৩) মা ! আমায় আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দাও, সেই শক্তি যেন আমার মনেরও প্রিয়তমা হয় এবং আমার চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেন সেই শুভ ইচ্ছাশক্তিরই অনুসরণ করে । আর যেন জগৎমুখী মনোবৃত্তি না থাকে ।

(৪) মা ! আমায় দৈবী প্রকৃতি দাও, সেই প্রকৃতি যেন আমার মনোরমা হয় এবং চিত্তের বৃত্তিগুলিও যেন তাহারই অনুসরণ করে।

কিছু না কিছু সদিচ্ছা, একটু না একটু দৈবী প্রকৃতি মানুষমাত্রেরই আছে ; কিন্তু উহা মনের পক্ষে প্রীতিজনক হয় না বলিয়াই ত' লোক জগদ্‌ভোগে মুগ্ধ থাকে ; এই ভাবটি যাহাতে দূরীভূত হয় অর্থাৎ আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি —দৈবী প্রকৃতিরূপিণী ভার্যা যাহাতে মনোরমা হয়,—মনের পক্ষে প্রীতিজনিকা হয়, তাহাই প্রার্থনা করা হইতেছে।

এইরূপ যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন, যে সাধক যেরূপে অভাব বোধ করেন, তাহা সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন। মায়ের নিকট চাহিতে কোন নিষেধ নাই। যাঁহারা আদর্শ পুরুষ— আমাদের দেশের পূর্বতন ঋষিমণ্ডলী, তাঁহারাও যখন যাহা আবশ্যক হইত অম্লান বদনে প্রার্থনা করিতেন ; ইহা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইত না। আর চাহিবার জন দ্বিতীয় কে আছে ? যিনি আমাদের প্রাণের প্রত্যেক ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করিবার জন্য নিত্য কল্পতরুরূপে বিরাজমান, তিনি আর কেহ নন, আমার মা —আত্মা বা আমি। চাহিতে হয়—উহার নিকট চাহ, বিমুখ হইবে না ; সরল বিশ্বাসে চাহিও। তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে বুক ভরিয়া রাখিও। শুধু চাহিতে পারি না বলিয়াই পাই না, ইহা বুঝিও। একজন মানুষের নিকট যতটা বিশ্বাস নিয়া চাহিতে পার, অন্ততঃ ততটা বিশ্বাস রাখিও— নিশ্চয়ই পাইবে। তা কে জানে ছোট জিনিষ, কে জানে বড় জিনিষ। ধন-রত্নই হউক, আর আত্মজ্ঞানই হউক, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। শুধু চাহিতে অভ্যাস কর।

যে স্থানে দেখিবে তুমি চাহিয়াও প্রার্থিত বস্তু পাইতেছ না, সেখানে বুঝিবে তোমার বিশ্বাস হয় নাই। যথার্থ 'মা কল্পতরু, এই সত্যই মা রহিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট চাহিতেছি' এই বোধ স্থির হইলে নিশ্চয়ই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। মা কোথায় ? সে অনুসন্ধান তোমাকে করিতে হইবে না। তিনি সর্বত্র সর্বরূপে পূর্ণভাবে বিরাজিতা। তুমি যেখানে বলিবে সেইখানেই তিনি শুনিবেন। মনে রাখিও—তোমার প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। তবে এই কথা যে, তিনি ইচ্ছা করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য দিতে পারেন, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র জিনিষ প্রার্থনা করা বালকোচিত কার্যমাত্র ; নতুবা চাহিতে কোন দোষ নাই। চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না।

সে যাহা হউক, চণ্ডীপাঠের প্রথমেই—এত কামনা পূর্ণ করিবার কথার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীব স্বভাবতঃ বিষয়বিমুগ্ধ, দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট, বাসনার আগুনে নিয়ত বিদগ্ধ ; সুতরাং যদি প্রথমেই বাসনা পূর্ণ হইবার সহজ উপায় দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়াও যদি জীব মাতৃ-মুখী হয়, তাহাও পরম সৌভাগ্য। আর যাহারা আত্মাভিমুখী গতি উপলব্ধি করিয়াছে, যাহারা মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, মাতৃ-লাভের জন্য আকুল পিপাসা যাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে তাহাদের পক্ষে যে সকল শক্তি লাভ একান্ত প্রয়োজন, যে বল লাভ করিতে না পারিলে, অতি গহন চণ্ডীতত্ত্বে বা মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, সেই বল লাভের জন্যই অর্গলাস্তোত্র। অথচ এই ব্যপদেশে স্তোত্রটি মন্ত্রচৈতন্য করিয়া পাঠ করিলে, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্মুখী হইয়া থাকে এবং সেই অবসরে শনৈঃ শনৈঃ সাধন-সমরে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়।

———০———

কীলক—অধিকার-নির্ণয়

কীলক শব্দের অর্থ এ স্থানে—অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। যাহাকে সাধারণ কথায় শাপ বলে। গায়ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রেই কোনও ঋষি কিংবা দেবতার শাপ আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই শাপ উদ্ধারেরও বিধান আছে। এই কীলকস্তুতিও শাপোদ্ধার-বিশেষ। সপ্তশতী-মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যের উপরও মহাদেব-কৃত কীলক আছে। সেই কীলক দূর করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ না করিলে, উহা অভীষ্ট ফলপ্রদানে অসমর্থ। এই শাপ বা কীলকের প্রকৃত রহস্য—অধিকার নির্ণয়। কিরূপ ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া, কিরূপ মানসিক উন্নতি লইয়া, কিরূপ সাধন-বল লাভ করিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই কীলকস্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যান্য মন্ত্রেরও

শাপোদ্ধার ব্যাপারটার প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই । সে যাহা হউক, এই স্তোত্রেই আছে—

কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ,
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি ।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্,
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ ।
স সিদ্ধঃ ... ... ।।

বঙ্গানুবাদ । কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে দান এবং প্রতিগ্রহ করিতে হয়, অন্যথা এই চণ্ডী প্রসন্না হয়েন না । এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব এই চণ্ডীকে কীলিত করিয়াছেন । যে ব্যক্তি নিষ্কীল করিয়া (অর্থাৎ ঐরূপ দান প্রতিগ্রহ করিয়া) নিত্য এই চণ্ডী জপ (পাঠ) করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকেন ।

ব্যাখ্যা । দান ও প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে মূলে কিছুই উল্লেখ নাই । কে দিবে, কি দিবে, কাহাকে দিবে, এবং কাহার নিকট হইতে কি প্রতিগ্রহ করিবে, কিছুই মন্ত্রে বলা হয় নাই ; সুতরাং বিভিন্ন ভক্ত উহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু সে সকল অর্থ অনেকেরই সংশয়-নিরাশক নহে । যাহা হউক, আমরা ঐস্থানের যে অর্থ বুঝিয়াছি, জ্ঞানরূপিণী মা আমাদের হৃদয়ে উহার যেরূপ অর্থ বিকাশ করিয়াছেন, এস পিপাসিত সাধক ! আমরা একবার সেই অর্থটির আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি ।

কৃষ্ণায়াং চতুর্দশ্যাং অষ্টম্যাং—এইটি সাধকের বিশেষণ । এই স্থানে সপ্তমী বিভক্তিটি বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে ; অধিকরণে নহে । উহার প্রমাণ রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বে বিশদ্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে । বৈধকার্যে সঙ্কল্পবাক্যে যে মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহা পুরুষ-বিশেষণ অর্থাৎ ঐ মাস, ঐ পক্ষ, ঐ তিথিবিশিষ্ট পুরুষ, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং এস্থলেও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী এবং অষ্টমী তিথিবিশিষ্ট পুরুষ বা সাধকই ঐ মন্ত্রের অর্থ । সাধক কিরূপ অবস্থায় আসিলে উক্ত বিশেষণযুক্ত হইতে পারে ?

চন্দ্রকলাক্ষয় পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ ; চন্দ্র—মনের অধিপতি-দেবতা । চতুর্দশী—এককলামাত্র-অবশিষ্ট চন্দ্র বা মন । অষ্টমী—অর্দ্ধক্ষীণ চন্দ্র বা মন । যাঁহারা মনের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ মাতৃ-চরণে উপহার দিতে পারিয়াছেন, আত্মাকে বা আমিকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, অন্ততঃ অর্দ্ধেক মন হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিবিশিষ্ট সাধক । আর যাঁহাদের প্রায় সমগ্র মনটি মাতৃময় হইয়াছে, একটি কলা অবশিষ্ট আছে—শুধু মাকে ভোগ করিবার জন্য, উপাস্য উপাসক উভয়ই এক, অথচ পরমানন্দরস-আস্বাদনের জন্য, একটু ভেদবোধ রাখিবার জন্য, মা কোন কোন সাধকের এককলামাত্র মন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন ;—এই শ্রেণীর সাধকই কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিবিশিষ্ট । এই উভয় অবস্থার অন্তরালটি (অর্থাৎ অষ্টমী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত) সুতরাং পরিগৃহীত ।

সমাহিতঃ—একাগ্রচিত্ত—সমাধিস্থ । কৃষ্ণাষ্টমী বা মনের অর্দ্ধলয়াবস্থা হইতে মৃদু মৃদুভাবে সমাধি আরম্ভ হয় এবং এককলা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত, মাতৃ-ভোগ বা আত্মসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দসম্ভোগ হইয়া থাকে । কৃষ্ণচতুর্দশীই সমাধির দৃঢ়াবস্থা । মনের সম্যক্ লয়ে —অমাবস্যায় অর্থাৎ সমাধির পরিণত অবস্থায় আর কিছুই থাকে না— জ্ঞাতাজ্ঞেয়-বোধের পর্যন্ত লয় হয়, যাহা থাকে, তাহা অব্যক্ত, অচিন্ত্য অথচ উহাই গম্য । সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না । উহাই 'আমি'র পরম ধাম । **'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (গীতা ১৫।৬) । সে অবস্থায় চণ্ডী বা সাধন-সমরের সম্পূর্ণ অবসান হয় ; তাই এস্থলে কৃষ্ণাষ্টমী হইতে মাত্র চতুর্দশী পর্যন্তের উল্লেখ আছে এবং উহাই সমাহিত অবস্থা ।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি— অর্পণ ও গ্রহণ ; পূর্বোক্তরূপ সমাহিত অবস্থা আসিলে একটি ব্যাপার স্বতঃই সংঘটিত হইতে থাকে ; উহাই দদাতি ও প্রতিগৃহ্ণাতি । যাঁহাদের মনের অর্দ্ধাংশ মাতৃমুখী হইয়াছে, তাঁহারা মাতৃ-মহিমা, মাতৃস্নেহ কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন । মাতৃস্নেহ যিনি একবার উপলব্ধি করেন, তিনি আর অকৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন না, কৃতঘ্নতা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব । কিছু না কিছু মাতৃ-চরণে অর্পণ করিবার বাসনা ফুটিবেই ; পত্র, পুষ্প, ফল, জলই হউক কিংবা ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রণামই হউক, একটা কিছু অর্পণরূপ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ফুটিবেই ; এই যে অর্পণ, ইহাই দদাতি ; তারপর এইরূপ অর্পণ হইলে, উহার

প্রতিগ্রহও অবশ্যম্ভাবী। তুমি মাকে যাহা অর্পণ করিবে, তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া আবার তোমাতেই প্রত্যর্পিত হইবে ; ইহা সাধনাজগতের একটি অপূর্ব রহস্য ! মাতৃ-স্নেহের ইহাই চরম নিদর্শন ! কেন ইহা হয় শুনিবে ? তবে শুন ! মা যে আত্মা। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে মালা পরাইতে গেলে, কার্যতঃ তাহা আপনার কণ্ঠেই অর্পিত হইয়া থাকে। এই সমাহিত অবস্থায়— ভগবৎ উদ্দেশে অর্পিত বস্তু বা ভাবসমূহ সাধকের মনে একটি অভূতপূর্ব তৃপ্তি আনয়ন করে। সে মাকে স্নান করায়, কিন্তু স্নাত হয় আপনি। পূজা করে মাকে, পূজিত হয় আপনি। মাতৃ-উদ্দেশে অন্নসম্ভার উৎসর্গ করে, ক্ষুধা দূর হয় আপনার। মাতৃতৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে ; কিন্তু অনুভব করে—নিজেরই সহস্রার হইতে মূলাধার পর্যন্ত কি যেন একটা সুখময় স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, এমনই একটা অবস্থা সাধকমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দদাতি ও প্রতিগৃহ্নাতি। যতদিন সাধনার মধ্যে এইরূপ আত্ম-সম্বেদন না আসে, ততদিনই সাধনা একটা নীরস কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠানমাত্র বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু সে অন্যকথা।

নান্যথৈষা প্রসীদতি—অন্যথা চণ্ডী প্রসন্না হয়েন না। যাঁহাদের পূর্বোক্ত রূপ অবস্থা আসিয়াছে, তাঁহারাই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের উপযুক্ত অধিকারী। ইহা না হইলে চণ্ডীর প্রসন্নতা-উপলব্ধি সম্যক্‌রূপে হয় না, ইহাই মহাদেবের কীলক অর্থাৎ জ্ঞানময় গুরুর আদেশ। এই কীলকই শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ। যে ব্যক্তি নিষ্কীল করিয়া এই চণ্ডীপাঠ করে, সে-ই সিদ্ধ হয়। নিষ্কীল করা —সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূরীভূত করা। একটু সমাহিত-চিত্ত না হইলে আত্মবোধ প্রস্ফুটিত হয় না, আত্মবোধ মহিমান্বিত না হইলে অর্পণ ও গ্রহণ হয় না ; সুতরাং সে অবস্থায় চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কি দুরাশা নহে ? সাধন সমরে জয়লাভ করিতে যেরূপ বল সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে অর্গলা-কীলক ও দেবীকবচে পরিবর্ণিত হইয়াছে।

এই কীলকস্তুতির আর একটি প্রয়োজন —ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান। 'এই কার্য দ্বারা আমার এই ইষ্টফল সংসিদ্ধ হইবে' এইরূপ জ্ঞানই কর্মপ্রবৃত্তির মূল। উক্ত ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানাংশে ভ্রম বা অজ্ঞানতা থাকিলে কর্মসিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। তাই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে কি লাভ হইবে, তাহাও এই স্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সৌভাগ্য, আরোগ্য, বশীকারাদি ষড়্‌বিধ শক্তি প্রভৃতি আপাত-প্রীতিকর পার্থিব ফল যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের সে সকল ত' হইবেই, প্রধান ফল-লাভ হইবে— মোক্ষ। স্তোত্রের শেষভাগে তাহা উক্ত হইয়াছে —**'শত্রুহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তূয়তে ন স কিং জনৈঃ'**। এক কথায় চণ্ডী ভোগ এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধন ; সুতরাং যাহারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ মহাফলের অভিলাষী, তাহারাই চণ্ডীপাঠের অধিকারী। কীলক-স্তুতিতে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও মোক্ষশাস্ত্র বটে, কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিক ফলে সম্যক্ বিরক্ত এবং একমাত্র মোক্ষাভিলাষী সাধকই ঐ সকল শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী। দেবীমাহাত্ম্য কিন্তু উভয় ফলেরই সাধন ; ইহা কীলক-স্তোত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে মাত্র স্তুতিবাদ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কীলকস্তোত্রে যাহা বলা হইয়াছে, সেইরূপ নিষ্কীল করিয়া—সমাহিত হইয়া, চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই ভোগ এবং অপবর্গ, এতদুভয় ফললাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু মা ! আমাদের কি উপায় ! আমরা যে কোন অধিকারই লাভ করি নাই ! যে সকল অধিকার লাভ করিলে, মা ! তোমার বড় সাধের সাধন-সমরে প্রবেশ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব, আমাদের যে তাহার কিছুই নাই ! বন্ধন-জ্ঞানই হয় নাই, মুমুক্ষু কিরূপে হইব ? মনের ষোল কলাই ত' জগৎমুখী, আমরা ত' অষ্টমী তিথিবিশিষ্ট সাধক বা অধিকারী হইতে পারি নাই ! তবে, কি সাহসে তোর অতি গহন চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিব মা ! কেন— সাহস আছে বই কি ? তুই যে মা ! আমরা যে তোর সন্তান ! ইহা অপেক্ষা আর কি বল— কি সাহস থাকিতে পারে ! আমরা জানি— 'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে— চণ্ডীতত্ত্বে বারংবার প্রবেশের উদ্যম করিতে করিতেই উপযুক্ত অধিকারী হইব এবং তারপর যথার্থ সাধন-সমরে জয়লাভ করিব— সিদ্ধ হইব ! ইহাই আমাদিগের অমোঘ আশা।

———○———

দেবীকবচ—মাতৃ-অনুভূতি

কবচ—অঙ্গত্রাণ। যাহা পরিধান করিয়া শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহাকে কবচ কহে। সাধন-সমরে প্রবেশ করিতে হইলে, এই কবচ দ্বারা আবৃত হইয়া অগ্রসর হইতে হয় ; নতুবা জয়লাভের আশা দুরাশামাত্র। তাই, উক্ত হইয়াছে—**'জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা। নির্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা ॥'** সপ্তশতী চণ্ডীপাঠের পূর্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয় ; যাঁহারা এই কবচ দ্বারা আবৃত হইতে পারেন, তাঁহারাই নির্বিঘ্নে চণ্ডী-জপ-জন্য সফলতা বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন।

এই কবচে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণপূর্বক প্রার্থনার বিধান আছে। যথা—**'প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী'** ইন্দ্রশক্তিরূপিণী মা আমায় পূর্বদিকে রক্ষা করুন ; কিংবা—**'শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেৎ'** প্রকাশ-শক্তিস্বরূপা মা আমার শিখাস্থান রক্ষা করুন ; এইরূপ সর্বত্র। ইহাতে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে ; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া কিছুকালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই সকল স্থানে বিশিষ্ট বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে ; কল্পনায় নহে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিবে। সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে হইবে। কবচে যে স্থানে যে নাম উচ্চারণের বিধান আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শক্তির প্রকাশ প্রতীতিগোচর হয়, সেই ধর্ম বা শক্তিটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ সকল নামে বিশিষ্ট কোন মূর্তির ধ্যান করিবার আবশ্যকতা নাই ; মাত্র সেই ধর্মটি বোধে আসিলেই যথেষ্ট। যেমন 'খড়্গাধারিণী'—এস্থলে খড়্গাধারণকারিণী মূর্তির চিন্তা না করিয়া, দৃঢ় হস্তে খড়্গাদি অস্ত্র ধারণ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি-অংশমাত্র বোধ করিতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র।

যাঁহারা জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত কিংবা গুরুদত্ত বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বোধশক্তি পরিচালনা অনায়াস-সাধ্য। তাহা না হইলেও, যে কোন ব্যক্তি সাধারণ যত্নের ফলে, এই কবচে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। স্বকীয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোধশক্তি লইয়া যাওয়া এবং সেই বোধশক্তিকে মাতৃশক্তিরূপে অনুভূতি করা, ইহা করিতে পারিলেই কবচপাঠের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা যায়। কেহ মনে করিও না, এই কবচের শেষভাগে যে ফলশ্রুতি আছে, উহা স্তুতিবাক্য মাত্র। উহার বর্ণে বর্ণে সত্য নিহিত রহিয়াছে। অন্য ফলগুলি লাভ হইবে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার সময় ও সুযোগ না হইলেও, **'নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে'** শারীরিক ব্যাধি-নাশ যে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক গতির উৎকর্ষতা-লাভও অবশ্যম্ভাবী। আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি—রামকবচ, সূর্যকবচ, শ্রীকৃষ্ণকবচ, কালীকবচ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কবচসমূহের মধ্যে, যে কোনও কবচ পূর্বোক্ত নিয়মে পাঠ করিলেও ঐ ফললাভ হইয়া থাকে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে দেবী কবচে যত বেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ আছে, অন্য কবচগুলিতে তাহা নাই। সে যাহা হউক, যাহারা চণ্ডী-পাঠের প্রকৃত ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষফলের অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে কবচপাঠ নিতান্ত আবশ্যক ; কারণ, ইহা দ্বারা নির্বিঘ্নে সাধন-সমরে জয়লাভ করা যায়। তবে যথানিয়মে পাঠ করিতে হইবে অন্যথা আশানুরূপ ফললাভের পথ দূরতর হইয়া পড়ে।

দেবীসূক্ত, অর্গলা, কীলক অবং দেবীকবচ—এইগুলি সাধন-সমরে বা চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার পূর্ব আয়োজন। এই উদ্যোগ-পর্ব যাহার যত সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে অনুষ্ঠিত, তাহার সিদ্ধিলাভ বা আধ্যাত্মিক গতিও তত সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং দ্রুততর হইয়া থাকে। তবে যতদিন আমাদের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলির সম্যক্‌ভাবে নির্বাহ না হয়, ততদিন কি আমরা চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত থাকিব ? না, তাহা নহে ; পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে পুনঃ পুনঃ চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে আমরা একদিন দেখিতে পাইব যে, পূর্ব আয়োজনগুলি যেন কোনও অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে, আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই সুসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে ; তখনই আমরা চণ্ডীর প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া মাতৃ-কৃপালাভে ধন্য হইব।

প্রথম চরিত

ঋষিচ্ছন্দ—উপোদ্‌ঘাত-সূত্র

সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্যে মায়ের তিনটি চরিত বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে প্রথম চরিত— মধুকৈটভ বধ। ইহার ঋষি—ব্রহ্মা। যিনি যেরূপ সম্বেদনের বা মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। এই মধুকৈটভনিধন বা সত্ত্বগুণের প্রলয় বিরাট মনেই সংঘটিত হয় ; তাই সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা এই চরিত্রের প্রথম দর্শক। উপাখ্যানেও দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মাই মধুকৈটভ-নিধনের প্রথম হেতু।

মহাকালী—দেবতা। প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্তির অঙ্কেই সত্ত্বাদি গুণের অবসান। ইনি কালশক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিতা ; তাই মহাকালী। গায়ত্রী—ছন্দঃ। প্রাণ-প্রবাহের স্পন্দনই ছন্দঃ। এই প্রথম চরিতে প্রবিষ্ট সাধকের প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণায়াম ঠিক বেদমাতা গায়ত্রীর তুল্যরূপই হইয়া থাকে, তাই গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ। নন্দা বা হ্লাদিনী ইহার শক্তি। রক্তদন্তিকা—অর্থাৎ পরা প্রকৃতির রক্তবর্ণ রজোগুণাত্মিকা চিৎ ইহার বীজ। রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা দ্বারাই সত্ত্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়। সাধকগণ মনে রাখিবেন, চণ্ডীতত্ত্বই পরা প্রকৃতির বিলয়। অপরা প্রকৃতির যেখানে আদিবিন্দু বা সত্ত্বগুণের উন্মেষ, পরা প্রকৃতির সেইটিই চরমবিন্দু।

অগ্নি বা তেজস্তত্ত্বেই বিশিষ্টসর্বভাবের প্রলয় হয় ; তাই, অগ্নিই ইহার তত্ত্ব। মণিপুরচক্র বা নাভিকমল ইহার স্থান। ঋক্ বেদ—স্বরূপ। শ্রুতি আছে **'বাগেবর্ক্'**। বাক্ বা নাদই ঋক্। বাক্ প্রাণশক্তিরই বিশিষ্ট প্রকাশ। অন্য শ্রুতি বলেন—**'অগ্নে ঋচো'** অগ্নি বা তেজ হইতেই ঋকের বা বাক্যের আবির্ভাব। নাদ বা শব্দরূপে শক্তির বিকাশ না হইলে জপ হয় না। মহাকালীর প্রীত্যর্থ অর্থাৎ প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্তিতে সাধকের প্রীতি বা আসক্তির জন্যই এই প্রথমচরিতের জপরূপ কার্যে ইহার বিনিয়োগ।

———○———

সাধন-সমর
বা
দেবী-মাহাত্ম্য

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।

চণ্ডমূর্তি-মাতৃকাচরণে প্রণাম ।

জীব ! সাধক ! তুমি মায়ের আমার চণ্ডমূর্তি দর্শন করিতে চাও । তুমি কি একদিনের জন্যও মায়ের স্নেহকরুণাভার-নম্রা মূর্তি দেখিয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মায়ের রক্ত-চরণে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছ ? একদিনের জন্যও কি কাতর-প্রাণে মা মা বলিয়া, অশ্রুসিক্ত-নয়নে মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছ ? একদিনের জন্যও কি **'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** বলিয়া গুরুরূপিণী মায়ের আমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার হৃদয়-রাজ্যের অচ্যুত সারথি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার চিরজীবনের একান্ত সুহৃদ, বন্ধু ও সখা বলিয়া স্নেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মায়ের বিশ্বরূপ দর্শনে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছ ? একদিনের জন্যও কি মায়ের আমার শ্রীমুখবিনির্গত **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** এই মধুময় অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিয়াছ ? যদি তোমার জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও এই সকল শুভ সংঘটন ঘটিয়া থাকে, তবেই তুমি মায়ের আমার চণ্ডিকা-মূর্তি দর্শনের অধিকারী ।

ভগবদ্গীতা মায়ের হিরণ্ময় মন্দিরের অক্ষয় ভিত্তি —মনোময় কোষের সাধনা এবং চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য তদুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ—বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা । যেরূপ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমুন্নত মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ গীতোক্ত সপ্তশত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া চণ্ডীরূপ মুক্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয় । যাহারা গীতার বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত, তাহারাই দেবী-মাহাত্ম্য দর্শনের অধিকারী । চণ্ডী কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব । চণ্ডী মাতৃমিলনের তিনটি তরঙ্গ । সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করিবার পর, যে তিনটি তরঙ্গ আসিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি সম্যক্ উচ্ছেদ করিয়া দেয়, তাহাই চণ্ডীর তিনটি রহস্য । ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন এবং চণ্ডীতে নিরবশেষ মিলন পরিব্যক্ত হইয়াছে । জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান হয়, যখন জীবকর্তৃত্ব সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে, তখন সে দেখিতে পায়—'মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্তিতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপথের অন্তরায়স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসুরকুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন' । সেই মহা-মিলনের সময় যে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবী মাহাত্ম্যে অসুরনিধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ—এই ত্রিবিধ কর্ম-সংস্কার বা বাসনাবীজই মুক্তির অন্তরায় । সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণরূপে পরিচিত । ইহারাই ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত । যতদিন এই গ্রন্থি ভেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর উৎপীড়ন বিদূরিত হয় না । একমাত্র মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয় । **'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি তস্মিন্ দৃষ্টে'** । মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর

সাধক দেখিতে পায়—তাহার এই হৃদয়গ্রন্থি সম্যক্‌ উচ্ছেদ করিবার জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডীকামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একটি গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের হৃদয়ে মা যেরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহাই চণ্ডীর এক একটি রহস্য। প্রথম—মধুকৈটভবধ বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয়—মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয়—শুম্ভবধ বা রুদ্রগ্রন্থিভেদ। এইসকল তত্ত্ব যথাস্থানে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইবে।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যতদিন অনুলোম গতি বা বহির্মুখী শক্তির বিকাশ করেন, ততদিন জীব এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যখন বিলোম গতি বা অন্তর্মুখী শক্তির বিকাশ হয়, ধীরে ধীরে গতি পরমাত্মাভিমুখী হয় অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ স্থিরত্বের অভিমুখী হয়, তখনই জীব-হৃদয়ে এই দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়; তখন জীব প্রত্যক্ষ করে— মা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সুর-বিরোধী ভাবসমূহকে সমূলে বিলয় করিতে থাকেন। মায়ের ইচ্ছা—পুত্রকে সর্বভাব-বিনির্মুক্ত করিয়া— শুদ্ধ-পূত-মুক্ত করিয়া, আপনাতে মিলাইয়া লয়েন। তিনি পুত্রস্নেহ বিমূঢ়া মা, তাঁর ইচ্ছা আমাকে একত্বে উপনীত করেন—চিরতরে আপনবক্ষে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, আর আমি চাই — সর্বভাবে খেলা করিয়া জগতের ধূলি গায়ে মাখিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে। কিন্তু তিনি যে মা! কতদিন আমাকে পুতুল খেলা খেলিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তাই মা যখন আমার এই বড় সাধের খেলাঘর তিনখানি ভাঙিয়া দিবার উপক্রম করেন— যখন আমার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ- দেহের বিলয় করিবার জন্য বিশেষভাবে আবির্ভূতা হয়েন, তখনই চণ্ডীমূর্তিতে মায়ের প্রকাশ হয়।

চণ্ড শব্দের অর্থ—অত্যন্ত কোপন। মাতৃস্নেহে বিমুগ্ধ সন্তানই মায়ের চণ্ডিকামূর্তি-দর্শনে সমর্থ; কারণ, সে প্রতিকর্মে মাতৃস্নেহের বিকাশমাত্র দেখিতে পায়। জন্ম-মৃত্যুতে, সুখ-দুঃখে, পাপ-পুণ্যে রোগ ও স্বাস্থ্যে, সর্বত্র মায়ের মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিয়া আত্মহারা হয়। কি ব্যবহারিক জগতে, কি সাধনরাজ্যে সর্বত্র মায়ের মঙ্গলময় হস্তের অমৃতময় স্পর্শ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়। আনন্দময়ী চিন্ময়ীর বক্ষে নিরানন্দ বা ধ্বংস কোথায়! বিশেষতঃ সাধকপুত্রগণ মায়ের আমার চণ্ডমূর্তি দেখিতেই ভালবাসে। যে মূর্তিতে মা আমার আমিত্বকে বিনাশ করিতে উদ্যতা, যে মূর্তিতে মা আমার ক্ষুদ্রত্ব, পরিণামিত্বকে গ্রাস করিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত করিতে উদ্যতা, সেই মূর্তিই সাধকপুত্রের অভীষ্ট—প্রিয় হইতে প্রিয়তর। সরল নির্ভীক শিশুপুত্র কি মায়ের ক্রোধময়ী মূর্তি দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হয়, না আরও দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে প্রয়াস পায়?

জীব! তুমি কি এই জন্ম-মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যথিত হইয়াছ? প্রতিনিয়ত এই ঘোর চঞ্চলতাময় জীবনকালকে একটা উৎপীড়নমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক মুহূর্তের জন্যও নিত্যস্থিরত্ব লাভের জন্য আকুল উদ্বেলন অনুভব করিয়াছ? তুমি কি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের অসহনীয় অত্যাচারে আপনাকে সম্পূর্ণ জর্জরিত—মথিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? রোগে শোকে প্রবলের অযথা অত্যাচারে, আপনাকে নিতান্ত দীন আর্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ? যদি করিয়া থাক— যদি অমৃতময় মাতৃঅঙ্ক লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া থাক, তবে এস, আমরা মায়ের চণ্ডিকামূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হই। আর দূর হইতে দাঁড়াইয়া—মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিয়া দেখি, কিরূপে মা আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আমাকে মুক্তিমন্দিরে উপনীত করেন— আপন অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন। যখন দেখিতে পাইবে—আমার ক্ষুদ্র নিশ্বাসটি হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বাণ বা মোক্ষ পর্যন্ত প্রত্যেক কার্য মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছায়—অঙ্গুলিচালনে নিষ্পন্ন হইতেছে; কেবল তখনই সাধক, তুমি স্ফীতবক্ষে হর্ষোৎফুল্ললোচনে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া জয় মা! জয় মা! বলিতে বলিতে, মায়ের আমার চণ্ডমূর্তির সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তখন দেখিবে— তোমাকে কিছুই করিতে হয় না। তোমার সমস্ত কার্য, সমস্ত সাধনা তোমার অজ্ঞাতসারে অচিন্তনীয় উপায়ে মা স্বয়ংসম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তখনই বুঝিতে পারিবে—মায়ের এই অভাবনীয় অনন্ত লীলায় তুমি নিমিত্তমাত্র। তবে আর ভয় কি সাধক? এস, আমরা চণ্ডমূর্তি মাতৃকাচরণে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হই, মায়ের সম্মুখে দাঁড়াই—দেখি তিনি

কিরূপে আমাদের আমিত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার স্বকীয় **'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্'** আমিত্বে চিরতরে মিলাইয়া লয়েন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

কথিত আছে—পূর্বকালের ব্যাসশিষ্য মহাতেজা জৈমিনি মুনি, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট প্রসঙ্গক্রমে দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণের অভিলাষী হইয়া ছিলেন ; কিন্তু মার্কণ্ডেয়ের অবসর-অভাবে তাঁহাকে বিন্ধ্যাচলনিবাসী পক্ষীচতুষ্টয়ের নিকট চণ্ডীতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। পূর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি যেরূপভাবে দেবীমাহাত্ম্য ক্রোষ্টুকি মুনিকে বলিয়াছিলেন, পক্ষিগণ ঠিক সেইভাবে মার্কণ্ডেয়ের মুখের কথাগুলি জৈমিনিকে শুনাইয়াছিলেন। তাই, এস্থলে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' বলা হইল। মার্কণ্ডেয়—প্রাজ্ঞপুরুষ বা প্রজ্ঞাচক্ষু—এবং জৈমিনি বিশ্ব বা জীব।

মার্কণ্ডেয়—সপ্তকল্পান্তজীবী—অমর। জীব যখন আপন-অমরত্ব বুঝিতে পারে ; যখন চৈতন্যকে—প্রাণকে নিত্য, স্থির, ধ্বংস ও উৎপত্তিশূন্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে ; যখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল নখদর্পণে বিম্বিত চিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় ; যখন মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানময় গুরুরূপী মহাদেবের কৃপায় জীবত্ব হইতে— কালপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রজ্ঞাক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখনই জীব মার্কণ্ডেয় অর্থাৎ প্রাজ্ঞ বা অমর হয়। তখনই কর্মপরায়ণ নিয়ত পরিণামশীল সংশয়পূর্ণ জৈমিনিরূপী স্থূলাভিমানী বিশ্বকে এই অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার মহাশক্তিরহস্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়। তাই, আমরা চণ্ডীর ষট্‌সংবাদে দেখিতে পাই, মার্কণ্ডেয়-জৈমিনিসংবাদে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিয়া, কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হন যে, মার্কণ্ডেয় কিংবা জৈমিনি নামে কোন ঋষি ছিলেন না অথবা চণ্ডীর উপাখ্যানভোগ রূপকমাত্র। রূপকচ্ছলে স্বল্পবুদ্ধি মানবের নিকট আধ্যাত্মিক রহস্য বর্ণনা করাই যে সমস্ত পুরাণের অভিপ্রায়, একথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। যেহেতু, দর্শন ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। বৃক্ষকে শাখা-পল্লবাদিবিশিষ্ট একটি পাঞ্চভৌতিক পদার্থরূপে যতক্ষণ দর্শন করা যায়, ততক্ষণ উহা আধিভৌতিক দর্শন। যখন দেখা যায় —একটি চৈতন্যসত্তাই বৃক্ষের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, তখন উহাকে আধিদৈবিক দর্শন বলা যায় ; কারণ, বৃক্ষাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত দর্শন-ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আর, যখন জীবের যোগচক্ষু বা তৃতীয় নেত্র গুরুকৃপায় উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—আত্মা অর্থাৎ 'আমি'ই বৃক্ষাকারে প্রকাশিত ; এই দর্শনের নাম আধ্যাত্মিক দর্শন। জীবের জ্ঞান এই ত্রিবিধ স্তরে বিচরণ করে ; সুতরাং জগতের প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার মধ্যে এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কেহ কেহ দেখে—নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে ; কেহ দেখে—স্বামীর সহিত—সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য নদী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে ; আবার কেহ দেখে—আমারই আত্মা—আমারই প্রাণ—আমারই মা স্নেহতরল প্রবাহরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহার কেহই ভ্রান্তদর্শী নহে, সকলেই সত্যদর্শী। জ্ঞান যখন যে স্তরে বিচরণ করে, তখন সেই স্তরোপযোগী অনুভূতির বিকাশ হয়। তবে ইহা স্থির, যাহা স্থূলে—ভৌতিক জগতে অর্থাৎ আধিভৌতিক ভাবে একটি পদার্থ বা ঘটনামাত্র, তাহাই সূক্ষ্মে—চৈতন্যরাজ্যে বা আধিদৈবিক ভাবে বিশিষ্ট চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। আবার তাহাই কারণে—আত্মক্ষেত্রে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে, মাত্র আত্মরূপে—'আমি'রূপেই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। যে যেরূপ চক্ষু পাইয়াছে—যাহার জ্ঞান স্বভাবতঃ যেরূপ স্তরে বিচরণশীল, তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে স্থূলে যাহার প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাহাই সূক্ষ্ম ও কারণ পর্যন্ত অবিকলভাবে দেখিতে পান। তাই, কথায় বলে—'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে (দেহ) ভাণ্ডে'। স্থূল ও সূক্ষ্ম শুধু মাত্রা বা পরিমাণগত বৈষম্য, বস্তুগত বা তত্ত্বগত উভয়ই অভিন্ন।

সেইজন্যই এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, চণ্ডীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে ; উহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। তবে জীবশিক্ষার জন্য, স্থূলে—ভৌতিক রাজ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই চৈতন্যক্ষেত্রে বা আত্মরাজ্যে তুল্যরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে

সংঘটিত হয় ; জীবজগতের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণের মধ্যে এমনই একটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিরাজিত । এমন কোন জীবন্মুক্ত সাধকের নাম আজ পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথবা হইতেই পারে না, যাঁহার হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রসমর— গীতাতত্ত্ব কিংবা দেবাসুর সংগ্রাম —চণ্ডীতত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই । তবে, কোনও কোনও সাধক ঐগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হন, আবার কেহ বা লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া, জীবনের অতীত ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পান যে, তাঁহাকে প্রায় অজ্ঞাতসারে গীতা ও চণ্ডীতত্ত্বের ভিতর দিয়াই আসিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রহস্য অবগতির জন্যই চণ্ডী-তত্ত্বে অবগাহন করিব। মা আমাদিগের প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত করুন আমাদের হৃদয়ে চণ্ডীতত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হউক, আমরা কৃতার্থ হই ।

———o———

সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম ॥১॥

অনুবাদ । যিনি অষ্টম (অষ্টসিদ্ধীশ্বর অষ্টপাশবিমুক্ত) মনু নামে কথিত হন, তিনি সূর্যতনয় সাবর্ণি। তাঁহার উৎপত্তি-বিবরণ আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা । সূর্য্য—জগৎ-প্রসবিতা, প্রাণশক্তির একমাত্র আধার । যে বরণীয় ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে সম্যক্‌ভাবে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহারই বিশিষ্ট বিকাশক্ষেত্র সূর্য ; তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্রে সেই বরণীয় ভর্গের উপাসনা করিতে গিয়া, সূর্যকেই প্রতিনিধি স্বরূপে গ্রহণ করেন । প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি বাক্যব্যয়ে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনে, প্রত্যেক চিন্তায় আমাদের যে প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়, একমাত্র সূর্য হইতেই, তাহা আমরা পুনরায় লাভ করিয়া আপন অস্তিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হই, তাই কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে, কি সাধনাক্ষেত্রে, একমাত্র সূর্যই জীবের সর্বপ্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন । গর্ভস্থ শিশু যেরূপ নাভিসংযুক্ত নাড়ীদ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসপ্রবাহে পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ আমাদের নাভিচক্রে বা মণিপুর কেন্দ্রে সূক্ষ্ম সূত্ররূপী জ্যোতির্ধারা অবলম্বনে প্রতিনিয়ত সূর্য হইতে প্রাণশক্তিরূপ রসপ্রবাহ আসিতেছে। তাহারই ফলে জীব—আমরা সঞ্জীবিত থাকি । জীব মনুষ্যত্বলাভ করিলে বুঝিতে পারে, এই পরিদৃশ্যমান সূর্যই তাহার পিতৃস্থানীয়।

সাবর্ণি—সবর্ণার পুত্র । সবর্ণার অন্য নাম সরণ্যু । বেদে ইনি সরণ্যু নামেই অভিহিত হইয়াছেন । সবর্ণা —সূর্যশক্তি । ইহা ঐশীশক্তিরই প্রতিনিধি । সূর্য যেরূপ ব্রহ্মজ্যোতির বিশিষ্ট প্রতিনিধি, সবর্ণা বা সৌরশক্তি সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিবিশিষ্ট প্রতিনিধি । এই শক্তির প্রভাবেই এই ভূতধাত্রী বসুন্ধরা এবং অনন্ত গ্রহমালা সূর্যমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিধৃত হইয়া, মহাশূন্যে অবস্থান করতঃ স্ব স্ব অবয়ব-পরিবর্তন-রূপ প্রণাম করিতে করিতে সেই রমণীয় ভর্গপ্রতিনিধি সূর্যদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এই মহীয়সী শক্তির প্রভাবে জীবসঙ্ঘ স্ব স্ব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মত্বের—মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; মনু এই মহীয়সী সৌরশক্তিরই গর্ভ-সঞ্জাত, তাই সাবর্ণি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মনু—মন্ ধাতু হইতে মনুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । মন্‌ধাতুর অর্থ—বোধ বা জ্ঞান । যখন জীবভাবাপন্ন কল্পিত শিশু-চৈতন্য বা ক্ষুদ্র জ্ঞান, সমষ্টি-মানব-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই উহা মনু নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; যেরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ, তদ্রূপ সমগ্র মনুষ্যজাতির সমষ্টিচৈতন্য মনু । এই মনুচৈতন্যের প্রত্যেক কল্পিত অণুই ব্যষ্টি মনুষ্যরূপে প্রতিভাত ; তাই মনুষ্যগণকে মনুজ কহে । আর একটু খুলিয়া বলি— প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে 'আমি মানুষ' এরূপ একটি বোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, ঐ বোধটির নাম ব্যষ্টি মনুষ্য । সমগ্র মানবজাতি যে চৈতন্যে পরিধৃত বা অবস্থিত তাহা সমষ্টি মানবচৈতন্য বা মনু । তিনি যতক্ষণ 'আমি মানুষ' এই বোধে সম্বুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ আমরা স্ব স্ব মানবত্বের উপলব্ধি করিতে সমর্থ । যেরূপ আমাদের দেহস্থিত অসংখ্য কীটাণু আমাদেরই চৈতন্যে সচেতন, সেইরূপ সমগ্র মানবজাতি মনুচৈতন্যের সত্তায়ই সত্তাবান ; এক কথায় ভগবান মনুকেই মনুষ্যজাতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা বলা যায় । তাই মনুকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয় । মনুই ব্রহ্মার আত্মজ বা প্রথম সৃষ্টি । সাধনাবলে মানুষ যখন এই মনুত্ব লাভ করে,

তখন দেখিতে পায়, সে একমাত্র জগৎপ্রসবিত্রী সূর্যশক্তি সবর্ণার অঙ্কেই নিত্য অবস্থিত । তাই মনুকে সূর্যতনয় সাবর্ণি বলা হইয়াছে ।

মনুষ্য ! তুমি কি তোমার ব্যষ্টিভাবাপন্ন ক্ষুদ্র মানবচৈতন্যকে মনুত্বে বা সমষ্টিরূপ মহান মানবচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ ? তুমি কি ক্ষুদ্র ও পরিণামী জ্ঞানের গণ্ডী ছিন্ন করিয়া এক বিশাল আনন্দময় জ্ঞানে উপনীত হইতে চাও ? তুমি কি মনুজত্ব পারিত্যাগ করিয়া মনুত্ব লাভের অভিলাষী হইয়াছ ? কেন হইবে না ! এই মনুষ্যক্ষেত্রে অবস্থিত তোমার জ্ঞান যে প্রতিমুহূর্তে বিষয়রূপে পরিণত না হইয়া—ক্ষুদ্রত্বের আলম্বনরূপ যষ্টি না ধরিয়া, স্থির হইতে পারে না, তুমি যে প্রতি মুহূর্তে জন্ম-মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত, প্রতি মুহূর্তে চঞ্চলতার উৎপীড়নে বিব্রত, তুমি কি স্থিরত্ব ও মহত্ত্বের সন্ধান না করিয়া থাকিতে পার ? নিশ্চলা, নির্বিকল্পা শ্রীকৃষ্ণরূপিণী মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন এই সঙ্কীর্ণতারূপ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে তোমার প্রবল বাসনা জাগিবেই জাগিবে ; কারণ, স্থিরত্ব ও মহত্ত্বই যে তোমার অব্যয় স্বরূপ ! সেই নিত্য স্থিরত্ব লাভ করিতে হইলে তোমাকে মনুজত্ব ছাড়িয়া মনুত্বে উপনীত হইতে হইবে । কখন তুমি মনুজত্ব পরিহারে সমর্থ হইবে, তাহার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । জীব ! যখন তুমি সাবর্ণি সূর্যতনয় হইতে পারিবে, অর্থাৎ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিষ্ঠিতা মহীয়সী জগদ্বিধাত্রী ঐশীশক্তির অঙ্কে নিত্য সংস্থিত পরিপুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন তুমি **'নমো বিবস্বতে'** বলিতে গিয়া সৌরশক্তি সবর্ণারূপিণী মায়ের স্নেহময় স্পর্শে মুগ্ধ হইবে, যখন তুমি **'ভর্গো দেবস্য ধীমহি'** বলিয়া অমৃতস্রাবী অনন্ত জ্যোতিস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িবে, যখন তুমি **'তত্ত্বে পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'** বলিয়া সূর্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যদর্শী ঋষির ন্যায় মহাসত্যের আভাস তরঙ্গে সম্বেদিত হইবে, যখন তুমি **'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'** বলিয়া বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিদিগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাবে সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই তুমি মনুজত্ব পরিহারপূর্বক মনুত্বলাভের অধিকারী হইবে । সাধক ! মনে করিও না যে, ইহা তোমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব । ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ যে অব্যয় সরল পন্থার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পথে গুরূপদিষ্ট উপায়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে, ইহা মানুষমাত্রেই করিতে পারে ।

আমাদের দেবকার্যাদিতে আসনশুদ্ধি নামে যে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই, এই সৌরশক্তি উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয় । বর্তমানে ঐ আসনশুদ্ধি একটি মন্ত্রপাঠমাত্র ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়াই, উহার যথার্থ ফললাভ হয় না । যাহা হউক এই স্থলে আমরা ঐ মন্ত্রটি ও তাহার সাধনরহস্য উল্লেখ করিতেছি—

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা ।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

সাধক ! মনে করিবে—তুমি গোলাকার একটি ফুটবলের ন্যায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আছ । যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পার, সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে । **'সমকায়শিরোগ্রীব'** হইবে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডটি ঠিক সরলভাবে রাখিবে। তারপর ধারণা করিবে—তোমার ঊর্ধ্বে-নিম্নে, দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে সর্বত্র মহাশূন্য বিরাজিত। মহাব্যোম-মণ্ডল-মধ্যে তুমি পৃথ্বিরূপিণী মাতৃ-বক্ষে উপবিষ্ট । সম্মুখে সূর্যদেব মহাশূন্যে অবস্থিত । তাঁহারই স্নেহময় আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে তুমি ধৃত হইয়া রহিয়াছ । পৃথিবী যেন তোমাকেই বক্ষে ধরিয়া সূর্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছেন । এইরূপ অবস্থায় উক্ত মন্ত্রটি চৈতন্যময় করিয়া পাঠ করিবে । উহার অর্থ—হে পৃথিবীরূপিণী মা ! তোমা কর্তৃক এই লোকসমূহ ধৃত হইয়া রহিয়াছে । তুমি এই সম্মুখবর্তী সূর্যরূপী বিষ্ণু কর্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছ । মা ! তুমি আমায় ধরিয়া থাক এবং আমার আসনখানি পবিত্র করিয়া দাও ; এইরূপ উপলব্ধি করিয়া, প্রতিদিন সৌরজ্যোতিতে অভিস্নাত হইয়া, সূর্যে সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, জ্যোতির্ময় ব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবে । কিছুদিন এই অভ্যাসের ফলে তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার অন্তরে বাহিরে চৈতন্যময় জ্যোতি ব্যতীত অপর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না । ক্রমে যখন সেই দিগন্তব্যাপী চিন্ময় জ্যোতির্মণ্ডলে আত্মহারা হইয়া পড়িবে, তখন বুঝিতে পারিবে, তুমি সৌরশক্তির অঙ্কে অবস্থিত হইয়াছ । তখন

ধীরে ধীরে 'আমি মানুষ' এই বোধটির সমীপস্থ হইয়া মহতী ধীশক্তিরূপিণী সবর্ণার অতুলনীয় কৃপা প্রার্থনা করিবে, এবং যে বিরাট মনুচৈতন্য হইতে ঐ ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠিতেছে, সেই 'আমি মানুষ'রূপ বোধটি তাহাতেই মিলাইয়া দিবে। তখনই এই মনুত্বের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই মনুত্ব লাভ করিলে আমাদের কি হইবে ? আমরা অষ্টম হইব। অষ্টম কি ? **'অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঐশ্বর্যাণি বা মিয়ন্তে অস্মিন্ ইতি অষ্টমঃ'**। যেখানে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য সম্যক্ পরিমিত হয়, তাহাই অষ্টম। জীব যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি তাহার আয়ত্তীভূত হয়। একদিকে যেমন এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়া জীব ভগবৎসারূপ্য উপলব্ধি করে, অন্যদিকে তেমনই ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জুগুপ্সা প্রভৃতি অষ্টবিধ পাস হইতে মুক্ত হইয়া যায় ; তাই মনুকে অষ্টম বলা হইয়াছে।

মুমুক্ষু সাধক যে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া মোক্ষলাভ করে, মা আমার দেবীমাহাত্ম্যের প্রারম্ভেই তাহার সূচনা করিয়াছেন। মনুজত্ব হইতে মনুত্ব এবং মনুত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব, এই ত্রিবিধ অবস্থা একটির পর একটি মায়ের কৃপায় সাধকের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়। দেবত্বস্তর মনুত্ব ও ব্রহ্মত্বস্তরের অন্তর্গত বলিয়াই এস্থলে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। পিতৃ-অঙ্কস্থিত শিশুপুত্র যেরূপ নির্ভয়ে করতালি দিয়া সহচরবর্গের সহিত হাসিতে হাসিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনরূপ আনন্দক্রীড়া করিয়া অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করে, সেইরূপ জীব যখন বুঝিতে পারে,—আমরা পিতৃরূপী মনুর অঙ্কে নিত্য অবস্থিত, আমার জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার যতই কেন পরিণাম হউক না, আমি আমার আনন্দময় পিতৃ-অঙ্কে অবস্থিত। হই না কেন ক্ষুদ্র, হই না কেন দীন, হই না কেন পাপের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গভীর কূপে নিপতিত, হই না কেন অবিশ্বাসী, হই না কেন শ্রদ্ধাহীন, হই না কেন অজ্ঞানান্ধ, 'আমি আমার আনন্দময় পিতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থিত', জীব যখন এইরূপ উপলব্ধি লাভ করে, এইরূপ আনন্দময় সম্বেদনে অহর্নিশ সম্বেদিত হয়, এইরূপ নিত্যযুক্ততা যখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন জীব মর্ত্যে থাকিয়াও অমরত্বের আস্বাদে মুগ্ধ থাকে এবং সাধারণের পক্ষে নিয়ত দুঃখময় এই জগৎকে আনন্দময়রূপে ভোগ করিয়া অনির্বচনীয় শক্তি লাভ করে। মনুজবৃন্দ ! তোমরা কি এই নিত্য শান্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছ ?

———○———

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়োরবে ॥ ২॥

অনুবাদ। সেই রবিতনয় মহাভাগ সাবর্ণি মহামায়ার অনকূল ইচ্ছায় যেরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন (তাহা শ্রবণ কর)।

ব্যাখ্যা। মনুত্ব লাভ করিলে অষ্টম হওয়া যায় ; ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি অলৌকিক লাভের কথা বলিলেন—মন্বন্তরাধিপ। যে অখণ্ডবোধ মনু-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত, সেই সমষ্টি মানব-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ব্যষ্টি মানব-চৈতন্য আয়ত্তীভূত হয়। মনুষ্যজাতি মনুরই অন্তর ; মনু হইলেই মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ হয়। সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় তাহারই ইঙ্গিতে সাধিত হয়। সে তখন প্রত্যেক মানুষের সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহার ফলে—প্রত্যেক মানুষের অন্তর-নিহিত ভাবরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আমরা মানুষ, আমাদের অন্তরে কত জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কার-রাশি লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; কিন্তু যখন আমরা মনুত্ব লাভ করিব, মন্বন্তরের অধিপতি হইব, তখন আমরা নিজের সংস্কাররাশি ত' দেখিতে পাইবই, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানুষের বহুজন্মসঞ্চিত পাপ, পুণ্য, জন্ম, জাতি, আয়ু, ভোগ ইত্যাদি সকলই প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা কখন কখন কোনও বিশিষ্ট সাধু মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বলিবার পূর্বেই বুঝিয়া লইতে পারেন, ইহা ঐ আংশিক মনুত্ব-লাভের ফল। ব্যষ্টি মানবগণ মনুরই অন্তর ; সেই অন্তররাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে, প্রত্যেক মানুষের উপরে নিজের ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক নিম্ন গতির পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়।

একমাত্র মহামায়ার অনুভাবে—অনুকূল ইচ্ছায়—কৃপায় এই মনুত্ব লাভ করা যায়। মনুত্বে বা বোধময় ক্ষেত্রে

উপনীত হইলে, সমস্ত জগৎ আমারই অন্তরে অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাই যথার্থ মন্বন্তরের আধিপত্য।

মহামায়া কি, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ দর্শনকার এবং তদনুগামী ভাষ্য ও টীকাকারগণ নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন—জড়া প্রকৃতি, কেহ বলেন—মিথ্যা, ভ্রান্তি ইত্যাদি। এইরূপ কত মতই না আছে! আমরা সেই সকল মতবাদ উপস্থিত করিয়া কূট তর্কের আশ্রয়ে মায়ার বিচার করিতে যাইব না; কারণ, জানি—তিনি বিচারলভ্য নহেন। আমাদের উদ্দেশ্য তাহাকে লাভ করা, আমরা মাতৃস্নেহের অভিলাষী, মায়ের স্বরূপ বিচারে আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা যখন গর্ভধারিণী মায়ের নিকট মা বলিয়া দাঁড়াই, তখন যেরূপ তাঁহার স্বভাবের বিচার করি না, শুধু মা বলিয়া স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত হই, সেইরূপ চল আমরা আমাদের একান্ত আশ্রয়স্বরূপা মহামায়া জগৎ-জননীর সম্মুখে মা বলিয়া দাঁড়াই—দেখি তিনি কিভাবে আমাদের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকটিত করেন, কিভাবে সন্তানকে আনন্দময় স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন।

আমরা দেখি—মহামায়াই সত্য। মহামায়া ছাড়া কোথায়ও কিছু নাই, মহামায়াই জীবের জননী। আমরা তাঁহারই গর্ভসঞ্জাত, তাঁহারই বক্ষে সংস্থিত, তাঁহারই স্নেহময় জ্ঞান-স্তন্যে পরিপুষ্ট হইতেছি; আবার তাঁহারই কৃপায় মাতা-পুত্র-সম্বন্ধশূন্য এক অদ্বিতীয় স্থির নিরঞ্জন সত্তায় উপনীত হইব। অর্থাৎ আমি সম্যক্‌ভাবে মহামায়ায় মিলাইয়া যাইব। আমরা জানি—মহামায়াই জীব, মহামায়াই ঈশ্বর এবং মহামায়াই ব্রহ্ম। যেখানে মায়া নাই, সেখানে সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই; যতক্ষণ মায়া আছে, ততক্ষণ সত্য ও মিথ্যা উভয়ই আছে; যতক্ষণ বাক্য-মন-ইন্দ্রিয় আছে, সৎ-চিৎ-আনন্দ আছে, ততক্ষণ মায়া আছে। নির্গুণ চৈতন্যে যখন বহুভাবে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন তিনি—ঐ চৈতন্যই মায়ারূপে অভিব্যক্ত হন। এই বহু ভাবের বীজ গর্ভে ধারণ করেন বলিয়াই তিনি জননী; আবার জগৎরূপে প্রকটিত হইয়া অর্থাৎ অব্যক্ত জীবসমূহকে প্রসব করিয়া পুনরায় নির্গুণত্বে উপনীত করিবার জন্য স্বয়ং মহতী ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় অঙ্কধৃত জীবজগৎকে পুনরায় একত্বে—ব্রহ্মত্বে প্রলীন করিয়া থাকেন; তাই মহামায়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বরী—জগদ্‌বিধাত্রী জগৎ-পালয়ত্রী জগৎ-সংহর্ত্রী মোক্ষপ্রদায়িনী জননী।

এই মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছা—কৃপা হইলে অর্থাৎ তাঁহার স্নেহের উপলব্ধি করিতে পারিলেই, জীব মন্বন্তরের অধিপতি হয়। সাধক! তুমি কি ইঁহাকে জানিতে চাও? এই মহামায়ার স্বরূপ অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে চণ্ডীতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না; তাই খুলিয়া বলিতেছি—মাতৃ অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া, মাতৃ-স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া যে সন্তান আপন গর্ভধারিণীকে জানে না, সে পুত্র যতই না কেন অভ্যুদয়সম্পন্ন হউক, যতই না কেন জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করুক, জগতে সে যতই সম্মানিত হউক, বাস্তবিক সে যেরূপ ঘৃণার পাত্র, সেইরূপ মানুষ হইয়া যদি মহামায়াকে মা বলিয়া চিনিতে না পারে, তাহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা। সাধক! তুমি আমার মাকে দেখিবে? তবে ঐ দেখ,—যিনি তোমার ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসটি হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত ক্রিয়া-শক্তি-রূপে, সঙ্কল্প-বিকল্প-আকারে মনোরূপে, কামক্রোধাদি আকারে, বৃত্তিরূ,পে বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি-আকারে অবস্থারূপে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপে মহা-পরিবর্তনের আকারে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ঐ উনিই যে তিনি, মহামায়া মা আমার। যাঁহাকে তুমি সাধনার অনন্ত অন্তরায় মনে করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে পরিহার করিতে উদ্যত হও, যাঁহাকে তুমি মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, বন্ধন বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে চেষ্টা কর—ঐ উনিই যে তিনি গো! ঊর্দ্ধে-নিম্নে, পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে যাহা কিছু দেখিতে পাও—ঐ উনিই যে মহামায়া মা আমার। এই যে স্নেহময় পুত্রের কমনীয় মূর্তিখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে আত্মহারা হইলে, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কাঞ্চনের লোভে তৃষ্ণার্ত হরিণের মত ছুটিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কুসুম-সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে নানাবিধ ভোজ্য সম্ভারে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা। তোমার স্থূলদেহের প্রত্যেক পরমাণু—

মহামায়া মা। তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মা, কাম-ক্রোধ মা, সুখ-দুঃখ মা, পাপ-পুণ্য মা, জন্ম-মৃত্যু মা, দীনতা মা, স্বর্গ-নরক মা, অজ্ঞানতা মা ; মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই, তোমার অন্তরে-বাহিরে একমাত্র মা-ই পূর্ণভাবে প্রকটিত। যাঁহাকে তুমি চাও, যাঁহাকে তুমি অন্বেষণ কর, ঐ যে তিনি—মহামায়া মা আমার তোমাকে স্নেহময় আলিঙ্গনে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, অনন্ত জন্মমৃত্যু-প্রবাহের ভিতর দিয়া, উন্মাদিনীবেশে আলুলায়িতকেশে, 'পুত্র ! আয় আয়' বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। বড় আদরে—অতি যত্নে তোমার জড় পরমাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এতদিন মহামায়াকে— মাকে আমার চিনিতে পার নাই ; ক্ষতি নাই ; কিন্তু এখন মানুষ তুমি—মাকে চিনিবে না ! মাকে দেখিবে না ! ইহা কি মানুষের কাজ। মা আমার তোমার মুখে আধ আধ মাতৃ-আহ্বান শুনিতে বড়ই উৎসুকা ! তাই তিনি প্রতিনিয়ত নিজে মা বলিয়া তোমাকে মা বলা শিখাইতেছেন ; তবু তুমি মা বলিবে না।

ঐ দেখ, তুমি যাহা চাহিতেছ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাহা যখন চাহিতেছ, তৎক্ষণাৎ মা আমার সেইরূপে—তোমার ভোগ্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। তুমি বহুত্বের আনন্দক্রীড়া করিতে চাহিয়াছিলে—ক্ষুদ্রত্বের, পরিণামিত্বের অভিনয় করিতে চাহিয়েছিলে—দেখ, স্নেহময়ী স্মেরাননা মা অমনি তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া, অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় তোমার অভিলাষ মিটাইতেছেন। তুমি ফল চাহিলে, ফুল চাহিলে, অমনি মা আমার ফলের আকারে, ফুলের আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। হায় ! তুমি মাকে চিনিলে না। শুধু ফল ফুল চিনিলে ! কে তোমার নিকট ফল-ফুলের আকারে— কাম-কাঞ্চনের আকারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা চাহিয়া দেখিলে না ! শুধু নাম-রূপে মুগ্ধ হইলে ! ঐ নাম ও রূপ কাহার ! কে ঐ বহু নামে, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা একবার দেখিলে না ! বড় বড় দার্শনিকের ভাষাগুলি মুখস্থ করিয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া, ভ্রান্তি বলিয়া, উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ ? উনি মিথ্যা নহেন, ভ্রান্তি নহেন, স্বপ্ন নহেন, অধ্যাস নহেন, জড় নহেন, উনি সত্য, উনি ব্রহ্ম, উনি অভয়, উনি অমৃত, উনি আর কেহ নহেন, উনি মহামায়া মা—'আমি'।

ধার্মিক ! তুমি যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছ ! ঐ যে তোমার প্রকৃতি ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ! উনি কে ? উনিই যে মহামায়া মা ! অধার্মিক ! তুমি প্রতিনিয়ত কাহার ইঙ্গিতে পাপের পঙ্কিল অভিনয় করিতেছ ? কাহার তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য পাপপূর্ণ পথে বিচরণ করিতেছ ? কে তোমার নিন্দিত-প্রকৃতিরূপে মলিনতার ছিন্ন বসন পরিয়া, তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন ? একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? ঐ উনিই মহামায়া মা। হিংসাদ্বেষ-নিষ্ঠুরতারূপে কিংবা দয়া-ক্ষমা উদারতারূপে, নিদ্রা-তন্দ্রা-আলস্যরূপে কিংবা উৎসাহ-উদ্যম-অধ্যবসায়-রূপে বিষয়সম্ভোগরূপে কিংবা সন্ন্যাস-রূপে বিষয়-বিদ্বেষের আকারে, অর্থোপার্জন, পরিবার-প্রতিপালন কিংবা জপ-ধ্যান-যোগ-পূজাদি উপাসনা-রূপে, কে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ?

ঐ দেখ—তোমার দেহাত্মবুদ্ধিরূপে মা ! ঐ দেখ —চঞ্চলতাময় মনোরূপে মা। ঐ দেখ—সুখদুঃখের ভোক্তা প্রাণরূপে মা ! ঐ দেখ—শুদ্ধ বোধরূপে মা ! ঐ দেখ —বন্ধনরূপে মা ! ঐ দেখ—মুক্তিরূপে মা ! ওরে ! এত নিকটে এত অন্তরে আর কে আছে রে। এত আত্মীয়তা, এত স্নেহ আর কোথায় আছে। এত স্নিগ্ধ মধুর আলিঙ্গনে আর কে মুগ্ধ করিবে ? তোমরা জগতে প্রিয়তমা ভার্যার সোহাগপূর্ণ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হও, আত্মহারা হও ; সে আলিঙ্গন যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে দেহের ব্যবধান থাকে, সম্যক্ মিলাইয়া যাইতে পারা যায় না ; কিন্তু তাঁহার—মহামায়া মায়ের আমার আত্মহারা-আলিঙ্গনে কিছুই ব্যবধান থাকে না। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে হারাইয়া আমাতে মিলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই স্নেহের আত্মহারা, আনন্দের নিগূঢ় আলিঙ্গন উপলব্ধি কর, উঁহারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। যিনি তোমার প্রকৃতি সাজিয়া, দীনতার নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়া, মলিন পরিচ্ছদে জীবত্বের অভিনয় করিতেছেন ; ঐ মহামায়া মায়ের, ঐ পরমাত্মরূপিণী মায়ের, ঐ জগৎরূপে প্রকাশশীলা মায়ের সম্মুখে একবার মা বলিয়া দাঁড়াও। তিনি যেমন বহুরূপে বহু মূর্তিতে তোমায় মুগ্ধ করিয়া

'আয় আয়' বলিয়া ডাকিতেছেন, তুমিও যাই মা, যাই মা বলিয়া ছুটিয়া চল। মহামায়া মায়ের আমার বড় সাধ—তাঁহার মনুজ পুত্রকে মনুত্বে অধিরোহণ করাইবেন, অষ্টম করিবেন, মন্বন্তরের আধিপত্য দিবেন। আমরা রাজরাজেশ্বরীর সন্তান ! মা কি আমাদের দীনতা দেখিতে পারেন। আমাদের দীনতা-হীনতা দেখিয়া যে মায়ের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হয়। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর করিবার জন্য, পরিণামিত্ব অপনয়ন করিবার জন্য—জন্ম-মৃত্যু-যাতনা চিরদিনের জন্য বিদূরিত করিবার জন্য তিনি রাজরাজেশ্বরী হইয়াও দীনবেশে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। চল আমরা একবার মা বলিয়া দাঁড়াই। আর কিছুই করিতে হইবে না—চল কোটি কণ্ঠে একবার মা বলিয়া ডাকি। তাহাতেই তিনি প্রীত হইবেন, আনন্দে আত্মহারা হইবেন, মন্বন্তরের আধিপত্য দিবেন। আমরা মহাভাগ হইব—সৌভাগ্যবান হইব। আমরা সূর্যতনয় হইব। অনন্ত জগৎপ্রসবিনী সবর্ণা মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিব। মনু হইব—মুক্তিলাভ করিব।

বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন উহাই মায়া নামে অভিহিত হয়। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় জগতের প্রত্যেক পদার্থই মহামায়ার অঙ্কস্থিত। মনে কর একটি বৃক্ষ দেখিতেছ, 'বৃক্ষ আছে' বলিয়া একটি বোধ প্রকাশ পাইল। ঐ বোধের যে অংশটি 'আছে' অর্থাৎ অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত, সেই অস্তিত্বই বৃক্ষরূপ বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়াছে। বৃক্ষ—একটি শক্তি মাত্র। বহির্দৃষ্টিতে যদিও বৃক্ষকে শক্তিরূপে অনুভব করা যায় না, তথাপি একটু ধীরচিত্তে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—স্থির ভাবে দণ্ডায়মান বৃক্ষটি বাস্তবিক স্থির নহে, উহা একটি শক্তি প্রবাহমাত্র। একটি শক্তি পরমাণুগুলিকে দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিক্ষণে অকর্মণ্য পরমাণুগুলি বহিঃনিসৃত হইতেছে, অভিনব পরমাণু সংযোজিত হইতেছে, অন্তর্নিহিত রসপ্রবাহ শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পাদিতে পরিচালিত হইতেছে, পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, আপনি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপ বহু ক্রিয়াশক্তি বৃক্ষের ভিতর রহিয়াছে ; অতএব কতকগুলি শক্তিপ্রবাহ একস্থানে 'বৃক্ষ' এই নামে পরিচিত হইতেছে। ঐ শক্তিপ্রবাহগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—একটি বৃক্ষকে গঠন করিতেছে, একটি স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং তৃতীয়টি বিনাশ করিতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়শক্তিরই সাধারণ নাম জগৎ বা পদার্থ। প্রতি পদার্থে প্রতিক্ষণে এই ত্রিশক্তির সম্মিলনমাত্র পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে বলিয়াছি—অস্তিত্বটি বিশেষণ যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণই হইতেছে শক্তি। 'জগৎ আছে'—এই যে প্রতীতি, এই যে জগৎ বিশিষ্ট একটি সত্তা-জ্ঞান, উহা হইতে জগৎ অংশ বা বিশেষণ অংশ দূরীভূত হইলে, সাধারণতঃ ঐ সত্তা-অংশটি এখন আমাদের প্রতীতিযোগ্যই হয় না। আবার জগৎসত্তার প্রতীতি না হইলে, আত্মসত্তা অর্থাৎ আমি আছি এই জ্ঞানও থাকে না। ঐ সত্তা বা অস্তিত্ব-অংশ সর্বদা শক্তির অঙ্কেই অবস্থিত ; সুতরাং জগৎ বলিলে আমরা বুঝি—একটি শক্তি এবং একটি সত্তা। তন্মধ্যে শক্তি-অংশটি প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া স্থূলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই অংশের সাধারণ সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। অপর অংশটি অর্থাৎ সত্তাটি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অপ্রত্যক্ষ নহে। এই শক্তি ও সত্তা বস্তুতঃ অভিন্ন। শক্তির সত্তা অথবা সত্তারই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। যতক্ষণ ভেদ-প্রতীতি থাকে, ততক্ষণ দেখা যায়, শক্তি যেন সত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তিটিও জড় নহে, চিৎ বা চৈতন্যমাত্র। ইহারই নাম মহামায়া। তাই, পূর্বে বলিয়াছি—জীব-জগৎ মহামায়ারই অঙ্কস্থিত সন্তান মাত্র।

এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে—সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে—প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশই—শক্তি বা মায়া। আমরা জানি—মায়া সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন আর বহুত্বের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া, স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুণ নির্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত। যতক্ষণ জীবজগৎ, যতক্ষণ উপাসনা, সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়া। যতক্ষণ মাতৃ-লাভ, ততক্ষণ মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশু-চৈতন্যই জীব। ব্যোম-

পরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত সন্তানমাত্র ; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ-আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখি না, দেখি মা ; ফলে ফল দেখি না, দেখি মা ; জলে জল দেখি না, দেখি রসময়ী মা ; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ী মা ; চন্দ্রসূর্য চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃ-চক্ষু বা মা ; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, মায়ের কটাক্ষ বা মা ; নির্মল আকাশ আকাশ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃ-বক্ষ ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎই মায়ের প্রকট মূর্তি ! জগৎ দেখিয়া যার মাকে মনে না পড়ে, সে কিরূপে জগদতীতা ভাবাতীতা মাকে ধরিবে ! মা আমার দয়া করিয়া গুরুরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যাহার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সে-ই—মাত্র সে-ই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মাতৃ-মূর্তি দেখিতে পায় ও নিয়ত আনন্দে আত্মহারা থাকে। চৈতন্যদেব বলিতেন—**'চারিদিকে হেরি আমি রাইহেমরূপ'**। যতদিন যাহা দেখে, তাহাতেই ইষ্টস্ফুরণ না হয়, ততদিন তপস্যা তপস্যামাত্র। একটি শ্লোকেও আছে—'যাহার অন্তর বাহিরে হরি, তাহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি ? যাহার অন্তর বাহিরে হরি নাই, তাহার তপস্যায় কি ফল ?' কিন্তু সে অন্য কথা—

অনুভাব—এই মায়ার অনুভাবে অর্থাৎ অনুকূল ইচ্ছায়—কৃপায় স্নেহের উপলব্ধিতে জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। অনুভাব কি ? **অনু পশ্চাৎ ভূয়ত ইতি অনুভাবঃ**। মহামায়া চৈতন্যময়ী শক্তিস্বরূপা ; সুতরাং দুর্বিজ্ঞেয়া ; কিন্তু অনু অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তিনি ভাব আকারে প্রকটিতা হইয়া থাকেন। প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে যে ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, উহাই মহামায়ার অনুভাব। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, রূপ রসাদি বিষয়, দয়া ক্ষমাদি গুণ, এ সকল মহামায়ারই অনুভাব। এই ভাবরাশি মহামায়ারই অঙ্কে সঞ্জাত এবং মহামায়াতেই বিলীন হয়। যখন মা আমার অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্ত অবস্থায় আবির্ভূতা হয়েন তখনই তিনি ভাবের আকারে প্রকটিতা হইয়া পড়েন। ঐ ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়াই এই স্থূল জগৎ-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। যতক্ষণ মহামায়া অনুভাবের আকারে থাকেন ততক্ষণ উহা মাত্র মানসগ্রাহ্য ; উহা ঘন হইলেই স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়। ভাবই মহামায়ার অনু অর্থাৎ পশ্চাদবর্তী দ্বিতীয় স্বরূপ। মহামায়ার স্বকীয় নির্বিশেষ স্বরূপটি জীবের নিকট অব্যক্তপ্রায় হইলেও, ভাবময়ী অনুভাব স্বরূপিণী মহামায়া মা প্রতি জীবের নিকট প্রতিমুহূর্তেই প্রকটিতা। তিনি প্রতিক্ষণে আমাদের নিকট ভাবের আকারে প্রকটিতা হইতেছেন। ভাবই মা ! ভাবে ভাবে ভাবিনী মা আমার সর্বদাই আসিতেছেন ; ইহা যদি আমরা বুঝিতাম, তবে যথার্থ মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছা বা মাতৃ-স্নেহ উপলব্ধি করিয়া আত্মহারা হইতে পারিতাম। সাধক ! তুমি যাহাকে ভাব বলিয়া কল্পনামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেছ, উহাই যে ভাবিনী অনুভাবরূপিণী মা আমার ; ইহা যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে তোমার সাধনমার্গ সুগম হইবে। যদি মহামায়াকে চাও, তবে ভাবে ভাবে অগ্রসর হও। ভাবকে মা বল, ভাবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও, ভাবের চরণে প্রণত হও। ভাব উপেক্ষার জিনিস নহে ; এই জগৎ ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এক স্থানে চৈত্র নামক কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, পুত্র, ভৃত্য ও জনৈক কামুক বন্ধু সহ উপবিষ্ট ; সম্মুখে একটি সদ্যধৃত ব্যাঘ্র শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় শায়িত আছে। এই সময়ে চৈত্রের পত্নী কার্যব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র চৈত্রের মনে পত্নীভাব, তাহার পিতার মনে পুত্রবধূভাব, পুত্রের মনে মাতৃ-ভাব, ভৃত্যের মনে প্রভুপত্নীভাব, বন্ধুর মনে কামভাব এবং ব্যাঘ্রটির মনে খাদ্যভাব উপস্থিত হইল। একটি নারীমূর্তি এতগুলি বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিল। একটু ভাব দেখি ব্যাপারটা কি ? বাস্তবিকই এতগুলি ভাব কি নারীমূর্তিতেই ছিল ? না—উহা প্রত্যেকের স্বগত ভাব।

তোমার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল, তুমি ব্যথা পাইলে। ঐ ভাবটি কোথায় ছিল ? কণ্টকে, না তোমারি অন্তরে ? এইরূপ বুঝিয়া লও—তুমি আম খাইলে। মিষ্ট রস আমের মধ্যে ছিল, না উহা তোমার অন্তরস্থিত একপ্রকার ভাব বা অনুভূতি। এইরূপ জগতের সর্বত্র। আমরা দিবারাত্র যে জগদ্ভোগ করি, ঐ জগৎ ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই ভাবসমূহ আমাদের অন্তরে অবস্থিত। বাহিরে জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা

আমাদের জানিবার উপায় নাই। সর্বত্র একমাত্র পরমপদ অবস্থিত। উহারই অর্থরাশি বা ভাবসমূহ প্রতিনিয়ত আমার অন্তররাজ্যে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার প্রয়োজন শেষ হইলে মিলাইয়া যাইতেছে। ঐ পরমপদই মহামায়া এবং ঐ পদের যাহা অর্থ বা পদার্থ তাহাই ভাব ; তাই ইহাকে মহামায়ার অনুভাব বলা যায়। মহামায়া মহাশক্তিরূপিণী চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি মা আমার আমাকে পূর্ণত্বে—ব্রহ্মত্বে উপনীত করিবার জন্য —পরিচ্ছিন্ন বা বিষয়জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে উপনীত করিবার জন্য যখন যেভাবে ভাবুক করা প্রয়োজন মনে করেন, তখন সেইরূপ অনুভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাপ পুণ্য, ধর্মাধর্ম, রোগ শোক, পরিতাপ ব্যসন, হাসি কান্না প্রভৃতি যখন যে ভাবটি আমার পক্ষে অনুকূল যখন যেভাবে ভাবুক হইলে আমার আধ্যাত্মিক গতি খরতর হইবে, যখন যেভাবে ভাবিত হইলে ভাবাতীতা মহামায়াকে মা বলিয়া সহজে চিনিতে পারিব, মা আমার তখন সেইভাবেই প্রকাশ পান। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় —ঐ ভাবরাশি যেন কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে অপর কাহারও ইচ্ছায় আবির্ভূত হয়, আবার কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উহার আবির্ভাব-তিরোভাব যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীবভাবীয় জ্ঞানগণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। যে সাধক এই ভাবরাশির কেন্দ্র অন্বেষণের জন্য লালায়িত হয়—ভাবে ভাবে মহামায়ার অনুভাব লক্ষ্য করে—ভাবকে মা বলিয়া—আত্মা বলিয়া ভাবের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেই সাধক পুত্রই মহামায়াকে চিনিতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই,—জগতে অনেক সাধক আপন আপন ইষ্টমূর্তিকে ধ্যান করিতে গিয়া—হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ইষ্টদেবকে ফুটাইতে যাইয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর যখন দেখিতে পায় যে, ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে কোন জাগতিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছে, রাজরাজেশ্বরের আসনে জগতের ধূলি—ধনজন স্ত্রী পুত্র যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কোন একটিকে বসাইয়া ফেলিয়াছে, তখনই চমকিয়া উঠে ও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মনে করে—'হায় ! আমার কিছুই হইল না, মাকে ভাবিতে বসিলেই ছাইভস্ম কত কি ভাবনা পুঞ্জীভূত হইয়া যেন হৃদয়ক্ষেত্র তোলপাড় করিয়া তোলে। আমাদের পক্ষে ভগবৎ লাভ একান্ত অসম্ভব। এত চঞ্চল মন নিয়া কি ভগবানের সাধনা হয় ! সাধনা ব্যাপারটি শুধু সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী সাধু মহাপুরুষদের জন্যই ; উহা আমাদের মত চঞ্চল সংসারী গৃহস্থ লোকের জন্য নহে।' কিন্তু হায় ! যদি সে জানিতে পারিত যে, ঐ চঞ্চলতারূপে—ঐ জগতের ধনজনাদিরূপে মা-ই আসিয়াছেন—ভাবমাত্রেই যে মা, ইহা যদি বুঝিতে পারিত—যদি সে দেখিতে পাইত—ছলনাময়ী রঙ্গপ্রিয়া লীলা-বিলাসিনী মা আমার যতদিন আনন্দ লীলা করিবেন, ততদিন মুহুর্মুহুঃ তাঁহার ভাবময়ী মূর্তি রূপান্তরিত হইবেই, তবে আর হতাশের কারণ কিছুই থাকিত না। ওরে, পুত্র যখন মা বলিয়া ডাকে, পুত্র যখন হৃদয় সিংহাসনে মাতৃ-চরণ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হয়, তখন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই যে, সে সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। পুত্র মা বলিয়া ডাকিলে —ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবতাবৃন্দ শশব্যস্তে পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়। আর জগতের ভাবরাশি ত কোন্ তুচ্ছ। মা ছাড়া, মায়ের সিংহাসন স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সাধক ! ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া যদি দেখিতে পাও, জাগতিক ভাবরাশি আসিয়া তোমার ইষ্টচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তবে, সেই ভাবগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠা করিও। প্রত্যেক ভাবকে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, উহাকে ছদ্মবেশী ইষ্টমূর্তিজ্ঞানে আদর করিও ; উহাকেই মা বলিয়া প্রণাম করিও। ঐ চঞ্চলা ভাবময়ী মায়ের আমার চরণ লক্ষ্য করিয়া তোমার সাধনার শাণিত শরসন্ধান করিও। ভাবচঞ্চল মা আমার অচিরে স্থির হাস্যময়ীমূর্তিতে প্রকটিতা হইবেন, চিত্ত স্থির হইবে, মাকে পাইবে, তোমার জন্ম-জীবন সার্থক হইবে।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি—চিত্ত চঞ্চল বলিয়া সাধনা হইল না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক কথা। চিত্ত স্থির হইলে ত' সাধনার পরিসমাপ্তি হয় ! মাকে পাইবার পূর্বে চিত্ত স্থির কাহারও হয় না ; হইতে পারে না। মা আসিলে চিত্ত আপনি স্থির হয়—সূর্যের উদয় হইলে অন্ধকার আপনি পলায়ন করে। মাতৃ-লাভের পূর্বে কোনরূপ হঠক্রিয়া কিংবা বহিঃ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তের বৃত্তি

নিরুদ্ধ হইলে, বিশেষ ফল কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। উহা এক প্রকার নিদ্রাবিশেষ—জড়-সমাধিমাত্র। বাস্তবিক প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে চিত্ত আপনি স্থির হয় ; কোন প্রযত্নের অপেক্ষা করে না। আর যদিই বা তাদৃশ প্রজ্ঞালাভের পূর্বে চিত্ত দৃঢ়ভূমিক হয়, অর্থাৎ বৃত্তিপ্রবাহ যদি কোন একটি বিষয় অবলম্বনে দীর্ঘকাল চলিতে থাকে, তবে সংসারী জীবের পক্ষে উহা মহা-অমঙ্গলই আনয়ন করে। কাম-ক্রোধাদির উদ্দীপনা কিংবা শোক-দুঃখাদির আবির্ভাব হইলে, উহারা মানুষকে যতই অভিভূত করুক না কেন, চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ অচিরকাল মধ্যে আবার তিরোহিত হয় ; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় চিত্ত স্থিরভূমি হইলে, উহাদিগের উৎপীড়নে মানুষের কি দুর্দশা হইত, একবার ভাব দেখি ! তাই ত' বলি—চিত্ত-চাঞ্চল্য মায়ের আশীর্বাদ।

সে যাহা হউক, মহামায়া অনুভাব অথবা অনুভাবরূপিণী মহামায়াই মনুজবৃন্দকে মনুত্বে উপনীত করেন। তখন সাধক এই মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়াই উপনিষদের ঋষির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকে—'**অহং মনুরভবম্ সূর্যশ্চ**'—আমি মনু হইলাম, আমি সূর্য হইলাম। ভাবিও না ইহা শব্দের ঝঙ্কার মাত্র। ভাবিও না ইহা ভাষার উচ্ছ্বাসমাত্র। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—মনুষ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্তযোগ্য। হৃদয়ের অন্তররাজ্যে অহর্নিশ যে ভাবসমূহ একটির পর একটি উঠিতেছে, কু সু বিচার না করিয়া, প্রত্যেক ভাবটিকে মা বল। ঐ ভাবগুলি কোথায় মিলাইয়া যায়, সেই স্থানে যাইবার জন্য ঐ ভাবরূপিণী মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদ। কাতর ক্রন্দনে আকুল হও, অশ্রুধারায় হৃদয় প্লাবিত হউক। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইবে, পুনঃ পুনঃ বিফলতা আসিবে ; কিন্তু কাতর প্রার্থনা—মা বলিয়া ডাকা যেন ক্ষান্ত না হয়। ভাবগুলি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে ; কিন্তু তুমি বিফলতায় হতাশ হইও না ; পুনঃ পুনঃ বিফলতাই সফলতাকে লইয়া আসে। কিছুদিন এরূপ করিতে থাক, দেখিবে—বুঝিতে পারিবে—তুমি মহামায়া মায়ের অঙ্কে নিত্য অবস্থিত। ভাবরূপিণী মা-ই তোমায় ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। যাহা হইতে ভাবরাশির আবির্ভাব ও তিরোভাব ; উহা সেই স্থান। হায় জীব ! কবে তুমি সে মহান উদার শান্ত পূর্ণপ্রকাশময় উদাসীন ভাবাতীত মাতৃ-স্বরূপা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবে ! কিন্তু সে অন্য কথা—

এইবার আমরা সংক্ষেপে একবার মন্ত্রের স্থূল মর্ম আলোচনা করিয়া লইতেছি—ব্রহ্মা অবধি ব্যোম পরমাণু পর্যন্ত, সর্বত্রই মহামায়ার প্রকাশ। সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়ার অভাব কোথাও নাই। তাঁহার অনুভাব অবলম্বনে অগ্রসর হইলে অর্থাৎ ভাবসমূহকে মহামায়া বলিয়া বুঝিতে পারিলে, জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে— শুদ্ধবোধরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন সে বরণীয় ভর্গশক্তির অঙ্কস্থিত আত্মজ বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করে। তাহার মত সৌভাগ্যবান জীব আর কে আছে ? তাই, মন্ত্রে মহাভাগশব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। (**মহান্ ভাগঃ বীর্যং যস্য সঃ ইতি মহাভাগঃ**)। তখন সে অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম হয়। অষ্টম অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধীশ্বর ও অষ্টপাশ-বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ-সারূপ্য লাভ করে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর বোধশক্তি তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়।

এইরূপে চণ্ডীর প্রারম্ভেই মা আমার মহাফলের সূচনা করিয়া—পুত্রদিগের চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের বল পরিবর্দ্ধিত করিয়া, আত্মহারা হইয়া আকুল স্নেহে আকর্ষণ করিতেছেন। যে এই আকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িবে, সে-ই ধন্য হইবে। অনিচ্ছায় তাহাকে যেন অবশ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মাতৃক্রোড়াভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক সময় যেরূপ আমরা অনিচ্ছায়ও জগতে এক একটা ভাল কাজ করিয়া ফেলি ; এই মাতৃ আকর্ষণগণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেও—সেইরূপ যেন অনিচ্ছায়ই মাতৃমুখী গতি আরম্ভ হয়। মানুষ যখন এই গতি মৃদু মৃদু ভাবে উপলব্ধি করে, তখন হইতেই তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে। নিত্য নবীন উৎসাহে, নিত্য নবীন অনুভূতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ হইতে থাকে। তখন জীব পূর্ণ উৎসাহে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতি মণ্ডলে ॥৩॥

অনুবাদ। পূর্বকালে স্বারোচিষ্-মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত, সমগ্র ক্ষিতি মণ্ডলের অধিপতি সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন।

ভাবিতেছেন আমি বৃক্ষ। ভূমি ভূমি নহে; মা ভাবিতেছেন আমি ভূমি। বায়ু বায়ু নহে; মা ভাবিতেছেন আমি বায়ু। কামিনী কামিনী নহে; মা ভাবিতেছেন আমি কামিনী। কাঞ্চন কাঞ্চন নহে; মা ভাবিতেছেন আমি কাঞ্চন। পুত্র পুত্র নহে; মা ভাবিতেছেন আমি পুত্র। এইরূপ সর্বত্র। জগৎটা মায়ের মনের ভাব বা মন। আমাদের মনের ভাবগুলি বড় অল্পক্ষণস্থায়ী; কিন্তু মায়ের মন অসীম ও অনন্তবীর্য। তাই, তাঁর ভাবগুলি এত ঘন, এত বেশী সময় স্থায়ী যে, আমরা উহাকে আর ভাব বলিয়া সহসা ধারণা করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা মায়েরই অন্তরে জন্মগ্রহণ করি, মায়েরই অন্তরে বিচরণ করি, আবার মায়েরই অন্তরে মরিয়া যাই। আমরা সর্বাবস্থায় মায়েরই অন্তরে অবস্থিত। যেরূপ কোন সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বহুবিধ দ্রব্য দেখিয়াও একটি গৃহমাত্রের প্রতীতি হয়; সেইরূপ এই জগতের অসংখ্য ভেদ, অসংখ্য নাম রূপ, অসংখ্য পদার্থ দেখিয়াও সবগুলি যেন একমাত্র মায়ের অন্তররূপ একখানি গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধারণার ফলে বহুত্ববুদ্ধি ভেদবুদ্ধি ধীরে ধীরে একত্বের দিকে অগ্রসর হয় এবং অন্তর বলিয়া জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। পূর্বে যে মহামায়ার অনুভাব কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা এই অন্তরজ্ঞানসাপেক্ষ।

এখানে আর একটি রহস্য আছে,—যে যাহার অন্তর সে তাহার আশ্রিত। এই জগৎ মায়ের অন্তর; সুতরাং মায়ের আশ্রিত। আমরা মায়ের অন্তর; সুতরাং সর্বতোভাবে মায়ের আশ্রিত। মা আশ্রয়—একমাত্র আশ্রয়—একান্ত আশ্রয়। এইরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব সাধনা-পথের সর্বপ্রধান অবলম্বন। আমরা অনেক সময় মনে করি ভগবানকে না পাইলে— মাকে না দেখিলে, আমাদের কি ক্ষতি আছে; ভগবান ব্যতীতও আমাদের ত' বেশ চালিয়া যাইতেছে। উহা আমাদের অজ্ঞানতামাত্র। বৃক্ষস্থিত ফল যদি মনে করে—বৃক্ষ না থাকিলে আমাদের কি ক্ষতি আছে,— বায়ু যদি মনে করে, আকাশ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে,—জল যদি মনে করে, মৃত্তিকা না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে— দেহ যদি মনে করে, প্রাণ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে; তাহা হইলে এইরূপ মনে করাকে যেমন অজ্ঞানমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, ঠিক সেইরূপ যাহারা ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া আপন-অস্তিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে অজ্ঞান শিশু ব্যতীত অধিক আর কি বলা যাইতে পারে। অন্তর বাহির ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইলে, সর্বত্র আমারই অন্তর—এইরূপ অনুভূতি লাভ করিলে, এই আশ্রয়-আশ্রিত-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

যাহা হউক, যখন অন্তরদেশ সর্বত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে —মায়ের লাবণ্যময়ী অঙ্গপ্রভায় সমুদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীতি হয়, তখনই অন্তর স্বারোচিষ হয়, তখনই জীব সুরথ নামে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হয়। সুরথ এইরূপ স্বারোচিষ-অন্তর-বিশিষ্ট সাধক—জীবাত্মা। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—**'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি দেহন্তু রথমেব চ'**। আত্মা—রথী; এবং দেহ—রথ। জীবাত্মার এই দেহরথখানি যখন সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়, তখনই জীব সুরথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যতদিন এই স্বারোচিষত্ব-লাভ না হয়; যতদিন স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত না হয়; যতদিন জীব মহামায়ার জগন্মূর্তি বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারে; যতদিন পূর্ণ অস্তিত্ব জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে অজ্ঞানান্ধ জীবের হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত না হয়; ততদিন জীব সুরথ হইতে পারে না। সুরথ না হইতে পারিলে মনু হইবার আশা থাকে না। কি ভাবে মা তাঁহার স্নেহের সন্তান জীবগণকে এই সুরথ-স্বরূপে সমানীত করেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন —**'চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ'**। (চিত্র+ষ্ণ=চৈত্র)। বিচিত্র নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া—জড় পরমাণু হইতে ক্রমে গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, বন্য, অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য প্রভৃতি অসংখ্য যোনি, অসংখ্য বংশ ভ্রমণ করিয়া জীব সুরথ হয়—মানুষ হয়।

মহামায়া মা আমার জীব-সন্তানকে স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়া এইরূপ অসংখ্য চিত্র-বিচিত্র বংশের ভিতর দিয়া, যখন শ্রেষ্ঠবংশ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করেন; যখন মানুষ সম্যক্ জ্ঞানের সমীপবর্তী হয়; যখন অসংখ্য জন্মমৃত্যুর ঘাত-প্রতিঘাতে ত্রিবিধ দুঃখে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হয়; যখন আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের একান্ত নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়-বিষয়ক যথার্থ জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয় তখনই

জীব সুরথ হয়। পক্ষান্তরে, জীব যতদিন ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসবান হইতে না পারে—যতদিন এই জগন্মূর্তিকে মহামায়া বলিয়া বুঝিতে না পারে ; ততদিন তাহার দেহ রথমাত্র থাকে ; সুরথ হয় না।

মানব ! একবার স্বকীয় অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখ—যেদিন তুমি প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, যেদিন তুমি অসীম আনন্দময় একত্ব হইতে বহুত্বের আনন্দে লুব্ধ হইয়াছিলে, সেই দিন—সেই মুহূর্ত হইতে মহামায়া মা তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া, তোমাকে বক্ষে ধরিয়া, বিচিত্র নানা যোনিসম্ভূত বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করাইয়া, জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। তোমাকে সুরথ করিবেন বলিয়া—তোমার দেহরথখানি সর্বেন্দ্রিয়-সামঞ্জস্যপূর্ণ অসীম জ্ঞানের আধার করিবেন বলিয়া, প্রতিমুহূর্তে গতিরূপে উন্মাদিনীর ন্যায় তোমাকে অঙ্কে ধরিয়া ছুটিয়াছেন। যতদিন তুমি তির্যক্‌জাতিতে প্রবৃত্তিমাত্র পরিচালিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিলে, ততদিন মাকে চিনিতে পার নাই, ক্ষতি নাই। এখন মা তোমাকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় হস্তদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার দেহরথখানি সুসজ্জিত করিয়াছেন অন্নময় কোষের কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তুমি সুরথ হইয়াছ ! সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছ—জড়ের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছ, এখনও মাকে ভুলিয়া থাকিবে ? এখনও মাকে দেখিবে না ?

যিনি আমাকে জড়পরমাণু হইতে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশক্ষেত্রে মানবকুলে উপনীত করিয়াছেন, যিনি আমার অন্তরদেশ স্বারোচিষ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার স্বর্গীয় অঙ্গজ্যোতিতে আমার হৃদয়রাজ্য আলোকিত হইয়াছে, পাছে আমার অহং-কর্তৃত্বাভিমানে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে ; তাই, যিনি আমার সকল কার্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়াও, তাঁহার নিজ কর্তৃত্ব আমার নিকট লুক্কায়িত রাখিতেছেন ; যিনি অন্তরাল হইতে অসীম স্নেহ-প্রকাশে ধন্য করিতেছেন অথচ আমি ভালবাসিতে গেলেই অন্তর্হিত হন ; হায় ! একদিনের জন্যও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না ! একদিনের জন্যও সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রের মত তাঁহার আদর অনুভব করিতে পারিলাম না ! যিনি আমার জন্ম-মরণের সাথী, যিনি আমার সুখ-দুঃখের সখা, যিনি আমার অনন্তযাত্রার অদ্বিতীয় সহচর, যিনি আমার দেহরথের একমাত্র সারথি, যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমরা মানুষ হইয়াছি, সুরথ হইয়াছি, সেই স্নেহময়ী মহামায়া মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটিমাত্র কৃতজ্ঞতার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ! ধিক্ আমাদের মানবজীবনে ! ধিক্ আমাদের কৃতঘ্নতায় ! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ত দূরের কথা ! যিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, যাঁহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, তাঁহার অস্তিত্বে আজ পর্যন্ত সম্যক্ বিশ্বাসবান হইতে পারিলাম না ! সরল প্রাণে তাঁহার সত্তা চাহিয়া দেখিলাম না ! হায় ! তবু মা আমায় কত আদর, কত স্নেহ করেন ! জানি, তিনি যে মা, তিনি তাঁহার অনুপম স্নেহের প্রতিদান-আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহার কার্য—স্নেহ-স্তন্যদান। তাহা তিনি প্রতিনিয়ত করিতেছেন, করিবেন। আমি কৃতঘ্ন, আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া, তিনি আমায় ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে পারেন না, বরং অমৃতময় সঞ্জীবনী ধারায় সর্বদাই অভিষিক্ত করিতেছেন, করিবেন। হায় ! এ স্নেহ, এ মাতৃত্ব কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ! কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, জীব যখন চৈত্রবংশ সমুদ্ভূত হয়, অর্থাৎ বিচিত্র নানা যোনি—নানা বংশ ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হয়, যখন অন্তররাজ্য স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়—জ্ঞানের নির্মল আলোকে আলোকিত হয়, তখন জীব সুরথ হইয়া থাকে ; এবং সুরথ হইলেই সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হয়। ক্ষিতিমণ্ডল-শব্দে পার্থিব বস্তুসমূহ বুঝা যায়। সুরথ হইলেই পার্থিব পদার্থের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। অন্নময় কোষ স্থূল দেহ তখন অনন্ত জ্ঞানবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। সকল ইন্দ্রিয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, বুদ্ধির বিকাশকেন্দ্র উন্মেষিত হয়, স্থূল সূক্ষ্মের ভেদ প্রতীতিযোগ্য হয়, সর্বপ্রধান কথা —ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

এস্থলে সাধনার আভাস দিয়া রাখিতেছি —ক্ষিতিমণ্ডল শব্দের অর্থ মূলাধার-চক্র। গাঢ় রক্তবর্ণ ত্রিপুরক্ষেত্রের বহির্দেশে অষ্টশূলে আবৃত চতুষ্কোণ ধরা বা ক্ষিতিমণ্ডল অবস্থিত। ইহা অব্যক্তা প্রকৃতির চরম পরিণতি। গন্ধ ইহার তত্ত্ব। মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে ইহার

স্থান। ঐ চক্রের মধ্যভাগে 'লং' এই ক্ষিতিবীজ অবস্থিত, মন্ত্রচৈতন্য করিয়া গুরূপদিষ্ট উপায়ে উক্ত বীজের ধ্যান করিলে অথবা ঐ কেন্দ্রে সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট দর্শন বা অনুভূতি লাভ হয়। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাসের ফলে ইচ্ছা মাত্র মনকে এই ক্ষিতিমণ্ডলে লইয়া গিয়া নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যোগে আরোহণকারী সাধকগণের প্রথম প্রথম যে **'অঙ্গমেজয়ত্ব'** বা অঙ্গবিক্ষেপ স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তাহা এই মূলাধারের বিশিষ্ট ক্রিয়ায় দূরীভূত হয়। পার্থিব দেহ স্থিরভাবে অবস্থান করে। এতদ্ভিন্ন দুই একটি সিদ্ধিও লাভ হয়। ইহাই ক্ষিতিমণ্ডলের আধিপত্য।

———০———

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজাবৃন্দকে পালন করিতেন। কিন্তু তাহারাই তাঁহার শত্রু হইয়া, স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্বক কোলা নামক রাজধানী বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। প্রকর্ষেণ জায়ন্তে আবির্ভবন্তি বা ইতি প্রজাঃ ভাবাঃ। প্রজা শব্দের অর্থ—বৃত্তি বা ভাব। নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব যখন সুরথ হয়, যখন পার্থিব দেহ বা স্থূল পদার্থসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করে, অর্থাৎ যখন জীবভাবীয় অহংজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন সে সমুদয় মনোবৃত্তি বা ভাবসমূহকে ঔরস পুত্রের ন্যায় আত্মজবোধে প্রতিপালন করিতে থাকে। কি অন্তরে কি বাহিরে যত রকম ভাব ফুটিয়া উঠে 'সবই ত' আমার ভাব, 'সবই ত' আমার আত্মজ, 'সবই ত' আমা হইতে উদ্ভূত ; সুতরাং ইহাদিগকে আমারই পোষণ করা একান্ত কর্তব্য, এইরূপ কর্তব্যবোধে পুরুষকারের—অহংকারের সুদৃঢ় কার্মুকহস্তে, ভাববৃন্দের পরিপোষণে যত্নবান হয় ; কারণ জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবমাত্রই মহামায়ার অনুভাব। যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ত' সে মনু হইবে।

সাধারণতঃ এই ভাবসমষ্টির নামই 'আমি'। যেরূপ বৃক্ষ বলিলে—তাহার শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল ও তদধিষ্ঠিত পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত নিয়া একটি বৃক্ষ বুঝায়, সেইরূপ 'আমি' বলিলে—আমিত্বের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু দাঁড়ায়, সে সকল ভাবমাত্র। সাধারণতঃ 'আমি' বলিলে—অনাদিজন্মসঞ্চিত সংস্কার-রাশিবিশিষ্ট একটি আমিকে বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সপ্তধাতুবিশিষ্ট স্থূল দেহ, অতঃপর—স্ত্রী, পুত্র, ধন, বিদ্যা, যশ ইত্যাদি, তারপর—সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, দয়া, ক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ; এরূপ যত কিছু সবই যেন আমার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, অথবা এখন আমরা এই সকলকেই 'আমি' বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এই সকল ভাব পরিত্যাগ করিলেও যে 'আমি' থাকিতে পারে, ইহা আমরা প্রথমতঃ বুঝিতেই পারি না ; সুতরাং 'আমি'র তৃপ্তিবিধান করিতে গিয়া ভাববৃন্দের পরিপোষণ করিয়া থাকি। ইহাই সুরথের ঔরস পুত্রের ন্যায় অর্থাৎ অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন।

ঔরস পুত্র সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। উরস শব্দের অর্থ বক্ষঃস্থল অর্থাৎ হৃদয়। হৃদয় হইতে—আত্মা হইতে সঞ্জাত হয় বলিয়াই পুত্রকে ঔরস বলা হয়। আত্মার —পরম প্রেমাস্পদ প্রিয়তমের অংশ বলিয়াই জগতের সর্ববস্তু অপেক্ষা আত্মজ এত প্রিয় হয়। জাগতিক ভাবসমূহও ঠিক এইরূপ প্রিয়তমের সহিত— আত্মার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে ; তাই, বাধ্য হইয়াই ইহাদিগকে ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হয় ; কিন্তু অবশেষে ইহারাই শত্রু হইয়া পড়ে। কিরূপে আমরা ভাবসমূহের পরিপোষণ করি, এবং কিরূপে ইহারা শত্রু হয়, তাহা আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—দেখ, অধিকাংশ মানুষই স্ত্রী পুত্র ধন যশ এবং দেহাদির পরিপোষণে ব্রিব্রত। (ঐগুলিও যে ভাবমাত্র, তাহা পূর্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে) উহাদের জন্য জীব আপনাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। 'কিরূপে আমার পরিজন সুখে থাকিবে, কিরূপে আমার প্রচুর ধন হইবে, কিরূপে আমার দেহটি সুন্দর ও সুস্থ হইবে, কিরূপে আমি যশস্বী হইব, কিরূপে আমি জগতের উপকার করিব', ইত্যাদি ভাবরাশিকে বহু দিবস ধরিয়া পরিপুষ্ট করিয়াও যখন প্রাণের যথার্থ পরিতৃপ্তি হয় না, তখন দেখিতে পায়, —সেইদিন জীব-জীবনের প্রথম শুভদিন—যেদিন দেখিতে পায়— আমি যাহাদের পরিপোষণে নিয়ত ব্রিব্রত, বস্তুতঃ তাহারা আমার আত্মীয় নহে—শত্রু। এবং তাহারাই ত' দেখিতেছি 'ভূপ' অর্থাৎ রাজা হইয়া বসিয়াছে ; কারণ

এখন ত' ভাবসমূহ দ্বারাই আমি পরিচালিত হইতেছি। তাহাদের ইঙ্গিতে—তাহাদের ইচ্ছায় আমি চলিতেছি, তাহাদের আদেশ ব্যতীত আমার একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইরূপে যত চক্ষু খুলিতে থাকে ততই দেখিতে পায়, কি সর্বনাশ ! ভাবসমূহ যে আমাকে আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। পূর্বে আমি ভাবের প্রতিপালক—রাজা ছিলাম। এখন দেখিতেছি ভাবসমূহই আমার রাজা। উহারা কোলানামক রাজধানীতে— চিত্রক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, সমূলে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হায় ! যে প্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি সর্বস্ব পণ করিয়াছিলাম, প্রাণপাত করিয়াও যাহাদের তৃপ্তিসাধনে রত থাকিতাম, যে জাগতিক ভাবরাশিকে পূর্ণত্বে উপনীত করিবার জন্য জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, এখন তাহারাই আমার পরিচালক।

প্রভাত অবধি সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে পুনঃ প্রভাত পর্যন্ত এইরূপ আমরা ভাবরাশি দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক, স্ত্রী-পুত্রাদি সাংসারিক, ধন, যশঃ প্রভৃতি জাগতিক এবং দয়া, ক্ষমা, সন্ধ্যা-বন্দনা, উপাসনা প্রভৃতি পারমার্থিক ভাবরাশি প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বিচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থাটি যাহার চক্ষুতে পড়ে, যে এই চিরপরাধীনতা প্রত্যক্ষ করে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? এই ভাবচাঞ্চল্য বা প্রজাবর্গের বিরোধিতা গুরুকৃপায় যাহার হৃদয়ে বিষজ্বালা বিস্তার করে, সেই প্রকৃত বিষাদযোগী। গীতার বিষাদযোগ দেবী মাহাত্ম্যে চরমে উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে ইহা পরিব্যক্ত হইবে।

জীব ! একবার চাহিয়া দেখ—তোমার চারিদিকে দশদিকে, অন্তরে বাহিরে, একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর। তোমার সংসার সংস্কারশ্রেণী তোমায় কিভাবে পরিচালিত করিতেছে ! কিভাবে তোমাকে দিবারাত্র গর্দভের মতন ভার বহন করাইতেছে ! তোমারই যত্নে, তোমারই আদরে প্রতিপালিত—পরিপুষ্ট, তোমারই স্বেচ্ছাকৃত অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা, তোমার আনন্দলীলার সহচর স্ত্রী, পুত্রাদি, তোমায় কিরূপভাবে আয়ত্ত—শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তোমায় উঠিতে বলিলে উঠিতে হয়, বসিতে বলিলে বসিতে হয়, মরিতে বলিলে মরিতে হয়, এমনি তুমি ভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছ। এই অবস্থাটি বেশ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। হও না কেন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, হও না কেন পার্থিব সর্ববিধ সুখে সুখী, তুমি একবার আপনার চিত্তক্ষেত্রের—স্বীয় রাজধানীর দুরবস্থা দেখ—একটির পর একটি ভাব আসিয়া বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার শান্তির উপকূলকে নিয়ত আহত করিতেছে। বড় আদরে—বড় সোহাগে প্রিয়তম শিশু পুত্রকে বুকে ধরিয়া চুম্বন দিতেছ, স্নেহের অমিয়ধারায় আত্মহারা হইতেছ ; কিন্তু ঐ এক মুহূর্তেই, আবার অন্য ভাব আসিয়া তোমার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, তোমাকে সে আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল। আহার করিতে বসিলে—ভাল, তাই কর ! জগতের সর্বপ্রধান ভোগ—আহার। মা তোমায় খাইবার সুযোগ দিয়াছেন, নানাবিধ ভোজ্যসম্ভার তোমার সম্মুখে, উদরেও তীব্র ক্ষুধা, বেশ স্থির হইয়া আহারজনিত তৃপ্তি ভোগ কর ; কিন্তু হায় ! তাহাও ত' পার না দুইবার মুখে না দিতে, কত চিন্তা, কত ব্যস্ততা, কত উৎকণ্ঠা আসিয়া তোমার ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তখন আর আহার নাই, তৃপ্তি নাই, একটা নিত্য অভ্যস্ত কাজ করিতে হয়, তাই কর। এইরূপ সর্বত্র—একটি পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটি আসিয়া উপস্থিত। ভাবরাশি প্রতিক্ষণে আমাদের কানে ধরিয়া ওঠ্ বস্ করাইতেছে, কান ছিঁড়িয়া গেল—ক্ষতি নাই, তাহাদের আদেশ পালন করিতেই হইবে। না পারি উঠিতে, না পারি বসিতে। উঠিতে উঠিতেই বসিবার হুকুম, আবার বসিবার উদ্যোগ করিতেই উঠিবার হুকুম ; ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে ?

আচ্ছা, দেখা যাউক—যাহারা এইরূপ করিয়া আমার স্থিরত্বের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, যাহারা আমার নিত্য শান্তিলাভের পথে অন্তরায়, তাহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ? অহো ! এ যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ ! আমিই ত' রাজা, আমিই ত' প্রতিপালক। আর আজ তাহারাই আমার শত্রবো ভূপাঃ। কেবল শত্রু ও স্বাধীন হইয়াই নিরস্ত হয় নাই, আমার রাজধানী কোলা-নগরী অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্রটি পর্যন্ত বিধ্বস্ত করিতেছে। হায় ! সুরথের কি দুর্দশা ! সাধক ! যদি সুরথ হইয়া থাক, তবে তুমিও

এইরূপ প্রজাবৃন্দের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতেছ, সন্দেহ নাই।

তস্য তৈরভবদ্‌যুদ্ধমতি প্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥৫॥

অনুবাদ। তখন অতিপ্রবল দণ্ডধারী রাজা সুরথের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। সুরথ অপেক্ষা হীনবল হইলেও কোলাবিধ্বংসিগণ কর্তৃক এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। জীব যখন ভাবরাশিদ্বারা স্বকীয় চরণ পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত দেখিতে পায়, তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিব, এই চিন্তা প্রবলভাবে আসিতে থাকে। তখন সে একবার উভয় পক্ষের বলাবল নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়। প্রথমতঃ আত্মবল পর্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে অতি প্রবল দণ্ডধারী বলিয়া মনে হয়; কারণ প্রজাবৃন্দ বা ভাবরাশি ত' আমার ইচ্ছায় সঞ্জাত, আমারই যত্নে পরিপুষ্ট, আমারই বলে বলীয়ান! আমি যদি ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, আমি যদি ইহাদিগকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করি অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্র হইতে ভাবরাশিকে বহিষ্কৃত করিয়া দিই, অথবা বৃত্তিসমূহের নিরোধপূর্বক, ভাববিকাশের সুযোগ না দিয়া একেবারে উন্মূলিত করিয়া ফেলি; তাহা হইলে অল্পায়াসেই ত' আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তারপর, বিপক্ষের বল পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া দেখিতে পায় ভাবপক্ষ আমা-অপেক্ষা ন্যূন —হীনবল; কারণ আমারই সত্তায় সত্তাবান, উহারা আমাকে যেরূপ পরিচালিত করে, আমি ইচ্ছা করিয়াই ত' সেইরূপ আচরণ করি। আমি যদি উহাদিগকে সে সুযোগ না দেই, তবে আর ভাবপক্ষের প্রবলতা কোথায় থাকে? এইরূপে উভয় পক্ষের বল পর্যালোচনা করিয়া যখন আত্মপক্ষ প্রবল এবং বিরুদ্ধপক্ষ দুর্বল দেখিতে পায়, তখন বিপুল আয়োজনে সমর-উদ্যম হইতে থাকে। নানারূপ যোগ, হঠক্রিয়া, জ্যোতির্ধারণা, নিরামিষাহার, ব্রহ্মচর্য, সংসারত্যাগ, সন্ন্যাস-অবলম্বন ইত্যাদি কত কি আয়োজন উদ্যোগে ভববৃন্দকে নির্মূল করিতে উদ্যত হয়; সকলই প্রায় বৃথা হয়। হায়! মুগ্ধ জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবরাশি মহামায়ারই অনুভাবমাত্র; মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এই ভীষণ ভাব-সমরে বিজয়ী হওয়া যায় না।

আমিও একদিন এইরূপ আয়োজনে ভাব-সমরে বিজয়ী হইয়া, আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কত চেষ্টা, কত উদ্যম, কত কি; কিন্তু সকলই নিষ্ফলপ্রায়। একবার মনে হয়—এইবার আমি ভাব-সমরে জয়ী হইলাম। আহা! পরক্ষণেই দেখিতে পাই—ভাববৃন্দকর্তৃক আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত। এই ভাব-চাঞ্চল্য যে কি ভীষণ কষ্ট-শত্রু, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, মাত্র তিনি বুঝিতে পারেন। তাহা অন্যকে ভাষায় ঠিক বুঝান যায় না।

স্বকীয়জীবনের একটি ঘটনা সংক্ষেপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। অধ্যয়ন-কাণ্ড শেষ করিয়া, অর্থোপার্জন আরম্ভ করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। একদিন গভীর রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখি—নবোঢ়া বধূ নিদ্রিতা। তখনই স্বকীয় বন্ধনদশা-বিষয়ক একটু গভীর চিন্তা আসিল। জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম, কি তন্দ্রাগ্রস্ত হইলাম, কি জাগিয়া ছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম —সম্মুখে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মাতৃ-মূর্তি, ঈষৎ হাস্যবিকশিতমুখে দণ্ডায়মানা। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন—'দেখেছিস্ তোকে কেমন করে বেঁধে ফেলেছি।' সে হাসি ও কণ্ঠস্বর স্নেহকরুণাব্যঞ্জক, অথচ বিদ্রূপাত্মক। আমি দেখিলাম সত্য সত্যই আমি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, সে বন্ধনের অবস্থা কি ভীষণ! পদদ্বয়, জানুদ্বয়, কটিদেশ, উদর-বক্ষ-কণ্ঠ-হস্তদ্বয়-বাহুদ্বয় এবং মস্তক, প্রত্যেক অবয়ক পৃথক পৃথক ভাবে দৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। শুধু তাহা নহে—সেই রজ্জুসমূহের প্রত্যেক অপরপ্রান্ত দৃঢ় কীলকে আবদ্ধ হইয়া গভীরভাবে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত। আমার একটুও নড়িবার উপায় নাই, কোনও অঙ্গ বিন্দুমাত্র সঞ্চালিত করিবার শক্তি নাই। এমনই ভাবে আমি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার এরূপ অবস্থায়ও কিন্তু কোনরূপ ভীতি বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই বরং একটু একটু হাসিতেছিলাম; কারণ, সম্মুখে করুণাময়ী দেবীমূর্তি-দর্শনে এমন একটা আনন্দ হইয়াছিল যে, বন্ধন-যন্ত্রণাই বোধগম্য হইতেছিল না। আবার সেই

কণ্ঠস্বর, সেই স্নেহ করুণা বিদ্রূপমাখা কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—'দেখেছিস্ তোকে কেমন করে বেঁধে ফেলেছি।' আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'হাঁ দেখেছি ; কিন্তু এ আর বেশী বন্ধন কি ! ইচ্ছা করিলে এখনই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি।' সত্যই যেন আমার মনে হইতেছিল —আমি ইচ্ছা করিয়া বন্ধন লইয়াছি, একবার বল-প্রয়োগ করিলেই ইহা ছিন্ন করিতে পারি। তিনি হাসিয়া বলিলেন—'ইঃ এত ক্ষমতা ! ছেঁড়ত' দেখি ! আমি যদি ছিঁড়িয়া না দিই, তবে কিছুতেই পারবি না।' 'আমি আবার বলিলাম— 'এ আর বেশী কথা কি ! এই দেখ —এখনই সব বাঁধন ছিঁড়িতেছি।' এই বলিয়া যেই মাত্র বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইল, অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম ; বড় ভয় হইল। কাতরতাব্যঞ্জক গোঁ গোঁ শব্দ এত অধিক হইতে লাগিল যে, পার্শ্বস্থিত গৃহে নিদ্রিতা মাতাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন। তখন আর কিছুই নাই, দেবীমূর্তি হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইলেন, বন্ধনের চিহ্নমাত্র নাই ; কিন্তু ভয়ে ও যাতনায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল ! অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হইলাম।

এইরূপই হয়—আমরা প্রথমে আত্মবলের প্রাধান্য দেখিয়া অহং-কর্তৃত্বের গর্বে স্ফীত হইয়া ভাবরাশির সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হই ; কিন্তু তখনও বুঝি না যে, ভাবিনী মা আমার স্বয়ং অসিহস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ না হইলে, এই ভাবাসুরনিকর বিধ্বস্ত হয় না। যতদিন রোগ, শোক, দারিদ্র্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন, বিষয়-চাঞ্চল্য, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভাবরাশির দিকে সাধকের দৃষ্টি থাকে, সাধক যতদিন সমুদ্র না দেখিয়া তরঙ্গশ্রেণীমাত্র নিরীক্ষণ করে, যতদিন ভাবিনীকে না দেখিয়া ভাবমাত্র দর্শন করে, ততদিন মা আমার ইচ্ছা করিয়াই এই ভাববিদ্রোহ উপস্থিত করাইয়া থাকেন। ভাবরাজ্যে এরূপ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত না করিলে যে জীব চিরদিন ক্ষুদ্রত্বে—জগতের ধূলিতে মুগ্ধ থাকিত, আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্মমহত্ত্ব অমৃতত্ব বিস্মৃত হইত। মহামায়া মা পুত্রকে কখনই অপূর্ণ থাকিতে দিবেন না, তিনি শুধু অপেক্ষায় আছেন— কিরূপে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলির মধ্য দিয়া—এই পরিচ্ছিন্ন ভাবাধীনতার মধ্য দিয়া তাঁহার মহতী আকর্ষণী শক্তি প্রবাহিত করিবেন। কি করিলে আমি সত্য সত্যই সরলপ্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিব। কিরূপে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে—মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে স্থান দিবেন তাই, ভাবরূপিণী মা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—আমার হস্ত-পদ-অজস্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহা প্রজাবিদ্রোহ নহে—মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছার পূর্ববর্তী ক্রূর আয়োজনমাত্র।

মা সুরথকে—আমাদিগকে বিশেষভাবে ধরিয়া ধরিয়া বুঝাইয়া দেন,—আমরা কিরূপ দুশ্ছেদ্য নিগড়ে চির আবদ্ধ রহিয়াছি। নিজেদের অস্বতন্ত্রতার যে পরিমাণে বোধ হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য—স্বাধীন হইবার জন্য লালায়িত হইব। এ জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব। এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু কেহ নাই, যাহার নিকট সবটা প্রাণ খুলিয়া দিয়া স্বাধীন ব্যবহারে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু যে কেহ হউক না কেন, তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া, আমাদিগকে অনেকাংশে তাহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে হয় ! আমাদের প্রাণের একদিক সঙ্কুচিত রাখিয়া দিতে হয়। দেখ—স্ত্রীর সহিত মাতার মতন ব্যবহার চলে না, পিতার সহিত বন্ধুর মতন ব্যবহার চলে না, বন্ধুর সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার চলে না—এইরূপ জগতের সর্বত্র। এমন কেহ নাই—যাহার সহিত আমি আমার সর্বভাবের আদান প্রদান করিতে পারি ; কিন্তু যেখানে আমি স্বাধীন, যেখানে আমার প্রাণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না, সেই একমাত্রস্থান—মা আমার। আমার পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র। সে যে আমার পিতা, সে যে আমার মাতা, সে যে আমার সখা, সে যে আমার বন্ধু, সে যে আমার গুরু, সে যে আমার প্রভু, সে যে আমার পুত্র, সে যে আমার কন্যা, সে যে আমার ভার্যা, সে যে আমার পরিচারিকা, সে যে আমার সখী, সে যে আমার আত্মীয়, সে যে আমার প্রাণ, সে যে আমার আত্মা, আমার সর্বস্ব সে, আমার সর্ব সে। প্রাণের সমস্ত কবাট খুলিয়া অসঙ্কোচে কথা বলিবার, অসঙ্কোচ ব্যবহার করিবার একমাত্র স্থান—মহামায়া মা। আমি যেমনটি করিলে তৃপ্তিলাভ করি, মা আমার তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে আমার সহিত ব্যবহার করেন।

তাঁহার নিজের যে, কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই। তিনি ভাবাতীতা। শুধু পুত্রস্নেহে আত্মহারা হইয়া, ভাবে ভাবে আমার পরিতৃপ্তি-সাধনে নিয়ত নিরতা থাকিয়া, ভাবাধীনতার হস্ত হইতে আমাকে চিরমুক্ত করিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে এই ভাব-বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছেন।

মা কেন আমায় মুক্ত করিবেন জান কি ? মুক্ত না হইলে যে মা আমায় বুক ভরিয়া ভালবাসিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে যে প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে আমিও যে অত স্নেহ ভোগ করিবার স্থান পাই না। আমার এতটুকু বুক ; কি করিয়া সে উদার অসীম স্নেহ ভালবাসা ধরিয়া রাখিব। যে ভালবাসার অফুরন্ত প্রবাহের এক বিন্দু ধরিতে গিয়া, অনন্তদেব সহস্র শীর্ষ হইয়াছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া সূর্যদেব সহস্রকিরণে প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া **'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্'** রূপ স্নেহধারা ঢালিয়া জীববৃন্দকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগণন জীববৃন্দের প্রাণে ভালবাসা নামে একটা অমর-সম্বেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে ভালবাসার একবিন্দুর সহস্রাংশ পাইয়া আমাদের গর্ভধারিণী মাতা পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া পড়েন, যিনি সেই ভালবাসার কেন্দ্র, যিনি এই সমষ্টি-ভালবাসার একমাত্র আধার, সেই মহামায়া মায়ের ভালবাসা ভোগ করিব, সে আধার কই ! সে পাত্র কই ! ওরে ! আমার বুক যে এতটুকু ! এক বিন্দুতেই ভরিয়া যায় ; সে অনন্ত প্রেমসিন্ধু কিরূপে ধরিয়া রাখিব ! তাই, মা আমায় মুক্ত করিবেন। আমায় বিশাল অনন্ত করিয়া লইবেন। আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমৃতের স্নেহধারা অনন্তকাল পান করাইবেন বলিয়াই এই ভাব-বিদ্রোহ—এই কঠোর আয়োজন।

জানি মা—এই ভাববিদ্রোহরূপ মর্মন্তুদ অশান্তির অন্তরালে অনন্ত শান্তি লুক্কায়িত, জানি মা—এমন করিয়া বন্ধন-যাতনা অনুভব করাইয়া মুক্তির দিকে টানিয়া লইতেছ ; জানি মা—বন্ধনজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ না পাইলে, মুক্তিরূপ সুবর্ণ-কমল প্রস্ফুটিত হয় না ; জানি মা—আমারই মহামঙ্গলের জন্য তুমি আমার প্রজাবৃন্দকে আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া অসীম বীর্যবান করিয়াছ। সবই জানি মা—তবু আর মুহূর্ত বিলম্বও যে যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। কবে এ দেহেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের আধিপত্য হইতে চিরমুক্ত হইয়া, চিরশান্তিময় অনন্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে—অপার স্নেহসমুদ্রে চিরতরে নিমগ্ন হইব ? কবে—মা কবে ? সে দিনের কত দেরী ! কালাতীতা মা আমার ! কবে এ কালপ্রবাহের অগণিত তরঙ্গভঙ্গ হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইয়া মহামুক্তিক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে ?

যাহা হউক, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ! যখন ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত প্রজাগণ সুরথকে রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন যুদ্ধ অনিবার্য। সুরথ একবার শেষ চেষ্টা দেখিল। ভাবরাশিকে চিরতরে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু সকলই নিষ্ফল ! ভাববৃন্দ জয়ী হইল। জীব ভাব-সমরে পরাজিত হইল। ভাবসমূহকে হীনবল মনে করিয়া জীব সমারঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া বৃত্তিনিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু **'ন্যূনৈরপি স তৈর্জিতঃ'**। কেন এ পরাজয়-সংঘটন হইল—প্রবল-পরাক্রান্ত সুরথের সহিত সমরে তদধীনস্থ দুর্বল ক্ষুদ্র ভাববৃন্দ কিরূপে জয়লাভ করিল, শ্লোকে **'কোলাবিধ্বংসিভিঃ'** এই হেতুগর্ভ বিশেষণ দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভাববৃন্দ যে পূর্বেই কোলানগরী—সুরথের রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। যখন একটির পর একটি আসিয়া বহু জন্ম-জন্মান্তর হইতে ভাবাঙ্কুরসমূহ চিত্তক্ষেত্রে উদ্গত হইতেছিল, তখন ত' তাহাদিগকে বিনাশ করা হয় নাই ! তখন বরং সলিল-সিঞ্চনে সে ক্ষুদ্র অঙ্কুরগুলিকে অপত্যনির্বিশেষে পরিপোষণ করা হইয়াছে ! এখন তাহারা পরিপুষ্ট, বলবান ও বহুসংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে, চিত্তক্ষেত্রে বাস্তু নির্মাণ করিয়াছে, আর কি তাহাদিগকে নির্জিত করা সম্ভব ? সুতরাং সুরথ পরাজিত হইল।

———○———

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৬॥

অনুবাদ। অনন্তর (ভাবসমরে পরাজিত হইয়া) সুরথ স্বপুরে আগমনপূর্বক মাত্র নিজদেশের অধিপতি হইলেন ; কিন্তু তিনি মহা সৌভাগ্যবান ; সুতরাং তখনও পূর্বোক্ত প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্বে বলিয়াছি—ক্ষিতিমণ্ডল শব্দে

মূলাধারচক্র বুঝা যায়। জীব এই মূলাধারচক্রে চিত্ত স্থির করিতে গিয়া শারীরিক চঞ্চলতার হাত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতিলাভ করে বটে, কিন্তু ভাবচাঞ্চল্য বিদূরিত হয় না। তখন ক্রমে স্বাধিষ্ঠানে ও মণিপুরে চিত্ত স্থির রাখিতে যত্নবান হয়; কিন্তু এখানেও ভাবের সহিত বিরোধিতায় পরাজিত হইতে হয়, তখন অগত্যা স্বপুরে—হৃদয়ে—দহরপুণ্ডরীকে আশ্রয় লইতে হয়। হৃদয়ই জীবাত্মার বাসস্থান। বেদান্ত—হৃদয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'**হৃদি অয়ং ইতি হৃদয়**'! হৃদয়ই আত্মার বিশিষ্ট অনুভূতি-স্থান। এই হৃদয়ই সুরথের স্বপুর। পূর্বে তিনি এখান হইতে রাজ্য-বিস্তার করিয়া, ক্রমে মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান অতিক্রম-পূর্বক ক্ষিতিমণ্ডল—মূলাধার পর্যন্ত গিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ জীবের মন এই নিম্নস্থ তিন কেন্দ্রেই বিচরণ করে, এই স্থানেই জীবভাবের পূর্ণ বিকাশতার পর মহামায়ার কৃপায় ভাববিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ভাবসমরে পরাজিত হইয়া, জীব পুনরায় স্বস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; ক্রমে সর্বত্র পরাজিত হয়; তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বপুরে আশ্রয় লইয়া থাকে।

বহু সুকৃতির ফলে—মায়ের অসীম কৃপায় জীব এই স্বপুরের সন্ধান পায়। সাধারণতঃ জীব এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে যে, 'স্ব' বলিয়া জিনিষটাই ভুলিয়া যায়। জগতের মোহ—বহুত্বের আনন্দ-ক্রীড়া জীবকে স্বপুর হইতে বিচ্যুত করিয়া বহু দূরে নিয়া যায়। সংসার-সংস্কারশ্রেণী দস্যুরূপে—বিদ্রোহীরূপে যখন সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়—যখন আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্মস্মৃতি পর্যন্ত বিস্মৃত হয়, তখন জীব আবার ধীরে ধীরে সেই লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনের জন্য যত্নবান হয়। সেই সময়ে একবার ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বপুরে আশ্রয় লয়—'আমি কে' তাহা স্মরণ করিবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সংসারক্ষেত্রেও দেখিতে পাই—পুনঃপুনঃ পুরুষকারের নিষ্ফলতা দেখিয়া, পুনঃপুনঃ আশাভঙ্গ ও অচিন্তিত ঘটনার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া জীব ভগবৎমুখী হয়—ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হওয়া ও আপনাকে অন্বেষণ করা একই কথা। আত্ম-স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইলেই জীব স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়—স্বকীয় মহান স্বরূপটি পুনরায় লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সর্ববিধ ভাবচাঞ্চল্যের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া, জীব যখন স্বস্থানে—অনাহত-কেন্দ্রে আত্মসংস্থ হইতে উদ্যত হয়, তখনও দেখিতে পায়—প্রবল শত্রুগণ এখানে আসিয়াও আক্রমণ করিতেছে। দুস্ত্যজ্য সংসারসংস্কারশ্রেণীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এতদূর আসিয়াও যখন আত্মসংস্থ হইতে পারে না, তখন জীব হতাশের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করে। হায়! এইরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া কত সাধক স্খলিতচরণ হইয়া পড়ে, কত সাধক অবসাদের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কত সাধক এইখানে আসিয়াই 'ভগবৎ-লাভ' অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করে।

অধিকাংশ সাধক স্বকীয় হৃদয়পদ্মে ইষ্টমূর্তিকে ধ্যানের সাহায্যে বসাইতে গিয়া, চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ অকৃতকার্য হইয়া পড়েন। যাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহারাও ক্ষণকালের মধ্যে বড় সাধের, বড় আদরের শ্রীমূর্তিটি হারাইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। যাঁহারা বিশিষ্ট মূর্তির ধাঁধা অতিক্রম করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইবার প্রয়াসী, তাঁহারাও নির্মল প্রাণজুড়ান বুদ্ধিজ্যোতির পরপারে অবস্থিত সেই মহান চৈতন্যসমুদ্রে অবগাহন করিতে গিয়া মুহূর্তমধ্যে বিষয়াকারে আকারিত হইয়া পড়েন। যাঁহারা সে চিৎসমুদ্রে অবগাহন করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে হয়। এইরূপ সর্বত্র ভাবরাশি বা প্রজাবৃন্দের অত্যাচারকাহিনী সাধকগণের মুখে বিঘোষিত হয়। এই অত্যাচার, এই ভাবচাঞ্চল্য নিবারণের জন্য আবার কতরূপ আয়োজন উদ্যোগের বিধান আছে। বৃত্তি-নিরোধ, হঠযোগ, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি কত কি উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন রুচির সাধকগণ এই পর্যন্ত আসিয়া—স্বপুরে আশ্রয় নিয়াও যখন সংস্কার-শ্রেণী দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকেন, তখন স্ব স্ব রুচি অনুসারে এক একটি কৌশল অবলম্বন করিয়া, বাধানিবারণে উদ্যত হয়েন। হয়ত সেই কৌশলটি শিক্ষা করিতে—ভাববৃন্দের অত্যাচার প্রতিহত করিতে—দুই তিনটি জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায়। উদ্যানের বেড়া দিতেই জীবন অতিবাহিত হইলে কুসুম-সুবাস কবে গ্রহণ করিবে?

বাধা নিবারণ করিতে গিয়া যদি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়, তবে আর মাতৃ-লাভ কবে করিবে।

কিন্তু—তুমি মাতৃ-অন্বেষি-শিশু! তুমি অমৃতপিপাসু জীব! তুমি ওসকল বাধাবিঘ্নের দিকে কেন দৃক্‌পাত করিবে? তীর্থযাত্রী যখন সুদূর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া হিরণ্ময় তীর্থমন্দিরের উচ্চ পতাকা দূর হইতে দেখিতে পায়, তখন কি আর পথশ্রমের দিকে কিংবা পদে কণ্টকবেধজনিত যাতনার দিকে লক্ষ্য করে? যদি লক্ষ্য পড়ে এবং উহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার তীর্থদর্শনে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী! যাঁহাদের ঐরূপ অত্যাচার আক্রমণ আসিতে থাকে, তাঁহারা যাহাতে হতাশ হইয়া না পড়েন, অথবা বাধা নিবারণের উদ্দেশ্যে সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত না করেন, তজ্জন্য মহর্ষি উচ্চকণ্ঠে আশার মোহনবাণী শুনাইতেছেন। ঐ শোন, **'আক্রান্তঃ স মহাভাগঃ'** —যেহেতু তিনি (সুরথ) মহাসৌভাগ্যবান, সেইজন্যই স্বপুরেও শত্রুর আক্রমণ। এইরূপ ভাবে শত্রুকর্তৃক স্বপুরে আক্রান্ত জীব অতিশয় ভাগ্যবান। সাধকমাত্রকেই এইরূপ ভাবরাশি দ্বারা শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হইতেই হইবে এবং এই আক্রমণই সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দেয়। কই, ঋষি ত' মহারাজ সুরথকে দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে কিন্তু দেখা যায়—সুরথ অতি ভাগ্যহীন; কারণ, রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর অত্যাচারে উপদ্রুত; স্বপুরেও সুস্থ হইয়া থাকিবার উপায় নাই, সেখানেও অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালিত প্রজাগণের অযথা আক্রমণ; ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু তথাপি সুরথকে 'মহাভাগ' বলা হইয়াছে!

সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে। একটু ভগবৎমুখী হইলে প্রাণে যথার্থ মাতৃ-অন্বেষণের ভাব একটু ফুটিয়া উঠিলে, তাহার নানা দিক্ হইতে নানারূপ উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনারাশি আসিয়া সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। ঐ সকল চঞ্চলতা অতিক্রম করিয়া সাধক যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটু একটু করিয়া ভগবৎরসের আস্বাদ পাইতে থাকে তখন আরও বিষম সমস্যা— একদিকে জগদ্‌ভাবগুলি আর ভাল লাগে না, কে যেন জগদ্‌ভোগের উপর তিক্ত ঔষধ মাখাইয়া দিয়াছে; সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় জগতের ভোগগুলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়; অথচ অন্যদিকে ভগবৎমুখী গতিও বিশেষ খরতর মনে হয় না। একদিকে যেমন মাকে পায় না অন্যদিকে তেমন সংসারও ভাল লাগে না। এই উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধকের মর্মস্থান যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপনীত নিরাশ-হৃদয় সন্তানের প্রাণে পূর্ণ সাহস ও বিপুল আশা-সঞ্চারের জন্যই মন্ত্রে 'মহাভাগ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহারা মাতৃ-মুখী হইয়াছ, যাহার মাতৃ-লাভকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা এইরূপ সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া হতাশ হইও না। তুমি মহাসৌভাগ্যবান বলিয়াই মা তোমার প্রতিকূল বেদনরূপে ভাবরাশির আক্রমণ উপস্থিত করিয়াছেন। আর একটি কথা—ঐ আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য মাতৃ-চরণ সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, নিজের আধ্যাত্মিক গতি শ্লথ করিও না। বাধা বিঘ্ন অত্যাচার উৎপীড়ন ওসকল আসিবেই; যে যাহার কার্য করিবে। চির বিদ্রোহী প্রজা বিদ্রোহাচরণ করিবেই; সেজন্য তুমি মাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। তুমি শাণিত অসিহস্তে বাধা-নিবারণে উদ্যত হইয়া মাকে ভুলিও না। উদ্দেশ্য মাতৃ-লাভ, বিঘ্ননিবারণ উপায় মাত্র। তুমি উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। কোনরূপ হঠক্রিয়ার সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিনিরোধের চেষ্টায় জীবনের যে অংশটা অতিবাহিত করিবে, সেই সময়টা মাতৃ-উদ্দেশ্যে কাতর প্রাণে কাঁদিতে থাক। অত্যাচারে বিব্রত হইয়া তুমি ইষ্টস্মরণ হইতে—মাতৃ-চিন্তা হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া, মাকে জানাও। আমাদের সকল আবেদন, সকল দুঃখ জানাইবার এমন বিশ্বস্ত স্থান আর কোথায় আছে! আপনাকে অশক্ত, দুর্বল, উৎপীড়িত জানিয়া নিত্য-আশ্রয় মাতৃ-চরণে শরণ লও। প্রত্যেক বিঘ্নকে মায়ের মঙ্গলময় আহ্বান বলিয়া গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাবকে ছদ্মবেশিনী মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। বিভিন্ন মনোভাবগুলিকে মহামায়ারই অনুভব বলিয়া আদর কর। উহার চরণে মা বলিয়া অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। মায়ের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার ভাবময়ী মূর্তি সংহরণ করিয়া মহতী মূর্তিতে প্রকটিত

হইবার জন্য প্রার্থনা কর। দেখিবে, অচিরকাল মধ্যে তোমার ভাববিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছে। সাধক! হাতের হাওয়া দিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিশিখাকে নির্বাপিত করিতে যাইও না। হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুন নিভিবে না; বৃত্তিনিরোধে সমস্ত অধ্যবসায় নিযুক্ত করিলে বৃত্তিনিরোধ হইতে পারে; কিন্তু মাতৃ-লাভ হইবে না; কারণ, তুমি মাকে চাও না, চাও—চিত্তচাঞ্চল্য দূর করা। যাহা চাইবে, তাহাই পাইবে। মনের চঞ্চলতা-নিবৃত্তি জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিদ্রিত অবস্থায় ত' উহা অনায়াস লভ্য হয়; কিন্তু মাতৃ-লাভ হয় কি? চিত্তকে চিৎসমুদ্র দেখাও, ভাববৃন্দকে ভাবিনীমূর্তি দেখাও, মনকে মা দেখাও, উহা আপনি শান্ত হইবে, তুমি ধন্য হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি জীব ভগবৎমুখী হইলে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। কেন হয়? এরূপ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসিয়া থাকে। কেহ বলেন—মায়ের পরীক্ষা। আমরা কতটা প্রাণ দিয়া মাকে চাই, তাহা দেখাইবার জন্য মা আমাদিগকে নানারূপ উৎপীড়িত করেন। কেহ বলেন —কর্মফল-ভোগ। আমরা কিন্তু বুঝিয়াছি জীব মাতৃ-মুখী হইলেই, তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কারগুলি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। যে সকল সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য বহুজন্ম স্বীকার করিতে হইত, মা আমার দয়া করিয়া সেই সংস্কারগুলি দুই এক জন্মেই ক্ষয় করিয়া দিয়া থাকেন। তাই, অনেক জন্ম-বিনাশ্য কর্মগুলি একেবারে ফলোন্মুখ হইয়া পড়ে। লক্ষ জীবনের কর্মফল এক জীবনে ভোগ করিতে গেলে, যুগপৎ বহু বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতেই হইবে। মাকে ডাকিলে—মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিলে জন্মস্রোত হ্রাস অথবা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই সাধকের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ।

———○———

অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষোবলং চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৭॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই স্বপুরেও বলশালী দুষ্ট ও অসৎ প্রকৃতি মন্ত্রিবর্গ সেই হৃতরাজ্য দুর্বল সুরথের কোষ এবং বল অপহরণ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। জীব যখন ভাব-সমরে সম্যক্ নির্জিত হইয়া স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন সমস্ত জগৎ-সংস্কারশ্রেণীকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, নিত্যশান্তিময় সর্বগুহাশয় গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ পরমপদের সন্ধানে হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে; তখন সেখানেও দেখিতে পায়—অত্যাচারের বিরাম নাই। এখানেও প্রবল বিরোধি অমাত্যবর্গ। এই অমাত্যবর্গ কাহারা? শাস্ত্রীয় আদেশসমূহ। যে বিধিনিষেধ বাক্য-সমূহের অনুপালন করিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীব হৃদয়গুহার সন্ধান পায়; ঐ কর্মকাণ্ড—ঐ আনুষ্ঠানিক ধর্মই জীবের আত্মলাভের প্রবল এবং চরম অন্তরায়। কত জন্ম ধরিয়া, জপ পূজা ব্রত উপবাসাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট আদেশসমূহের অনুপালন করিবার ফলে, ভাববিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কত প্রাণপাত তপস্যা, কত কঠোর যোগাভ্যাস প্রভৃতির ফলে আত্মরূপিণী মায়ের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠে, সাধক স্বপুরের সন্ধান পায়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যে শাস্ত্রীয় আদেশসমূহ ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে অনুকূল ধীমান মন্ত্রীর ন্যায় প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতা হয়; যাহারা অধর্মগতি হইতে রক্ষা করিয়া জীবকে শান্তির সুনির্মল সলিলে অভিষিক্ত করে; যাহাদের সহায়তায় সুরথ সুবিশাল ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ্র সত্ত্বগুণরূপ নির্মল যশলাভ করে; ভাব-বিদ্রোহে নির্জিত হইয়া, স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় সেই সুরথই দেখিতে পায় —তাহারাই প্রতিকূলাচারী প্রবল শত্রু। পূর্বে যাহারা সৎ-হিতাচারী ছিল, এখন স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া বুঝিতে পারে—উহারাও দুষ্ট এবং দুরাত্মা।

বাস্তবিক পক্ষে, জীবের অধর্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্মপথে আনয়ন পক্ষে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক-উদ্ধারের ন্যায় বৈধকর্মাদিই প্রধান সহায়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করিতে করিতেই মানুষের প্রাণে মাতৃ-লাভের —আত্মলাভের প্রবল বাসনা জাগে। মা যে আমার ধর্মের অতীত, অধর্মের অতীত, কর্মের অতীত, অনির্বচনীয়, পরমানন্দময় অদ্বিতীয় বস্তু; ইহা বুঝিতে পারে জীব — বহুদিন শাস্ত্রীয় আদেশগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে তবে। যদি কখনও কাহাকে দেখিতে পাও—সে বৈধকর্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও যথার্থ মাতৃ-অন্বেষী হইয়াছে, তবে বুঝিবে—পূর্ব পূর্ব জন্মে তাহার কর্মকাণ্ডাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। আগে

ধর্মরাজ্য। পরে আত্মরাজ্য। আগে ধর্ম পরে মা। তাই, ধর্মকে মুক্তির সোপান বলা হয়। জীব যে অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও আনন্দময়! সে কতদিন পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ ক্ষণিক আনন্দদায়ক ধর্মের গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান করিবে? জীব যে নিত্যমুক্ত! সে কতদিন ধর্মের সুবর্ণ শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া অধীন থাকিবে? একদিন তাহাকে শাস্ত্রগণ্ডীর বাহিরে—উন্মুক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মহাপ্রাঙ্গণে—মধুময় মাতৃ-অঙ্কে উপস্থিত হইতেই হইবে। জীব যে '**স্ব**' সুতরাং স্বৈর বিচরণ ভিন্ন জীবের স্বস্তিলাভ হয় না। তাই '**স্ব**'কে লাভ করিবার জন্য একবার সর্বস্বান্ত হইয়া স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই। মাকে—আপনাকে পাইবার জন্য একবার হৃদয়ানুভূত চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবেই। ভগবদ্গীতার সেই মহাবাক্য—'**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**' এবং '**তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত**'—এই শান্তিময় অভয় বাণী জীবের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবেই। কিন্তু স্বপুরে প্রবেশ করিতে গিয়া জীব দেখিতে পায়, অমাত্যবর্গ—বৈধকর্মজনিত সংস্কারসমূহ, অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার অতি বলী। অধর্মসংস্কার দূর করা তত কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু শাস্ত্রবিধির সংস্কারগুলি দূর করিতে, জীবের সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মদ্যপানকারীর মদ্যপানজনিত সংস্কার যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায়, একজন ত্রিসন্ধ্যান্বিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কার দূরীভূত করা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। এইরূপ অধর্মসংস্কার অপেক্ষা ধর্মসংস্কার প্রবল ও কষ্টশক্র; ইহাদের গতি অনেক উচ্চে। কিন্তু এমন একটি দিন আসে, মাতৃ-করুণার এমন একটা প্রবাহ আসে যে, ঐ সকল সংস্কার প্রবল প্লাবনে তৃণরাশির ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। সেইদিন—জীবজীবনের শুভদিন, সেই দিনই রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলাইয়া সাধক বলে—'**ধর্মাধর্ম দুইটা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে রাখ্‌বি, যদি না মানে বারণ (ওরে মন) জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি**।'

যাহা হউক মন্ত্রে—**বলিভিঃ, দুষ্টৈঃ এবং দুরাত্মভিঃ**—এই তিনটি বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম-কর্মের সংস্কার বড় প্রবল, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। দুষ্ট কেন? —'**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**'; এই ভগবদ্বাক্য যখন জীবহৃদয়ে যথার্থ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন কি আর জীব কাম্যকর্মগুলিকে বা ধর্মসংস্কারগুলিকে দুষ্ট না বলিয়া থাকিতে পারে? তারপর দুরাত্মা—অসৎ-প্রকৃতি। ইহারা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। জানি—ধর্মে আমার আত্মরাজ্য নাই, জানি—ধর্মে আমার মোক্ষ নাই, জানি—ধর্মে আমার মায়ের কোল নিরবচ্ছিন্ন নাই; কিন্তু জানিলে কি হয়! আমি ছাড়িলে কি হয়! ধর্ম যে আমায় ছাড়ে না! জীবের স্বপুরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—ঐ দেখ ধর্মসংস্কার। কেবল কি তাই—'**কোষোবলঞ্চাপহৃতম্**' জীবের কোষ এবং বল পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে—ঐ দেখ ধর্মসংস্কার। আমার আনন্দময় কোষ—মায়ের হিরণ্ময় মন্দির, আমার চিরবিশ্রামের শান্তিনিকেতন বিলুণ্ঠিত করিয়াছে—ঐ ধর্মসংস্কার। বৈধকর্মের সংস্কার-সমূহ আমার পরিচ্ছিন্ন নশ্বর আনন্দের সহায়মাত্র; কিন্তু আমার যে নিত্যানন্দ ধাম—যেখানে আরোহণ করিতে পারিলে মায়ের প্রসারিত বাহুদ্বয় স্বতঃই আসিয়া, আমায় টানিয়া কোলে তুলিয়া লইবে; যেখানে গেলে আমি চিরতরে মাতৃবক্ষে মিলাইয়া যাইতে পারিব; যেখানে গেলে—আমার সর্ববিধ সন্তাপ—সকল দুঃখ, সকল জ্বালা চিরতরে বিধ্বস্ত হইবে, হায়! আমাদের সেই শান্তিনিকেতন—সেই আনন্দময় কোষ যে বৈধকর্ম সংস্কাররূপ মন্ত্রিবর্গদ্বারা বিলুণ্ঠিত।

এস্থলে আধুনিক বেদান্তবাদিগণ বলিতে পারেন—আত্মা যখন আনন্দময় কোষেরও অতীত, তখন আনন্দময় কোষ বিলুণ্ঠিত হইলেই বা ক্ষতি কি? একটু স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এ সংশয় অপনীত হইবে। আত্মা যদিও আনন্দময় কোষেরও অতীত—এ কথা সর্ববাদিসম্মত—কিন্তু উপাসনা বা সাধনা বলিয়া একটা ব্যাপার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আনন্দময় কোষেই তাঁহার বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ হয়; আনন্দময় কোষে আত্মবোধ লইয়া যাওয়াই সাধনা। অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি স্থূলতর কোষগুলিতে যে আত্মবোধ ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে উপসংহৃত করিয়া আত্মবোধটিকে আনন্দময়কোষে উপনীত করাই সাধনার শেষ। সাধনার সূত্রপাতেই অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহ হইতে জীবের আত্মবোধ-উপসংহরণ আরম্ভ হয়। ক্রমে প্রাণ, মন এবং বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, আনন্দময় কোষে উপনীত হয়। '**আমি নিত্যানন্দময় মহান্ চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ**'—এই

বোধে উপস্থিত হইলেই সাধনার পরিসমাপ্তি হয় ! উপাসনা দ্বারা ঐ পর্যন্তই যাওয়া যায় । ইহাই হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত । উহাই অক্ষর পুরুষ—যেস্থানে জগৎসংস্কার বীজবৎ অবস্থিত। **'বটকণিকায়াং বৃক্ষ ইব'** । এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলে আর জগদ্বীজ বা সংস্কাররাশি জীবকে বদ্ধ করিতে পারে না । সে নিত্যমুক্ততার আভাস পায় । যেরূপ পরমেশ্বরে অনন্ত কোটি ভুবনের সংস্কার বা বীজ থাকা সত্ত্বেও তিনি বদ্ধ নহেন, যেরূপ এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্যে নিয়ত নিরত থাকিয়াও তিনি নিত্যমুক্ত, ঠিক সেইরূপই জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলে, জগদ্ভাবে আর বদ্ধ হয় না ; সংসার তাহার স্বাধীন লীলামাত্র হয় । এ অবস্থায় নিয়ত নিত্যানন্দ রসের উপভোগ হইতে থাকে । ইহাই জীবের সাধনালভ্য—ইহাই জীবের প্রকৃত শান্তিনিকেতন । বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিত্য রাসমণ্ডল বা গোলোকধাম এই স্থান । ইহার পরপারে যিনি অবস্থিত, তিনি **'অবাঙ্মনসোগোচর'** বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সাধনার অতীত, স্ব-সংবেদ্যমাত্র। আনন্দময়কোষে আরোহণ করিতে পারিলে, ইহার পরবর্তী অবস্থায় অনায়াসে যাওয়া যায় । উহা স্বয়মাগত একটি অবস্থাবিশেষ । (অবস্থা বলিলে ঠিক বলা হয় না) ! ব্রহ্মলীলার অবসান বা বেদান্তপ্রতিপাদ্য 'পরান্তকাল' উপস্থিত হইলেই উহার লাভ হয় ; সুতরাং বেদান্তবাদের সহিত আমাদের কোনওরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই ।

যাহা হউক, জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারে আনন্দময় কোষটি পর্যন্ত ধর্মসংস্কারের পরিচ্ছিন্নতায় সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । আরে ! মনে কর—শাস্ত্রে আছে—রক্তজবা দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিও না, শিবকে বিল্বপত্রটি বিপরীত ভাবে দিও, দক্ষিণ নাসাপুট শক্ত করিয়া ধরিও, যেন বায়ু-নির্গম না হয়, বাম পদের উপরে দক্ষিণ পদ স্থিরভাবে স্থাপন করিবে, ইত্যাদি সহস্র সহস্র আদেশ প্রতিপালনেই জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, মন্ত্রিবর্গের হুকুম তামিল করিতেই সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত হইল ; আত্মসম্ভোগ বা আনন্দময় কোষের সে স্বাধীন লীলা আর কবে ভোগ করিবে ? হায় ! কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে জীবন কাটিয়া গেল, মায়ের কোলে কবে উঠিবে ? এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মাতৃলাভের পক্ষে প্রথম প্রথম হিতকর হইলেও ইহাও ত' বন্ধন ! ইহাও ত' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের অধীনতা ! স্বাধীনতা প্রয়াসী জীব—মাতৃ-বক্ষোরূপ উন্মুক্তক্ষেত্রে বিচরণশীল সন্তান কি আর অত ভাবিয়া—অত বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে ভালবাসে ! পারে না। অথচ ওগুলিকে উপেক্ষা করিতেও সাহস হয় না । যতদিন জীব মাতৃ-স্নেহবিমুগ্ধ হইতে না পারে, ততদিন বৈধকর্মের সংস্কার জীবকে বড়ই উৎপীড়িত করে । উহার অনুষ্ঠান করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না, অথচ ছাড়িতেও পারে না । তাই ইহারাই প্রবল শত্রু—নিত্যানন্দের বিঘাতক ।

কেবল তাহাই নহে ; জীবের যাহা 'বল'— নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সামর্থ্য, সকলই অমাত্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত ; কারণ উহারাই জীবকে অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান এবং বদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করাইয়া দেয় । প্রজাগণ রাজ্যমাত্র নিয়াছে ; কিন্তু সুরথের সর্বপ্রধান সহায় মন্ত্রিগণ কোষ ও বল পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে । জীব যখন বুঝিতে পারে—তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কতকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত, তখন উহাদিগকেই প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করে। পাতঞ্জল দর্শনেও ঠিক এইকথাটিই আছে—**'স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলাবৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্ত মহাপ্রতিপক্ষাঃ ।'** স্থূলবৃত্তিগুলি সাধারণ শত্রু এবং সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি প্রবল শত্রু । কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি আত্মরাজ্যলাভের পক্ষে তত অন্তরায় বলিয়া মনে হয় না, যত অন্তরায় এই সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি— এই ধর্মসংস্কারগুলি ! এই ধর্মশত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; সর্বত্রই নির্জিত হইতে হয় । এই স্থানেই জীবের চরম বিষাদযোগ উপস্থিত হয় ; ইহার পর আর বিষণ্ণ হইতে হয় না । গীতায় কুরুক্ষেত্র-সমরে অনাত্মীয়কে আত্মীয়বোধে বিমূঢ় যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের বিষাদযোগের পরিসমাপ্তি এইখানে ! স্বপুরপ্রবেশে অমাত্য-বিদ্রোহ সুরথের প্রাণে যে বিষাদ উপস্থিত করিয়াছিল তাহার তীব্রতা অনেক বেশী ; কারণ, সে যুদ্ধ এবং বিষণ্ণতা মনোময় ক্ষেত্রে ; কিন্তু এই অমাত্য-বিদ্রোহ বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে—অধিক উচ্চে ।

জাগতিক সাধারণ দুঃখের সহিত—সাধন জগতের দুঃখের যে কত প্রভেদ, তাহা মাত্র সাধকগণের

বোধগম্য । বহুদিনব্যাপী দুরারোগ্য নিয়ত-যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির দুঃখ কিংবা গুণবদ্ যুবক-পুত্র-বিয়োগবিধুরা মাতার দুঃখ অথবা সদ্যঃ পতিবিরহিতা পতিপ্রাণা বালবিধবার দুঃখ অথবা অনশনক্লিষ্ট অস্থিচর্মাবশিষ্ট মানুষের দুঃখ দেখিলে মনে হয়, ইহাই দুঃখের চরম ; কিন্তু এ সকল দুঃখ সেই দুঃখের সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—যে দুঃখ আনন্দময় কোষে আরুরুক্ষু সাধকের প্রাণে অনুভূত হয়। এবিষয়ে একটি আত্ম-সম্বেদন আছে যথা—'**অনৌপম্যমনির্দেশ্যমব্যক্তং নিশ্চলং মহৎ । যথা ব্রহ্ম তথা তস্য বিরহবেদনং ভৃশম্ ॥**' ভগবান যেরূপ অতুলনীয়, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, নিশ্চল এবং মহান, তাঁহার বিরহ-বেদনাও ঠিক তেমনই অতুলনীয়, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, নিশ্চল এবং মহান । বৈষ্ণব-গ্রন্থে কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা শ্রীরাধার যে সকল বাহ্য লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে ; সত্যই ঐ সকল অবস্থা হয় । যে শ্রীমতী হইয়াছে —আরাধিকা বা রাধিকা হইয়াছে, সেই মাত্র কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারে। যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার পক্ষে আবার জগদ্ভাবে বিচরণ বা শ্রীকৃষ্ণবিরহ যে কত তীব্র, কত দুঃখদায়ক তাহা সেই শ্রীমতীই মাত্র জানেন ; অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে । ভাষায় সে বিরহবেদন পরিব্যক্ত হয় না । যদিও প্রতিপত্রে, প্রতিবৃক্ষে, প্রতিধূলি-পরমাণুতে, জগতের সর্বত্র আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজিত, তবু তাহাতে কি পিপাসা মেটে ! ওরে ! অপরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুনীরে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, সে কি আর এই পরিচ্ছিন্ন প্রেমবিন্দুতে —নামরূপবিশিষ্ট চৈতন্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। হায় ! জীব কবে সেই অগাধ কৃষ্ণপ্রেমসাগরে অবগাহন করিবে । কবে শ্রীরাধিকা হইয়া ধন্য হইবে । কিন্তু সে অন্য কথা—

———o———

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতি ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৮॥

অনুবাদ । অনন্তর হৃতরাজ্য সেই ভূপতি মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণপূর্বক গহন বনে গমন করিয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যা । ভাব-সমরে পরাজিত জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াও যখন স্থিরত্ব ও শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন সে দেখিতে পায়—কেবল সংসার-সংস্কার-শ্রেণী তাহার প্রতিকূল নহে, বৈধকর্মজন্য দুরপনেয় সংস্কারগুলিও প্রধান শত্রু ; উহারা তাহার আনন্দময় কোষ এবং নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধত্বাদিরূপ বল পর্যন্ত অপহরণ করিয়াছে ; যখন জীব আপনাকে হৃতস্বাম্য বলিয়া বুঝিতে পারে—কি দেহরাজ্যে, কি মনোরাজ্যে, কি জ্ঞানময় ক্ষেত্রে, কি আনন্দের কেন্দ্রে, কোথাও আর আমার বলিয়া প্রভুত্ব করিবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই ; কারণ, দেহ আমার অনিচ্ছায় রুগ্ন হয়, বৃদ্ধ হয়, অকর্মণ্য হয় ; মন আমার অনিচ্ছায় প্রতিনিয়ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, জ্ঞান আমার জ্ঞেয় বস্তুকে সম্যক্ প্রকাশিত করে না ; আর আনন্দ—তাহার অস্তিত্বই ত' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না— সকলই আমার, অথচ সকলই বিপক্ষ— স্বাধীন ; আমার ইচ্ছায় — আমার আদেশে দেহের একবিন্দু শোণিত পর্যন্ত পরিচালিত হয় না—সকলেই স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্বক আমার আত্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে প্রবলভাবে দণ্ডায়মান—আমার মাতৃ-অঙ্কলাভের প্রবল বিরোধী, তখন এইরূপ নিজের শোচনীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া, সে একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে !

যদিও মন্ত্রে বিষাদ শব্দটির উল্লেখ নাই, তথাপি '**একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্**' —এই কথাটিই সুরথের চরম বিষাদযোগের সূচনা করিতেছে । এ বিষাদ বাহিরে দেখাইবার নহে ; এরূপ অবস্থাপন্ন জীব ত' মহাসৌভাগ্যবান ; তাই পূর্বেই সুরথকে মহাভাগ বলা হইয়াছে । কিন্তু সুরথের প্রাণে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবে ? যে ব্যক্তি স্বপুরের সন্ধান পাইয়াছে, সাধারণ লোক তাহাকে দেখিলে, তাহার একবিন্দু চরণধূলার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে । বাস্তবিক সে একদিকে মহাসৌভাগ্যবান হইলেও অন্যদিকে সে অত্যন্ত দুঃখী ; কারণ, জীবভাব এবং জীবত্বের গ্রন্থিগুলি তাহার পক্ষে তখন অসহনীয় যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে । যতদিন মাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে না পারা যায়, যতদিন সবটা প্রাণ দিয়া মাতৃ-স্নেহ ভোগ করা না যায়, যতদিন যথার্থ গ্রন্থিভেদ না হয় অথচ গ্রন্থির যাতনা বেশ বোধে আসিতে থাকে, ততদিন জীবের যে কি কষ্ট, তাহা যাহার গ্রন্থিবোধই হয় নাই, তাহারা কিরূপে

বুঝিবে ? তাই এস্থলে বিষাদ শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গীতায় বিষাদযোগের বহির্লক্ষণগুলি বেশ উক্ত হইয়াছে— **'গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ, ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, বেপথুশ্চ শরীরে মে'** ইত্যাদি শব্দে ধনুস্খলন, গাত্রদাহ, মুখশোষ, হৃৎকম্প প্রভৃতি বিষাদের চিহ্নগুলি অর্জুনের অন্নময় কোষে প্রকাশ পাইয়াছিল ; কিন্তু সুরথের বিষাদ লক্ষণ সূক্ষ্ম ও কারণদেহে প্রকটিত হওয়ায় বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। প্রজাবিদ্রোহ বা ভাববিরোধিতা বিজ্ঞানময় কোষে এবং অমাত্যবিদ্রোহ বা ধর্মকর্মের সংস্কারজন্য পরিচ্ছিন্নতা আনন্দময় কোষেই প্রকাশ পায়। যাহার জ্ঞান বা অধিকার যত উচ্চে, তাহার বিষাদও তত উচ্চস্তরের হয়। পুতুলটি ভাঙ্গিয়া গেলে শিশু কাঁদে ; কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতেও বিচলিত হয় না ; কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে—তাহার দুঃখ হয় না! একাকী অশ্বারোহণে বনে গমন করাই সুরথের মহাবিষাদের সূচনা করিলেও আমরা কিন্তু দেখিতে পাই— উহা একটি সাধনাবিশেষ ; বিষাদের বহির্লক্ষণমাত্র নহে।

একাকী বনে গমন করার মধ্যে কিরূপ সাধনরহস্য লুক্কায়িত আছে এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে মন্ত্রস্থ শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ—অন্বেষণ অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান! অন্বেষণার্থক মৃগ্ ধাতু হইতে মৃগয়া শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হয়' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব। কঠোপনিষদে উক্ত আছে—**'ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ।'** 'গহন বন' শব্দের অর্থ—বিষয়ারণ্য। রূপ-রসাদি বিষয়সমূহের সহিত গহন বনের সাদৃশ্য ভাগবতাদি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সমুদয় মন্ত্রটির অর্থ এই যে, ভাবসমরে পরাজিত হইয়া, জীব আত্মানুসন্ধানের ছলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া, অতি গহন বিষয়ারণ্যে গমন করিল।

জীব প্রথমতঃ আত্মলাভের জন্য উদ্যত হইয়া, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ করিতে যত্নবান হয়। বাহ্যবিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া, নানাবিধ যোগ-কৌশলাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, কিন্তু যথার্থ অমরত্বের সন্ধান পায় না ; যথার্থ শান্তির—আনন্দের কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না ; সর্বত্রই সংস্কার বা ভাবরাশির দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে। তখন স্নেহময়ী মা আমার আদরের সন্তানকে এক সরল পন্থায় লইয়া যান। এতদিন সে মাকে চাহে নাই, চাহিয়াছে সংযম, চাহিয়াছে যোগধ্যান, চাহিয়াছে সিদ্ধি শক্তি ; কাজেই এতদিন এই ঋষিজনসেবিত সরল পন্থাটি চক্ষুতে পড়ে নাই। বার বার প্রতিহত হইয়া, বহুবার বিফলপ্রযত্ন হইয়া, যথার্থ মাতৃ-অন্বেষণ প্রাণে ফুটিয়াছে ; তাই, এইবার ইন্দ্রিয় অশ্বে আরোহণপূর্বক বিষয়ারণ্যে গমন ও মায়ের সন্ধান আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাই বুদ্ধিযোগ। গীতায় এই বুদ্ধিযোগের সূচনা হইয়াছে—**'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।'** যাহা দ্বারা আমাকে—আত্মাকে পাওয়া যায় সেই বুদ্ধিযোগ জীবকে প্রদান করি। ইহা ভগবানের স্বমুখনির্গত অভয়বাণী। গীতায় যে মোক্ষফলপ্রদ কল্পতরুর বীজ-বপন হইয়াছে, দেবীমাহাত্ম্যে তাহা ফলপুষ্প-সমৃদ্ধ বনস্পতিরূপে পরিণত হইয়া, জীবকে ধন্য করিতেছে। জীব যখন গুরুকৃপায় বুদ্ধিযোগে অধিকার লাভ করে তখন তাহার অধ্যবসায় কিরূপভাবে কার্যকরী হয়, তাহাই বলিতে গিয়া মহর্ষি বলিলেন—মৃগয়াচ্ছলে অরণ্যে প্রবেশ।

জীব যখন অন্তররাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও মায়ের সন্ধান পায় না, (কারণ, তখনও অন্তর জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারে না) তখন অগত্যা আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়রাশির সমীপে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এই বিষয়কে— এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি ভোগ্য বস্তুকে নশ্বর ও মিথ্যা বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক অন্তররাজ্যে প্রবেশ করে। (বর্তমান যুগের অধিকাংশ সাধক এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সাধনাপথে অগ্রসর হয়)। তারপর অনেক ঘুরিয়া আবার সেই বিষয়-অরণ্যে প্রবেশ করে ; তবে একটু পরিবর্তন হয়,— পূর্বে বিষয়-মাত্র বোধে বিষয়ভোগ করিত, এইবার মৃগয়াচ্ছলে — আত্মানুসন্ধানের ছলে। প্রথমে ছল করিয়া বা নকল করিয়াই বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান জাগিয়া উঠে ; কারণ, বুদ্ধিযোগের প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করে, বিষয় ত' আর যথার্থ মা নহে। বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র, মা আমার অনন্ত ; বিষয় ভাবের ঘনীভূত অবস্থা ; মা আমার ভাবাতীতা! বিষয় অজ্ঞান-মাত্র ; মা আমার জ্ঞানময়ী।

সুতরাং বিষয়ে বিচরণ করিয়া কি বিষয় হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মায়ের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা আছে ? তবে কি করা যায় ! অন্তর রাজ্যে যখন অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন অগত্যা বহিঃরাজ্যে বিষয়ে বিষয়ে অনুসন্ধান করায় ক্ষতি কি ? তাই, যেন ছল করিয়া, নকল করিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান আরম্ভ করে ; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিতে পায় —ইহা ছল নহে, যথার্থই অনুসন্ধান। আর একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি— মৃগয়া আত্মানুসন্ধান । ইহা বাহিরে অনুসন্ধানের আকারে প্রকাশ পাইলেও ফলতঃ এই স্থান হইতেই আত্মলাভ সংসূচিত হয় । যেহেতু স্থূল বিষয়ে মাতৃ-বোধ হইলেই, যথার্থ মাতৃ-লাভের আরম্ভ হয় ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিলে, কিরূপে মাতৃ-অনুসন্ধান বা মাতৃলাভ সংঘটিত হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । যে কোন পদার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক—ইন্দ্রিয়-অশ্ব স্বেচ্ছায় পরিচালিত হইয়া, যে কোনও পদার্থের সম্মুখে তোমায় উপস্থিত করুক, উহাকেই মা বলিয়া, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে । চক্ষু রূপ আনিয়া উপস্থিত করিল, তুমি তাহা মায়েরই রূপ বলিয়া গ্রহণ কর । কর্ণ শব্দের নিকট উপস্থিত করিল, তুমি উহাকে মাতৃ-আহ্বান বা মায়েরই কণ্ঠস্বররূপে গ্রহণ কর। নাসিকা সৌরভ-সমীপে সমুপনীত করিল, তুমি মাতৃ-অঙ্গ-নিসৃত সুগন্ধরূপে গ্রহণ কর । রসনা বিচিত্র রসের নিকট উপস্থিত করিল, তুমি **'রসো বৈ সঃ'** বলিয়া মাতৃ-আস্বাদনে অমৃতায়মান হও । ত্বক্ তোমায় কমনীয় স্পর্শে কণ্টকিত করিল, তুমি স্নেহময় মাতৃকর-স্পর্শে পুলকিত হও । এইরূপ এক সূর্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত যাহা কিছু কর, সকলই যেন মাতৃ-পূজারূপে পর্যবসিত হয় । **'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'** ইহা মর্মে মর্মে অনুভব কর । শুধু মুখে বলিলে যথার্থ ফললাভ হইবে না । ভাবের বিরুদ্ধে, বিষয়ের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছ, ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ ; এইবার অনুকূলে পরিচালিত হও, অথচ তাহারই মধ্যে মাতৃ-সম্বেদনে পুনঃ পুনঃ সম্বেদিত হইতে থাক । বহুদিন, বহুজন্ম, বহুযুগ ধরিয়া জগদ্ভাবে অভ্যস্ত, জগদ্ভাবে পরিচালিত, জগদ্ভাবেই বিমুগ্ধ ; তাই, জগদ্ভোগই কর ; কিন্তু মা বলিয়া কর । যাহা কিছু দেখিবে, যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভাবিবে, সবই যে মহামায়ার বিভিন্ন মূর্তি, এই বুদ্ধিতে উদ্‌বুদ্ধ হও ! এই সুকৌশল কর্মই বুদ্ধিযোগ, ইহাই মোক্ষপন্থার আবিষ্কারক । সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বেদ, সমস্ত দর্শন এই একটি কথাই বলিয়াছে । **'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং ; স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং ; আত্মৈবেদং সর্বম্ ; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** ইত্যাদি সহস্র সহস্র শাস্ত্রপ্রমাণও আছে । 'ভগবান সর্বব্যাপী' এ কথাটি মানুষ মাত্রেই জানেন, বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই উহা অনুভব করেন । শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার কিছুই নাই, জানিবার বাকী কিছু নাই, শুনিবার বাকী কিছু নাই ; শুধু যাহা শিখিয়াছ, যাহা জানিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, তাহা কার্যে পরিণত কর । উহাই যথার্থ সাধনা ।

এই বুদ্ধিযোগই তোমার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার অব্যর্থ অস্ত্র । তোমার মন বলিবে—সম্মুখে যাহা দেখিতেছ, উহা একটি বৃক্ষমাত্র ; তোমার বুদ্ধি যেন জোর করিয়া বলে—না, উহা বৃক্ষরূপিণী মা ; মা আমার বৃক্ষের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । প্রথম প্রথম ইহা নকল করা মাত্র মনে হইতে পারে । তাই ঋষি বলিলেন —**'মৃগয়াব্যাজেন'** বাস্তবিক কিন্তু উহা ছল বা নকল নহে । আমাদের অবিশ্বাসী মন প্রথমতঃ বুঝিতে পারে না, অথবা স্বীকার করিতে চায় না যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে একমাত্র মহামায়াই নিত্য বিরাজিত । মনের চাতুরীতে, ইন্দ্রিয়ের ধূর্ততায় তুমি প্রতারিত হইও না । উহাদের কুটিল প্ররোচনায় এই বুদ্ধিযোগের উপক্রমটি তোমার নিকট নকল করা রূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হইও না । বুদ্ধি দ্বারা সর্বত্র সত্যের প্রতিষ্ঠা কর— সর্বব্যাপী মাতৃ-সত্তায় বিশ্বাসবান হও ; দেখিবে—ইহার পরিণাম কত মধুময় । গীতা বলেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি । তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।'** সর্বত্র সর্বভাবে সত্যদর্শন করিলে সত্যলাভ হয় ।

মাকে তুমি যেমনভাবে চাও—যে মূর্তিতে মাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার প্রাণ লালায়িত, মনে কর—তোমার সম্মুখেই মা আমার সেইরূপভাবে উপস্থিত হইলেন ;

তখন তুমি মাকে পাইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যেক জড় পদার্থের নিকট করিতে থাক। মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের ন্যায় মিথ্যা করিয়া বল—'মা! এই আমি তোমায় পাইয়াছি। মা! এই আমি তোমায় ধরিয়াছি,' বলিয়া হয়ত গাছটা, মাটিটা, পাথরটাকে জড়াইয়া ধরিবে, তাহাতেই আত্মহারা হইতে চেষ্টা করিবে, মা বলিয়া প্রত্যক্ষ মায়ের নিকট সন্তপ্ত হৃদয়ের যত কিছু আবেদন-নিবেদন নির্বিচারে করিতে থাকিবে। এইরূপ নকল ভক্তি, নকল মাতৃ-লাভ, নকল মৃগয়া আরম্ভ কর, অচিরে যথার্থ ভক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। যদি তোমার প্রাণে যথার্থ মাতৃ-লাভের ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, তবে আর বিচার বিতর্ক বিজ্ঞানের যুক্তি প্রভৃতির মধ্যে না যাইয়া, সরল প্রাণে এই সত্য পথটি অবলম্বন কর। এইখান হইতে এইরূপ ভাবে মাতৃ-লাভ আরম্ভ হউক। আগে জগদ্রূপিণী মাকে দেখ —জগদ্রূপিণী মায়ের উপভোগ কর; তারপর জগদতীতা মায়ের সন্ধান পাইবে। জগৎ ছাড়িয়া—পঞ্চভূত ছাড়িয়া, ভাবরাশি পরিত্যাগ করিয়া, মাকে বুঝিবার দিন—অনেক দূরে। আগে স্থূলে—প্রত্যক্ষ মাকে ধর, তারপর সূক্ষ্মে —অব্যক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। দেখ, ভগবান বস্তুটি দুর্লভ নহে, পরন্তু অতি সুলভ; দুর্লভ আমরা। কারণ আমরাই তাঁহাকে চাই না। জগতে অর্থোপার্জন কিংবা কোন একটা বিষয়ের আহরণ করিতে মানুষ যতটা চেষ্টা করে, ভগবানকে লাভ করিতে ততটা চেষ্টারও আবশ্যক হয় না; এত নিকটে তিনি, এত প্রত্যক্ষ তিনি। সর্বাপেক্ষা সুলভ জিনিষ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা মা। বিনা প্রযত্নে লাভ হয়। যাঁহারা বলেন—কঠোর যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস ইত্যাদি ব্যতীত তাঁহার দর্শন-লাভ ঘটে না, তাঁহারা পুস্তক পড়িয়া বা পরের মুখের উপদেশ শুনিয়া উহা বলিয়া থাকেন। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র সুপ্রকট—শুধু তিনি আছেন, আর কিছুই নাই—তাঁহাকে দর্শন করা দুর্লভ হইবে কেন? দুর্লভ—ঐ বিশ্বাসটি; তিনি সর্বত্র বিরাজিত—এই বিশ্বাসই দুর্লভ। যত কিছু আয়োজন, যত কিছু কঠোরতা, ঐ বিশ্বাসটুকু লাভ করিবার জন্য। 'এই তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন'—এই বিশ্বাস হইলেই যে বিগতশ্বাস হওয়া যায়। সেই মুহূর্তে (অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও) শ্বাসরোধ হইয়া যায়—বিনা চেষ্টায় কুম্ভক সিদ্ধ হয়। বিশ্বাস হইলেই যে বি-শ্বাস হয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, কত সাধক কত কৌশলের সাহায্যে শ্বাসরোধ করিয়া, চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করেন। প্রাণপাত তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বনেও যে, মায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ—মাকে না চাওয়া। অনেকে তপস্বী হইবার জন্য তপস্যা করেন—মাকে চাহেন না। সাধু হইবার জন্য ত্যাগমার্গ অবলম্বন করেন— মাকে চাহেন না। মা যে আমার কল্পতরু। যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। যোগী, তপস্বী, বিরাগী হইবার জন্য সাধনা করিলে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমরা যে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগের কথা বলিয়াছি, উহাই বৈদিক যুগের ব্রহ্মর্ষিদিগের সরল সত্যসাধনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, —**'মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত'** মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থের সত্যপ্রতিষ্ঠা করা ঠিক একই কথা। মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা কথাটি সরল ভাষায় সাধারণকে বুঝাইতে গেলে, ঠিক এই সত্য প্রতিষ্ঠার কথাই বলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি জগৎটা মনের ভাব বা মন; সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মদর্শন করিলে, বস্তুতঃ মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। যাহা হউক, আমরা বহু প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি উপস্থিত করিয়া বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত করিতে চাই না। পিপাসু সাধকগণের নিকট যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না।

বুদ্ধিদ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নামই বুদ্ধিযোগ। আমাদের অন্যান্য তত্ত্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতত্ত্ব সমধিক সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বেই চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি, সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা যত সহজে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ, মন কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা তত সহজে যুক্ত হওয়া যায় না; কারণ উহারা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থূল ও সমধিক জড়ধর্মী। সমধর্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন যত সহজে নিষ্পন্ন হয়, অসমানধর্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন তত সহজে হয় না। জল ও মাটির মিশ্রণে যতটুকু যত্ন আবশ্যক, জলের সহিত জলের মিশ্রণ তদপেক্ষা অল্প প্রযত্নসাধ্য। জলের সহিত বায়ুর যোগ যত আয়াসসাধ্য, কিন্তু বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন তদপেক্ষা অনেক অল্পায়াসসাধ্য। এইরূপ, আকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ

প্রযত্নেরই প্রয়োজন হয় না। ঠিক এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা আত্মায় যুক্ত হইয়া থাকা অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হয়। আত্মা—মা আমার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ; সুতরাং তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইলে, আমাদিগের যে অংশটি সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহা দ্বারাই যুক্ত হইতে হইবে। প্রথমেই যদি মন কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা মায়ের সহিত যুক্ত হইতে যাই, তবে বিফলমনোরথ হইতে হইবে ; কারণ, মা নিত্য-স্থিরা নির্বিকল্পা, আর মন অতিশয় চঞ্চল ও সঙ্কল্প-বিকল্পময়। কিন্তু প্রথমতঃ স্থিরবুদ্ধি দ্বারাই মাতৃ-যুক্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এইরূপ বুদ্ধি-যোগে অভ্যস্ত হইলে কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় দ্বারাও ক্রমে যুক্ত হওয়া যায়। সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর রূপরসাদি বাহ্য বিষয়গুলির চাপ পড়ে ; পরে ঐ বিষয়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের চাপ পড়ে মনের উপর এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন মনের চাপ পড়ে বুদ্ধির উপর। তাই, বুদ্ধি অনবরত বিষয়াকারেই প্রকাশিত হইতে থাকে ; কিন্তু ভিতরের দিক হইতে যদি বুদ্ধিটি মাতৃ-যুক্ত করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ভগবদ্‌ভাবান্বিতা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির চাপ মনের উপর পড়ে, তাহারই ফলে মনোযোগ আরম্ভ হয় অর্থাৎ মন দ্বারাও ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। মনোযোগ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত হওয়া আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই বুদ্ধিযোগের ফল অতি চমৎকার! ইহা ঠিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় সূক্ষ্মমাত্রায় প্রযুক্ত হইয়া, জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে ; ক্রমে স্থূলে আসিয়া শক্তিপ্রকাশপূর্বক ভবব্যাধি চিরদিনের জন্য উন্মূলিত করিয়া দেয়।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে আর একটি শব্দ আছে —একাকী। বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বাহিরে কোনরূপ আয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান না করিয়া, মানুষমাত্রেই উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে, সর্বদা সর্বাবস্থায় আপন মনে একাকী এই সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা মৃগয়াচ্ছলে আত্মানুসন্ধান ব্যপদেশে, একাকীই এই বিষয়ারণ্যে বিচরণ করে। একা না হইলে যে একক সখাকে পাওয়া যায় না। মা আমার একা। তাই আমাদেরও একা হইতে হইবে ; নতুবা মাকে পাইব কিরূপে ? সাধক ! যে মুহূর্তে তুমি একাকী হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই মাকে লাভ করিবে। এক-অদ্বিতীয় বস্তুকে পাইতে হইলে, একাকী হইতেই হইবে। মা যে আমার বড় স্বার্থপরা। একা না হইলে আসেন না। মায়ের ইচ্ছা, একা আমাকে আদর করিবেন, একা আমাকে স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিবেন ; কিন্তু আমরা যে এক মুহূর্তের জন্যও একা হইতে পারি না ; সংসারত্যাগই করি, আর অরণ্যে পর্বতে কিংবা গিরিগুহায় বাস করি, যথার্থ একা কিছুতেই হইতে পারি না। আমার সবটা প্রাণ মাকে দিবার জন্য এক মুহূর্তও একা হইয়া বসিতে পারি না।

সুরথ কিন্তু একাকী হইয়াও হইতে পারে নাই ; ঐ হয়টি—ইন্দ্রিয়-অশ্বটি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। যখন একা হইতে পারিবে, তখন ত' সে মনু হইবে ? এইমাত্র তাহার সূচনা। একা হওয়ার জন্যই ত' সাধনা। সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বাস করিলেই একা হওয়া যায় না। যতদিন মন আছে, ততদিন একা হইবার উপায় নাই। অথবা কেন হওয়া যাইবে না! যখন মাকে পাওয়া যায়, যখন মাতে আত্মহারা হওয়া যায় ; যখন আমি ও মা, দুইটি পৃথক বোধ থাকে না, এক অখণ্ড ঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করা যায়, তখন একা হওয়া যায়। না, সে অবস্থায় একত্ববোধও থাকে না। একত্বজ্ঞানও দ্বিত্বাদি বোধকে অপেক্ষা করে, দ্বিতীয় বোধের অভাবে একাত্ববোধও থাকে না। সে যাহা হউক, ও সব বড় কথায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা জানিব—মা! একা আসিয়াছি, একা চলিয়া যাইব। জন্মিবার সময় কেহ সঙ্গে আসে নাই, মৃত্যুর দিনেও কেহ সঙ্গে যাইবে না ; তবে কেন মধ্য সময়টায় কতকগুলি উপসর্গ যোগাড় করিয়া দিয়া, আমাকে বহু করিয়া দিলি। মা! প্রতিনিয়ত এই বহুত্বের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অথচ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মা! তুমি যে একা অদ্বিতীয়া! আমাকেও একা কর। এই বহুত্বের মধ্যে—এই সর্বভাবের মধ্যেও যে তুমি এক অখণ্ড স্বরূপে বিদ্যমান! আমায়ও এই বহুত্বের মধ্যে একত্বে—মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। আমিও বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়া একা হই।

যাহারা সত্যলাভের জন্য লালায়িত, তাহারা মধ্যে মধ্যে নিজেকে একাকী—নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে

করিবে, শত শত বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হইয়া শত শত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিজেকে প্রতিমুহূর্তে একাকী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যখন ভুলিয়া থাক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু যখন মায়ের কথা মনে পড়িবে, অমনি সেই মুহূর্তে মন হইতে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে। আমার বলিতে কেহ নাই —আমি একা। 'একমাত্র একক-সখা — চিরজীবনের অদ্বিতীয় সহচর তুমি মা আমার।' সাধ্যানুসারে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজে একা হইতে চেষ্টা করিবে। একা হইতে হয়—মনে। মনে মনে নিজে সর্বদা একা ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেই বিষয়াসক্তি কমিয়া আইসে। পুনঃপুনঃ মৃত্যু চিন্তা ইহার বিশেষ সহায়তা করে। বৃন্দাবনে গোপীগণ যথাসাধ্য একা হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই, একক-সখা শ্রীকৃষ্ণকে একাকী সম্ভোগ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল। আর এখানেও দেখিতে পাই—সুরথ অনেকটা একাকী হইয়াছিল বলিয়াই, মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল। এস সাধক ! আমরাও একা হইতে যথাশক্তি সচেষ্ট হই।

———○———

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥৯॥

অনুবাদ। সুরথ সেখানে (অরণ্যমধ্যে) দ্বিজবর মেধসের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমটি প্রশান্ত শ্বাপদসমূহের দ্বারা আকীর্ণ এবং মুনিশিষ্যগণ কর্তৃক উপশোভিত।

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত প্রকারে মৃগয়াচ্ছলে গহনবনে বিচরণ করিতে করিতে, অর্থাৎ নকল করিয়া বিষয়ে বিষয়ে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে আত্মানুসন্ধানরূপ সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে মাতৃ-কৃপায় একদিন সাধক দেখিতে পায়—তাহার সম্মুখে এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব স্নিগ্ধ চৈতন্যময় আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ আকাশ এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে, আর নকল বা কল্পনা বলিবার উপায় থাকে না। উহার দর্শনমাত্র প্রাণ যেন অমৃতরসে নিমগ্ন হয়, অবিশ্বাসী চঞ্চল মন স্থির হয়, সে শুভ্র সত্য-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সন্তাপসমূহ যেন মুহূর্ত মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। প্রথমে ঐ চিদাকাশ মলিন ভাবাপন্ন, চঞ্চল ও অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। ক্রমে সত্য-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলে, উহা শুভ্র, নির্মল ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, ইচ্ছামাত্রেই দর্শন করা যায়। তখন সাধক বড় আনন্দ লাভ করিতে থাকে। সুরালুব্ধ মদ্যপায়ীর ন্যায় আকুল আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। সমস্ত জগৎ ভুলিয়া শুধু ঐ জিনিষটা নিয়াই যেন অনায়াসে অবস্থান করা যায়, এইরূপ মনে হইতে থাকে। ক্রমে মায়ের কৃপায় ঐ আকাশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে থাকে। কখনও পীত, কখনও বা রক্তবর্ণের অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধজ্যোতি নয়ন পথে সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। ক্রমে ঐ জ্যোতি অতিশয় শুভ্র শান্ত ও নির্মল হইয়া অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ও জগৎসত্তা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ইহারই নাম অরণ্যমধ্যে সুরথের মেধসাশ্রম দর্শন।

মেধস শব্দের অর্থ মেধা বা স্মৃতিশক্তি। যাহাতে আত্ম-স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই মেধস-পদবাচ্য। বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিতে পারিলে, অর্থাৎ বুদ্ধিজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে—আত্ম-স্মৃতি উপস্থিত হয় ; তাই, ইহাকে বুদ্ধির স্থান বলা হইয়া থাকে। দ্বিজবর্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, তিন বর্ণই দ্বিজশব্দ-প্রতিপাদ্য। এই তিন বর্ণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দ্বিজবর্য। নীতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে — '**বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ**।'

ধী বা বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রাহ্মণ। ধী এবং মেধা প্রায় অভিন্ন। এই ধী যখন প্রথম উন্মেষিত হইতে থাকে, তখন উহা স্মৃতির আকারেই প্রকাশ পায়। তাই এস্থলে বুদ্ধি বা ধী না বলিয়া মেধস বলা হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্বেই ব্রহ্মের বা নির্গুণ চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি। জীব এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলেই, ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারে। তাই, ধীকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। জগতের ব্রাহ্মণ-বর্ণও এই ধী-শক্তি লাভ করিয়াই জগৎপূজ্য। প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে এই ধী-শক্তির প্রার্থনা করেন, এবং উহা জগৎময় ছড়াইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে সর্বজীবের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ বপন করিয়া, জীবসঙ্ঘকে মহাসত্যের দিকে আকর্ষণ করেন। তাই, ব্রাহ্মণ এত পূজ্য ; তাই, কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত

বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সুশোভিত। ব্রাহ্মণ মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্নশিশু। জগন্মঙ্গলই ব্রাহ্মণের ব্রত। ব্রাহ্মণের আসন যে কত উচ্চে, ব্রাহ্মণগণ যে আমাদের কি উপকার করেন, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় অগম্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়। ব্রাহ্মণরূপ মহাকেন্দ্র স্থির আছে বলিয়াই জীবসঙ্ঘ— সৃষ্টিচক্র স্থির আছে ; নতুবা কক্ষচ্যুত গ্রহমালার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। আচার্যগণ যে ভক্তের আসন ভগবানেরও উচ্চে দিয়াছেন, ইহা স্তুতিবাদ নহে। ভক্তহৃদয়েই ভগবান নিত্য বিরাজিত। ভক্তই সাকার ভগবান! ভক্ত-দর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়। এই ভক্তই ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণই ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরাভক্তি বা প্রেম একই কথা। ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ভক্ত বা প্রেমিক। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমরা মেধার স্থান বা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকেই মেধসের আশ্রম বলিয়া বুঝিব। এই স্থানই ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মুক্ত দ্বার। সাধকের সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত হইলেই সে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে। সাংখ্যদর্শনের ভাষায় এই স্থানকে মহত্তত্ত্ব বলা যায়। এই মহত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভ হইলে জীবের অজ্ঞান-গ্রন্থি সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া যায়। তান্ত্রিকগণের কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণেরও ইহাই লক্ষণ।

এই মেধসাশ্রমের দুইটি বিশেষণ আছে ; একটি **'প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ'** এবং অপরটি **'মুনিশিষ্যোপশোভিত'**। সেখানে শ্বাপদ জন্তুগণ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে। শার্দূল-মৃগ, ময়ূর-ভূজঙ্গ, অহি-নকুল প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বভাব-বৈরতা পরিহারপূর্বক মিত্রভাবে অবস্থান করিতেছে। চতুর্দিকে মুনি—মৌনভাবাপন্ন শিষ্যগণ ব্রহ্মধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। কখনও বা শিষ্যবৃন্দের মৌনভাব বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহাদের পুষ্কল স্তোত্র দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে। কখনও বা তাঁহাদের আহুতি-সকল অগ্নিতে অর্পিত হইয়া, পূত-হব্যগন্ধে সর্বতঃ সৌরভ বিস্তারপূর্বক দূরস্থিত জনগণের প্রাণেও পবিত্র সাত্ত্বিকভাব আনয়ন করিতেছে। হায়! এরূপ আশ্রম কি আর আমরা দেখিতে পাইব! যেখানে গেলে স্বর্গকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে! যেখানে প্রতিবৃক্ষ প্রাণময়—সত্যভাবে সম্বুদ্ধ! যেখানে মৃত্তিকা নিয়ত সত্যসম্বেদনে সঞ্জীবিত, যে আশ্রমে বায়ু সত্যভাবমাত্র বহন করে! যেখানে ব্যোমমণ্ডল সত্যনাদের সত্যকম্পনে নিত্য তরঙ্গায়িত! এরূপ ঋষির আশ্রম আবার দেখিতে পাইব কি? ভারত যাহাতে গৌরবান্বিত, দ্বাপরের শেষ হইতে সে গৌরবের চিহ্ন পর্যন্ত যেন ভারত-বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে! পূতনামা ঋষিবৃন্দের পূতচরণরেণু-স্পর্শে পূত ভারত-বক্ষে ভগবান আবার ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইবেন? তাঁহারা গৃহী কি সন্ন্যাসী, আশ্রমী কি দণ্ডী, কিছুই বলা যায় না ; তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-ধান্য-পশু সবই ছিল ; অথচ কিছুই ছিল না ; যাঁহারা এই সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে নিরত থাকিতেন। এখন চারিদিকে কত অবতারের নাম শুনিতে পাই, কত স্থানে মঠ দেখিতে পাই! কিন্তু কই, এরূপ ঋষির আশ্রম ত' একটিও দেখি না! মা কবে তুমি ব্রহ্মর্ষিরূপে আবার আবির্ভূত হইবে? কবে আবার সত্যধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক ভাবে ঐ দুইটি বিশেষণের রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করা যাউক। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মহত্তত্ত্বে উপনীত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহ স্থিরীভাব অবলম্বন করিয়াছে। পূর্বে ভাবরাশি একটির পর একটি অনাহূত ভাবে উপস্থিত হইয়া, সাধককে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এখন সাক্ষিমাত্রস্বরূপ উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতির বিকাশে সাধক দেখিতে পায়, উহারা যেন সম্পূর্ণ স্থিরভাবে দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। বৃত্তিগুলির সেই পাশবিক চঞ্চলতা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহারা পূর্বে প্রতিনিয়ত সাধককে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বুদ্ধিজ্যোতির তলদেশে পড়িয়া তাহারা স্থির ও প্রশান্তভাবে যেন ছায়ার ন্যায় অবস্থান করিতেছে ; এইরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে। ইহাই প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ অবস্থা। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি শ্বাপদ-স্থানীয়। বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে ইহারা প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করে।

কেবল ইহাই নহে, সেই স্থানটি মৌনভাবাপন্ন শাসনযোগ্য শিষ্যবৃন্দ দ্বারা উপশোভিত। পূর্বে বলিয়াছি —বুদ্ধিজ্যোতির প্রকাশে ভাব বা বৃত্তিগুলি প্রশান্ত হয়। সেই ভাবসমূহের মূল কোথায়? শব্দে ;—শব্দশূন্য ভাব

হয় না। তুমি বৃক্ষ চিন্তা করিতেছ, একটু স্থির ভাবে মনের দিকে লক্ষ্য কর—দেখিবে, তোমার মনের মধ্যে 'বৃক্ষ বৃক্ষ বৃক্ষ', এইরূপ একটি শব্দ হইতেছে। অথবা গান শুনিতেছ। সেই সময় ধীরভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে—তোমারই মনের ভিতরে গান হইতেছে। এইরূপ সর্বত্র। বেদান্তের ভাষায় ভাবের সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। শব্দ নাই অথচ নাম আছে; ইহা হয় না। আমাদের মনে যখন যে কোন ভাবই জাগুক না কেন, উহা কতকগুলি শব্দ-সমষ্টিমাত্র। শব্দ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। ঐ শব্দগুলি যদিও ধ্বনির আকারে বাহিরে আসে না, তথাপি উহা যে নীরবতার শব্দ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেকেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক, ভাব স্থির হইলেই, তদুৎপাদক শব্দরাশি স্বতঃ স্থির হইয়া যায়। সেইজন্য মন্ত্রেও মুনি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মনটা দিবারাত্র যেন পাগলের মত কেবল বকে; তাই, আমরা এত চঞ্চল। বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে ঐ বকুনিটা থামিয়া যায়। মনে আর কোনরূপ শব্দ কিংবা চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় না। শিষ্য শব্দের অর্থ শাসন-যোগ্য। ভাবসমূহ স্থির হওয়াতে তদুৎপাদক শব্দসমূহ আর শুনিতে পাওয়া যায় না, এবং উহারা যেন আমার সম্পূর্ণ শাসনযোগ্য অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনই বোধ হয়। জীব পূর্বে এই বৃত্তিসমূহ দ্বারা—এই ভাবরাশি দ্বারা কতই না উৎপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু এখন ভাব-সমরে নির্জিত হইয়া সে মৃগয়াচ্ছলে গহনারণ্যে প্রবেশপূর্বক মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল—ভাববৃন্দ সর্ববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমারই ইচ্ছায় যেন উহারা পরিচালিত হইবার মতন অবস্থায় আসিয়াছে। এমনই মনোরম সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র বা মেধসাশ্রম। মরি! মরি! কি প্রাণ-জুড়ান, কি লোভনীয় সে চিন্ময় জ্যোতির্মণ্ডল! সেখানে সর্ববিধ চঞ্চলতা, সর্ববিধ বহিঃশব্দ সম্পূর্ণ দূরীভূত। জীব! কবে তুমি সে মহতী ধীরূপিণী জ্যোতির্ময়ী মায়ের স্নেহময় বক্ষে স্থান লাভ করিয়া সর্ববিধ চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবে?

আর একটু খুলিয়া বলি—নকল করিয়া জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে—প্রত্যেক পদার্থে সত্যবোধ ঘনীভূত হইয়া আসিবে। তারপর একদিন দেখিতে পাইবে—একটি শুভ্র প্রাণময় জীবন্ত জ্যোতি চারিদিকে প্রসৃত হইয়া রহিয়াছে। উহা এত স্থির যে সেখানে যাবতীয় ভাব-চঞ্চলতার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। এইটা অমুক, এইটা অমুক, এইরূপ বিশিষ্ট শব্দে আর ভাবসমূহ উদ্বেলিত হইতেছে না। একটা জীবন্ত স্থির সত্তার মধ্যে যেন জগৎটা ছায়ার মত অবস্থান করিতেছে। ইহা এত প্রত্যক্ষ, এত ঘন যে, আর কল্পনা বলিতে পারিবে না। জগতের অস্তিত্বে বরং সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু এ সত্তায় কোন সংশয় থাকিবে না। পুনঃ পুনঃ ইহাতে অবস্থান করা অভ্যাস করিয়া লইলে শেষে ইচ্ছা মাত্রেই এই মহৎ তত্ত্ব পর্যন্ত একেবারে যাওয়া যায়। ইহাই সুরথের মেধসাশ্রমে অবস্থিতি।

এই দর্শনকে মেধসাশ্রম বলিবার তাৎপর্য কি? গীতাভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—**'ব্রহ্মাহমস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধা।' 'আমি ব্রহ্ম'** এইরূপ যে স্মৃতি, তাহারই নাম মেধা। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। যাঁহারা পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়া **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** বলেন, তাঁহারা মাত্র বাক্যেই উহা উচ্চারণ করেন—শিক্ষিত পক্ষীর মত শব্দ-আবৃত্তিমাত্র। মহৎ তত্ত্বে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে জীবব্রহ্মের অভেদ-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। এই পরোক্ষ-জ্ঞানই সাধন-সাপেক্ষ। অপরোক্ষানুভূতি সাধনার চরম ফলরূপে স্বয়ং উপনীত হয়। অথবা উহা সাধনার ফলে নহে,—মা আমার দয়া করিয়া, স্নেহে মুগ্ধ হইয়া, আপনিই আসেন।

জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, সত্য প্রতিষ্ঠারূপ সরল পন্থা অবলম্বনে শ্রীগুরূপদিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইলে, অনায়াসে এই আশ্রমে উপস্থিত হওয়া যায়। এইখানে উপস্থিত হইয়া জীব বুঝিতে পারে—যাঁহার সাধনা করিতেছি, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছি, সে যে, 'আমি' রে! এতদিন এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারি নাই। এ আমারই অনুসন্ধানে আমি ছুটিতেছি; এই যে বুঝা, এই যে অনুভব, ইহার নাম মেধা এবং যেখানে উপস্থিত হইলে এইরূপ স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই স্থানের নাম মেধসাশ্রম। ইহাই বুদ্ধির ক্ষেত্র বা মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিযোগ-অবলম্বনের ইহাই অমৃতময় ফল! এই বুদ্ধি-যোগের মহত্ত্ব কীর্তন করিতে গিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা

পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এইস্থানে উহার ফল আরম্ভ হইয়াছে । তাই, প্রথমেই বলিয়াছি— গীতা ভিত্তি, এবং চণ্ডী তদুপরি অতুলনীয় প্রাসাদ । গীতা— সাধনা ; চণ্ডী —সিদ্ধি ।

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥১০॥

অনুবাদ । হে মুনিবর ! রাজা সুরথ সেই আশ্রমে মেধস কর্তৃক সৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণপূর্বক, কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । তৎকালে তিনি সেখানে মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া (বক্ষ্যমান) নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা । জীব বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মেধসাশ্রমে উপনীত হইলে, কিছুকাল তথায় অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, কারণ মেধস তাহাকে সৎকৃত করে—সৎস্বরূপের স্মৃতি উদ্‌বোধিত করিয়া দেয় । পূর্বে এই **'সৎ'** বোধটি থাকিয়াও যেন ছিল না ; কিন্তু এখানে বুদ্ধিজ্যোতির আলোকে—ধ্রুবাস্মৃতিরূপ মেধসের কৃপায় জীব বুঝিতে পারে 'আমি তিন কালেই সৎ বা সত্য' ! তাই, মন্ত্রস্থ **'সৎকৃতঃ'** পদটিতে অভূততদ্ভাব অর্থে লুপ্ত চ্বি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে ।

মা যখন জীবহৃদয়ে **'ব্রহ্মাস্মি'**— আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্রুবা স্মৃতির উদ্‌বোধ করিয়া দেন, তখন জীব এত আনন্দলাভ করে যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । মাত্র ঐ স্মরণটিও অত্যন্ত লোভনীয়—পরিহার করিতে ইচ্ছা হয় না । বহুজন্মব্যাপী জীবত্ব-ভারবহন এবং পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ ভোগ করিবার পর যখন জীব এই আশ্রমে—এই ব্রহ্মত্ববোধরূপ স্মৃতির নিকটে উপস্থিত হয়, যেখানে বোধে জীবত্ব নাই, জ্ঞানে ক্ষুদ্রত্ব নাই, আনন্দে সীমা নাই, মৃত্যু নামে ভয় নাই, প্রিয়বিরহ নামে শোক নাই, অনিষ্টপ্রাপ্তি নামে দুঃখ নাই, আছে শুধু সত্তা, আছে শুধু জ্ঞান, আছে শুধু আনন্দ, আর আছে—অখণ্ড পূর্ণ আত্মবোধ । সেইখানে যদি কোনও প্রকারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি আর সে স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় ? সুরথের কিন্তু এখন পর্যন্ত ঠিক এই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই । এই অবস্থার একটা স্মৃতিমাত্র চিরান্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে মুহূর্তের জন্য নক্ষত্রালোকের ন্যায় ফুটিয়াছে । সে যাহা হউক, এই সুখময়ী স্মৃতিটি জীবকে কিছুকাল আনন্দমুগ্ধ করিয়া রাখে । তাই, মন্ত্রে, **'কঞ্চিৎ কালং তস্থৌ'** বলা হইয়াছে ।

জীব এখানে আসিলে কেন এত মুগ্ধ হয় ? কেন মেধসাশ্রম সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না ? জীব যে এখানে সৎকৃত হয় ! এইখানে জীব বুঝিতে পারে— আমি 'সৎ' হইতে সঞ্জাত, 'সৎ'-এ নিত্য অবস্থিত এবং 'সৎ'ই আমার অবসানস্থান । আমি তিন কালেই নিত্য বর্তমান সৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি । প্রথমে যে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা সৎ-উপলব্ধির জন্য জীব চেষ্টা করে, (যাহা আমরা মৃগয়াচ্ছলে অশ্বারোহণে বনগমন কথাটির মধ্যে পাইয়াছি) উহা সাধনার প্রথম সূত্রপাত—নকল করিয়া সৎ-এর অনুসন্ধানমাত্র । ঐ নকল সত্যানুসন্ধানই আজ সাধককে ধ্রুবাস্মৃতির নিকট উপস্থিত করিয়াছে । এইখানেই সাধকের এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, 'আমি যত জন্ম-মৃত্যু ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করি না কেন, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ আমাকে যতই বিনাশশীলতার বিভীষিকা প্রদর্শন করাউক না কেন, আমি এক অখণ্ড নিত্য স্থির সত্তায় অধিষ্ঠিত' । সৎ-বস্তুটি যে সর্ববিধ পরিবর্তনের ভিতর নিত্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষতা লাভ হয় জীবের এইখানে —এই মেধসাশ্রমে । এই সৎ-এর অভিজ্ঞানের নামই মায়ের কোল । পূর্বে আমরা অনেক স্থানে 'মাতৃ -অঙ্কস্থিত শিশু' শব্দটির ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি ; তাহার তাৎপর্য এইস্থানে সাধকগণ বুঝিতে পারিবেন । যতদিন **'সৎকৃতঃ'** না হওয়া যায়, ততদিন অভয় মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না ।

সুরথের ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়াছে— জীবত্ব-অবসানের সময় আসিয়াছে ; তাই মাতৃ-লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছে । ভাববিরোধিতা—প্রজা-বিদ্রোহ ও অমাত্য বিরোধিতা সে আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে । সে আকুলপ্রাণে মাতৃ-লাভের আশায় ছুটিয়াছে ! তাই, আজ মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, নিত্য-সত্যের সন্ধান লাভরূপ **'সৎকৃত'** হইয়া ধন্য হইয়াছে । মা আমার ধ্রুবাস্মৃতিরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া

বলিয়া দিলেন— তুই যে সৎ । আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা— আর তুই জীবরূপী আমারই স্নেহের দুলাল পুত্র । যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে একবার মা বলিয়া ডাকিয়াছ, আর কি তোমায় অসৎ রাখিতে পারি ! পুত্র চাহিয়া দেখ—তুমি আমার অঙ্কে—নিত্য সত্যে চির অধিষ্ঠিত । তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বাল্য নাই, যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, জাতি নাই, বর্ণ নাই, অধর্ম নাই, ধর্ম নাই, কোনও পরিবর্তন, কোনও বিবর্ত, কোনও বিকার, কোনও ভ্রান্তি তোমাতে নাই । আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা তোমার । তুমি সচ্চিদানন্দময় পুত্র আমার ! আজ আমার মাত্র সৎস্বরূপটির উপলব্ধি কর । ক্রমে তোমার পিপাসার তীব্রতা-অনুসারে চিৎ এবং আনন্দস্বরূপও তোমার প্রতীতিযোগ্য করিয়া দিব, আমাতে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে, আমার স্নেহময় বক্ষে চিরতরে আশ্রয়লাভ করিবে, চিরতরে তোমার জীবত্ববোধ দূরীভূত হইবে, মুক্তিরূপ আমারই স্নেহাঞ্চলের অন্তরে চিরতরে নির্বিশঙ্কে অবস্থান করিবে । আর আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া, অসৎ মনে করিয়া, পরিণামী দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইও না । দেখ আমি—মা তোমার সকল অবসাদ দূর করিবার জন্য তোমাকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছি ।

সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাতে যাহা কল্পনামাত্র বলিয়া প্রতীত হইত, এখান হইতে তাহা যথার্থ সত্যরূপেই অনুভূত হইতে থাকে । যেহেতু, এই সৎ-জিনিষটি প্রত্যক্ষ । ইহা কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে হয় না । ইহা এত স্থূল, এত ঘন যে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের স্থূলতা যেন এই নিশ্চল সত্তার নিকট ছায়ামাত্র বলিয়া বোধ হয় । সাধনাজগতে অনুমান বা অপ্রতক্ষ্য যতদিন থাক, বুঝিতে হইবে—ততদিন যথার্থ সাধনার সূত্রপাত হয় নাই । ইহার প্রতিপদক্ষেপে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ, কিছু না কিছু লাভ হইবেই । যখন এইরূপ প্রত্যক্ষতা আসিতে থাকে, তখনই সাধনা সরস ও মধুময় হয় । তখন হইতে আর ইহাকে নীরস ও কষ্টসাধ্য কর্মবিশেষমাত্র মনে হয় না । তখন হইতে সাধকগণ দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকে ও অচিরে আত্মলাভে ধন্য হয় ।

যাহারা সাধনা করিতেছে, অথচ এ পর্যন্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তাহারা বুঝিবে—মৃতকর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে । কর্মকে চৈতন্যময় করিয়া লও, দেখিবে—সকলই মধুময়, সকলই সরস । মৃত সাধনা যে একেবারেই ফলপ্রদ হয় না, একথা আমরা কখনই বলি না ; কারণ জীবমাত্রই সাধক, কর্মমাত্রই সাধনা এবং সাধনারূপ সিদ্ধিলাভও অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু সাধক ! যদি তুমি অচিরে অর্থাৎ এই জীবনেই অমৃতের সন্ধান বা আস্বাদ পাইতে চাও, তবে সাধনাকে সজীব করিতে হইবে —প্রাণময় করিতে হইবে । সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সর্ববিধ সাধক-সম্প্রদায়ই যথার্থ অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে । স্ব স্ব সাধনার প্রণালীগুলিকে যদি সত্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই উহা আশাতীত ফল আনয়ন করিয়া থাকে । যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, সেই সাম্প্রদায়িক সাধনাই এক অদ্বিতীয় বস্তুলাভের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি তাহার মধ্যে সাধক প্রাণের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন । প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না । প্রাণ না পাইলে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না । যাঁহার সাধনা যত প্রাণময়, তাঁহার সাধনা তত শীঘ্র ফলপ্রসূ । প্রাণহীন সাধনা শবদেহমাত্র । শবদেহকে যতই বসন-ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হউক না কেন, সে যেমন কিছুতেই সৌন্দর্য-বিকাশ করিতে পারে না, বরং একটা মলিন ছায়াকে আরও ঘন করিয়া তোলে ; সেইরূপ প্রাণহীন কতকগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানরূপ সাধনা কখনও পরমাত্মপ্রকাশে সমর্থ হয় না ; বরং অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারকে আরও যেন নিবিড়তর করিয়া তোলে । বৃক্ষের শাখা-উপশাখা-কাণ্ড-মূল-ফুল-ফল-পত্রাদিরূপ বহুবিধ ভেদ, বহুবিধ নাম ও রূপের বিভিন্নতা থাকিলেও যে রসপ্রবাহটি বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা যেরূপ বৃক্ষের সর্বাবয়বে তুল্যরূপে অনুস্যূত, সাধনাক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ বুঝিবে । সম্প্রদায়গত, নামগত, আকারগত, আচারগত, অনুষ্ঠানগত, অসংখ্যভেদ ও বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, এবং থাকাও উচিত ; (কেন, তাহা পরে বলিব) কিন্তু ঐ বহু বিভিন্নতার মধ্যে, একটি অখণ্ড রসপ্রবাহ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ প্রাণ সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে । ঐ রস প্রবাহটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে সকল সাধনাই অভিন্ন ফলপ্রদ বলিয়া

প্রতীত হয়। শুধু এই সত্য জিনিষটাকে বাদ দিয়াই সাধকগণের মধ্যে নানারূপ সাম্প্রদায়িকতা, স্বমতের প্রাধান্যস্থাপন, পরমত-খণ্ডনে প্রয়াস প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়।

চারিটি বালক বিভিন্ন গ্রন্থকার-প্রণীত চারিখনি বর্ণপরিচয় পাঠ করিতেছে। কোন পুস্তকে 'অ' বর্ণটির ধারে একটি অশ্ব চিত্রিত রহিয়াছে, কোন পুস্তকে অজগর সর্প চিত্রিত আছে, কোন পুস্তকে অলাবুর ছবি আছে, আবার কোন পুস্তকে একটি অজার ছবি আছে। বালকগণ ছবি দেখিয়া 'অ' বর্ণটি শিক্ষা করিবে, অকারের আকৃতিটি মনে রাখিবে,—ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; কিন্তু বালকগণ ঐ অকার বর্ণটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অথবা কালী দিয়া অদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। তারপর চারিজনে মহাঝগড়া। একজন বলে—আমার বই ভাল, ইহাতে ঘোড়ার ছবি আছে, দেখ ত' কেমন সুন্দর! আর একজন বলে— না না আমার বইখানা ভাল; এই দেখ, কেমন অজগরের ছবি আছে। আর একজন বলে—ওরে তা নয়, আমার বইতে আছে অলাবু। অলাবু কি জান—লাউ! কেমন উৎকৃষ্ট তরকারি! আর একজন বলে—যা যা তোদের সবার চাইতে আমার বইখানা বেশী ভাল—কেমন ছবিটি। এই দেখ, অজার ছবি আছে। অজা তা কি জান? অজা মানে ছাগী। আমাদের ধর্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাও এইরূপ। যেটি উদ্দেশ্য—যাহা লক্ষ্য, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু বাহিরের আবরণ নিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতেছে।

সাধনার বা জীবের লক্ষ্য—সচ্চিদানন্দ-লাভ। সচ্চিদানন্দই জীবের স্বরূপ! যে কোন কারণেই হউক, আমরা অসৎ, অচিৎ এবং নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। সর্বদা মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত,— পাছে আমার অস্তিত্বলোপ হয়, এই আশঙ্কা জীবমাত্রেরই আছে; সুতরাং অসৎ। আমাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না; সুতরাং অচিৎ। আমরা যে আনন্দভোগ করি, উহা দুঃখমিশ্রিত; সুতরাং নিরানন্দ। জীবমাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধিতে যাইতে হইবে, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্য। ঐ স্বরূপটি অপর কোনও স্থান হইতে ধার করিয়া বা চাহিয়া আনিতে হয় না, উহা প্রত্যেকেরই অন্তরে যেন লুক্কায়িত আছে। সেই অপ্রকট ব্রহ্মভাবকে প্রকাশিত করার নাম সাধনা। সকল জীবই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই সাধনাই করিতেছে। যেহেতু, সকলেই চায়—আমার অস্তিত্ব যেন লোপ না পায়—আমি যেন অনন্তকাল থাকি; ইহারই নাম সৎ-এর উপাসনা। তারপর এমন অস্তিত্ব আমরা চাই না, যে অস্তিত্ব জানিতে পারিব না। যদি কেহ বলে—'তুমি চিরকাল থাকিবে; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে না যে তুমি আছ', তবে আমরা তেমন থাকাটি চাই না। আমরা চাই—'আমি চিরকাল থাকিব এবং বুঝিতে পারিব যে আমি আছি'। ইহার নাম চিৎ-এর সাধনা। তারপর সেই থাকাটি যদি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হয়, তবে সেইরূপ থাকাও চাই না; সুতরাং আমরা চাই—'আমি থাকিব', আমি বুঝিব যে, 'আমি আছি', এবং আমার থাকাটি 'আনন্দময়' হইবে। এইরূপে প্রত্যেক জীবই সচ্চিদানন্দের অন্বেষী। কেহ মদ্যপান করিয়া, কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া, কেহ নিষ্ঠুরতা করিয়া ঐ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ বা সেবা করিতেছে; আবাার কেহ বা দয়া-ক্ষমা-উদারতা-ভগবৎপ্রীতি কিংবা সাধনভজন দ্বারা সচ্চিদানন্দের সেবা করিতেছে; সুতরাং জীবমাত্রেই সাধক এবং কর্মমাত্রই সাধনা। ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। যতদিন ইহা না জানিয়া কর্ম করে, ততদিন মানুষ সাধারণ জীবমাত্র; আর যখন ইহা বুঝিয়া কর্ম করিতে থাকে, তখন সে সাধক নামে অভিহিত হয়। সাধারণ জীবে ও সাধকে এই প্রভেদ। যে ব্যক্তি আপনাকে সাধক বলিয়া মনে করেন, অথচ জ্ঞানতঃ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ করেন না, তাঁহার সেই সাধনাকে জাগতিক কার্য অপেক্ষা উন্নত আসন দেওয়া যায় কি? তাই বলিতেছিলাম—সর্ববিধ সাধনার অন্তর্নিহিত ঐ সচ্চিদানন্দরূপ রসপ্রবাহটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কেহ কঠোর তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, অথচ এই সচ্চিদানন্দের সন্ধান পান নাই —আপন অমরত্ব, নিত্যত্ব, আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; যদি এরূপ আমরা দেখিতে পাই, তবে বুঝিব—তিনি লক্ষ্যহীন হইয়া বা উদ্দেশ্য ভুলিয়া মাত্র তপস্যার জন্য বা সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন।

জীব যখন জানিয়া শুনিয়া সাধনার প্রাণ এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের সন্ধানে আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে,

তখন সর্বপ্রথম সৎস্বরূপটি প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে। এই প্রথম স্বরূপটির উপলব্ধিতে জীব একটি অখণ্ড নিত্য সত্তার সন্ধান পায়। ইহাই মন্ত্রে **'সৎকৃত'** শব্দটি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক তাহার সাধনার প্রণালীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাণময় বা রসময় করিয়া, এই অখণ্ড সৎ-বস্তুটির সন্ধান পাইতে পারেন। আচারভেদে ও অনুষ্ঠানভেদে সাধনার যে বিভিন্ন প্রকার ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, উহা অজ্ঞান-মূলক। এই স্থলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনার ক্রমগুলি উল্লেখ করিয়া তাহার মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার উপায় দেখাইয়া দিতে গেলে পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে; তাই নিরস্ত হইতে হইল। অথবা পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ কখনও সাধনার রহস্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। বিনীতভাবে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গুরুমুখ হইতে উহা শ্রবণ করিতে হয়; এবং গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তবেই সাধনা আশানুরূপ ফলবতী হয়। নচেৎ মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় কেহ কোনদিন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। সকল কথা পুস্তকে লিখিয়া প্রকাশ করায় কোন বিশেষ ফল হয় না বলিয়াই অনেক স্থলে নিরস্ত হইতে হয়।— কিঞ্চ —ফললাভ ত' হয়ই না বরং অপাত্রে প্রযুক্ত হইয়া গুরু ও বেদান্তবাক্যের অবমাননা হয়। সেইজন্যই পূজ্যপাদ ঋষিগণ ভূয়োভূয়ঃ অধিকারভেদে সাধনরহস্য আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যিনি এই অধিকারগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের সূক্ষ্ম দেহটি পর্যন্ত পরিদর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ উপদেষ্টা, তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরু।

যাহা হউক, আমরা সাধনার অবান্তর কথা নিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি — পুনরায় প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হওয়া যাউক। মেধসকর্তৃক সৎকৃত হইয়া, সুরথ কিছুকাল সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থলে ঐ **'কঞ্চিৎকালম্'** কথাটির মধ্যে একটু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বহু সৌভাগ্যের ফলে, বহু প্রাণপাত তপস্যার বলে জীব মহত্ত্বের সন্ধান পায়, সৎকৃত হয়, অখণ্ডৈকরস-সত্তার সন্ধান পায়। তবে এমন ক্ষেত্রে আসিয়াও 'কঞ্চিৎ কালং' কেন? চিরকাল এখানে কেন থাকে না? না—তাহা কেহই পারে না। যতদিন দেহ থাকে, ততদিন সে ক্ষেত্রে কেহই নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করিতে পারে না। বহু জন্মসঞ্চিত সংস্কারবশে আবার দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করিতেই হয়; কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্যও বুদ্ধিময়-ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, যে অমরত্বের স্মৃতি, যে অপরিসীম আনন্দের আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই জীব ধন্য হয়! সেই তিলার্দ্ধকাল-মাত্র-ভোগ্য সচ্চিদানন্দের সুখময়ী স্মৃতিটুকুও মানুষকে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখে। তখন হইতেই সাধকের জীবন উৎসাহময় এবং কর্মসমূহ মধুময় হয়। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বে অবস্থানকালের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন ইচ্ছামাত্রেই অনতি প্রযত্নে এই মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইতে পারে এবং **'ব্রহ্মাস্মি'** এই স্মৃতি ঘনীভূত হওয়ায়, সাধক-জীবনে দেবভাবীয় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

ইতশ্চেতশ্চ বিচরন্—মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও সুরথ এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। মহৎতত্ত্বে উপনীত হইয়া, সেই শুভ্র শান্তি নির্মল উদাসীন বুদ্ধিজ্যোতিতে অবগাহন করিয়াও জীব প্রারব্ধবশে সে স্থান হইতে মনোময় ক্ষেত্রে কিংবা অন্নময় কোষে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। বেশী সময় অতি সূক্ষ্মক্ষেত্রে অবস্থান করিতে না পারার হেতু— স্থূলাভিমানিতা। বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমার স্থূল বিষয়ের অবলম্বনে আত্মবোধ উদীপ্ত করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। যদি কোনদিন এই নামরূপবিশিষ্ট স্থূলভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর স্তরে আরোহণ করিতে হয়, তবে প্রথম প্রথম যেন একটা অস্বস্তিভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ না আবার স্থূলের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, ততক্ষণ যেন দম আটকাইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তাই, এক একবার সূক্ষ্মতত্ত্বে আরোহণ করিলেও পুনঃপুনঃ স্থূল কোষগুলিতে বিচরণ করিতে হয়। ইহাই সুরথের ইতস্ততঃ বিচরণ।

বুদ্ধিযোগের সাহায্যে প্রত্যেক স্থূল পদার্থে মাতৃসত্তা-দর্শনের ফলে হঠাৎ একদিন বুদ্ধিময় জ্যোতির প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধক সে জ্যোতিতে প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে না পারিয়া, আবার দেহবুদ্ধিতে

নামিয়া পড়ে ; কারণ নীচের দিকে যে এক মণ ভার বাঁধা রহিয়াছে। ভগবানের ওজন—একমন—সম্পূর্ণ মনটি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবত্বের অবসান হয়। যতদিন উহা পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন একটু একটু করিয়া বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে হয়। পূর্ণভাবে মনটিকে গ্রাস করিবার জন্যই মা আমার স্নেহের সন্তানকে লইয়া এইরূপ দোলখেলা করিয়া থাকেন। একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ আবার পরক্ষণেই দেহাত্মবুদ্ধিতে অবরোহণ। যখন জীব এই আরোহণ-অবরোহণরূপ মায়ের আনন্দক্রীড়ার অনুভব করিতে থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয়। সাধক মনে কর—তুমি এক একবার আকুল প্রাণে মা মা বলিয়া মায়ের কোলে উঠিতেছ, জীবভাবীয় সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হইয়া, অসীম আনন্দ-জলধি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছ ; আবার পরক্ষণেই জীবত্ববোধে নামিয়া পড়িয়াছ। একবার মনে হইতেছে, তুমি স্বর্গেরও উচ্চে উঠিয়াছ, আবার হয়ত পরক্ষণেই নিজের নীচতা, হীনতা দেখিয়া, আপনাকে নরকের জীব বলিয়া মনে করিতেছ। এইরূপ সমস্যাপূর্ণ অবস্থার নামই মেধসের আশ্রমে সুরথের ইতস্ততঃ বিচরণ। পরবর্তী মন্ত্রে ইহা আরও বিশদ ভাবে বলা হইবে। যাহা হউক, সাধক যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার মর্ম্মস্থান যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। যতদিন অন্ধকারে থাকে, ততদিন আলোকের আনন্দ বুঝিতে পারে না ; কিন্তু একবার আলো দেখিয়া, আবার অন্ধকারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। আলো যত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, অন্ধকারও যেন ততই অধিক গাঢ় হয়। যত মাকে পাইতে থাকে, ততই যেন না পাওয়াটা তীব্রভাবে বোধে আসিতে থাকে ; তখনই অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় আসিয়া সাধকগণ কখন কখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন ; কিন্তু ইহাতে হতাশের কোন কারণ নাই ; ইহা মাতা পুত্রের আনন্দলীলা। একবার মা তোমার হাত ধরিয়া দাঁড়া করিয়া দিলেন। মা যে তোমাকে আপন পায়ে চলিতে শিখাইবেন ; তাই হঠাৎ হাতখানা সরাইয়া লইলেন, তুমি পড়িয়া গেলে ; আছাড় খাইলে ব্যথা পাইলে। আবার মা আসিয়া হাসিতে হাসিতে হাত ধরিয়া তুলিলেন, তুমি আনন্দে বিভোর হইলে মা আবার হাতখানি সরাইয়া লইলেন। এইরূপ মাতা-পুত্রের আনন্দ-লীলা যে কত মধুময় এবং সমকালীন কত বিষাদময়, তাহা সাধকমাত্রেই অবগত আছেন। মাকে যাহারা সর্বভাবে সর্বরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা এইরূপ আনন্দ-লীলা করিবার জন্য প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকেন। কি উপায়ে সহজে মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, এই মাতা-পুত্রের আনন্দ ক্রীড়া সম্ভোগ করা যায়, তাহা মা-ই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া বুঝাইয়া দেন।

সোঽচিন্তয়ৎ—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের বলে যখন জীবের এমন একটা অবস্থা আসে যে, কিছুকাল সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিবার সামর্থ্য হয় ; তখনও আবার মমত্ববোধে আকৃষ্ট হইয়া—প্রারব্ধ সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, নানারূপ স্থূল বিষয়ক চিন্তা আসিতে থাকে! বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয়। প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া, বিষয় ভুলিয়া, সেই মোহন বুদ্ধিজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে ; ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বে অবস্থানের কাল যত দীর্ঘ হইতে থাকে ততই সেখানে থাকিয়াও স্থূল দেহাদি-বিষয়ক চিন্তা যেন আপনা হইতে উপস্থিত হইতে থাকে। বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যদি সহসা মুক্ত আকাশমার্গে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়, তথাপি যেরূপ সে বেশী দূরে না গিয়া, আবার সেই চিরাভ্যস্ত বাসস্থান—পিঞ্জরটিতে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ বহু দিন দেহাত্মবোধে আবদ্ধ জীব যদি মাতৃ-কৃপায় সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহের সন্ধান পায়, তথাপি তাহাতে সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। চিরচঞ্চল, চিরমলিন জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রের সে বিশালতা, সে নির্মলতা, সেই উদাসীনভাব, সেই বজ্রবৎ কঠোরতা, সেই পর্বতবৎ স্থিরতা, অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। আবার দেহাদি-বিষয়ক স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইতে থাকে। অথবা মা আমার দয়া করিয়াই এইরূপে একবার নীচের দিকে, একবার উপরের দিকে গমনাগমন করাইয়া, প্রাণের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সাধকের বলবৃদ্ধি করিয়া, বিশালতার দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ করিয়া দেন।

———○———

মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্মতঃপাল্যতে ন বা ॥১১॥

অনুবাদ—আমার পূর্ববর্তিগণ যে পুরকে পূর্বে যত্ন-পূর্বক প্রতিপালন করিতেন, সেই পুর অধুনা আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত। অসদ্‌বৃত্ত ভৃত্যগণ আমার সেই পুরকে ধর্মনুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না ?

ব্যাখ্যা । মেধসাশ্রমে অবস্থানকালে সুরথ প্রারব্ধ সংস্কারবশতঃ দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধির প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, যে সকল চিন্তা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে, তাহাই চারটি মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে । মানুষমাত্রেরই ঐরূপ চিন্তা করা একান্ত স্বাভাবিক । নির্মল বুদ্ধি-জ্যোতিতে অবস্থানকাল অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘ হইলেই সর্বপ্রথমে পুর-বিষয়ক চিন্তা হয় । পুর শব্দের অর্থ দেহ । এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে জীবাত্মা অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহাকে পুরুষ কহে । জীবাত্মা এই দেহপুর পরিত্যাগ-পূর্বক বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে । প্রশান্ত উদার বুদ্ধিজ্যোতি-দর্শনে সর্ববিধ সঙ্কোচ কিছু কালের জন্য দূরীভূত হইয়াছে ; কিন্তু বহুজন্মসঞ্চিত দেহাদির প্রতি মমত্ববোধ বিদূরিত হয় নাই । যতদিন চণ্ডীতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত না হয়—যতদিন শুম্ভ বধ পরিসমাপ্ত না হয়—যতদিন ত্রিবিধ কর্ম-ফল সমূলে বিধ্বস্ত না হয়, ততদিন মমতার উচ্ছেদ পূর্ণভাবে হয় না । যতদিন দেহ আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, মমতা নিশ্চয়ই আছে । জীবের যখন এই মমতার প্রতি দোষদর্শন উপস্থিত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—শীঘ্রই মমতার মূল বিধ্বস্ত হইবে । মানুষ যখন নিজের দোষ নিজে ঠিক ঠিক ধরিতে পারে, তখনই বুঝা যায়—তাহার দোষ সংশোধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ।

জীব বুদ্ধিযোগের অব্যর্থ ফলে দেহ হইতে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া বুদ্ধিতে বিন্যস্ত করিয়াও দেহাদি-বিষয়ক স্মৃতি দ্বারা বিব্রত হয় । তাই, সুরথ মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়াও চিন্তা করিতেছেন—**'মৎ পূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ'** । পূর্ব পূর্ব অসংখ্য জন্মকৃত দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা যে দেহপুরকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, অধুনা আমার বড় সাধের সেই দেহপুরটি আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল ! জানি না—আমার সেই অসদ্‌বৃত্ত ভৃত্যগণ—ইন্দ্রিয়সমূহ এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরকে ধর্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কিনা ?

আমরা মৃত্যুর পরই যে, আবার একটি দেহ গঠন করিয়া লইতে পারি, তাহার একমাত্র কারণ—পূর্ব পূর্ব জন্মের দেহবিষয়ক দৃঢ়সঙ্কল্প । মৃত্যুকালে যেন অতি অনিচ্ছায় অতি প্রিয় এই দেহটি পরিত্যাগ করি এবং অপর একটি দেহলাভের জন্য তীব্র বাসনা লইয়া প্রয়াণ করি । তাই, অনায়াসে পূর্বসঙ্কল্পবশে অভিনব দেহ রচিত হয় । পূর্ব পূর্ব জন্মের দেহাত্মবোধদ্বারাই দেহ গঠিত এবং পরিপুষ্ট হয় । তাই, **'মৎপূর্বৈঃ পালিতম্'** বলা হইয়াছে ।

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম । আমাদের শাস্ত্রে যে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহার কারণ—দেহবিষয়ক তীব্র বাসনার অভাব । আত্মঘাতীর মৃত্যুকালে দেহের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ উপস্থিত হয় ; সেইজন্যই মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল যাবৎ আর সে দেহবিষয়ক বাসনা উদ্দীপ্ত করিতে পারে না । প্রেত-দেহ বা আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে । জীবিতকালের সঞ্চিত সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে, অথচ স্থূল দেহের অভাবে একটি বাসনাও পূর্ণ করিতে পারে না ; তীব্র যন্ত্রণায় তাহাকে কালাতিপাত করিতে হয় । শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্যসমূহ পরলোকগত জীবাত্মার শীঘ্র ভোগদেহ-সম্পাদনের পক্ষে (অর্থাৎ প্রেতলোক পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় ভোগ-ক্ষেত্র-লাভের) বিশেষ সহায় হয় ; কিন্তু আত্মঘাতীর পক্ষে ভোগ-দেহের প্রতি তীব্র বিদ্বেষবশতঃ তদুদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিন্দুমাত্র উপকারক হয় না । সেইজন্যই শাস্ত্রে আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে । তবে যদি কোন সত্যদর্শী সাধক আত্মঘাতীর পাপক্ষয়-উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুনরায় যাহাতে ভোগদেহ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে প্রায়শ্চিত্ত এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবেই উহার প্রেতলোক হইতে নিষ্কৃতলাভ সম্ভব । যাহারা স্বাভাবিকভাবে রোগাদির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহবিষয়ক আসক্তি প্রবলভাবে চিত্তক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই যেন প্রিয়তম দেহটি ছাড়িয়া যাইতে চায় না ; এই প্রবল আসক্তিই মৃত্যুর পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ভোগয়তনস্বরূপ একটি দেহের গঠন

করিয়া লয় । ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি তাহার সেই ভোগদেহ-লাভের সহায়তা করে ।

যাহা হউক, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও জীব অনাদিজন্মসঞ্চিত মমতায় বাধ্য হইয়া, অতি যত্নে প্রতিপালিত দেহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় কিছুকালের জন্য দেহ হইতে আত্মবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয় বলিয়া, মনে করে— **'ময়া হীনং পুরং হি তৎ'** —আমি সেই দেহপুর পরিত্যাগ করিলাম । আমার অসদ্বৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত দেহপুরকে যথারীতি প্রতিপালন করিতেছে কিনা ? ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়সমূহ বহন করিয়া আনিয়া প্রতিনিয়ত দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের দ্বারা দেহের পরিপোষণ না হইয়া, মনেরই পরিপুষ্টি হয় ; তথাপি দেহাভিমানবশতঃ মনের যাবতীয় পুষ্টি স্থূল দেহের পরিপোষণেই পরিব্যয়িত হয় । সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণকে দেহের প্রতিপালক বলা যায় । ইন্দ্রিয়গণ অসদ্বৃত্ত । অসৎ শব্দের অর্থ—সৎ-বিরোধী কোনও বস্তু-বিশেষ নহে ; কারণ, এক সৎবস্তু ব্যতীত অপর কোন সত্তাই নাই । গীতায় ভগবান বলিয়াছেন **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** । অসৎ নামে কোন বস্তু নাই । এখানে নঞ্‌টি অল্পার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এক অখণ্ড সৎবস্তু যখন ঈষৎভাবে বা অল্পভাবে প্রকাশিত হন , তখনই তাঁহাকে অসৎ বলা হয় । নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে সৎ-এর যে একরূপ বিকাশ বা লীলা, তাহাই অসৎ-পদবাচ্য । ইন্দ্রিয়সমূহ নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিমুগ্ধ ; সুতরাং অসদ্বৃত্ত । আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে, উহাতে আমাদের অসৎভাবই পরিপুষ্ট হয় ; কারণ বিষয়সমূহ অসৎ । যতদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে বিষয়মাত্র-বোধে গ্রহণ করে, ততদিন এই দেহ ধর্মানুসারে প্রতিপালিত হয় না । অসৎকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ না করিলে 'সৎ'-এর সন্ধান পাওয়া যায় না । 'সৎ'-এর সন্ধান না পাইলে, জীবের নশ্বরতাবোধ অপনীত হয় না, মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না ।

সুরথ(জীব) মেধস কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে, যথার্থ সৎবস্তুর সন্ধান পাইয়াছে ; তাই এখন বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে অসদ্বৃত্ত বলিয়া বুঝিতে পরিয়াছে । যাহারা প্রতিনিয়ত অসদ্‌ভাবেই —পরিচ্ছিন্ন ভাবেই বর্তমান থাকে, তাহারাই অসদ্‌বৃত্ত । সে যাহা হউক, এইখানে আসিয়াই জীব বুঝিতে পারে—যে চক্ষু বিশ্বরূপে ভগবৎরূপ দেখিতে না পায়, সে চক্ষুদুইটি ময়ূর-পুচ্ছমাত্র ; যে কর্ণ শব্দমাত্রকে মাতৃ-আহ্বান বলিয়া গ্রহণ না করে, সে কর্ণ দুইটি ছিদ্রমাত্র ; যে নাসিকা পুণ্য-গন্ধ-গ্রহণে মাতৃ-অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ না করে, সে নাসিকা প্রতিনিয়ত ভস্ত্রার ন্যায় (কামারের হাপর) বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে ; যে জিহ্বা সর্বদা মাতৃ-নাম উচ্চারণে বিমুখ, তাহা ভেকরসনার ন্যায় নিন্দনীয় ; যে ত্বক সমীরণরূপ মাতৃ-স্পর্শে কণ্টকিত না হয়, সে ত্বক দেহের বৃথা আবরণমাত্র ।

এইরূপ বিষয়মুগ্ধ ইন্দ্রিয়রূপী ভৃত্যগণ অসদ্‌বৃত্ত । তাহারা ধর্মতঃ দেহের পরিপোষণ করে না, প্রতিনিয়ত অসদ্‌ভাবের পোষণ করে ; সুতরাং ঐ পোষণ শোষণেরই রূপান্তরমাত্র—প্রতিমুহূর্তে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে । বুদ্ধিতত্ত্বে আরূঢ় জীবের ইচ্ছা—আমি যেরূপ সৎবস্তুর সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি আমার ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ হউক । কেন অসদ্‌বৃত্ত থাকিবে ? তাহারা কেন আর বিষয়কে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমার অতি প্রিয়তম ভোগায়তন ক্ষেত্রটিকে অসদ্‌ভাবে পরিপুষ্ট ও অপবিত্র করিবে ? 'সৎ'-এর সন্ধান পাইলেই এই সকল চিন্তা স্বভাবতঃ জীবের মানসক্ষেত্রে উদিত হয় ।

———○———

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১২॥

অনুবাদ । আমার সেই প্রসিদ্ধ সর্বপ্রধান সর্বদা গর্বিত অতি বিক্রমশালী (দেহাভিমানরূপ) হস্তী এখন আমার শত্রুর বশতাপন্ন হইয়া, কিরূপ ভোগ্যবস্তু লাভ করিবে, তাহা জানি না ।

ব্যাখ্যা । দেহবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই 'অহং' বৃত্তি-বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হয় । অভিমান সকল বৃত্তির প্রধান কারণ, অভিমান না থাকিলে, দেহ থাকে না । আমরা সর্বদা —'আমি দেহী' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকি বলিয়াই দেহটি ক্রিয়াশীল থাকে । যে মুহূর্তে এই

দেহাভিমান রুদ্ধ হয়, (একেবারে লোপ পায় না) সেই মুহূর্তে দেহ নিশ্চল হইয়া পড়ে। এইজন্যই চতুর্দশ করণের মধ্যে অহং-কারেরই প্রাধান্য, তাই মন্ত্রে, 'প্রধান' বলা হইয়াছে। তারপর—এই দেহাভিমান কখনও একেবারে বিদূরিত হইতে চায় না, আপনভাবেই মত্ত থাকে। এইরূপ সে দেহাত্মবোধে নিয়ত আনন্দ ও গর্ব অনুভব করে বলিয়াই মন্ত্রে 'সদা-মদ' শব্দটি উক্ত হইয়াছে। এই দেহাভিমানকে বলি দেওয়া বা নির্জিত করা বড় দুরূহ ব্যাপার ; তাই, ইহাকে 'শূর' বলা হইয়াছে। এই 'অহংকার' অজ্ঞানমাত্র ; তাই 'হস্তী' নামে অভিহিত হইয়াছে। হস্তী যেরূপ অমিত বলসম্পন্ন হইয়াও দুর্বল মানবের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, বুঝিতে পারে না যে, আত্মবল কত ; সেইরূপ এই 'আমিও' একদিন অমিত বলসম্পন্ন ছিল, যে দিন বিরাট্ আমিরূপে —পরমেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তৃত্ব নিয়া ছিল, —যে দিন স্বাধীন ইচ্ছায় বহুত্ব-লীলার অভিলাষ করিয়া ছিল। সেই মহান 'আমি' আজ অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মাংসপিণ্ডময় দেহ মাত্রে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত বল, সমস্ত শক্তি বিস্মৃত হইয়াছে। দেহের দাসত্ব—বিষয়ের সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত আছে ; সুতরাং ইহাকে হস্তিমূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও, প্রথম প্রথম এইরূপ দেহাভিমানবিষয়ক চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বহুজন্মের সংস্কার সহজে বিদূরিত হইতে চায় না। এরূপ স্থলে জীবের প্রধান চিন্তা ঐ হস্তীটির ভোগের জন্য।—**'কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে'** ; কারণ, জীব জানে —এই অহং-এর ভোগ বড় বেশী ; কিছুতেই ইহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। সে যাহা পায়, তাহাই আয়ত্ত করিবার জন্য নিয়ত লোলুপ ! সম্মুখে দেখিল—অত্যুচ্চ রাজ-প্রাসাদ ; অমনি অহং—সেই শূরহস্তী বলিয়া উঠিল —'উহাই চাই'। হয়ত ঐ ক্ষুধাটির নিবৃত্তি করিতে জীবের দশবার জন্মমৃত্যু-যাতনা সহ্য করিতে হইল। তারপর সম্মুখে দেখিল স্বর্গসুখ বিরাজিত, অমনি—'উহা চাই'। কিংবা সম্মুখে দেখিল অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সুশোভিত ; অমনি—'আমি উহা চাই'। এ সব ত' বড় খাদ্য ! এ সকল খাদ্য সংগ্রহ করিতে জীবকে যে কত শতবার জন্মমৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতে হয়, তাহা কে নির্ণয় করিবে ? এ সকল বিপুল খাদ্য ব্যতীত কাম, কাঞ্চন, যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, কত কি যে ইহার খাদ্য আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? এই সর্বগ্রাসী আমিটিকে 'আর চাই না' বলানো বড় সহজ ব্যাপার নহে ! যত দিন মায়ের আমার অনিন্দ্য-সুন্দর চিদ্‌ঘন মোহন মূর্তিটি দেখিতে না পায়, তত দিন কিছুতেই ইহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। **'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'**—যাঁহাকে পাইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, একমাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই, ইহার ভোগের অবসান হয় ; নতুবা অন্য কিছুতেই হয় না। এই হস্তীটির ভোগ নিষ্পন্ন করিবার জন্যই জীবের যত কিছু আয়োজন—যত কিছু উৎপীড়ন। তাই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও হস্তীটির ভোগ সম্পন্ন হইল কি না, এই চিন্তা দ্বারা জীবকে আকুল হইতে হয়। জীব ! একবার তোমার দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অহংটির দিকে চাহিয়া দেখ। উহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে উন্মাদের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাইয়া লইতেছে ; জন্ম হইতে জন্মান্তরে সমানীত করিতেছে ; মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে ধাবিত করিতেছে। উহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য কত জীবন পরিব্যয়িত করিতেছ, অথচ কি করিলে উহার ভোগের — আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না। 'সঃ'-এর নিকট অহংকে উপস্থিত কর, উহার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিবে। মাতৃ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাও, নিত্যানন্দময়ীকে দেখাও, নিত্য-নূতন আশার অবসান হইবে। জগদ্‌গ্রাসী ভাব— জলন্ত বুভুক্ষা চিরতরে নির্বাপিত হইবে। তখন এই আমিই 'ব্রহ্মাহমস্মি' বলিয়া সর্ববিধ শোক মোহের পরপারে চলিয়া যাইবে—সর্ববিধ ভোগের অবসান হইবে।

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১৩॥

অনুবাদ। যাহারা (কর্মকাণ্ড) পূর্বে প্রসাদ, ধন এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনুগত ছিল ; অধুনা নিশ্চয়ই তাহারা অন্য মহীপালগণের আনুগত্য করিতেছে।

ব্যখ্যা। দেহাভিমানবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকাণ্ডবিষয়ক চিন্তার উপস্থিত হয়। জ্ঞানের উন্মেষ

হইলেই কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তির মূল শিথিল হইতে থাকে ; অথচ বহুজন্মসঞ্চিত সেই অনুরাগ একেবারে দূরীভূত হয় না। তাই, উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও বৈধকর্মবিষয়ক চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

প্রসাদ, ধন এবং ভোজন—এই তিনটি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া, শাস্ত্রীয় আদেশগুলি আমাদের বিশেষ অনুগত বা অনুকূল! প্রসাদ শব্দের অর্থ—চিত্তের প্রসন্নতা। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, হোম, জপ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়। কাম কাঞ্চনের সেবা করিয়া, জীব যে তৃপ্তি ভোগ করে, তদপেক্ষা একটু বিশিষ্ট তৃপ্তির সন্ধান পায় বলিয়াই, মানুষ শাস্ত্রীয় আদেশগুলি যথাসাধ্য পালন করিতে উদ্যত হয়। ধন শব্দের অর্থ—সিদ্ধিশক্তি প্রভৃতি মাতৃ-বিভূতি—ঐহিক উন্নতি, অনভীষ্টের অপ্রাপ্তি, পারত্রিক স্বর্গাদি সুখ, কিংবা মাতৃ-প্রীতি অথবা মুক্তি। ইহার কোন না কোনও ফল অর্থাৎ ধনলাভের আশা থাকে বলিয়াই মানুষ বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করে। ভোজন শব্দের অর্থ মাতৃ-সঙ্গভোগ এবং পঞ্চ কোষের আহার। প্রথম প্রথম বিশিষ্ট কর্মের সাহায্যেই মাতৃ-সম্ভোগের অভ্যাস করিতে হয়। যতদিন **'সর্বতঃ সংপ্লুতোদক'** না হয়—যতদিন সর্বভাবে সর্ববস্তুতে সর্বেশ্বরী মূর্তির দর্শন না হয়, যতদিন মাতৃ-করুণা-মহার্ণবে পূর্ণভাবে অবগাহন করিতে পারা না যায়, ততদিন বিশেষ বিশেষ কর্মের অনুষ্ঠানরূপ কূপাদি জলাশয় খনন করিয়া, পিপাসা-নিবৃত্তি বা মাতৃ-সঙ্গ ভোগ করিতে হয়। সেইজন্যই পূর্বাচার্যগণ প্রতিমাসেই নানারূপ পূজা পার্বণের ব্যবস্থা করিয়া, আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এক দিকে এই বৈধকর্মাদি যেরূপ সাময়িক মাতৃ-সম্ভোগের সহায়, অন্যদিকে উহারা সেইরূপ আমাদের সর্বাবয়বেরই পরিপুষ্টি বিধান করে—আহার দেয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রিয়মান বৈধকর্মসমূহ দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের পোষণ করে। শাস্ত্রীয় আদেশগুলি যথাশক্তি প্রতিপালন করিলে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহাই অন্নময় ও প্রাণময় কোষের আহার। ঐ সকল কর্ম মানসিক প্রসন্নতা ও স্থৈর্যের বিশেষ অনুকূল—আত্মাভিমুখী চিন্তাশক্তির সহায়তা করে ; সুতরাং জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত হয়। যে পরিমাণে জ্ঞান অধিগত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে আনন্দ বা শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে বৈধকর্মসমূহ আমাদের পঞ্চ কোষেরই ভোজন বা পুষ্টিবর্দ্ধন।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক যে, দিন দিন বৈধকর্মাদির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার প্রধান হেতু—এই তিনটির প্রতি লক্ষ্যহীনতা। বিধি-নিষেধগুলির মধ্যে যে অপূর্ব চিত্তপ্রসাদ আছে, সিদ্ধি-শক্তিরূপ ধন আছে এবং মাতৃ-সম্ভোগের আনন্দ ও পঞ্চ কোষের পুষ্টিবিধান আছে, ইহা যদি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে কেহই উহাতে বিমুখ হইবেন না। আধুনিক পুরোহিতগণ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন বটে ; কিন্তু উহার ভিতর এই তিনটির একটিরও সন্ধান রাখেন না। একটা মৃত কর্ম, অভ্যাসানুযায়ী কতকগুলি মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—করিয়া যান ; সুতরাং যজমানগণও কর্ম-কাণ্ডের যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকলাপ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। তাহারই ফলে রোগ, শোক, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপাতে দেশ জর্জরীভূত হইতেছে।

এখনও গৃহে গৃহে দেবপূজা হয়, এখনও বহুসংখ্যক নরনারী ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে ; কিন্তু ঐ প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দিকে লক্ষ্য নাই বলিয়াই অনেক স্থলে আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেহ বলেন—কলিকালে শাস্ত্রীয় কর্মসমূহের যথোক্ত ফললাভ হয় না। কেহ বলেন—কর্ম অজ্ঞানের অনুষ্ঠেয়। কেহ বলেন নামকীর্তন ভিন্ন অন্য কর্ম কলিযুগে নিস্ফল। এই অসংখ্য মতবাদ শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, এখন—এই কলিযুগেও বৈধকর্ম সম্পূর্ণ সফল, এখনও দেবকার্যে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয় এবং সাধকও অভীষ্ট বর লাভে ধন্য হয়। কিন্তু সে অন্য কথা—

মা আমার শঙ্কররূপে আবির্ভূত হইয়া কর্মকে অজ্ঞানমাত্র প্রতিপাদন করিলেন ; আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়া কর্মকাণ্ডের অনাবশ্যকতা কীর্তন করিলেন ; একদিকে উজ্জ্বল জ্ঞানের অন্যদিকে পরাভক্তির তীব্র কশাঘাতে কর্মকাণ্ড সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তাই কি বর্তমান বৈধকর্মগুলি প্রাণহীন একটা অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে ? শঙ্করের মত

জ্ঞানী, চৈতন্যের মত প্রেমিক হইলে কর্মকাণ্ডের মূল শিথিল হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু তদনুগামিগণ—যাঁহারা সে জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা যদি বেদোক্ত কর্মকাণ্ডকে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—তাঁহারা ভ্রমসঙ্কুল পথে বিচরণ করিতেছেন। কর্মের প্রবর্তক বেদ। বেদ অপৌরুষেয়। উহা ভ্রম-প্রমাদশূন্য ঋষিগণের আত্মসম্বেদন হইতে সঞ্জাত ; সুতরাং কর্মকাণ্ড নিষ্ফল বা অল্প ফলপ্রদ ইহা বলা অজ্ঞতার পরিচয়। তবে এমন একটা দিন আসে যে, যখন আর কর্মকাণ্ডের কোন প্রয়োজনীয়তা মনে হয় না। তখন কেহ কেহ বা লোকশিক্ষার জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করেন। সে অবস্থায় কর্ম আপনি খসিয়া পড়ে। ভেকশাবকের পুচ্ছ আপনা হইতে স্খলিত হয় ; কিন্তু সেই পুচ্ছস্খলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যদি কেহ উহা ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে ভেকশিশুর মৃত্যু অনিবার্য।

আমাদের বেদোক্ত কর্মকাণ্ড এত মধুর, এত আনন্দপ্রদ যে, নিতান্ত পাষণ্ড ব্যক্তিও সেই কর্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী-দর্শনে ক্ষণকালের জন্য বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে পূর্বকথিত প্রাণরসের সন্ধান করিয়া লইলেই, এই চিত্তপ্রসাদ মাতৃ-বিভূতি ও মাতৃ-সম্ভোগের সুযোগ উপনীত হয়। এমন কোনও ব্রত নিয়ম কিংবা পূজাদির অনুষ্ঠানই হইতে পারে না, যাহাতে ঐ সকল অনুভূতির ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ না হয়। যাঁহারা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, দর্শকগণও বিপুল আনন্দে ও সাত্ত্বিক ভাবে আপ্লুত হইয়া পড়েন।

প্রত্যেক কর্মের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়—আমার চিত্ত কতটা প্রসন্ন হইল, আমি কতটা মাতৃ-মহিমা দর্শন করিলাম, আমি কতটা সময় জগতের খেলা ভুলিয়া মাতৃ-সঙ্গভোগে ধন্য হইলাম। এই সার্থকতার দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, কর্ম প্রাণহীন হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকের ধারণা — আমরা যে নিত্য-ক্রিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করি, অথবা বাড়ীতে যে মাসে মাসে পূজা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয়, উহা দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, কোন যোগী কিংবা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোনও গুপ্ত উপদেশ লইয়া তদনুসারে সাধনা করিতে হয় এবং বহুকাল সাধনার ফলে যদি ভাগ্যবশে কদাচিৎ কাহারও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। এইরূপ ধারণা বহুদিন হইতে এদেশে পরিপুষ্ট হইতেছে। বৈদিক যুগে কিন্তু এরূপ ধারণ ছিল না। এখনও আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়মান কর্মগুলিই ভগবৎলাভের পক্ষে প্রচুর। আচমন, সূর্যার্ঘ্য, আসন-শুদ্ধি, ইষ্টমন্ত্রজপ ইত্যাদি যে কোনও একটি কার্যের অনুষ্ঠান যদি যথারীতি সম্পন্ন হয়, তবে উহাতেই মানুষ অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—অধিকারীভেদে কর্মভেদ। হিন্দু-ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, অধিকারভেদে সাধন-প্রণালীর ভেদ বিহিত হইয়াছে। অন্য কোনও দেশে এই বিশেষত্ব নাই। অন্য দেশে সকলেরই উপাসনাপ্রণালী এক প্রকার। কেবল হিন্দুজাতিরই সম্প্রদায়ভেদে, ব্যক্তিভেদে, অধিকার ভেদে বিভিন্ন উপাসনার প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াও বহুত্বের মধ্যে অপূর্ব একত্ব, মধুর মিলন ও অচিন্ত্যনীয় সামঞ্জস্য বিন্যস্ত রহিয়াছে। গুণ ও কর্মভেদে প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতি পৃথক-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং সকল মানুষেরই সাধন-প্রণালী বিভিন্ন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ কর্মকাণ্ডবিধানের আর একটি উদ্দেশ্য আছে—আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল ; কোন একটিমাত্র কার্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনের স্থৈর্য অধিকক্ষণ রক্ষা করা দুষ্কর। নিত্য এক প্রকার রসের আস্বাদনে প্রাণও পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। তাই একই জিনিষকে নূতন নূতন ভাবে ভোগ করিতে হয়। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের কর্মকাণ্ডগুলি শুধু আমাদের মনের স্বাভাবিক পরিবর্তন-প্রিয়তার জন্যই বিহিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রসাদ, ধন এবং ভোজন-এই তিনটিই বৈধকর্মের পরিপোষক হেতু। এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সংসাধিত হয় বলিয়াই, কর্মকাণ্ড আমাদের অনুগত থাকে—অনুকূল হয় ; কিন্তু জীব যখন একটু একটু করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইতে থাকে, (বুদ্ধিময় ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার আভাস পাওয়া যায়) তখন দেখিতে পায়, সেই নিত্য অনুকূল কর্মকাণ্ডসমূহ—যাহারা এতদিন প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দ্বারা পরিপুষ্ট

হইয়াছে, তাহারা অন্য মহীভৃদ্‌গণের আনুগত্য করিতেছে। মহীভৃৎ শব্দের অর্থ—ক্ষিতিতত্ত্বপোষণকারীর স্থূলাভিমানী ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণ। কর্মসমূহ মাত্র স্থূল পার্থিব ভাবগুলিরই সেবা—আনুগত্য করে। প্রথমে জীব কর্মকাণ্ডের এই দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। মনে ভাবে, ঠিকই হইতেছে। সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি যাহা করিতে হয়, ঠিকই করিতেছি; কিন্তু হায় তখনও দেখিতে পায় না—বুঝিতে পারে না যে, উহা পার্থিব ভাবেরই পরিপুষ্টিসাধন করিতেছে। মন ও ইন্দ্রিয়ের সেবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে। একবার চৈতন্যের সন্ধান পাইলে, একটু প্রজ্ঞার আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হইলেই, কর্মের এই দোষ অংশ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তখন জীব কর্মকাণ্ডের এই স্থূলাভিমুখী দোষ দেখিয়া নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং কি উপায়ে কর্মগুলি জ্ঞানময়, মধুময় ও আত্মানুসন্ধানযুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য যত্নবান হয়।

এস্থলে কর্ম-রহস্য একটু আলোচনা করা আবশ্যক। বৈধকর্মগুলি যতদিন জ্ঞানময় না হয় এবং জ্ঞান যতদিন ভক্তিময় না হয়, ততদিন উহারা সাধককে চরিতার্থ করিতে পারে না। কি বৈধকর্ম, কি ব্যবহারিক কর্ম—যে কেন্দ্র হইতে উহারা বিকাশ পায়, আবার যেখানে মিলাইয়া যায়, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যদি অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা যথার্থ অজ্ঞানমাত্র। কর্মের প্রত্যেক অঙ্গ মাতৃময় করিয়া লইলে, তবেই কর্ম সার্থক হয়। **'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'** রূপে কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ—এই ছয়টি কারকই ব্রহ্ম—মা। মা আমার কর্তা, মা আমার কর্ম, মা আমার করণ, মা আমার ফল। কর্মের সর্বাবয়বেই মাতৃ-সত্তার উপলব্ধি করিতে হয়, তবে কর্ম জ্ঞানময় হয়। সাধক! ধ্যান করিতে বসিয়া দেখ— মা-ই মায়ের ধ্যান করিতেছেন! পূজা করিতে বসিয়া দেখ—মা-ই মায়ের পূজা করিতেছেন। পূজার উপচাররূপেও মা-ই বিরাজ করিতেছেন। হোম করিতে বসিয়া দেখ—অগ্নিরূপে মা, হবিরূপে মা, হোতারূপে মা, অর্পণরূপে মা। কাতরস্বরে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেখ—শব্দরূপে মা, কাতরতারূপে মা! মা-ই মাকে ডাকিতেছেন। এইরূপ কর্মের সর্বাবয়বে মাকে দেখিতে অভ্যাস কর, কর্ম জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞান ও কর্ম একই জিনিষ। কর্ম অজ্ঞান নহে, জ্ঞানের ঘনীভূত বিকাশ মাত্র। যে জ্ঞানের সন্ধানে তুমি ছুটিতেছ, যে জ্ঞান অমৃতের নিদান, সেই জ্ঞানই কর্মের আকারে তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, তোমার **'ব্রহ্মার্পণং'** মন্ত্রটি সিদ্ধ হইবে—চৈতন্যময় হইবে। তখন কি লাভ হইবে?—**'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্'**। তুমি ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে পারিবে—জীবত্বের অব্যয় গ্রন্থি ছিন্ন হইবে; যতদিন কর্মের মধ্যে এই শাশ্বত জ্ঞানকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন কর্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই আনুগত্য করে। সুরথের শুভদিন সমাগত; তাই কর্মের দোষাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। কর্মগুলি যে অন্য মহীভৃদগণের সেবা করিতেছে, আমার—আত্মার—জ্ঞানের—সচ্চিদানন্দের সেবা ত' করে না! কর্মের যাহা লক্ষ্য, কর্মের যাহা মধু, তাহা সবই যে 'অন্য উদ্দেশ্যে' পরিব্যয়িত হইতেছে। এখন পর্যন্ত কর্মগুলি ত' জ্ঞানময় হয় নাই! যে আত্মজ্ঞান-লাভ জীবের চরম এবং পরম উদ্দেশ্য, বৈধকর্মসমূহ এখন পর্যন্তও ত' সে উদ্দেশ্যে, সেরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে না! যাঁহার দিকে তাকাইয়া যাঁহার প্রেমে আসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হয়, এতদিন তাঁহার সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ইহা বুঝিতে পারিয়াই সুরথের এই সকল ভাবনার সময় আসিয়াছে।

অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৪॥

অনুবাদ। অসম্যক্ ব্যয়শীল সেই মহীভৃদ্‌গণের সতত ব্যয়ের ফলে, আমার অতি দুঃখে সঞ্চিত (প্রাণময়) কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা। জীবের জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে যত উন্মেষিত হইতে থাকে, ততই সে নিজের দোষগুলি উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। কেবল বৈধকর্মগুলি যে স্থূলভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের আনুগত্য করিতেছে, তাহা নহে; উহারা—ঐ মহীভৃদ্‌গণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষেরও অযথা ক্ষয় করিতেছে; ইহাও সে বেশ দেখিতে পায়। প্রাণময় কোষ বিনষ্ট হইলে দেহ বা অন্নময় কোষেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অসময়ে মাকে লাভ করিবার পূর্বে দেহের

পতন কাহারও অভীষ্ট নহে। ঈশোপনিষৎ বলেন —**'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'** —জগতের সর্বত্র পরমেশ্বরের সত্তা দর্শনরূপ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, শত সংবৎসরকাল অর্থাৎ পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকিবার অভিলাষ করিবে ; আত্মহন্ হইবে না। পুরুষায়ু-পরিমাণের পূর্বেই যদি অসম্যক্ প্রাণব্যয়ের ফলে অসময়ে দেহের পতন হয়, তবে পুনরায় গর্ভ-যন্ত্রণা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখসম্ভোগ অনিবার্য। তাই, সতত প্রাণশক্তির অযথা অপচয় দেখিতে পাইয়া, জীব নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ—আমরা কত কষ্ট করিয়া, কত শোক, দুঃখ, মর্মপীড়া, কত জন্মমৃত্যুর যাতনা সহ্য করিয়া, ধীরে ধীরে কত সুদীর্ঘ কালের কঠোর প্রযত্নে এই মনুষ্যোচিত প্রাণ ও দেহটি লাভ করিয়াছি ; তাহা স্মরণ করিলেও ভয় হয়। জীব যখন ইন্দ্রিয়হীন, কেবল একটু স্পন্দন-ধর্ম লইয়া, ক্ষুদ্রতম জীবাণু-আকারে প্রথম উন্মেষিত হয়, (ইহার পূর্বে যে কতকাল জড়পদার্থরূপে অভিব্যক্ত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই) চৈতন্যের সেই প্রথম উন্মেষণে যখন অপেক্ষাকৃত প্রবল জীব কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকায় জীবহৃদয়ে বিন্দুমাত্র কাতরতার অভিব্যক্তি হয়। প্রাণরূপিণী মা আমার সেইটুকু মনে করিয়া বসিয়া থাকেন। তাই পরবর্তী জন্মে অপেক্ষাকৃত বলবান দেহ লাভ করে। মনে কর, একটি পুরীষকীট ইন্দ্রিয়হীন—তাহার মাত্র স্পন্দন-ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। (ঐ স্পন্দনটুকু আছে বলিয়াই আমরা চৈতন্যের জীব ভাবীয় অভিব্যক্তি বুঝিতে পারি)। কতকগুলি পিপীলিকা তাহাকে চতুর্দিক হইতে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সে দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও, দেখিতে পাইতেছে না —কে তাহাকে যাতনা দিতেছে। তাহার সেই কাতর নির্বাক দর্শনবাসনাটি মায়ের বুকে লাগিল। তিনি পরবর্তী জীবনে তাহাকে চক্ষুস্মান্ কীটরূপে পরিবর্তিত করিলেন। সেই জীবনে চক্ষুস্মান্ হইয়াও সম্মুখস্থ উৎপীড়নকারীর হস্ত হইতে পলায়ন করিবার সামর্থ্য নাই দেখিয়া আবার কাতর প্রার্থনা উঠিল— আবার অন্তর্যামিনী মায়ের প্রাণে লাগিল। পরবর্তী জন্মে সে গমনশীল পলায়ন-সমর্থ কীটরূপে আবির্ভূত হইল। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য পূর্ণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইতে অর্থাৎ মনুষ্যকুলে আসিয়া উপস্থিত হইতে অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থূল কথায় বহু লক্ষ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম করিয়া, অগণিত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যে, এই প্রাণময় কোষ অর্থাৎ মানবদেহটি গঠন করিয়া লইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাই, সুরথ বলিলেন— **'সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন'**।

ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি—প্রাণময় কোষের অযথা অপচয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে এই কোষক্ষয় আরম্ভ হয় এবং সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। জগতে আমরা যাহা কিছু করি, তাহাতেই কিছু না কিছু প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়। এই যে মহীয়সী বিরাট্ প্রকৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-সম্ভার পরিপূর্ণ উপহারডালা সাজাইয়া, প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন এবং তোমার বাসনারূপ বিষয়-প্রদানে পরিতৃপ্তিসাধন করিতেছেন, মনে করিও না জীব ! উহা বিনামূল্যে লাভ করিতেছ। মনে করিও না, কোন প্রতিদানের অপেক্ষা না করিয়া, প্রকৃতি সুন্দরী তোমাকে এই জগদ্ভোগের সুযোগ দিতেছেন। তুমি ফুল দেখিলে, ফল দেখিলে, কার্যতঃ অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার প্রাণশক্তির অপচয় হইল। তুমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ প্রভৃতিকে ভালবাসিতেছ ; ভাবিয়া দেখিয়াছ কি কোন্ জিনিষ ইহার বিনিময়ে তোমাকে দিতে হইতেছে ! ঐ প্রাণশক্তি ! যাহা সঞ্চয় করিতে—যে মনুষ্যোচিত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি ও শক্তি লাভ করিতে তোমাকে অগণিত জন্ম-মৃত্যু, দুঃখের অসহনীয় পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে, ঐ দেখ ! সেই প্রাণশক্তি পলে পলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে নির্গত হইয়া যাইতেছে। হায় ! জীব ! অতি কঠোর যত্নে সঞ্চিত এই প্রাণময় কোষের অযথা ক্ষয় দেখিয়া, কবে তুমি সুরথের মত উৎকণ্ঠিত হইবে। দিন দিন যে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছ ; পৃথিবীতে এমন কেহ আত্মীয়, এমন কেহ বন্ধু নাই যে, তোমার এই মৃত্যুগতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে ! কেবল আহার-নিদ্রার ও কামনার সেবা করিয়া, অতি দুর্লভ মনুষ্য-জীবন অতিবাহিত করিয়া দেওয়া অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে ! মাত্র

ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হইতেছে। কেবল মৃত্যু নহে, জীবনকালেও অপরিমিত প্রাণশক্তির অপচয়ের ফলে, নানাবিধ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, মৃত্যুর অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি সর্ববিধ পার্থিব সুখ-সম্ভোগের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে এই প্রাণব্যয়রূপ মৃত্যুর করাল ছায়া দর্শনে উৎকণ্ঠিত হও, অচিরে অমরত্বের সন্ধান পাইয়া, সুরথের ন্যায় ধন্য হইবে।

এই প্রাণশক্তির অযথা ক্ষয় নিরোধ করিবার জন্য ধর্মজগতে প্রাণায়াম, হঠযোগ, নাভিক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিবার বিধান আছে। বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে আমাদের নিশ্বাসের গতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমরা প্রতিশ্বাসে যতটা বহির্বায়ু গ্রহণ করি, প্রতি নিশ্বাসে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বায়ু নির্গত হয়। এই অতিরিক্তটুকুই আমাদের সঞ্চিত প্রাণশক্তির অংশ। বায়ু ঠিক প্রাণশক্তি নহে, প্রাণের স্থূল বিকাশমাত্র। সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক শ্বাসের গতি দ্বাদশাঙ্গুলি। অধিক ভোজন, নিদ্রা, রতিক্রিয়া, ধাবন প্রভৃতি কার্যে উহার গতি অত্যধিক মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্ষয় রহিত করার জন্য আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদির সংযম অবলম্বন করিতে হয়। তারপর স্বাভাবিক গতির হ্রাস করিয়া, ক্রমে নাসাভ্যন্তরচারী শ্বাস-প্রশ্বাস অভ্যাস করিতে হয়। পরিশেষে কুম্ভকের সাহায্যে একেবারে বায়ু নিরোধপূর্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কঠোর অধ্যবসায়-বলে উহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, দীর্ঘকাল উপযুক্ত ক্রিয়াবান গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া, উহা অভ্যাস করিতে হয়। তাহার ফলে সুস্থ শরীর, দীর্ঘজীবন এবং দুই একটি ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভও হইতে পারে, কিন্তু মানুষ কি মাত্র উহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে? যত চেষ্টাই করা হউক, যত যোগ-কৌশলই অবলম্বন করা হউক, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায় নাই; সুতরাং যেখানে গেলে, যে উপায় অবলম্বন করিলে আর মরিতে হয় না, যাহা পাইলে মৃত্যু বলিয়া একটা বোধই থাকে না, সেই অভয় অমৃত মাতৃস্নেহ ভোগের জন্য সমস্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করাই একান্ত সঙ্গত।

একমাত্র প্রাণেশ্বরী মহাপ্রাণময়ী মহামায়া মায়ের আমার মহতী পূজা বা এই বিরাট্ ব্রহ্মযজ্ঞদর্শনকারী সাধকই এই অমরত্বলাভে সমর্থ। যে সাধক দেখিতে পায়—তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রত্যেক প্রচেষ্টা, প্রত্যেক চিন্তা, প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে মহামায়ারই পূজা নিষ্পন্ন হইতেছে, যে মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে—**'প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'** ॥ মাত্র সে-ই এই কোষক্ষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। যাহার সকল কর্মই মাতৃময় হইয়াছে, যে সাধক **'ব্রহ্মার্পণং'** মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার জন্ম-মৃত্যুর ধাঁধা চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে; সুতরাং কোষক্ষয়-নিরোধ বলিয়া তাহার আর পৃথক কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। যতদিন ধর্ম কর্মসমূহ, কেবল ধর্ম কর্ম নহে—সকল কর্মই জ্ঞানময় না হয়, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই যে কর্মের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই বোধ যতদিন বিকাশপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন কর্মগুলি অহং বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অহং বুদ্ধিতে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা প্রাণক্ষয় করিবেই; কারণ, জীব যে ক্ষর পুরুষ! ক্ষরণ বা অপচয় জীবের নিয়ত ধর্ম। নৈষ্কর্ম অবলম্বনই কর, কিংবা প্রাণায়ামই কর, যতদিন অক্ষর পুরুষের সন্ধান না পাইবে, ততদিন এই ক্ষয়নিরোধের কোনও উপায় নাই।

যাহা হউক, প্রাণময় কোষটি যথোপযুক্তভাবে গঠিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে যে বহুজন্মের কাতর ক্রন্দন, বহুজন্মের আকুল আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ লক্ষ জীবন-আহুতি, লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অপব্যয় করিতে জীব সঙ্কুচিত হইবেই। কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির সেবায়—মনের আদেশ প্রতিপালনে ইহার ব্যয় হইলে, তদপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? জীব যখন সৌভাগ্যবান হয়—সুরথ হয়, তখনই স্বীয় দেহ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে দিবারাত্র কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে থাকে। তখনই সে আত্মলাভের প্রতিকূল ঘটনাসমূহ প্রতিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু দেখে—আমার যে সবই বিনাশমুখী; সবই যাইতে বসিয়াছে! অতি যত্নে পালিত বৃত্তিনিচয় অসদ্‌বৃত্ত হইয়াছে। মন নিয়ত পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখে মুগ্ধ! দেহপুর বিলুণ্ঠিত! প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় ক্ষয়প্রাপ্ত! শত্রুমিত্র

উভয়েই প্রতিকূল ! তবে আর আমার কি আছে ! কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি মাতৃ-লাভের পথে অগ্রসর হইব !

মা ! যাঁহারা তোর প্রিয়তম সাধক সন্তান, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য দ্বারা মন বিশুদ্ধ রাখিয়াছে, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছে, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণের অপচয় নিরোধ করিয়াছে। তাঁহারা মা বলিয়া ডাকিলে, তাহাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এক সুরে বাজিয়া উঠে, সে মাতৃ-ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পবিত্রীকৃত হয়, আর তুমিও মা সে আহ্বানের প্রবল আকর্ষণে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইয়া দেও, তাঁহারা ধন্য হন। কিন্তু মা ! আমাদের উপায় কি ! আমরা যে দিক্ চাই, সবই ত' অন্ধকার ! যদি বা একবার ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করি, অমনি মন তাহার পুঞ্জীভূত সংস্কার লইয়া সম্মুখে দাঁড়ায় ! চির চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতে থাকে ! আর প্রাণ ! তার ত' খোঁজই নাই ! সে ইন্দ্রিয়ের সেবায় নিরত। তবে এই মনহীন, ইন্দ্রিয়হীন, প্রাণহীন, সুতরাং শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসহীন এই দুর্বল ক্ষীণকণ্ঠের মাতৃ-আহ্বান কি তোর কৈলাসের হৈম-সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছিবে মা ! তুই কি কনিষ্ঠ অর্বাচীন সংসারতাপে জর্জরিত দুর্বল সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখিবি মা ! এই অষ্টবন্ধনযুক্ত শিশুপুত্রকে একবার কোলে লইবার জন্য উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিবি কি মা ! দেখ, কি দুরবস্থায় নিপতিত আমরা। এ অধম পুত্রগণের গায়ে ধূলা ময়লা দুর্গন্ধ দেখিয়া পথের ধারে ফেলিয়া রাখিলে, তোর অকলঙ্ক মাতৃস্নেহ কলঙ্কিত হইবে। যে তোকে চায়, সে ত' নিশ্চয়ই তোকে পায় মা ! আমরা যে চাইতেই পারিলাম না ! মন চায় ভোগ, ইন্দ্রিয় চায় বিষয়, প্রাণ চায় দেহ ; সুতরাং তোকে আর চাহিতে পারিলাম কই ! যত দিন যায়, ততই মর্মে-মর্মে ইহার উপলব্ধি হয়।

আমরা না চাহিলেও তুই আসিবি কৃপাময়ি ! এত কৃপা, এত স্নেহ তোর বুকে মা ! তোর স্নেহের একবিন্দু পাইয়া, জগতের মা পুত্রস্নেহে আত্মহারা। আর সিন্ধু তুই, তোর স্নেহ কত বেশী ! জানি তুই মা ! যেখানে অপরাধ বলিয়া কিছু নাই, সেই মা তুমি আমাদের ; সন্তানের দোষ দেখিতে অন্ধা মা আমার ! তুমি আসিবে ! আমায় আত্মহারা করিবে— আমার চিবুক ধরিয়া তেমনি করিয়া 'এস বাবা' বলিয়া আদর করিবে ! আর আমি অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বলিব— 'আর তোকে মা বলে ডাকবো না মা !'

এই চারিটি মন্ত্রে সুরথের যে সকল চিন্তার বিষয় কথিত হইয়াছে, এই স্থলে আর একবার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। প্রথম, দেহপুর-বিষয়ক চিন্তা—অসদ্‌বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের অযথা পরিপোষণ। দ্বিতীয়, দেহাভিমানের বিপুল ভোগ-বাসনা-বিষয়ক চিন্তা, তৃতীয়, কর্মকাণ্ডের বহির্মুখতা এবং চতুর্থ, বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষের অযথা ক্ষয়-বিষয়ক চিন্তা। যাঁহারা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেরূপ সাধকগণের এই সকল চিন্তা একান্ত স্বাভাবিক।

———○———

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৫॥

অনুবাদ। হে বিপ্র ! রাজা সুরথ সর্বদা এইরূপ এবং অন্যান্য নানাবিধ চিন্তা করিতেন। অনন্তর একদিন তিনি সেই আশ্রমের সমীপে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন।

ব্যাখ্যা। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা দ্বারা জীব যখন একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কি উপায়ে এই দেহেন্দ্রিয়ের প্রতিকূলতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, অভয় মাতৃ-অঙ্কে চিরতরে আশ্রয় লইবে, এইরূপ চিন্তায় যখন অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার এক বৈশ্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সংঘটন করাইয়া দেন। প্রবেশার্থক বিশ্ ধাতু হইতে বৈশ্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রবেশ-ধর্মশীল ব্যক্তিই বৈশ্য। বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করিয়া, যে ব্যক্তি আত্মরাজ্যে—মাতৃ-অঙ্কে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তাহাকে বৈশ্য বলে। ইহার বিশেষ পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। এস্থলে জাতিরহস্যসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আত্মার জাতি নাই, দেহেরও জাতি নাই ; কিন্তু দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের জাতি সর্বজনপ্রসিদ্ধ ! গুণ ও কর্মভেদে জাতির ভেদ হয়। গুণ ও কর্ম অনাদি ; সুতরাং জাতিও অনাদি। ইহা মনুষ্যকৃত একটি সামাজিক শৃঙ্খলাবিধান নহে। সূক্ষ্মদেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যই বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের প্রবর্তক। সাধনজগতে অধিকারের স্তরভেদে বর্ণচতুষ্টয় নিরূপিত হইয়াছে। যত দিন জীব

ভগবানকে আত্মভেদে বিশিষ্ট মূর্তি বা ভাব অবলম্বনপূর্বক সেবা পরিচর্যাদি করিয়া পরিতৃপ্ত থাকে, ততদিন সে শূদ্রস্তরীয় সাধক ; যখন জীব আপনাকে ভগবানের অংশ বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নানাবিধ অভীষ্ট ফললাভের আশায় সর্বশক্তিসমন্বিত কোনও বিশিষ্ট মূর্তি বা ভাবের সমীপস্থ হইয়া, তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে বৈশ্যস্তরীয় সাধক বলা যায় । যখন ভগবানকে একান্ত আত্মীয়বোধে জীবত্বরূপ ক্ষত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে ক্ষত্রিয়স্তরের সাধক । আর যাঁহারা ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানেন, অর্থাৎ চিন্ময়ী মহাশক্তির চরণে জীবভাবীয় কর্তৃত্ব সম্যক্‌ভাবে উৎসর্গ করিয়া, নিত্যানন্দ ভোগ করিতে করিতে জগতের মঙ্গলবিধানে নিরত থাকেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ।

শারীরক-ভাষ্য শূদ্র শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'**শুচা দ্রবতি ইতি শূদ্রঃ**' । যে ব্যক্তি শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে সে-ই শূদ্র ; যাঁহারা এই শূদ্রত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাই বৈশ্য । বেদশাস্ত্রে বা মাতৃ-সম্বেদনে প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণই বৈশ্য-জাতি । যাঁহারা আত্মলাভে অর্থাৎ আত্মসমর্পণে উদ্যত, তাঁহারা ক্ষত্রিয় । যাঁহারা আত্মলাভে কৃতকৃতার্থ তাঁহারা ব্রাহ্মণ । আধ্যাত্মিক জগতের এই তারতম্য এবং বিভাগ অনুসারেই ব্যবহারিক জগতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ হইয়াছে ! একই মহান উদ্দেশ্যে — একমাত্র আনন্দময় পরমাত্মবস্তু-লাভের উদ্দেশ্যে ধাবমান এই বিরাট জনসংঘের যাঁহারা সর্বাগ্রবর্তী তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; যাঁহারা তৎপশ্চাদ্‌বর্তী তাঁহারা ক্ষত্রিয় । এইরূপ ক্রমপশ্চাৎ জনসংঘ বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হয় । ইহাতে বিদ্বেষ নাই, হিংসা নাই, পরস্পর সহানুভূতি আছে । যাহারা শূদ্র অথবা বৈশ্যজাতীয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কিছুদিন পরে অবশ্যম্ভাবী ব্রাহ্মণ জন্ম জানিয়াও, বালোকোচিত অধীরতার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষে কোনরূপ সমাজস্থিতির বিশৃঙ্খলা উৎপাদন হইতে বিরত থাকেন, ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল । তাই তিনি গীতায় বর্ণসঙ্করের অনিষ্টকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও বর্তমান যুগে বর্ণসঙ্করতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি এখনও মানুষমাত্রেরই স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ম-প্রতিপালনে যত্নবান হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য । যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে কার্যে নিযুক্ত আছ, তাহার সেই কার্য নিন্দিত হউক অথবা প্রশংসিত হউক, যে যেমন অবস্থায় আছ ঠিক তেমনই থাকিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও । সর্বতোভাবে তাঁহার চরণে আশ্রয় নিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও । কর্মের শক্তি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, অথচ চিত্তে একটা অনুপম নির্মল শান্তি সর্বদা বিরাজমান থাকিবে । প্রত্যেক বর্তমান অবস্থার ভিতর দিয়া জীবনের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় । ভবিষ্যৎ বা অতীত অবস্থাগুলির সার্থকতা আপনি আসিবে । 'শেষ জীবনে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিব', উহা অলসের শূন্যগর্ভ বাক্যবিন্যাসমাত্র । 'একান্ত আশ্রয় তুমি প্রভু', 'একান্ত সুহৃৎ তুমি আমার' বলিয়া প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে (যে মুহূর্তে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া যায়) তাঁহার নিকট সকল দুঃখ কষ্ট পাপ আত্মগ্লানি সরলপ্রাণে নিবেদন কর । অচিরাৎ আশ্রমধর্ম বর্ণধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে । তোমায় কোন বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে না, দেখিতে পাইবে,— কোন অজ্ঞেয় শক্তি তোমার ভিতরে থাকিয়া সকল আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করাইয়া লইতেছে । গীতার সেই সুমধুর আশ্বাস-বাণী স্মরণ কর—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

———○———

স পৃষ্টস্তেন কস্তং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ ।
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৬॥

অনুবাদ । সুরথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে ? এখানে আগমনের প্রয়োজন কি ? কেনই বা আপনাকে শোকাচ্ছন্ন এবং দুর্মনায়মান দেখা যাইতেছে ?

ব্যাখ্যা । কিছুদিন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বারংবার যাতায়াত করিবার ফলে ধীরে ধীরে একটা তন্ময়তা আসিতে থাকে । প্রাণ-প্রিয় মনোবিমোহন বুদ্ধিজ্যোতির উপর

একটু একটু আত্মপ্রতিবিম্বের আভাস পাইয়া স্বভাবতঃ তাহাতে ক্ষণকালের জন্য সাধকের মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। এই মুগ্ধভাব হইতেই একটু একটু তন্ময়তা আসে। তখন ঐ তন্ময়তার স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত হয়। যে তন্ময়তা-লাভের জন্য সাধকগণ কত রকম যৌগিক কৌশল অবলম্বন ও কঠোর অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াও বিফলমনোরথ হন, তাহা যে স্বয়ং অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়, ইহা জীব প্রথমে ধারণাই করিতে পারে না; তাই, উহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেই অবস্থাটি অপূর্ব আনন্দপ্রদ হইলেও তখন পর্যন্ত বিষয়মলিনতা ও জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নতা থাকে; সেই জন্যই, মন্ত্রে বৈশ্যকে সশোক ও দুর্মনা বলা হইয়াছে। অন্ততঃ সুরথের নিকট বৈশ্য সেইরূপেই প্রতীয়মান হইতেছিল। সুরথের প্রথম কথাগুলি আগন্তুকের প্রতি প্রণয়ভাবের সূচনা করিতেছে। এই বৈশ্য যে জীবের অতি প্রিয় এবং একান্ত আকাঙ্ক্ষিত, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্য প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৭॥

অনুবাদ। ভূপতির এরূপ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বৈশ্য বিনয়নম্র হইয়া রাজাকে বলিলেন।

ব্যাখ্যা। আগন্তুকের পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়াস পাইলেই জীব বুঝিতে পারে—এ অবস্থাটি কি, যেহেতু মা নিজেই দয়া করিয়া জীবের সকল সংশয় দূরীভূত করিয়া দেন। প্রথম যখন তন্ময়তা উপস্থিত হয়, তখন জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ কিছুই জানে না; অথচ সে অবস্থা অতীব সুখাবহ বলিয়া পুনঃপুনঃ তাহার সঙ্গলাভের বাসনা হয়। প্রথম দর্শনেই একটা পরমাত্মীয় ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, সাধকের এই প্রণয়োদিত ভাবের উদ্বেলনবশতঃই আগন্তুক অসঙ্কুচিতভাবে স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

বৈশ্য উবাচ।

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। বৈশ্য বলিলেন—আমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনীদিগের কুলে আমার জন্ম; কিন্তু ধনলোলুপ অসাধু স্ত্রী-পুত্রকর্তৃক আমি বিতাড়িত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা। বহু-জন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে, জীব সমাধির সন্ধান পায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত—এই তিনটি অবস্থাই সাধারণ জীবের নিয়ত ভোগ্য। ঐ তিনটি ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি। কদাচিৎ কোনও জীব ইহার সাক্ষাৎকার-লাভে ধন্য হয়। যে অবস্থায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্দশ করণ ক্রিয়াশীল থাকে, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। যখন কেবল অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় ক্রিয়াশীল থাকে, অবশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তখন স্বপ্ন-অবস্থা। যখন এই চতুর্দশ করণ সকলই নিষ্ক্রিয় হয়, তখন ইহাকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সুপ্তাবস্থায় আমরা আপনাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হই। তখন জগৎজ্ঞান এবং 'আমি আছি' এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয় না। ইহাকে প্রায় মৃতবৎ অবস্থা বলা যায়। কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাহা হয় না—জগৎজ্ঞান থাকে না, অথচ আত্মসত্তাটি প্রবুদ্ধ থাকে। যাহাকে বলে 'জাগিয়া ঘুমান'। জগদ্ভাবে সম্পূর্ণ নিদ্রিত; কিন্তু আত্মভাবে প্রবুদ্ধ, ইহারই নাম সমাধি। বুদ্ধিযোগের ফলে চৈতন্যময় মহাব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইবার পর, এই অবস্থা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। ইহা আত্মরাজ্য ও মাতৃ-অঙ্ক-লাভের প্রবেশদ্বার। তাই, ইনি বৈশ্য বা আত্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশক বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধনীদিগের কুলেই ইঁহার আবির্ভাব। যাহারা মাতৃ-স্নেহরসে অভিষিক্ত, ভক্তিধনে ধনবান, যাহারা সদ্গুরুর অহৈতুক কৃপাধনে জ্ঞানবান, যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠার অসীম শক্তিতে বীর্যবান, যাহারা বুদ্ধিযুক্ত কর্মফলে—চিন্ময়জ্যোতির্ধনে ধনবান, সেই ধনবানদিগের কুলেই সমাধির আবির্ভাব হয়।

সমাধি— অষ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গ। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান এবং সমাধি, যোগশাস্ত্রে এই আটটি যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। এ গুলি যে কেবল ভগবৎলাভের পক্ষেই উপযোগী তাহা নহে, যোগ ব্যতীত জগতের কোন ব্যাপারই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যোগ শব্দের অর্থ মিলন, কি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের মিলন, কি মনের সহিত বুদ্ধির মিলন,

কি বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন, কি প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কিংবা ভক্তের সহিত ভগবানের অথবা মাতার সহিত পুত্রের মিলন, ইহার সকলই যোগশব্দ-বাচ্য। এই মিলন বা যোগ পূর্বোক্ত যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গের সমষ্টিমাত্র। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের নাম কর্ম ; সুতরাং কর্মমাত্রই যোগ এবং জীবমাত্রই যোগী। মহাযোগিনী যোগমায়া মায়ের আমার কল্পিত প্রত্যেক পরমাণুই এই মহাযোগে সতত যুক্ত। মহাযোগী মহেশ্বরের হৃদয়বিহারিণী যোগেশ্বরীর সহিত যোগচ্যুতি বা সম্বন্ধবিলোপ ঘটিলে, ব্যোম-পরমাণু পর্যন্ত অস্তিত্ববিহীন হয়। সম্যক্ মাতৃমিলনে—মহামুক্তিতে এই যোগের অবসান। কোন্ অতীত যুগে—কোন্ প্রথম চৈতন্যের অভিব্যক্তি-দিনে এই যোগের আরম্ভ হইয়াছে এবং কতদিনে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা আমার যোগরাণী মা ব্যতীত অন্য কে বুঝিবে ?

এইবারে আমরা দেখিব—কিরূপে কর্মমাত্রেই যোগ হইয়া থাকে। মনে কর—তুমি আহার করিতেছ ; তৎকালে তোমার চিত্তকে অন্যান্য কার্য হইতে আবশ্যকানুরূপ কথঞ্চিৎ সংযত করিতে হয়, ইহারই নাম যম। আহার করিতে হইলে হস্ত পদাদি-প্রক্ষালন, অন্নাদির যথাস্থানে সংস্থাপন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যক নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। যেরূপভাবে উপবেশন করিলে আহারকার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেরূপ উপবেশনের নাম আসন। ধাবন কিংবা শয়নকালে যেরূপ অঙ্গসংস্থান করিতে হয়, সেরূপ করিলে আহারকার্য সুসম্পন্ন হয় না। যেরূপ অঙ্গসংস্থান যে কার্যের পক্ষে উপযোগী ও সুখকর তাহাই সে কার্যের উপযুক্ত আসন। তার পর প্রাণায়াম। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার। প্রাণায়ামতত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। সাধারণতঃ প্রাণায়াম বলিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম বুঝায়। বিভিন্ন কার্যের অনুষ্ঠানে আমাদের শ্বাসের গতির পরিমাণ ও মাত্রার যে তারতম্য হয়, প্রাণের আয়াম অথবা সঙ্কোচই উহার হেতু। যে কার্যে প্রাণের প্রসার হয়, সেই কার্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়! আর যে কার্যে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সেই কার্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি তীব্র হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি মানুষমাত্রেরই লক্ষ্য ; কিন্তু প্রাণায়াম সাধকগণের প্রণিধানযোগ্য। কোন্ কার্যে প্রাণ কি পরিমাণ আয়াম বা সঙ্কোচ লাভ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়াই পূর্বাচার্যগণ পুণ্য পাপ ও বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, তাহাই শাস্ত্রে পুণ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; উহাই বিধিনির্দিষ্ট কর্ম। আর যে কার্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, উহাই শাস্ত্রকারগণ পাপকার্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই নিষেধবিধানের অন্তর্গত বা নিষিদ্ধ। পাপ পুণ্য এবং বিধিনিষেধ এই প্রাণায়াম-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক, সে অন্য কথা। আমাদের পূর্ব-প্রস্তাবিত আহাররূপ কার্যেও এইরূপ স্বাভাবিক প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির তারতম্য নিত্যসিদ্ধ। অনন্তর প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহকে অন্যান্য বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া অভীষ্ট কার্যে বিনিয়োগ করার নাম প্রত্যাহার। আহারকার্য সম্পন্ন করিতেও কথঞ্চিৎ প্রত্যাহার একান্ত আবশ্যক। তারপর ধারণা। চিত্তকে আহার এবং তজ্জন্য তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির দিকে ধারণা করিয়া রাখিতে হয়। তাই, ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হইলেই আহারের পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ আহার-বিষয়ক একটু ধ্যান বা চিন্তা এবং তজ্জন্য অতি অল্পক্ষণস্থায়ী সমাধি হয়—ক্ষণকালের জন্য মন আজ্ঞাচক্র স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে আহারকার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সর্বত্র। আমাদের সমস্ত কর্মের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধিত হইতেছে। জাগতিক কার্যগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে, প্রত্যেক কার্যের অনুষ্ঠানে যে এতগুলি কাণ্ড করিতেছি, তাহা লক্ষ্যই করিতে পারি না, অথচ এই আটটি ব্যাপার একটির পর একটি নিষ্পন্ন হইতেছে। উৎপলশতপত্রভেদ ন্যায়ে [১] ইহা আমাদিগের নিকট এক প্রযত্নে যুগপৎ নিষ্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

সমাধি ব্যতীত কোন কার্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; মন যখন বুদ্ধিতে বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে সমাহিত

---

[১] একশত পদ্মফুলের পাপড়ি একটি সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে, মনে হয় একেবারে সমস্ত দলগুলির ভেদ হইয়া গেল। বাস্তবিক কিন্তু একটির পর একটি বিদ্ধ হয়।

বা সম্যক্‌ভাবে সংস্থাপিত হয়, তখনই সমাধি হয়। তোমার পদে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ ঐ কণ্টকবেধরূপ ব্যাপারটি মনের নিকট উপস্থিত করিল। মন কিন্তু বলিতে পারে না, ইহা কি ; তাই সে আবার উহাকে বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, এই যে উপস্থিত করা —ইহারই নাম সমাধি। এই সময়ে মন আজ্ঞাচক্রে বুদ্ধির সহিত মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি বলিয়া দেয়— উহার নাম 'কণ্টকবেধ, উহাতে একটি যাতনা হইতেছে'। অমনি মন 'উহুঃ বড় যন্ত্রণা' বলিয়া কণ্টকবেধের যাতনা উপলব্ধি করে। এইরূপ সর্বত্র। এই মন বুদ্ধির মিলন রূপ সমাধি, জাগতিক সর্বকার্যের মূল। এরূপ সমাধি জীবের অহর্নিশ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং তদঙ্গীভূত যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগও স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন হইতেছে ; কিন্তু এরূপ সমাধি সমাধি নহে ; কারণ, ইহা মনের সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত সমাধি—প্রজ্ঞার সহিত মনের মিলন। **'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'** এইটি ঋগ্‌বেদীয় মহাবাক্য—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম! মন যখন প্রজ্ঞানাকারে আকারিত হয় অথবা প্রজ্ঞায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই যথার্থ সমাধি হয়। ইহা প্রথমতঃ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটিযুক্ত হইয়া সবিকল্পভাবে আবির্ভূত হয়। পরে মাতৃ-কৃপায় অভ্যাসবলে নির্বিকল্প অর্থাৎ উক্ত ত্রিপুটিশূন্য কেবল বিশুদ্ধ-বোধরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সমাধিই মাতৃ-মিলনের দ্বার। অখণ্ড চিৎসমুদ্রের সহিত কল্পিত জীবভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের মিলন সংঘটিত হইবার প্রণালী—এই সমাধি। প্রতিনিয়ত জীবচৈতন্যে ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হইলেও, যতদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন জীব জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। মা-ই আমার সমাধিরূপে আবির্ভূত হইয়া, স্নেহের সন্তান জীবকে আত্মসমুদ্রে মিলিত বা আত্মহারা করাইয়া লয়েন। মনুষ্যজীবনের উহাই চরম এবং পরম চরিতার্থতা।

প্রথম প্রথম এই সমাধি মলিন ভাবাপন্ন থাকে, তাই মন্ত্রে সশোক এবং দুর্মনা এই দুইটি বিশেষণ-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক সুরথ এতদিন সমাধির সন্ধান পায় নাই, এইবার বহু সৌভাগ্যের ফলে মাতৃ-কৃপায় উহার দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে। তবে মলিন ভাবাপন্ন, তা হউক। মলিনতা কাটিয়া যাইবে, শোক দূর হইবে, দুর্মনা সুমনা হইবে। সে সকল কথা পরে জানিতে পারিব এখন দেখা যাউক— সমাধি প্রথম সাক্ষাৎকারে 'সশোক' এবং 'দুর্মনা' কেন ? মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— **'পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ'**। ধনলোলুপ অসাধুবৃত্তি পুত্র ভার্যাকর্তৃক বিতাড়িত ; তাই এই মলিন ভাব—সশোক এবং দুর্মনা। সমাধির পুত্র—ধ্যান এবং ভার্যা ধারণা। কথাটা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়— যম নিয়মাদি অঙ্গগুলির পর পরটি পূর্ব পূর্ব অবস্থার পরিপক্বতা-অনুসারে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ 'যম'-অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইলেই নিয়ম উপস্থিত হয়। নিয়মে সিদ্ধ হইলে আসন অনুষ্ঠানের সময় হয়। এইরূপ ক্রমে ধারণায় অভ্যস্ত হইলেই ধ্যান হয় এবং ধ্যান গভীর হইলেই সমাধি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে ; আমরা দেখিতে পাই—সমাধি আসিবার সময় হইলে অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি যেন আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতে থাকে। সমাধি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উহা জড় পদার্থ নহে। ধ্যান হইতে সমাধি আসে না, সমাধি আসিলেই ধ্যান সিদ্ধ হয় ; সূর্যের উদয় হয়, তাই অন্ধকার পলায়ন করে।

যে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি, প্রলয়ও ঠিক সেইরূপ ভাবেই নিষ্পন্ন হয়। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূত ; এইরূপে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি হয়। মুক্তি বা প্রলয়ের সময়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঠিক অনুলোমক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি যখন মনে করেন যে, আমি আর পরিণাম দর্শন করিব না, তখন উপরের দিক হইতেই টান পড়ে ; অর্থাৎ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে বিলীন করিতে প্রয়াস পায়, মহৎ অহঙ্কারকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রকে, পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূতকে, এইরূপে আকর্ষণ ঠিক অনুলোম গতিতেই হয় ; কিন্তু বাহিরে বিলোম গতি প্রকাশ পায়। মনে হয়, নীচের দিক হইতে প্রলয় আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রায় প্রবেশ করে, পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কারে প্রবেশ করে, অহঙ্কার মহতে এবং মহৎ প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়, এইরূপে প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয় বা পুরুষের সম্মুখ হইতে সরিয়া

যায়। এই যে বিলোমগতি প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অন্তর্নিহিত অনুলোম গতিরই বহির্বিকাশ বা ফলমাত্র। যেমন জোয়ারের সময় দেখা যায়—সমুদ্রের জলরাশি নদী, শাখানদী, খাল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের কলেবর পুষ্ট করে, আবার ভাটার সময়ে সমুদ্রের আকর্ষণেই নদী নালার জল সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রে সমুদ্রে ভাটার টান পড়ে; তাই নদী নালার জল সমুদ্রাভিমুখী হয়। সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলিও ঠিক এইরূপ। অনুলোম গতিই জগতের সর্বত্র। সমাধি হইতেই ধ্যান, ধ্যান হইতেই ধারণা এবং ধারণা হইতেই প্রত্যাহার। এইরূপ অন্যান্য যোগাঙ্গগুলিও বুঝিবে। যদিও যোগশাস্ত্রে ঠিক এইরূপ ক্রমের উল্লেখ নাই, যদিও সাধকগণ নীচের দিক হইতেই উপরের দিকে যাইতে চেষ্টা করেন, তথাপি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ একটু ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—সমাধি বলিয়া একটা নিত্যসিদ্ধ বস্তু বা অবস্থা আছে; তাহা সর্বকালে সমভাবে অবস্থিত। সে ধ্যান ধারণা হইতে জন্মগ্রহণ করে না বরং ধ্যান ধারণা প্রভৃতিই সর্বতোভাবে সমাধিরই অনুগত। সমাধি যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনিই যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি আকারে প্রকাশিত হইতে থাকেন। সাধারণ জীব এই রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নীচের দিক হইতে সাধনার গতি ঊর্দ্ধমুখে ফিরাইতে আরম্ভ করেন এবং বহু আয়াসেও যথার্থ আত্মস্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন।

সাধক! মনে কর, তোমাকে প্রথম যমের সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ, এইগুলির নাম যম। ইহার এক একটি সাধনায় সিদ্ধ হইতেই বহুবর্ষ অতীত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যেক যোগাঙ্গ ও তাহার প্রত্যঙ্গগুলিতেও সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধিতে উপনীত হইয়া, পরমাত্মসাক্ষাৎকার করিতে যত দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার আবশ্যক, বর্তমান যুগে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। পূর্ব পূর্ব জীবের চলচ্ছক্তি ছিল, তখন পথ দেখাইয়া দিলে অগ্রসর হইতে পারিত। আর এ যুগের জীব যেন সম্পূর্ণরূপে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি আর পথ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলে চলে? এখন আমরা মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিহীন। এখন কি আর ঐ সকল যোগাঙ্গ-অনুষ্ঠানের সময় ও সহিষ্ণুতা আছে? এযুগে মা নিজে আসিয়া সন্তানকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল যতই কঠোর হয়, অন্ধকার যত ঘনীভূত হইতে থাকে, পুত্রবৎসলা মা আমার ততই করুণার সিন্ধু উদ্বেলিত করিতে থাকেন; দয়ায় জগৎ ভাসাইয়া দিতে থাকেন। ইহাই মায়ের আমার মাতৃত্ব। শুধু মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হও। 'এই মা! তুমি আমার রহিয়াছ'—এইটা ঠিক ঠিক মনে প্রাণে ধারণা কর। এক কথায় মাকে মান। মা যে সত্যই রহিয়াছেন এবং তোমার মঙ্গলসাধনে নিয়ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এই কথাটা জোর করিয়া বুকের মধ্যে বসাইয়া দাও। দেখিবে—তোমার সমাধি স্বয়ং উপাগত হইবে। তোমার অষ্টাঙ্গযোগ (তোমার অজ্ঞাতসারে) স্বয়ং সিদ্ধ হইবে। শুধু কাতরপ্রাণে—'মা! তুমি ত' সর্বত্র সর্বভাবে বিরাজিত, তবে কেন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না? আমার এই অক্ষমতার মূলেও ত' তুমি, তবে কেন আমায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবাইয়া মারিবে? আয় মা! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দে, একবারমাত্র তোর ত্রিজগৎপ্লাবী স্নেহরস আস্বাদনের সুযোগ করিয়া দে, আমি মা বলিয়া ধন্য হই! এই ত্রিতাপ-বিশুষ্ক প্রাণ সরস হউক'! এমনই করিয়া কাঁদিতে থাক, বিশ্বাস হইল না বলিয়া দুঃখিত হও, মাকে জানাও, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন দেখিবে—সমাধির সন্ধান করিতে হয় না, আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুরথ ত' সমাধির সন্ধান করে নাই, তথাপি একমাত্র অশ্বারোহণে বনগমন বা বুদ্ধিযোগের ফলে সমাধির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছিল।

যাহা হউক, ধ্যানধারণারূপ সমাধির পুত্র ও ভার্যা — ধনলোলুপ; সুতরাং অসাধুবৃত্তি। ধন শব্দের অর্থ রূপ-রসাদি বিষয়গত ঐশ্বর্য বা বিষয়ত্ব। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—**'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্‌'** বিষয়গত ধন গ্রহণ করিও না অর্থাৎ বিষয়ত্বে মুগ্ধ হইও না। ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলি নিয়ত বিষয়াভিমুখী। সমাধি সর্বদাই অখণ্ড জ্ঞানে—প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়; কিন্তু ধারণা, ধ্যানাদি বিষয়াভিমুখী আকর্ষণ অর্থাৎ ধনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পূর্বে বলিয়াছি— আমাদের প্রত্যেক কার্যেই সমাধি বা অষ্টাঙ্গযোগ নিষ্পন্ন হয়। সুরথ যে সমাধির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহা ঐ নিত্যসিদ্ধ অহর্নিশ

আবির্ভূয়মান সমাধি ; সুতরাং ধনলোলুপ অসাধুবৃত্তি পুত্রভার্যা কর্তৃক বিতাড়িত। মানুষ দিবারাত্র বিষয়ের ধ্যান করে, বিষয়ের ধারণায়ই অভ্যস্ত, বিষয় আহরণের জন্যই ইন্দ্রিয় প্রত্যাহরণ করে ; যাহা কিছু সাধনা ঐ রূপরসাদি বিষয়গত ধনের লোভেই অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং উহারা অসাধু ; কিন্তু সমাধি স্বভাবতঃ অতি নির্মল। সে সর্বদা প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে পারিলেই সুখী। যতদিন সমাধির এই স্বাভাবিক উচ্চভাব না আসে, ততদিন সে স্ত্রীপুত্রাদির পরিতৃপ্তির জন্যই লালায়িত থাকে। যোগাঙ্গসমূহ যে রূপরসাদি বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে, সমাধি তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়। সমাধি না থাকিলে বিষয়ই প্রকাশিত হয় না। যাহা হউক, বহুদিন এইরূপ পরিজনবর্গের পরিপোষণ করিয়াও যখন সমাধির অতৃপ্তি বিদূরিত হয় না, তখন সে বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া, একাকী প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে চায় ; কিন্তু ধ্যান ধারণাদির পূর্ববৎ ধনলোলুপতা দূরীভূত না হওয়াতে, তাহারা সমাধিকে নির্জিত করিতে থাকে। তাহারা চায় —আমাদের প্রভু সমাধি আমাদের অনুগত হইয়া থাকুক ; কিন্তু সমাধি চায়—ধ্যান-ধারণা আমার অনুকূল হইয়া ভূমা সুখের অনুগামী হউক। এই পরস্পর বিরুদ্ধভাব নিবন্ধন, ধ্যান-ধারণাদি কর্তৃক সমাধিকে নির্জিত হইতে হয়। যদিও উহারা সমাধিরই অঙ্গমাত্র, তথাপি এখন সকলেই যেন স্বাধীন ও বলবান হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবভাবের মধ্যে অবস্থান করিয়া, প্রত্যেকেই এক একটি অহং হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রত্যেকেই স্বাধীন হইতে চায়, তাই সমাধিকে বিতাড়িত করে। সেই জন্যই সমাধির সশোক এবং দুর্মনা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আসল কথাটা এই যে, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যখন একটু একটু তন্ময়তা আসিতে থাকে, তখনও বিষয়-সংস্কার দূরীভূত হয় না। তাই, সমাধি নির্মল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যষ্টিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, সমষ্টিতেও তাহাই হয়। মা আমার প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে যেরূপ ভাবে আবির্ভূত হইয়া জীবকে মুক্তিমন্দিরে আকর্ষণ করেন, যাহা সাধক-হৃদয়ে গোপনে সংঘটিত হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইবার জন্যই মা আমার ধরাধামে বিশিষ্টভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ সুরথ-সমাধিরূপে প্রকটিত হইয়া কিংবা অসংখ্য অসুরকুল নির্মূল করিয়া জীব-জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রারম্ভেই বলিয়াছি, চণ্ডীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে। সুরথ সমাধির যে, কোন ঐতিহাসিকতা নাই, তাহা নহে। আর্ষগ্রন্থে মিথ্যা কল্পনার স্থান নাই। প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য রাজন্য কর্তৃক এই ধরা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কিছু না কিছু ইতিহাস আছে। ঋষিগণ সকলের ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই। যে চরিত্রটি চিত্রিত করিলে তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য সন্নিবেশ করা যায়, মাত্র সেইরূপ চরিত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার নাম এবং কর্ম বর্ণনা করিতে গেলে, একদিকে যেমন ইতিহাস ও লোকশিক্ষা হইতে পারে, তেমনি অন্যদিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাশিরও বিন্যাস করা যাইতে পারে, এরূপ লোকের চরিত্র অঙ্কন করাই ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই আর্ষগ্রন্থমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক সত্যের পার্শ্বেই আধ্যাত্মিক রহস্য সুবিন্যস্ত।

———○———

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্ত-বন্ধুভিঃ ॥১৯॥

অনুবাদ। দারা পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণপূর্বক আমাকে ধনহীন করিয়াছে। বিশ্বস্ত বন্ধুগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, আমি বড় দুঃখে অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা। আনন্দই সমাধির ধন। পুত্র, ভার্যা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা ও অন্যান্য যোগাঙ্গ সেই ধন গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিনিয়ত প্রতিকর্মে জীবগণ যে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করে, উহা বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্য পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পরিচ্ছিন্ন আনন্দ সমাধিলভ্য আনন্দসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। ব্রহ্ম অবধি পিপীলিকা পর্যন্ত প্রত্যেকেই আনন্দের অন্বেষী। এই যে ছুটাছুটি জগৎময় দেখিতে পাও, এই যে শুধু কামনা ও কাঞ্চনের পূরণের আশায় জীববৃন্দ উন্মত্তের মত, অন্ধের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একটু আনন্দ। ধার্মিক ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দ পায়, পাপী নিন্দিত

কর্ম করিয়া আনন্দ পায়। আনন্দাংশে উভয়ই তুল্য ; কারণ, 'আনন্দং ব্রহ্ম' আনন্দই ব্রহ্ম—আনন্দই মা ; সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সৎ-স্বরূপটি বিশিষ্টভাবে জড়পদার্থে প্রতিভাত। মা যে সৎস্বরূপা, অর্থাৎ মা যে আছেন তাহা আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, এই পরিদৃশ্যমান জড়পদার্থরূপে তিনি সতত প্রকটিতা। মা যে আমার চিন্ময়ী, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রাণীরূপে সর্বত্র বিদ্যমান। প্রাণীতেই আমরা চৈতন্যসত্তার বিশিষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই। আর আনন্দ-ধর্মটি বিশেষভাবে কেবল তাহাতেই বিদ্যমান। আনন্দ আর কোথাও নাই। একমাত্র মা আমার আনন্দ-ঘনমূর্তিতে সর্বদা সর্বত্র সুপ্রতিভাত। প্রতি জীবে যে বিষয়ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সেই আনন্দ-সমুদ্রেরই এক একটি বিশিষ্ট বুদবুদ্‌মাত্র। এই আনন্দ জীব কিরূপে ভোগ করে—

আমরা যখন কোন অভীষ্ট বস্তু-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি, তখন আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন তদুদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় ; বুদ্ধিও তখন আনন্দসমুদ্র হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। তারপর যখন চেষ্টা সফল হয় অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। তখনই আনন্দের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। তাই আনন্দলাভ হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, অভীষ্ট বস্তুই আনন্দ প্রদান করে। ইহাই অজ্ঞান। বিষয়ে আনন্দ নাই— আনন্দ আমারই বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিম্বিত। যখন বুদ্ধি সেই প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আমরা আনন্দচ্যুত হইয়া পড়ি ; আবার বুদ্ধির স্থৈর্যে সে আনন্দ উপলব্ধিযোগ্য হয়। এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে —আনন্দ যদি এক এবং অখণ্ডস্বরূপই হয়, তবে আমরা বিভিন্ন বিষয়লাভে বিভিন্নরূপ আনন্দ ভোগ করি কিরূপে ? কাঞ্চনলাভে যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় তদপেক্ষা ভিন্নপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হয় কেন ? একটি ফুল দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয়, একটি সঙ্গীত শুনিয়া সেরূপ আনন্দ হয় না কেন ? তাহার উত্তর এই যে, আনন্দ-বস্তু এক এবং অখণ্ড হইলেও, বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ-বৈচিত্র্যবশতঃ উহা আমাদের নিকট বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আমাদের যে ইন্দ্রিয় যখন বিশেষভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে,—সেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগত বিভিন্নতাই আনন্দগত বিভিন্নতা প্রতীতির হেতু।

আনন্দের অভাব কোথাও নাই ! এ জগৎ আনন্দে ভরা। 'আনন্দ হইতেই জীবগণ প্রাদুর্ভূত, আনন্দেই সঞ্জীবিত এবং আনন্দেই জীবের অবসান' এই মোহন-বাণী ঋষিগণ ভূয়োভূয়ঃ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্তমান যুগেও যাঁহারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। শোকার্তের করুণ-ক্রন্দন, রোগার্তের হতাশব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্ষুধার্তের কাতর চীৎকার, ঐ সকলই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। মানুষ ঐরূপ কাঁদিয়া, ঐরূপ হাহাকার করিয়া, আনন্দের সন্ধান পায় ; তাই, ঐরূপ করে। তিক্ত ঔষধ সেবনকালে মৌখিক অনিচ্ছা কিংবা মুখবিকৃতি প্রভৃতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইলেও রোগী উহার অন্তর্নিহিত রোগ-নিবারণ-শক্তিরূপ আনন্দরসের সন্ধান পায় বলিয়াই, সেই বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে বাধ্য হয়। বিষদুষ্ট অবয়বে অস্ত্রোপচারজনিত যাতনার অভ্যন্তরে একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান থাকে। রামবনবাস, সীতাহরণ, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি করুণরসোদ্দীপক প্রকৃষ্ট অভিনয় দর্শনে সহৃদয় দর্শক অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে। ঐ রোদনের মধ্যে আনন্দের আস্বাদ আছে। করুণও একটা রস। **'রসো বৈ সঃ'**—রসস্বরূপ একমাত্র মা। সেই রস বা আনন্দ-প্রবাহ যখন করুণ আকারে বাহিরে প্রকটিত হয়, তখনই আমরা উহার নাম দেই দুঃখ। এইরূপ একমাত্র রসস্বরূপা মা আমার প্রতিনিয়ত শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি বহুভাবে প্রকটিত হইয়া, বহুত্ব-প্রিয় জীবরূপী সন্তানগণকে আনন্দরস পান করাইয়া থাকেন। পতিব্রতা সতী যখন মৃতপতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, তখন সেই প্রাণান্তকর অসহ্য বহ্নিদাহের মধ্যেও একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান পায়। এইরূপ জগতের সর্বত্র। যে ব্যক্তি এই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত আনন্দরস-প্রবাহের সন্ধান পায়, সে জগতের যাবতীয় দুঃখ, শোক, সন্তাপ, যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করিয়াও, নিত্য নিত্যানন্দ-সম্ভোগে কৃতার্থ হয়। হায় জীব ! করে তুমি সে আনন্দের ধারা পান করিয়া, অমর শান্তিলাভ করিবে ? সে যাহা

হউক, সমাধি এই অখণ্ড আনন্দসমুদ্রের অন্বেষী ; কিন্তু ধ্যান ধারণাদি বিষয়ানন্দে মগ্ন । আনন্দময়ী মা আমার আত্মস্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়া, লীলার ছলে যে বিষয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দ দান করিতেছেন, যোগাঙ্গসমূহ তাহারই প্রয়াসী ; তাই সমাধির সহিত পরস্পর বিরোধিতা । সেই যে বিষয়সংস্পর্শজনিত আনন্দ-কণা, তাহাও সমাধি হইতে লভ্য । অন্যান্য যোগাঙ্গ ত' সে আনন্দের নিকটে যাইতে পারে না ; তাই, মন আজ্ঞাচক্রে সংস্থিত হইয়া সেই আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিলে, অমনি তাহার পরিজনগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করে । তাই, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— **'আদায় মে ধনম্'** । মনে কর— ধ্যান ; সে কোন বিশিষ্ট-পদার্থেই পর্যবসিত । যাহারা কেবল বিষয়ের ধ্যান করে, তাহারা ত' আনন্দকে খণ্ড খণ্ড করেই, তদ্‌ভিন্ন যাঁহারা কোন বিশিষ্ট মূর্তি কিংবা জ্যোতি অথবা কোনও বিশিষ্ট ভাবের ধ্যান করেন তাঁহারাও সমাধিলভ্য অখণ্ড আনন্দকে খণ্ডিত করিয়া ফেলেন । এইরূপে ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রত্যেক যোগাঙ্গই পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ । যোগাঙ্গসমূহের এই পরিচ্ছিন্ন-মুগ্ধতা নিয়ত অনুষ্ঠিত প্রতিকর্মে, অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা ভগবৎ-সাধনায়, উভয়ত্রই প্রায় তুল্য । যদিও আত্মজ্ঞান-লাভ উদ্দেশ্যে ক্রিয়মান শাস্ত্রীয় যোগাঙ্গগুলি জীবকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তোলে, তথাপি যতদিন যম, নিয়মাদি সাহায্যে আত্মাকে জানিতে পারা যায়—মাত্র যোগাঙ্গের সাহায্যে অখণ্ড আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, তত দিন বুঝিতে হইবে— সে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পায় নাই। ওরে, সে যে সর্বত্র সুপ্রকট । ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাকে দেখা যায়—সে আনন্দ উপলব্ধি করা যায় । যে মুহূর্তে তাঁহার দর্শন হয়—সেই মুহূর্তেই ত' সমাধি সিদ্ধ হয় । সমাধি-সিদ্ধি হইলে, অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি যে আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায় ! যতক্ষণ দেখিব—তুমি মাকে দেখিবার জন্য যম, নিয়মের অনুষ্ঠান করিতেছ, যতক্ষণ দেখিব—তুমি মাকে দেখিবার জন্য পদ্মাসন করিয়া বিশিষ্ট ভাবে বসিবার উপক্রম করিতেছ, যতক্ষণ দেখিব—তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া, মাতৃমুখী করিতে প্রয়াস পাইতেছ, ততক্ষণ বুঝিব— তুমি শুধু কোমরে কাপড় বাঁধিতেছ । আরে ধ্যান করিয়া মাকে পায় না, মা আসিলে ধ্যান আপনি হয় । জাগতিক প্রতি কর্মে যেরূপ আমরা বিশিষ্টভাবে ধ্যান ধারণা করি না ; যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি না, তথাপি সেই যোগাঙ্গগুলি আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া যায়, (আহারের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর ।) সেইরূপ মাতৃ-লাভের বেলাও শুধু 'এই আমি মাকে দেখিতেছি' বলিয়া দৃষ্টি মায়ের দিকে ফিরাও, দেখিবে তোমার সর্ববিধ যোগাঙ্গ আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে ।

শোন—আহার-বিহারাদি দৈনন্দিন কর্মগুলি যেরূপ আমাদের স্বাভাবিক, মনে হয়—কোন চেষ্টা ব্যতীত আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে, মাতৃ-লাভও ঠিক তেমনি স্বাভাবিক । মা যে আমাদের সহজ বস্তু । আমরা দেখি না, তাই, মা যেন কোন দুরধিগম্য দেশে রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । ওরে, এ ত' আর পাতান মা নয় যে চেষ্টা করিয়া তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে হইবে । এ যে সত্য মা আমার ! সে যে স্বকীয় স্নেহের প্রবল আকর্ষণেই আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে । আমরা মা বলিয়া ডাকি না, আমরা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, আমরা মায়ের বক্ষে বসিয়া বলি— কই মা কোথায় ? তাই, মা আমার দুঃখে ম্রিয়মাণা । বড় আদরের, বড় স্নেহের পুত্র যদি মাকে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করে, তবে মা কি কাঙ্গালিনী না সাজিয়া থাকিতে পারেন । তাই প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও জননী মা আমার জীবত্বের মলিন ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া, কল্পিত অভাবের দারুণ হাহাকারে দিগন্ত মুখরিত করিয়া, আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন । হউক কাঙ্গালিনী, তুমি তাহারই দিকে একবার সত্যদৃষ্টিতে তাকাও, 'এই যে মা তুমি রহিয়াছ' বলিয়া সত্য সত্যই মাকে দেখিতে অভ্যস্ত হও । সমাধির জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, উহা আপনি আসিবে। তুমি নিয়ত আনন্দে পরিপ্লুত থাকিবে ।

সমাধি চায়— সেইরূপ স্বাভাবিক আনন্দ, স্বাভাবিক মাতৃ-মিলন । যাহাতে সর্বদা সর্বভাবে মাতৃ-যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, সর্বদা অখণ্ড আনন্দের আস্বাদনে মুগ্ধ থাকিতে পারে, তাহাই সমাধির আকাঙ্ক্ষা ; কিন্তু পরিজনবর্গ তাহার সে বাসনা-সিদ্ধির বিরোধী ; তাহারা

সমাধিকে পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ রাখিতে চায় ; তাই, সে পুত্র ভার্যাদি কর্তৃক বিতাড়িত।

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥২০॥

অনুবাদ। সেই পরমাত্মাই আমি ; কিন্তু এই মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়া, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের মঙ্গলামঙ্গল-প্রবৃত্তি কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যা। সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে। জীব যখন প্রথম সমাধির সাক্ষাৎ পায়, তখন সমাধি আত্ম-পরিচয় প্রদানকালে আপনাকে '**সোঽহং**' বলিয়াই পরিজ্ঞাপিত করে। 'সোঽহং' জ্ঞানের নামই সমাধি 'সেই পরমাত্মাই আমি' এইরূপ প্রজ্ঞার নাম সমাধি। পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়া 'সোঽহং' বোধের বিকাশ হয় না। মা যে আমার স্নেহে আত্মহারা হইয়া, আমি হইয়া গিয়াছেন, অনন্ত মহিমময়ী কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী মা-ই যে আমিরূপে বিরাজ করিতেছেন, যে মুহূর্তে উহার উপলব্ধি হয়, সেই মুহূর্তেই সমাধি ! তখন কি অবস্থা হয়, তাহা ভাষায় কি প্রকারে প্রকাশ করিব ! সে যে মূকাস্বাদনবৎ স্বসংবেদ্যমাত্র ; তথাপি কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মাতৃ-চরণ স্মরণ পূর্বক যতটুকু পারি বলিতে চেষ্টা করি। তখন কি হয়—চক্ষু আর জগতের রূপ দেখে না, মায়ের রূপহীন রূপসাগরে নিমজ্জিত হয়। কর্ণ জগতের শব্দ শুনিতে পায় না, শব্দহীন মাতৃ-আহ্বান শুনিয়া মুগ্ধ হয়। রসনা সে অখণ্ড রসের আস্বাদনে জড় হইয়া যায়। নাসিকা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অবসর পায় না, মাতৃ-অঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভে স্তব্ধ হইয়া যায়। ত্বক্ মাতৃ-আলিঙ্গনের মধুর স্নেহময় স্পর্শে যে কি হইয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না। শরীরের প্রত্যেক পরমাণু কি যে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয় তাহা অবর্ণনীয়। কল্পনায় মহাকবি ভবভূতির ভাষায় বলিতে পারি '**নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ**'। চাঁদ নিংড়াইয়া যদি কেহ সেই সুধাকরের সুধাময়-স্নেহ-স্নিগ্ধ-নিস্যন্দনে অন্তর-বাহিরে প্রলেপ দেয়, তবু বুঝি এ সুখময় স্পর্শের তুলনা হয় না। আরও হয়—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, নয়নদ্বয় মৃতব্যক্তির নয়নদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিহীন হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল বা কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়ে। জগতের বিভিন্ন নাম রূপ আর থাকে না। এক কথায় দেহবোধ কিংবা জগদ্‌বোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়। থাকে শুধু অনন্ত আনন্দময় চিৎসমুদ্র। প্রথম প্রথম 'ঐ যে তিনি আমার পরমাত্মা, উনিই ত' আমি' এইরূপ বোধপ্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই 'সোঽহং' ভাবে সমাধি। এইরূপ সমাধিতে কিছু দিন অভ্যস্ত হইলে, আর সে, আমি, তুমি—কিছুই থাকে না। তখন কি থাকে, তাহা বলা যায় না, ভাবা যায় না, তবে যাহা থাকে, তাহাই যে মহতী সত্তা, মহান চৈতন্য এবং অসীম আনন্দ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না—তাহাকে মহানও বলা যায় না, অণুও বলা যায় না ; কারণ তখন পরিমাণ বলিয়া কোন বোধ ত' আর ফোটে না ! কিরূপে বলিব অণু কি মহান ! তবে একটা বিশেষত্ব আছে—যাহা বলিব, তাহাই সেখানে দেখিতে পাইব। যদি বলি—(মনে করি) অণু, তৎক্ষণাৎ অণু। যদি মনে করি—মহান, অমনি মহানস্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এমন কোন সঙ্কল্প নাই যে, সেখানে অপূর্ণ থাকিতে পারে, তবে সমস্যার কথা এই যে, সেখানে গিয়া সঙ্কল্প ফোটান বড় কঠিন ; কারণ, সঙ্কল্প যে করে, সে মনটিকে ত' আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ! যদি মা দয়া করিয়া সে ক্ষেত্রে একটু বেশী সময় থাকিতে দেন, তবে দুই-একটি মহান সঙ্কল্প সেখানেও জাগিতে পারে। না—সেখানে জাগে না ; যেখানে সঙ্কল্প ফোটে, সেটা ঠিক সে জায়গা নয় ; সে স্থান তাহার অনেক নিম্নে। কি সুখময়, কি আনন্দময় ধাম আমার মায়ের কোল ! আমার যথার্থ স্বরূপ।

মা যখন দয়া করিয়া, জীবকে 'সোঽহং' বোধে উপনীত করেন, জীব-ব্রহ্মের একত্ব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখনই ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ববন্ধন, কর্মসংস্কার, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি স্খলিত হইতে আরম্ভ হয়, যতদিন পরিপক্কাবস্থায় উপস্থিত না হয় অর্থাৎ জ্ঞান যতদিন সংশয়রহিত ও বিপর্যয়-প্রতীতিরহিত না হয়, ততদিন সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আধিপত্য বিদূরিত হয় না। সাধক যতক্ষণ 'সোঽহং' ভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ সব ভুলিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু সে কতক্ষণ ? আবার ব্যুত্থিত হয়। আবার '**প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ**'। স্ত্রী পুত্রের খবর পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। অথবা আর একটি

অবস্থা আছে, তাহা মাত্র সাধকগণেরই উপলব্ধিযোগ্য। যখন সাধক 'সোঽহং' ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তন্ময় হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই নিরালম্ব মহান চিৎসমুদ্রে ক্ষুদ্রজীবভাবীয় অহংটি নিমগ্ন হইতে গিয়া কি রকম ভয় পায়। একটা ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে ; কারণ জীব বহুকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের বা ভাবের সাহায্যে অস্মিত্ববোধকে জাগাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে সীমাহীন নিস্তরঙ্গ চিৎসমুদ্রে অবগাহন প্রথম প্রথম কেমন যেন একটা ভীতি-উৎপাদন করে ! মনে করে—এ কি ! কোথায় আসিয়া পড়িলাম ! ইন্দ্রিয়-রাজ্যে মনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া, অকস্মাৎ ভাবাতীত স্বরূপের সমীপস্থ হইলে, প্রথমতঃ ঐরূপ ভাব আসিবেই। ক্রমে মাতৃ-কৃপায় যাওয়া অভ্যস্ত হইলে,আর ভয় থাকে না। তখন উহাই নিজ নিকেতন বলিয়া মনে হয় এবং সংসার ও দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বিদেশ বলিয়াই বুঝিতে পারে। যাহা হউক, সেই বিস্ময়বিহ্বল অবস্থায় জীব আবার একটা ক্ষুদ্রবোধ বা ভাবের সন্ধান করিতে থাকে ; কারণ, তাহাতেই সে অভ্যস্ত। তাই, স্ত্রী, পুত্র, দেহ প্রভৃতি গভীরভাবে অঙ্কিত সংস্কারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আবার একটু আশ্বস্ত হয়। তোমরা শিশুকে কখনও খুব জোরে পাখার হাওয়া দিয়া দেখিবে—সে যেন কেমন হাঁকপাঁক করিতে থাকে। প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই তাহার ঐরূপ কষ্ট হয়। ইহাও অনেকটা সেইরূপ বুঝিবে। তাই, বৈশ্য সমাধি ধ্যান ধারণাদি স্বজনবর্গের কুশলাকুশল সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র। যে সকল যোগাঙ্গ বা জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব-অবলম্বন আত্মবোধ জাগাইয়া রাখে, সাধক নিরালম্ব সত্তার দিকে অগ্রসর হইয়া, সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবলম্বনগুলিকে আবার গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায় ইহাই সমাধির উৎকণ্ঠা।

এস, এইবার আমরা সোঽহং-তত্ত্ব একটু বুঝিতে চেষ্টা করি। সর্বদা মনে রাখিও—আমরা যে যাহাই বুঝি, উহা নিজ নিজ বুদ্ধিগণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। ভগবত্তত্ত্ব কিন্তু বুদ্ধির অনেক বাহিরে অবস্থিত ; সুতরাং তাহাকে সম্যক্ জানিতে কেহ কখনও পরিয়াছেন কিংবা পারিবেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্যা মা আমার মানব-বুদ্ধিগম্য কিরূপে হইবেন ? তবে মায়ের এক বিন্দু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পিপীলিকার চিনির পাহাড়ের পরিমাণ জানিবার প্রয়োজনই বা কি ?

'সোঽহং' শব্দের অর্থ 'সেই আমি'। এই আমি নহে—'সেই আমি'। আমির তিনটি স্বরূপ বা অবস্থা আছে। একটি জীব আমি, একটি ঈশ্বর আমি ও অপরটি সেই বা পরম আমি। 'সেইটিই' হইল আমির পরমভাব বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। উহা বাক্য, মন এবং বুদ্ধির অতীত স্বরূপ বলিয়া জীবভাবের পক্ষে নিয়ত অপ্রত্যক্ষ। তাই, নামপুরুষ বা সঃ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুসারেও অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই তৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য 'সঃ' শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝা যায়। আমি এবং আত্মা একই কথা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ দুইটি বিভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মার যে কল্পিত অংশে জীবভাব বিকশিত হয়, তাহারই নাম জীবাত্মা এবং যে অংশে কোন ভাবের বিকাশ নাই, তাহাই পরমাত্মা। আত্মার এই পরম ভাবটি কি, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক ! যে ভাবে আত্মা মাত্র সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে প্রতিভাত হন অথবা যেখানে অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ বলিয়া কোন কিছুর উপলব্ধি হয় না, তাহাই পরম ভাব। তাহাকে ভাষার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া, ভাব, অবস্থা, স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ তাহাতে প্রয়োগ করিতেছি। বুঝিও—এসকল শব্দও তাহাতে প্রযুজ্য নহে ; কারণ ভাব, অবস্থা, স্বরূপ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই হইয়া থাকে। মোটামুটি মনে করিয়া লও—আমার এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে অসৎ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অচিৎ কিংবা জড় বলিয়া কিছু নাই এবং নিরানন্দের লেশমাত্র সেখানে অনুভব করা যায় না। কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা নাই, রূপ-রসাদি বিষয় নাই, সুতরাং ভাব এবং অভাব উভয়ই সেখানে প্রতীতিযোগ্য নহে—সে এমনই একটি অবস্থা। তুমি প্রতিনিয়ত যে চৈতন্য-সত্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছ, যদি একবার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি ভুলিয়া ঐ চৈতন্য-সত্তটি-মাত্র তোমার বোধের সমীপস্থ করিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে এই পরমাত্মভাবের আভাস পাইবে। সেখানে কিন্তু আমি, তুমি, সে প্রভৃতি বোধ

নাই। তাহাকে বিজ্ঞাতা কিংবা দ্রষ্টাও বলা যায় না ; কারণ সে অবস্থায় জ্ঞেয় বা দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। এই অবস্থাটির নাম পরমাত্মা বা আমার পরম ভাব।

এইবার আমরা 'অহং' বস্তুটি বুঝিতে চেষ্টা করি। চণ্ডীর প্রারম্ভে দেবীসূক্তের ব্যাখ্যায় এই অহং-এর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এইস্থানে আমরা সেই কথাই আবার অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেরূপ একবার আহার করিলেই চিরজীবনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ অতি গহন আত্মতত্ত্ব একবারমাত্র আলোচনায় আত্মজ্ঞান লাভ হয় না ; পুনঃপুনঃ ইহার আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হয়। তাই আমরা এক কথাই বারংবার আলোচনা করিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, আমার সেই যে পরম-ভাব, উহার এক অংশে স্বভাবতঃ লীলাকৈবল্যবশতঃ একটা 'অহং'-বোধ ফুটিয়া উঠে। (কেন এবং কিরূপে উঠে এরূপ প্রশ্ন করিও না, বুঝিতে চেষ্টা কর)। অহংবোধটি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্মনসোগোচর। যেই অহংবোধটি জাগিল, অমনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া প্রকাশ পাইলেন। সেই প্রথম অহংবোধের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ পর্যন্ত বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপেই মহামায়ার প্রকাশ। এই মহামায়াই যতক্ষণ স্থির অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিহীন ছিলেন ততক্ষণ পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতেন। যখন শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার নাম হইল মহামায়া। সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল, ঐ আমিটি মহান ও এক। আর দ্বিতীয় একটা 'আমি' তখন ছিল না। উহার— সেই এক আমির ইচ্ছা হইল— বহুভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের খেলা খেলিব। আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, তাই, এই বহুত্ব-লীলার ভিতরেও অখণ্ড আনন্দ অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত। যেখানে এই বহুত্বের ইচ্ছাটি ফুটিয়া উঠিল, সেটা কিন্তু মন। মন ব্যতীত সঙ্কল্প হইতে পারে না। এই মনোময়ী মা পূর্বপূর্ব কল্পের সৃষ্টির বীজগুলি এতদিন অব্যক্তভাবে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রসব করিলেন। এই বহুত্বসৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই তিনি—ঐ আমি— মা। তিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, সূর্য, চন্দ্র, অণু, জীবাণু, পরমাণু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মানব, দেবতা আরও কত কি হইলেন। দিক্, কাল, কর্ম, ধর্ম, অধর্ম, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপু এক কথায় সব হইলেন। সব হইতে গিয়া তাঁহাকে শব পর্যন্ত হইতে হইল। চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ ; তথাপি আনন্দের প্রেরণায়, স্নেহের উচ্ছ্বাসে তাঁহাকে জড় পর্যন্ত হইতে হইল। তিনি নিজে আমি ; তাই তাঁর কল্পিত অণু পরমাণু পর্যন্ত আমি বোধে সংবুদ্ধ হইল। তিনি সমুদ্রবৎ অবস্থিত আমি, আর জীব-জগৎ তাঁহার তরঙ্গবৎ আমি।

মনে কর—একটা লণ্ঠন আছে, উহা সাতখানি সাত রং-এর কাঁচ দ্বারা গঠিত। মধ্যে একটা আলো জ্বলিতেছে। সাতখানি কাঁচের ভিতর দিয়া ঐ একটা আলোই সাত রকমে প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে একটা আমিবোধ রহিয়াছে, উহাও ঠিক সেইরূপ। বস্তুতঃ তিনি এক আমি হইলেও এই বহু জীবের ভিতর দিয়া বহু আমি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বেশ ধীরভাবে চল, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আচ্ছা ধর, ঐ যে বহু আমি (মূলে কিন্তু বহু আমি নয়, বহুভাবে প্রকাশিত এক আমি) উহার নাম দাও ব্যষ্টি আমি বা জীব। আর ঐ যে এক আমি, উহার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর কেন বলিবে ? বহুত্বের সৃষ্টি ও তাহার ধারণ ঐ আমিতেই হইতেছে ; আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আর আমি বহু-ভাবে প্রকাশিত হইব না, তখনই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইবে—প্রলয় হইবে। সুতরাং তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা ঈশ্বর। এই অংশটিকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্বকথিত পরমাত্মা-স্বরূপেরই শক্তিরূপের বিকাশ বলা যায়। সেই পরম অংশটির নাম শক্তিমান এবং অহংবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুভাবে প্রকাশ, তাহার ধারণ ও প্রলয়াদি কার্য অংশটির নাম শক্তি। এই শক্তি ও শক্তিমান বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। সূর্যের প্রকাশশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেরূপ মুখে বলা যায় মাত্র, উক্ত রূপ ভেদ কখনও অনুভূতিযোগ্য হয় না, সেইরূপ শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদ মাত্র মৌখিক বিচারে প্রযুজ্য। যেরূপ রাহুর শির বলিলে, রাহু এবং শির অভিন্নভাবে প্রতীত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা ও শক্তি অভিন্নভাবে প্রতীতি-যোগ্য।

যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারা গেল, আমির তিনটি স্বরূপ। একটি জীব আমি, একটি ঈশ্বর আমি

এবং অপরটি পরম আমি। এই পরম আমিটির নাম 'সঃ' কেন না সেটি অপ্রত্যক্ষ । আর জীব আমির নাম হইল 'অহং'। 'সঃ' এবং 'অহং'—এই উভয় যখন মিলিয়া যায়, তখন জীব ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। এই মিলনের দ্বার সমাধি। সমাধিই 'অহং'কে-'সঃ' করিয়া দেয়। তাই সমাধি আপনাকে 'সোঽহং' বলিয়া পরিচিত করিলেন।

এইরূপে আমরা কোনো রকমে 'সোঽহং' কথাটি বুঝিয়া লইলাম ; কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ধর, 'জীব আমি' কথাটায় যাহা বুঝিলাম, তাহা ত' বাস্তবিক কিছুই নয় ; কারণ লণ্ঠনের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারিয়াছি— 'আমি' একজন মাত্র। 'আমি' যদি বলিতে হয়, তবে ঈশ্বরকেই বলা যাইতে পারে। দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট জীবের পৃথক আমিত্ব—অজ্ঞানমাত্র। কার্যতঃ তাহাই বটে। 'সঃ'-এর সহিত যে 'অহং'-এর মিলন, তাহা পরমের সহিত ঈশ্বরের মিলন বলিলেই ঠিক বলা হয়। মিলন বলিলে বুঝিও না যে, দুইটি বিভিন্ন বস্তু একত্রিত হইল। জীবভাবে প্রকাশিত অজ্ঞানসম্ভূত আমি, ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত যথার্থ আমির সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়। আবার ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত আমি, পরমভাবে উপনীত হইলেই, পরম পুরুষার্থ বা কৈবল্য লাভ হয়। জীবকে পরম ভাবে প্রকাশিত হইতে হইলে, মধ্যবর্তীস্বরূপ যে ঈশ্বর 'আমি', তাহাকে অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। জীবকে প্রথমে ঈশ্বর হইতে হইবে, ঈশ্বর পরমভাবে উপনীত হইবেন ; ইহাই মুক্তি ; ইহাই মূলতত্ত্ব।

তাহা হইলে এখন বুঝা গেল—জীবের সাধ্য ঈশ্বর, পরমভাব সাধ্য নহে। উহা সাধ্যসাধনাদি সর্ববিধ অবস্থার অতীত ; সুতরাং উপাসনা, সাধনা ইত্যাদি যাহা কিছু, তাহা মধ্যবর্তী অবস্থাটি লইয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীব যদি কোনরূপে ঈশ্বরস্বরূপে সংবুদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত আমি জিনিষটির সন্ধান পায়। জীবভাবে যে আমি প্রকাশ পায়, উহা প্রতিচ্ছায়ামাত্র। তাই এই চণ্ডীতে পরে উক্ত হইবে—**'যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা'**। যথার্থ আমি—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর অনন্ত করুণাসিন্ধু স্নেহময় নিগ্রহানুগ্রহক্ষম ও একান্ত আশ্রয়—ইনিই অক্ষর পুরুষ। আর জীব ক্ষর পুরুষ ; কারণ, কাঁচের অন্তর্নিহিত আলোকরূপ অহংটি যদি সরিয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিচ্ছায়ারূপ জীব থাকিতেই পারে না। তাই পূর্বে বলিয়াছি — আমিই একমাত্র মা। মা আমার আমি-স্বরূপা, আমিময়ী। তাই, তাঁর সর্বাবয়বে আমি ফুটিয়াছে ; প্রত্যেক পরমাণু আমি আমি শব্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। যে বিরাট্ মহান আমি-সমুদ্র হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আমির সন্ধান করার নামই সাধনা। সেই আমিকে ভালবাসার নাম ভক্তি বা প্রেম। সেই আমিকে জানবার নাম জ্ঞান। যতদিন সাধনা এই তত্ত্বময় না হয়, —আত্মানুসন্ধানযুক্ত না হয়, ততদিনই সাধনা নীরসভাবে মৃদুপদে অগ্রসর হইতে থাকে। একটি আত্মসংবেদনে আছে—**'পূজাধ্যানজপাদীনি নামসংকীর্তনানিচ। অহং-দেববিযুক্তানি বিকলান্যাহ ব্রহ্মবিৎ।'** পূজা, ধ্যান, জপ, নামকীর্তন প্রভৃতি ততক্ষণ অসম্যক্ ফলপ্রদ থাকে, যতক্ষণ অহংদেবযুক্ত না হন। অহংই সাধ্য, অহংই পূজ্য, অহংই উপাস্য ; যতদিন এই আমাকে বাদ দিয়া সাধকগণ অগ্রসর হন, ততদিন আমারই পূজা করেন ; কিন্তু অবিধিপূর্বক ; তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন —**'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।'** ইত্যাদি।

ঐ শোন—এই আমিই ঈশ্বর, সর্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা এবং প্রভু। যে যাহা কিছু কর—আমিই তাহা ভোগ করিয়া থাকি। জীব ! যতদিন তুমি আমাকে না জানিবে, আমাকে আদর না করিবে ততদিনই জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-যাতনার সংপেষণে সম্পিষ্ট হইবে। আমি সর্বজীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত। আমাকে চেনে না মনুষ্য মধ্যে এমন দুরাচার কেহ নাই। তাই, দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনা করিতে পারে। এই আমিই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, গাণপত্যের গণেশ, সৌরের সূর্য। এই আমিই সাকারে বিশ্বরূপ এবং বিশেষ বিশেষ ভক্তের জন্য বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই আমিই আবার রূপাতীত নিরঞ্জন। যতদিন জীব **'জীবোঽহং'**—বোধে অবস্থান করিয়া **'ঈশ্বরোঽহং'**-কে পৃথক্‌ভাবে উপাসনা করে, ততদিন সে আমাকে পাইবে না—পাইবার উপায় নাই। সর্বদা মনে রাখিও 'আমি' জীব নহে। ঐ যে **'জীবোঽহং'** বলিয়া অভিমানে স্ফীত

হইতেছে, উহার মধ্যে 'অহং'টি হইতেছেন 'আমি' —মা। তিনি কখনও জীবকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন না। ওরে, জন্ম-জন্মান্তর হইতে আমি—মা জ্ঞাতসারে হৃদয়ে থাকিয়া এবং অজ্ঞাতসারে সর্বরূপে থাকিয়া, তোমাদিগকে পরিপোষণ করিতেছি, আদর করিতেছি—স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধন করিতেছি। এতদিন বুঝিতে পার নাই, ক্ষতি নাই এখন মানুষ হইয়াছে,—এখনও আমাকে—মাকে চিনিবে না ? বড় দুঃখে আমি বলিয়াছি—'**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**।' মানুষ তোমরা আমাকে বড় অবজ্ঞা কর। যত অবজ্ঞা কর, ততই আমি আত্মগোপন করি, লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিয়া পুত্র বলিয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটি, শুধু অপেক্ষায় আছি, কবে তুমি আমায় আদর করিবে—কবে তুমি আমায় মা বলিয়া ডাকিবে ! তুমি দিবারাত্র 'আমার আমার' বলিয়া ছুটিতেছ—অভিমানরূপিণী আমারই মানে অভিমান করিয়া বেড়াইতেছ। আ—মা'র আ—মা'র বলিয়া ত' একবারও আমার দিকে তাকাও না। পুত্র ! আর কত দিন শিশু থাকিবে ? আমাকে মা বল, আমাকে পাইবে।

'অহং' তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া আমরা অনেক অপ্রকাশ্য কথার আলোচনা করিয়া ফেলিয়াছি ; তাহাতে ক্ষোভ নাই, যদি দুই-চারিজন সাধকও আমিকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশের ক্ষোভ তিরোহিত হইবে। মনে রাখিও—আমিকে না ধরিতে পারিলে 'সোঽহং' হইবার উপায় নাই ; সোঽহং না হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আমরা জীবভাবে যে 'আমি আমি' করি উহা কিন্তু বাস্তবিক 'আমি' নহি। আমি—এক ব্যতীত দুই নাই। সর্ব জীবের ভিতর একই আমির প্রতিধ্বনি হইতেছে। বিভিন্ন আধারে বিভিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া,—একই আমি দেব মনুষ্য তির্যক্ ইত্যাদি আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উহার—ঐ 'একোঽহং'-এর শরণাগত হও—'**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**'। সর্বরূপে যে আমির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বের ভিতর যাহা অনুস্যূত, সেই আমির আশ্রয় গ্রহণ কর। '**অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ**।' 'আমি তোমাকে সর্বরূপ পাপ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিব—শান্তিময় উদার মুক্তিক্ষেত্রে—সোঽহং-রাজ্যে উপনীত করিব, তুমি দুঃখ করিও না বৎস !' গীতার এই চরম ও পরম বাণীটি যাহার প্রাণে সম্বেদন আনিয়াছে—যে সত্যসত্যই এইভাবে আমাকে—মাকে গুরুরূপে পাইয়া, তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণের জন্য যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিতেছে, একমাত্র তাহারই জন্য এই চণ্ডী। শুধু পড়িবার জন্য, শুধু দুই-চারিটি ভাল কথা শিখিবার জন্য গীতা বা চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করা বালকোচিত ক্রীড়া মাত্র।

———○———

কিন্নু তোষং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম।
কথং তে কিন্নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্বৃত্তাঃ কিন্নুমে সুতাঃ ॥২১॥

অনুবাদ। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল বিরাজ করিতেছে ? আমার সেই পুত্রাদি স্বজনবর্গ কি সদ্বৃত্ত অথবা অসদ্বৃত্ত ? (তাহা জানিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত আছি)।

ব্যাখ্যা। ধ্যান-ধারণাদির গৃহ মন। সেই মনে কি ক্ষেমঙ্করীর শ্রীপাদপদ্ম-সংস্পর্শে ক্ষেম বিরাজ করিতেছে, অথবা এখনও বিষয়-বাসনাজনিত অক্ষেম-অমঙ্গল পূর্ণভাবে আধিপত্য করিতেছে ? ক্ষেম বা মঙ্গল একমাত্র মা। যিনি সর্বভূতে আমিরূপে বিরাজিতা, সেই মাকে পাইয়া, মন কি ধন্য হইয়াছে ? মন কিরূপে মাকে পাইবে ? আত্মার বা আমার যে চঞ্চলতাময় সংস্কারাত্মক অবস্থা, তাহাই মন। যখন প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে, মাতৃ-দর্শনের ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রকৃতিগত হইয়া যায়, সর্বভাবে মাতৃ-সত্তাই প্রকটিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে—মনোময় ক্ষেত্রে ক্ষেমঙ্করীর পাদস্পর্শ হইয়াছে। আর যত দিন তাহা হয় না, পরিচ্ছিন্ন বিষয়-বাসনা মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতাকে আরও বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে, যত দিন কামনার অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকে তত দিনই মনে অক্ষেম-বিরাজ করে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি এখন মনের উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সমাধির এই উৎকণ্ঠা। সে যে এখন মনোরাজ্য হইতে বিতাড়িত, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত ; তাই, মনের সঙ্গবিচ্যুতি-

নিবন্ধন মনের বর্তমান অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না, অথচ মনের প্রতি সেই যে পূর্বসঞ্চিত আসক্তি, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলি যত দিন পূর্ণভাবে মাতৃ-লাভের উদ্দেশ্যে সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইয়া মাত্র শারীরিক স্বাস্থ্য, চিত্তস্থির কিংবা বিশিষ্ট কোনো শক্তি-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তত দিন মনোময় ক্ষেত্রে অক্ষেমই বিরাজ করে। তদ্ভিন্ন পুত্রগণ অর্থাৎ ধ্যানাদি যোগাঙ্গসমূহ, এখন কি সদ্বৃত্ত হইয়াছে, অথবা দুর্বৃত্ত— অসদাচরণশীল আছে? ইহাও সমাধির উৎকণ্ঠার কারণ। সৎ একমাত্র আত্মা —মা। তাহাতে বর্তমান থাকার নাম সদ্বৃত্ততা, আর মাতৃ-ভাবশূন্য কেবল বিষয়ভাবে বিচরণ করার নাম দুর্বৃত্ততা। যোগাঙ্গগুলি আত্মলাভ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অথবা মাত্র চিত্তস্থির উদ্দেশ্যে বা বিষয়মাত্রে বিমুগ্ধ, ইহাই সংশয়। সমাধির এরূপ সংশয় প্রথম অবস্থায় একান্ত স্বাভাবিক।

———○———

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।

তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥২২॥

অনুবাদ। (সমাধির এইরূপ পর্যাকুল অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া) রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন —বিষয়লোলুপ যে পুত্রদারাদি কর্তৃক আপনি নিরাকৃত হইয়াছেন, (কি আশ্চর্য)! আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি স্নেহানুরক্ত!

ব্যাখ্যা। যদিও নিয়ত পরিচ্ছিন্নত্বে মুগ্ধ ধ্যান-ধারণাদির ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া, সমাধি অসৎসঙ্গ-পরিহার বাসনায়, তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক মেধসাশ্রমে উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তাহাদের প্রতি চিত্তের অনুরাগভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বহু দিন সহবাসের ফলেই এইরূপ হয়। সমাধির ধর্ম —আত্মানুসন্ধান, মনের ধর্ম—চঞ্চলতা—বিষয়-অন্বেষণ। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা নিবন্ধন, বলবান মন কর্তৃক প্রথম প্রথম সমাধিকে নির্জিত হইতে হয়, তথাপি সে মনের প্রতি পূর্ব অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, ঐ চঞ্চলতা ঐ পরিচ্ছিন্নতার সাহায্যেই ত' আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ আছে। যাহারা আমার আমিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিবার প্রধান সহায়, তাহাদিগকে সাধনার অন্তরায় জানিলেও, নিতান্ত নির্দয়ের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি স্নেহ-শূন্য হওয়া প্রথম অবস্থায় সমাধির পক্ষে বড় কঠিন। সম্যক্ মাতৃভাবে বিভোর না হইলে, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হইলে, ইহা সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াও যখন জীব আমিত্বকে উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়, তখনই উহাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা কি সাধনার অঙ্গ, কি যোগাঙ্গ, কি ইন্দ্রিয় ধর্ম, কিছুই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহা পরে আরও ব্যক্ত হইবে।

———○———

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ।

কি করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। বৈশ্য বলিলেন— আপনি আমার বিষয়ে যাহা বলিতেছেন, তাহা এইরূপই বটে, (অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা আমি বিতাড়িত, তাহাদের মঙ্গলা-মঙ্গলের জন্যই আমার চিত্ত পর্যাকুল, ইহা ঠিকই বলিয়াছেন) কিন্তু কি করিব! অমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না।

ব্যাখ্যা। যোগাঙ্গসমূহ বিষয়াসক্ত হইয়া সমাধিকে বিতাড়িত করিয়া, নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও, সমাধি কিছুতেই সেরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। সমাধি সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত; সুতরাং দয়াই তাহার স্বভাব। অপরের দ্বারা শত উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপর একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করা সমাধির পক্ষে অসম্ভব। সমাধিরই অন্য পর্যায় প্রেম। বিশ্বব্যাপী প্রেমময় আত্মদর্শন যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে প্রেমহীনতা একান্ত অসম্ভব।

———○———

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।

পতিঃ স্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেম্বেব মে মনঃ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে ধনলুব্ধ পুত্র, পত্নী প্রভৃতি স্বজনগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম এবং স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগপূর্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, আমার মন তাহাদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

ব্যাখ্যা। ধ্যানের পিতৃস্থানীয়, ধারণার পতিস্থানীয় এবং যম নিয়মাদি স্বজনস্থানীয় সমাধির প্রতি যে স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে। উহারা সমাধিকে চিরদিনের জন্য ক্ষুদ্রত্বে মুগ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্তু সে আত্মসন্ধানে অগ্রসর হইয়া উহাদিগের স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন একটু একটু করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইলেও তাহাদের প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটিত হয় নাই । এইরূপ বিরুদ্ধভাব দ্বারা পর্যাকুল হওয়া, মলিন ভাবাপন্ন অল্পক্ষণস্থায়ী সমাধির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ; কেন না, এখনও সে বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থিত ; ব্রহ্মক্ষেত্রে এখনও সম্যক্‌ভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই । যদি বা কদাচিৎ তিলমাত্র সময়ের জন্য পরমাত্মসান্নিধ্য লাভ করে, তথাপি আবার তৎক্ষণাৎ মনোময় ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হয় ; সুতরাং পূর্বোক্তরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য বৈশ্য সমাধির একান্ত স্বাভাবিক।

কিমেতন্নাভিজানামি র্জানন্নপি মহামতে ।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্মনস্যং চ জায়তে ।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥২৫॥

অনুবাদ। হে মহামতে সুরথ ! বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন স্বজনগণের প্রতি আমার চিত্ত যে অতিশয় প্রেমপ্রবণ, তাহা বুঝিতে পারিলেও আমি ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না ; তাহাদের জন্যই আমার এই দীর্ঘনিশ্বাস ও দুর্মনায়মানতা উপস্থিত হইয়াছে। অনুরাগহীন স্বজন-গণের প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না।

ব্যাখ্যা। পূর্বে উক্ত হইয়াছে— প্রজা ও মন্ত্রিবর্গের অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ সুরথ বনে আসিয়াও পরিত্যক্ত রাজ্য, মন্ত্রী, প্রজা, ভৃত্য ও কোষাদির জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছেন। সমাধির অবস্থাও সেইরূপ । তিনি বিষয়লুব্ধ স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত ; অথচ তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল ; উভয়েরই তুল্য অবস্থা ; সুতরাং পরস্পরের প্রতি স্নেহানুরাগ স্বাভাবিক। তাই, বৈশ্য তাহার নিজের চিত্তের দুর্বলতার বিষয় কিছুই গোপন না করিয়া, সরল প্রাণে অসঙ্কোচে সুরথের নিকট প্রকাশ করিলেন।

জীবাত্মার সহিত বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে যখন সমাধির প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন তাহাকে এইরূপ মলিনভাবাপন্নই দেখা যায় ; কারণ, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে পূর্ণ নির্মলতা প্রস্ফুটিত হয় না । একমাত্র প্রজ্ঞায় প্রবেশ করিতে পারিলেই সর্ববিধ ভাবচঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । বুদ্ধি—জগৎমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষ । যদিও ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও স্থির উদাসীনবৎ অবস্থিত ; তথাপি তাহার সম্মুখে মন প্রতিক্ষণে সংস্কাররাশি একটির পর একটি আনিয়া উপস্থিত করে, তাহাতেই বুদ্ধিকেও চঞ্চল বলিয়া প্রতীতি হয় । দ্রুতগামী-শকটারূঢ় ব্যক্তি যেরূপ উভয়পার্শ্বস্থ নিশ্চল ভূভাগকে সচল বলিয়া মনে করে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। নিয়ত চঞ্চল মন একটির পর একটি সংস্কার উপস্থিত করিয়া, বুদ্ধি-জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া লইতেছে ; তাই অতি চঞ্চল মনের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ নিশ্চল বুদ্ধিও যেন চঞ্চলবৎ হইয়া থাকে । বহুজন্মসঞ্চিত সংসার-সংস্কারশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে চিদাভাসের নির্মল জ্যোতিতে আত্মহারা হয়, ঈষৎ সমাধির আভাস পাইতে থাকে, তখন যে অননুভূতপূর্ব আনন্দরসের আস্বাদ পায় ; যদিও তাহাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সামর্থ্য না থাকায়, পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে ; তথাপি সেই আস্বাদের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া সংস্কার শ্রেণীকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হয় ; কিন্তু কার্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারে না । তখন স্বকীয় দুর্বলতা দেখিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে ; উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে নিজের মর্মদাহ যেন আরও দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে থাকে । 'হায় ! আমার মত দুর্বলচিত্ত জীবের পক্ষে মাতৃ-লাভ সুদূরপরাহত !' এইরূপ ভাবিয়া সাধক নিতান্ত দুর্মনায়মান হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, কেন যে এইরূপ হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

জগতের মানুষ যখন কোন ভীষণ দুঃখের আবর্তে উৎপীড়িত হইতে থাকে, তখন যদি তাহার কারণটি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সেই দুঃখের মাত্রা যেন কিয়ৎ

পরিমাণে লাঘব হয় ; কিন্তু 'কারণ জানি না, অথচ উৎপীড়িত হইতেছি,' ইহা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। জানি—কামনী-কাঞ্চন, বিষয়-বাসনা কিংবা যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি সাধনার উপায়গুলি আমার মাকে আনিয়া দিবে না ; জানি—উহারা পরিচ্ছিন্নত্বে মুগ্ধ ; জানি—উহারা আমার হিতৈষী নহে, জানি—তাহারা চায় পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ ; আমি চাই—অপরিচ্ছিন্ন উদার মাতৃ-বক্ষ—মন বুদ্ধির অতীত অতীন্দ্রিয় আত্মসত্তা, অথচ দেখিতে পাই—মন এই অতুচ্চ আশা এবং তদনুযায়ী উদ্যম দেখিতে পাইয়া, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ অথবা কর্মকাণ্ডের সাহায্যে আমাকে ক্ষুদ্রত্বে মুগ্ধ রাখিতে উদ্যত। আমি প্রতি মুহূর্তে মনের প্ররোচনায় এইরূপ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি। আমার অমূল্য জীবন, আমার বহুজন্ম-সঞ্চিত অসহনীয় যন্ত্রণায় লব্ধ জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি অনর্থক পরিব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছি। পরিচ্ছিন্নতাই যে মুক্তিপথের একান্ত অন্তরায়, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কেন আমি তাহাদের এত অনুরক্ত। কিছুতেই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ; তাই তাহাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ভাবও পোষণ করিতে পারিতেছি না! যাহা বাস্তবিক হেয় বলিয়া বুঝিতেছি, কি যেন কি অজ্ঞাত কারণে তাহাকেই উপাদেয়রূপে পরিগ্রহ করিতেছি! হায় দুর্ভাগ্য! এইরূপ চিন্তা—এইরূপ দুর্মনায়মান সমাধিকে যেন নিতান্ত মলিন করিয়া রাখে।

একটু একটু করিয়া যখন সমাধির আভাস আসিতে থাকে, তখন সাধকের পক্ষে সংসার-সংস্কার, বিষয়ের ক্ষুদ্রতা এবং উপাসনার উপায়গুলির প্রতি যে পূর্বসঞ্চিত আসক্তি, উহা অতিশয় মর্মপীড়াদায়ক হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধক! মনে রাখিও—ইহাই তোমার শুভ মুহূর্ত। বহুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে আজ তুমি সমাধির সাক্ষাৎ পাইয়া, জীবত্বকে অসহনীয় যন্ত্রণাপ্রদ শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতেছ। মনে রাখিও—তোমারই জন্য মায়ের আমার বক্ষোবাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুত্র-স্নেহের আকুলতায় পীনস্তনে ক্ষীরধারা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, বহুদিন সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মনের মতন আদর করিতে পারেন নাই বলিয়া, আজ উন্মাদিনীবেশে দ্রুতবেগে সত্যলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। মনে রাখিও সাধক! তোমার জন্য মায়ের কত ব্যাকুলতা! তুমি এতদিন মাকে চাও নাই, বিষয় চাহিয়াছিলে—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ চাহিয়াছিলে ; তাই মা আমার বিষয়ের আকারে উপস্থিত হইতেন। নিজের স্বরূপটি কত কঠোরতায় লুক্কায়িত রাখিয়া, বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া, তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে চরিতার্থ করিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চনের আকারে মা কত জীবন তোমার উদ্দাম লালসা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তুমি যে পুত্র! তুমি চাহিয়াছিলে, আর মায়ের আমার বিচারের অবসর নাই, ভালমন্দ বিচার-বিমূঢ়া মা আমার—পুত্রস্নেহে অন্ধা মা আমার—তোমার সেই প্রার্থনার অনুরূপ কাম-কাঞ্চনের আকারে, রূপ রসাদি বিষয়ের আকারে, দেহ-মন-বুদ্ধির আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ওরে, এ স্নেহের কথা মনে করিলেও মর্ম শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ স্নেহ বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদের নাই ; এ স্নেহ ধরিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। মা আমার অদ্বিতীয় অনন্ত, তাঁহার স্নেহও অদ্বিতীয় অনন্ত। একবার দেখ, মা তোমার জন্য কি করিতেছেন! কত ব্যস্ত তোমায় বক্ষে লইতে, কত আকুল তোমার মলিনতা মুছাইতে, কত উন্মদনা তোমায় চুম্বন করিতে, কত আবেগ তোমায় নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে, এইরূপ প্রতিনিয়ত দেখিতে থাক! পরিচ্ছিন্নতার—চঞ্চলতার, বিষয়-বাসনার মোহ অচিরে বিদূরিত হইবে। শুভ দিন—বড় আনন্দের দিন আসিয়াছে ; সুরথ সমাধির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। যদিও প্রথম অবস্থায় সমাধি তত দৃঢ়, তত উজ্জ্বল, তত একাত্মপ্রত্যয়মাত্র না হউক, তথাপি উহার মূল্য বড় বেশী। উহা বহু জন্মের বহু সাধনার ফল।

সুরথ ও সমাধি উভয়ই এখন নিজেদের অভাব দেখিতে পাইতেছে। কি যেন একটা অজ্ঞেয় শক্তি, অজেয়-মোহ বিগুণ বন্ধুদের প্রতি, দুর্মতি পুত্রভার্যাদির প্রতি এবং বিনশ্বর কোষ বলাদির প্রতি বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছে। পশ্চাৎ দিকের এই প্রবল আকর্ষণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় জীবের কখন? যখন সম্মুখে মায়ের দিকের আকর্ষণ একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে পারে, যখন মাতৃ-স্নেহের প্রবল আকর্ষণের মাধুর্য এবং বিষয়াভিমুখী বিপরীত আকর্ষণের ক্ষণস্থায়ী রসের তিক্ততা উপলব্ধিযোগ্য হয়, তখন জীবমাত্রেই বলিতে বাধ্য হয়

—'তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে' । তখনই সাধক 'করোমি কিং' বলিয়া আকুল হইয়া, সেই অজ্ঞেয় শক্তি—অজেয় মোহের উচ্ছেদ সাধনে কৃতযত্ন হয় ।

———○———

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্ ।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ২৬॥

অনুবাদ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিপ্র ! (ক্রৌষ্টুকি) অনন্তর সমাধি নামক বৈশ্য এবং রাজসত্তম সুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া, সেই মেধস মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, যথাশাস্ত্র যথাযোগ্য সমুদাচারপূর্বক উপবেশন করিলেন এবং (উপযুক্ত অবসরে) কয়েকটি কথা বলিবার উপক্রম করিলেন ।

ব্যাখ্যা । জীব চিত্তবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সমাধির সাহায্যে পুনরায় বুদ্ধির নির্মলজ্যোতি আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হইলেন । পূর্বে সুরথ একা ছিলেন, তখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও মেধসের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । এখন সমাধির সহায়তায় সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । পূর্বে সুরথ মেধসকে স্মৃতিরূপ একপ্রকার বোধপ্রবাহমাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এখন তাহাকে প্রজ্ঞানরূপে গুরুর আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন । পূর্বে 'ব্রহ্মাস্মি' এই স্মৃতিরূপ পরোক্ষজ্ঞানমাত্র মনে করিয়া, সুরথ মেধসের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন । এখন সেই মেধসকেই সমস্ত সংশয়ের নিরাসক, হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপহারক এবং অনন্ত শান্তিদায়ক গুরুরূপে দর্শন করিলেন ।

যখন স্বকীয় জ্ঞানবলে এবং অধ্যয়নাদি দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে কিংবা সমধর্মী কোনো লোকের জ্ঞানের আলোকে কিছুতেই তত্ত্ব-উন্মেষ হয় না, কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না, সন্দেহ দূর হয় না, অজ্ঞান-অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া আসে । 'সবই বুঝি, আর একটু হইলেই যেন সব সন্দেহ বিদূরিত হয় ; অথচ সেইটুকু হইতেছে না, কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না —ঐ একটুকুর জন্যই যেন সব বৃথা হইতে চলিয়াছে । কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথা চেষ্টা, বৃথা আয়োজন, বৃথা তপস্যা, বৃথা কর্মোদ্যম ! সকলই করিলাম ; কিন্তু জীবনের কৃতকৃতার্থতা আসিল না— অমরত্বের আস্বাদ পাইলাম না, অভয়ের সন্ধান পাইলাম না, সংশয় মিটিল না ।' এইরূপ ভাবের দ্বারা জীব যখন একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । যখন কোনো দেশবিদেশ বা জাতিবিশেষের অধিকাংশ লোক এইরূপ ভাবের দ্বারা আকুল হইয়া পড়ে, তখনই তিনি জগদ্‌গুরুরূপে, ঋষিরূপে, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারূপে মনুষ্যদেহে প্রকটিত হইয়া সত্যের সমুজ্জ্বল আলোকে জীবজগৎকে ধন্য করিয়া যান । যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, ততদিন অতি অল্প লোকই যথার্থরূপে তাহাকে জানিতে পারে ; কিন্তু তিরোধানের পর জগৎ তাঁহার উপদেশ শুনিয়া, তাঁহার কার্য ও আদর্শ দেখিয়া, আর তাঁহাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না । স্বয়ং ঈশ্বরের বিশিষ্ট অবতারজ্ঞানে পূজা করিয়া ধন্য হয় । ইহাই মায়ের খেলা ।

সে যাহা হউক, উল্লিখিত মন্ত্র দুইটিতে গুরূপস্থানের কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে । আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব । দেখিতে পাইতেছি—একজন বৈশ্য পরমাত্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত, সাধনারূপ ধনে মহাধনী । **'অসৌ'** শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধনামা, তাহার নাম সমাধি । ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাধি শব্দটা কর্ণগোচরও করেন নাই, এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন । এইরূপ প্রখ্যাত একজন । অপর একজন — প্রসিদ্ধ রাজা পার্থিবসত্তম— জীবশ্রেষ্ঠ । সত্তম শব্দের অর্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ । যিনি সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের মাত্র সৎস্বরূপটির উপলব্ধি করিয়াছেন, 'আমার মা একজন আছেন' এই কথাটি যিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন, যাঁহার আস্তিক্য-বুদ্ধি কখনও সন্দেহ-বাত্যায় আন্দোলিত হয় না, তিনিই সত্তম । এ কথাটিও নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নহে । একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই সাধনার যথার্থ মূলধন । এই মূলধন যার যত বেশী, তিনি তত বেশী লাভবান হইয়া থাকেন । আমি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাহার রূপ, গুণ, স্নেহ, আদর, মহিমা প্রভৃতি কিছুই আমার জ্ঞাত নাই, মাত্র জানি—'আমার মা একজন আছেন ।' এই কথাটিতে এমন একটা বিশ্বাস আনা চাই যে, শত সহস্র

ঘাত-প্রতিঘাত সন্দেহ বিতর্ক বিরুদ্ধ প্রমাণ যতই আসুক না কেন, আমার সেই সত্যজ্ঞান, সেই অস্তিত্ব-বোধকে বিন্দু মাত্রও চঞ্চল করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবে যিনি মায়ের সৎস্বরূপটির সাধনায় সিদ্ধ, তিনিই পার্থিব-সত্তম, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীববৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ দুইজন উচ্চস্তরের সাধক যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহর্ষি সেই কথা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন—'**তেন সহ যথান্যায়ং যথার্হং সংবিদং কৃত্বা উপবিষ্টৌ**।' তাঁহার সহিত যথান্যায় যথাযোগ্য সমুদাচার করিয়া উপবেশন করিলেন।

'যথান্যায়' শব্দের অর্থ বিধি-অনুসারে এবং 'যথার্হ' শব্দের অর্থ যথাযোগ্য। কিরূপ সমুদাচার যথাশাস্ত্র এবং যথাযোগ্য হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। গুরুর সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র যেন মনে হয়—এই সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যিনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের চিরসখা, চিরসুহৃৎ, হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, যিনি বিজ্ঞানময় সর্বভূত-মহেশ্বর-মূর্তিতে সর্বভূতে বিরাজিত, সমগ্র জগৎ যাঁহাতে অবস্থিত, এক কথায় আমি যাঁহাকে চাই, তিনি—সেই মা-ই আমার প্রতি স্নেহে, পরম কৃপায় শুধু আমারই জন্য আজ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তেই আমার সর্ববিধ বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। ইনিই দয়া করিয়া আমার অজ্ঞান-অন্ধ নয়নে দিব্য জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, বা দিতে পারেন ; এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তোমার প্রাণ যেমনটি করিতে চায়, তাহাই করিবে। যথাশক্তি বিনয় নম্রভাবে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণামপূর্বক, চরণস্পর্শের অধিকার দিলে, চরণস্পর্শ করতঃ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। তিনি যতক্ষণ না কোনো কথা বলেন, ততক্ষণ ধীরভাবে তাঁহার অনুমতি-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। এক কথায় তুমি যদি সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হও, তবে তোমার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতির যেরূপ পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া মনে কর, যদি গুরুদর্শনমাত্রেই সেইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে— তোমার যথান্যায় যথাযোগ্য সমুদাচার করা হইল। 'সম্বিদ্' শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। গুরুতে যথার্থ ভগবৎ-বুদ্ধি না হইলে প্রকৃত সম্বিদ্ হয় না। এই সম্বিদ্ যাহার যত সরলতাপূর্ণ, যত সত্যে ও বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি তত শীঘ্র গুরুকৃপালাভে চরিতার্থ হইবেন। 'গুরুর কৃপা হ'লে ভূমণ্ডলে জন্ম মৃত্যু হয় না আর।' গুরু-গীতা বলেন —'**মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা !**'

সমুদাচারের পর উপবেশন—শ্রীগুরু আসন-গ্রহণের অনুমতি কিংবা ইঙ্গিত করিলে, তবে উপবেশন করিবে। উপবেশনেরও একটু বিশেষত্ব আছে। পদদ্বয় যেন বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, মেরুদণ্ড যেন সরলভাবে থাকে, মস্তকটি যেন ঈষৎ অবনত থাকে। উহার সমস্ত আদেশ পালন করিবার জন্য তুমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত, এমনি একটা ভাব যেন তোমার উপবেশন হইতে প্রকাশ পায়। সর্বপ্রকার ঔদ্ধত্য, বিতণ্ডা, পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখনির্গত প্রত্যেক বাণীটি দৃঢ় অভিনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিক্ষণে উৎকর্ণ থাকিবে। গুরু আনন্দময় মহাপুরুষ সর্বদা বালকবৎ সরলভাবে অবস্থিত ; তাই হয়ত কোনো কথা হাস্যজনক হইতেও পারে, তাহাতে তুমি এমন হাসিও না, যাহাতে একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। স্থূল কথা—ধীর, স্থির, শুশ্রূষু, বিনীত এবং আদেশ পালনে উদ্যত, এই পঞ্চ-ভাব-প্রকাশক উপবেশনই শিষ্যযোগ্য।

আজকাল দেশে কি একটা বিপরীত ভাব আসিয়াছে, কেহই শিষ্যত্ব অর্জন করিতে চায় না ; আগেই গুরু হইয়া বসিতে চায়। শিষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই যে সব লাভ হয়, এ কথা দেশ ভুলিয়া গিয়াছে। ওরে, শিষ্য ঠিক হইলে গুরু মৃন্ময় মূর্তি হইলেও মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। শিষ্যত্বের সাধনা করিয়াছিল সত্যকাম, উপমন্যু, আরুণি, বেদ, কৌৎস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণ। মহাভারতে আর একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে—চণ্ডালপুত্র একলব্য। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মৃন্ময় গুরুমূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক এরূপ অভূতপূর্ব অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল যে, একদিন দ্রোণাচার্যের সর্বপ্রধান শিষ্য সর্বায়ুধ-বিশারদ অর্জুনকেও তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধন্য শিষ্যত্বের সাধন ! আগে হৃদয়ে হৃদয়ে গুরুর আসন রচিত কর। স্বয়ং

শিষ্যত্ব-লাভের যোগ্যতা অর্জন কর। গুরুর জন্য আকুল হইতে হইবে না ; গুরুর অভাব নাই ! গুরু প্রতিনিয়ত তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন— কবে তুমি আসিবে, কবে তোমায় কৃতার্থ করিবেন। তুমি কেবল গুরুর বিচার করিয়া বেড়াইও না, নিজে শিষ্য হইয়াছ কি না দেখ। গুরু যে কেহ হইতে পারেন। ভাগবতে আছে— অবধূতের পশু, পক্ষী পর্যন্ত গুরু হইয়াছিল ; সুতরাং শিষ্যত্বলাভ করাই প্রকৃত সাধনা।

দেখ, হিন্দুর ঘরের মেয়েরা কিরূপ করে ? দশ বার বৎসরকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া, মাতৃ-পিতৃস্নেহে লালিতপালিত হইয়া, সহোদর, সহোদরা ও অন্যান্য প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সহ একত্র কালযাপন করে। পরে একদিন এক মুহূর্তে কে একজন অপরিচিত লোক আসিল, রাত্রিকালে ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত দেহে হয়ত চারি চক্ষুর মিলনও হইল না। পুরোহিত মহাশয় কি দুই-চারিটি সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিলেন। রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া সেই মেয়েটি পূর্বপরিচিত মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব, ভাই-ভগিনী সব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত পুরুষটির সঙ্গে চলিল। মনে ভাবিল,—উনিই আমার সর্বস্ব। উনিই আমার ইহ-পরকালের গতি, আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মীয় বটে ; কিন্তু ইঁহার মতো প্রিয়তম নিকট হইতে নিকটতম কেহ নয়। একবার দেখিল না, যাহার সঙ্গে সে চলিয়াছে, সে অন্ধ কি বধির, মূর্খ কি পণ্ডিত, সাধু কি তস্কর, কিছু বিচার নাই, কিছু সন্দেহ নাই, যেমনি থাকুক না কেন, ইনিই আমার সর্বস্ব। এই এক মুহূর্তের পরিবর্তন কি সুন্দর ! কি তীব্র সাধনার ফল। ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কেন এমন হয় ? এত হঠাৎ কিরূপে এই পরিবর্তন সম্ভব হয় ? কারণ আর কিছুই নহে। ঐ বালিকাটি বহুদিন হইতে পত্নীত্বের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সে জানিত—আমি একজনের ভার্যা হইব। সে যিনিই হউন না কেন, তিনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। বহুদিনব্যাপী এইরূপ ধারণার ফলে, এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। ঠিক এমনি করিয়া প্রাণে প্রাণে গুরুর আসন রচনা কর। নিজে শিষ্য হও। এমন এক মুহূর্ত আসিবে যে, আর তোমার গুরু-বিচার করিবার অবসর থাকিবে না। আর ভাবিবার সময় পাইবে না যে, ইনি আমার গুরু হইবার উপযুক্ত কি না, ইনি আমায় মুক্তিমার্গে লইয়া যাইতে পারিবেন কি না ; ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া যিনি গুরুরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, তাঁহার নিকট তোমার প্রাণ স্বতঃই নমিত হইয়া পড়িবে। গুরু একটি আলম্বনমাত্র। সব নিজেকেই করিতে হয়। কাহারও মুক্তি কেহ করিয়া দেয় না, বা দিতে পারে না। যাঁহারা সমস্ত ভার গুরুর উপর দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন, এরূপ মহাপুরুষ জগতে অতি বিরল। সে সকল ক্ষেত্রেও শিষ্যের অজ্ঞাতসারে গুরু মুক্তির অনুকূল কার্যগুলি সম্পাদন করাইয়া লন ; কিন্তু গুরুর এমনি মহিমা যে, শিষ্য বুঝিতে পারে না— 'আমি সাধনা করিতেছি।'

সে যাহা হউক, জীব বহুজন্মের সুকৃতির ফলে সমাধির সাক্ষাৎ পায় এবং উভয়ই উভয়ের অভাব বুঝিতে পারে। অভাব কিসের ? জ্ঞানের। একবিন্দু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীবকে কত প্রাণপাত তপস্যা করিতে হয়। সাধারণতঃ জীব যাহাকে শ্রেয় বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা প্রেয় হয় না, অথচ যাহা প্রেয়ঃ, তাহাকেও শ্রেয়োরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। যে জ্ঞানজ্যোতিঃ এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সমস্যা বিদূরিত করিয়া দেয়, সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ বোধরূপী গুরুর সমীপস্থ হইতে হয়। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই গুরুরূপে তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি অন্তর্যামী চিন্ময় মহাপুরুষ। যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সাক্ষাৎ না পায়, ততদিন প্রকৃত শান্তির কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। বাহিরে মনুষ্যমূর্তি-গুরু যতদিন বিজ্ঞানময় মহেশ্বর-মূর্তিতে প্রকটিত না হন, ততদিন যথার্থ গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ হইলে জীবের আর কোনো ভয় থাকে না ; তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত।

একমাত্র অভিনিবেশের সাহায্যে এই হৃদয়স্থ গুরুর সমীপস্থ হইতে হয়। একটু একটু করিয়া সমাধি আসিলেই, জীব এই বোধময় গুরু মেধসের সমীপে উপনীত হইতে পারে। তাই, বৈশ্য সমাধি ও পার্থিব সুরথ আজ বড় আনন্দের সহিত বোধময় গুরুর চরণে উপসন্ন হইয়া **'কশ্চিৎ কথাঃ চক্রতুঃ'** নিজেদের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একটি গানে শুনিয়াছিলাম, 'বলবো যত দুঃখের কথা কৈলাসেতে গিয়ে।' কথাটি অতি সত্য। আগে কৈলাসেতে যাও, তার পর ত' দুঃখের কথা

মাকে জানাইবে ! মা যে আমার কৈলাসের সমুন্নত শিখরে—গুরুবক্ষে নিত্য বিরাজমানা ! মাকে দেখিবে—কৈলাসে যাও । গুরুকে ধর । দেখিবে গুরুই মা, কি মা-ই গুরু বুঝিবার অবসর থাকিবে না । ওরে, গুরু যে বড় আপনার লোক, প্রাণের প্রাণ, সখা হইতে প্রিয়তম, বন্ধু হইতেও সমধিক স্নেহশীল, ভার্যা হইতেও সমধিক আনন্দদাতা, সে যে নিতান্ত অন্তরঙ্গ । তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে না, কোথায় বলিবে ?

মনে করিও না, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা উপদেশ পাইলেই গুরুলাভ হইল, গুরু যতদিন 'আমার' না হন, একান্ত আত্মীয়—একান্ত অন্তরঙ্গ না হন, ততদিন গুরুলাভ হয় না । যথার্থ গুরুলাভ হইলে শিষ্য অনসূয় হয়, অর্থাৎ গুরুর দোষদর্শনে অন্ধ হয়, গুরুর প্রত্যেক কার্য-প্রত্যেক ইঙ্গিতই তখন মহান উদ্দেশ্যপূর্ণ ঐশ্বরিক কার্য বা ইঙ্গিতরূপে শিষ্য-হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে । আদর্শ-শিষ্য অর্জুন এইরূপ অসূয়াহীন হইতে পরিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান অপূর্ব রাজগুহ্য যোগের উপদেশ প্রদানে তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন ।

———○———

রাজোবাচ

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥২৭॥

অনুবাদ । রাজা বলিলেন হে ভগবন্ ! আপনার নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি, আপনি (অনুগ্রহ করিয়া) বলুন ।

ব্যাখ্যা । সমাধি-সহায় জীবাত্মা বোধময় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথমে সম্বোধন করিলেন—'ভগবন্' ! শিষ্যের গুরুকে যে কি ভাবে দর্শন করিতে হয়, তাহা এইস্থানেই পরিব্যক্ত হইয়াছে । আধ্যাত্মিক দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবাত্মা যখন প্রজ্ঞানের সমীপস্থ হয়, তখন ত' তাহাকে ভগবান বলিতে বাধ্য হইবেই ; কারণ, প্রজ্ঞানই যে ব্রহ্ম । গুরু ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; সুতরাং সে অবস্থায় ভগবান বলা একান্ত স্বাভাবিক । ব্যবহারিক জগতেও যখন কোনো শিষ্য গুরুর সমীপস্থ হন, তখনও যে গুরুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বররূপে দর্শন করা উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে 'ভগবন্' শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে । বিচার বা বিবেকের সাহায্যে কল্পনার দ্বারা গুরুকে ঈশ্বররূপে দর্শন নিম্নাধিকারিতার সূচনা করে । গুরুমূর্তি-দর্শন অথবা গুরুর নাম-স্মরণ বা শ্রবণ করা মাত্র সরলপ্রাণ শিশুর মতো মনে হওয়া উচিত, উনিই আমার ভগবান । যেরূপ নিজের মা বিকলাঙ্গ হইলেও 'আমার মা' বলিয়া একটা কি যেন অব্যক্ত সরল সত্যসম্বন্ধ প্রকাশ করে ; ঠিক সেইরূপ, গুরু যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমার ইহ-পরকালের গতি, তিনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, শুধু আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মনুষ্যমূর্তিতে বিরাজিত । হইতে পারে তিনি বহুলোকের গুরু, আমার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই । তিনি আমার গুরু—ব্রহ্ম । ইহা যে কেবল ধারণা বা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে ; যথার্থই ভগবান ব্যতীত আর কাহারও গুরু হইবার অধিকার নাই । যদি কোনো জীবভাবাপন্ন মানুষ নিজেকে গুরু মনে করেন, তবে তিনি অনায়াসে 'উ'কারটি পরিত্যাগ করিয়া লইতে পারেন ; কারণ, তিনি অজ্ঞানান্ধ । গুরুগীতায় প্রত্যেক মন্ত্রটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে—গুরু কে ? মনুষ্যদেহ গুরুর আসনমাত্র, যেরূপ শালগ্রামশিলা যে সিংহাসনে থাকে সেই আসনখানাও আমাদের পূজ্য, সেইরূপ যে দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তি প্রকাশ পায়, সে দেহটিও আমাদের পূজ্য । গুরু—একজন । কেহ কখন কাহারও গুরু-নিন্দা করিও না ; কারণ, তোমার গুরু ও আমার গুরু পৃথক নহেন । বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বাহ্য আবরণগুলি গুরুর ভেদক চিহ্ন নহে । যেরূপ সকল কাচাধারের মধ্যে একই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, কেবল আকারগত বর্ণগত বৈচিত্র্যবশতঃ আলোর বিচিত্রতার উপলব্ধি হয়, সেইরূপ একই গুরু বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া, বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন । সর্বদা মনে রাখিবে—'মদ্‌গুরুঃ—শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।'

এস্থলে গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বলা হইতেছে । অধীতবেদ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই উভয়গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সদ্‌গুরুপদবাচ্য । শাস্ত্রজ্ঞান থাকিয়া যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, কিংবা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যদি শাস্ত্রজ্ঞানহীন হন, তবে তিনি সম্যক্‌ভাবে শিষ্যের অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ নহেন ।

শাস্ত্র এবং যুক্তি বলে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদন, এবং সাধনা দ্বারা তাহা শিষ্যহৃদয়ে সমুদ্দীপিতকরণ ; এই উভয়শক্তি যাঁহাতে পূর্ণভাবে প্রকটিত, তিনিই শিষ্যের অনেক জন্মসঞ্চিত কর্ম-বন্ধ বিদাহ করিতে সমর্থ ; বহু সৌভাগ্যবলে এরূপ গুরু লাভ হয় । যাঁহারা কৌলিক নিয়মানুসারে মাত্র তান্ত্রিক মন্ত্রাদি প্রদান করেন, তাঁহারাও শিষ্যকে সর্বপ্রথমে ধর্মপথে প্রবর্তিত করিয়া জীবের আত্মোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন ; সুতরাং তাঁহারাও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজনীয় । মন্ত্রদাতা ও মুক্তিদাতা ভেদে গুরুশ্রেণীতে দ্বিবিধ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । যে শক্তি মন্ত্রদাতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া লৌকিকী দীক্ষা-প্রদানে জীবের মঙ্গল-দ্বার উদঘাটিত করেন, সেই গুরুশক্তিই আবার মুক্তিদাতারূপে, হয়ত অন্য কোনো মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া মুক্তিপথ উন্মুক্ত করিয়া দেন । তাই বলিতেছিলাম—গুরু বহু নয়, একজন ।

আজকাল কেহ কেহ গুরুশক্তির এই রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া, কৌলিক গুরু পরিত্যাগপূর্বক কোনো সাধু মহাপুরুষের অথবা কোনো দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া, পূর্বপুরুষের গুরুকে নানারূপ অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; ইহা অতীব অজ্ঞানতার পরিচায়ক । গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যথারীতি আশ্রমধর্ম পরিপালন ও গৃহস্থ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, তদুপদিষ্ট উপায়ে অভ্যুদয়-লাভের জন্য যত্নবান হওয়াই গৃহস্থের কর্তব্য । সে কর্তব্যলঙ্ঘন অনেক স্থলে উন্মার্গগমন ও অধঃপতনের সূচনা করে । তবে ইহাও স্থির, যেরূপ ভ্রমরগণ মধুর জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য বহু গুরুর শরণাপন্ন হওয়াও শাস্ত্রে অবিহিত নহে । যতদিন অধীতবেদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুলাভ না হয় ততদিন তাদৃশ গুরুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য কাতরপ্রাণে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় । এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন দেখিবে–তোমারই প্রাণের মতো গুরু মিলিয়াছে । অভূতপূর্ব উপায়ে অচিন্তনীয় ঘটনায় এই শুভ সম্মিলন হয় । মা-ই আমার গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । লীলাময়ীর প্রত্যেক লীলাই অভূতপূর্ব ও অচিন্তনীয় । আসল কথা— ঐ কাতর প্রার্থনা ; 'আমি যথার্থই চাই' এই ভাবটি যতদিন প্রাণে না জাগিবে, ততদিন গুরু কেন, জগতের ধনৈশ্বর্যও লাভ করা যায় না। এই যে দেখিতে পাও—যাহারা দরিদ্র, তাহারা মুখে বলে ধন চাই ; কিন্তু যথার্থ প্রাণের অন্তস্তল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়— সে ধন চায় না । ঐ দরিদ্র অবস্থাই তাহার প্রীতিকর, তাই সে ধন পায় না । যাহার প্রার্থনা যত সত্য, তাহার অভীষ্টলাভও তত সহজ । মা যে আমার কল্পতরু, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে । ইহা ধ্রুব সত্য ; সুতরাং প্রথমে মায়ের নিকট গুরুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রার্থনা কর ; তিনি সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া কি চাহিতে হইবে, কেমন করিয়া চাহিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন, অথবা অভীষ্টপ্রদানে কৃতার্থ করিবেন ।

গুরুলাভ হইলে শিষ্যের কর্তব্য কি ? এ বিষয়েও শাস্ত্র বলিয়াছেন— তনু, মন, ধন, ও বাণী, এই চারিটি যথাসম্ভব শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিতে হয় । সর্বতোভাবে গুরুর আদেশ পালনের জন্য দেহটি শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করার নাম তন্বর্পণ । প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করার নাম মনার্পণ । ঈশ্বরের সেবা পূজাদির ফল অনেকস্থলেই অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ গুরুর সেবা পূজাদির ফল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ই । এই হিসাবে গুরুকে ঈশ্বরেরও উচ্চে আসন দেওয়া যাইতে পারে । গুরু যদি সংসার-আশ্রমী হন, তবে ধন, বস্ত্র, ভূষণ, পশু প্রভৃতি যাহা কিছু নিজের আছে, সে সমস্তই তাঁর চরণে নিবেদন করার নাম ধনার্পণ । ভয় নাই ! ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া তোমায় পথের কাঙ্গাল করিবেন না । যদিই বা করেন, তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিবে । বৎস ! একটু কষ্ট না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । জিনিষটি নিতান্ত সহজ নয় । যাহা লাভ করিলে তুমি অমর হইবে, নিত্যানন্দ ভোগ করিবে, পৃথিবীতে থাকিয়া অপার্থিব জীব হইবে, তাহা শুধু মৌখিক ভক্তিতে লাভ করা যায় না । তোমার প্রাণ সংসারের নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই সমগ্র প্রাণটি তুলিয়া লইয়া গুরুর চরণে অর্পণ করিতে হইবে । সর্বধন-অর্পণ তাহার প্রথম আয়োজন মাত্র । আর যদি গুরু সন্ন্যাসী হন তবে, শিষ্যকেও সর্বস্ব পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হইতে হইবে । অনন্তর তিনি যদি পুনরায় গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করেন, তবে সে আদেশ পালন করিবে । সর্বদা গুরুর গুণগান করার নাম বাণী-অর্পণ । এইগুলি করিতে

পারিলে শিষ্যের কর্তব্য শেষ হয়। তখন গুরুর কর্তব্য আরম্ভ হয়।একদিনের চেষ্টায় না হইতে পারে—কিছু-দিনের যত্নে শিষ্যত্ব অর্জন, গুরুর উপরে সমস্ত ভার-অর্পণ—নিতান্ত অসম্ভব নহে।ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমায় সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া তোমায় অমৃতধনে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। ওরে, যতদিন না শিষ্য মুক্ত হইতে পারে, ততদিন গুরুর মুক্তি নাই, বিশ্রাম নাই; বড় ভীষণ দায়িত্ব। জান, গুরু কি জিনিষ দিয়া থাকেন? **'একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোহনৃণী ভবেৎ ॥'** গুরু শিষ্যকে এক অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে প্রবোধিত করেন; পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ নাই, যাহা তাহার বিনিময়ে অর্পণ করিয়া শিষ্য অঋণী হইতে পারে। জানিস, গুরু শিষ্যকে কি জিনিষ দেন—এক অক্ষর দেন, প্রবোধিত করেন—জাগান। জানিস, গুরু শিষ্যকে কি দেন—প্রাণ! নিজের প্রাণ, যাহা পুত্রকেও দিতে কুণ্ঠিত, সেই প্রাণ নিজের হাতে তুলিয়া শিষ্যের বুকে বসাইয়া দেন। জানিস, গুরু শিষ্যকে কি দেন— নিজে মরিয়া শিষ্যকে বাঁচান। যে ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করিলে জগৎ বলিয়া, শিষ্য বলিয়া, দীক্ষা বলিয়া আর কিছু থাকে না, ওরে সেই ব্রহ্মানন্দ হইতে নিম্নে অবতরণ করেন। শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, স্নেহে আকুল হইয়া, সেই আনন্দ শিষ্যদের মধ্যেই বিতরণ করেন। তাহাতেই তাঁহার সুখ। নিজের সুখ তাঁহারা চান না। জানিস, গুরু শিষ্যকে কি দেন? শিষ্যের যত কিছু মলিনতা, যত কিছু সন্তাপ, যত কিছু পাপ, নিজে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পবিত্রতায়, পুণ্যের উজ্জ্বল আলোকে শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। আর জানিস গুরু শিষ্যকে কি দেন? না সে আর বলা চলে না। যে শিষ্য সে প্রাণে প্রাণে বুঝিবে।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—**'যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ ॥'** যাঁহার গুরুতে ঈশ্বর-জ্ঞান আসিয়াছে, যিনি গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানেই ভক্তি করিতে পারেন, একমাত্র তাঁহার নিকটেই গুরূপদিষ্ট সাধনরহস্যসমূহের যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, জীবাত্মা সমাধির সাহায্যে শুদ্ধবোধে সমাহিত হইয়া, চিত্তবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে উদ্যত হইলেন!

ইহাই এই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ। 'বদস্ব তৎ' তাহা বল। এই অংশটুকু গুরুর অনুমতি। রাজা বলিলেন **'প্রষ্টু-মিচ্ছামি'**; মুনি অনুমতি দিলেন—**'বদস্ব তৎ'**। তারপর রাজা স্বকীয় বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রটির এইরূপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে।

———○———

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ॥
জানতোহপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥২৮॥

অনুবাদ। হে মুনিসত্তম! আমার মন (পরমাত্মায় নিরুদ্ধ না হওয়ায়) নিতান্ত অবশীভূত, তজ্জন্য আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। এই দেখুন, আমার পরিত্যক্ত রাজ্য (দেহাদিপুর) এবং অখিল রাজ্যাঙ্গ (বৃত্তিসমূহ), এই সকলের প্রতি আমার মমতা কত! আমি জানি—ইহার কিছুই আমার নহে, তথাপি অজ্ঞের মতো আমার চিত্ত তাহাতে আসক্ত! ইহা কিরূপ, অর্থাৎ কেন এইরূপ হয়?

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্বে সমাধির সহিত সুরথ যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, যে চিত্তবিক্ষেপের হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া, গুরু মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন। বোধময় গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়াসক্তির কেন্দ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এস্থলে **'জানতোহপি যথাজ্ঞস্য'** 'জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞ' এই কথাটির মধ্যে একটি সুন্দর রহস্য আছে। আমরা অনেকেই জ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারি—সংসার আমার নহে, দেহেন্দ্রিয়াদি আমার নহে, অন্যকে বুঝাইবার সময়েও বেশ বলিতে ও বুঝাইতে পারি; কিন্তু কাজের বেলায় আমরা সকলেই অজ্ঞ। জ্ঞানে যাহা বুঝি, অনেক সময়ে কার্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারি না। সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়। বুদ্ধির নির্মল জ্যোতিতে হৃদয় যতই আলোকিত হইতে থাকে, সংসারসংস্কার-শ্রেণীর ততই অকিঞ্চিৎকরত্ব-বোধ হইলেও, চিত্তের চিরাভ্যস্ত বিষয়াসক্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মা আমার একদিকে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া সাধক-হৃদয়ে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক যতই উদ্ভাসিত করিয়া দিতে থাকেন, ততই সে দেখিতে পায়—তাহার চিত্ত পূর্বে যেরূপ বিষয়বিমূঢ় ছিল, দেহাত্মজ্ঞানে মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে।

জ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারে—দেহ কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, সংস্কার কিছু নয় ; ও সব মায়েরই স্বেচ্ছাকৃত একটা ক্ষুদ্রতার খেলামাত্র ; কিন্তু মন যে ঐ ক্ষুদ্রত্বেই মুগ্ধ, তাহাকে ত' ছাড়াইবার উপায় নাই ! এ সকল দোষ যে পূর্বে ছিল না, তাহা নহে, তবে তখন ইহা যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই, তখন এই সংসার-কূপে—বিষাক্ত বায়ুপূর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বেশ সুখেই অবস্থান করিতেছিল ; কিন্তু জীব এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে—সমাধির সহায়তা লাভ করিয়াছে, শুভ্র আলোকমণ্ডিত সেই উদার অনন্ত চিন্ময় আকাশ চক্ষে পড়িয়াছে, আর ত' সেই পূর্বের অবস্থা প্রীতিকর হয় না ! '**ত্যক্তুম্ ভোক্তু মশক্তা যে দুঃখিনস্তে ত্বহর্নিশম্**।' এই অবস্থায় বিষয়াসক্তি-পরিহার অথবা বিষয়-ভোগ-জনিত প্রীতিলাভ, এই উভয়েরই অভাববশতঃ জীব অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়ে। তাই, মন্ত্রের প্রথমেই 'দুঃখায়' কথাটি উক্ত হইয়াছে।

———○———

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্ত স্তেষু হার্দী তথাপ্যতি ॥ ২৯ ॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩০॥

অনুবাদ। কেবল আমি একা নহি, এই যে সমাধি, ইনিও পুত্র, দারা, স্বজন এবং ভৃত্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত —পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ! এইরূপে আমি এবং সমাধি দুইজনেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি ; যেহেতু দৃষ্টদোষ-বিষয়েও আমাদের মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যা। ঐটুকুই দরকার ! মা আমার ঐটুকুরই অপেক্ষা করিতেছেন, —ঐ '**অত্যন্তদঃখিতৌ**'। বহু জন্মান্তর, বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া, পুত্রকে বক্ষে করিয়া অনন্ত জন্মমৃত্যু-প্রবাহের ভিতর দিয়া, পুত্রেরই অভিলাষ-সিদ্ধির অন্তর্নিহিত স্বকীয় মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা পরিচালিত করিয়া, মা আজ সন্তানকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, সে বলিতেছে—আমরা বড় দুঃখিত। দেখিতে পাইতেছি—বিষয়সমূহ দোষ-যুক্ত—নশ্বর পরিণামী অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছিন্ন পরিণাম-বিরস ; এত দোষ এখন দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। এতদিন দেখিতে পাই নাই, বেশ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি—'**বহুদোষা হি বিষয়াঃ**'। তথাপি মমত্বাকৃষ্ট-মানস—মন তাহাতেই আসক্ত। ইহা হইতে পরিত্রাণেরও কোনো উপায় দেখিতে পাইতেছি না ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা কষ্টদায়ক আর কি আছে ?

সত্য-সত্যই জীব যখন দেখিতে পায়—বিষয় বিষমাত্র, তথাপি কি যেন অজ্ঞেয় শক্তির তাড়নায় সেই বিষ গলাধঃকরণ করিতে হয়, তখন ইহা অপেক্ষা নরকযন্ত্রণা আর কি হইতে পারে ? প্রথম প্রথম এই যন্ত্রণা সামান্য মাত্রায় অনুভূত হয়। মা আমার যতই দয়া করিয়া বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থানের সুযোগ ও সময় বেশী করিয়া দিতে থাকেন, ততই যেন এই যন্ত্রণার মাত্রা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। জগতের কাজ করিতে হয় করে ; কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না। এমনি একটা মর্মপীড়া অন্তরে অন্তরে হইতে থাকে, ইহা সাধক ভিন্ন অপরে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম—সাধক হওয়া অপেক্ষা না হওয়া বরং এক পক্ষে সুখের বলা যায়। যে জানে না—ইহা বিষ, সে অনায়াসে খাইতে পারে ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া যে কি কষ্ট, তাহা অবর্ণনীয় !

যাহা হউক, আজ মা আমার গুরুরূপে, শুদ্ধ-বোধরূপে, বিজ্ঞানময় মহেশ্বররূপে আশুতোষ-মূর্তিতে উপবিষ্ট হইয়া পুত্রের মুখে শুনিতেছেন, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।' একদিন মা আমার গীতাচ্ছলে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন— '**অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্**।' এই অনিত্য অসুখময় সংসার পাইয়া আমাকে ভজনা কর। আজ আমরা দেবীমাহাত্ম্যে আসিয়া তাহারই কার্যকারী অবস্থা দেখিতে পাইতেছি। সুরথ ও সমাধির ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই লোককে অনিত্য বোধ হইয়াছে ; নতুবা '**দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে**' কেন বলিবেন ? অসুখ-বোধও যথেষ্ট হইয়াছে ; নতুবা '**অত্যন্তদুঃখিতৌ**' কেন বলিলেন ? সত্য সত্যই দুঃখ জিনিষটা বড় ভাল। দুঃখই মাকে আনিয়া দেয়। দুঃখের মতো বন্ধু আর কেহ নাই। দুঃখ দিয়াই জীব সুখ কিনিয়া থাকে। দুঃখই যেন মায়ের অগ্রদূত ; তবে কথা এই যে, দুঃখের বোধ হওয়া চাই—অনুভব হওয়া চাই। অনেকে আছেন—দুঃখ ত' দুঃখ, পরিধানে বস্ত্র নাই, বাসগৃহ নাই, উদরে অন্ন নাই, ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী, পুত্র

অপ্রিয়, বন্ধুগণ উচ্ছৃঙ্খল, তথাপি বেশ আছেন। উহারই মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কোনো রকমে দিনযাপন করিতে পারিলেই হয়। কই, তাহাদের দুঃখের অনুভূতি কোথায়? যাহার দুঃখের যথার্থ অনুভূতি আসিয়াছে, সে অচিরাৎ দুঃখমুক্ত হইবেই। মা ঐ অনুভূতির জন্যই ত' দুঃখরূপে আসেন। সাংসারিক দুঃখের অনুভূতি জাগাইয়া, তবে সাধনাক্ষেত্রে জীবকে প্রবেশ করান ; তারপর মাতৃ-স্নেহরসে অভিসিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে সাধনাক্ষেত্রের দুঃখগুলি ফুটাইয়া তুলেন।

জানি মা দুঃখরূপেও তুমি, অনুভূতিরূপেও তুমি, আবার দুঃখের সংহন্ত্রীরূপেও তুমি, তথাপি বলিতেছি—আমাদের দুঃখের অনুভূতি থাকুক বা না-ই থাকুক, তুমি ত' দেখিতেছ মা! অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অত্যন্ত দুঃখিত সন্তান আমার হতাশ-প্রাণে পথভ্রান্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি ; যাহা আপাত-মধুর পরিণাম-বিরস, তাহাকেই যথার্থ সুখ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি ; যাহা বাস্তবিক আত্ম-মোহজনক, সেই তামসিক সুখকেই ভূমা সুখ মনে করিয়া, নিদ্রা আলস্য মোহ অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা-জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতেছি ; আর যাহা প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাই না ; তাহারই ফলে নানাবিধ সন্তাপে নিয়ত সন্তপ্ত হইতেছি। ঐ দেখ মা, তোর ত্রিতাপদগ্ধ পুত্রগণ একবিন্দু স্নেহবারির আশায় শুষ্ককণ্ঠে 'মা মা' বলিয়া ছুটিতেছে, আর তুই বিশ্বের জননী, বিশ্ববিধাত্রী মা হইয়া পাষাণের মতো স্থির ধীর অচল মূর্তিতে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিস কোন্ প্রাণে? বড় অন্ধ জগৎ, বড় সন্তপ্ত জগৎ, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, মাতৃ-বিমুখ সন্তান আমরা পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ, চঞ্চলতা ও দুর্বলতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই দুর্দিনে, এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে তুই একবার স্নেহময়ী মূর্তিতে দাঁড়া দেখি মা! আমাদের আমিত্ব-ভার একবার জোর করে কেড়ে নে! আর একবার—একবারমাত্র তোর ঐ পীনোন্নত পয়োধরবৃন্ত সন্তানের মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া দে। আমাদের বিশুষ্ক কণ্ঠ রসার্দ্র হউক—আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা নির্বাপিত হউক, ধন্য দেশ আবার ধন্য হউক।

———০———

তৎ কৌনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥৩১॥

অনুবাদ। হে মহাভাগ! আমরা সদসদ্ বিচার-জ্ঞানসম্পন্ন, তথাপি এই মোহ কেন? আমি এবং ইনি উভয়ই বিবেকান্ধ হইয়াছি। আমাদের এই মূঢ়তার কারণ কি?

ব্যাখ্যা। জীব সমাধি সহযোগে নিত্য পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী ; কিন্তু মন সর্বদা বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগজন্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত। কিছুতেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া, সাধক স্বকীয় অজ্ঞান-অন্ধতা, মোহমূঢ়তা, সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে ; তাই, শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহারই কৃপায় এই মূঢ়তা বিদূরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

যতদিন এই মোহ জিনিষটা ধরা না পড়ে, ততদিন প্রকৃত অভাব যে কি তাহা সাধক বুঝিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, **'তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ।'** কাম ক্রোধাদি রিপুগণের মধ্যে মোহই সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ ; কারণ, যে ব্যক্তি অমূঢ় অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন নয়, তাহাকে অন্য রিপুগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। 'মোহ' শব্দ 'মুহ' ধাতু নিষ্পন্ন! 'মুহ' ধাতুর অর্থ বৈচিত্ত্য। মমত্ব অর্থাৎ আমার দেহ, আমার গেহ, ইত্যাকার জ্ঞানই মোহ। অজ্ঞান—বৈচিত্ত্য-মূলক। সাধনা-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়া অনেকেই মনে করেন—স্ত্রী-পুত্র-সংসার-কাম-কাঞ্চন, এইগুলিই আমার সাধনার পক্ষে মহান অন্তরায়। এইগুলি হইতে দূরে থাকিতে না পারিলে মাতৃ-লাভ হইবে না ; কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়—সংসারটা কোথায়—বাহিরে না অন্তরে? বাসনার কেন্দ্র কতদূরে অবস্থিত? ক্রমে যত অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে থাকে, ততই বুঝিতে পারে, মায়ার কেন্দ্র যে আমার অন্তর হইতে অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সে মূল উৎপাটন করিতে গেলে, আমিও যে থাকে না! অথচ আমার চাই—'আমিটি থাকুক, আমারটা ধ্বংস হউক!' কিন্তু 'আমার ধ'রে টান দিলে, আমি পর্যন্ত উপড়ে আসে যে!' তখন আর উপায় নাই—সমগ্র সাধনশক্তি, যোগশক্তি, তপস্যা-বল, যত কিছু উপায় সমস্ত প্রয়োগ করিয়াও ইহার বিহিত বিধান করিবার

ক্ষমতা থাকে না। সে যে অসহনীয় যাতনা। জীব চায়—পরমাত্ম-সমুদ্রে চিরনিমগ্ন হইতে ; কিন্তু দেহাত্মবোধ তাহাকে জোর করিয়া নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। যাঁহারা চিৎক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ যাতনা সম্যক্ অনুভব করিয়াছেন। তাই শুনিতে পাই— গাজিপুরের পওহারী বাবা দেহটি পর্যন্ত **'ব্রহ্মার্পণং'** করিয়া, এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই কি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন ? মহারাষ্ট্রীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ তুকারাম বোধ হয় এই পরিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যই ইন্দ্রায়ণী-নদী নীরে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। আরে, মনে কর না—সম্মুখে অমৃতের সমুদ্র ; ইচ্ছা করিলেই চির নিমগ্ন হইয়া চিরশান্তি লাভ করা যায় ; অথচ কি অজেয় মোহ—অনন্ত জীবনের কর্ম-সংস্কার-শ্রেণী পশ্চাদভাগ হইতে টানিয়া নিয়া আসে। এরূপ অবস্থায় দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব স্বতঃই উপস্থিত হয় না কি ?

একমাত্র গুরুকৃপায় ঐ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। যখন জীব নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তখন কোনো চক্ষুষ্মান জ্ঞানীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করাই উহার একমাত্র প্রতীকার। তিনি ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিবেন যে, ঐ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বা আসক্তিরূপ যে মোহ উহাও মায়েরই অঙ্গ-ভূষণ। মা আমার লীলা-কৈবল্যবশতঃ এই অনুরাগ ও বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই এই মোহ বিদূরিত হয় ; কিন্তু শান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—**'শান্ত উপাসীত'**। বড় সুন্দর উপাদেয় উপদেশ। জীবত্বের বন্ধন হইতে চির বিমুক্তি, ইহা অতি দূরের কথা— উচ্চস্তরীয় জ্ঞানলভ্য। ধীর-স্থিরভাবে গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে অগ্রসর হইতে হয়। অধীর হইলে উপাসনা চলে না। সর্বদা মনে রাখিবে—একদিনে মোহ কাটে না ! পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলে ধীরে ধীরে মোহ বিদূরিত হয়।

এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—সুরথ ও সমাধি উভয়েই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগকে বিবেকান্ধ এবং মূঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। উহাই প্রয়োজন। যত বড় জ্ঞানী, যত বড় আভিজাত্যবিশিষ্ট হউন না কেন, গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে হয়—**'আমি অজ্ঞানান্ধ মূঢ় বালক, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করুন।'** এইরূপ ভাব প্রাণে প্রাণে পোষণ না করিলে, যথার্থ গুরু-কৃপা লাভ হয় না। গীতায় উক্ত হইয়াছে —**'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ !'** তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তোমায় জ্ঞানের উপদেশ করিবেন, তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা তাহা গ্রহণ করিবে। প্রণিপাত শব্দে কেবল কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রণামমাত্র নহে। প্রণিপাত তখনই পূর্ণাঙ্গ হইবে, যখন তুমি স্বকীয় অহংজ্ঞানকে অম্লানবদনে বিনা বিচারে গুরুর চরণে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করিতে পারিবে। আমি যাহা বুঝিয়াছি বা জানি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, সে জ্ঞান আমার প্রাণে যথার্থ শান্তি আনিতে পারে না ; সুতরাং তত্ত্বদর্শী গুরু আপনি আমায় এমন জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে আমি শোক ও মোহের পরপারে উপনীত হইতে পারি ! এইরূপ সরল ভাব অন্তরে পরিপোষণ করার নামই যথার্থ প্রণিপাত।

সুরথ ও সমাধি এখনও পর্যন্ত ততটা প্রণিপাত করিতে সমর্থ হন নাই ; কারণ, তাঁহারা বলিলেন —**'জ্ঞানিনোরপি।'** 'আমরা বুঝি কিন্তু পারি না।' এই কথাটির মধ্যেও জ্ঞানের অহঙ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে ! তাই, মহর্ষি প্রথমেই সেই অহঙ্কার সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তাহা অতি সুন্দর ও অপূর্ব। 'বুঝি কিন্তু পারি না।' কথাটাই ভুল ! বুঝিলে নিশ্চয়ই পারা যায়। 'পারি না' কথাটির দ্বারা বেশ প্রতীতি হয়—ঠিক বোঝা হয় নাই। আরে, যে যথার্থ বুঝিতে পারে যে, সংসারসংস্কারশ্রেণী আমার—আত্মার স্বরূপ নহে, সে কি আর তাহাতে মুগ্ধ হয় ? আসল কথা ঐ বোঝাটিই বাকী। ঐটি শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদকে, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও গুরুকরণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক সরলপ্রাণে প্রণিপাত অভ্যাস কর, গুরুর চরণে শরণাগত হও, নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া পূর্ণভাবে উপলব্ধি

কর, গুরু নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তুমি ধন্য হইবে! জগৎ পবিত্র হইবে!

ঋষিরুবাচ

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩২॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে মহাভাগ। সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান আছে; কিন্তু উহা বিষয়গোচরমাত্র, এবং বিষয়সকলও পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। সুরথ ও সমাধি যে তত্ত্বজ্ঞানের সমীপস্থ হইয়াছে, এই অপূর্ব ব্রহ্মজ্ঞান ঋষি ব্যতীত অন্য কেহ উন্মেষিত করিতে পারেন না। সত্যদর্শী ঋষিগণই প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞানসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। 'ঋষ্' ধাতুর অর্থ গতি। যাঁহারা পরমাত্মক্ষেত্রে নিত্য-বিচরণশীল তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই সত্যদর্শী, তাঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা। সত্যস্থ হইয়া তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। উহা অধ্যয়ন কিংবা উপদেশজনিত জ্ঞান নহে। তাঁহাদের সেই ধর্মবাণীসমূহই মন্ত্র বা বেদ। উহা পুনঃ পুনঃ মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। যদিও দেশ হইতে বহুদিন 'ঋষি' শব্দটি পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি ভারতবর্ষ এখনও ঋষিশূন্য হয় নাই। এখনও স্বয়ং ভগবান ঋষিরূপে জগজ্জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিতেছেন। অন্বেষণ আসিলে নিশ্চয়ই মিলিবে। ঋষির অভাব হয় নাই, পিপাসার অভাব হইয়াছে। ওরে, ঋষি শব্দটি দুই চারিবার উচ্চারণ করিলেও মন পবিত্র হয়! সে স্থানের বায়ু ব্যোম পর্যন্ত পূত হইয়া যায়; এমনি জিনিষ ঋষি! ঋষি মায়ের বড় আদরের ছেলে। ঋষি সদানন্দময় মহাপুরুষ। ঋষি ব্রহ্মলিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। বাহ্য লক্ষণে ঋষি চেনা বড় কঠিন। কাহাকেও আত্মপরিচয় দিবার জন্য তাঁহারা কোনোওরূপ মিথ্যা-আড়ম্বর লইয়া থাকেন না।

সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—সকল প্রাণীর জ্ঞান আছে; কিন্তু ঐ জ্ঞান বিষয়গোচর। 'বিষয়' শব্দের অর্থ—রূপরসাদি। 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় এবং 'চর' ধাতুর অর্থ বিচরণ। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়-পথে বিচরণ করিয়া বিষয়াকারে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিষয়গোচর জ্ঞান কহে। বৎস সুরথ! তুমি যে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, ঐরূপ জ্ঞান প্রাণিমাত্রেরই আছে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি-বিষয়ক জ্ঞান সর্বপ্রাণীসাধারণের আছে। ঐ সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে প্রকাশ পায়, তোমার যে রাজ্যাদিবিষয়ক জ্ঞান কিংবা সমাধির যে স্ত্রী পুত্রাদিবিষয়ক জ্ঞান, উহাও সেইরূপ বিষয়গোচর জ্ঞানমাত্র। যে জ্ঞান লাভ করিলে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করা যায়, সেই গোচরাতীত জ্ঞানের সন্ধান না পাইয়াও, আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ; উহা অজ্ঞানমাত্র।

এইবার আমরা সর্বপ্রাণীসাধারণে যে জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা করিব। দেখ, জীবগণ এক সূর্যোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা ভোগ করে। প্রথমে জাগ্রত অবস্থা ধর—এই অবস্থাটি কতকগুলি বিশিষ্ট-জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। দর্শন, শ্রবণ, আহার, বিহার, অর্থোপার্জন প্রভৃতি যাহা কিছু জাগ্রতকালে অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই জ্ঞানমাত্র। রূপবিষয়ক জ্ঞান, রসবিষয়ক জ্ঞান, স্পর্শবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। একই জ্ঞান কতকগুলি বিশেষণযুক্ত হইয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, যে অখণ্ড শুদ্ধ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই জাগ্রতকালে জ্ঞানের স্বরূপ। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়। তখন মাত্র অন্তঃকরণচতুষ্টয় ক্রিয়াশীল থাকে। সে অবস্থায়ও দর্শনাদি ব্যাপার জাগ্রতবৎ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং রূপ রসাদি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়াই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তারপর সুষুপ্তি-অবস্থা। এই অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত লয়প্রাপ্ত হয়, কোনোরূপ জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না বটে; কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে এরূপ প্রতীতি হয় যে, 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, এত ঘটনা হইয়া গেল, কিছুই ত' জানি না।' এই যে জানি না বা অজ্ঞান, ইহাও একপ্রকার জ্ঞান। সুষুপ্ত অবস্থায় ঐ অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, জাগ্রৎকালে তাহার স্মৃতি হয়। পূর্বে যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মৃতি অসম্ভব; সুতরাং বুঝিতে পারা গেল—ত্রিবিধ অবস্থায়ই জীব জ্ঞানে অবস্থিত। জ্ঞানের অভাব কখনই হয় না। দিন, সপ্তাহ,

পক্ষ, মাস, বৎসর, যুগ, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীবসমূহ এই এক অখণ্ড জ্ঞানে অবস্থিত। তাই মহর্ষি বলিলেন **'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোঃ।'** কিন্তু এই জ্ঞান বিষয়গোচর, অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বা বিশিষ্ট হইয়াই এই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঘটবিষয়ক জ্ঞান, পটবিষয়ক জ্ঞান, পুত্রবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি আকারে আকারিত হইয়া দিবারাত্র একই জ্ঞান বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের এই বিশিষ্টভাবে প্রকাশের নামই বিষয়গোচর জ্ঞান।

আচ্ছা, একবার ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় জ্ঞানের ঐ যে বিশেষণ অংশ দেখিতে পাও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যে অখণ্ড একরস জ্ঞানের সন্ধান পাইলে তাহা তোমারই ত' ! না অন্যের নিকট হইতে ধার করা ? তোমারই। তোমার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ একটি অখণ্ড জ্ঞান নানাভাবে বিশেষিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। কখনও কামিনী কাঞ্চন, কখনও বা ধর্মার্থকামমোক্ষ ; অর্থাৎ ভোগ এবং অপবর্গ ঐ একই জ্ঞানের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। এইরূপ অনাদি জন্ম মৃত্যু ঐ জ্ঞানের অঙ্কেই সংঘটিত হইতেছে। জ্ঞান-বক্ষে তুমি জাত, অবস্থিত এবং মৃত।

গীতায় উক্ত হইয়াছে, **'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তি-মচিরেণাধিগচ্ছতি।'** জ্ঞানলাভ করিলে অচিরে শান্তিলাভ হয়। জ্ঞানেই প্রকৃত শান্তি। জ্ঞানেই সর্বকর্মের অবসান। জ্ঞানই অমৃত। জ্ঞানলাভ করিলেই যাবতীয় ভয় বিদূরিত হয়। এইবার বুঝিতে পারিলে—কোন্ জ্ঞান লাভ করিলে শান্তিলাভ হয়, সর্বকর্মের অবসান হয় ? বেদান্তশাস্ত্র জ্ঞানকেই যে মুক্তির কারণ বলেন, এইবার বুঝিতে পারিলে, উহা কোন্ জ্ঞান ? ঐ সর্বজীবে প্রতিনিয়ত উপলব্ধ যে জ্ঞান, উহা সেই জ্ঞান ; উপদেশ বা অধ্যয়নজন্য জ্ঞান নহে। উহা সর্বজীবে সমভাবে অবস্থিত ; সুতরাং অতিবড় মূর্খ, অতিবড় দুরাচার ব্যক্তিও ইচ্ছা করিলে এই জ্ঞানকে লাভ করিতে পারে। ইহারই নাম প্রজ্ঞান বা ব্রহ্ম। ইহা যতদিন শুধু বাচনিক জ্ঞানে পর্যবসিত থাকে, ততদিন বিশেষ কিছুই লাভ হয় না ; এই জ্ঞান অতি প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানের উদয়ে জগৎসত্তা বিলুপ্ত হয়, তাই আচার্য শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। এ জ্ঞান এত ঘন যে, প্রস্তরও ইহার নিকটে পরাজিত হয়। এ বিষয়ে একটি আত্ম-সম্বেদন আছে— **'আকাশাদপি তৎ সূক্ষ্মং ঘনং তৎ সৈন্ধবাদপি ! শৈলাদপ্যচলং বিদ্যাৎ চিন্মাত্রং পূর্ণমব্যয়ম্ ॥'** এই জ্ঞান একটি তত্ত্বমাত্র নহে, উহার ব্যক্তিত্ব আছে। উনি একজন। উঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, আত্মপ্রাণ নিবেদন করিতে হইবে, তবে উনি—**'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ'**—এই মূর্তিতে প্রকটিত হইবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে—**'অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা তমাহুরাদ্যং পুরুষং প্রধানম্'** রূপে সর্বভূতমহেশ্বর-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাকে চরিতার্থ করিয়া দিবেন। ওরে, সত্যই এই জ্ঞানকে ধরা যায়। মানুষ-মাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে! ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই এই জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই এই জ্ঞানের সাধনা করে ; কিন্তু— ঐ বিষয়গোচর ! যতদিন জগতের ধূলি বা জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতামাত্র প্রিয়তম বোধ করে ততদিন ঐ জ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগ-নিবন্ধন খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ পায়।

অসংখ্যভাবে, অসংখ্য বিশেষণে ঐ জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উহার শ্রেণীবিভাগ করিলে, মাত্র পাঁচটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চবিধ জ্ঞানতরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রকাশ ও লয় পাইতেছে। এইবার বোঝ, একটি অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র তাহাতে অসংখ্যতরঙ্গ, ঐ তরঙ্গগুলি ধরিবার জন্য আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এই জ্ঞানেরই নাম গুরু বা শিব। স্থূলমূর্তি গুরু এই জ্ঞানেরই ঘনীভূত প্রত্যক্ষ বিকাশ। পাঁচ প্রকারে জ্ঞান প্রকাশ পায় বলিয়া, শিবের পঞ্চ বদন। এখানে বলিয়া রাখি— কেহ মনে করিও না, শিবনামে পঞ্চবদন কোনো দেবতা নাই। এই জ্ঞানের সাধনা করিলে এবং বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য ভক্তের প্রাণে কাতর প্রার্থনা উপস্থিত হইলে, ভক্তির প্রবলহিমে ঘনীভূত হইয়া ঐ অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র হইতে রজতগিরিনিভ শুভ্র, নিখিলভয়হর, আশুতোষ পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, বরদমূর্তি আবির্ভূত হইয়া দয়ার পরাকাষ্ঠায় সাধকের অজ্ঞানান্ধ নয়ন চিরতরে উন্মীলিত করিয়া দেন।

এই জ্ঞানেরই অন্য নাম চিৎ। প্রতিমুহূর্তেই ত'

আমরা ইঁহাকে—আমাদের চিন্ময়ী মাকে, আমাদের অজ্ঞানান্ধ-নেত্র-উন্মীলনকারী গুরুকে পাইতেছি। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি ইন্দ্রিয়সঞ্চালনে, তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছি ; কিন্তু কই, একদিনও কি তাঁহাকে মা বলিয়া আদর করিয়াছি ? ওগো, তুমি আমার সর্বস্ব, ওগো, তুমি না থাকিলে যে আমার কিছু থাকে না ! তুমি একটু দাঁড়াও, একটা অবজ্ঞার প্রণাম নিয়া যাও বলিয়া কি একদিনও ঠিক ঠিক বলিয়াছি যে তাঁহাকে পাইব ! তিনি আসেন প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার আবির্ভাব হয় রে ! কিন্তু আমরা তাঁহাকে আদর করি না । তিনি উপেক্ষিত হইয়া কুটিল কটাক্ষে চলিয়া যান, আবার স্নেহের পীড়নে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসেন, আবার অনাদৃত হইয়া চলিয়া যান। এইরূপ কত যুগ যুগান্তর চলিয়াছে । এখন মানুষ হইয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছ, এখনও কি তাঁহাকে অনাদর করিবে ! একবার ইন্দ্রিয়দ্বারে অপেক্ষা কর, তাঁকে ধরিব বলিয়া অপেক্ষায় বসিয়া থাক । জানি বহুবার বিফল হইবে ; কিন্তু ঐ বিফলতাই তোমাকে সফলতা অনিয়া দিবে । তাঁহার ত' আর আসিবার বিরাম নাই ! অহর্নিশ আসেন, অহর্নিশ চলিয়া যান। একবার নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিবে। যদি না পার, তাঁহার অগম-নির্গম অনুভব করিয়া ইন্দ্রিয়পথে বসিয়া কাঁদ । এই পথে তিনি আসেন, এই পথে তিনি চলিয়া যান । না-ই বা তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার যাতায়াতের পথ তাঁহারই চরণধূলায় পবিত্রীকৃত । ঐখানে বসিয়া কাঁদ, ঐ পথের ধুলা গায়ে মাখ—জীবন ধন্য হইবে ! তিনি দেখা দিবেন ।

সুরথ একটু জ্ঞানের গর্ব করিয়াছিল, তাই মহর্ষি প্রথমে একটি কথাতেই তাহার সে গর্ব বিদূরিত করিয়া, যে মহান তত্ত্ব সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে সুরথ ও সমাধি ধন্য হইয়াছিল । বহু যুগ যুগান্তর পরে, তাহার একবিন্দু আস্বাদ লইয়া আমরাও ধন্য হইতেছি । সে যাহা হউক, জীব সাধারণতঃ এই বিষয়গোচর জ্ঞানেই বিচরণ করে । যতদিন এই সহজ অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান না পায়, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান, যত বড় তপস্বী, যত বড় যোগী, যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, সে অজ্ঞান শিশু । এই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্যতীত যত জ্ঞান, উহা বিশেষ জ্ঞান বা জ্ঞানাভাসমাত্র । সমুদ্র ও তরঙ্গে যে প্রভেদ, জ্ঞান ও বিশিষ্ট-জ্ঞানে সেই প্রভেদ । যতদিন উহার লাভ না হয়, ততদিন মনুষ্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা বিশেষ শ্রেয়ান্ নহে । এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই **'সমস্তস্য জন্তোঃ'** শব্দটির প্রয়োগ করিলেন ।

এই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গসমূহই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়রূপে প্রতিভাত । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, **'বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক্ পৃথক্ ।'** বিষয় কি ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু । ' ষিঞ্' ধাতুর অর্থ বন্ধান । বিশেষরূপে বন্ধন করে বলিয়াই ইহার নাম বিষয় । শব্দ,স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় । পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ইহারা গৃহীত হইয়া থাকে ।

পূর্বে বলা হইয়াছে—জ্ঞান অখণ্ড । এই অখণ্ড বস্তুর পঞ্চবিধ ভেদ কিরূপে হয় ? সমুদ্রে যতই তরঙ্গ উঠুক না কেন, সকলেই যেরূপ জলরূপে প্রতীত হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসমুদ্রের যে পাঁচ প্রকার তরঙ্গ-বিভাগ আছে, তাহাও জ্ঞানের আকারেই প্রতীয়মান হওয়া উচিত ; অথচ তাহা না হইয়া, রূপ রসাদি আকারে তাহার উপলব্ধি হয় কেন ? জ্ঞানরূপ অর্থাৎ রূপবিষয়ক জ্ঞান, রসবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদিরূপে প্রতীতিযোগ্য হয় না কেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হয়—যদিও এরূপ প্রতীতিই যথার্থ, তথাপি জ্ঞান সাধারণতঃ রূপ রসাদি-রূপেই গৃহীত হয় ; কারণ, জ্ঞানরূপ বিশেষ্য-অংশ তিরস্কৃত বা আচ্ছাদিত থাকে ; মাত্র বিশেষণ অংশটি সর্বজীবে সাধারণভাবে প্রতীত হয় । ইহারই বা কারণ কি ? আমি চাহিয়াছি। একদিন আনন্দের উচ্ছ্বাসে বহুত্বের ক্রীড়া করিব বলিয়া অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেইজন্যই জ্ঞান অখণ্ড এবং একরসস্বরূপ হইয়াও, বহু আকারে আমার প্রতীতিযোগ্য হইতেছে । যতদিন বহু চাহিব, ততদিন ইহা এক হইয়াও বহু নামে, বহু রূপে, বহু ব্যবহারে আমার বহুত্বের সাধ মিটাইবে । যে দিন বলিব —আর বহুত্ব চাই না মা, এক হও, এক কর ! এই কথাটা যেদিন সত্য সত্য প্রাণের অন্তস্তল হইতে বলিয়া উঠিব, সেই দিন হইতে ইনি আমার নিকট একরূপেই বিরাজ করিবেন । একই শর্করাদি-নির্মিত সন্দেশ বিভিন্ন ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া কোনটা আতা-সন্দেশ, কোনটা আম-সন্দেশ, কোনটা বা বর্তুলাকার, কোনটা বা চতুষ্কোণ ইত্যাদি বহু নামে ও বহু আকারে পরিচিত হয় । অল্পবয়স্ক বালক বলে—আমি আতা-সন্দেশ চাই না, আম-সন্দেশটি

চাই। তাহার চক্ষে শুধু ঐ আকৃতিগত বৈচিত্র্যই প্রীতি বা অপ্রীতির বিষয় হয় ; কিন্তু বর্ষীয়ান ব্যক্তি উহাদের আকৃতিগত বহুত্বের মধ্যে একই জিনিষ দেখিতে পায়। গঠনবৈচিত্র্য তাহার প্রীতির বা অপ্রীতির বিষয় হয় না। এইরূপ এক অখণ্ড জ্ঞানই সর্বজীবে সাধারণভাবে অবস্থিত ; তথাপি অজ্ঞানপ্রভাবে সংস্কারগত বৈচিত্র্য-বশতঃ উহা বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত হয়।

শোন, একমাত্র বিষ্ণুর পরম পদ সর্বত্র অবস্থিত, তাহা হইতে বিভিন্ন স্পন্দনসমূহ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া জীবের সংস্কারপুঞ্জে উপস্থিত হয় এবং তৎসমজাতীয় সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করে। ইহাই পরমপদের অর্থ বা পদার্থ। সংস্কার বিষয় আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্বে বলিয়াছিলাম জগৎ বাহিরে নহে, আমারই জ্ঞানে অবস্থিত। আমারই জ্ঞান জগদাকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি-প্রভাবে ঐ অখণ্ড জ্ঞান খণ্ড খণ্ড হয়—বিষয়ের আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই এই চণ্ডীতে মহামায়ারূপে ব্যাখ্যাত। সাধক রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন—'**জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে**।' যখন গুরুকৃপায় জীবের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—বিষয় বলিয়া পৃথক কিছু নাই, একটি শক্তিই বিভিন্ন বিষয়-আকারে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বেও বলা হইয়াছে পরিদৃশ্যমান এ জগৎ একটি শক্তিমাত্র। প্রত্যেক পরমাণুই শক্তি। বিষয়সমূহ যে শক্তিমাত্র, ইহা আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও প্রমাণীকৃত হইতেছে। যতদিন জীব শিশু থাকে ঐ অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান না পায়, ততদিনই শক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার একই জ্ঞানকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রসে আস্বাদিত করাইয়া থাকেন। একই জ্ঞান বিভিন্ন জীবনে বিভিন্নরসে রসময় করিয়া আমাদের মুখরোচক করাইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মনে রাখিও—একই জ্ঞান এবং বহু বৈচিত্র্যকারিণী বিষয় আকারে প্রকটিতা মহাশক্তি ইহাই মূল তত্ত্ব। এই জ্ঞান এবং শক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহাও পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরে আরও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

———০———

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥৩৩॥

অনুবাদ। কতিপয় প্রাণী দিবান্ধ, কোনো কোনো প্রাণী রাত্র্যন্ধ, আবার কতকগুলি দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা। পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞান অভিন্ন হইলেও বিষয়গোচর-হেতু উহা বহুরূপে প্রকাশ পায় ; সুতরাং বিষয়সমূহও পৃথক পৃথক রূপে প্রতীতিযোগ্য হয়। এক্ষণে এই বিষয়ভোগ বা অনুভূতিগত বিভিন্নতা পরিব্যক্ত হইতেছে। কতিপয় প্রাণী (প্রাণী শব্দে এখানে আমরা মানবই বুঝিব) দিবান্ধ। দিবা শব্দের অর্থ প্রকাশাত্মক বস্তু—জ্ঞান, তাহাতে অন্ধ—দেখিতে পায় না। একমাত্র জ্ঞানই যে বিষয়রূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা দেখিতে পায়—রূপ, রসাদি, বিষয় বা জগৎ। উহা যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, শত সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও তাহারা উহা গ্রহণ করিতে পারে না। এইটি সাধারণ জীবজগতের অবস্থা।

দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা রাত্রিতে অন্ধ, অর্থাৎ দিবায় দেখিতে পান। এই শ্রেণী জগৎ-মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত। যেহেতু ইহারা সত্য পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বেই মুখে বলেন—অখণ্ডজ্ঞানসমুদ্রে তরঙ্গরূপে ঐ যে বিষয়রূপিণী মহাশক্তি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, উহা ভ্রান্তি বা মিথ্যা ; সুতরাং দর্শনের অযোগ্য। ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-অংশ তাঁহাদের নিকট রাত্রিতুল্য অর্থাৎ অজ্ঞাতই থাকে। বিশেষ কথা এই যে ইঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিতে গিয়া কার্যতঃ জগদীশ্বরকেও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। অথচ স্বয়ং কিন্তু সতত জগৎজ্ঞানেই বিচরণ করিতে বাধ্য হন। ইহারাই বাস্তবিক রাত্র্যন্ধ।

তৃতীয় আর এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ইঁহারা সত্যদর্শী, ঋষি নামে অভিহিত। চিৎ-অচিৎ, সৎ-অসৎ, জ্ঞান-অজ্ঞান, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সর্বত্র এক অখণ্ড পরমাত্মসত্তা-দর্শনেই তাঁহারা অভ্যস্ত। তাই, ইহারা দিবারাত্র উভয়ত্র অভেদদর্শী, তুল্যদর্শী। অজ্ঞান যে জ্ঞানেরই এক প্রকার প্রকাশ, তাঁহারা ইহার উপলব্ধি করিতে পারেন। এক অখণ্ড জ্ঞানই যে অখণ্ড শক্তিময় এবং সেই অখণ্ড শক্তি যে আনন্দলীলার নাম-রূপ ব্যবহারাত্মক বিষয়ের আকারে জীবজগৎরূপে

প্রতিভাত, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঋষিগণ এই সর্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বে নিয়ত অবস্থিত ; সুতরাং দিবা রাত্রি অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞান, প্রকাশ-অপ্রকাশ, উভয়ত্রই ইহারা তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন।

গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটি শ্লোক আছে—'**যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥**' যাহা সর্বভূতের পক্ষে নিশা অর্থাৎ অপ্রকাশ, সংযমী সাধক সেই আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যপ্রকাশাত্মক বস্তুতে সর্বদা জাগ্রত। তাঁহারা সর্বদাই জ্ঞানে বিচরণ করেন। আর সমস্ত প্রাণী যে বিষয়জ্ঞানরূপ পরিচ্ছিন্নতায় বিচরণ করে, সত্যদর্শী সাধকের পক্ষে তাহাই নিশা অর্থাৎ অদৃশ্য। যেহেতু সাধারণ মানবের মতো তাঁহারা বিষয়কে বিষয়-মাত্ররূপে গ্রহণ করেন না। 'আত্মা—জ্ঞানরূপিণী মা আমার বিষয়-আকারে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত,' এইরূপ দর্শনেই তাঁহারা অভ্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারাও যথার্থ-বাদী ; ঐ উক্তিও সম্পূর্ণ সত্য ; যেহেতু জগৎকে মাত্র জগৎরূপে দর্শনের নামই মিথ্যা-দর্শন। ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত, এই দর্শনই সত্যদর্শন ! কিন্তু কেহ কেহ শাস্ত্রের নানারূপ কূটার্থ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে একটি নীরস কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ করিয়া তুলেন। ওরে, যে ব্রহ্মশব্দ স্মরণমাত্র শরীর পুলকিত হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্তব্ধ হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়, চক্ষু শব-চক্ষুবৎ নিষ্প্রভ হয়, নেত্রপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু পরিলক্ষিত হয়, আরও কত কি বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায় ; সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ এখন মুখে মুখে এত অবজ্ঞাত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে যথার্থই মর্মপীড়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সে অন্য কথা—

মা যেরূপ জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বা ক্ষর-অক্ষর ও পুরুষোত্তম, এই ত্রিবিধ আকারে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনও সেইরূপ তিন ভাবে পরিব্যক্ত। এইরূপ দর্শন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে। এই ত্রিবিধ দর্শীয় মধ্যে কাহারও দর্শনে ভ্রম নাই—কাহারও নেত্রপীড়া জন্মায় নাই যে তিনি ভ্রান্তি দেখিবেন। ভ্রান্তি যে আমার মা। তাই বলিয়াছিলাম, সকলেই সত্যদর্শী। যাহারা বিষয়মাত্রদর্শী জ্ঞানে অন্ধ, তাহারাই দিবান্ধ ; তাহাদের নিকট মা আমার সেই রূপেই প্রকাশমানা। যাঁহারা জ্ঞানমাত্র দর্শন করেন, বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা রাত্র্যন্ধ ; তাঁহাদের নিকট মা আমার সেইভাবেই প্রকটিতা। আর তৃতীয়— যাঁহারা সর্বত্র সত্যদর্শন করেন—জ্ঞান-অজ্ঞান উভয়ই যাঁহাদের নিকট তুল্যভাবে ব্রহ্মসত্তার অববোধক, মা আমার তাঁহাদের নিকট সেইরূপ ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। জীবের ক্রমগতিও ঠিক এই-রূপেই হইয়া থাকে। প্রথমে বহুত্বপ্রিয় জীব বিষয়মাত্র দর্শনে পরিতৃপ্ত থাকে, জগৎ-ধূলি গায়ে মাখিয়াই আনন্দ পায়। তারপর বিষয়কে দূর করিয়া দিয়া, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা গ্রহণে উদ্যত হয়। ইহা জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। অবশেষে যখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তখন দেখে—সবই এক—সবই মধু। কিছুই ত্যাজ্য নহে, কিছুই গ্রাহ্য নহে। ত্যাগ ও গ্রহণ বলিয়া কিছুই নাই। আমারই অনন্ত আনন্দময় সত্তা সর্বত্র পূর্ণভাবে বিরাজিত।

মা আমার সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁহার সৎস্বরূপটি বিশেষভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই তিনি জড়-আকারে প্রকটিতা। যতদিন জীব এই জড়ের বা মায়ের আমার ঘনীভূত সৎস্বরূপের সেবায় পরিতৃপ্ত, ততদিন সে দিবান্ধ বা প্রথম শ্রেণীর জীব। দ্বিতীয়তঃ মা আমার বিশিষ্টভাবে চিৎ স্বরূপটি প্রকটিত করিবার জন্য প্রাণীরূপে—চৈতন্য-রূপে সর্বত্র বিরাজিতা। যখন জীব ঐ সৎস্বরূপটি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মায়ের শুদ্ধ চৈতন্যময়ী মূর্তিদর্শনে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা রাত্র্যন্ধ বা দ্বিতীয় স্তরের জীব। আর যাঁহারা মায়ের আনন্দঘন মূর্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানে অজ্ঞানে, জড়ে চৈতন্যে, সর্বত্র মায়ের সচ্চিদানন্দমূর্তি দর্শন করেন। ইঁহারাই দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন বা তৃতীয় স্তরের জীব। জীবমাত্রকেই এই ত্রিবিধ দর্শনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হয়। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটির লাভ হয় না ; সুতরাং এই মন্ত্রে কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা হয় নাই। পূর্বমন্ত্রে যে অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান কিরূপভাবে জীবজগতে প্রকটিত ও উপলব্ধিযোগ্য হয়, তাহাই এই মন্ত্রে প্রকাশ করা মহর্ষির অভিপ্রায়।

———০———

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৩৪॥

অনুবাদ। হে সুরথ! মনুজগণ জ্ঞানী, একথা সত্য; কিন্তু কেবল তাহাদেরই যে জ্ঞান আছে, তাহা নহে; যেহেতু পশু, মৃগ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই জ্ঞান বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা। জীবসমূহ যে জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানেই অবস্থিত, ইহা পূর্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানসত্তা যে কেবল মনুষ্যগণেরই আছে, তাহা নহে; পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীমাত্রই জ্ঞানসত্তায় সত্তাবান। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি-ব্যপদেশে উহা বিষয়গোচররূপে প্রকটিত। এক কথায় জগৎ একমাত্র জ্ঞানেই সঞ্জাত, জ্ঞানেই অবস্থিত এবং জ্ঞানেই পুনঃ প্রলীন হয়। জ্ঞান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। যাহা জড়পদার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান উহাও জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা; জ্ঞানই জগতের আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। মা আমার জ্ঞানময়ী মূর্তিতে সর্বত্র সু- প্রকট হইলেও, পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণিগণ উহার উপলব্ধি করিতে পারে না; কারণ, উহারা এখনও তাদৃশ সমুন্নত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু মনুজসন্তানগণকে মা এমন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণকরণসমূহ প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলেই, সে এই চিন্ময়ীমূর্তি সাক্ষাৎ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সত্যসত্যই মায়ের এই সর্বপ্রাণী-সাধারণ অখণ্ড জ্ঞানময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ করিলে, মানুষ বুঝিতে পারে—'**নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।**' শস্ত্রসমূহ ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল ইহাকে ভস্ম করিতে পারে না, জল ইহাকে নষ্ট বা আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না; সুতরাং '**ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ**'; আমি জন্ম-মৃত্যুর অতীত। মায়ের এই জ্ঞানময়ী মূর্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তবে এই সকল উপলব্ধি আসিতে থাকে, তৎপূর্ব পর্যন্ত ঐ সকল বাক্যের অর্থ-বোধই হয় না। শুধু পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলির ন্যায় মৌখিক অবৃত্তি করা হয় মাত্র। যতদিন মানুষ এই সহজ জ্ঞানলাভে বিমুখ থাকে, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান, যত বড় ধনী, যত বড় যশস্বীই হউক না কেন, পশুর সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না; এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি মহারাজ সুরথকে পশু পক্ষীর তুল্য জ্ঞানবানরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন।

———○———

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ। মৃগপক্ষী প্রভৃতির যেরূপ জ্ঞান, মনুষ্যদিগেরও ঠিক সেই জ্ঞান (পরিদৃষ্ট হয়)। আবার মনুষ্যগণের যেরূপ জ্ঞানপ্রিয়তা, মৃগপক্ষী প্রভৃতিরও সেইরূপ জ্ঞানপ্রিয়তা (পরিলক্ষিত হয়)। এতদ্ভিন্ন (অজ্ঞানাংশেও) উভয়ই তুল্য।

ব্যাখ্যা। পূর্বমন্ত্রে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে —কেবল মনুষ্যই জ্ঞানী নহে, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে। এক্ষণে '**জ্ঞানঞ্চ**' ইত্যাদি বাক্যে, তাহাই বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে মৃগপক্ষী প্রভৃতি তির্যক্ জাতির জ্ঞানের সহিত মনুষ্যদিগের জ্ঞানতুল্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ তুল্যতা আহার, নিদ্রা, ভয়াদি-বিষয়ক; কারণ পশুদিগের জ্ঞান যেরূপ কেবল আহারাদি ব্যপদেশে—পরিচ্ছিন্ন আকারেই প্রতিভাত; সাধারণ মনুষ্যদিগের জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও একবার আহার করে পুনরায় আহারের চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়সমূহ অবসন্ন হইয়া পড়িলে নিদ্রিত হয়। মৃত্যু হইতে সর্বদাই ভয় প্রাপ্ত হয়। নিজের মরণ স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠিলেই অজ্ঞাতসারে বুকের ভিতর কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর একটি কার্য আছে—ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা। এই যে দেখিতে পাও— বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুল প্রচারে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সর্বদিগব্যাপী ও বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে; আর্ষ দৃষ্টিতে উহাও পশুচিত জ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞানের সীমা মাত্র ভৌতিক জগৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাহা যতই মার্জিত, সুসংস্কৃত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হউক না কেন, উহা অজ্ঞান নামেই অভিহিত। অজ্ঞান শব্দে জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞানবিরোধী অনির্বচনীয় কিছু বুঝায় না! ঈষৎভাবে প্রকটিত জ্ঞানকেই অজ্ঞান কহে। সর্বপ্রাণীসাধারণ পূর্বকথিত সেই অখণ্ড সহজ জ্ঞান, যখন পরিচ্ছিন্নরূপে

অর্থাৎ নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহাকেই অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানে বা অল্প জ্ঞানাংশে পশু এবং মনুষ্য উভয়ই তুল্য। পশুর ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন ; তাই তাহাদের ভিতর দিয়া যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, মনুষ্যের চক্ষুতে তাহা অজ্ঞান। মনুষ্যের করণবর্গ সমধিক সমুন্নত ; তাই, জ্ঞানও সসংস্কৃতভাবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ উভয়ত্রই গোচর-জ্ঞান ; সুতরাং অজ্ঞানমাত্র। এই মনুষ্যত্ত্বর ঠিক সন্ধিস্থল। একদিকে দেবক্ষেত্র, অন্যদিকে পশুক্ষেত্র। মানুষ পূর্ণ হইলেই দেবতা এবং পশু পূর্ণ হইলেই মানুষ হয়। এই পূর্ণত্ব শুধু জ্ঞানাংশ নিয়া ; তাই, নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —'**জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ**'।

আমাদের যত দেবদেবী মূর্তি আছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই বাহনগুলি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যকজাতীয়। হিন্দুদিগের ধর্মবিজ্ঞানের ইহা একটি সুন্দর অপূর্ব রহস্য। এস্থলে বাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে দেবশক্তি যেরূপ পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, তাহাই সেই দেবতার বাহনরূপে পরিচিত। প্রথমেই ধর, গণেশ—সিদ্ধিদাতা। তাঁহার বাহন—মূষিক। অথর্বশীর্ষের সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—'**মুষ্ণাতি অপহরতি কর্মফলানি ইতি মূষিকঃ।**' জীবের কর্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মূষিক। প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্মফল-হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ এমন একটি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে সিদ্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফলগুলি ভোগ ব্যতীত ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে মূষিকধর্মী হয়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হইলেই, জীব চুপি চুপি অজ্ঞাতসারে স্বকীয় অতি কঠোর কর্মফলগুলি কাটিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মানুষ এইরূপ মূষিকধর্মী হইলেই পরম সিদ্ধিলাভে ধন্য হয়।

এইরূপ লক্ষ্মীর বাহন পেচক! যাহারা দিবান্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে অন্ধ, তাহারাই পেচকধর্মী। জীব যতদিন এইরূপ পেচকধর্মী থাকে, ততদিনই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধনধান্যাদি পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মশক্তির উপাসনা করে। অথবা মা আমার ধনেশ্বরী মূর্তিতে দিবান্ধ প্রাণীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীর বাহন হংস। সরস্বতী—ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয় শত 'হংস'—এই অজপা মন্ত্রজপরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন হংসধর্মী হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না। এতদ্ভিন্ন হংস-পক্ষীর একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগপূর্বক দুগ্ধ গ্রহণ করে। মানুষও যখন এইরূপ নশ্বর জগৎ হইতে সার জ্ঞানাংশমাত্র পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তখনই ব্রহ্মবিদ্যালাভে চরিতার্থ হয় ; তাই, হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'**ত্রিবৃদ বেদঃ সুপর্ণস্তু যজ্ঞং বহতি পুরুষম্।**' বেদই গরুড় পক্ষী, ইনি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে বহন করেন। বিষ্ণু—জগৎব্যাপক চৈতন্য—মুক্তিদাতা। জ্ঞান এবং কর্ম এই উভয়াত্মক সাধনাই সর্বব্যাপী বিষ্ণুদেবতাকে বহন করে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে —'**উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্। কেবলাৎ কর্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে। কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তু ভয়ং বিদুঃ।**' যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষদ্বারা উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান এবং কর্মরূপ উভয়াত্মক সাধনা-বলে বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধান পায়। কেবল কর্ম কিংবা জ্ঞান-দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম এই উভয় দ্বারাই মোক্ষলাভ হয় ; সুতরাং এতদুভয়াত্মক কর্মই সাধনা [১]। জীব যখন বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের জ্ঞানময়

[১] এস্থলে কাহারও মনে এরূপ একটি আশঙ্কা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে যে, যদি জ্ঞান এবং কর্মই মোক্ষের সাধনা হয়, তবে ভক্তির স্থান কোথায়? তাহার উত্তর পরে বিশেষভাবে দেওয়া হইবে, এখানে সংক্ষেপে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। দেখ, ভক্তির কথা আবার বলিতে হয়? ওরে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয়, না কর্ম হয়? অথবা আজকাল যখন 'পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে,' এইরূপ উপদেশপূর্ণ পুস্তকাদিরও অসংখ্য প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশপূর্ণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারই বা না হইবে কেন? ভক্তি মানুষের সহজাত ধর্ম, যতদিন এই ধর্মের বিকাশ না হয় ততদিন বেদে অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে অধিকারই হয় না। তাই শূদ্রের বেদপাঠ নিষিদ্ধ।

অনুষ্ঠান-তৎপর হয়, তখনই সে পক্ষীস্থানীয় হয়। পূর্বে বলিয়াছি—বেদশাস্ত্রই গরুড়[১]। বেদ প্রতিপাদিত কর্ম ও জ্ঞান, এই দুইটি গরুড়ের পক্ষস্থানীয়, এতদ্‌ভিন্ন গরুড়ের আর একটি ধর্ম—পন্নগাশনত্ব। কর্মসমূহ যতই জ্ঞানময় হইতে থাকে, ততই সংসারাসক্তি—দেহাত্মরূপী কুটিল-গতি সর্প বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই, গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প। মানুষ যখন এইরূপ সর্বতোভাবে গরুড়ধর্ম লাভ করিতে পারে, তখনই দেখিতে পায়—মোক্ষদাতা জগদ্ব্যাপক বিষ্ণু তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানময় কর্মযজ্ঞই যজ্ঞেশ্বরের বাহন। সর্বগত ব্রহ্ম যে নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত একথা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ শিবের বাহন বৃষ। শিব—বিজ্ঞানময় পুরুষ বা জ্ঞানরূপী গুরু। যে জ্ঞাপে এই জগৎ পরিধৃত, সেই অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইলে অমঙ্গলরূপী মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়; তাই, তাঁহার নাম শিব বা মঙ্গল! বৃষ শব্দে অর্থ ধর্ম। শুভ্র সত্ত্ব গুণের উদয়ে ধর্মের বিকাশ হয়; তাই বৃষটি শুভ। বৃষের চারিটি পদ। তপঃ, শৌচ, দয়া এবং দানরূপ ধর্মও চতুষ্পাদ। মানুষ যখন এই চতুষ্পাদ ধর্মের যথাসম্ভব আচরণ-যোগ্যতা লাভ করে, তখনই তাহার শিবদর্শন বা গুরুলাভ হয়; তাই, বৃষপৃষ্ঠে শিব প্রতিষ্ঠিত।

দুর্গার বাহন সিংহ। হিংসাই সিংহের প্রধান ধর্ম। যে মানুষ স্বকীয় জীবভাবকে হিংসা করিতে সমর্থ, জীবত্বের বিলয়পূর্বক ব্রহ্মত্বের বিকাশ করিতে প্রয়াসী সেই সিংহধর্মী। সিংহ পশুরাজ, মানুষ পশুশ্রেষ্ঠ। এক কথায় মানুষ যখন পশুত্বের আধিপত্য হইতে যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হইবার যোগ্য হয়, তখনই তাহাকে সিংহধর্মী বলা যায়। তাদৃশ জীবেই মা আমরা দশদিগ্ ব্যাপিনী সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী মূর্তিতে প্রকটিতা; তাই মা আমার সিংহবাহিনী। সকল দেবতার বাহনতত্ত্ব বলিতে গেলে পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে।

এস্থলে পুনরায় মনে করিয়া দিতেছি—এই বাহনতত্ত্ব পাঠ করিয়া কাহারও যেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয় যে, ঐ সকল দেবতার কোন বিশেষ মূর্তি নাই। সত্য সত্যই ঐ সকল দেবতা আছেন। চিন্ময়ী মহতী শক্তির যে ভাবটি যখন সাধকের ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইয়া, যেরূপ বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকাশ পায়, এস্থলে আমরা কেবল সেই ভাবটির বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি। চৈতন্যের ঐ সকল বিশিষ্ট ভাবে তন্ময়তা আসিলেই ঐরূপ দেবমূর্তি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃন্ময় অথবা চিত্রাঙ্কিত মূর্তির সহিত তাঁহার তুলনাই হয় না। ছবির মূর্তি প্রাণহীন—জড়মাত্র; কিন্তু সে মূর্তি চৈতন্যঘন জ্যোতির্ঘন। এক কথায় বলিতে হয় —প্রাণ দিয়া কোন মূর্তি গঠিত হইয়া যদি বিরাট সূর্য-মণ্ডলমধ্যে স্থাপিত হয়, (না সূর্যমণ্ডল নয়,—চন্দ্রমণ্ডল, না চন্দ্রমণ্ডলও নয়, উত্তাপহীন সূর্যমণ্ডল বলিলে কতকটা হয়) তবে যেমনটি হয়, ঠিক তেমন গো ঠিক তেমন। কি ক'রে বুঝাব সে মাধুরী—সে চৈতন্যঘন, আনন্দঘন মূর্তির স্বরূপ কিরূপ! কি দিব্য জ্যোতি! সে চিত্তমুগ্ধকর অপূর্ব সৌন্দর্য! সে প্রাণমাতান স্নেহ। তাহা কি চিত্রে অঙ্কিত হয়? সে যাহা হউক, এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই; মানব ও তির্যক—উভয়ই প্রায় তুল্যভাবে বিষয়গোচর জ্ঞানসম্পন্ন এই কথাটি বলিবার জন্যই মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধ। পরার্দ্ধের প্রথমে বলা হইল—মানুষের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশুপক্ষীরও সেইরূপ জ্ঞান আছে। এইটি কোন্ জ্ঞান? বিষয়গোচর জ্ঞানের কথা ত' পূর্বার্দ্ধেই ব্যক্ত হইয়াছে; আবার তাহা বলিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্রের অর্থের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এস্থলে জ্ঞানপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

খুলিয়া বলি—মানুষ যেমন জ্ঞানপ্রিয়, তির্যক্ জাতিও

আর একটি কথা আছে—আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন 'কেবল জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম উভয়ের সমুচ্চয় কখনও হইতে পারে না।' কথাটি খুবই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের সহিত যোগবাশিষ্ঠের বাক্যের বিরোধ প্রতীতি হইতে পারে, বাস্তবিক বিরোধ কিছুই নাই। প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণের সে সকল বিচার নিষ্প্রয়োজন। চণ্ডীর তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত ধীরভাবে অধ্যয়ন করিলে সকল সংশয়েরই নিরাস হইবে।

[১] সাধারণতঃ বেদ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-মন্ত্রাদি দ্বারা পূর্ণ এবং অপর ভাগ উপনিষদ্ বা জ্ঞানকাণ্ড। এই অংশকে বেদান্ত বা শ্রুতিশির কহে। কিরূপ জ্ঞানে জ্ঞানময় হইয়া কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই এই অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সেইরূপ। জ্ঞানপ্রিয় শব্দের অর্থ কি ? যে স্বপ্রকাশ অখণ্ডজ্ঞান কতকগুলি সংস্কারের আবরণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে বিষয়গোচর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞানটুকুমাত্র মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর প্রতীতিযোগ্য। জ্ঞানের এই অংশটি মানুষের যেমন প্রিয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক্ জাতিরও সেইরূপ প্রিয়। ঐ সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞানটুকুর উপর একটা অস্মিতা বা অহংজ্ঞান আছে। ঐ অস্মিতাই প্রিয়ত্বের হেতু। জীবমাত্রেই নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। 'আমি' আমার যত প্রিয়, এ জগতে অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নহে। মানুষ এবং তির্যক্ সকলেরই মৃত্যুভয় তুল্য। ইহা দ্বারাও প্রতীত হয়— আত্মপ্রিয়তা সকলেরই সমান। জীব মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন ? পাছে 'আমি আছি' এই জ্ঞানটুকু হারাইয়া যায়।

ঐ এক বিন্দু জ্ঞানের জন্য জগতের যত কিছু। আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সকলই ঐ আমি বলিয়া যে জ্ঞানটুকু প্রকাশ পাইতেছে, উহাকে ভালবাসিবার ফল। সাধারণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে যে যতটুকু জ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে, (অর্থাৎ জ্ঞানের যে অংশটুকু মাত্র করণ বা ইন্দ্রিয় সমুদয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়) সে সেই অংশকেই সমধিক ভালবাসে, উহার সংরক্ষণেই বিশেষ যত্নশীল!

তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ এইটি মন্ত্রের শেষাংশ! অন্যথা অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন অন্য। যদিও জ্ঞান ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য বলিলে জড় পদার্থ বুঝা যায়। প্রাণিসমূহে সাধারণতঃ এই দুইটি অংশই লক্ষিত হয়। একটি জ্ঞান, অন্যটি ক্ষিত্যাদি জড় সংঘাত। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার-গণের ভাষায় এই অংশকে অজ্ঞান বলা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে— জ্ঞানাংশে মনুষ্য ও পশু উভয়ই তুল্য। পরে বলা হইল— সেই জ্ঞান উভয়েরই তুল্যপ্রিয়! এখন ঋষি বলিলেন—অন্যৎ অর্থ জ্ঞানাংশ ব্যতীত আর যাহা আছে, সে অংশেও উভয়েরই তুল্যতা। বাস্তবিক, প্রাণিজগতে দুইটি জিনিষই দেখিতে পাওয়া যায়—একটি জ্ঞান বা চৈতন্য, অন্যটি জড় বা অচেতন। এই উভয়ই সর্বপ্রাণি সাধারণ—তুল্য।

কেহ কেহ মন্ত্রের এই অংশটির অন্যরূপ অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন—অন্যৎ শব্দের অর্থ অখণ্ড জ্ঞান। অর্থাৎ যাহা সর্বত্র সুপ্রকাশ—কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—সেই একরস আত্মজ্ঞান। সেই অংশটি সাধারণ মানুষের যেরূপ অনধিগম্য, পশুগণেরও সেইরূপ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে উভয়ই অন্ধ। আমরা কিন্তু ঐরূপ ব্যাখ্যায় প্রীতিলাভ করিতে পারি না ; কারণ, মনুষ্যজগতে কোন না কোন ব্যক্তি এই জ্ঞানের সন্ধান পাইতে পারে ; কিন্তু পশুজগতে কেহ পারে না।

যাহা হউক, এইবার আমরা মেধসবাক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইব। মেধস্ বলিতেছেন—'হে সুরথ! তুমি যে জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার ঐ অহঙ্কারের যোগ্যতাই নাই। তুমি মানুষ, তোমার জ্ঞান আছে ইহা সত্য ; কিন্তু ঐ জ্ঞান বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ জন্য পরিচ্ছিন্ন। পশুপক্ষীরও জ্ঞান ঠিক এইরূপ পরিচ্ছিন্নভাবেই প্রকাশ পায়। তুমি তোমার সংস্কারবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে 'আমি' মনে করিয়া তাহাতেই প্রীতিমান্। পশুপক্ষীও তাহাদের স্ব স্ব জ্ঞানকে বা আমিকে ভালবাসে। এইজ্ঞান ব্যতীত আর যাহা আছে —তাহা জড় দেহাদি বা অজ্ঞান ; সে অংশেও মনুষ্য এবং পশুতে কোন প্রভেদ নাই।'

———০———

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৬॥

অনুবাদ। হে সুরথ! দেখ, আত্মপ্রীতিবিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় অতি পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ শাবকের চঞ্চুতে অতি আদরের সহিত তণ্ডুলকণাদি খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। তির্যক্ জাতিও নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। ক্ষুধা হইয়াছে, আহার করিলে স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়, তাহা না করিয়া মুখস্থিত খাদ্যগুলি সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়। মানুষের বরং প্রত্যুপকারের আশা আছে ; সুতরাং নিজে দুঃখ-কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে ; অন্য প্রাণীর ত' সে আশাও নাই। তবে এরূপ করে কেন ? উহাতে একটা অলক্ষিত আত্মতৃপ্তি আছে। নিজে খাইয়া যে তৃপ্তি লাভ করে, নিজে না খাইয়া

সন্তানকে খাওয়াইয়া তদপেক্ষা অধিক আত্মতৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্যই জীবের এইরূপ ব্যবহার। ইহার মধ্যে একটি মোহ বা অজ্ঞানতা আছে। তাই, মন্ত্রে 'মোহাৎ' শব্দটি উক্ত হইয়াছে । জীব জানে না যে, ঐরূপ করিয়া বস্তুতঃ নিজেকেই ভালবাসিতেছে। সংসারে যে যাহা করে, সবই আত্ম-তৃপ্তির জন্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'পতির পরিতৃপ্তির জন্য পত্নী পতিকে ভালবাসে না, পতিকে ভালবাসিয়া আপনিই পরিতৃপ্ত হয়, তাই, পত্নী পতিকে ভালবাসে। এইরূপ জায়ার প্রীতির জন্য পতি জায়াকে ভালবাসে না, পত্নীকে ভালবাসিয়া আপনি সুখী হয়; তাই পতি পত্নীকে ভালবাসে। পুত্রের জন্য পিতা পুত্রকে ভালবাসেন না, আত্মতৃপ্তির জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। এইরূপ সকলের তৃপ্তির জন্য সকলে সকলকে ভালবাসে না। নিজ নিজ তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যেই সকলে সকলকে ভালবাসে।' ইহারই নাম জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইহা জানে—বোঝে—উপলব্ধি করে, সে-ই জ্ঞানী। সে সকলকেই ভালবাসে, সকলেরই উপকার করে; কিন্তু নিজে জানে—আমি আমাকেই ভালবাসিতেছি। যতদিন এই আত্মাকে—মাকে বা আমাকে জীব খুঁজিয়া না পায়, ততদিন তাহার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মোহ বিদূরিত হয় না; তাই মন্ত্রে '**জ্ঞানেঽপি মোহাৎ**' কথাটি উক্ত হইয়াছে। কাহার তৃপ্তি সাধনের জন্য পক্ষীগুলি স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও শাবকের চঞ্চুতে নিজের মুখস্থিত খাদ্য অর্পণ করে, তাহা তাহারা জানে না; তাই তাহারা মোহাচ্ছন্ন। এইরূপ মানুষও যতদিন মনে ভাবে—আমি স্ত্রী-পুত্রকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিতেছি, কিংবা জগতের উপকারের জন্য জগতের হিতকর কর্ম করিতেছি, বুঝিতে হইবে ততদিন তাহার মোহ বিদূরিত হয় নাই। এ কথা পরে আরও ব্যক্ত হইবে।

———○———

মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥৩৭॥

অনুবাদ। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ পুত্রাদির প্রতি অভিলাষসম্পন্ন অর্থাৎ স্নেহশীল। ইহারা যে লোভবশতঃ প্রত্যুপকারের আশায় এইরূপ করিতেছে, ইহা কি দেখিতে পাও না?

ব্যাখ্যা। পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক্ জাতি যে পুত্রাদির প্রতি স্নেহশীল, তাহা প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ। ভবিষ্যতে এই শাবকগুলি বড় হইয়া আমাদের প্রতিপালন করিবে, এরূপ একটা আশা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করে না, তথাপি নিজেরা প্রাণান্তকর কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে, যেহেতু অপত্যপালন তাহাদের সহজাত বৃত্তি। মনুষ্যগণও এই অপত্য-স্নেহরূপ স্বাভাবিক বৃত্তির বশেই পুত্রাদির প্রতি স্নেহশীল হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে পুত্রাদি দ্বারা প্রত্যুপকৃত হইবার আশাও অন্তর্নিহিত থাকে। এইটুকুই বিশেষ। তির্যক্ জাতি অপেক্ষা মনুষ্যজাতি অনেক অংশে জ্ঞানে উন্নত, তাহারা ভবিষ্যতেরও কিছু কিছু দেখিতে পায়। সাধারণ মনুষ্য পুত্রাদির নিকট পার্থিব উপকারের আশা করে; আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত; তাঁহারা পারলৌকিক কিংবা আত্মিক উপকারের আকাঙ্ক্ষা রাখেন। উভয়ত্রই মোহটি কিন্তু অবিশেষ। প্রত্যুপকারের আশায়ই হউক অথবা প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হইয়াই হউক, পুত্ররূপে, পত্নীরূপে কাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, ইহা তাহারা জানে না! সাধক! তুমি দূর দেশ হইতে আসিয়া শিশুপুত্রের মুখে সুখাদ্য মিষ্টান্ন তুলিয়া দিলে, পুত্র আনন্দে খাইতে লাগিল। দেখিয়াছ কি তখন নিজের বুকে হাত দিয়া—তোমার বুকটার ভিতর কে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ভোগ করিতেছে? পুত্ররূপে কে? আত্মা মা। প্রিয় পরিজনরূপে কে? আত্মা মা। সর্বরূপে কে? আত্মা মা আমার। আমিই ত' পত্নী-পুত্রাদিরূপে বহুভাবে বিরাজিত। আমি বহুত্বের লীলা করিতে চাহিয়াছিলাম। তাই, এক আমি বহু হইয়া, বহুরূপী আমির সেবা করিতেছি। বিষ্ণুমূর্তিতে—বিশ্বরূপে আমিই বিরাজমান। ইহাকে না জানিয়া, মাকে না চিনিয়া, আমাকে ভুলিয়া কি করিতেছ? পত্নী-পুত্রের সেবা! ও যে 'আমারই সেবা!' '**নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে**' বলিয়া যতদিন আমার পূজা না করিবে, ততদিন ফলতঃ আমার পূজা করিলেও কার্যতঃ কিন্তু অন্য দেবতারই পূজা হইবে। ইহারই নাম অজ্ঞান, ইহারই নাম মোহ।

শুন, অখণ্ড চিৎসমুদ্রে যে কয়েকটি তরঙ্গ একত্র

করিয়া তাহার উপর একটা কল্পিত আমিত্ব বসাইয়া দিয়াছ, উহাই প্রথম অবিদ্যাগ্রন্থি। বিশুদ্ধ জ্ঞানাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে—আমি-তুমি-শূন্য একটা মহান্ জ্ঞানসমুদ্র মাত্র প্রতীত হয় এবং উহাতে আত্মবোধের বিকাশ হয়। জ্ঞানসমুদ্রের ঐ বিভিন্ন তরঙ্গগুলিই পত্নী পুত্রাদিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জগৎ যে আত্মসত্তায় সত্তাবান ইহা না জানার নামই মোহ। এই যে মোহ, এই যে অজ্ঞানে প্রত্যুপকারের আশায় ভালবাসা, ইহার পরিণাম কি? পরিণাম জ্ঞান। অজ্ঞান বা ঈষৎ জ্ঞান হইতেই পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের উদয় হয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে? মনে কর—তুমি পুত্রকে পুত্র বলিয়া ভালবাসিতেছ; কার্যতঃ তোমার ভালবাসারূপ একটি বিশিষ্ট সংস্কার তৈয়ারী হইতেছে! কিছুদিন পরে পুত্রের অভাব হইল; কিন্তু তোমার বুকের ভিতর ভালবাসা নামে যে একটি অমর সম্বেদন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ত' অভাব হইল না! এইরূপ জগতের সর্বত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি ভালবাসিয়া, জগতের পরিচ্ছিন্নতায় মুগ্ধ হইয়া, শুধু নাম ও রূপে অনুরক্ত হইয়া, জীবগণ বিন্দু বিন্দু অনুরাগ বা প্রেম সঞ্চিত করিতেছে। যে দিন উহা পূর্ণতায় উপনীত হইবে, সে দিন দেখিবে—আপনাকেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তখনই জীব-আত্মরতি-আত্মক্রীড়-আত্ম-মিথুন হইয়া অখণ্ড প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিবে। যতদিন ঐ অবস্থা না আসে ততদিন আত্মা ভিন্ন অন্য একটা কল্পিত জিনিষ আশ্রয় করিয়াই ভালবাসা নামে অনুভূতির বিকাশ করিতে হয়। অন্য একজনের উপর নিজের প্রাণের কতক অংশ ঢালিয়া দিয়া তবে ভালবাসা বস্তুটি বুঝিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা—'আমরা যে এই নশ্বর জগৎকে ভালবাসি, ইহাই আমাদের বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে আর ভগবানকে লাভ করিবার আশা নাই'। কথাটি একদিক দিয়া সত্য হইলেও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পায়—এই যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, এই যে সংসারাসক্তিরূপ মায়ারজ্জু, উহা জীবকে চিরদিন বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য নহে, উহা মাকে বা আমাকে চিরদিনের তরে প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ করিবার পূর্ব আয়োজন-মাত্র। ভয় নাই সাধক! তুমি সংসারের প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে অসমর্থ বলিয়া, মনে করিও না, তোমার পক্ষে মাতৃ-লাভ সুদূর-পরাহত। **'গণয়সি যদিদং বন্ধনমাত্রং পশ্চাদ্রক্ষ্যসি মোচনদাত্রম্॥'** যাহাকে তুমি এখন বন্ধান বলিয়া মনে করিতেছ, কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে—উহাই বন্ধনমুক্তির উপায়স্বরূপ। আরে! আগে ভালবাসা নামে, প্রেম নামে একটা জিনিষ তৈয়ারী হউক! তার পর দেখিবে—তুমি তাঁহাকেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ। ভালবাসাই যে তাঁর স্বরূপ! প্রেমই যে মায়ের আমার আনন্দঘন স্বরূপ! সেখানে প্রেমে ও প্রেমিকে ভেদ নাই। আপনাকে সর্বত্র প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। প্রেমের স্বরূপ আত্মদান। প্রেমময়ী মহামায়াকে আত্মদান কর। দেখিবে—তুমি প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়াছ। প্রেমের সাধনার জন্য—প্রেমিক হইবার জন্য পৃথক কোনোরূপ অনুষ্ঠান কিংবা কল্পিত মনুষ্যপ্রেমের আরোপ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না। মানুষে কি প্রেম হয়? না, হইতে পারে? এক কথায় বুঝিয়া রাখ—পূর্বে যে অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের কথা বলিয়াছি, উহা শুধু নীরস একটি জ্ঞানসমুদ্র নহে, উহাই প্রেমের সমুদ্র। জ্ঞান ও প্রেম একই কথা।

অনেক সাধক ভগবানে প্রেম হইল না বলিয়া দুঃখ করেন। প্রেমময়ী মা কিন্তু আমাদিগকে অন্য পথে পরিচালিত করিতেছেন। আমরা বুঝিয়াছি—ভগবানের প্রেম করার চেষ্টা অপেক্ষা, যাহার প্রতি প্রেম স্বাভাবিক, তাহাকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করার চেষ্টা সত্বর ফলপ্রসূ হয়। সাধক! একথাটা ভাবিয়া দেখিও।

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা ॥৩৮॥

অনুবাদ। (বাস্তবিক সকলেই আত্মপ্রিয়) তথাপি সংসার-স্থিতিকারী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্তে ভ্রমণ করিয়া মোহগর্তে নিপতিত হয়।

ব্যাখ্যা। পূর্বে বলিয়াছি—কি মনুষ্য, কি তির্যক্, সকলেই অজ্ঞানতঃ আত্মপ্রিয়। মনুষ্যজাতিমধ্যে প্রত্যুপকারের আশায় পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ঐ আত্মপ্রিয়তাকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয়। বস্তুতঃ মানুষ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাকেই সেবা করে;

আপনার তৃপ্তিসাধনই সর্বজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যদিও ইহাই যথার্থ তত্ত্ব ; তথাপি ঐ আপনাকে ভালবাসিতে গিয়া, জীব 'আমি' কথাটি ভুলিয়া যায় ; কতকগুলি জিনিষ 'আমার' হইয়া দাঁড়ায়। এই 'আমার' শব্দটিই যত গোলযোগের হেতু। আমার অর্থাৎ 'মম'। ঐ মম শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া, মমতা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক কথায় মমতার অর্থ— 'আমার' 'আমার' এইরূপ ভাব। এই মমতা একটি আবর্ত অর্থাৎ জলভ্রমী-সদৃশ ; ঘূর্ণীজলে কোন তৃণাদি পতিত হইলে যেরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক স্থানেই অবস্থিত হয়, এই মমতারূপ আবর্তে পড়িয়া মনুষ্যগণও সেইরূপে প্রায় একস্থানেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বহুদিন এই মমতার আবর্তে অর্থাৎ আমার সংসার, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার দেহ, ইত্যাকার জ্ঞানে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্য মোহরূপ গর্তে নিপতিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়— জলভ্রমী অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা গর্তের আকার ধারণ করে, তৃণাদি যাহা কিছু প্রথমতঃ জলের ভ্রমীর সহিত ঘুরিতে থাকে, অবশেষে তাহা জলবিবরে সমাহিত হইয়া যায়। জীবেরও ঠিক এইরূপ দশাই হয়। বহুদিন 'আমার আমার' করিয়া অবশেষে আমি বস্তুটি হারাইয়া ফেলে ; ইহারই নাম মোহ। এই মোহই গর্ত সদৃশ। মানুষ যখন 'আমিকে' খুঁজিয়া পায় না, তখনই সে পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ; তখনই নর, নরক হইয়া যায়। নরশব্দের উত্তর অল্পার্থে ক-প্রত্যয় করিয়া নরক শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। মানুষ যখন বড় ছোট—অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই সে নরকে যায়। গর্তের মধ্যে কোন জিনিষ পড়িয়া গেলে, যেমন বাহির হইতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বহুদিন 'আমার সংসার, আমার সংসার' এইরূপভাবে বিচরণ করিয়া জীব এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, আর আমি কে, তাহা দেখিতে পায় না। দিবারাত্র 'আমি আমি' করে, অথচ আমি কে, তাহা জানে না—ইহারই নাম অজ্ঞান—ইহারই নাম মোহ। এই অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হয়। আমরা বহু দিন এইরূপ মমতার আবর্তে পড়িয়া সংসারটাকে এতই আমার করিয়া ফেলিয়াছি যে, সংসারের একটু অনিষ্ট হইলেই মনে হয় আমিটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাড়ীর প্রাচীরের চূণ খসিয়া পড়িলে বুকটা কর্ কর্ করিতে থাকে। এমনই একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু সংসারের সকল নষ্ট হইলেও 'আমি' যে নিত্য স্থির থাকে, ইহা বুঝিতে পারি না। এই সংসার—এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-বুদ্ধি — এ সকলই যে 'আমার' সত্তায় সত্তাবান, 'আমি' না থাকিলে যে ইহার কিছুই থাকে না, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। এমনই অজেয় এই মোহ।

ঐ 'আমিই' অন্নময়াদি পঞ্চকোষের ভিতর দিয়া —স্ত্রী-পুত্রাদি সংসারের ভিতর দিয়া— আমার নিত্যভোগ্য জগতের ভিতর দিয়া অলক্ষিত উঁকি মারিতেছে। '**ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি, তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।**' আমাতেই সকল জাত, আমাতেই সকল স্থিত, আমাতেই সকল লীন, আমিই সেই অদ্বয়ব্রহ্ম ! ওঃ, আমি কি মহান ! রাজার ছেলে মেথরের সাজে কাঙ্গালের অভিনয় করিতেছি, আমি সে-ই।

বুঝিতে পারিয়াছ ? অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়াছে ; এইবার চিনিতে পারিলে —কে শ্যাম, কে শ্যামা, কে তেত্রিশ কোটি দেবতা, কে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, কে সর্বব্যাপী মহান, কে সুপ্রকাশ অথচ অদৃশ্য, কে দূরাৎ সুদূরে অথচ অন্তর হইতে অন্তরে। দেখলে— তাঁকে আমাকে মাকে ? ওরই নাম দেখা, ওরই নাম জানা। এইবার বুঝিতে পারিলে তিনি কত সুলভ ! এইবার তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা কর। তাঁহাকে ভালবাস। বড় অনাদরে, বড় অবজ্ঞায় ফেলিয়া রাখিয়াছ। তাঁহাকে আদর কর। যে মুহূর্তে তাঁহাকে দেখিবে, সেই মুহূর্তেই সংসার পলায়ন করিবে। যে মুহূর্তে তাঁহাকে দেখিবে, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। এইরূপ বারংবার দেখ, তুমি জীবন্মুক্ত হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, জীবকে এই মোহগর্তে কে ফেলে এবং কেনই বা ফেলে, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিলেন—'**মহামায়া-প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণা**' সংসার-লীলার অভিনয় করাই মায়ের বা আমার উদ্দেশ্য। এক হইয়াও বহু ভাবে বিরাজ করিয়া যে কি আনন্দ, তাহা উপভোগ করিবার জন্যই এই সংসারস্থিতির প্রয়োজন। মোহ না হইলে, এই সংসার

খেলা চলে না। চক্ষু না বাঁধিলে কি লুকোচুরি খেলা চলে ! আমার প্রকৃতস্বরূপটি প্রতিমুহূর্তে বোধে বিকাশ পাইলে, আর এই বহুত্ব—এই সংসারলীলা থাকে না।

তাই মেধস্ বলিতেছেন—জীব, তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ বলিয়া দুঃখ বা অনুতাপ করিও না। হায়, আমি কি নিকৃষ্ট জীব ? আমি কিছুতেই মোহের হাত এড়াইতে পারিতেছি না। আমার আর তবে আত্মলাভ হইবে না, এইরূপ ভাবে আপনাকে অবসন্ন করিও না। যতই মোহ হউক না কেন, বুঝিয়া লও—উহা মহামায়ারই প্রভাব। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ। তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ পুণ্যবান, কেহ পাপী। রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয় করে, তাহাদের মধ্যে রাজার অভিনয়কারী এবং ভিক্ষুকের অভিনয়কারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রথম অঙ্কে যে দুই জন জগাই-মাধাই সাজিয়াছে, পরবর্তী অঙ্কে তাহারাই হয়ত গৌর-নিতাইর অভিনয় করিতেছে। ইহার মধ্যে ছোট বড়, পাপী পুণ্যবান, আদৃত বা ঘৃণিত, কেহই নাই ; সবই সমান। সবই আমার মহামায়া মায়ের খেলা।

মহামায়া কে ? ইতিপূর্বে তাহার অনেক আভাস দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে আবার আমরা সেই কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বে যে জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ সর্বপ্রাণিসাধারণ অখণ্ড জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান যে আছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি ! তরঙ্গ দেখিয়া—বিষয়ের দ্বারা। রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ একটির পর একটি আসিয়া ঐ জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছে। যখন আমরা বিষয়গ্রহণে বিমুখ হই অর্থাৎ সুষুপ্ত হই, তখন আর জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অতএব বুঝিয়া লও—জ্ঞান স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইলেও যতক্ষণ বিষয়াকারে আকারিত না হয়, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না। এই বিষয়গুলি যে শক্তিপ্রবাহ মাত্র, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রকারগণ এই শক্তি প্রবাহকে স্থূলতঃ ষড়্ভাববিকার বলিয়াছেন ; যথা, জায়তে—জন্মগ্রহণ করে, অস্তি—প্রতিকূল শক্তিপ্রবাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপন সত্তা বর্তমান রাখে, বর্দ্ধতে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিপরিণমতি—পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধির চরম অবস্থায় উপনীত হয়, অপক্ষয়তি—ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, নশ্যতি—নষ্ট বা অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক পদার্থে প্রতিমুহূর্তে এই ছয়টি বিকার সংঘটিত হইতেছে। এই ছয়টি বিকারকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে গেলে—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়া বলা যায় ; সুতরাং জগৎ বলিলে—বিষয় বলিলে বুঝবে—উহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মিকা একটি মহতী শক্তিবিশেষ। একটি ফল বা ফুল হাতে লইয়া দেখ, উহাতে উক্ত ষড়্ভাব বিকার বা সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রতিক্ষণে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ জগতের সর্বত্র।

এস্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, শক্তি ত' স্থির পদার্থ নহে, উহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল —প্রবাহময় ; তবে এই জগৎকে আমরা স্থির দেখি কিরূপে ? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহার সমাধান করিব। একখণ্ড কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগ অগ্নিসংযুক্ত করিয়া অতি দ্রুত বেগে সঞ্চালিত করিলে একটি স্থির অগ্নিময়রেখা আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। জগতের স্থিরতা এবং সত্তাও ঠিক এইরূপ ; সুতরাং রূপ রসাদি বিষয়সমূহ যে একটি শক্তিপ্রবাহমাত্র, ইহা বেশ প্রতীতিগোচর হয়। এই শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ উহা এক। প্রকাশগত বিভিন্নতা দেখিয়া, শক্তিগত বিভিন্নতার অনুমান সঙ্গত নহে। একই তড়িৎশক্তি কোথাও আলোক, কোথাও ব্যজন, কোথাও মুদ্রণ, কোথাও যান-পরিচালন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ একই শক্তি এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগদাকারে প্রতিনিয়ত প্রকটিতা।

এই শক্তি পূর্বোক্ত জ্ঞানবক্ষেই অবস্থিতা। শক্তির দ্বারাই জ্ঞান প্রকাশিত। এই দুইটি জিনিষ লইয়া জগতে দার্শনিকগণের যত বিচার। একটি জ্ঞান আর একটি শক্তি। এই দুইটি এক কি ভিন্ন। সাংখ্য বলেন—ভিন্ন ; জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নিষ্কল চৈতন্যময় পুরুষ ; আর শক্তি জড়া, পরিণামশীলা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলেই পুরুষ প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া মুক্তস্বরূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতিযুক্ততাই পুরুষের বন্ধন বা জীবভাব। ইহা দ্বৈতবাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন নহে। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি বা অবয়বমাত্র। অঙ্গীর সহিত অঙ্গের যে ভেদ, ইহাতে তাদৃশ ভেদ আছে। পুরুষের সাম্মুখ্যই মুক্তি এবং তদ্‌বিমুখতাই বন্ধন।

বেদান্তবাদের মতে জ্ঞান ও শক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই ; কিন্তু ঐ শক্তি-অংশটুকুর নাম মায়া ; উহা মিথ্যা, ইন্দ্রজালবৎ। উহার বাস্তব-সত্তা নাই, একমাত্র জ্ঞানেরই পরমার্থ সত্তা। তবে জগদাকারে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, উহা রজ্জুসর্পবৎ ভ্রান্তিমাত্র। ইহা বর্তমান অদ্বৈতবাদ। ইহারা সকলেই সত্যদর্শী। সাধকমাত্রেরই এই সকল অনুভূতির মধ্য দিয়া আসিতে হয়। প্রথমে দ্বৈতপ্রতীতি, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত-প্রতীতি, তারপর সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত অদ্বৈতপ্রতীতি ; কিন্তু সর্বশেষে সাধক উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য জ্ঞানে বা আর্ষদর্শনে উপনীত হয়। উহাই পূর্ণ অদ্বৈতদর্শন। পূর্ববর্তী দর্শনকার কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রামাণিক উপনিষৎসমূহ ধীরভাবে পাঠ করিয়া, উহার সরল অর্থ গ্রহণ করিলেও এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়। প্রেমিক অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—'**অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন**'। এতদ্ভিন্ন তিনি 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' কথাটি বলিয়া জ্ঞান ও শক্তির যথার্থস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যে তত্ত্ব বাক্য এবং মনের অতীত, যাহা বুদ্ধির বহির্দেশে ব্যবস্থিত, তৎসম্বন্ধে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া 'তিনি ইহাই অন্য কিছু নহেন' এরূপ বলা সমীচিন নহে। তিনি যে কত কি, তাহা কে জানে ? যাঁহার যেরূপ অনুভূতি, তিনি কেবল সেইটুকু বলিতে পারেন।

যাহা হউক, আমরা বুঝিয়াছি—ঐ জ্ঞান ও শক্তি সর্বতোভাবে অভিন্ন। সেই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের প্রত্যেক কল্পিত অণুই শক্তি। এই জন্যই বোধ হয় ঋষিগণ শক্তিবাচক চিৎশব্দে ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন শক্তির প্রকাশ থাকে না, তখনই ইহার নাম প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, নিরঞ্জন ইত্যাদি। শক্তিই জ্ঞানময় কিংবা জ্ঞানই শক্তিময় অথবা এতদুভয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবে ইহা স্থির যে, জ্ঞান ও শক্তি দুই নহে, এক বস্তু। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা মহাশক্তি জগদাকারে প্রকটিতা হন, তখন ইহার নাম সগুণ ব্রহ্ম। ইহার কোথাও মিথ্যা ভ্রান্তি এসকল শব্দ প্রযুজ্য নহে! আর্ষগ্রন্থে—উপনিষদে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ নাই!

যাক, বিচার করিতে করিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা জানি—উনি আমার মা। উঁহারই নাম মহামায়া। উঁহারই প্রভাব—এই সংসারস্থিতি। সংসারখেলা দেখিতে গিয়া মা আমার মমতাবর্তরূপে—মোহরূপে প্রকটিতা। আবার মোহগর্তে নিপতিত জীবরূপেও তিনি। যাহারা সর্বত্র এইরূপে মাকে দেখে, তাহাদের পক্ষে বন্ধন বলিয়া কিছুই নাই ; সুতরাং মুক্তি বলিয়াও কিছু থাকে না। আমরা জানি—আমরা মায়েরই গর্ভজাত, মায়েরই অঙ্কে ধৃত, আমরা সর্বতোভাবে মহামায়ার অঙ্কস্থিত আনন্দময় নগ্ন শিশু। ঐ যে এতক্ষণ বিচার করিতে গিয়া, কেবল 'জ্ঞান ও শক্তি' এই দুইটি কথার ব্যবহার করিয়াছি, উহা শুধু ভাষার কচ্‌কচি। কেহ উহাকে তত্ত্বমাত্র বুঝিও না। উনি—একজন ; উঁহার ব্যক্তিত্ব আছে। সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত হইলেও উহার সর্বেন্দ্রিয়ের ধর্ম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, দয়া আছে, স্থূলদেহ ধারণ করিবার শক্তি আছে! উনি সগুণ, নির্গুণ এবং এতদুভয়ের অতীত। উঁহাকে একটি তত্ত্বমাত্র বুঝিতে গেলে পথহারা হইতে হইবে। উনিই আত্মা, উঁহারই এসব খেলা। এই সংসার মাঝে সং সাজাই তাঁর আনন্দময় লীলা। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। মা বলিয়া, সখা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া কাতরপ্রাণে ডাক। ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া কাঁদ। সব সংশয় মিটিয়া যাইবে। জীবন চরিতার্থ হইবে। কাঁদিতে পার না, অভ্যাস কর। পুস্তক পড়িয়া বুঝিবে না—মহামায়া কে ? কিরূপে সংসারস্থিতি করেন—কেনই বা মমতাগর্তে নিপতিতা হন ? গুরু বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও, সব পাইবে, সব বুঝিবে।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রাস্বরূপা। এই জীবজগৎ তৎকর্তৃকই সম্যক্-প্রকার মোহাচ্ছন্ন থাকে। অতএব হে সুরথ! এবিষয়ে বিস্ময়ান্বিত হইও না।

ব্যাখ্যা। মেধস্ এইবার সুরথ ও সমাধিকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—তোমরা যে পরিত্যক্ত রাজ্য ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে পারিতেছ না, ইহাতে বিস্মিত বা বিষণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। মহামায়া—মোহজননী, তিনি ত' মুগ্ধ

করিবেনই ; তুমি ত' সামান্য জীব, তিনি জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রাস্বরূপ । যিনি এই জগৎকে পালন করিতেছেন— সেই জগদ্ব্যাপক বিষ্ণু বা প্রাণশক্তিও যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন । তিনিই এই জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । যিনি যোগনিদ্রা প্রভাবে বিষ্ণুকেও মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষ্ণুর ন্যায় পরিপুষ্ট সন্তানকেও জগতের খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি তোমার আমার মত জীবকে তাঁহার মহান স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিমুগ্ধ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ?

কেন তিনি এরূপভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন ? তাঁহারই স্নেহের সন্তান আমরা ! আমাদিগকে জগতের খেলায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে ? তাঁহার নিজের কোন অভীষ্ট নাই । আমাদের ইষ্টই তাঁহার অভীষ্ট । আমরা এইরূপ মুগ্ধ হইতে চাহিয়াছিলাম, এইরূপ বহুত্বের— ক্ষুদ্রত্বের খেলা করিবার জন্য একদিন মহতী ইচ্ছাময়ী মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম । সেই দিন হইতে ইচ্ছাময়ী মা আমাদিগকে বুকে করিয়া অনন্ত বহুত্ব—অদ্বিতীয় বহুত্ব সম্ভোগ করাইতেছেন । এক মুহূর্তের জন্যও অঙ্কচ্যুত করেন নাই। অনেক সাধক এইখানে আসিয়া বড় সমস্যায় পড়েন । সাধক যখন 'আর বহুত্ব চাহি না, আর বিষয়-বাসনা চাহি না, আর কামিনী কাঞ্চন চাহি না, আর বহুত্বের খেলা ভাল লাগে না, মা । এক হইতে আসিয়াছি আবার এক কর, মা !' এইরূপ বলিতে বলিতে সরল নগ্ন শিশুটির মত ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া মা মা করিয়া কাঁদে, তখনও এই বহুত্বের স্পন্দন—হৃদয়-বিদারক বাসনার সন্ধুক্ষিত বহ্নির শেষ শিখা নির্বাপিত হয় না । শিশু যত চাই না চাই না বলিতে থাকে, মা যে ততই জোর করিয়া সেই অপ্রার্থিত বিষয়সমূহ দিতে থাকেন । আজ না হয় তুমি পরিপুষ্ট হইয়াছ, আজ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াছ, তাই আজ আর বহুত্ব চাহি না বলিতেছ ; কিন্তু একদিন তুমি এই বহুত্বের জন্যই মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলে । মা সে কথা ভুলিয়া যান নাই । তুমি চাহিয়াছিলে ; তাই তিনি স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তোমারই প্রার্থিত বহুত্ব নির্বিচারে দিতেছেন । বিকারগ্রস্ত পুত্র বিকারের ঘোরে মায়ের নিকট তেঁতুল খাইতে চাহিয়াছিল । মা তখন তাঁহাকে খাইতে দেন নাই । এখন পুত্রের বিকার দূর হইয়াছে । তেঁতুল খাওয়ার কথাও স্মরণ নাই ; কিন্তু মা সেই কথাটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন —একদিন পুত্র তেঁতুল চাহিয়াছিল । আজ আর সে চাহে না, তথাপি পুত্রস্নেহে বিমূঢ়া মা তেঁতুল আনিয়া সন্তানের মুখের কাছে ধরিলেন। খাও বৎস ! একদিন বিকারের ঘোরে চাহিয়াছিলে, তখন তোমায় দিতে পারি নাই, এখন বিকার দূর হইয়াছে, এখন অনায়াসে তেঁতুল খাইতে পার। পুত্রের অনিচ্ছায়ও তখন মা তাহাকে তেঁতুল খাওয়াইয়া থাকেন । ঠিক এইরূপে মহামায়া মা জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ।

যে সকল সাধক এই অবস্থায় আসিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সম্মুখে গুরু মেধস্ কি অভয় বাণীর বিজয়-পতাকা ধরিয়াছেন দেখ ! তিনি বলিতেছেন—**'তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ'** তিনিই এই জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—তুমি কি করিবে ? মা-ই যে মোহরূপে সাজিয়া তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন । ঐ মোহরূপিণী মাকে দেখ । দেখ মা তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন ! ঐ মোহরূপে তোমার মা । এই বিশ্বাসটি বজ্রবৎ দৃঢ় ধারণায় বুকে বসাও । যতই মুগ্ধ হও না কেন, তুমি মা বলিতে ছাড়িও না । কাম আসে, বল—জয় মা ; কাঞ্চন আসে, বল—জয় মা ; বিষয়-বাসনা আসে, বল, জয় মা ; মমতা আসে বল—জয় মা ; তোমার ভয় কি ! সবই যে মা ! যে মূর্তিতেই আসুক না কেন, তোমার মা-ইত আসেন । হউক ক্ষুদ্র ! হউক মলিন ! হউক পঙ্কিলতাময়, তিনি তোমার মা, ইহা নিশ্চয় । তুমি তাঁহাকে অবজ্ঞা কর কেন ? ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে তাড়াইয়া দিতে চাও কেন ? মা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর । মা বলিয়া ঐ মোহরূপিণী মায়ের শ্রীচরণে অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি দাও, আর বল —'মা ! তুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রসূতি মহামোক্ষ-প্রদায়িনী রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া এমন কাঙ্গাল বেশে—এমন ক্ষুদ্রতার সাজে, এত মলিনতার ছদ্মবেশ পরিয়া আমার সম্মুখে আসিলি ? হা ভাগ্য আমার !' এমনই করিয়া মোহরূপিণী মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদ, দেখিবে কি হয় !

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৪০॥

অনুবাদ। এই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া, বিষয়-বিমুগ্ধ করিতে থাকেন।

ব্যাখ্যা। দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনশীলা। বহুভাবে প্রকাশ হওয়াই তাঁহার স্বভাব। অথবা দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। এই বহুত্ব ক্রীড়াই যাঁহার স্বভাব, তিনিই দেবী। ভগবতী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। এই দুইটি মহামায়ার বিশেষণ। মায়ের আমার এমনই খেলা, এমনই প্রভাব যে, যাহারা জ্ঞানী—যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মানাত্ম-বস্তু-বিবেক হইয়াছে, তাঁহাদিগের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বিষয়াভিমুখী করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার দেবীত্ব—ইহাই তাঁহার খেলা। এই 'বলাদাকৃষ্য' না হইলে, আচার্য শঙ্করের বৌদ্ধদলন বেদান্ত ভাষ্যাদি বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, দিগ্বিজয় প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ জোর করিয়া টানিয়া না নামাইলে ভক্তবীর গৌরাঙ্গদেবের নানাদেশে ধর্মপ্রচার, পতিতের উদ্ধার প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ সর্বত্র। পূর্বে পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যাঁহাদের জ্ঞানভক্তির উজ্জ্বল আলোকে জগৎ ধন্য হইয়াছে ; মনে করিও না—তাঁহারা মহামায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। যতই মিথ্যা, যতই ভ্রান্তি বলুন না কেন, মহামায়া যে নিত্য সত্য, ইহা মুখে না বলিলেও কার্য দ্বারা তাঁহারা অজস্র প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

কোন সাধক এমন মনে করিও না যে, তুমি অহর্নিশ সমানভাবে মায়ের আমার অচিন্ত্য অব্যক্ত অনির্দেশ্য স্বরূপে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে। তাহা কস্মিন-কালেও হয় নাই, হইবেও না ! মৌনী বাবাই হউন, আর পর্বত-কন্দর-নিবাসী কিংবা নির্জন মহারণ্যস্থিত সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, মহামায়ার প্রভাব হইতে কেহই পরিত্রাণ পান নাই। ওরে ! যতদিন দেহ আছে, ততদিনই মহামায়া আছেন ; বিদেহ কৈবল্য একদিন হয় ! যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, সেইটিই মায়ের আমার পরম ধাম। সেখানে তিনি যেদিন ইচ্ছা করিবেন, সেই দিন লইয়া যাইবেন। তৎপূর্বে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। প্রয়োজনই বা কি ? মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের খেলা দেখ না—কি আনন্দময় ! এতদিন নিজের সংসার করিয়াছ, আপনি কর্তা সাজিয়া সংসার খেলা খেলিয়াছ। কত আঘাত পাইয়াছ, কত ধূলা ময়লা মাখিয়াছ। এখন মাকে চিনিয়াছ, মাকে পাইয়াছ, মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের সংসার খেলায় যোগ দাও। তখন তুমি কর্তা ছিলে, এখন মা কর্তা। এখন আর আঘাত পাইবে না, ধূলা মাখিবে না। তবে আর খেলা করিতে দোষ কি ? কেন ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হও।

যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন অর্থাৎ মা যাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা এই 'বলাদাকর্ষণে' ভয় পান না, দুঃখিত বা বিষণ্ণ হন না ; কিন্তু প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকগণের এই অবস্থা অতীব যাতনাপ্রদ। ধর, একটু ধ্যান, পূজা বা এমন কার্য করিতে আরম্ভ করিলে, যাহাতে কিছুক্ষণ মাতৃ-যুক্ত হইয়া থাকিতে পার ; কিন্তু একটু যুক্ত থাকিতে না থাকিতে ঐ 'বলাদাকৃষ্য', কে যেন বলপূর্বক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়মুখী করিয়া দিল। অথবা তুমি দৃঢ় সংকল্প করিলে যে জীবনে সৎকার্য ব্যতীত অসৎকার্য করিবে না ; কিন্তু সেখানেও দেখিবে—কে যেন তোমার অনিচ্ছায় বলপূর্বক তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করিয়া দিল। মা ত' এইরূপ বলপূর্বক আকর্ষণ করিবেনই। সে আকর্ষণ যে মায়েরই, তুমি শুধু তাহাই দেখিয়া যাও। ইহাই এই মন্ত্রের জ্ঞাতব্য।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৪১॥

অনুবাদ। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিত্যপরিবর্তনশীল বিশ্ব তৎকর্তৃক সৃষ্ট হয়। তিনি প্রসন্না ও বরদারূপে অতিশয় সন্নিহিতা হইলেই মনুষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগ্য হয়।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে চরাচর, জগৎ ও বিশ্ব এই তিনটি শব্দে পুনরুক্তি-দোষ দেখিয়া অনেক টীকাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। আমরা সে রকম গোলযোগে যাইব না। চর—গমনশীল ; অচর—স্থিতিশীল ; অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম। জগৎ—নিত্য পরিবর্তনশীল ; বিশ্ব—যাহা নিয়ত মাতৃ-অঙ্কে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অব্যক্ত সত্তায় প্রবেশ করিতেছে, ইহা তাঁহারই রচনা। এই মন্ত্রে সৃজ্যতে

শব্দটির মধ্যে যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনটি কার্য ব্যবস্থিত আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এ তিনটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। চরাচর—সৃষ্টির, জগৎ— স্থিতির এবং বিশ্ব—লয়ের দ্যোতক। সৃষ্টি কথাটির ভিতর একটু রহস্য আছে। সৃজ্ ধাতুর অর্থ বিসর্গ ও ত্যাগ ; সুতরাং জগৎ সৃষ্টি বলিলে জগৎ-পরিত্যাগ বুঝায়। পূর্বে জগৎ অদৃশ্যভাবে কারণরূপে—মাতৃ-গর্ভে বীজরূপে অবস্থিত ছিল। জগৎ সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিল, অদৃশ্য দৃশ্য হইল, কারণ কার্য হইল। বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। ইহারই নাম ত্যাগ বা সৃষ্টি। গীতায়ও '**ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ**' কথাটিতে ঠিক এই তাৎপর্যই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইখানে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব—প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতির পরিণামরূপ সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি ; কিংবা আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদিক্রমে মায়ার বিবর্তরূপ বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হইলে, প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে বিশেষ কিছু লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। উহা জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায় হয়। যাহা হউক, আমরা অন্য দিক্ দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পূর্বে যে অখণ্ড জ্ঞান ও মহতী শক্তির কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই শক্তিটি একটি ইচ্ছামাত্র। এই যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে ধনেচ্ছা, পুত্রেচ্ছা, বিষয়েচ্ছা, সুখেচ্ছা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষণ বিশিষ্ট ইচ্ছার প্রকাশ হইতেছে, ইচ্ছা হইতে ঐ বিশেষণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একটি মহতী ইচ্ছার প্রতীতি হয়। অখণ্ড জ্ঞান বা চিৎশক্তি এই মহতী ইচ্ছারূপিণী। সেই অদ্বিতীয়া মহতী ইচ্ছায় বহুভাবে প্রকটিতা হইবার কল্পনা বিকাশ পায়। এই কল্পনাই জগৎ। কল্পনা মনের ধর্ম। নিরঞ্জনা নির্বিকল্পা চৈতন্যময়ী মা যখন মনোময়ী বা ইচ্ছাময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই এই চরাচর সৃষ্টি হয়। আমাদের নিজ নিজ মনের ভাবগুলি যদি বাহির করিয়া কাহাকেও দেখাইতে পারিতাম, তবে আমরাও এইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা পারি না, কারণ, আমরা মনকে মায়ের মন বা বিরাট্ মন হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ; কিন্তু মনোময়ী মহতী ইচ্ছাময়ী মহামায়া মা আমার যেখানে যেরূপ সঙ্কল্প করেন, সেইখানেই সেইরূপ ভাবে ঘন হইয়া যান ; সুতরাং পদার্থরূপে স্থূলে প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের একটি মাটির পুতুল গঠন করিতে হইলে, হস্তপদ সঞ্চালন, মৃত্তিকা-সংগ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় ; কিন্তু আমরা যখন মনের দ্বারা কোন পুতুল গঠন করি, তখন কোনও রূপ চেষ্টা বা বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় না।

মনে কর, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ—'সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকগণের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া, অসংখ্য অট্টালিকাশোভিত মহানগরীর রাজপথে বিচরণ করিতেছ'। এ স্থলে যেরূপ ঐ হস্তী, দর্শকবৃন্দ, অট্টালিকা, রাজপথ প্রভৃতি তোমার মনের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; অথচ স্বপ্নদর্শন-কালে এত প্রত্যক্ষ এত স্থূলভাবে উহার প্রতীতি হয় যে, আর উহাকে কল্পনা বলিয়া ভাবিতেও পার না ; সেইরূপ মনোময়ী মা আমার বহুত্বের কল্পনা করিয়া আপনাকে বহুভাবে প্রকটিতা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। পূর্বে বলিয়াছি—তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী ; সুতরাং তাঁহার এই সৃষ্টি অথবা বহুভাবের মধ্যেও তাঁহার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দরূপ ত্রিবিধ বিকাশ সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত। আর একটি বিশেষত্ব এই—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয়া ; তাই, তাঁহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ অদ্বিতীয়। দুইটি প্রাণী, দুইটি পত্র, এমন কি দুইটি বালুকণাও একরূপ নহে। সাধক ! একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, সর্বত্র মা আমার অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যতই বহুত্ব, যতই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করুন না কেন, এই অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দময়ী মূর্তির ব্যাঘাত কোথাও হয় নাই! এই জগৎই মায়ের আমার স্থূল মূর্তি। যে ইহাকে মা বলিতে না পারিবে, যে ইহাকে মা বলিয়া না দেখিবে, সে কিরূপে মায়ের জগদাতীত অতি সূক্ষ্ম —কেবল জ্ঞান, কেবল ইচ্ছা, কেবল শক্তি-মূর্তি দর্শন করিবে ? মনোময়ী মাকে ধরিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ চৈতন্যময়ী মাকে কিরূপে পাইবে ? যাক্—সে অন্য কথা।

এই সৃষ্টি তিনি কেন করিলেন ? তাঁহার ইচ্ছা ; এই বৈচিত্র্য কেন ? তাঁহার লীলা। একজন বাহক একজন

বাহ্য, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান। এ সকলই তাঁহার লীলা। তিনি কাহাকেও দণ্ড বা পুরস্কার দিতেছেন না। কর্মফল, পুরস্কার, তিরস্কার, সাধুর পরিত্রাণ, দুস্কৃতের বিনাশ ইত্যাদি জ্ঞানের প্রথম স্তর। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা না যায়, ততক্ষণ জীব এই সকল জ্ঞানে বিচরণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনের পর সাধক দেখে— **'প্রিয়োঽসি মে'**, **'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু'** সবই যে তিনি, তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই, সুতরাং কর্মফল, দণ্ড বা পুরস্কার ইত্যাদি কিরূপে বলিব ? মনে কর— তোমার চিত্তে যখন সৎপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তুমি তাহাকে পৃথক্ একজন বোধে পুরস্কৃত কর না; অথবা অসৎবৃত্তি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও না, সবই যে তোমাতে ফুটিতেছে। ইহাও সেইরূপ। মা আমার—**'সৎ অসৎ তৎপরং যৎ'**। কর্মফলানুরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্য—জ্ঞানের বিচারে যথার্থ। মায়ের এই স্বাধীন লীলারঙ্গের ভিতর কার্য-কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে গেলে এইরূপ অসংখ্য শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলাগুলি আবিষ্কার করিতে গিয়াই দার্শনিক অথবা পৌরাণিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, চরাচররূপে মা আমার সৃষ্টিশক্তিময়ী ব্রহ্মমূর্তি, জগৎরূপে পালন-শক্তিময়ী বিষ্ণুমূর্তি এবং বিশ্বরূপে সংহরণ-শক্তিময়ী শিবমূর্তি। এই সৃজনাদি তিনটি ব্যাপার যে স্থানে সংঘটিত হয়, তাহাই ঈশ্বর, অক্ষর, পুরুষ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। মহামায়া মায়ের অন্তরে এই তিনটি ভাব অব্যক্তভাবে লুক্কায়িত ছিল। তাহা প্রকাশযোগ্য করিতে গিয়া, তিনি সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। তাই, বিসৃজ্যতে অর্থ—ত্যাগ। ইহা তান্ত্রিকগণের কারণার্ণবে মহাকালীর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রসব।

ইনি যখন নরগণের মুক্তিরূপে অর্থাৎ বহুরূপ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র শুদ্ধ বোধরূপে পরিব্যক্ত হইবার জন্য— মনোময়ী মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মমূর্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য উদ্যত হয়েন, তখনই মা আমার প্রসন্না ও বরদারূপে প্রিয়তম সন্তানগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। আরও দেখ এই নিত্যতৃপ্তা, নিত্যপ্রসন্না, নিত্যবরদায়িনী মা জীবগণের মুক্তির জন্য অন্তর হইতে অন্তরে—অতি নিকটে অবস্থান করিতেছেন। তাই, মন্ত্রে 'এষা' এই একান্ত সান্নিধ্যবোধক এতদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

———○———

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥৪২॥

অনুবাদ। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরমা ও অপরমা সুতরাং বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু। সেই সনাতনী মা সর্ব এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মহামায়া মা আমার বিদ্যারূপিণী। বিদ্যা —**'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'**। যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম বিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা-ভেদে বিদ্যা দ্বিবিধা। অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিদ্যাবিরোধী কিছু নহে; কারণ, বিদ্যা স্বপ্রকাশরূপা। তাহার বিরোধী কিংবা আবরক কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে নঞ্‌টি ঈষৎ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যা যখন পরিচ্ছিন্ন জীবাদিরূপে প্রকটিতা হন, তখনই তিনি অবিদ্যা নামে —বিদ্যাবিরোধী-রূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। এখানে 'সা বিদ্যা', শব্দে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বুঝাইতেছে। এইরূপে পরমা-শব্দটিও পরমা অপরমা উভয় অর্থের দ্যোতক। অকার-প্রশ্লেষ করিলেই ঐরূপ অর্থ হয়। **'পরান্ ব্রহ্মাদীন্ অপি মাতি ইতি পরমা।'** ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও নিয়মনকর্ত্রী; তাই মা আমার পরমা। অপর অর্থাৎ জীব-জগতেরও নিয়মনকর্ত্রী; তাই, মা আমার অপরমা; সুতরাং মুক্তি এবং সংসার-বন্ধ এই উভয়েরই কারণস্বরূপা। তিনি সনাতনী—নিত্যা, অতএব সর্ব, অর্থাৎ জীবজগৎ এবং ঈশ্বরী অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এই উভয়ের তিনিই ঈশ্বরী। এককথায় মহামায়াই সর্ব, ঈশ্বর এবং এতদুভয়ের অতীত। মহামায়াই ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তম, জীব ঈশ্বর ব্রহ্ম, মন প্রাণ আত্মা, জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞ এই ত্রিবিধ বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রে মুক্তি ও সংসার-বন্ধ, এই দুইটি কথা আছে; সুতরাং এস্থলে তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। জীব যতদিন বিশুদ্ধ চৈতন্যের আভাস না পায়, ততদিন সংসার-বন্ধন মনেই করিতে পারে না।

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে হইলে, যে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্রতার —পরিচ্ছিন্নতার যে একটা যাতনা আছে, যতদিন জীব ইহা উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন মুখে সহস্রবার বন্ধন বন্ধন বলিলেও, যথার্থ বন্ধন-জ্ঞান হইতে পারে না। এক কথায়—মাকে দেখিবার পূর্বে বন্ধন-জ্ঞানই হয় না। একবার উন্মুক্ত গগন-বক্ষে বিচরণ না করিলে, পিঞ্জরে অবস্থান যন্ত্রণাপ্রদ মনেই হয় না। বন্ধনের স্বরূপ কি ? মন,— যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণই বন্ধন, ততক্ষণই সংসার। একটি আত্ম-সংবেদন আছে— **'সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি, ন পুত্র-ভার্যাদ্রবিণাদিকং হি। সংসার-নাশো মনসোলয়েন, ন তদ্ গৃহস্থাশ্রম-বর্জনেন'**। মনই হইতেছে সংসারের কারণ ; পুত্র ভার্যা ধন বিষয় ইহারা সংসার নহে। মনের লয় হইলেই সংসার বন্ধন দূর হয়। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই সংসার-ত্যাগ হয় না।

মুক্তি ! বড় দূরের কথা ; বন্ধনজ্ঞান ! বড় দূরের কথা ; জানি মা ! যে মুহূর্তে যথার্থ বন্ধনজ্ঞান ফুটিবে, সেই মুহূর্তেই আমি নিত্যমুক্ত ; কারণ, আমি যে ইচ্ছাময়ীর বরপুত্র। এখনও যে মা। বন্ধন-অবস্থায়ই বেশ প্রীতিকর বোধ হয় ! আমরা যতই কিছু করি না কেন, বন্ধনটি বজায় রাখিতে খুবই ভালবাসি। মা ! এ জগতে যাঁহারা শক্তিমান মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ত' তোমার দেওয়া দুই চারটি সিদ্ধির মুকুট মাথায় পরিয়া, আমিত্বকে মহত্ত্ব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কই মা ! তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ মুক্তিপ্রয়াসী কয়জন ছিলেন ? তারপর যাঁহারা তোমার রক্ত চরণের সমীপস্থ হইয়া শুদ্ধা ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিক্ষা করিয়া জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক নামে পরিচিত, তাঁহারাও ত' আমিত্বটিকে রক্ষা করিতে— বদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে বিশেষ সচেষ্ট। তবে তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা আমিত্বের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, উজ্জ্বল বহুমূল্য পোষাকে বিভূষিত হইতে চাহেন। কই মা ! তাঁহারাই কি মুক্তি-প্রয়াসী ? আর যাঁহারা সংসার-সন্তাপে বিদগ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সংসারের অভাব অভিযোগগুলি দূরীভূত হইলেই মুক্তি প্রয়োজন অবসিত হয়। আমরা কিন্তু জানি মা ! এ জীবত্ব থাকিতে তোমার জগৎপ্লাবী অসীম স্নেহ সম্ভোগ করা যায় না। এ ক্ষুদ্র বক্ষ তোমার সেই অসীম স্নেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় তোমার চির-লোভনীয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রূপরাশি গ্রহণ করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শ্রবণবিবর তোমার কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুধাময় আহ্বানরূপ প্রণবধ্বনি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তোমার অঙ্গনিঃসৃত দিব্যগন্ধ বহন করিবার সামর্থ্য এ ক্ষুদ্র নাসিকার নাই। এ ত্বক তোমার সে আত্মহারা স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শিশুহস্ত তোমার ত্রিভুবনব্যাপী শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-চন্দন-মিশ্রিত কুসুম-সম্ভার অর্পণ করিতে পারে না। আমার এই একটি মস্তক তোমার সহস্র চরণে প্রণাম করিতে সমর্থ হয় না। আমি কিরূপে তোমার সে আকুল স্নেহ অনুভব করিব ! ওগো, কূপে থাকিয়া কি আকাশব্যাপিনী সুধাময়ী-চন্দ্রিকা পান করা যায়। তাই মা, তোমার স্নেহ ভোগ করিতে হইলে—যথার্থ আত্মপ্রেমে বিহ্বল হইতে হইলে, মুক্ত হইতেই হইবে। মা ! আমরা মুক্তির জন্য মুক্তি চাহি না। মুক্তির কোন প্রয়োজনই নাই—যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তোমার স্নেহ ভোগ করিতে পারিতাম ? অথবা আমরা জানি— যে দিন জীব তোমাকে প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারে—যে দিন তোমাকে আত্মদান করিয়া আত্মময় হইতে পারে, সেই দিন বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না। আত্মদান করার পূর্ব পর্যন্তই জীববক্ষে তুমি বন্ধন ও মুক্তিরূপে প্রকাশিত হও।

মা ! তুমি ত' নিত্যমুক্ত ; তথাপি অনাদিকাল হইতে এই জগদ্-বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছ। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বন্ধন তোমারই অঙ্গের নিত্যভূষণ। এত বন্ধনে থাকিয়াও তুমি নিত্যমুক্ত ! আর আমি—আমি আমার নিত্যমুক্ত মায়ের কোলে অবস্থান করিয়াও বদ্ধ ! ধিক্ আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে ! ধিক্ আমাদের পুত্রত্বে ! যে পুত্র নিত্য উন্মুক্ত মাতৃ-বক্ষে লালিত-পালিত হইয়াও, আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার পুত্রত্ব বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা—

যতক্ষণ বন্ধনজ্ঞান প্রাণে না ফোটে, যতদিন খাই দাই বেড়াই বেশ আছি, বন্ধন আবার কি ? এই ভাবটা দূরীভূত না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে—মা আমার এখনও তাহার বক্ষে বন্ধন-জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন নাই। প্রার্থনা

করিলেই তিনি সেইরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তখন অসহনীয়-বন্ধান-যাতনার বোধ হইতে থাকে ; সেই যাতনা হইতেই মুক্তির কামনা ফোটে। তখন মা জীবকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে লইয়া যান। যদি সেই সকল উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবল মুক্তিকামনা জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে, তবেই মুক্তিরূপিণী মা আমার স্নেহের সন্তানকে আপন বক্ষে মিলাইয়া লয়েন। যে দুইটি অবস্থার ভিতর দিয়া জীব এই মোক্ষধামে উপনীত হয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই মন্ত্রে সর্বেশ্বরেশ্বরী শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব এবং ঈশ্বর এই উভয়েরই ঈশ্বরী। প্রথমতঃ সর্বত্বে মুগ্ধ জীব মায়ের আমার সর্বরূপে—জগৎধূলি গায়ে মাখিয়া পরিতৃপ্ত থাকে। এইটি জীবভাব বা সর্বভাব। তারপর এই সর্ব যাহাতে জাত, স্থিত ও সংহৃত সেইটি ঈশ্বরভাব। প্রথমে জীব সর্বত্ব হইতে এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে প্রয়াস পায়। অবশেষে এতদুভয়ের অতীত পরমভাব। যাহাতে এই উভয় স্বরূপ সম্যক্ভাবে অবস্থিত, অথচ যাহাকে পাইলে, এতদুভয় অবস্থা আর অনুভবে আসে না, সেইটি মায়ের সর্বেশ্বরেশ্বরী-স্বরূপ !

মনে কর—তুমি বস্ত্র দেখিতেছ ; যতক্ষণ তুমি বস্ত্রে মুগ্ধ, ততক্ষণ নাম, রূপ ও ব্যবহার-রূপিণী মায়ের সর্বরূপে অবস্থান করিতেছ। তারপর বস্ত্রের কারণ স্বরূপ সূত্রাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইল। এইটি মায়ের ঈশ্বরস্বরূপের দৃষ্টান্ত। অবশেষে সূত্রের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলে, তুলা ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই। তখন তোমার নিকট হইতে বস্ত্রের নাম, রূপ, গুণ এবং কারণ অর্থাৎ সূত্র সকলই অদৃশ্য হইয়াছে। তখন তুমি মহাকারণে মুগ্ধ। ইহাই মায়ের আমার সর্বেশ্বরেশ্বরী-স্বরূপের উদাহরণ। এই তিন স্বরূপে যে ব্যক্তি কামচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে, সে-ই আপ্তকাম মহাপুরুষ। সে-ই বন্ধন ও মুক্তির অতীত। জীবশ্রেণীতেও এই ত্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কতক বদ্ধ, কতক মুক্ত এবং কতিপয় এতদুভয়ের অতীত। (মুমুক্ষুজীব বদ্ধের অন্তর্গত)। এই তিনটি অবস্থাই যথাক্রমে অবিদ্যা, বিদ্যা ও পরমা নামে অভিহিত হয় এবং এই তিন অবস্থারই মধ্য দিয়া যে সত্য ও নিত্য বস্তুটি অবিকারী ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে সনাতনী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

———০———

রাজোবাচ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥৪৩॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোব্রহ্ম বিদাংবর ॥৪৪॥

অনুবাদ। রাজা বলিলেন—হে ভগবন্ ! হে দ্বিজ ! আপনি যাঁহাকে দেবী মহামায়া বলিলেন তিনি কে ? তিনি কেন উৎপন্ন হন ? তাঁহার কর্মই বা কি ? তাঁহার যেরূপ স্বভাব, যে স্বরূপ এবং যাহা হইতে তিনি উদ্ভূতা, হে ব্রহ্মবিদ্বর ! আমি আপনার নিকট হইতে সেই সকল তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাখ্যা। এতক্ষণ রাজা অবহিত-চিত্তে গুরু মেধসের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন এবং মহামায়ার ঈষৎ আভাস পাইয়া, তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, **‘সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি’** বলিয়া মনের প্রবল আগ্রহ বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে জানিবার জন্য ঐরূপ একটা আগ্রহ দেখিতে পাইলেই, গুরু প্রসন্ন হন। এস্থলে সুরথের ব্যাকুলতা গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধির অপলাপ ঘটায় নাই ; তাই, প্রথমে ‘ভগবন্’ সম্বোধন। ভগবান না হইলে ভগবৎ-তত্ত্ব কে বলিবে ? তাঁহার কথা, তাঁহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও বলিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই ; ইহা সুরথ ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমে ঐরূপ সম্বোধন করিলেন ; এ মন্ত্রে আর একটি শব্দ আছে—**ব্রহ্মবিদ্বর** ! শ্রুতি বলেন—**‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’** যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই সাকার ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কে বিশ্লেষণ করিবে ? সৌভাগ্যবলে জীবের যদি ব্রহ্মজ্ঞ-গুরু লাভ হয়, তবে সকল আশঙ্কা ও সন্দেহের মূল উৎপাটিত হয়।

আধ্যাত্মিকভাবেও দেখা যায়—জীবাত্মা সমাধিস্থ হইয়া শুদ্ধবোধে অবস্থান করিতে পারিলেই, তাহার এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধবোধ আত্মোপলব্ধির সর্বশেষ উপায়। আত্মা—মা আমার শুদ্ধবোধেই উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত। এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা হয়। জীবাত্মা এতক্ষণ সমাধি-সহায়ে এই বোধে অবস্থান করিয়া একমাত্র মহামায়া বা অজ্ঞেয়া মহতী শক্তিতত্ত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছে !

জীব বহু সৌভাগ্যবলে এই শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ না হইলে—ব্রহ্মজ্ঞানের আভাষ না পাইলে, এই শক্তিতত্ত্ব স্ফুরিত হয় না।

একবার এই শক্তি বা মহামায়ার সমীপস্থ হইতে পারিলে, জীবের যাবতীয় দুশ্চিন্তা, ত্রিতাপজ্বালা, সংসারের মোহজনিত উদ্বিগ্নতা সকলই তিরোহিত হয়। সুরথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে— জীব যে সংসার-মোহে মুগ্ধ হয়, ইহা মহামায়ার ইচ্ছা বা লীলামাত্র। তাই মহামায়ার স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য যুগপৎ এই ছয়টি প্রশ্ন করিলেন। (১) তিনি কে ? (২) তিনি কেন উৎপন্ন হন ? (৩) তাঁহার কর্ম কি ? (৪) তাঁহার স্বভাব কিরূপ ? (৫) তাঁহার স্বরূপ কি ? (৬) এবং কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব।

———o———

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি স্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥৪৫॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৪৬॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—তিনি নিত্যা ; এই জগৎই তাঁহার মূর্তি ; তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বহুবিধ উৎপত্তি-বিবরণ আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (তাঁহার নিজের কোন কার্য নাই) দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহামায়া কে ? ঋষি তাহার উত্তরে বলিলেন—তিনি নিত্যা ; তাঁহার ধ্বংস ও উৎপত্তি নাই ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ; কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই পরিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন ধ্বংসোৎপত্তিশীল। আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, ধ্বংস এবং উৎপত্তি তাহার ধর্ম। মহামায়াতে সে ধর্ম নাই। তাই, তিনি নিত্যা—অতীন্দ্রিয়া।

সাধক! তোমার ভিতরে যে চৈতন্য-সত্তা রহিয়াছে—প্রতিনিয়ত যাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ; অথচ নিত্য-সত্য—উহার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই, উহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, অক্লেদ্য ; উহা তোমার অপ্রাপ্য না হইলেও ধরিতে, বুঝিতে বা ভোগ করিতে পারিতেছ না ; অথচ প্রতিনিয়ত তাঁহাকেই সম্ভোগ করিতেছ। তুমি জন্ম-মৃত্যু-বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিতেছ ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গচ্যুত কখনই হও নাই। তোমার কতই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, হইবে ; কিন্তু তাঁহার কোন পরিবর্তন নাই। স্থূল কথায় যাহাকে তোমরা প্রাণ বল, ঐ যে চেতনা—ঐ যে হুঁস, যাহা আছে বলিয়া তুমি আছ, তিনি অণু কি মহান তাহা বলা যায় না। উহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণও কিছু নাই। এইরূপে সাধারণভাবে তাঁহাকে জানিয়া লও। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহাকে জানা যায় না ; কারণ, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। জানার ভিতরে আসিলেই তাঁহার নিত্য-স্বরূপটির বিলক্ষণতা ঘটে।

শিষ্য যখন ভগবৎস্বরূপ জানিতে চায়, তখন তাহাকে এই পর্যন্ত বলিলে, সে মনে করিতে পারে—ইহার আবার লাভ কি ? সাধনাই বা কি ? ইনি ত' সুলভ হইয়াও অলভ্য, সাধনার অতীত ; কারণ, সাধনা একটা ধর্মবিশেষ, তিনি ত' সর্ব ধর্মের অতীত ; সুতরাং সাধনা-লভ্য বা সাধ্য নহেন ; কিন্তু ইহাতে ত' সাধকের পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। সে চায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে—ভোগ করিতে। জগদ্-ভোগে অভ্যস্ত জীব যতক্ষণ মাকে ভোগের ভিতর আনিতে না পারে, যতক্ষণ প্রাণ খুলিয়া সুখদুঃখের কথা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটে কি ? তাই, আবেগ ভরে শিষ্য বলিতে থাকে,— হউন তিনি নিত্যা, হউন না তিনি অজ্ঞেয়, তাঁহাকে আমার সম্ভোগযোগ্য করিয়া দাও গুরো! আমার প্রত্যক্ষযোগ্য করিয়া দাও। এইরূপে যখন শিষ্যের কাতরতা পূর্ণ-ব্যাকুলতায় পরিণত হয়, তখনই অহেতুক কৃপানিধান গুরু শিষ্যের অজ্ঞানান্ধচক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ধীরে গম্ভীরে বলিতে থাকেন—পুত্র শিষ্য! সাধক! সত্যই কি তুমি মাকে—মহামায়াকে দেখিতে চাও ? যথার্থই কি তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে ? তবে দেখ—যাহা চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছ, যাহা বহু জন্ম হইতে ভোগ করিয়া আসিয়াছ, যাহাকে নশ্বর বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য বহুবার ব্যর্থ-প্রয়াস

হইয়াছ, স্বপ্ন বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া স্বকীয় দিব্য নেত্রে স্বয়ং মসীলেপন করিয়াছ, তাঁহাকে দেখ—'জগন্মূর্তি' । এই জগৎই তাঁহার প্রকট মূর্তি ।

সাধনা-পথে ইহা অপেক্ষা সারবান উপদেশ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না । এই জগৎকে মা বল । বিশ্বাস করিতে না পার, নকল করিয়া বল, মিথ্যা করিয়া বল ; কারণ উহা মিথ্যা নহে । বায়ু অদৃশ্য ; কিন্তু প্রবাহরূপে প্রকাশ পাইলে, উহা সকলেরই ভোগ্য হয় । সেইরূপ মা আমার নিত্যস্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন ; ভোগ্য নহেন ; কিন্তু আমাদের জন্য নিত্যভোগ্য এই স্থূল জগন্মূর্তিতে তিনি নিত্য বিরাজিতা ; প্রকট মূর্তিতে যদি বিশ্বাস করিতে না পার তবে অচিন্তনীয় তত্ত্ব কিরূপে ধারণা করিবে ? যে যথার্থ পিপাসু তাহার ইহাতে কোনরূপ বিচার বিতর্ক সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না । সে বুঝিবে—হায় ! আমি এতদিন কি ভ্রান্তিতে ছিলাম, এতদিন ইহাকে জগৎ বলিয়া ভোগ করিয়া আসিয়াছি, একদিনও ত' মা বলিয়া ভোগ করি নাই ! আর না, এখন গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মা । আজ আমার মাতৃ-লাভ হইল, আর আমি কিছুই চাই না । যে দিকে চাহিব সেই দিকেই মা, যাহা ধরিব তাহাই মা, তবে আর আমার অভাব কি ? আমার কাতর প্রার্থনা, আমার ভক্তিহীন প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গ্রহণ করিবার জন্য আমার মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আমি যেখানে অর্পণ করিব, সেইখানেই তিনি গ্রহণ করিবেন । ইহা অপেক্ষা সুখের ও আনন্দের বাণী আর কি আছে । ধন্য শ্রীগুরু ! যিনি আমায় অকূল সাগরে কূল দেখাইয়া দিলেন । মা কোথায়, ভগবান কোথায় বলিয়া কত অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাই নাই । অন্বেষণ যত করিয়াছি, তাঁহার দূরত্ব ততই বোধ হইয়াছে ; এখন বুঝিলাম তিনি নিকট হইতেও নিকটে অবস্থিত ; আর আমার ভয় কি ? এই বলিয়া সে তাহার সাধনার সূত্রপাত করিবে । নূতন জীবন পাইয়া, অভিনব উৎসাহে পূর্ণ অধ্যবসায়ের সহিত প্রতি কার্যে, প্রতি জগদ্ব্যাপারে সে মাতৃ-যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে । সাধক ! এইস্থানে **'মহামায়া প্রভাবেণ'** ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আর একবার পড়িয়া লও । ঋষি-বাক্যে পূর্ণ শ্রদ্ধা পূর্ণ বিশ্বাস আনিতে প্রয়াস পাও ; দেখিবে—তোমার শুভদিন কত সন্নিহিত ! সাধনার সফলতা, জীবনের চরিতার্থতা, নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারিবে ।

যাঁহারা গীতার **'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি'** এই মন্ত্রটির সাধনায় অগ্রসর হইয়া, চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশপূর্বক সমাধি-সহায়ে শুদ্ধ-বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে শুনিবেন—**'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি'** তাঁহাদের সকল আশা মিটিয়া যাইবে, প্রাণে পূর্ণ পরিতৃপ্তি আসিবে । আর যাঁহারা বলিবেন—এটা ত' জানা কথা ! এ আর কে না জানে যে, ভগবান সর্বভূতে বিরাজিত ; এ আর নূতন কথা কি ! এই বলিয়া যাঁহারা নূতন রহস্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহারা নিশ্চয় নূতন অন্বেষণ করিতে করিতে, এই চির পুরাতন সর্বজনবিদিত সত্যে আসিয়া উপনীত হইবেন ! সর্ব শাস্ত্র ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । বৈদিক যুগের সাধন-প্রণালীও যে, এই বিশ্বরূপ হইতে আরম্ভ হইত, তাহা উপনিষদে বিশদ্‌ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে ! সাধনাব্যাপার যতদিন অতি সহজ বলিয়া প্রতীত না হয়, ততদিন সাধকের আধ্যাত্মিক গতি মৃদুভাবে থাকে। আজকাল এমনই একটা যুগ আসিয়াছে যে, সাধনা বলিলে মনে হয়, কি যেন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কত ত্যাগ, কত সংযম, কত কঠোরতা করিতে হইবে। ইহা কিন্তু ঋষিযুগের কথা নহে। তাঁহারা সরল সত্যবিশ্বাসে এই বিশ্বরূপে উপাসনা করিতেন এবং তাহারই ফলে তাঁহাদের ঋষিত্ব-লাভ হইত। যাহা দেখিতেন তাহাই ভগবদ্‌বোধে গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা জল দেখিয়া বলিতেন—**'আপঃ শুন্দন্তু মৈনসঃ' 'আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তানউর্জে দধাতন, মহেরণায় চক্ষষে'**। অগ্নি দেখিয়া বলিতেন—**'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্‌'**। বায়ু স্পর্শ করিয়া বলিতেন —**'মধুবাতা ঋতায়তে'**। সূর্য দেখিয়া বলিতেন—**'যত্তে রূপং কল্যাণ-তমং তত্তে পশ্যামি'** । পুষ্প দেখিয়া বলিতেন— **'শ্রীরসি ময়ি রমস্ব'** । ভূমি দেখিয়া—**'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'** বলিতে বলিতে সরলপ্রাণ নগ্ন শিশুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন, সেই পূতনামা ঋষিদিগের সরল সত্য-সাধনা আবার কতদিনে ভারতের প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে ! সত্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সত্য প্রতিষ্ঠায় বীর্যবান হইয়া, সত্যলাভে কৃতার্থ হইয়া ভারত কবে বলিবে—এ জগৎ মহাসত্য ! কবে বলিবে—ভূমি সত্য, জল সত্য, বায়ু

সত্য, আকাশ সত্য, মন সত্য, প্রাণ সত্য ! সত্যের উজ্জ্বল আলোকে কতদিনে মিথ্যার কলঙ্ক-কালিমা অপনীত হইবে ! কিন্তু সে অন্য কথা—

এই জগন্মূর্তি মহামায়ার দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথমে জড় পদার্থ হইতে আরম্ভ করিতে হয় । যেহেতু চেতন জীবের ভাবচাঞ্চল্য সাধন-সমরে প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকের মাতৃত্ব-বোধে—সাধনার ব্যাঘাত জন্মায় । তাই, প্রথমে বৃক্ষলতা, ফল, ফুল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ প্রভৃতি পদার্থ-অবলম্বনে মাতৃ-বোধ বা সত্য জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে হয় । এইরূপ সাধনা অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে চিত্তবিক্ষেপবশতঃ মায়ের কথা ভুলিয়া, বিষয়াভিমুখী হইলেও ক্ষতি নাই । মনের চঞ্চলতা যেমন মাকে ভুলাইয়া দিবে, তেমনই নানা কার্যের ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে মাকে স্মরণ করাইয়া দিবে । সাধক ! তুমি শুধু সেই স্মরণ-মুহূর্তটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে যত্নবান হও । যতক্ষণ ভুলিয়া থাক, তাহার জন্য অনুশোচনা করিবে না ; কারণ, ভ্রান্তিরূপেও মা-ই বিরাজিতা । যে মুহূর্তে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া যাইবে, সেই মুহূর্তে যাহা সম্মুখে পাইবে, তাহাই তোমার প্রত্যক্ষ মা, এই সরল সত্য-বিশ্বাসে পূর্ণকাম-নিশ্চিন্ত পুরুষের মত দাঁড়াইবে । কিছুদিন এইরূপ করিতে অভ্যস্ত হইলেই মা যে জগন্মূর্তিতে প্রকটিতা, তাহা উপলব্ধিযোগ্য হইবে ।

সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাঁহার স্বরূপ কি ? ঋষি তাঁহার উত্তরে বলিলেন—এই জগৎই তাঁহার স্বরূপ । এইবার তাঁহার স্বভাব কি তাহার উত্তর দিতেছেন—**'তয়া সর্বমিদং ততম্'** । এই জগৎ তাঁহা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত । এই কথাটি দ্বারা শিষ্যহৃদয়ের একটি অমূলক আশঙ্কাও বিদূরিত হইল । সেই আশঙ্কাটি এই—পূর্বে বলা হইয়াছে, তিনি নিত্য হইয়াও অনিত্য জগদাকারে প্রকটিতা । এই অনিত্য স্বরূপের সাধনা করিলে আমাদের কি লাভ হইবে ? আমরা নশ্বর—অনিত্য বলিয়াই ত' নিত্য বস্তুর সন্ধান করি ! অনিত্যের সাধনায় নিত্যলাভ ত' দূরের কথা, অনিত্যতা আরও ঘনীভূত হইবে না কি ? কারণ, যে যাহার সাধনা করে, সে তাহাই হয়, সুতরাং অনিত্য জগতের সাধনা করিয়া আমরাও ত' অনিত্যই থাকিব ! **'তয়া সর্বমিদং ততম্'** কথাটিতে এইরূপ আশঙ্কাও দূরীভূত হইল । তিনি অনিত্য জগন্মূর্তিতে প্রকটিতা হইলেও, তাঁহার নিত্য-স্বরূপটি সর্বত্র অক্ষুণ্ণ —ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তিনি নিজে নিত্যস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এই নামরূপাত্মক অনিত্য জগদাকারে প্রকাশিত হন নাই । যেরূপ, বস্ত্রের প্রত্যেক পরমাণুই তুলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কিংবা বরফের প্রত্যেক পরমাণুই জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; সেইরূপ এই অনিত্য জগতের প্রত্যেক কল্পিত অণুই নিত্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; সুতরাং আশঙ্কার কোন হেতু নাই। অনিত্য জগৎকে মা বলিতে গিয়া, তোমাকে নিত্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না । তুলান্বেষী যদি বস্ত্রখণ্ড পায় কিংবা জলপানেচ্ছু যদি তুষারখণ্ড পায়, তবে সে কি অন্বেষ্টব্য পদার্থ হইতে বঞ্চিত হয় ? সেইরূপ তুমিও জগৎকে মা বলিতে গিয়া দেখিবে—মায়ের জগন্মূর্তি অপসৃত, নিত্য স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত । মা আমার সর্বব্যাপী বিভু । তিনি আত্ম-স্বরূপে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন । তুমি পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক পদার্থকে মা বলিতে গিয়া ইহার অনেক প্রমাণ পাইবে ; দেখিবে—এই জড়পদার্থই তোমার সহিত যেন চৈতন্যবৎ ব্যবহার করিতে উদ্যত । জড়পদার্থকে মা বলিতে বলিতে, সত্য বলিতে বলিতে, যে মুহূর্তে তোমার বিশ্বাস স্থির হইবে—জড়ত্বজ্ঞান অপনীত হইবে, সেই মুহূর্তে ইহা একজন চেতনাবান জীবের ন্যায় তোমার সহিত ব্যবহার করিবে । জড় বৃক্ষ তোমায় অভিলষিত বরদান করিবে, জড় মাটি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে । কণ্বমুনির আশ্রমতরু যে শকুন্তলার বস্ত্র-ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন ইহা কবি কল্পনা নহে, ধ্রুব সত্য । সত্য প্রতিষ্ঠার এমনই ফল । সত্য-প্রতিষ্ঠায় শুষ্কতরু মুঞ্জরে । বর্তমান যুগেও সত্য বলিয়া, মা বলিয়া অনেক সাধক জড়পদার্থ হইতে চেতনবৎ ব্যবহার পাইয়া ধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন ।

ভগবানের যে নামটি যাহার প্রিয়তম, ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধটি যাহার অভীষ্টতম, সেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নাম ধরিয়া জড়পদার্থে সত্য-প্রতীতি স্থাপন করিলে, দেখিবে—জড় বলিয়া কিছু নাই, উহা চৈতন্যের ছদ্মবেশ মাত্র । সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনীভূত হইলে, সত্যবোধ বিশ্বাসে পরিণত হইলে দেখিবে—জগন্মূর্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, মহান চৈতন্যময় আকাশবৎ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত, অথচ সর্বেন্দ্রিয়-ধর্মযুক্ত মায়ের সেই নিত্য-

স্বরূপটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই **'তয়া সর্বমিদং ততম্'** । ইহাই মায়ের আমার বিশ্বব্যাপী চিন্ময়রূপ ; অথবা উহা রূপও নহে, অরূপও নহে, উহা যে কি তাহা অব্যক্ত ; গগনসদৃশ—কেবল জ্ঞানমূর্তি । উহাই ক্ষীরোদসমুদ্র বা কারণবারি। অসুরকর্তৃক উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ এই ক্ষীরোদকূলে অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট মূর্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাবের জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এবং তিনিও অচিরে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া বরাভয় প্রদান করেন । এইরূপ আবির্ভাবকেই লোকে **'উৎপন্না'** বলিয়া অভিহিত করে । বস্তুতঃ মহামায়ার উৎপত্তিও নাই, কর্মও নাই । দেবতাদিগের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব এবং দেবকার্য-সিদ্ধিই তাঁহার কর্ম ।

তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যই দেবতাবৃন্দ । তাঁহারা যখন নিয়ত পরিবর্তনশীল জগদ্‌ভাবরূপ অসুরকর্তৃক পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া আপনাদিগকে অতীব আর্ত বিপদাপন্ন মনে করেন, তখনই তাঁহারা এই অব্যক্তক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রার্থনা করেন । সন্তানবৎসলা মা আমার সেই আকুল প্রার্থনার প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েন এবং উৎপীড়ক সুরবিরোধী-ভাবরাশিকে বিনাশ বা আপনাতে লীন করিয়া লয়েন । ইহাই মহামায়ার আবির্ভাব তত্ত্ব । ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে ।

এইবার সুরথের সকল প্রশ্নের সমাধান হইল । ষষ্ঠ প্রশ্ন **'যদুদ্ভবা'** কথাটির ঋষি আর পৃথক্ কোন উত্তর দিলেন না ; কারণ, প্রথমেই বলিয়াছেন—**'সা নিত্যা'** যিনি নিত্য, তাঁহার অন্য হইতে উদ্ভব অসম্ভব । সুরথ এ পর্যন্ত মহামায়াকে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত মনে করিয়াছিলেন ; তাই **'যদুদ্ভবা'** প্রশ্নটির আবশ্যক ছিল ; কিন্তু এখন গুরূপদেশে সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিলেন—মহামায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু ।

———○———

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে ।
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥৪৭॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥৪৮॥

অনুবাদ । প্রলয়কালে যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল,তখন প্রভু ভগবান বিষ্ণু শেষ-আস্তরণ-পূর্বক যোগনিদ্রার ভজনা করিতেছিলেন । সেই সময় মধু ও কৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল ।

ব্যাখ্যা । পূর্ববর্তী-মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছিলেন, মহামায়া নিত্য হইয়াও দেব-কার্য সিদ্ধির জন্য যখন বিশিষ্টরূপে আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি 'উৎপন্না' রূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন । এইবার সেই দেবকার্য-সিদ্ধির জন্য বিশিষ্ট আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছেন । এইখান হইতেই দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণন আরম্ভ হইল ।

কল্পান্ত শব্দের অর্থ প্রলয়কাল । যখন সৃষ্টির বীজসমূহ ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে, তখন জগৎ থাকে না, একার্ণবীকৃত হয় । জগৎরূপ কার্যসমষ্টিরই পরম-কারণে লীন হওয়া অর্থাৎ এই কারণীভাব প্রাপ্ত হওয়ার নাম একার্ণব । ঋগ্ বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে সমুদ্র ও অর্ণব এই দুইটি সৃষ্টির উল্লেখ আছে । উহা স্থূলতঃ একার্থবাচক হইলেও একটি কার্য ও অপরটি কারণের বোধক । বটকণিকা যেরূপ ভবিষ্যমাণ বিশাল বট-মহীরুহের পূর্বাবস্থা সেইরূপ যখন এই জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের বীজ বা কর্মসংস্কারসমূহ ব্রহ্মরূপ পরম-কারণে অবস্থান করে, তখনই কল্পান্তকাল নামে অভিহিত হয় । এই সময় বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছুরই উপলব্ধি হয় না ; তাই, ইহাকে একার্ণব বা কারণসমুদ্র বলে ।

এই কল্পান্তকালে বিষ্ণু যোগনিদ্রার আরাধনা করেন । বিষ্ণু শব্দের অর্থ জগদ্ব্যাপক চিৎশক্তি । যাহাতে জগৎ অবস্থিত—যে চৈতন্য জগৎ-প্রতীতিবিশিষ্ট, তাঁহার নাম বিষ্ণু । সাধনাক্ষেত্রে ইহা প্রাণ নামে অভিহিত হয় । শ্রুতিও আছে—এই সমস্ত জগৎ প্রাণেই ধৃত । উনিই ভগবান । **'উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্, বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি'** । প্রাণিসমূহের উৎপত্তি নাশ আগম নির্গম বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সকল বিষয় যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনিই ভগবান । বিষ্ণুর আর একটি বিশেষণ আছে প্রভু । প্রভু শব্দের অর্থ স্বাধীন—তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করিতে পারেন । মা ইঁহাকে এত উচ্চ অধিকার দিয়াছেন যে, ইচ্ছামাত্রে যাবতীয় সংকল্প সিদ্ধি

করিতে পারেন, তাই ইনি প্রভু। সে যাহা হউক, যখন জগৎ থাকে না, তখন জগদ্ব্যাপক চৈতন্য বা প্রাণ কিরূপে অবস্থান করেন তাহাই বলিতেছেন —'**শেষমাস্তীর্য**' তখন প্রাণ অবশেষামৃত আস্তরণ করিয়া অর্থাৎ ভবিষ্যমাণ জগতের বীজসমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া—অধঃকৃত করিয়া বা আপনাতে প্রলীন করিয়া যোগনিদ্রার ভজনা করেন।

যোগ শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মমিলনী ভাব। তখন জগদ্ভাব সুপ্ত থাকে বলিয়া, জগৎ ব্যবহারের পক্ষে ইহা নিদ্রা-তুল্য। যে বিষ্ণু জগদ্ব্যাপকস্বরূপে নিয়ত অবস্থিত, তিনিও জগতের অভাবে স্বকীয় ব্যাপকতা প্রভুত্ব ভগবত্ত্ব প্রভৃতি বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া, তামসী নিদ্রারূপিণী মহামায়ার ক্রোড়ে সুপ্ত হন। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে ? একমাত্র যোগের দ্বারাই ইহা সম্ভব। পরমাত্মভাবে স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি মিলাইয়া দেওয়াই যোগ। এই যোগ সুসিদ্ধ হইলেই জগদ্ব্যাপারে নিদ্রা বা সুপ্তভাব হইবেই। ইহা একটি অপূর্ব মধুময়ী অবস্থা। প্রলয়কালে ভগবান বিষ্ণু এই যোগনিদ্রা-রূপিণী মহামায়ার ভজনা করিতে থাকেন। যে যাঁহার ভজনা করে, সে তৎসারূপ্য লাভ করে ; ইহা সর্ববিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ; সুতরাং এ অবস্থায় বিষ্ণুর আর স্বতন্ত্রতা থাকে না। 'আমি বিষ্ণু' এরূপ প্রতীতিও থাকে না, তখন শুধু যোগ-নিদ্রারূপিণী মাতৃ-সত্তা বিদ্যমান থাকে।

বিষ্ণুকর্ণ শব্দের অর্থ—ব্যাপক চিদাকাশ। শব্দ-গুণাত্মক আকাশকে বুঝাইবার জন্যই কর্ণ এবং ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিষ্ণু শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। মল শব্দের অর্থ আবরক। নির্মল শুভ্র চিদাকাশের আবরণস্বরূপ বলিয়া মধুকৈটভকে বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত বলা হইয়াছে। 'মধু শব্দের অর্থ আনন্দ, কৈটভ শব্দের অর্থ বহুত্ব। **কীটবৎ ভাতি ইতি কীটভঃ, তস্য ভাব ইতি কৈটভঃ**' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটসমূহ যেমন একস্থানে সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব শক্তি অনুসারে স্পন্দনধর্ম প্রকাশপূর্বক একত্র বহুত্বের পরিচয় দেয়, সেইরূপ সঞ্চিত কর্মবীজসমূহ যুগপৎ বহুভাবের পরিজ্ঞাপন করে ; তাই, বহুত্বের বীজই কৈটভ নামে অভিহিত। স্থূল কথায়—'**একোঽহং বহুস্যাম**' এই দুইটি সংস্কারের নামই মধুকৈটভ।

এইবার আমরা যথার্থ সাধন-সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এইখান হইতেই দেবীমাহাত্ম্য, দেবীর আবির্ভাব, দেবকার্যসিদ্ধি ও অসুর-নিধন প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা-বৈচিত্র্যমধ্যে আপতিত হইব। সাধক ! এস, ধীরভাবে অগ্রসর হই, অতি গহন রহস্য ! মা ! হৃদয়ে বল দাও, তুমি সম্মুখে বিজ্ঞানময় গুরুমূর্তিতে দাঁড়াও, অতি গভীর রহস্যাবৃত এই সাধন-তত্ত্ব-সমূহ সমুদ্ভাসিত করিয়া দাও, আমরা ধন্য হই ! তোমার জগৎ, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দ এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন সুধাভাণ্ড লাভ করিয়া অমর হউক। ব্রহ্মর্ষির দেশে আবার গৃহে গৃহে ব্রহ্মর্ষি বিরাজ করুক।

জীবাত্মা সমাধিসহায়ে শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট হইতে মহামায়ার স্বরূপ এবং স্বভাব অবগত হইয়া, তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাব ও কার্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করিতে থাকে। সমাধিস্থ হইয়া, এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। মনে রাখিও সাধক ! ইহা সবিকল্প সমাধি। আমরা কীলকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি—কৃষ্ণাষ্টমী বা মনের অর্দ্ধলয়-অবস্থা হইতে কৃষ্ণচতুর্দশী বা এক কলা অবশিষ্ট মনের লয় হওয়া পর্যন্ত যে সমাহিত অবস্থা হয়, সেই অবস্থায়ই এই সকল তত্ত্ব উন্মেষিত হইতে থাকে। সাধক যখন এইরূপ সমাধিস্থ হইয়া কাতর প্রাণে আকুল হৃদয়ে মাতৃ-আবির্ভাব, মায়ের বিশিষ্ট কার্য, বিশিষ্ট স্নেহ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তখন সে মায়ের কৃপায় দেখিতে পায় —অহর্নিশ যে জগদ্ভাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিত, সে জগদ্ভাব আর জাগিতেছে না ; সুতরাং প্রাণ সুপ্ত অথচ আত্মবোধটি বেশ জাগ্রত। জগতের বীজ বা সংসারের অস্তিত্ব ঈষৎমাত্র প্রতীত হয় ; কিন্তু তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ কি, তাহার উপলব্ধি হয় না। সম্মুখে অতি ঘন অতি শুভ্র স্বপ্রকাশ মহাব্যোমমাত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে ; ইহারই নাম কল্পান্তকাল, জগতের একার্ণবীভাব এবং শেষ-আস্তরণে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, যে অপরিসীম আনন্দের সম্ভোগ হয়, সাধক প্রথমতঃ কিছুদিন তাহাতেই মুগ্ধ থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট ইচ্ছা তাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত বা ব্যুত্থিত হয়। আবার জগদ্ভাবে অবতরণ করে। তখন বড় দুঃখ হয় ; সে

আনন্দের স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করে। তখন আরও কাতর হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে। শ্রীগুরুর চরণকমল আরও শক্ত করিয়া ধরে। তাহারই ফলে সৌভাগ্যবান জীব মাতৃ-কৃপায় পূর্বোক্ত অবস্থায় কিছু কাল অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখন সে জানিতে চায়— কেন আমি এ মধুময় ক্ষেত্র— আনন্দময় মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হই ? তাই, প্রার্থনা করে—'মা আমায় দেখাও—কে আমাকে এখান হইতে টানিয়া আবার জগদ্ভাবে মুগ্ধ করে' ? তখন মায়ের কৃপায় সে দেখিতে পায়—সেই নির্মল শুভ্র চিদ্‌ব্যোমক্ষেত্রে মল বা আবরক স্বরূপ দুইটি সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে—একটি বিশিষ্ট আনন্দ, অপরটি বহুভাবেচ্ছা। ইহারাই বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ। এই বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দ পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হইতে অন্য প্রকার ; তাই ইহাকে বিশিষ্ট আনন্দ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, অহংবোধাত্মক আনন্দ এবং বহুভাবেচ্ছা এই দুইটি অতি দুরপনেয় সংস্কার। উহারাই সাধকের কৈবল্যের বিরোধী ; তাই, ইহারা ঘোর অসুর বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যে অবস্থায় ইহাদের দর্শন হয়, সেই অবস্থায় ব্রহ্মা—সৃষ্টিশক্তি বা মন বিষ্ণুর নাভিকমলে বা প্রাণশক্তির অঙ্কে নিশ্চল, প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। পরমাত্মযুক্ততাই জীবন, আর তদ্‌বিমুখতাই হনন। যদিও তখন মন সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, তথাপি তখনও ত' মন নাভি বা মণিপুর-চক্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই উক্ত সংস্কারদ্বয় মনকে পুনরায় ক্রিয়াশীল হইবার জন্য, আবার জগদাকারে আকারিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় ও করিতে থাকে। ইহাই মধুকৈটভের **'হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ'**।

মায়ের কৃপায় সাধক এই মূল সংস্কারের সাক্ষাৎ পায়। মুখে সহস্রবার বলিলেও ইহার অনুভূতি হয় না। মায়ার কেন্দ্র কোথায়—তাহা এই স্থানে মধুকৈটভ দর্শনে বুঝিতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে—**'বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি'** সেই বলপূর্বক আকর্ষণ এই কেন্দ্র হইতে আরম্ভ হয়। ইহারাই অজেয় অসুর। ইহারাই আমার মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থানের সর্বপ্রধান অন্তরায়। আমি চাহিয়াছিলাম—বহু হইব, বহুভাবের আনন্দ উপভোগ করিব। সে চাওয়া সে ইচ্ছা পরমেশ্বর-ভাবের ; সুতরাং অমোঘ। ঐ ইচ্ছাটি বুকে করিয়া মা আমায় স্বাধীন আনন্দে অসংখ্যযোনি ভ্রমণ করাইতেছেন। বহুদিন বহুজন্ম এইরূপ ভ্রমণ করিয়া, একবার মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পাইলে—নির্মল পরমাত্ম-স্বরূপের আভাস পাইলে, আর ঐ বহুত্ব ও তন্মূলক আনন্দ প্রীতিকর হয় না ; বরং অতি তিক্ত-বোধ হইতে থাকে ; তখনই মধুকৈটভ-বধের সূত্রপাত হয় !

———○———

স নাভি কমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥৪৯॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥৫০॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥৫১॥

অনুবাদ। বিষ্ণুর নাভি কমলে অবস্থিত প্রজাপতি তেজঃপতি ব্রহ্মা সেই অসুরদ্বয়কে অতি উগ্র এবং জনার্দন বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া, হরির নিদ্রাভঙ্গের জন্য —হরিনেত্রকৃতালয়া বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহার-কারিণী ভগবতী অতুলনীয়া বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী সেই যোগ নিদ্রার একাগ্রহৃদয়ে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ যখন বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান সংস্কারদ্বয় যখন প্রাণশক্তির অঙ্কস্থিত সুপ্তপ্রায় মনকে পুনরায় জগদ্ব্যাপারে উন্মুখ করিতে উদ্যত হয় ; যখন মন উক্ত সংস্কারদ্বয়কে উচ্ছেদ-বাসনায় প্রাণশক্তির শরণাপন্ন হইতে গিয়া দেখে—প্রাণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, জগদ্ব্যাপারে বহির্মুখ ; তখন সেই অবস্থায় প্রাণকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সে যোগনিদ্রার শরণাপন্ন হয়। যোগনিদ্রারূপিণী যে মহতী শক্তি প্রাণকে জগদ্ব্যাপারে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে, জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী সেই মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাবের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকে। ইহাই এস্থলে আধ্যাত্মিক রহস্য।

এই মন্ত্রে যোগনিদ্রার একটি বিশেষণ আছে —হরিনেত্রকৃতালয়া। হরি শব্দের অর্থ— বিষ্ণু বা প্রাণ।

সর্বভাবকে হরণ করেন বলিয়া ইহার নাম হরি। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণের উপাসনা-প্রস্তাবে প্রাণকেই জগদ্গ্রাসকারী বা সর্বভাবের বিলয়কারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ! বস্তুতঃ ইহা প্রত্যক্ষও হয়—কি জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তিপ্রবাহ, কি কর্মেন্দ্রিয় শক্তিপ্রবাহ, কি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু-প্রবাহ, কি জনন-মরণাদি পরিবর্তন-প্রবাহ সবই প্রাণশক্তির আশ্রয়ে প্রকটিত সুতরাং তাহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে। তাই, প্রাণই হরি। জীব যতদিন এই প্রাণের সন্ধান না পায়, যতদিন প্রাণকে হরি বলিয়া, কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে না পারে, যতদিন আত্মপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, যতদিন গুরুর প্রাণে আপনার প্রাণ মিলাইয়া দিতে না পারে, ততদিন গগনভেদী-রবে হরিনাম উচ্চারিত হইলেও, জীব অমরত্বের—অভয়পদের সন্ধান পায় না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই সর্বাশ্রয় প্রাণের সন্ধান পাইয়াই হরিনামে আত্মহারা হইতেন। প্রাণহীন নাম মৃত শব্দমাত্র ; কিন্তু প্রাণময় নাম নামী হইতে শ্রেষ্ঠ। যে নাম উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাণের অনুভূতিতে সাধক আত্মহারা হইয়া যান, সেই নাম এখন কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে ; কিন্তু কয়জন লোক যথার্থ প্রাণের সন্ধান পাইয়া অমরত্ব-লাভে চরিতার্থ হইয়াছেন ? নাম করিতে করিতে অশ্রু-বিসর্জন, ভূমি-বিলুণ্ঠন কিংবা সংস্কারগঠিত প্রাণহীন কোন দেবমূর্তি-দর্শন, এ সকল সাধারণের পক্ষে উচ্চ অবস্থা হইলেও, যথার্থ চরিতার্থতার পরিচায়ক নহে।

যাহা হউক, হরিনেত্রকৃতালয়া শব্দে—প্রাণের বহির্মুখী প্রকাশভাবকে বুঝায়। নেত্র প্রাণের বহিঃপ্রকাশ স্থান। মৃত ও জীবন্ত ভাব চক্ষুতেই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। আমরা যে নিত্য প্রাণময়ীর অঙ্কে অবস্থিত, তাহা চক্ষুতেই প্রধানরূপে উদ্ভাসিত। অক্ষিগত পুরুষের সাধনার বিষয় উপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। প্রতিমা-পূজাদিতে চক্ষুদান বলিয়া যে একটি অনুষ্ঠান আছে, উহা প্রাণেরই বহির্মুখী অভিব্যক্তির প্রথম ক্রিয়াবিশেষ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠাবান সাধক জানেন—কি উপায়ে মৃন্ময় জড়চক্ষুতে চৈতন্যের বিকাশ পরিব্যক্ত হয়। এখনও গৃহে গৃহে প্রতিমাপূজা হয় ; কিন্তু হায় ! 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং' ইত্যাদি চক্ষুদানের মন্ত্র কয়েকটি পঠিত হয় মাত্র ; উহা যে কি ব্যাপার ! কি উপায়ে মৃন্ময়চক্ষু চিন্ময়ীর বহির্বিকাশরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা অতি অল্প লোকই জানেন।

আমাদের সর্ববিধ বৈধক্রিয়ার প্রারম্ভেও আচমনমন্ত্রে **'দিবীব চক্ষুরাততম্'** বলিয়া বিশ্বব্যাপী প্রকাশ-শক্তির অন্ততঃ আংশিক উপলব্ধির বিধান আছে। সকলেই আচমন করেন ; কিন্তু কয়জন লোক সেই জগদ্ব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ, যাহা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুবৎ উদ্ভাসিত, সেই সর্বতোভেদী দৃক্শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ! কয়জন লোক মায়ের চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া প্রকৃত চক্ষুষ্মান হন ! কিন্তু সে অন্য কথা—

চক্ষুতেই মা আমার বিশেষভাবে প্রকাশিতা। নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই চৈতন্যের বহির্মুখ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই প্রাণ যখন অন্তর্মুখী হয়—যখন জগদ্ব্যাপার হইতে বিরত হয়, তখন চক্ষুতেই তাহার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। তাই, মা আমার হরিনেত্রকৃতালয়া। যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া প্রাণের জগন্মুখী বিকাশ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, প্রাণ সাময়িক মাতৃ-যোগজনিত আনন্দে আত্মহারা, সংসারের আসক্তি বা উচ্ছেদ উভয়ত্র নিস্পৃহ, এই অবস্থাটি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। মহামায়া মা প্রাণকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া স্থাপিত করিয়াছেন যে, সে আর জগতের ভালমন্দ কিছুতেই নাই। মা কিন্তু এভাবেও তাঁহাকে রাখিতে চান না। তাঁহার দ্বারাই জগৎ-উদ্ধার-ব্রত সম্পাদন করাইবেন। তাই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য এই আয়োজন। তাই, ব্রহ্মা বা মন মাতৃ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী এবং স্থিতি সংহারকারিণী ; সুতরাং অতুলনীয়া, অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী, ভগবতী। মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তি-বোধক শব্দ পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, পরে আরও অনেকবার বলা হইবে। দেবীমাহাত্ম্যে এরূপ বলায় পুনরুক্তি-দোষ হয় না ; কারণ, উহাই সাধনার বীজ। বেদান্তদর্শনে **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** এই ব্রহ্ম-নিরূপণ সূত্রটিও ঐ একই অর্থের বোধক। যাহা হইতে এ জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহার সাধনা কর। যত কিছু যোগতপস্যা, যত কিছু সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকলেরই উদ্দেশ্য ঐটুকু। ঐ **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'**। ঐটুকু উপলব্ধি করিতে

পারিলেই জীবত্বের অবসান হয়। জীব আমরা, চতুর্দিকেই জীবত্বের গণ্ডী। তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া আমরা দীন হীন সাজিয়া বসিয়াছি। যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট, যাঁহাতে এই জগৎ স্থিত এবং যাঁহাতে এই জগৎ প্রলীন হয়, কোনওরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই, জীবত্বের অবসান হয়; কারণ উহাই যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বরূপ মহত্ত্বের কথা দুই একবার শুনিলেই আমাদের আত্মস্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না; তাই, সাধকবরেণ্য ঋষিপাদগণ পুনঃ পুনঃ আত্মার এই গুণত্রয়—এই ঈশ্বর-ভাবটি স্মরণ করাইবার জন্য গম্ভীর ধ্বনিতে গম্ভীরবেদী[১] হস্তীর নিদ্রা ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা গম্ভীরবেদী হস্তী। কিছুতেই আমাদের জীবত্বের ঘুম ভাঙ্গে না; সুতরাং সাধনা-জগতের কথা—মায়ের মহত্ত্ব যত পুনরুক্তি দোষ-যুক্ত হইবে, ততই মঙ্গল। যিনি যত বেশী মাতৃ-মহত্ত্বের পুনরুক্তি করিবেন, তিনি আমাদের প্রতি তত সমধিক কৃপাবান। আমরা ত' পুনরুক্তি-দোষ দর্শন করিবই, মলিনতা দর্শনই আমাদের স্বভাব; কিন্তু যাঁহারা অস্মৎকৃত এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সহ্য করিয়াও বারংবার আমাদের নেত্রসমীপে মাতৃ-মহত্ত্ব চিত্রিত করেন, ধন্য তাঁহাদের অহৈতুক কৃপা!

শুন, আর একটু খুলিয়া বলিতেছি। নাভিকমল বা মণিপুরচক্র তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্র। মন্ত্রেও **'তেজসঃপ্রভুঃ'** শব্দটি ব্রহ্মার বিশেষণরূপে উক্ত হইয়াছে। এই নাভিচক্র হইতেই জাগতিক সর্বভাবের বিকাশ হয়। তেজস্তত্ত্ব হইতেই রূপ জগতের আরম্ভ; যতক্ষণ জগৎ-সংস্কারের বীজ থাকে, ততক্ষণ মন বা সৃষ্টিশক্তি এই নাভি কমলের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে না; অন্য দিকে হরিনেত্রকৃতালয়ার, বা আজ্ঞাচক্রস্থিত চিৎপ্রতিবিম্বের মোহিনী শক্তিতে একান্ত মুগ্ধ থাকে। এ অবস্থায় তাহাকে আবার বহুভাবে স্পন্দিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিলেও মন আর ঐ শান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিতে চায় না। সে তখন যে যোগনিদ্রারূপিণী চিৎশক্তির অঙ্কে প্রাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সেই শক্তির শরণাপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে প্রাণ সক্রিয় হইলেই আগামী কর্মের বীজস্বরূপ মূলসংস্কার বা মধুকৈটভ বিনষ্ট হইবে। আর তাহাকে বহুভাবে স্পন্দিত হইতে হইবে না।

———০———

ব্রহ্মোবাচ

ত্বং স্বাহা ত্বঃ স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥৫২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন—হে মা! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্কারাদি মন্ত্র এবং উদাত্তাদি স্বর, তুমিই সুধা। হে অক্ষরে! হে নিত্যে! তুমিই ত্রিমাত্রা-স্বরূপা।

ব্যাখ্যা। ত্বম্ বা তুমি শব্দটি সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়। অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে তুমি বলা যায় না। যাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই ত্বম্ শব্দের প্রয়োগ হয়। এস্থলে ব্রহ্মা বা মন হরিনেত্রকৃতালয়া যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়াই **'ত্বং'** শব্দের প্রয়োগ করিলেন। সাধকমাত্রেরই এরূপ করিতে হয়। স্তব-স্তুতি, আবেদন-নিবেদন কাতরপ্রার্থনা, করুন ক্রন্দন যাহা কিছু করিবে, কখনও মাকে অপ্রত্যক্ষ রাখিয়া করিও না। মা কোথায়—অলক্ষ্য স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার উদ্দেশ্যে কল্পনার সাহায্যে এইখানে বসিয়া স্তবাদি পাঠ বা সাধনা করিতেছ; এইরূপ ভাব যতদিন থাকিবে, ততদিন সাধনা-পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারিবে না। সাধনারাজ্যে কল্পনা বা অনুমানের স্থান নাই, অপ্রত্যক্ষের উদ্দেশ্যে কোন সাধনা হয় না। সাধনার প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যক্ষতার উপলব্ধি হইবে; প্রত্যক্ষতাই সাধনার প্রাণ। সেই জন্য এই স্থলে আমরা এই ব্রহ্মাকৃত স্তবটির ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে একবার মন্ত্রচৈতন্য-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইব; কারণ, মন্ত্রচৈতন্য হইলেই দেবতা প্রত্যক্ষ হয়। চৈতন্যহীন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ দেবতা অপ্রত্যক্ষ থাকিলে বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনাও প্রায় নিষ্ফল হয়। ইহাই ঋষিদিগের আদেশ।

মন্ত্র—শব্দবিশেষ। যে শব্দটি মনন করিলে পরিত্রাণ

[১]চর্মচ্ছেদ, মাংসকর্তন এবং রক্তপাত করিলেও যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তাহাকে গম্ভীরবেদী হস্তী কহে। 'তুমিই ব্রহ্ম' ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও জীব উহা উপলব্ধি করিতে পারে না; সেইজন্য জীবকে গম্ভীরবেদী হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পাওয়া যায়, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র-প্রতিপাদ্য সদর্থই গুরু। এবং তাদৃশ অর্থমূলক অনুভূতি বা বেদনের নাম চৈতন্য অর্থাৎ ইষ্টদেব। এইরূপ মন্ত্র গুরু ও দেবতা, এই তিনের একীকরণ হইলেই মন্ত্র-চৈতন্য হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সহজ করা যাউক। মনে কর, তেঁতুল একটি শব্দ। এই শব্দটি মন্ত্রস্থানীয় ; যতক্ষণ তেঁতুল শব্দটির অর্থ বোধ না হয়, তেঁতুল কি তাহা জানা না যায়, ততক্ষণ উহা মৃতশব্দমাত্র। মুখে লক্ষবার তেঁতুল বলিলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইবে না। তারপর একজন আসিয়া তেঁতুলের আকার আস্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝাইয়া দিল। তখন তেঁতুলের অর্থ-জ্ঞান হইল ; এই অর্থেরই নাম গুরু। তখন তেঁতুল-শব্দ-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার অম্লতা-বিষয়ক জ্ঞান ফুটিতে লাগিল। তারপর, যখন দেখিবে—তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করিলে ঐ অম্লতা-বিষয়ক জ্ঞান, তোমার অনুভূতি পর্যন্ত ফুটাইয়া তুলিতে পারে অর্থাৎ যখন তেঁতুল বলিলেই জিহ্বা রসার্দ্র হয়, তখনই বুঝিবে উহা চৈতন্যময় হইয়াছে! এইরূপ সর্বত্র। তুমি বলিলে—'দয়াময়ী মা'। অমনি দয়ার অনুভূতিতে তোমার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল। এইরূপ হইলেই বুঝিবে যে তোমার দয়াময়ী শব্দটি যথার্থ উচ্চারিত হইয়াছে। তুমি মা বলিতেছ, কে মা তাহা জান না, মা শব্দের অর্থও অবগত হও নাই, এরূপ অবস্থায় যতদিন তুমি মা বলিবে, ততদিন উহা মৃত মন্ত্রমাত্র। তারপর একজন তোমায় বুঝাইয়া দিলেন—মা শব্দের অর্থ 'পরিপূর্ণ স্নেহের আধার জগদ্ব্যাপী চৈতন্য তিনিই তোমার আত্মা'। গুরুকৃপায় ইহা যেদিন বুঝিতে পারিবে, যে দিন মা বলিবামাত্র একটা স্নেহঘন জগদ্ব্যাপী চৈতন্যময় আত্মানুভূতি ফুটিয়া উঠিবে সেই দিনই বুঝিবে তোমার 'মা' মন্ত্রটি চৈতন্যময় হইয়াছে। অর্থ না বুঝিয়া ঐ অর্থানুযায়ী রসে ও ভাবে স্বয়ং রসিক ও ভাবুক না হইয়া, মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে, উহার যথার্থ ফললাভ করা যায় না। শুধু মন্ত্রচৈতন্যরূপ একটি জিনিষের অভাবেই সাধনমার্গ দুর্গম ও অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয় ; সুতরাং কোন স্তোত্রাদিপাঠ কিংবা, বিশিষ্ট কোন মন্ত্রজপ অথবা নামকীর্তনকালে উহার সদর্থ জানিয়া, অর্থানুরূপ ভাবে স্বয়ং সম্বেদিত হইতে চেষ্টা করিবে, তবেই উহার যথার্থ ফল সত্বর প্রত্যক্ষ হইবে।

ব্রহ্মা বা মন আগামী কর্মের বীজস্বরূপ মধুকৈটভের উচ্ছেদ করিবার জন্য মহাশক্তির শরণাপন্ন হইলেন ; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব— শক্তিই একমাত্র সাধ্য, শক্তিই সর্ব-কারণ কারণ, অবাঙ্মনসোগোচর পরমাত্মা। তাঁহার কৃপা— ইচ্ছা না হইলে, এই অসুর-নিধন হয় না। তাই, মহামায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা বলিবেন—সমাধি-অবস্থায় এ সকল ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? তাঁহারা পুস্তক পড়িয়া সমাধি শব্দ মুখস্থ করিয়াছেন। যে সমাধিতে সর্বভাবের সম্পূর্ণ বিলয় হয়, তাহা একদিন একবার মাত্র হইয়া থাকে। সে সমাধি হইলে আর ব্যুত্থিত হইতে হয় না ; তাই, গীতা বলিয়াছেন—**'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'**। আর ইহা সেই সমাধিতে উপস্থিত হইবার পূর্ববর্তী অবস্থামাত্র। তবে ইহাও সমাধি ; কারণ, এ অবস্থায় জাগতিক ব্যাপার, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-প্রবাহ, প্রাণবায়ু-স্পন্দন, দেহবোধ-প্রভৃতি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসে। কলামাত্র অবশিষ্ট মন আত্মবোধময় মহা-চিদ্ব্যোম্-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, জীবভাবাপন্ন কার্যকারণ শৃঙ্খলাদি প্রত্যক্ষ করিতে থাকে এবং বিশিষ্ট প্রার্থনা বা কোন উপায়ের সাহায্যে শুদ্ধ আত্মবোধ—অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয়। সে অবস্থায় প্রার্থনা, স্তুতি অথবা প্রক্রিয়াবিশেষ স্থূলে প্রকাশ পায় না। শব্দহীন অথচ পূর্ণ শব্দময়, ক্রিয়াহীন অথচ পূর্ণক্রিয়াময় সে নীরবতার ধ্বনি, সে ক্রিয়াহীন সক্রিয় অবস্থা যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা সহজবোধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মোটামুটি এই পর্যন্ত জানিলেই হইবে যে — সমাধির প্রাথমিক অবস্থায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম করণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয় ও তাহাদের বিশিষ্ট কার্য-প্রণালী-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার আমরা স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্মা বলিলেন—মা তুমি স্বাহা। স্বাহা একটি দেবহবির্দানমন্ত্র ; কিন্তু এস্থলে যাবতীয় দেবকৃত্যের উপলক্ষণ। তুমি স্বধা—এইটি পিতৃদানমন্ত্র ; কিন্তু এ স্থলে পিতৃকৃত্যের এবং বষট্কার—এইটি যাবতীয় মন্ত্রের উপলক্ষণ। আমাদের মাকে মনে পড়িলে, সর্বপ্রথমে কর্মকাণ্ডগুলি চক্ষুর উপর ভাসিতে থাকে ; কারণ,

ঐগুলিই মাতৃ-আবির্ভাবের পূর্ব-সূচনা। কর্মকাণ্ড দেব ও পিতৃকার্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত। উভয়ই কতিপয়-মন্ত্রসাধ্য অনুষ্ঠানবিশেষ।

মা! তুমি স্বাহা, স্বধা এবং বষট্‌কার। পূজা হোম ব্রত জপ পুরশ্চরণাদি দেবকার্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকার্য এবং এই উভয়বিধ কার্যে যে মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়, তাহা তুমি। সেই মন্ত্রসমূহ পাঠ করিতে গেলে যে ত্রিবিধ স্বর উচ্চারিত হয়, যাহা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে অভিহিত যে স্বরের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে কাম্য-কর্মসমূহের ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে ; সেই স্বর-স্বরূপাও তুমি। তাই, তুমি স্বরাত্মিকা। ইন্দ্রের নিধনকামনায় বৃত্রাসুরের উৎপত্তির জন্য, ঋষিগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠপূর্বক আহুতি প্রদান করিতেছিলেন, তখন তুমি ত' মা! সেই সত্যদর্শী-ঋষিদিগের কণ্ঠে অবস্থান করিয়া 'ইন্দ্রশত্রু' পদের উচ্চারণ-কালে অনুদাত্ত স্বরের বিনিময়ে উদাত্ত স্বরূপে নির্গত হইয়াছিলে! তাহারই ফলে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল ; সুতরাং তুমিই ত' স্বরাত্মিকা। এতদ্ভিন্ন জীবসমূহের কণ্ঠ হইতে নাদরূপে যে স্বর নির্গত যাহা—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী নামে অভিহিত হয়, সে স্বররূপেও তুমি মা!

পূর্বোক্ত দেব ও পিতৃকার্যাদি অনুষ্ঠানের যাহা ফল বা অপূর্ব, সেই কর্মফল বা অদৃষ্টরূপেও তুমি মা। কর্মফলই অমৃত ; তাই তুমি সুধাস্বরূপিণী। উপনিষদে দেখিতে পাই —**'অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মষু চামৃতম্'**। আচার্য শঙ্কর অমৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন—কর্মফল। যতক্ষণ দেব ও পিতৃকার্যকে মাত্র কর্মরূপে, বৈধকার্যে উচ্চারিত শব্দগুলিকে মাত্র মন্ত্ররূপে এবং বৈধকার্যজন্য ফলসমূহকে মাত্র কর্মফলরূপে দেখি, ততক্ষণই উহা ক্ষর-ধর্মী ; কিন্তু যখন দেখিতে পাই অক্ষরা নিত্যা মা আমার, দেব ও পিতৃকার্যরূপে প্রকটিতা, যখন দেখিতে পাই—উদাত্তাদি স্বরভেদে এবং মন্ত্ররূপে মা তুমিই উচ্চারিতা, তখন আর কর্মফলগুলিকে সুধা বা অমৃত না বলিয়া কিরূপে অজ্ঞান বা ক্ষরধর্মা বলিব?

কর্মমাত্রেরই একটি সাধারণ ফল আছে, উহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানের উন্মেষ করাই কর্মরূপিণী মায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান নিত্য ; সুতরাং অমৃত। তাই, কর্মফলকে অমৃত বা সুধা বলা যায়।

তারপর সর্ব মন্ত্রের সার যে ত্রিধামাত্রা—ওঁকার। যাহা হইতে এই জগৎ, যাহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যাহা অকার, উকার ও মকার রূপে জগদাকারে প্রকটিত, সেই ত্রিমাত্রাও তুমি।

এই স্থলে ত্রিমাত্রার স্বরূপসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। মাত্রাশব্দের অর্থ স্পন্দন। স্পন্দন—শক্তি-প্রবাহমাত্র। চিন্ময়ী মহাশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকটিতা হইয়া, জড়শক্তি নামে অভিহিত হন। ঐ শক্তিপ্রবাহ তিন প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ করে। প্রথম—উৎপত্তি বা নামরূপবিশিষ্ট এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্র। ইহাই সৃষ্টি বা অকারমাত্র। দ্বিতীয়—স্থিতি। সেই বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত শক্তি-কেন্দ্রটি যতক্ষণ লয়শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপ স্থির রাখিতে সমর্থ, ততক্ষণই উহা স্থিতি বা উকারমাত্রা নামে অভিহিত হয়। তৃতীয়—লয়। যখন উক্ত শক্তিকেন্দ্র আবার মহাশক্তির অঙ্কে অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনই লয় বা মকারমাত্রা কথিত হইয়া থাকে। একটি ফল হাতে করিয়া দেখ—কি যেন একটা শক্তি অদৃশ্য পরমাণুগুলিকে ঘন সন্নিবদ্ধ করিয়া ফলের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উহাই প্রথম স্পন্দন বা অকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহা ব্রহ্মা। যোগিগণ উহাকে মনরূপে দর্শন করেন। তারপর দেখ, উক্ত ফলরূপে স্থূলে প্রকটিত শক্তিপ্রবাহ যতক্ষণ লয় বা বিরোধীশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত রাখে, ততক্ষণই উহা দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহাকে বিষ্ণু কহে। যোগিগণ ইহাকে প্রাণরূপে দর্শন করেন। অনন্তর কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে, ঐ ফলটি পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ যে নাশ বা প্রলয়, উহারই নাম তৃতীয় স্পন্দন বা মকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহাকে শিব কহে। যোগিগণ উহাকে জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। এই প্রলয় একটা আকস্মিক পরিবর্তন নহে, প্রতি পরমাণুর প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের ফল। প্রতি মুহূর্তে প্রতি পরমাণুতে পূর্বকথিত জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে প্রভৃতি ছয়টি পরিবর্তন এই ত্রিবিধ স্পন্দনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। জীব যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এক দিনে মৃত্যু হয় না। জন্মশব্দের অর্থই মৃত্যুর আরম্ভ। তবে, যতদিন তৃতীয়

স্পন্দন বা মকারমাত্রা অপেক্ষা দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা প্রবল থাকে, ততদিন মৃত্যু বলিয়া বিশিষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না।

জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতি মুহূর্তে এই বিবিধ স্পন্দন বা ত্রিশক্তিপ্রবাহ চলিতেছে। যখন যে স্পন্দনটি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে, তখন সেইটিমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এই জগৎকে ত্রিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। উহাই শ্যামাপূজার ত্রিকোণ যন্ত্র। পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি শ্যামাপূজা করিবার বিধান তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চভূত ঐ ত্রিবিধ শক্তির প্রবাহমাত্র। কর্পূরাদি স্তবের ত্রিপঞ্চার শব্দটিরও ইহাই তাৎপর্য। তন্ত্রে যে সকল যন্ত্রপূজার বিধান আছে, উহা মহতী-শক্তি-প্রবাহ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা জন্মায়।

———○———

অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥ ৫৩॥

অনুবাদ। মা! যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য, সেই নিত্য অর্দ্ধমাত্রা তুমি। তুমিই সাবিত্রী। হে দেবি! তুমিই পরা জননী।

ব্যাখ্যা। মা! এ পর্যন্ত তোমার যে ত্রিমাত্রাস্বরূপের আভাস পাইলাম, উহাই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাভিমানী বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পুরুষ। বহুদিন ধরিয়া তোমার এই ত্রিবিধ স্বরূপ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি— তুমিই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ। মা! তোমার এই স্বরূপটি অতি মনোহর হইলেও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর একটি স্বরূপ আছে, তাহা অনুচ্চার্য, বিশেষভাবে উচ্চারণ করা যায় না; তাহাই তোমার নিত্যস্বরূপ। উহাই অর্দ্ধমাত্রা নামে কথিত। উহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মা! তোমার ত্রিমাত্রাস্বরূপে বরং বিশেষণ দেখিয়া বিশেষ্যের প্রতীতি হয়, জগৎ দেখিয়া শক্তির অনুমান হয়; কিন্তু সেখানে—সেই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপে তুরীয় অবস্থায় তুমি অচিন্ত্য অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়গম্য সত্য। এক কথায়, যখন তোমাতে ত্রিমাত্রার পূর্ণভাবে লয় হয়, তখনই তুমি অনুচ্চার্যরূপে বিন্দুরূপে প্রকটিতা হও।

তৃতীয় মাত্রা বা মকারটি ব্যঞ্জন, উহা অর্দ্ধমাত্রা ওকারের মস্তকে ঐ অর্দ্ধমাত্রাই নাদ ও বিন্দুরূপে প্রকাশিত। যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই তাহাকে বিন্দু বলে। ইহা জ্যামিতির অনুশাসন। ঐ অবস্থিতি-অংশটি নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক এবং বিস্তৃতি-অংশটি সগুণ ব্রহ্ম বা শক্তির প্রকাশক। ইহাই নাদ। যাঁহারা নিগুর্ণের গুণ বা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারাই ব্রহ্ম হইতে মায়াকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। যাহার অবস্থিতি আছে, তাহার একটু না একটু বিস্তৃতি আছেই; কারণ, বিন্দু-সমষ্টিই পদার্থ। বিন্দুকে মাত্র চৈতন্য এবং নাদকে মাত্র জড়শক্তিরূপে গ্রহণ করিলে, বিন্দুর শক্তিহীনতা আপতিত হয়। এ মতে শক্তিহীনের শক্তি-পরিচালকতা অসম্ভব বিধায় ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে হয়। ইহা বেদ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

আমরা কিন্তু জানি মা! তুমি বিন্দুরূপে নির্গুণ, নাদরূপে সগুণ এবং ত্রিমাত্রাস্বরূপে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছ। তবে তোমার এই অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপটি নিত্য— পরিবর্তনহীন এবং অনুচ্চার্য— বাক্যের অগোচর। অতএব হে দেবি! প্রকাশাত্মিকে দ্যোতনশীলে মাতঃ! তুমিই সাবিত্রী—জগৎ প্রসবকর্ত্রী, আবার তুমিই পরাজননী। ঐ ত্রিমাত্রারূপে তুমি জগজ্জননী আর অর্দ্ধমাত্রারূপে তুমিই পরাজননী।

যাঁহারা ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রাশব্দের অর্থ যথাক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জন করেন, তাঁহাদের সহিতও আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই; কারণ, স্বরের সাহায্যেই ব্যঞ্জন উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। স্বর বা শক্তি আশ্রয় করিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকাশ পান।

———○———

ত্বয়ৈব ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥ ৫৪॥

অনুবাদ। হে মা! এই বিশ্ব তোমাকর্তৃক নিয়ত বিধৃত; তুমিই এ জগতের সৃষ্টি ও পালন করিতেছ। হে দেবি! আবার অন্তকালে তুমিই ইহাকে ভক্ষণ বা গ্রাস কর।

ব্যাখ্যা। মা! সৃষ্টির পূর্বে বীজরূপে এই বিশ্ব তোমারই গর্ভে বিধৃত থাকে; আবার তুমিই উক্ত বীজকে পরিবর্তনশীল জগৎরূপে প্রসব কর। তারপর তুমিই

ইহাকে পরিপালন করিয়া, অন্তকাল ভক্ষণ বা সংহরণ করিয়া থাক। ইহাই তোমার মাতৃত্ব। গর্ভে ধারণ, প্রসব, বক্ষে ধারণ ও জ্ঞান-স্তন্যে পরিপোষণ এবং অবসানে —পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় তোমাতে অভিন্নভাবে মিলন-সম্পাদন, ইহাই তোমার মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব। যতদিন আমি জগদ্‌ভোগের যোগ্যতা লাভ করি নাই, ততদিন বীজরূপে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমারই রক্ত অর্থাৎ উপরঞ্জনশক্তির দ্বারা আমার ভোগ-যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছ। তারপর যখন দেখিলে—আমি জগদ্ভোগের সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, অমনি প্রসব বা সৃষ্টি করিয়া আমাকে বক্ষে লইয়াছ। নিজস্তন্যে—অমৃতে —বিষয়জ্ঞানে আমাকে পরিপুষ্ট করিতেছ। বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসঞ্চয়রূপে অমরত্বলাভের যোগ্যতা-সম্পাদনের জন্য অসংখ্য জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছ। যখন দেখিবে—আমি মাতৃ-স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছি, মা বলিয়া আত্মহারা হইতে শিখিয়াছি, অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি, পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখনই আমি অমৃত বা তোমার অন্ন হইব। তখন তুমি আমাকে অশন বা সংহরণ করিয়া তোমার অন্নপূর্ণা নাম সার্থক করিবে।

আমরা যে তোমার অন্ন। 'সর্বগ্রাসিনী মা একদিন আমাদিগকে গ্রাস করিবেন' যতদিন ইহা বুঝিতে না পারিব, ততদিন তুমিই আমার অন্ন। আমরা তোমারই স্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি। মা! তোমাকে যে কতরূপে ভোগ করিতেছি, তাহা ভাবিতে গেলেও স্তব্ধ হইতে হয়। যখন যাহা যেরূপ ভাবে চাহিতেছি, সেইরূপ ভাবে তখনই তাহা সাজিয়া আসিতেছ। তুমিই ত' বিষয়াকারে আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগ পূর্ণ করিতেছ, আমার উদ্দাম লালসার আহার যোগাইতেছ। এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, কত জন্ম-জন্মান্তর এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বাসনা বুকে করিয়া ছুটিয়াছি। আর তুমি আমার এমনই স্নেহবিমূঢ়া মা যে, আমার ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য—বাসনানুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছ! পাছে আমার স্বাধীন ভোগের মধ্যে বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে, আমার সমুন্নত আমিত্বের বিন্দুমাত্র অসম্মান হয়, তাই এত করিয়াও আপনার সত্তা, আপনকর্তৃত্ব লুক্কায়িত রাখিয়াছ। আমাকে বুঝিতে দাও নাই যে, তুমিই আমার বাসনা, তুমিই আমার ভোগ, তুমিই আমার অন্ন এবং তুমিই আমার পরিতৃপ্তি। এত স্নেহ এত ভালবাসা তোমার বুকে! রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দুর্গতি, আশাভঙ্গ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার অনাবিল পুত্রস্নেহ প্রবাহিত। এ স্নেহ আমরা কবে বুঝিতে পারিব! মা! এতদিন তোমায় খাইয়াছি —অজ্ঞানে তোমায় ভোগ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে খাও। কেন আর একটা পৃথক্ আমিত্বের গণ্ডি দিয়া তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছ? আমি তুমি এক হউক! আর সর্বরূপে কেন মা? সর্বগ্রাসিনীরূপে দাঁড়াও! একবার আকুলনয়নে আত্মহারা পুত্রের মুখপানে তাকাও মা! তোমার দিব্যনয়নে আমার ক্ষীণজ্যোতিঃ মলিন নয়ন স্থাপিত করিয়া, আমি মা মা বলিয়া আত্মহারা হই! আর তুমি—এস পুত্র! এস বৎস! বলিয়া আমায় গ্রাস কর। আমি মরিয়া অমর হই।

কি বল্‌লি মা! তুই সুধা; অমৃতই তোর আহার! আমরা এখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারি নাই—সুধা হই নাই; তাই, তুমি আহার করিতে পারিতেছ না! কেন, কার দোষ? আমার—না তোমার! আমি এখনও অযোগ্য সন্তান কার জন্য? তুমি বিজ্ঞানেশ্বরী মা, আর আমি অজ্ঞানান্ধ পুত্র! তুমি অমৃত, আর আমি মৃত্যুর কবলে অবস্থিত। কেন মা! কার দোষ? আমি চাহিয়াছিলাম! তাই কি? চাওয়ারূপে বাসনারূপে কে আমার বুকে ফুটিয়াছিল? লীলা! আর চাহি না মা। তোমার আনন্দময় জগৎলীলা করিতে হয়, সম্যক্‌ভাবে তোমার সহিত মিলিয়া করিব। আর পৃথক্ ভাবে কেন? মা মা মা!

এই মন্ত্রে ধার্যতে সৃজ্যতে পাল্যতে এবং অৎসি এই চারিটি ক্রিয়াপদের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিতা হইয়াছে।

———o———

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥ ৫৫॥

অনুবাদ। হে জগন্ময়ে! সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিরূপা। পালনে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহর্ত্রীরূপা।

ব্যাখ্যা। মা! পূর্বে বলিয়াছি—তুমিই এই জগতের

উৎপাদন পরিপালন ও সংহরণকর্ত্রী ; কিন্তু উহাতেও ঠিক বলা হয় নাই ; কারণ ওরূপ বলিলে মনে হয়—তোমা হইতে জগৎ স্বতন্ত্র। বাস্তবিক, তুমিই যে জগন্ময়ী, তুমি ছাড়া কোথাও কিছুই নাই । যদিও সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই—প্রত্যেক কার্যেই তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। একটি নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা, একটি উপাদান-কারণ বা উপকরণ এবং অপরটি কার্য বা বিশিষ্ট ফল ; কিন্তু মা ! তোমার এই জগদ্ব্যাপারে তুমিই নিমিত্ত, তুমিই উপাদান, তুমি কার্য । জল জমিয়া বরফ হয়, তাহাতেও বরং শৈত্যরূপ একটি আগন্তুক হেতু বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু তোমার এই জগদ্ব্যাপারে সে সব কিছুই নাই । তুমিই কার্য, তুমিই কারণ, আবার তুমিই কর্তা ।

আমি একটি ফল চাহিলাম । এই চাওয়া বা বাসনাই ফলের বীজ । (অব্যক্তা মা বাসনারূপে ফলের বীজ-আকারে প্রকাশ পাইলেন) । তারপর উক্ত বাসনা ঘনীভূত হইয়া ফলরূপে বাহিরে প্রকটিত হয় ; কারণ, বাসনার ঘনীভূত অবস্থাই ফল । সেই ফলটি আমার ভোগের অবসানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়া যায় । প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে । কোন্ এক অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে এক একটি বাসনা ফুটিয়া উঠে, পুনঃপুনঃ ঐ বাসনাটি উদ্বুদ্ধ হইয়া অভিলষিত বিষয়রূপে—ইন্দ্রিয়-ভোগ্যরূপে উপনীত হয় । ভোগের অবসানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়া যায় । এই যে ত্রিবিধ প্রকাশ ; ইহাই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহৃতি নামে অভিহিত। প্রতিনিয়ত প্রতি জীবে সম্যক্‌ভাবে এই ত্রিশক্তি পরিব্যক্ত ! হে জগন্ময়ি মা ! তোমার এক মুহূর্তও বিশ্রাম নাই । আমারই জন্য তুমি অজ্ঞেয়া হইয়া জ্ঞানরূপা, শক্তিত্রয়াতীতা হইয়াও শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াতীতা হইয়াও ক্রিয়াশীলা । তাই দেখিতে পাই—সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই সংহৃতিরূপা। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক ।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥৫৬॥

অনুবাদ । মা ! তুমি মহাবিদ্যা এবং মহামায়া, মহামেধা এবং মহা-অস্মৃতি ; সুতরাং তুমি মহামোহরূপিণী ; অতএব তুমিই মহাদেবী ও মহা-আসুরী ।

ব্যাখ্যা । মা ! যাবতীয় অসম্ভব ব্যাপার তোমাতেই সম্ভব । আলোক অন্ধকার অতি বিরুদ্ধ পদার্থ হইয়াও তোমাতেই সহাবস্থান করিতেছে । মহতী দৈবী প্রকৃতি এবং আসুরী প্রকৃতিরূপে তুমিই বিরাজিতা ; তাই, তুমি মহাদেবী হইয়াও মহাসুরী ; কারণ তুমি মহাবিদ্যা হইয়াও মহামায়া । মহতী ব্রহ্মবিদ্যারূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াও জীবজগৎরূপে মহামায়া-মূর্তিতে বিরাজিতা । আবার মহামেধা হইয়াও মহতী অস্মৃতি । আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী মহতী ধীস্বরূপা মহামেধা তুমি, আবার তোমাকে ভুলিয়া থাকা, তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া, ইহাও তোমারই প্রভাব । তুমিই মহতী বিস্মৃতরূপে জীবহৃদয়ে বিরাজিতা ; সুতরাং মহামোহরূপিণীও তুমি । তোমার সর্ববিধ কার্য, জাগতিক কার্যকারণ-শৃঙ্খলা-জ্ঞানের অতীত । মানববুদ্ধি তোমাকে বুঝিতে পারে না । মানুষ মনে করে—আলোক-অন্ধকার একস্থানে থাকিতে পারে না । জ্ঞান-অজ্ঞান, মেধা-বিস্মৃতি যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না ; কিন্তু মা ! তোমাতে সকলই সম্ভব । দৈবী এবং আসুরী প্রকৃতি পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াও তোমাতে নিত্য অবস্থিত । মা গো ! তুমিইত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ—আলোকের অল্পতাই অন্ধকার, জ্ঞানের অল্পতাই অজ্ঞান। তাই ত' মা তোমার সৃষ্ট জীবজগতেও দেখিতে পাই—তোমার এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ মূর্তির যুগপৎ অভূতপূর্ব সমাবেশ । [১]

---

[১] শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—জ্ঞান-অজ্ঞান, বিদ্যা-অবিদ্যা, সৎ-অসৎ, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ ; কিন্তু সত্যই কি উহারা অত্যন্ত বিরুদ্ধ ? পরস্পর বিরোধী-পদার্থদ্বয়ের একাধিকরণে সহাবস্থান মানব-বুদ্ধির অতীত হইলেও, 'পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব' বলিয়া, যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয় । উপলব্ধিও হয়—জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান থাকে না, আবার অজ্ঞান থাকিতেও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না । তথাপি ঐ অজ্ঞানটি যখন জ্ঞানেই অবস্থান করিতেছে, তখন অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী না বলিয়া, ঈষৎ জ্ঞান বলিলে কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা স্বীকার করিতে হয় না ; কারণ, অখণ্ড পূর্ণজ্ঞান ও ঈষৎ জ্ঞানের সহাবস্থান অসম্ভব হয় না । এইরূপ অবিদ্যা, অসৎ প্রভৃতি শব্দেও নঞ্‌টির ঈষদর্থ স্বীকার করিয়া লইলেই সর্ববিধ তর্কের অবসান হয় । বিরোধ এবং ঈষৎ এই উভয়ার্থ যখন লাক্ষণিক তখন ঈষদর্থ স্বীকার করিতে আপত্তি কি ? ন্যায় মতে নঞ্‌এর লাক্ষণিকতাই স্বীকৃত হয় নাই ।

যাঁহারা মহাবিদ্যা-শব্দে কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যারূপ অর্থ করেন তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারা যায় না ; কারণ, এই মন্ত্রে মায়ের দুইটি মহতী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । একটি দৈবী ও অন্যটি আসুরী । এই দুইটি প্রকৃতির স্বরূপ পরিব্যক্ত করিতে গিয়া মহাবিদ্যা ও মহামায়া, মহামেধা ও মহতী অস্মৃতিরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বরূপদ্বয় কথিত হইয়াছে ; সুতরাং মহাবিদ্যা শব্দের অর্থ এস্থলে ব্রহ্মবিদ্যা করাই সঙ্গত ।

———o———

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৫৭॥

অনুবাদ । মা ! তুমি সকলের প্রকৃতি । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এই ত্রিগুণ দ্বারা তোমার প্রকৃতি-স্বরূপটি বিভাবিত হয় । আবার এই ত্রিগুণলয়ের জন্য তুমিই দারুণা (ভয়ঙ্করী) কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে প্রকটিতা হও ।

ব্যাখ্যা । মা ! তুমি কেবল সমষ্টিরূপা মহতী প্রকৃতি নও, ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপেও তুমি । প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র প্রকৃতিরূপে অধিষ্ঠিতা । প্রকৃতি-শব্দের স্থূল অর্থ —স্বভাব । যে জীবের যেরূপ স্বভাব, তাহাই তাহার প্রকৃতি। মা ! সমষ্টিতে তোমার মহাদেবী ও মহা-আসুরী এই দুইটি প্রকৃতি দেখিয়া আসিয়াছি । এখানে ব্যষ্টিতেও আবার তাহাই দেখিতেছি । কাহারও দৈবী প্রকৃতি, কাহারও আসুরী প্রকৃতি । কেহ সাধু, কেহ অসাধু । ঐ যে সাধক মা মা বলিয়া আত্মহারা হইয়া মুক্তিপথে চলিয়াছে, উহার ভিতরে সাধনারূপে যে দৈবী প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা তুমি ; আবার ঐ যে পাপের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়া কেহ নরকের চিত্র উদ্‌ঘাটনপূর্বক জগতে ঘৃণাভাজন হইতেছে, ঐ নিন্দিত আসুরী প্রকৃতিরূপেও তুমি । তুমি যখন যে জীবকে যে মূর্তিতে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, সে সেইরূপ স্বভাবের পরিচয় দেয় । ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্বাসবাণী আর কি আছে ! যাহার যেরূপ প্রকৃতিই থাকুক না কেন, তাহাই তাহার মা ।

মা ! পূর্বে তোমার মহতী মূর্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলাম— বুঝি আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আহ্বান কৈলাসের হৈম সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছিবে না ; তাই তুমি এই নিত্য-সন্নিহিত অভয়া মূর্তি দেখাইলে । তুমি ব্রহ্মাণ্ডের জননী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রসূতি হইয়াও আমার প্রকৃতিরূপে একা আমার মা— তুমি শুধু আমার প্রীতি-সাধন, আমার ভোগাপবর্গ-সাধনের জন্য আমাকে বক্ষে করিয়া রাখিয়াছ ! আমার প্রত্যেক অভাব অভিযোগ, আমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বাসনাটি পর্যন্ত পূর্ণ করিবার জন্য তুমি প্রকৃতিরূপে আমার মা ! এইরূপ প্রতি জীবের—ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু পর্যন্ত প্রত্যেকের যে বিভিন্ন প্রকৃতি, উহা তুমিই ; তাই '**প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য**'। তুমি সমষ্টিতে সকলের মা, আবার ব্যষ্টিতে প্রত্যেকের মা । হউক তোমার ছিন্ন বসন, হউক তোমার রুক্ষ কেশ, হউক তোমার মলিন গাত্র, হউক তোমার রুগ্ন দেহ ; তথাপি তুমি আমার মা ! শুধু আমার ! আর কাহারও নয় !

স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীবের নানারূপ দুরবস্থা, সাধনা-জগতের অসম্ভব বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দুষ্টভাব প্রভৃতি সংঘটিত হয় । ঘরের মাকে অবজ্ঞা করিয়া, কোথায় কাহাকে মা বলিতে যাওয়া জীবের কি মূঢ়তা ! আপনার মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের দ্বারে স্নেহপ্রার্থী হইলে যে, অবিধিপূর্বক তোমারই কৃপা প্রার্থনা করা হয়, ইহা গীতায় রাজ্যগুহ্য-যোগে তুমি বিশেষভাবে বলিয়াছ ! মা ! আমিও একদিন তোকে চিনিতে না পারিয়া, তোর দীনতার মলিন বেশ দেখিয়া, ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম । সেই দিনের তোর সে অভিমানভরা ও অশ্রুভারাক্রান্ত মুখখানি মনে পড়িলে, এখনও বক্ষ বিদীর্ণ হয় ! তুমি যে আমার রাজরাজেশ্বরী মা ! অনন্ত জগতের অধীশ্বরী মা, তাহা কি সে দিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম ! কত অবজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি, আর প্রতি মুহূর্তে তুমি অভিমানভরে বলিতেছ— '**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**' । সত্যই মা ! মানুষ আমরা তোমায় বড়ই অবজ্ঞা করি । তোমার তির্যক্ সন্তানগণ তোমায় জানে না, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির বিকাশ হয় নাই ; সুতরাং তাহাদের অবজ্ঞা সম্ভব নহে । তারপর তোমার প্রিয়তম সন্তান দেবতাবৃন্দ—তাঁহারা তোমাতে নিত্যযুক্ত । নিত্য স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার পূজায় নিরত ; কিন্তু মানুষ আমরা মানুষী-তনু-আশ্রিতা প্রকৃতিরূপিণী তোমাকে

নিয়ত—প্রতিপদক্ষেপে অবজ্ঞা করিতেছি। আমার কোন্ কার্যটি তোমা ব্যতীত হয় মা! নিশ্বাসটি হইতে মোক্ষ পর্যন্ত, কোন্ কার্যটি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভব হয়! ওগো! ভোগরূপে তুমি অপবর্গরূপেও তুমি, সুখরূপে তুমি, অসুখরূপেও তুমি, হাসিরূপে তুমি, কান্নারূপেও তুমি, জন্ম-মৃত্যুরূপে তুমি, আবার বন্ধন-মুক্তিরূপেও তুমি। প্রতিজীবে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন সাজে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা।

শুধু কি তাই মা! আমি বহুত্বপ্রিয়, আমি নিত্য নূতন সাজে সাজিতে চাই, অমনি তুমি আমারই জন্য নিত্য নূতন সাজ পরিধান করিয়া, একই তুমি বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকটিত হও। কখনও সাধু সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি সাধুর সাজে আমায় কোলে করিয়া রাখিয়াছ! কখনও তস্কর সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি তস্করের মলিন সাজ পরিয়া আমায় কোলে করিয়া বসিয়া আছ। এইরূপ কি স্বর্গে, কি নরকে, তুমি ত' আমায়, এক মুহূর্তের জন্য কোলছাড়া কর নাই। শুধু আমার মা হইয়া, আমার প্রত্যেক অভিসন্ধি পূরণ করিবার জন্য বিশ্বস্ত অনুচরের মত, প্রিয়তম সখার মত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছ! যে দিন আমি তোমার মহতী মূর্তির সুধাময় অঙ্ক হইতে বহুত্বের উল্লাসে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন হইতে তুমি আমার একার মা সাজিয়াছ। সেই দিন হইতে তুমি আমার চিরসাথী। এত ভালবাসা! এত আদর! এক দিন তাকাইয়া দেখিলাম না! তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, করিতেছ; অথচ বিন্দুমাত্র প্রতিদানের অপেক্ষা রাখ নাই। কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান—দূরের কথা, প্রতিনিয়ত তোমার অঙ্কে বসিয়া তোমায় অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছি; তথাপি তুমি যেমন স্নেহশীলা, যেমন পুত্রস্নেহে অন্ধা, তেমনই রহিয়াছ। আমার দোষ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই, অবজ্ঞা দেখিবার অবসর তোমার নাই, এমনই মা তুমি! কবে আমি তোমায় মা বলিব! বেশী নয়, একবার মাত্র মা বলিব! শুধু ঐটুকু অপেক্ষা করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে অহর্নিশ আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছ— কবে আমার মুখ দিয়া যথার্থ মাতৃনাম বিনির্গত হইবে। শুধু ঐটুকু তোমার অপরিসীম স্নেহের প্রতিদান। কই, তাহাও ত' পারি না! তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই যে তুমি রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে আবির্ভূত হইবে, ইহা ত' কিছুতেই বুঝিতে পারি না! তাই, তোমাকে ভগ্ন উপেক্ষিতা গৃহে পরিচারিকা সাজাইয়া রাখিয়াছি। ওগো তোমার প্রিয়তম পুত্রগণকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই মা। যাহারা মাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না, তাহাদিগকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই মা। যাহারা সাধনা করিয়া হতাশ হয়, তাহাদিগকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই সাধনার অবলম্বন। যাহারা গুরুর সন্ধান করিয়া পায় না, তাহাদিগকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই গুরু।

মা! তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে তোমার ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতি বিভাবিত —পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। নির্গুণা মা! তুমি যখন সর্বপ্রথমে একত্ববোধে সম্বুদ্ধ হইয়াছিলে, তখন এক দ্বারা গুণিত হইলে—ইহাই সত্ত্বগুণ। তার পর যখন বহু হইবার জন্য ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিলে, তখন দ্বিগুণিত হইলে—ইহাই রজোগুণ। আর যখন বহু হইতে গিয়া, তোমার চৈতন্যময় স্বরূপটি জড়াকারে পরিণত হইল, তখন তৃতীয় বার গুণিত হইলে—ইহাই তমোগুণ। সত্ত্বগুণে তোমার সৎ, রজোগুণে চিৎ এবং তমোগুণে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দময়ী মা! তুমি আপনাকে বিশিষ্টভাবে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, তিন গুণে গুণিত হইয়া, সমষ্টিতে মহতী, দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিরূপে এবং ব্যষ্টিতে জীব-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হও। তুমি অনির্দেশ্যা অব্যক্তরূপা হইয়াও পুত্র-স্নেহের প্রেরণায়, গুণত্রয় বিভাবিনী—প্রকৃতি। দর্শনকারগণ বলেন—গুণত্রয়ের সাম্যবস্থাই প্রকৃতি। উহা অব্যক্ত; সুতরাং অসাধ্য। আমরা চাই—তোমাকে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিতে। আমরা স্থূল হইয়া পড়িয়াছি; তাই তোমার স্থূলভাবের সেবা করিয়াই আত্মতৃপ্তির সন্ধান করি; সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা ব্যষ্টিমূর্তিই আমাদের আরাধ্য। যাঁহারা সমষ্টির সন্ধান পাইয়াছেন—হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন, তাঁহারা উচ্চ অধিকারী—তাঁহারা তোমার সমষ্টি-প্রকৃতি মহাদেবী-মূর্তির পূজা করুন। আমরা ক্ষুদ্র অবোধ শিশু, খেলার পুতুল ভালবাসি; তাই, তোমার সর্বভাবময়ী সর্বেন্দ্রিয়যুক্ত ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপা মূর্তিই আমাদের প্রিয়। তাই, আমাদের নিকট তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী। আমরা জানি—তোমার এই মূর্তির পূজা করিতে পারিলেই, মহতী মূর্তির সন্ধান পাইব;

কারণ, এই তিন গুণকে সম্যক্ লয় করিবার জন্য, তুমিই কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রিরূপে প্রকটিত হইয়া থাক।

কালও যে স্থানে প্রকাশিত হয় না তাহাই কালরাত্রি। সত্ত্বগুণের লয়স্থানকে কালরাত্রি কহে। এইরূপ রজোগুণের লয়স্থানকে মহারাত্রি এবং তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রি কহে। মোহ তমোগুণের বহিঃপ্রকাশ ; উহার রাত্রি—অপ্রকাশ অর্থাৎ লয়স্থান।

গুণত্রয়বিভাবিনী মা ! ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপে তুমি শুধু আমার মা—আর কাহারও নয়, কেবল আমার মা ! এইরূপ কেবল আমার মা তোমাকে পূজা করিতে গিয়া, ক্রমে তোমার যে তিনটি স্বরূপ দেখিতে পাইব, এই স্থানে তুমি তাহারই পূর্বাভাস দিলে। তুমি কালরাত্রি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমার কালজ্ঞান দূর করিয়া দিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ ত্রিবিধ কালপ্রতীতি, গভীর অন্ধকারময় ক্ষেত্রে—অপ্রকাশযোগ্য স্থানে বিলীন হইবে। সকলই বর্তমানবৎ প্রতীত হইবে। তখন আমি কালের অতীত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইব, তোমার রক্তচরণ বক্ষে ধরিয়া শিব হইব, জীবত্ব চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। ইহাই সত্ত্বগুণের প্রলয়। আবার মহারাত্রিরূপে আবির্ভূত হইয়া, তুমি আমার মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত বিলীন করিবে। তখন আমার ক্রিয়াশীলতা বা রজোগুণজনিত চঞ্চলতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, আমার নৈষ্কর্ম্য লাভ হইবে ; তখন আমি শুধু চৈতন্যময় আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ থাকিব। আর মোহরাত্রিরূপে প্রকটিতা হইয়া, আমার জগৎমোহ সংসার ধাঁধা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিবে। তখন আমি অজেয় মোহকে জয় করিয়া নিত্য চিন্ময়ী মূর্তিতে চিরতরে মুহ্যমান থাকিব।

মা ! তোর এই মূর্তিত্রয় দারুণা—অতীব ভয়ঙ্করী। যেখানে কালশক্তি রুদ্ধ, জগৎপ্রকাশ সুপ্ত, মোহশক্তি বিমুগ্ধ, তোর সেই কৃষ্ণা রাত্রিমূর্তি স্মরণ করিলেও জীবের ভীতি উপস্থিত হয়। অমাবস্যার ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারেও বরং একটা প্রকাশ আছে ; কিন্তু মা ! তোর সেই কৃষ্ণামূর্তিতে তাহাও নাই। সর্ববিধ বিকাশ সেখানে বিলুপ্ত। **'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি'**। সে কি দারুণ মূর্তি ! অথচ স্বপ্রকাশ অনন্ত-শান্তিময়ী। আমিত্বের গাত্রসংলগ্ন সর্ববিধ জঞ্জাল দূরীভত করিয়া, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারের রাজত্ব ছাড়িয়া শুধু আত্মবোধটি লইয়া সেই স্থানে অবস্থান করা যায়। রাত্রিরূপিণী মা ! তোমার সেই মধুময় অঙ্ক যে কত লোভনীয়, তাহা ভাষায় কিরূপে ব্যক্ত করিব। সেই দেবীপুরাণের একটি শ্লোক দেখিয়াছিলাম—**'ব্রহ্মমায়াত্মিকারাত্রিঃ পরমেশ লয়াত্মিকা'** যেখানে জীব ত' দূরের কথা পরমেশ্বরের পর্যন্ত বিলীন হয়, সেই একমাত্র ব্রহ্মমায়াই তোমার স্বরূপ। এই ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিরূপিণী তুমি, ত্রিগুণলয়ের জন্য জীবভাবের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদা কালরাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাক !

———○———

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥৫৮॥

অনুবাদ। মা ! তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি অকর্ম জুগুপ্সারূপিণী হ্রী, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই শুদ্ধবোধস্বরূপা। লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি এবং ক্ষমাও তুমি।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি যে ব্যষ্টি-প্রকৃতিরূপে সর্বজীবে বিরাজিতা রহিয়াছ, তাহাই এই ব্রহ্মস্তোত্রে বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'ত্বং শ্রীঃ'—মা তুমিই জীবের সৌভাগ্যরূপিণী। যখন দেখিতে পাই—কোন জীব সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য-যশঃ অভ্যুদয় প্রভৃতি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারি—শ্রীরূপিণী তুমি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যখন দেখিতে পাই, কেহ ঈশ্বরত্ব—প্রভুত্ব অর্থাৎ সহস্র সহস্র লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তখনই বুঝি—তুমি ঈশ্বরী-মূর্তিতে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। যখন দেখিতে পাই—কেহ অসৎ কর্ম করিয়া নিন্দার ভয়ে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝি, সে হ্রীরূপিণী তোমারই অঙ্কে অবস্থিত। আমাদের যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি, যাহা এই জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, যাহা না থাকিলে জগৎসত্তা থাকে না, সেই বুদ্ধিরূপে তুমিই বিরাজিতা। আবার যখন জগৎবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, শুদ্ধবোধমাত্ররূপে আত্মসত্তা সম্বুদ্ধ থাকে, শুধু বোধ ব্যতীত যাহার অন্য কোন লক্ষণ নাই, তুমিই সেই

বোধলক্ষণা মা। কোন নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, সেই লজ্জারূপেও প্রতিজীবে তুমিই অধিষ্ঠিতা ! এইরূপ যখন দেখিতে পাই— কেহ দৈহিক পুষ্টিলাভ করিয়া জনসমাজে অতুলনীয় বলবান বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখনই বুঝি—পুষ্টিরূপিণী মা তুমিই তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ । যখন দেখি, কেহ মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিনযাপন করিতেছে, তখনই বুঝি—তুষ্টিরূপিণী মা তুমি তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছ । যখন দেখিতে পাই— কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগতের সুখ-দুঃখের অতীত শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তখনই বুঝি —শান্তিরূপিণী মা তুমি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । যখন দেখিতে পাই— কেহ প্রতিকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও পরের অপকার অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে, তখনই বুঝি— সে ক্ষমারূপিণী মা তোমারই অঙ্কে অবস্থিত ।

মা ! এই সকল মূর্তিতে সর্বজীবের প্রকৃতিরূপে তুমি নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছ ; কিন্তু মূঢ় জীবগণ ঐ সকলকে মানসিক বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করে । হায় ! তাহারা জানে না যে, তাহাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তুমিই এইরূপ বহু মূর্তিতে আসিয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছ । মা ! তোমার এ সকল নিত্য প্রত্যক্ষ মূর্তি—তোমার সর্বত্র সর্বদা প্রকট স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ সপ্তস্বর্গের পরপারে, কোন্ সর্বতত্ত্বের অতীত ক্ষেত্রে জীব তোমাকে অন্বেষণ করিতে যায় ! যাহাকে তুমি চক্ষু দিয়াছ, সে যে সর্বভাবে তোমার আলিঙ্গনে সংবদ্ধ থাকিয়া নিয়ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে । কিন্তু সে অন্য কথা ।

———○———

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশণ্ডী পরিঘায়ুধা ॥৫৭॥

অনুবাদ । মা । তুমি খড়্গ ও শূলধারিণী, তুমি ঘোরা —তোমার এক হস্তে নৃমুণ্ড ; তুমিই গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনু, বাণ, ভুশণ্ডী (কণ্টকাকীর্ণ লৌহ-লগুড় বিশেষ) এবং পরিঘরূপ (লৌহমুদ্গার) আয়ুধসমূহ ধারণ কর ।

ব্যাখ্যা । মা ! পূর্ববর্তীমন্ত্রে জীব জগতে তোমার শ্রী, ঈশ্বরী প্রভৃতি দশবিধ আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে । উহারা মাতৃভাবে—ব্রহ্মভাবে উপাসীত না হইলে অর্থাৎ যাহারা 'মনোব্রহ্ম' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সাধনায় বিমুখ, তাহাদিগের পক্ষে তোমার ঐ সকল মূর্তি উৎপীড়নকারিণী দশপ্রহরণধারিণীরূপে আবির্ভূত হয় । উহা বাস্তবিক উৎপীড়নে নহে, শাসনের আকারে মাতৃ-স্নেহের বহির্বিকাশ । অনভিজ্ঞ শিশু-সন্তানকে অনেক সময় শাসনরূপ স্নেহবিকাশে জ্ঞানের উজ্জ্বলক্ষেত্রে আনয়ন করিতে হয় ! তাই, তুমি খড়্গ, শূল, গদা প্রভৃতি আয়ুধবিমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হও ।

যে জীব শ্রীরূপিণী প্রকৃতির অঙ্কে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ববিধ সৌভাগ্যলাভে ধন্য, সে যদি অনভিজ্ঞ শিশুর মত ঐ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া যায়, —তুমিই যে তাহার অভ্যুদয়রূপে প্রকটিতা, তাহা যদি না দেখি, অভ্যুদয়রূপিণী মা ! তোমার চরণে যদি কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি না দেয়, তবে সেই জীবের পক্ষে শ্রীরূপিণী মা তুমি খড়্গিনী মূর্তিতে প্রকটিতা হও । অর্থাৎ শীঘ্রই উক্ত সৌভাগ্য-সুখকে খড়্গাচ্ছিন্নের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও । তুমিই যে শ্রীরূপে আসিয়াছিলে, ইহা বুঝাইবার জন্য—যে অহঙ্কার তোমাকে না দেখিয়া স্বয়ং সৌভাগ্যবান হইয়া বসিয়াছিল, তাহার মস্তক ছিন্ন করিবার জন্যই তোমার শ্রীমূর্তি খড়্গাধারিণীরূপে প্রকটিতা হয় । এইরূপ যাহারা প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরীমূর্তি তোমায় অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের নিকট তুমি শূলধারিণীরূপে প্রকটিত হও । প্রভুত্ব হইতে বিচ্যুতিরূপ শূলাঘাতে তাহাদিগকে বিদ্ধ কর ; তাই তোমার ঈশ্বরীমূর্তি শূলধারিণী । যাহারা অসৎকর্ম করিয়া নিন্দাভয়ে গোপন করে, সে হ্রীমূর্তি-রূপিণী তোমারই অঙ্কস্থিত জীব যদি তোমার উদ্দেশ না রাখে, যদি তোমার স্মরণ না করে, তবে অচিরাৎ তুমি এক হস্তে নৃমুণ্ডধারিণী ঘোরারূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহার সেই অসৎকর্ম জনসমাজে প্রকাশিত করিয়া, তোমার শরণাগত হইতে শিক্ষা দাও । এইরূপ যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিকে তোমারই স্বরূপ না দেখিয়া বুদ্ধিমাত্র মনে করে, তাহারা পুনঃপুনঃ দৈব-প্রতিকুলতারূপ গদার আঘাতে আহত হইয়া স্বকীয় বুদ্ধিকে ভ্রমসঙ্কুলা মনে করিয়া ব্যথিত হয় । তাই, বুদ্ধিরূপিণী মা ! সে স্থানে তোমার গদাধারিণী-মূর্তিতে প্রকাশ । যাহারা তোমার

কৃপায় শুদ্ধবোধের সন্ধান পাইয়াও উহাকে তত্ত্বমাত্র-জ্ঞানে উপেক্ষা করে, উনিই যে একজন, ইহা না বুঝিয়া একটি আকাশীয়-ভাবমাত্র মনে করে, তাহাদের সংসারচক্রে পরিভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না। তাই মা তোমার বোধলক্ষণা মূর্তি অজ্ঞান জীবের নিকট চক্রধারিণীরূপে প্রকটিতা হয়। যাহারা অসৎকর্মে সঙ্কোচরূপ লজ্জাকে তোমারই বিশিষ্ট আবির্ভাব বলিয়া দেখে না, তাহাদের সেই নিন্দিত কর্ম অচিরাৎ শঙ্খনিনাদে সর্বজন-বিদিত হইয়া পড়ে। তাই মা! তুমি লজ্জারূপে শঙ্খিনী। যাহারা শারীরিক পুষ্টিকে মাত্র আহার ঔষধ অথবা ব্যায়ামের ফল মনে করিয়া, পুষ্টিরূপিণী তোমার অনাদর করে, তাহাদের সে পুষ্টি দুরারোগ্য রোগে পরিণত হইয়া, তোমার চাপিনী বা ধনুর্দ্ধারিণী মূর্তির আবির্ভাব ঘোষণা করে। যাহারা মানসিক তুষ্টিকে তোমারই মূর্তি না দেখিয়া, মাত্র বিষয় ভোগের সন্ধান করে, আকস্মিক বিপৎপাতরূপ বাণবিদ্ধ হইয়া তাহাদের মর্মদেশ চিরদিনের জন্য ব্যথিত হয়; তাই তোমার তুষ্টিমূর্তি বাণধারিণী। যাহারা শান্তি লাভ করিয়া শান্তিরূপিণী তোমার মূর্তি দেখিতে না পায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তাহাদিগকে সাংসারিক দুর্ঘটনারূপ লৌহ-লগুড়াঘাতজনিত যাতনা সহ্য করিতে হয়। তাই, তুমি শান্তিরূপ ভূশণ্ডীধারিণী। যাহারা অপরকে ক্ষমা করিয়া, তোমার ক্ষমাময়ী মূর্তি না দেখে, তাহারা অন্য কর্তৃক অযথা উৎপীড়িত হইয়া তোমার পরিঘধারিণীরূপের বিকাশ দেখিতে পায়।

এইরূপ যাহারা সর্বভাবে তোমায় না দেখে, তাহারা যতদিন তোমায় না দেখিবে, ততদিন তুমি ঐ সকল ভাবের ভিতর দিয়া একটা না একটা উৎপীড়ন আনিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাক। সন্তানের অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই তোমার এই শাসনকর্ত্রী মূর্তি। যাহারা একবার শাসনে বুঝিতে না পারে, তাহাদের নিকট বাধ্য হইয়া তোমাকে পুনঃপুনঃ ঐরূপ বিভিন্ন আয়ুধধারিণী মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে হয়। ইহা তোমার সন্তান-বাৎসল্যের অপূর্ব নিদর্শন। সন্তানকে অপূর্ণ দেখিয়া, পূর্ণা তোমার পরিতৃপ্তি হয় না; তাই সন্তানের ইচ্ছার অভ্যন্তর দিয়া—সন্তানের অভিলাষ পূরণের অন্তস্তল দিয়া, তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা অলক্ষিতে পরিচালিত হয়। সেই ইচ্ছা ততদিনই শাসনের আকারে আসিয়া থাকে—যতদিন জীব সর্বভাবে তোমাকে দেখিতে না পায়। আর যাহারা তাহা পারে, তাহাদিগের নিকট তুমি এই সকল মূর্তিতে প্রকটিতা না হইয়া সৌম্যা-মূর্তিতে আবির্ভূত হও। পরবর্তী মন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥৬০॥

অনুবাদ। মা! তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা এবং সৌম্যতমা। তুমি অতিশয় সৌন্দর্যবিশিষ্টা। তুমি পর এবং অপর উভয়েরই আশ্রয়—পূজনীয়া; সুতরাং তুমিই পরমেশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মা! যাহারা সর্বভাবে তোমাকে দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে অজ্ঞান শিশুগণের জ্ঞাননেত্র-উন্মীলনের জন্য তুমি নানা প্রহরণ-ধারিণী মূর্তিতে আবির্ভূতা হও। আর যাহারা স্ব স্ব প্রকৃতিকে মা বলিয়া জানিয়াছে, সর্বভাবে সর্বত্র মায়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করে, যাহারা **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'**। এই গীতোক্ত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট তুমি সৌম্যমূর্তিতে আবির্ভূত হও।

যাহারা কেবল জ্ঞানে বুঝিয়াছে—সর্বভাবে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধিযোগে প্রথম অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা তুমি সৌম্যা। যাহারা তোমাকে প্রাণ দিয়া সর্বভাবে আত্ম-প্রাণের বিশিষ্ট উদ্বেলনমাত্র দেখিতে পায়, তাহাদের নিকট তুমি সৌম্যতরা। আর যাহারা সর্বতোভাবে তোমাতে মন অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—অর্থাৎ সবটা মন তোমাতে মিলাইয়া দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট তুমি **'অশেষসৌম্যেভ্যঃ অতিসুন্দরী'** অর্থাৎ সৌম্যতমা মূর্তিতে প্রকটিতা। এইরূপে তুমি তিন স্থানে ত্রিবিধরূপে প্রকটিতা হও। বুদ্ধিযোগীর নিকট তুমি সৌম্যা, প্রাণদর্শীদিগের নিকট সৌম্যতরা এবং মন বিলয়কারীদিগের নিকট সৌম্যতমা। মা! যে সকল সৌভাগ্যবান সন্তান সম্পূর্ণ মনটি তোমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা সর্বভাবে মাতৃ-ময় হইয়া যায়,

তাহাদের স্থূল ইন্দ্রিয় পর্যন্ত মাতৃ-ধর্ম মাতৃ-মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তাহারা অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র মায়ের সৌম্যতমা মূর্তির প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মা! তোমার সৌন্দর্য যাহার চক্ষে পড়িয়াছে, সে কি আর কখনও জগতের বিশিষ্ট সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। চন্দ্রে পদ্মে কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে যে সৌন্দর্য— যে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ দেখিয়া জীব মুগ্ধ হয়, উহা তোমার সৌন্দর্যরাশির কোটিতম অংশও নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য আছে, উহা সৌন্দর্যসিন্ধু তোমারই ক্ষুদ্রতম বিন্দুমাত্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত সৌন্দর্যকণা রহিয়াছে, সকল একত্র করিয়া যে সৌন্দর্যরাশি কল্পনায় গঠিত হয়, তাহাই তোমার সৌম্যতমা মূর্তির আভাস।

মা! তুমি **'পরাপরাণাং পরমা'**। পর—ব্রহ্মাদি, অপর—দেব মনুষ্যাদি। এই উভয়েরই তুমি আশ্রয় —পূজ্যা; সুতরাং তুমিই পরমা—সর্বশ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী! যাহারা তোমার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সৌম্য মূর্তির বিকাশ দর্শনে ধন্য হইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধি, প্রাণ ও মন সম্যক্‌ভাবে মাতৃযুক্ত হইয়াছে তাহারাই দেখিতে পায়—ব্রহ্মা হইতে কীটাণু পর্যন্ত অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড তোমারই সত্তায় সত্তাবান। এই ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে পর অপর উচ্চ নীচ যেখানে যাহা আছে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সকলেই তোমার পূজায় নিরত। তাহাদের নিকটই তুমি এইরূপ পরমেশ্বরীমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হও।

এইখানে একটু খুলিয়া বলিতেছি—স্ব স্ব প্রকৃতিকে মা বলিয়া বুঝিতে পারিলে, সর্বভাবে মাতৃ-যোগে অভ্যস্ত হইলে, তখন আর ক্ষুদ্র জৈবী প্রকৃতি থাকে না। তখন ঐ প্রকৃতিই জগদ্‌বিধাত্রী দৈবী মহতী প্রকৃতিরূপে উপলব্ধ হয়। তখন আর তাহাকে দীনা মলিনা মা বলিয়া মনে হয় না। সেই অবস্থায় সাধক দেখিতে পায়—এত দিন যাঁহাকে শুধু আমার বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি —তিনিই পরাপরপূজ্যা পরমা পরমেশ্বরী। 'আমারই মা সর্ব জগতের মা', সাধকের যখন এই উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহাকে 'সৌম্যতমা অতি সুন্দরী' না দেখিয়া আর কি মলিনা কাঙ্গালিনী মূর্তিতে দেখিতে পারে?

যখন দেখিতে পাই—ঐ সূর্য অনন্ত অনন্ত গ্রহ-উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হইয়া আমারই মায়ের অঙ্গে প্রতিনিয়ত কিরণ বিকীরণ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—ঐ সমীরণ কুসুম-সৌরভসম্ভার বহন করিয়া আমারই মায়ের তৃপ্তি-সাধন করিতেছে; যখন দেখিতে পাই— জলদবৃন্দ পূতবারিবর্ষণে আমারই মায়ের অঙ্গ স্নিগ্ধ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—উন্নত শৈলরাজি মস্তক উন্নত করিয়া আমারই মাকে দেখিবার জন্য ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যখন দেখিতে পাই—পুষ্পিত তরুবৃন্দ আমার মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—বিহঙ্গমনিচয় কলকণ্ঠে আমারই মায়ের বন্দনাগীত গান করিতেছে; এইরূপ যখন সর্বভাবে সর্বত্র আমারই মায়ের পূজা-সেবা দেখিতে পাই; তখন আমি যে কি হইয়া যাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন আর আমি থাকে না, থাকে শুধু মা—মায়ের এই বাসুদেব-মূর্তি। এইরূপ অবস্থায় সাধক এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মূর্তির সম্বেদনে একান্ত আত্মহারা হইয়া পড়ে; ইহাই মায়ের আমার অতি সুন্দরী সৌম্যতমা পরমেশ্বরী মূর্তি।

———○———

যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥৬১॥

অনুবাদ। হে অখিলাত্মিকে জননি! (যখন দেখিতে পাইতেছি) সৎ অসৎ যেখানে যাহা কিছু বস্তু আছে, সবই তুমি এবং যে শক্তি এই সর্বভাবে বিরাজিত, তাহাও তুমি, তখন আর তোমাকে কি স্তব করিব।

ব্যাখ্যা। মা! যাহারা আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয়া সাধনাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহারা কিরূপে স্তরে স্তরে ভেদজ্ঞানশূন্য অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হয়, তখনই এই ব্রহ্মার স্তোত্রে একে একে দেখাইয়া দিলে। মা! তুমি পরমাত্মরূপে দুরধিগম্যা; কিন্তু প্রকৃতিরূপে মনুষ্য-মাত্রেরই উপলব্ধিযোগ্যা। প্রকৃতিরূপিণী তোমার সেবা করিলেই, তোমার পরমেশ্বরী মূর্তি প্রকটিত হয়, তখন সৎ বা অসৎ বলিয়া কোন ভেদ থাকে না। সর্বময় জগন্ময় আত্মার বিকাশ-দর্শনে এবং সর্বরূপে যে বহুত্বপ্রতীতি হয়, উহা যে আত্মারই শক্তিমাত্র, এইরূপ দর্শনে জীবের সর্ববিধ সংশয় তিরোহিত হয়।

যখন সকলই আমার প্রকৃতি— আমার মা— আমার আত্মা বা আমি; যখন স্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি, সকলই আমি— মা, তখন আর কে কাহার স্তব করিবে! **'যদা**

সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ' এইরূপ উপলব্ধিতে উপস্থিত হইলে, সেই মুহূর্তে সর্ববিধ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। পূজ্যপূজকভেদ থাকে না, এক হইয়া যায়। আমিত্বের মহাপ্রসারে জীবভাবীয় আমিত্ব ডুবিয়া যায়। যাহা 'সর্বস্য প্রকৃতি' ছিল, তাহা মহাদেবী হইয়া যায়। চিত্ত-বিক্ষেপ, বাক্য, নিশ্বাস হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়; শুধু একটি ঘন আনন্দময় সত্তা বিদ্যমান থাকে। যাহাতে উপস্থিত হইলে মনে হয়—'আছে' বলিয়া কথাটি এইখানেই বলা যায়। জগতের অস্তিত্ব ইহার নিকট নাই বলিলেই চলে। যাক সে অন্য কথা!

———o———

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥৬২॥

অনুবাদ। যিনি জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, সেই বিষ্ণু পর্যন্ত যখন তোমার প্রভাবে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আর কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?

ব্যাখ্যা। হে মা! যে প্রাণ হইতে জগৎ জাত, যে প্রাণে এই সমস্ত জগৎ বিধৃত এবং যে প্রাণে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী সেই প্রাণ বা বিষ্ণুশক্তিই যখন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, স্বয়ং বিষ্ণু যখন জগদ্বীজ—অর্থাৎ জন্ম-মরণের মূলীভূত সংস্কার পর্যন্ত দূরীভূত করিতে বিমুখ, তখন আর কে তোমার স্তব করিবে? আমি (ব্রহ্মা) প্রাণের অঙ্কে অবস্থিত মন মাত্র, বিষ্ণু বা প্রাণের সহায়তা ব্যতীত তোমার স্তব করিবার সামর্থ্য আমার কোথায়?

———o———

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥৬৩॥

অনুবাদ। বিষ্ণু, আমি এবং ঈশান আমরা তিনজনেই যখন তোমা হইতে শরীর গ্রহণ করিয়াছি; (আমাদের শক্তি যখন তোমারই শক্তি) সুতরাং তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে?

ব্যাখ্যা। মা! তুমিই জ্ঞান, প্রাণ ও মনোরূপে প্রকটিত হইয়া শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হও। যখন তুমি জীবভাবাপন্ন সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখনই তোমার নাম মন। এইরূপ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অনুভূত ব্যষ্টি চৈতন্যই প্রাণ, এবং প্রতি জীবে নিয়ত প্রকাশমান বুদ্ধি জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রত্যেক জীবে অনুভূয়মান এ ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞান একটি সমষ্টি বিরাট্ মন প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র। প্রতিজীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। সকলই যখন মহামায়া মা তোমারই বিশিষ্ট বিকাশমাত্র, আমরা যখন তুমি ছাড়া অন্য কিছুই নয়, তখন আর আমাদের তোমাকে স্তব করিবার সামর্থ্য কোথায়?

এখানে একটু সাধনার রহস্য বলিয়া রাখিতেছি—ঐ বিরাট্ মন, প্রাণ ও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, উঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, স্বকীয় জীবভাবীয় মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়। উহাদিগকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া পূজা করিতে হয়। যেরূপ পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলপ্রবাহ স্পর্শ করিতে হইলে, নিজ-প্রাঙ্গণে কূপ খনন করিলেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, সেইরূপ বিরাটের বা সমষ্টির সন্ধান করিতে হইলে, নিজের অন্তরে অহরহঃ অনুভূয়মান ব্যষ্টির সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মহামায়ার যে শক্তিবিন্দুটুকু তোমার ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে, যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে, উহাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জননী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। উহারই চরণে তোমার সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন কর। উনিই মহতী শক্তিরূপে প্রকটিত হইবেন; তোমার সকল অবসাদ দূর করিবেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে—ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখান হইতে সর্বময় মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া, সর্বভাবে মাতৃ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, সর্বত্র মাতৃ-শক্তি অনুভব করিয়া, তিনি ক্রমে স্তোত্র হইতে বিরত হইতেছেন। সাধনা ক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। প্রারম্ভে দ্বৈত-বোধ লইয়া—জীব ও ঈশ্বর এই দ্বিবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ক্রমে দ্বৈত প্রতীতির বিলোপ হইয়া আত্মানুভূতিমাত্র বিদ্যমান থাকে। কি সমস্ত জীবনের সাধনায়, কি দৈনন্দিন সন্ধ্যা-বন্দনাদি অনুষ্ঠানে এইরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। সাধকগণ যতদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন

উপাসনায় এইরূপ অবস্থার আভাসও পায় না, ততদিন বুঝিতে হইবে— সাধনা ঠিক হইতেছে না। প্রতিদিনের সাধনায়ই অন্ততঃ একবার করিয়া সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে প্রথম তিন প্রকার মুক্তির আস্বাদ লইতে হয়। সে তত্ত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা আছে।

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥৬৪॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥৬৫॥

অনুবাদ। হে দেবি ! স্বকীয় অতি উদার প্রভাবের দ্বারা স্বয়ং সংস্তুত হইয়া (নিত্যতৃপ্তা তুমি বিশেষভাবে প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছ ; সুতরাং প্রার্থনা করি) এই দুর্দমনীয় অসুরদ্বয়কে মুগ্ধ ও জগৎকর্তা অচ্যুত বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ কর এবং যাহাতে তিনি এই অসুরদ্বয়কে নিহত করেন, সেইরূপ বোধের অনুপ্রেরণা কর।

ব্যাখ্যা। মা ! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি —তোমার স্তব, তোমার সাধনা তুমিই কর ! তোমার অতি উদার প্রভাব, অলৌকিক মহত্ত্বের গাথা, মহতী শক্তির অনির্বচনীয় কাহিনী, স্নেহের অনন্ত নির্ঝররহস্য যদি তুমি নিজে বর্ণনা না কর, নিজে নিজেকে প্রকাশিত না কর — নিজে ইচ্ছা করিয়া ধরা না দাও, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে। **'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো না মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'** যত শাস্ত্র-জ্ঞান, যত বেদ-অধ্যয়ন, যত কঠোর তপস্যা হউক না কেন, তুমি ইচ্ছা করিয়া ধরা না দিলে, কাহারও অধিকার নাই যে, তোমাকে জানিতে পারে। আজ আমরা তোমার স্তব করিতে গিয়া, তোমার বিশিষ্ট প্রভাব দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে স্তুতি, এই যে ব্যাখ্যা যাহা এই মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, এইরূপেও তুমিই আবির্ভূত হইয়াছ ! তুমিই তোমার স্তব করিলে ; এবং তাহারই ফলে নিত্যতৃপ্তা তুমি বিশেষ প্রসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ। সুতরাং প্রার্থনা করি— মা ! যদি বিশেষ দয়া-প্রকাশে সন্তানের হৃদয় আলোকিত করিয়া স্বপ্রকাশ-রূপিণী পরমেশ্বরী মূর্তিতে আবির্ভাব হইয়া থাক, তবে এই অসুর দুইটিকে (মধু-কৈটভকে) মুগ্ধ কর। এই যে বহু হইবার সাধ, এই যে বহুত্ব ক্রীড়া, ইহারা আমাদিগকে বড় উৎপীড়িত করিতেছে, ইহারা একটু স্থির হইয়া তোমার সৌম্যমূর্তির জগদতীত সৌন্দর্য ভোগ করিতে দেয় না। যাহাতে এই সুরবিরোধী ভাবদ্বয় স্বকীয় ভাব পরিত্যাগ পূর্বক তোমার একরস আনন্দঘন মূর্তিতে মুগ্ধ হয় তাহা কর।

শুধু ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। যে প্রাণশক্তির অঙ্কে ইহারা প্রকাশিত, যিনি এক মুহূর্তের জন্য কাহারও হৃদয়-বৃন্দাবন হইতে বিচ্যুত হন না, সেই অচ্যুত বিষ্ণু যাহাতে প্রবোধিত হন তাহাও তোমাকে করিতে হইবে ; কারণ, বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আছন্ন বলিয়াই ত' এই অসুরের অত্যাচার। প্রাণ ক্ষণিক আত্মমিলনের মোহে জগদ্ব্যাপার উচ্ছেদ করিতে বিমুখ রহিয়াছেন, এই অসুরদ্বয়কে নিধন করিলেই যে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হয়, ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না ; তাই তিনি আজ অসুর নিধনে পরাঙ্মুখ।

আমরা মুখে বলি—আর সংসার চাই না আর বিষয় চাই, না আর দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে চাই না ; চাই— নিত্য সনাতন মাতৃ-চরণ ; কিন্তু প্রাণের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারি, উহা কথার কথা মাত্র। প্রাণ যথার্থ পূর্ণভাবে মাকে চায় না, যতটুকু চাহিয়াছে, ততটুকু পাইয়াছে। প্রাণ এখনও পূর্ণভাবে জগৎখেলা বিদূরিত করতে চায় না ; তাই যোগ থাকিতেও নিদ্রা। এই নিদ্রা দূর করিতেই হইবে।

যোগিগণ যে সমাধি হইতে বারংবার ব্যুত্থিত হন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ যোগনিদ্রা—ঐ মধুকৈটভ। তাঁহাদের ইচ্ছা মা ও জগৎ উভয়ই থাকুক। তাঁহারা দুইদিক বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতে চান ; কিন্তু মা ! তুমি যে সর্বগ্রাসিনী, সকল একা গ্রাস না করিয়া তোমার তৃপ্তি নাই ; সুতরাং এই অসুর-উৎপীড়ন প্রাণে ফুটাইয়া প্রাণের দ্বারাই অসুর নিধন করাও—সম্যক্‌ভাবে আপনাতে মিলাইয়া লও। ইহাই তোমার মধুকৈটভবধের রহস্য।

এখানে দেখিতে পাই—ব্রহ্মা—মায়ের নিকট তিনটি বর প্রার্থনা করিলেন। একটি মধুকৈটভের মোহ, একটি বিষ্ণুর জাগরণ এবং অন্যটি বিষ্ণুর অসুরবধানুসারিণী

বুদ্ধির অনুপ্রেরণা । কার্যতঃ এই তিনটি না হইলে, এই দুর্জয় অসুর বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ; কারণ, অসুররূপেও মা ; মায়ের এই আসুরী প্রকৃতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মনিধন যাচিয়া না লয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাদিগকে নিধন করে ! দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণু বা প্রাণশক্তি সম্যক্‌ভাবে প্রবুদ্ধ না হইলে, মাতৃ-লাভ হয় না ! তৃতীয়তঃ মাতৃ-মিলনের অভিলাষ পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেই, প্রাণ জগদ্ভাবকে বিমথিত করিতে উদ্যত হয় । ইহাই বিষ্ণুর অসুর-নিধনে বুদ্ধির অনুপ্রেরণা ।

———○———

ঋষিরুবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥৬৬॥
নেত্রাস্য-নাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ॥৬৭॥

অনুবাদ । ঋষি বলিলেন—ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া তামসী দেবী বিষ্ণু জাগরণ এবং মধুকৈটভের নিধনের জন্য, নেত্র মুখ নাসিকা হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া, অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার দর্শনবিষয়িণী হইলেন ।

ব্যাখ্যা । ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়া তামসীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেন । তমোগুণেই সর্বভাবের বিলয় হয় । পূর্বে বলা হইয়াছে, মহামায়া দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকটিত হয়েন— মহতী প্রকৃতি ও জীব ভাবীয় প্রকৃতি । প্রকৃতি—গুণত্রয় বিভাবিনী । জীব-ভাবীয় প্রকৃতি যেরূপ সত্ত্বরজস্তমোময়ী, মহতী প্রকৃতিও সেইরূপ ত্রিগুণাত্মিকা। ভগবদ্‌গীতায় এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই যথাক্রমে পরা ও অপরা নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পরা প্রকৃতির যে স্থলে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি, অপরা প্রকৃতির সেইটিই সর্বপ্রথম বিকাশ বা পরিণাম । পরা প্রকৃতি তমোগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণরূপে এবং অপরা প্রকৃতি যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণরূপে অভিব্যক্ত হয় অপরা প্রকৃতির সর্বশেষে এবং পরা প্রকৃতির সর্বপ্রথমে তমোগুণ । সত্ত্বগুণ উভয় প্রকৃতির সন্ধিস্থল । নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, আলাপ, জড়তা প্রভৃতি অপরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম, আর সর্বভাবের বা বহুত্বের বিলয় পরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম । এক কথায় মহামায়ার জগৎমুখী বিকাশের নাম অপরা প্রকৃতি এবং পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম পরা প্রকৃতি । জীব-প্রকৃতি যখন তমঃ ও রজোগুণের প্রাধান্যকে অভিভূত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়, তখনই পরা প্রকৃতির রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা ঐ সত্ত্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হয় ; সুতরাং এস্থলে মহামায়ার তামসী মূর্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় । মধু ও কৈটভ সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত —সত্ত্বগুণেরই অভিব্যক্তি তমোগুণে বা তামসীমূর্তির অঙ্কে এই বহুভাবেচ্ছা ও তন্মূলক আনন্দরূপ অসুরদ্বয়কে বিলীন করিবার জন্য মধ্যবর্তী রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা বা প্রাণের জাগরণ একান্ত আবশ্যক । ইহাই ব্রহ্মার স্তবে তামসী মূর্তির আবির্ভাব এবং মধুকৈটভ নিধনের জন্য বিষ্ণুর জাগরণ ।

এই তামসী প্রকৃতি স্থূলভাবে প্রকাশিত হইলেই, পূর্বকথিত খড়্গ, শূল প্রভৃতি দশবিধ প্রহরণধারিণী মহাকালী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন । এই মূর্তি নীলকান্তমণির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট ; ইহার হস্ত, পদ ও মুখ প্রত্যেক দশখানি। ইহার জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়রূপ দশবিধ চিৎশক্তি প্রবাহের দ্যোতক । একমাত্র চিৎশক্তিই যে দশ ইন্দ্রিয়পথে বহুভাবে বিকাশ পায়, ইহা পরিপুষ্ট করিয়া এই বহুভাবকে একত্বে বিলীন করিবার জন্যই এইরূপ তামসী মহাকালী মূর্তির আবির্ভাব হয় । এই মূর্তিতে একত্ব ও বহুত্বের অপূর্ব সমন্বয় প্রকটিত । মুমুক্ষু সাধক এই মূর্তি-দর্শনে ধন্য হইয়া থাকেন ।

চিদ্‌ব্যোম-ক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মূর্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই মূর্তিটি সাধকের সংস্কারানুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে । মায়ের নিজের কোন বিশিষ্ট মূর্তি নাই ! সর্বরূপেই তিনি, অথচ স্বয়ং রূপবিবর্জিত । তথাপি **'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'** । সাধকের হিতের জন্যই সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্ম বা মা আপনাতে বিশিষ্টরূপের কল্পনা করেন । উহাই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্র-বর্ণিত দেব-দেবী ! সাধক যেরূপ সংস্কারে, যেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেষিত করেন, ভক্তিপ্রিয় অরূপ পরমাত্মা সেইরূপ গুণে গুণময় হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন । ইহাই সাধনা-জগতে

বিশিষ্ট মূর্তি দর্শনের রহস্য।

দুই স্থানে এইরূপ বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন হয়। এক মানোময় ক্ষেত্রে, অন্য বিজ্ঞান কোষে বা প্রজ্ঞায়। মনে মনে কোন বিশিষ্ট মূর্তির কল্পনা (প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে) ঘন করিয়া তুলিলে প্রায় ঐরূপ মূর্তি-দর্শন হয়। কোন কোন স্থলে ঐরূপ অভ্যাসের সাহায্যে কল্পনা ঘন না করিলেও কদাচিৎ কোন মূর্তির দর্শন হইয়া থাকে। বুঝিতে হইবে— সে সকল পূর্বজন্ম সঞ্চিত ঘন কল্পনার ফল। যাহা হউক, মনোময় ক্ষেত্রে যে সকল মূর্তির দর্শন হয়, উহা ক্ষণিক আনন্দদায়ক ও ভগবৎসত্তার বিশ্বাস-বর্দ্ধক ; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ; কিন্তু ঐ সকল মূর্তি সাধককে কৃতার্থ করিতে পারে না ; কারণ, উহাতে প্রাণধর্মের বিকাশ নাই, সর্বজ্ঞতা, সর্বদর্শিতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি মহত্ত্বের স্ফুরণ নাই। উহা মনঃকল্পিত একটি ছায়াবিশেষ মাত্র ; সুতরাং সাধককে বরাভয়দানে, অমরত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না ; কিন্তু প্রজ্ঞাক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট মূর্তির দর্শনলাভ ঘটিলে সর্ববিধ সংশয় দূর হয়, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সাধক অভীষ্ট বরলাভে ধন্য হয়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—নেত্র, আস্য, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া তামসী দেবী ব্রহ্মার দর্শন গোচর হইয়াছিলেন। ঐ সকল স্থান প্রাণশক্তির বিশিষ্ট অনুভূতির কেন্দ্র। জগতের বীজ-সমূহকে পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি-হীন না করিয়া পরমাত্মার সহিত যে মিলন-প্রয়াস, সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা বলে। এই অবস্থায় প্রাণের ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ থাকে ; সুতরাং চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিকাশকেন্দ্র হইতে উপসংহৃত হইয়া প্রাণশক্তি পরমাত্মার অঙ্কে সংলীন হইতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলে অর্থাৎ যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, ঐ সকল কেন্দ্রে প্রাণশক্তির ক্রিয়াশীলতা পূর্ববৎ পরিলক্ষিত হয়। সাধকমাত্রেই বুঝিতে পারেন— প্রথম প্রথম যখন দেহাত্মবোধ ও বহুভাব পরিত্যাগ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ পরমাত্মাভিমুখী গতি লাভ হয়, তখন চক্ষু, মুখ, হৃদয় প্রভৃতি অবয়বের অস্বাভাবিক স্পন্দন বা বিক্ষেপ হইতে থাকে। আবার যোগযুক্ত অবস্থা হইতে বহির্মুখ হইবার উপক্রম হইলেও, এই সকল অবয়বের ঐরূপ বিক্ষেপ আরম্ভ হয়। এতদিন জগন্মূর্তি মায়ের রূপ দেখিয়া নেত্র, গুণ কীর্তন করিয়া আস্য, চরণস্পর্শ করিয়া বাহু, সন্তানুভূতিদ্বারা হৃদয় এবং স্নেহ বহন করিয়া বক্ষঃস্থল পরিতৃপ্ত ছিল। এ সকল অবয়ব এখন আর মায়ের এই পরিচ্ছিন্ন ভাবসমূহে মুগ্ধ থাকিতে চায় না। তাই, মা আমার তামসী মূর্তিতে ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ-পূর্বক, বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে সংস্থিত হইবার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিলেন।

মন্ত্রে ব্রহ্মাকে অব্যক্ত জন্মা বলা হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতেই মনের জন্ম হয়। মানুষমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন— চিত্তের বৃত্তিগুলি কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় উহাতেই বিলীন হয়। এই অব্যক্তক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেই সাধক পরমাত্মস্বরূপের সন্নিহিত হয়।

———○———

উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ॥৬৮॥
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রাহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ॥৬৯॥

অনুবাদ। যোগনিদ্রা কর্তৃক বিমুক্ত জনার্দন জগন্নাথ একার্ণবে শেষ শয়ন হইতে উত্থিত হইলেন। এবং দেখিতে পাইলেন—দুরাত্মা অতি বীর্যবান পরাক্রমশালী ক্রোধরক্তলোচন মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার স্তবে বিশেষ পরিতুষ্টা মহামায়া মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-মূর্তি পরিত্যাগ করিলেন। নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ উঠিলেন কিন্তু জনার্দনরূপে, এবার যে অসুর নিধন করিতে হইবে ; তাই বিষ্ণুর এই জন-পীড়ক রূপধারণ।

পূর্বে যে মন অতি চঞ্চল ও জগদ্ব্যাপারের সর্বপ্রধান নিয়ন্তা ছিল, আজ সে মনই পরম শান্তভাবে অবস্থান করিবার জন্য, অসুর নিধনের জন্য মহামায়ার প্রসাদে প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল। চঞ্চলতা পরিত্যাগ যে কি সুখের, কি আনন্দের, তাহা প্রশান্ত ভাবের একটু আস্বাদ না পাইলে উপলব্ধি হয় না। খুলিয়া বলিতেছি —জগৎময় সত্য প্রতিষ্ঠার ফলে, প্রত্যেক পদার্থে

আত্মসত্তা-দর্শনের ফলে, জগদ্-ব্যাপারের উচ্ছেদ সাধন না করিয়াই প্রাণ মাতৃ-যুক্ত হয়। এদিকে এইরূপ মাতৃ-যুক্ততার ফলে, অতি চঞ্চল মনও চিরাভ্যস্ত চঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণলাভে উদ্যত হয় ; কিন্তু আদি সংস্কাররূপী অসুরদ্বয় তাহাকে পুনরায় বহুভাবে তরঙ্গায়িত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে । ইহাই মধুকৈটভের ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যম । এতদিন জগদ্ধর্তা প্রাণ জগৎকে একার্ণবীকৃত করিয়া—জগৎসংস্কারসমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া, মাতৃ-যুক্তভাবে অবস্থান করিতেছিল ; জগন্মূর্তি মাতৃ-স্বরূপে পরিতৃপ্ত প্রাণও ভাবাতীত মাতৃ-সত্তায় পূর্ণভাবে মিলন-বিষয়ে উদাসীন ছিল ; কিন্তু এতদিনে সে মোহের অবসান হইয়াছে । যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া মা তাহাকে জনার্দনরূপে—অসুর-পীড়করূপে প্রবুদ্ধ করিলেন ; তাই, আজ প্রাণ আদি-সংকল্পের বিলয় করিতে উদ্যত ।

এইরূপই হয় । যতদিন মা আমার দয়া করিয়া জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া না দেন, যতদিন নিদ্রারূপিণী মা প্রবোধরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিনই জীব জগতের ধূলি গায় মাখিয়া, অতি চঞ্চল নশ্বর সুখে মুগ্ধ থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে । তারপর গীতাতত্ত্ব উন্মেষিত হইলে, বুদ্ধিযোগরূপ জগৎময় সত্যদর্শনের ফলে বিশিষ্টভাবে মাতৃ-লাভে ধন্য হয় । এই অবস্থায় জীব এই গুণময়ী, ভাবময়ী মায়ের দর্শনকেই প্রথম চরিতার্থতা মনে করিয়া, আত্মতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ মোহে আচ্ছন্ন থাকে । তারপর ধীরে ধীরে চণ্ডীতত্ত্বের উন্মেষ হয় । একে একে অসুরকুলের আবির্ভাব হইতে থাকে— বহুত্বের সংস্কার-সমূহ সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে । সেই চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভাবরূপ গুণরূপ অসুর-নিবহকে নিধন করিয়া, ভাবাতীত গুণাতীত সত্তায় প্রবেশ করিবার জন্য সাধক প্রাণপণ উদ্যম করে । এই উদ্যম বাহিরে দেখিবার নহে, ইহা বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা । সেখানে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন । অকপট কাতর প্রার্থনা এবং সম্যক্ আত্মসমর্পণই সে ক্ষেত্রের সাধনা বা উদ্যম । কত বিফলতা কত হতাশা আসিয়া সাধককে অবসন্ন করিয়া দিতে প্রয়াস পায় কিন্তু একমাত্র নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণের ফলে সকল প্রতিকূলতা অপূর্ব উপায়ে দূরীভূত হইয়া যায় ।

———○———

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥৭০॥

অনুবাদ । অনন্তর সর্বৈশ্বর্য-সমন্বিত, বাহুপ্রহরণ, বিভু, সর্বসংহারক হরি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, পঞ্চবর্ষসহস্র সেই অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যা । যোগনিদ্রা-বিমুক্ত প্রাণ, আপনাকে ভগবান বিভু এবং হরি ত্রিবিধ উপলব্ধিতে মহাশক্তিমান বলিয়া বোধ করেন । ভগবান শব্দের অর্থ—সর্বৈশ্বর্য-সমন্বিত । বিভু শব্দের অর্থ—ব্যাপক, অসীম-শক্তিসম্পন্ন । হরি শব্দের অর্থ—সর্ব-সংহারক । এই ত্রিবিধ অনুভূতি প্রাণে না ফুটিলে, অসুর-নিধনের যোগ্যতালাভ হয় না ।

অবসাদ দূর করাই প্রথম সাধনা । 'আমি কি এই অনাদিকাল সঞ্চিত অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিব ?' এইরূপ ভাব প্রাণের অবসাদসূচক ; সুতরাং একপক্ষে ইহা নিদ্রা-স্থানীয় । মায়ের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে, যথার্থভাবে মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলে, প্রাণে মা এমন বল সঞ্চারিত করেন যে, সাধক যাথার্থই অনুভব করিতে পারে—আমিই ভগবান, আমিই বিভু, আমিই সর্বসংহারক হরি ; সুতরাং নিশ্চই আমি অসুরকুল নির্মূল করিতে সমর্থ । ইহাই পরম পুরুষকার ।

বাহুপ্রহরণ শব্দে গ্রহণ বা আদানশক্তি বুঝা যায় । বাহু বা গ্রহণেন্দ্রিয় যাহার প্রহরণ অর্থাৎ অস্ত্রবিশেষ তিনিই বাহুপ্রহরণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণশক্তি সংস্কারের ফলোন্মুখতা নিরাকৃত করিবার জন্য—আপনাতে মিলাইবার জন্য, আদান-শক্তির প্রয়োগ করেন । ইহাই মধুকৈটভের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ। এই যুদ্ধ পঞ্চ-বর্ষসহস্র-ব্যাপী হইয়াছিল । 'পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি' ইহার আধিভৌতিক অর্থ—পাঁচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ; কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শনে ইহার অন্যরূপ অর্থপ্রতীতি অর্থ হয় । পঞ্চ শব্দের অর্থ— রূপ রসাদি বিষয়পঞ্চক । বর্ষ-শব্দের অর্থ—স্থান এবং সহস্র শব্দটি অসংখ্যের বোধক ; সুতরাং 'পঞ্চ-বর্ষসহস্রাণি' শব্দের অর্থ—অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট বিষয়পঞ্চকের

অনুভূতিস্থানকে লক্ষ্য করিয়া।

মনের যে কেন্দ্র হইতে পঞ্চবিধ বিষয়ানুভূতি ফুটিয়া উঠে, সেই স্থানের পঞ্চবর্ষ। ঐ পঞ্চবিধ অনুভূতিই আবার অসংখ্য নাম রূপাদি ভেদবিশিষ্ট হয়। তাই, সহস্রাণি পদটিতে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। যে স্থান হইতে এই অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট পঞ্চবিধ বিষয়ের অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া অবদান বা গ্রহণশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়।

খুলিয়া বলি—'আমি বহু হইব' এই সংস্কারের মূলে দুইটি ভাব আছে। একটি আনন্দ এবং অপরটি বহুত্বের ইচ্ছা। উহারাই মধুকৈটভ। উহাদিগকে নাশ করিতে হইলে, বহু ভাবের কেন্দ্রস্থানকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ আদানশক্তির প্রভাবে আত্মোপসংহরণ করিতে হয়। যতদিন অনুভূতিসমূহ আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত না হয়, ততদিন এই বাহু-প্রহরণ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। অনুভূতিগুলি বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, আর প্রাণ যেন পশ্চাদভাগ হইতে দুই হাতে ধরিয়া আপনাতে মিলাইয়া লইতে থাকেন। ইহাই আদানশক্তি বা বাহুপ্রহরণ-প্রয়োগের রহস্য। অনুভূতি-কেন্দ্র বহুজন্মাবধি পঞ্চবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে অভ্যস্ত। ঐ তরঙ্গগুলি আবার বিভিন্ন নামরূপ ও ব্যবহারের অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়; সুতরাং মধুকৈটভের নাশ করিতে হইলে, ঐ অনুভূতি-কেন্দ্র বা বঞ্চবর্ষসহস্রকে লক্ষ্য করিয়া আদানশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ বাহুপ্রহরণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে মধুকৈটভের নিধন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, এস্থলে অসুরদ্বয়ের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধের কথাই উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ পঞ্চবর্ষসহস্র শব্দটির দীর্ঘকালরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। সে মতের তাৎপর্য এই যে, জীবত্বের মৌলিক উপাদান-স্বরূপ ঐ দুইটি প্রবল সংস্কার ঈশ্বরভাবীয় অবস্থাবিশেষ; সুতরাং জীবভাবীয় শক্তি প্রয়োগে উহার বিনাশসাধন করিতে হইলে, দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ উভয় হস্তের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রদ্ধাপূর্বক নিরন্তর অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত জীবত্বের গ্রন্থি কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না।

———○———

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়া-বিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥৭১॥

অনুবাদ। তাহারা উভয়ে অতি বলোন্মত্ত; কিন্তু মহামায়া-স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারা কেশবকে বলিল —'তুমি আমাদের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর'।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ অতি বলোন্মত্ত অসুর; কারণ, **'সোঽকাময় বহু স্যাং প্রজায়েয়'** এই বহু ভাবের ইচ্ছা —সংস্কার, ইহা সর্বপেক্ষা বৃহত্তম ক্ষেত্র বা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত, সুতরাং অতি প্রবল। আর 'বহুভাবে প্রকাশিত আমি এক হইব' এই ইচ্ছাটি জীবভাবীয় সংস্কার হইতে সঞ্জাত; সুতরাং অতি দুর্বল। দুর্বল কর্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব; তাই মহামায়া মা স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া ঐ অসুরদ্বয়কে বিমোহিত করিলেন। তাৎপর্য এই যে, প্রাণ যেখানে মাতৃস্নেহে মুগ্ধ, মন সেখানে মায়ের মহতী শক্তিতে মুগ্ধ; এই উভয়ই যখন আর বহুভাব চায় না, মহামায়া মায়ের অনন্ত উদার নিত্য শান্তিময় সর্ব ভাববিরহিত নিরঞ্জন সত্তায় মিলাইয়া যাওয়াই যখন উভয়ের উদ্দেশ্য, একান্ত অভিলাষ, তখন উহাদের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া, মহামায়া মা মধুকৈটভকে আত্মস্বরূপে মুগ্ধ করিলেন। তাহারা সেই নীলশ্মদ্যুতি তামসী-মূর্তির মনোহর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ঐ স্বরূপে সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

ঠিক এইরূপই হয়। ওরে, মায়ের আমার এমনই রূপমাধুরী! যে একবার দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারিবে না। সেই স্নিগ্ধ শ্যামা, সেই কোটি-চন্দ্র-সূর্য-ম্লানকারিণী সুধাময়ী মাধুরী, সেই অভিনব চিদ্‌ঘন চারুতা, তাহা একবার দেখিলে আর জগৎ ভাল লাগে না, আর বহুত্ব ভাল লাগে না। সর্বদাই তাহাতে মিলাইয়া যাইতে বাসনা হয়। সেই যে আমার যথার্থ স্বরূপ, সেই যে আমি গো, এখানে যে 'আমি আমি' করি, এ ত' যথার্থ আমি নয়! এ যে কাঙ্গাল আমি, হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব আমি। সে আমি স্বাধীন সরল বিভু নিরঞ্জন আনন্দঘন; আরও কত কি বলিব! একবার সেই আমিকে দেখিলে, আর কেহ এই আমিতে থাকিতে চায় কি? তাই বহুত্বের সংস্কাররূপী অসুরদ্বয় আজ মাতৃ-সত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া, নিজেরাই নিজেদের বিনাশসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে; মরিয়া অমর হইতে ছুটিয়াছে। তাই, কেশবকে

বলিল—'আমাদের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর'।

প্রাণ এখানে কেশব-মূর্তিতে বিরাজিত অর্থাৎ সর্বভাবের বীজকে সংহরণপূর্বক স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি পর্যন্ত বিলয় করিয়া মহাকারণে সম্মিলিত হইতে উদ্যত। ইহাই কেশব-মূর্তির স্বরূপ ; 'ক' শব্দের অর্থ জল। কারণ সলিলে যিনি শববৎ অবস্থান করেন তিনিই কেশব ; সে যাহা হউক, প্রাণের প্রলয়কালীন শক্তির আভাস পাইয়া মহামায়া বিমোহিত অর্থাৎ মাতৃ-স্বরূপে মুগ্ধ অসুরদ্বয় প্রাণকে বলিল— তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, আর আমরা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। এতদিন বুঝি নাই, তুমিই আমাদের মহামঙ্গলের একমাত্র হেতু, তাই বহুভাবে বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দে মুগ্ধ ছিলাম ; কিন্তু এখন তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি আমাদিগকে মাতৃঅঙ্গের ভূষণ করিয়া দিবে, তাহারই চেষ্টা করিতেছ ! সুতরাং তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব।

সংস্কাররাশিও জ্ঞান। জ্ঞান জন্য-পদার্থ নহে ; সুতরাং জ্ঞানের ধ্বংস অসম্ভব। তাই সংস্কারগুলিও দগ্ধ-বীজবৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকে। উহাই মাতৃ-কণ্ঠে মুণ্ডমালা। কোনরূপ ভাব উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া উহারা মৃত। এ সকল রহস্য দ্বিতীয়, তৃতীয় চরিত্রে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

———০———

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবেতামদ্য মে তুস্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥৭২॥

অনুবাদ। ভগবান কহিলেন— যদি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও। এস্থলে অন্য বরে আর কি প্রয়োজন ? ইহাই আমার প্রার্থিত বিষয়।

ব্যাখ্যা। কিছুদিন অনুভূতি-কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া, আদান-শক্তি প্রয়োগ বা মাতৃ-স্বরূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতিই মা, এইরূপ বোধ যখন সংশয় ও বিপর্যয়-প্রতীতি-শূন্য হয়, তখনই মধুকৈটভ বধ্য হয়। সাধক ! তুমিও দেখ— তোমার পঞ্চবর্ষ (অনুভূতি কেন্দ্র) প্রতিনিয়ত সহস্র ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া উপস্থিত হইতেছে। তোমার বাহুই প্রহরণ। তুমিও দুই হাতে সেই ভাবরাশিকে গ্রহণ করিয়া বল—এস মা আমার, এস আত্মা আমার, এস আমি আমার, এস সর্বস্ব-আমার ! রূপ হইয়া আসিয়াছ, এস মা ! রস হইয়া আসিয়াছ, এস মা ! শব্দ হইয়া আসিয়াছ, এস মা ! এইরূপে সর্বভাব আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভাবে দর্শন কর, দেখিবে—অজেয় অসুর স্বেচ্ছায় আপনার মৃত্যু যাচিয়া লইবে।

কিরূপে ইহা হয় ? যখন তুমি দেখিতে পাইবে—দৃঢ় অধ্যবসায় বলে সংস্কার রাশিকে মাতৃ-ময় করিয়া তুলিয়াছ, তোমার অনুভূতি-কেন্দ্রে সত্যরূপ অগ্নি জ্বালিয়াছ, পতঙ্গবৎ সংস্কার রাশি আসিয়া সেই অগ্নিতে পড়িয়া সত্যময় হইয়া উঠিয়াছে, সবই মা হইয়াছে, তখন তুমি আদরের সন্তান মাকে বলিতে পার— 'আর কেন মা এই বহুভাবে ফুটিতেছ ? এইবার তোমার বহুভাব সংহরণ কর।' তখন সন্তানবৎসলা মা বহুরূপ সংহরণ করিয়া লইবেন। মা নিজে যদি সন্তানস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আসুরী মূর্তির সংহরণ না করেন, তবে আর কাহারও সাধ্য নাই, যে, উহার অঙ্গ স্পর্শ করে। যতই যোগ, যতই বৃত্তিনিরোধ, যতই দৃঢ় অধ্যবসায়-সহকারে চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা কর না কেন, তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইতে পারে— যদি প্রকৃতিরূপিণী মা স্বকীয় আসুরীভাব (পুনঃ পুনঃ পরিণামরূপ বহুত্ব) স্বকীয় অঙ্গে বিলীন করিয়া না লয়েন। ইহাই যথার্থ তত্ত্ব।

সে যাহা হউক আমরা দেখিতে পাইতেছি—ভগবান বিষ্ণু অসুরদ্বয়ের বধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়া বলিলেন —**'কিমন্যেন বরেণাত্র'**। আর অন্য বরে কি প্রয়োজন ? আর কিছুই চাই না। আমি সিদ্ধি শক্তির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া জগতে শক্তিমান বলিয়া প্রতিষ্ঠা রাখিতে চাই না, অথবা প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, সৎকর্ম প্রভৃতি সর্বোত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া মহিমময় মহাপুরুষ সাজিতে চাই না, গায়ের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া আমাকে মহামূল্য রত্নভূষণে সাজাইব, ইহাও আমার বাসনা নহে। আমি চাই —আমাকে সর্বতোভাবে তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিব। তোমার চরণে আত্মবলি দিয়া, অনন্ত জীবনব্যাপী অকৃতজ্ঞতার একবিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ নিষ্কামতা বা যথার্থ মুমুক্ষুভাব প্রাণে বিকাশ পাইলেই, অসুরের নিকট প্রার্থনা করা যায় —'তোমরা আমার বধ্য হও' ! সংস্কাররূপী অসুর মাতৃ-মূর্তিতে চিরতরে মিলাইয়া যাউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা !

———০———

ঋষিরুবাচ।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥৭৩॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—সেই অসুরদ্বয় আপনাদিগকে বঞ্চিত মনে করিয়া এবং সমগ্র জগৎ রসময় দর্শন করিয়া কমললোচন ভগবান বিষ্ণুকে বলিল—পৃথিবী যেখানে সলিল-পরিপ্লুতা নহে. সেই স্থানে আমাদিগকে বধ কর।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ আজ মহামায়ার স্বরূপে মুগ্ধ ; তাই তাহারা এতদিন পরে বুঝিতে পারিল—আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। বহুভাবের খেলা খেলিয়া, ভূমা সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঠিক এইরূপ জীবও যতদিন মহামায়ার মায়ায় সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ না হয়, ততদিনই জগদ্ভাবে—বহুভাবে—মুগ্ধ থাকে, জগৎকেই আনন্দের স্থান বলিয়া মনে করে। যতদিন জীব অতি অল্পকালস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সুখেই চরিতার্থ হয়, ততদিন আপনাদিগকে বঞ্চিত বলিয়া মনেও করিতে পারে না ; কিন্তু মহামায়া মা যেদিন আত্মস্বরূপ খুলিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরেন, সেইদিনই বুঝিতে পারে—'হায়! এতদিন জগতে যথার্থ সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।'

'আপোময়ং জগৎ'—দেবীসূক্ত-ব্যাখ্যা-অবসরে আচার্য সায়নদেব অপ্‌শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ব্যাপনশীলা ধী-বৃত্তি। এই স্থানে অর্থাৎ এই বুদ্ধিতত্ত্বেই পরমাত্মা বিশেষভাবে অনুভূতিযোগ্য। সাধক দেহাদি হইতে আত্মবোধ অপসৃত করিয়া ধী-ক্ষেত্রে আরোহণ করেন, আর পরমাত্মা জীবের প্রতি স্নেহপরবশতাহেতু যেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই স্থানেই জীব ও পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। ইহাই জীবন্মুক্তের আনন্দ-নিকেতন। ইহাই বৈষ্ণবের ভাষায় বৃন্দাবন—এই খানেই রাসলীলা। রসস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তিরূপিণী গোপীগণ-পরিবেষ্টিতা আরাধিকা জীবপ্রকৃতির সহিত এইস্থানেই রমণ করেন। এ আনন্দ ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে। **'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ'** আত্মারাম হইয়াও কিরূপে তিনি আমাদের সহিত রমণ করেন, তাহা এই বৃন্দাবনে না আসিলে কিরূপে বুঝিবে ? গোপী বা ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ যখন আত্মার মহাকর্ষণে বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া, তীব্র বেগে বংশীধ্বনির অনুসরণে কৃষ্ণান্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিকা—'জীব আমি' যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রেমে—পরমাত্মমোহে মুগ্ধ হইয়া, এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্ররূপ বৃন্দাবনে উপনীত হয়, তখনই আত্মমিলনের মহা-সন্ধিক্ষণ। শৈবের ভাষায় এই ধী-ক্ষেত্রই কৈলাস। এইখানেই বিজ্ঞানময় শিব পার্বতীরূপিণী পরাপ্রকৃতির সহিত আনন্দে বিহার করেন। এইস্থানে আসিলেই **'সর্বমাপোময়ং জগৎ'** সমস্ত জগৎ ব্যাপনশীল-ধীময়—বোধময় দৃষ্ট হয়। এখানে সকলই আছে ; কিন্তু মাত্র বোধ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ চিন্ময়। জড়ভাব এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। পক্ষান্তরে, অপ্ শব্দের অর্থ রস। পরমাত্মাই একমাত্র রসস্বরূপ। আনন্দময় আত্মদর্শন হইলেই জগৎ আপোময় বা রসময় প্রতীত হয়। মধুকৈটভ এতদিন পরে আনন্দময়ী মহামায়াস্বরূপে মুগ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং সমগ্র জগৎ আপোময় দেখিতেছে।

যে বিষ্ণু তাহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত, সেও এখন তাহাদের দৃষ্টিতে **'ভগবান কমলেক্ষণ'**—অতি প্রিয়দর্শন হইয়াছে। যেহেতু এখন তাহারা প্রাণকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। প্রাণ যে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া, রসের সমুদ্রে ডুবাইতে যাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহারা রস-সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র ; তরঙ্গরূপে আর বিকশিত হইতে হইবে না, একেবারে সমুদ্র হইয়া যাইবে। প্রাণই এই মহামিলনের একমাত্র উপায় ; সুতরাং প্রাণই পরম প্রিয় ; তাই, সে এখানে কমলেক্ষণ—স্নেহ-দৃষ্টি-সম্পন্ন।

মধুকৈটভ বিষ্ণুর নিকট যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা আরও বিস্ময়কর। যেখানে **'উর্বী সলিল দ্বারা পরিপ্লুত নহে, সেইখানে আমাদিগকে বধ কর'**। কি সুন্দর প্রার্থনা! তাহারা জগৎকে বোধময় বা রসময় দর্শন করিতেছে। রস বা আনন্দসমুদ্রের কতকগুলি তরঙ্গই উর্বী বা পৃথিবীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে এই সলিল-পরিপ্লুতা পৃথিবী নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সলিল অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন রস, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সেইখানে আমাদিগকে নিধন কর—ডুবাইয়া দাও। আর এই বিশিষ্ট আনন্দ এবং এই কীটের ন্যায় বহুভাবে বিকাশ চাহি না। যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানে লইয়া চল।

শুন—বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে জগৎসত্তা বিলুপ্তপ্রায় হয়। এখানে জগৎ বোধময়রূপে প্রকাশ পায়। ঐ বোধটি আনন্দস্বরূপ। তাই, মন্ত্রে **'আপোময়ং জগৎ'** বলা হইয়াছে। যেখানে বোধময় জগদ্ভাবও নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বোধ বা আনন্দ সেইখানেই বিষয়সংস্পর্শজন্য আনন্দ ও বহুত্বের অবসান হয়। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বের উদয়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিভাবটির উপলব্ধি হয়। জগৎটা যেন ছায়ার মত বুদ্ধিসত্তায় ভাসিতে থাকে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবগুলি আর সাধককে চঞ্চল করিতে পারে না 'আমি এই সর্বভাবের দ্রষ্টা-মাত্র' এইরূপ বোধ ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থায় আত্মবোধময় উদাসীন ক্ষেত্রে জগৎসত্তা ক্ষীণভাবে থাকে ; ইহাই **'আপোময়ং জগৎ'**। যেখানে জগতের ঐ ক্ষীণ সত্তাটুকুও নাই, সেই বিশুদ্ধবোধমাত্রস্বরূপেই সর্বভাবের অবসান হয়। মধুকৈটভ সেইখানে যাইতে চায়। ধন্য তাহাদের প্রার্থনা !

ঋষিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্র-গদাভৃতা।

কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥৭৪॥

অনুবাদ। ঋষি কহিলেন—শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান 'তাহাই হউক' বলিয়া মধুকৈটভের মস্তকদ্বয় স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্বক চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন।

ব্যাখ্যা। শঙ্খ—ইহা নাদশক্তির প্রতিভূ। যে প্রণব-ধ্বনি অনন্ত-জগৎ-পরিব্যাপ্ত, অনাহত-চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পায়, যাহার বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দ-আকারে পরিচিত, শঙ্খ তাহারই প্রতিনিধি। গীতায় দেখিতে পাই—সারথিরূপী ভগবানের হস্তে শঙ্খ সুশোভিত ; আর এখানেও মধুকৈটভারি ভগবানের হস্তে নাদ-শক্তির প্রতিভূস্বরূপ শঙ্খ বিদ্যমান। নাদতত্ত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

চক্র শব্দের অর্থ জগৎ। অন্ন হইতে প্রাণী, পর্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জন্য, কর্ম হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে কর্ম এবং অক্ষর পুরুষ হইতে বেদ সম্ভূত ! অনুলোম ও বিলোমভাবে এই চক্রবৎ গতির নাম সংসার। ইহাই বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র। ইহাই সুদর্শন নামে অভিহিত। ব্রহ্ম হইতে প্রবর্তিত এই জগৎ-চক্রকে যাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তাঁহাদের চক্ষে এই চক্র অতি সুন্দর দর্শন।

গদা—লয় বা সংহার-শক্তির প্রতিভূ। যে শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ-চক্রের প্রলয় হয়, তাহাই গদা নামে অভিহিত। গদ্ ধাতুর অর্থ—ব্যক্ত শব্দ। শঙ্খ বা প্রণবনাদে জগতের উৎপত্তি ; উহা অব্যক্তধ্বনি। আর গদা বা ব্যক্ত নাদে ব্যোম (বি+ওম) শব্দে জগতের প্রলয় ; সুতরাং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বলিলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা বুঝা যায়।

মধুকৈটভ স্বেচ্ছাপূর্বক নিহত হইতে অভিলাষী। প্রাণশক্তি মহামায়ার শক্তিতে শক্তিমান—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য উদ্ভাসিত। এই অবস্থায় বিষ্ণু মধুকৈটভের মস্তক স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্বক ছেদন করিলেন। **'মহীতলং তজ্জঘনে'** বিষ্ণুর জঘনদেশ মহীতল। মহী বা ক্ষিতিতত্ত্ব জড়ের সর্বশেষ পরিণতি। জড় হইতে চৈতন্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে, স্থূলতম ক্ষিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় পার্থিব দেহ ব্যতীত জড় চৈতন্যের ভেদ উপলব্ধিযোগ্য হয় না ; সুতরাং মানব-দেহই সাধনার ক্ষেত্র। ইহা হইতেই ভোগ এবং অপবর্গের লাভ হয়। ইহাই বিষ্ণুর জঘনদেশ নামে অভিবর্ণিত হইয়াছে।

মস্তকচ্ছেদন কথাটির মধ্যে একটু রহস্য আছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ কণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত। যদিও ত্বক্ সর্বশরীরব্যাপী তথাপি ত্বকের ধর্ম—স্পর্শ, প্রধানভাবে অধর-ওষ্ঠেই পরিব্যক্ত। কণ্ঠের উপরিভাগ জ্ঞান বা চিৎক্ষেত্র এবং নিম্নভাগ জড়ক্ষেত্র। এই চিৎ, জড়-মিলনের নাম জীব। ইহার বিচ্ছেদ করাই জীবত্বরূপ-বন্ধন বিমুক্তি। সে জড়ের সংমিশ্রণে চৈতন্য তাঁহার স্বকীয় শুদ্ধ ভাবকে তিরস্কৃত করিয়া পরিচ্ছিন্ন জীবভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছেন, সেই জীব-ভাব হইতে চৈতন্যকে মুক্ত করাই সর্ববিধ সাধনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই অস্মদ্দেশে দেবতাপূজায় উৎসর্গীকৃত ছাগাদি পশুর কণ্ঠদেশ ছেদন করা হয়।

যাহা হউক, এইরূপ যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, মৌলিক সংস্কারবশে জীব অনন্তকালব্যাপী জন্ম-

মৃত্যুর খরস্রোতে ছুটিয়া চলিতেছে, সেই আদি-সংস্কার —সেই বহুত্ব মূলক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা এতদিনে প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি কর্তৃক স্থূল বা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়াই বহুত্ব হইতে বিমুক্ত হইল। ইহাকেই জীবের ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বলে। মন যে অজ্ঞানগ্রন্থিবশতঃ প্রতিনিয়ত বহুত্বের সঙ্কল্প করে এবং তাহাতেই আনন্দ পায়, সেই গ্রন্থির উচ্ছেদ হওয়ার নাম ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। ব্রহ্মা বা মন যে গ্রন্থিতে আবদ্ধ সেই বহুভাবমূলক মৌলিক সংস্কাররূপ প্রথম গ্রন্থির উচ্ছেদ এই মধুকৈটভবধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইলে সাধক বেশ বুঝিতে পারে—এই জগৎ, এই স্ত্রী পুত্রাদি, এই দেহ সকলই কল্পনামাত্র ! মায়ের বিরাট মনের কল্পনাই যে বিশ্বরূপে প্রতিভাত, তখন ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আর ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষাও দূরীভূত হইয়া যায়। বিষ্ণু ও রুদ্র-গ্রন্থি-ভেদ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রে ব্যাখ্যাত হইবে। পরমাত্মদর্শনেই এই গ্রন্থিত্রয়ের ভেদ হয়। এক কথায়, ইহাই আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্মফল-ধ্বংস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্মফল-ধ্বংস বিষয়ে ভগবান বলিয়াছেন —**'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'**। যেরূপ প্রজ্বলিত বহ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এস্থলে সর্ব শব্দটির অর্থ সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন—জ্ঞানলাভ হইলে আগামী এবং সঞ্চিত এই দ্বিবিধ কর্ম ক্ষয় পায় ; কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যাধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ব্যাধ একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে একটি বাণ সংযোজিত করিয়াছে। বাম হস্তে অপর একটি শর এবং পৃষ্ঠে বাণ-পূর্ণ তূণীর রহিয়াছে। অদূরস্থিত পলায়মান মৃগের উদ্দেশ্যে শর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরক্ষণে ভগবৎকৃপায় ব্যাধের জ্ঞানোদয় হইল। অকস্মাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়ায়, হস্ত ও পৃষ্ঠস্থিত বাণ পরিত্যাগ করিল। সে আর কখনও প্রাণীহত্যা করিবে না ; কিন্তু যে বাণটি হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যভূত মৃগকে বিদ্ধ করিবেই। সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে, বর্তমানে যে কর্ম ভবিষ্যৎ কর্মের বীজস্বরূপ হইতেছে অথবা যে কর্মের ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই, সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই উভয়বিধ কর্মই বিনষ্ট হইতে পারে ! কিন্তু যে কর্মের ফলে বর্তমান দেহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সম্যক্ ভোগ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ক্ষয় হয় না। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বটে ; শাস্ত্রেও আছে —**'মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি'**, অভুক্ত কর্ম কোটিকল্প কালেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়—যখন ভগবান বলিয়াছেন —**'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে'** তখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে, নিশ্চয়ই সর্ব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান যতটা উজ্জ্বল হইলে—জ্ঞানের যে অবস্থায় পৌঁছিলে, সাধকের প্রারব্ধ-কর্মফলরূপ এই স্থূল দেহটি পর্যন্তেরও বিলয় হইয়া যায়, জ্ঞানের সেই উন্নত স্তরে উপস্থিত হইতে পারিলে যথার্থই সর্ব-কর্ম-ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞান যতটুকু উজ্জ্বল হইলে আগামী ও সঞ্চিত কর্মমাত্র ক্ষয় পায়, সাধকগণ দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে ততটুকু পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু যাহাতে প্রারব্ধ পর্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তত উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা বারংবার সমাধিস্থ হইয়া, আবার দেহাত্মবোধে ব্যুত্থিত হন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা জ্ঞানের সেই উজ্জ্বলতম ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদের প্রারব্ধ-ভোগ-ক্ষেত্ররূপ দেহটি থাকিয়া যায় ; কিন্তু সাধকের এমন একটি দিন আসে—যে দিন সমাধিস্থ হইয়া আর দেহাত্মবোধে প্রত্যাবর্তন করেন না। **'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** ; ইহাই জ্ঞানের উজ্জ্বলতম স্বরূপ এবং জ্ঞানের এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে যথার্থ সম্যক্ জ্ঞান অধিগত হয়।

———○———

এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥৭৫॥

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধঃ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া, মহামায়া এইরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৎস সুরথ ! এই দেবীর প্রভাব—মাহাত্ম্য পুনরায় বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয় দেবী-

মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে মধুকৈটেভ-বধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা বা মন কর্তৃক স্তুত হইলেই দেবী স্বয়ং বিশিষ্ট মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। যতক্ষণ মাত্র বুদ্ধিতে ভগবদ্‌ভাব ফোটে, ততক্ষণ সত্তামাত্রের উপলব্ধি হয়। প্রাণে যখন ভগবদ্‌ভাব বিকাশ পায়, তখন সর্বত্র অব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা প্রত্যক্ষ হয়। আর যখন মন পর্যন্ত ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার মনোময়ী ইন্দ্রিয়-ধর্মময়ী বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন; সুতরাং ব্রহ্মা বা মন যদি মায়ের আরাধনা করে, যদি মাতৃ-আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল হয়, তবে মা নিশ্চয়ই এইরূপ স্থূলমূর্তিতেও দেখা দেন। এইরূপ যাঁহারা বুদ্ধি, প্রাণ ও মন সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-ময় করিয়া মাতৃ-লাভে ধন্য হয়েন, তাঁহাদের সেই দর্শনই সর্ববিধ সংশয়ের নিরাস ও হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ করিয়া দেয়।

যাঁহারা বুদ্ধি ও প্রাণের সন্ধান না লইয়া, মাত্র মনের গতি কথঞ্চিৎ ভগবৎমুখী করিয়া সাধনার পথে, অগ্রসর হন, তাঁহারাও অনেক সময় বিশিষ্ট মূর্তির দর্শন পাইয়া থাকেন; কিন্তু সেই মূর্তি চিত্রাঙ্কিত মূর্তির ন্যায় জড় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মাতৃ-ধর্মের—মাতৃ-মহত্ত্বের অভিব্যক্তি না থাকিলে, মূর্তি কদাপি সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারে না।

সে যাহা হউক, এই প্রথম চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই—সমাধি-সহায় সুরথরূপী জীবাত্মা মেধসরূপী বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে আশ্রয় লইয়া ক্রমে ক্রমে মাতৃ-মহত্ত্বের—মহামায়ার প্রভাব দর্শনে ধন্য হইতেছে। মধু ও কৈটভ —আগামী-কর্মের বীজ। এই বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থাৎ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন শক্তি শূন্য হইলেই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়। 'আর আমি কিছু চাই না; ঐহিক, পারত্রিক কোনরূপ ভোগের—ফলের কামনা আমার নাই' এইরূপ নিষ্কাম ভাবই, 'এক আমি বহু হইব' এই আদিম সংস্কারের বিরোধী। আচার্য শঙ্করের ভাষায় ইহাকে 'ইহামুত্র-ফলভোগ বিরাগ' বলা হয়। তিনি বলেন —ঐটা হইলে, তবে পরমাত্ম সাক্ষাৎকারলাভ হয়, আর দেবী-মাহাত্ম্য বলেন—মহামায়ার তামসী মূর্তিতে আবির্ভাব এবং বিষ্ণুর জাগরণ হইলেই যথার্থ ফলভোগ-বিরাগ উপস্থিত হয়। আমরা জানি—মাকে দেখিবার পূর্বে কেহ পূর্ণভাবে বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না।

মাকে দেখিবার উপায় কি? উপায় ইচ্ছা। দেখিবার ইচ্ছা হইলে দেখা যায়। তিনি ত' আর লুকাইয়া নাই যে কোনও রূপ উপায়ের সাহায্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বহির করিতে হইবে। তিনি সর্বত্র সুপ্রতিভাত! জীবের ইচ্ছা হয় না, তাই দেখে না। মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি সদ্‌গুরুরূপে প্রথমে দেখা দেন। সদ্‌গুরু লাভ হইলেই সাধক তাহার দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব গুরু-চরণে অর্পণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রমে গুরুই তাহার 'আমি' হইয়া যান, জীবভাবীয় কর্তৃত্ববোধ শিথিল হইয়া পড়ে, সৎ-অসৎ যেরূপ কর্মই হউক, সে আর 'আমি করিতেছি' এরূপ ধারণাই করিতে পারে না। তখন **'কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'** এইরূপ জ্ঞানে জাগতিক কার্যগুলি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। তাহারই ফলে বর্তমান কর্মগুলি অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য হয়; সুতরাং উহা ভবিষ্যৎ কর্মের বীজরূপে বা বন্ধনরূপে পরিণত হয় না। এইরূপ জাগতিক কর্মে যে পরিমাণে আসক্তি কমিয়া আসিতে থাকে, সেই পরিমাণে হৃদয়স্থ গুরুর প্রতি সাধকের আসক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। আসক্তি যত বৃদ্ধি পায়, ততই সে তাহাতে মুগ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধক নিশ্চিন্ত হয়। তখন বুঝিতে পারে—গুরু ও মা ভিন্ন নহেন, একজন। তিনিই অন্তরে থাকিয়া, তাহার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ করাইয়া লইতেছেন। এই সময়ই সাধক দেখিতে পায়—তাহার ত্রিবিধ কর্মফল ক্ষয় করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মা বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হইতেছেন। তখন আর তাহার কর্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। অহং বুদ্ধিতে বিশিষ্টপুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয় না। কোনও অলঙ্ঘ্য নিয়মবশে সমস্ত কার্যগুলি যেন একটির পর একটি স্বয়ং নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে। যখন যে গ্রন্থিটি ভেদ করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় প্রয়োগ আবশ্যক, মা আমার স্বয়ং সেইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাই সাধনা-জগতের যথার্থ ক্রম বা সোপান। যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হউন, তাহাকে এই সাধারণ ক্রমগুলির মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে। তবে একটি কথা, ইহার প্রথমটি আসিলেই, পর পরটি আপনি আসিতে থাকে, ইহাই সাধনার সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। সুরথ-সমাধির উপাখ্যানের ভিতর দিয়া এই তত্ত্বই সুন্দরভাবে

পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রথমে মধুকৈটভ নিধন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় মহিষাসুরবধ বা চৈতন্য প্রতিষ্ঠা এবং সর্বশেষে শুম্ভবধ বা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। মা আমার 'সচ্চিদানন্দস্বরূপা'। তাঁহার জগৎমুখী অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি যেরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ (পূর্বে ইহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে), আত্মাভিমুখী অভিব্যক্তি বা প্রলয়ও সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; সুতরাং সৎ বা সত্যের প্রতিষ্ঠাই সাধনার প্রথম স্তর[১], চিৎ বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় স্তর এবং সর্বশেষে আনন্দপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিত্যমুক্তভাব। অথবা সত্য ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইলে, আনন্দপ্রতিষ্ঠা আপনিই হয়। শুধু অস্তিত্বের উপলব্ধিই যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই 'মা রহিয়াছ' এই বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জীবভাবীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয়। আগামীকর্মের মূল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বা মধুকৈটভবধ কহে।

কেহ কেহ অনুরাগ এবং বিদ্বেষকে মধু ও কৈটভ বলেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই ; কারণ, রাগ এবং দ্বেষ এই দুইটিই যথার্থ বন্ধনের হেতু। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত হইলেই কর্মগুলি বন্ধন-উৎপাদন বিষয়ে শক্তি-হীন হয়। সর্বকর্মের ভিতর যে একমাত্র সত্যস্বরূপা মহামায়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই সত্যাংশমাত্র জীবের লক্ষ্য হইলেই, কর্মগুলি রাগদ্বেষশূন্য হইয়া যায়। তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে ; সুতরাং এ দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সত্যপ্রতিষ্ঠাই যে মধুকৈটভ-নাশের আভ্যন্তরিক তাৎপর্য, তাহাতে কোনরূপ সংশয় উঠিতে পারে না।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীবাত্মরূপী সুরথের সংশয় নিরাশ করিতে গিয়া বিজ্ঞানময় গুরু মেধস পূর্বে বলিয়াছেন —'দেবকার্য-সিদ্ধির জন্য মহামায়া যখন বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।' পরম করুণাময় গুরু সুরথকে মহামায়ার সেই আবির্ভাবটি প্রত্যক্ষ করাইয়া বলিলেন— **'এবমেষা সমুৎপন্না'**। বিপন্ন ব্রহ্মাকে অসুরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, মা কিরূপে তামসী-মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েন, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং পরে যথাক্রমে আরও বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করাইবেন, তাই বলিলেন —মহামায়ার আরও মহত্ত্বের কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর—দর্শন কর।

মায়ের প্রিয়তম সন্তান! সাধক মনুজবৃন্দ! তোমরা কি এইরূপ মধুকৈটভের দ্বারা—ক্ষণস্থায়ী বিষয়ানন্দজনিত চঞ্চলতা দ্বারা আপনাদিগকে উৎপীড়িত বলিয়া মনে করিতেছ। যদি এই বহুত্বের আনন্দকে উৎপীড়ন ও আত্মবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তুমি সদ্‌গুরু-কৃপায় মাতৃ-স্নেহে মুগ্ধ হইতেছ। অচিরাৎ মা তোমায় বক্ষে লইবেন, তাহারই পূর্ব আয়োজন চলিতেছে। তুমি মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** আমিতত্ত্বে—চিন্ময়-ক্ষেত্রে প্রশান্ত উদার মাতৃ-বক্ষে—আনন্দময় মুক্তি-জলধিতে ঝাঁপ দিয়াছ! নিশ্চয় ডুবিবে। তিনটি তরঙ্গমাত্র দেখিতে পাইবে। তাহার একটিতে তোমার অবিশ্বাস ও সন্দেহের যে লেশটুকু ছিল তাহা ধুইয়া সর্ববিধ বাসনার অনল নির্বাপিত করিয়া দিবে। তখন অন্তরের অন্তস্তম তল অন্বেষণ করিয়াও বিন্দুমাত্র কামনার সন্ধান পাইবে না। সর্বত্র আনন্দময় মাতৃ-সত্তার বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ় ও অচল-প্রতিষ্ঠ হইবে। যে মনকে এখন বহুত্বপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজেকে অকর্মণ্য—মাতৃ-লাভের অযোগ্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছ, সেই মনই অগ্রসর হইয়া মাতৃ-শক্তি উদ্বোধিত করিয়া বহুত্ব ও তন্মূলক আনন্দ বা আসক্তির উচ্ছেদ সাধন করিবে। মধুকৈটভ নিহত হইবে। তোমার আগামীকর্মের বীজ উন্মূলিত হইবে। ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইবে —তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে। সেই তরঙ্গটি এই চলিয়া গেল। ক্রমে আরও দুইটি তরঙ্গ আসিবে। উহার একটিতে তোমার সর্বময় আত্মসত্তার—মাতৃ-সত্তার দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাণময়, চৈতন্যময় করিয়া দিবে। সর্বত্র আত্মপ্রাণের লীলা-বিলাস দেখিয়া আত্মহারা হইতে আরম্ভ করিবে। বিষ্ণু বা প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদসাধন হইবে। সঞ্চিত-কর্মফল-ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠ হইবে! সর্বশেষে আর একটি তরঙ্গ

[১] সত্য প্রতিষ্ঠা নামক ক্ষুদ্রপুস্তকে ইহা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

আসিবে—উহা তোমার বিশ্বময় প্রসারিত মহান আমিটিকে একেবারে আনন্দসমুদ্রে ডুবাইয়া দিবে। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানময় রুদ্রগ্রন্থির উচ্ছেদ হইবে। প্রারব্ধ কর্মফলস্বরূপ স্থূল দেহটি পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তাই, বিজ্ঞানময় গুরু ব্রহ্মর্ষি মেধস সত্যের বৈজয়ন্তী বহন করিয়া স্নেহ-করুণা-পূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন—এস সুরথ! এস সমাধি! এস সাধক! এস অমৃতের বরপুত্র! **'প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে'** আবার দেবীর মাহাত্ম্য বলিব—দেখাইব। কে কোথায় আছ—সকলে মিলিয়া কোটি কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া অগ্রসর হও! মাতৃ-প্রভাব—মায়ের মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রের বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী, অভূতপূর্ব সাধনরহস্য শ্রবণ কর—প্রত্যক্ষ কর, ধন্য হও! অজ্ঞানান্ধ নয়ন জ্ঞানাঞ্জনে উন্মীলিত হউক! শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীন-শুষ্ক-হৃদয় পরাভক্তির বিশুদ্ধ মন্দাকিনী-ধারায় অভিপ্লাবিত হউক। হতাশ কর্মহীন অলসপ্রাণ আবার নিয়ত কর্মপরায়ণ হউক। তোমরা জ্ঞান-ভক্তিকর্মের অপূর্ব সমন্বয়-পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হও।

এস মা আমার! সন্তান-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া একবার সত্যলোক হইতে ছুটিয়া এস! আমরা বড় কাঙ্গাল—বড় মলিন সজিয়া বসিয়া আছি! কিছুতেই এই দীনতা-মলিনতা দূর করিতে পারিতেছি না। চতুর্দিক হইতে মিথ্যার—ভ্রান্তির অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। একবার দেখ মা! তোমার প্রিয়তম সন্তানগণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপীড়নে জর্জরীভূত; সন্দেহ, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে হৃদয়ের সরস ও প্রশান্ত ভাবগুলি উন্মূলিত, নিরানন্দ ও মৃত্যুই যেন এ যুগের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে একবার আবির্ভূত হও মা! একবার স্নেহ-করুণাভরা নম্রা মূর্তিতে দাঁড়াও। আনন্দের—অমৃতের পূতধারায় আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া দাও। আমরা যে—বিজ্ঞানময়ী, আনন্দময়ীর বড় স্নেহের সন্তান, তুমি যে আমাদিগকে বড় ভালবাস মা, এই কথাটা শুধু বুঝিতে দাও! আমাদের অকৃতজ্ঞ প্রাণ একবার স্বীকার করুক—তুমি আমাদের একান্ত আশ্রয়—সন্তানবৎসলা জননী। আমাদের বুঝাইয়া দাও মা আমরা সর্বতোভাবে তোমারই অঙ্কে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে যথার্থই অমৃতের সন্তান, আনন্দই যে আমাদের স্বরূপ ইহা আমাদের মর্মে মর্মে অনুভব করাইয়া দাও মা! আমরা যেন সত্য সত্যই সরল-প্রাণ শিশুর মত সমবেত কণ্ঠে একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারি। তোমার মঙ্গলময় স্নেহাশীর্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক; আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হই—ধন্য হই। মা! তুমি আমাদের ভক্তিহীন প্রণাম গ্রহণ কর।

———○———

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ইতি সাধন সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ নামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

———○———

মাতৃ-স্নেহ—উত্থান

জানন্তু বিশ্বে অমৃতস্য সত্তাঃ

স্নেহের সন্তান ! সত্যের মঙ্গল আহ্বান তোমার কর্ণে পৌঁছিয়াছে ? নিদ্রালস-নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া দূরাগত সত্যের আলোকরেখা দেখিতে পাইতেছ ? বহু জন্ম-জন্মান্তরের মোহনিদ্রা মায়ের আমার স্নেহ-শীতল করস্পর্শে বিদূরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে ? জাগিয়াছ, উঠিতে পার নাই ? নিদ্রার জড়তা এখনও দূর হয় নাই ? তা হউক— বৎস ! ঐ নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়াই উৎকর্ণ হইয়া থাক । অবিশ্রান্ত মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিতে থাক । আকর্ষণময় সে আহ্বান নিশ্চয়ই তোমাকে উঠাইবে—আহ্বান লক্ষ্যে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে । তোমার অনাদিকালের জড়তা বিদূরিত হইবে । শুধু একটু ব্যাকুলতা নিয়া শ্রবণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখ । যিনি তোমায় জাগাইয়াছেন, তিনিই তোমার উঠিবার শক্তি দিবেন, তিনিই তোমার প্রাণে আকুলতা আনিয়া দিবেন। সে আকুলতার প্রবল আকর্ষণে, তোমাকে বিষয়রূপ কূল পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে— মায়ের দিকে ধাবিত হইতেই হইবে ।

হায় ! স্বেচ্ছাকল্পিত মোহমদিরামত্ত পুত্রগণ ! তোমরা জড়ত্বের সংস্পর্শে যে সুখের আভাসমাত্র ভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, মায়ের কোলে বসিয়া মাতৃ-লীলাদর্শনে, ইহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক—ভূমাসুখের অনুভূতি পাইবে, অমৃতময় মাতৃ স্নেহ-ধারায় অভিষিক্ত হইবে, মায়ের আদরে আত্মহারা হইবে ।

তাই বারংবার ডাকিতেছি, —এস সন্তান ! এস অমৃতের পুত্রগণ ! যদি জাগিয়াছ, যদি জগৎকে সত্যেরই মূর্তি বলিয়া বুঝিয়াছ, যদি জড়কে চিন্ময়রূপে আদর করিতে শিখিয়াছ, যদি সর্বভূতে ভগবৎসত্তা দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, তবে এস, উঠিয়া দাঁড়াও ! আমার দিকে তাকাও, দেখ অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রতিনিয়ত আমারই আরতি করিতেছে । অগণিত বিশ্ব আমারই অঙ্গে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শোভা পাইতেছে । অগণিত জীব কোন্ অনাদিকাল হইতে আমারই পূজার অর্ঘ্যসম্ভার মস্তকে বহন করিয়া ছুটিতেছে । দেখ—এ ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে প্রতি পরমাণু আমারই উদ্দেশ্যে প্রাণাহুতি অর্পণ করিতেছে । উদ্দেশ্য—আত্মনিবেদন । উদ্দেশ্য—একবারমাত্র আমাকে দেখিয়া 'আমি'ময় হওয়া ।

রে বিন্দু বিন্দু প্রাণ আমার ! আর কতদিন বিক্ষিপ্ত-ভাবে থাকিয়া, সুখ-দুঃখের জন্য মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইবে ? আয় আয় ছুটিয়া মহাপ্রাণ-সমুদ্রের অভিমুখে। ভয় নাই ! আপনাকে হারাইবে না। আপনাকেই পাইবে। এখন যেটুকু পাইয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, উহা দুঃখমিশ্রিত, অতি অকিঞ্চিৎকর। উহাতে ইচ্ছার অভিঘাত আছে, অনভিলষিতের প্রাপ্তি আছে, জন্ম মৃত্যুর তাড়না আছে, রোগ শোকের অত্যাচার আছে। আর এখানে—কিছু নাই, অথচ সব আছে । পূর্ণ আনন্দ, কেবল অমৃত, কেবল স্নেহ—অফুরন্ত মাতৃ-করুণার ধারা । আর আছে —অব্যয় অচল জীবন—মহাসত্য ।

পুত্রগণ ! সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ; এইবার চৈতন্যে—প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হও ! তোমাদের শিরে শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ বর্ষিত হউক ।

—o—

মধ্যম চরিত

ঋষিছন্দঃ—উপোদ্‌ঘাত

মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুর্ঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা-
উষ্ণিক্‌ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তিঃ দুর্গা বীজং বায়ুস্তত্ত্বং
যজুর্বেদস্বরূপং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

মধ্যম-চরিত—মহিষাসুরবধ। ইহার ঋষি বিষ্ণু! যে সমষ্টি প্রাণ কর্তৃক এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পরিধৃত রহিয়াছে, তিনিই বিষ্ণু। রজোগুণের বহির্মুখ বিক্ষেপরূপ মহিষাসুর, এই মহাপ্রাণের অঙ্কেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাই বিষ্ণুই এই মধ্যমচরিতের দ্রষ্টা বা ঋষি। মহালক্ষ্মী দেবতা। লক্ষ্মী—প্রাণশক্তিরই অপর নাম। যতদিন দেহে প্রাণশক্তি বিরাজিত থাকেন, ততদিন আমাদের নামের পূর্বে লক্ষ্মীর অপর পর্যায় শ্রীশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যষ্টি প্রাণশক্তির নাম লক্ষ্মী এবং সমষ্টি প্রাণশক্তিই মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত। ইনিই পরাপ্রকৃতির রজোগুণাত্মিকা মহতীশক্তি। ইহাই রজোগুণের আত্মাভিমুখী ক্রিয়াশীলতা। বিষয়াসক্তিরূপ বিক্ষেপ ইহা দ্বারা নিহত হয়; তাই মহালক্ষ্মীই মধ্যমচরিতের দেবতা।

উষ্ণিক্ ইহার ছন্দঃ। এই চরিতে প্রবিষ্ট সাধকের প্রাণ প্রবাহ বা প্রাণায়াম, উষ্ণিক্ নামক বৈদিকচ্ছন্দের অনুরূপ স্পন্দনযুক্ত হইয়া থাকে। শাকম্ভরী শক্তি। শাকম্ভরী রহস্য পরে তৃতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। দুর্গা বীজ। দুর্গা শব্দের উত্তর হননার্থক আ-ধাতু হইতে দুর্গাশব্দ নিষ্পন্ন। যিনি যাবতীয় দুর্গতি হরণ করেন, তিনিই দুর্গা। মহিষাসুর নিহত হইলেই, মানবের দুর্গতির অবসান হয়। দুর্গতিহরণই এই মধ্যম চরিতের বীজ বা মূল কারণ।

বায়ু তত্ত্ব। প্রাণশক্তি যখন স্থূলতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বায়ুরূপেই ইহার অভিব্যক্তি হয়। শ্বাস প্রশ্বাসই প্রাণের বহির্লক্ষণ। তাই বায়ু ইহার তত্ত্ব।

যজুর্বেদ স্বরূপ। বায়ুতত্ত্বের বেদন বা অনুভূতি হইতেই যজুর্বেদ আজানিক শব্দরাশি প্রাদুর্ভূত হয়। তাই বায়ুদেবতার মন্ত্রই যজুর্বেদের প্রথম আরম্ভ। মহালক্ষ্মীর প্রীতি অর্থাৎ মহাপ্রাণময়ী মায়ের প্রীতি মহতী প্রীতিলাভ উদ্দেশ্যেই ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

———o———

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ—মহিষাসুর বধ

ঋষিরুবাচ ।

দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা ।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥১॥

অনুবাদ । ঋষি বলিলেন—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন, তখন পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল !

ব্যাখ্যা । মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে—আগামী-কর্মের বীজ ধ্বংস হইয়াছে । সাধক এখন আর নিত্য নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় না । কর্মক্ষেত্রে—দেহে অবস্থান করিলে বাধ্য হইয়া কর্ম করিতে হয়, তাই আসক্তিশূন্য হইয়া যথাসম্ভব উপস্থিত কর্মগুলি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে । কর্মের সফলতায় বিশেষ উল্লাস নাই, নিস্ফলতায়ও কোনরূপ হা হুতাশ নাই । সাধকের এইরূপ অবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও সৌভাগ্যের ফল বটে ; কিন্তু যে মাতৃঅঙ্কে নিত্য অবস্থানের আশায়—যে জীবভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিবার আশায়, সমাধি-সহায় সুরথরূপী জীবাত্মা বিজ্ঞানময়গুরু মেধসের কৃপা-প্রয়াসী হইয়াছিল, এখনও সে আশা পূর্ণ হয় নাই ; কারণ প্রজ্ঞা-চক্ষু যতই উন্মীলিত হইতে থাকে, অজ্ঞান অন্ধকার ধীরে ধীরে যতই অপসারিত হইতে থাকে, ততই সাধক স্বকীয় অলক্ষিত দোষরাশি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় । যেরূপ অতিশয় মলিন বস্ত্রে কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে তাহা লক্ষ্য করা যায় না ; কিন্তু সেই বস্ত্রখানা যতই পরিস্কৃত হইতে থাকে, পূর্বের অদৃশ্যপ্রায় চিহ্নগুলি যেন ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। সেইরূপ যতদিন জীব অজ্ঞানান্ধ থাকে, ততদিন নিজের দোষগুলি দেখিতে পায় না । তারপর যখন শ্রীগুরু-কৃপায় জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন সে নিজের অব্যক্ত দোষসমূহের প্রকট প্রকাশ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় ।

পরমাত্মামুখী— মাতৃ-অঙ্ক-প্রয়াসী জীব প্রথমে মনে করে — 'স্ত্রী-পুত্রাদি সংসার বন্ধনই পরমাত্ম-লাভের একমাত্র অন্তরায় । সংসার আশ্রম পরিত্যাগ না করিলে, আর কিছুতেই এ বন্ধনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই', কিন্তু শ্রীগুরু যখন চক্ষে অঙ্গুলিপ্রদানপূর্বক দেখাইয়া দেন যে, স্ত্রীপুত্রাদি সংসার বন্ধন নহে, অন্তরের সংস্কাররাশিই যথার্থ বন্ধন । সংসার অন্তরেই অবস্থিত । যতই নিভৃত স্থানে পর্বতকন্দরে অবস্থান করা যাউক না কেন, কিছুতেই সংসার ছাড়ে না । সাধক যখন মর্মে মর্মে ইহা অনুভব করিয়া সংসারের মূল উৎপাটন করিতে যত্নবান হয়, তখন জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে গুরুকৃপায় সুপ্তপ্রায় প্রাণশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আগামি কর্মের বীজরূপী মধুকৈটভকে নিধন করে । সংসার-মহামহীরুহের একটি মূল উৎপাটিত হয় । কিন্তু অপর দুইটি মূল আরও গভীরভাবে প্রোথিত থাকায়, উহা সহসা উন্মূলিত হয় না ।

সাধক ! তুমি মা মা বলিয়া যতই আকুলপ্রাণে মায়ের কোলে উঠিবার জন্য অগ্রসর হও, চতুরা ছলনাময়ী মা ততই যেন একটু একটু করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান । কিছুতেই তাঁহাতে একেবারে আত্মহারা হওয়া যায় না, কিছুতেই সবটা প্রাণ মহাপ্রাণময়ী মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া বহুত্বের—চঞ্চলতার হাত হইতে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারা যায় না—মাও যেন তাঁহার স্নেহময় আলিঙ্গনে সন্তানকে চিরতরে বক্ষে বাঁধিয়া রাখেন না, একবার একবার কোলে তুলিয়া আবার ছাড়িয়া দেন । মা তাঁহার পূর্ণ আকর্ষণময় প্রজ্ঞাচক্ষুতে জীবের চক্ষু চিরতরে মিলাইয়া লয়েন না । কেন এরূপ হয় ? দুর্জয় অসুর মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে, অভিনব আশার মূল উৎপাটিত হইয়াছে ; তথাপি কেন আমি মাতৃবক্ষে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারি না ? এইরূপ ভাবের দ্বারা সাধক যখন উৎপীড়িত হয় ; ইহার কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া গুরুর

চরণে শরণাপন্ন হয়, তখন বিজ্ঞানময় গুরু সাধকের সম্মুখে যে চিত্র উদ্ঘাটিত করেন, তাহাই মহিষাসুর-বধ বা বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ নামে ব্যাখ্যাত হইবে।

মধুকৈটভ বধের অবসানে মহর্ষি মেধস্ সুরথকে বলিয়াছিলেন, **'ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে'**। তিনি জানিতেন—এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, মধুকৈটভ বধে দেবীর যে মহত্ত্ব দর্শিত হইল, তাহাতে সুরথের আশা সম্পূর্ণ মিটিবে না ; জীবত্বের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিতেও আশার একান্ত অবসান হয় না ; জীব যতদিন পূর্ণভাবে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে না পারে, যতদিন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন এ আশার নিবৃত্তি হয় না। ইহা বুঝিতে পারিয়াই শিষ্যকে জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া অন্তর্যামী বিজ্ঞানময় গুরু আবার বলিতে থাকেন। তাই অধ্যায়ের প্রথমেই **'ঋষিরুবাচ'** উল্লিখিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— হে বৎস সুরথ ! তোমার ভবিষৎ কর্মবীজ ধ্বংস হইলেও সঞ্চিত কর্ম এখনও বিধ্বস্ত হয় নাই। উহারা যে বহুত্ব বিষয়ক ফল প্রসব করিবে, তাহার কোন প্রতীকার করা হয় নাই। তুমি নুতন আর কিছু নাই বা চাহিলে, নিত্য নূতন বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় নাই বা ছুটিলে, অভিনব আশার মোহিনী মূর্তি তোমায় অভিভূত নাই বা করিল ; কিন্তু তুমি যে বহুত্ব চাহিয়া আসিয়াছ, বহুদিন, বহুজন্ম, জন্মান্তর ধরিয়া যে অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তাহারা যে পুঞ্জীভূত বহুত্বের সংস্কাররূপে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া তোমার চিত্তক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে। চাহিয়া দেখ—তোমার সঞ্চিত সংস্কাররাশি এখনও অক্ষুণ্ণভাবে স্বাধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে বিধবস্ত না করিলে তোমার নিরবচ্ছিন্ন ভূমাসুখের আশা নাই। কিন্তু ভয় নাই বৎস, আমি তোমার মা, গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি ; এখন স্বয়ং অসি হস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার যাবতীয় সংস্কার বিলয় করিয়া দিব। তুমি শুধু আমারই অঙ্কে অবস্থান করিয়া, একাগ্র হৃদয়ে আমার কর্মশৃঙ্খলা—আমার অপূর্ব লীলা দর্শন করিয়া যাও। মুগ্ধ সন্তান ! ভীত সন্ত্রস্ত পুত্র ! যখন মা বলিয়া ডাকিয়াছ, যখন আমাকেই একান্ত আশ্রয় বলিয়া বুঝিয়াছ, আমার মহাপ্রাণে তোমার প্রাণ মিলাইয়া লইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিয়াছ, তখন আর ভয় নাই। আমি তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরতরে আমারই অঙ্গে মিলাইয়া লইব। তুমি ধন্য হইবে।

ভাবিও না জীব, ইহা শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস— ভাষার ঝঙ্কার মাত্র। সত্য সত্যই তুমি একবার সরল প্রাণে মা বলিয়া ডাক, সত্য সত্যই তুমি আমাকে তোমার একান্ত আশ্রয় বলিয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি কর, দেখিবে তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমার সকল সাধনা, সকল বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইব। তুমি সুখে দুঃখে নির্বিকার, আনন্দময় নগ্ন শিশুর ন্যায় আমারই স্নেহময় অঙ্কে অবস্থান করিয়া, দ্রষ্টা বা সাক্ষিমাত্র-স্বরূপে অবস্থান করিবে। তোমার আধারের কল্পিত অপবিত্রতা আমিই পবিত্র করিয়া দিব। তোমার জন্ম-জীবন পুণ্যময় হইবে।

এই মধ্যম চরিত্রে পূর্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার সমূহই অসুর রূপে বর্ণিত হইবে। জীব বহুজন্মব্যাপী নানাবিধ বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠানে, কিংবা যোগ তপস্যাদির সাহায্যে, অথবা জ্ঞান ভক্তির অনুশীলনে পরমাত্ম বিষয়ক সংস্কারসমূহ সঞ্চয় করে। উহারাই দেবতা, অর্থাৎ—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমূহের যে পরমাত্মাভিমুখী গতি বা মিলন প্রয়াস, উহাই দেব শক্তি নামে অভিহিত। আর উক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে বিষয়াভিমুখী লালসা, উহারাই সুর-বিরোধী অর্থাৎ অসুর নামে কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান যে দেবাসুর সম্পদ বিভাগ করিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া আবশ্যক। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানের উপায়ে একান্তনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, নির্লোভ, মৃদুতা, লজ্জা, ধীরতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অদ্রোহ, এবং নিরভিমান, এই সকল দেবতাদের সম্পদ অর্থাৎ দেবশক্তির কার্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং ইহার বিপরীতগুলি অর্থাৎ ভয়, অশুদ্ধি প্রভৃতি এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান, এই সকল আসুর সম্পদ বা অসুর শক্তির কার্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যপনিষদেও প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত হইয়াছে **'দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে'**। ভগবান শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, **'দেবা দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ,**

অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, সংগ্রামং কৃতবন্তঃ । **শাস্ত্রীয়প্রকাশ বৃত্ত্যাভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ । তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়-বিবেক জ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিক তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ, ইত্যন্যোঽন্যাভি-ভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।'**

ইহার তাৎপর্য—'জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল হইতে দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে । শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেবতা, আর তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বৃত্তি সকল অসুর । উভয় পক্ষই পরস্পরের বিষয় অপহরণে সমুদ্যত হইয়া নিয়ত-সংগ্রাম করিতেছে । প্রাণিগণের শরীরে উভয়বিধ বৃত্তিই আছে । শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয়ভোগবাসনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি । এই উভয়বৃত্তিরই দ্বেষ্য দ্বেষকভাব অনাদিসিদ্ধ' । এইরূপে আমরা গীতা, উপনিষদ এবং জগদগুরু শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হইতে দেবাসুর ও তাহাদের পরস্পর সংগ্রাম-রহস্য অবগত হইয়া দেবীমাহাত্ম্যে অবগাহন করিব । পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্রে যদিও দেবাসুর প্রভৃতির এইরূপ আধ্যাত্মিক রহস্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ দুই শ্রেণীর প্রাণী যে থাকিতে পারে না, এ প্রকার ধারণা করিবারও কোন হেতু নাই । স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, তিনিই সমান সত্য । এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে ।

যখন মহিষ নামে অসুরগণের রাজা এবং পুরন্দর দেবগণের রাজা অর্থাৎ ইন্দ্র ছিলেন, তখনই এই দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল !

মহিষাসুর—রজোগুণ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, **'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব'** —কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয় । আবার অন্যত্র মানসপূজা-বিধানেও কথিত আছে—**'ক্রোধঞ্চ মহিষং দদ্যাৎ'** অর্থাৎ ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করিবে । যদিও এস্থলে কেবল ক্রোধকেই মহিষরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি আমরা মহিষ শব্দে কেবলমাত্র ক্রোধকে না বুঝিয়া, যাহা হইতে ক্রোধের অভিব্যক্তি, সেই রজোগুণকেই মহিষাসুর বুঝিয়া লইব । বাস্তবিক চণ্ডীর তিনটি রহস্য গুণত্রয়ের বিশ্লেষণ মাত্র ! প্রথম চরিত্রে সত্ত্বগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কারদ্বয় মধুকৈটভ নামে বর্ণিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় চরিত্রে রজোগুণের বহির্মুখী বিকাশের জন্য যে সঞ্চিত বহুত্ব-সংস্কার, তাহাই অসুরবৃন্দরূপে বর্ণিত । 'এক আমি বহুভাবে প্রকাশ হইব,' এই ভাবটি বিদূরিত হইয়াছে ; কিন্তু যে বহুত্ব আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছি অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বহুত্ব-বিষয়ক সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা ত' দূরীভূত হয় নাই, তাহাই এই মধ্যম চরিত্রে বর্ণিত অসুরনিকর । রজোগুণ হইতে ইহাদের অভিব্যক্তি হয়, যাবতীয় কামনা বাসনা এবং ভগবদ্গীতোক্ত দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি যাবতীয় অসুর-সম্পদ এই রজোগুণেরই স্থূল বিকাশমাত্র । তাই রজোগুণরূপী মহিষাসুর ইহাদের অধিপতি ।

আবার অন্যদিকে রজোগুণের অন্তর্মুখী বিকাশ-সমূহই দেবতা । পুরন্দর ইহাদের অধিপতি । পুরকে যিনি বিদারণ বা ধ্বংস করেন, তাহাকেই পুরন্দর কহে । এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরকে বিদীর্ণ করিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবোধ বিলয় করিয়া দেহত্রয়াতীত অবস্থাত্রয়াতীত গুণত্রয়াতীত পরমাত্মসত্তায়—মাতৃ-অঙ্কে, সম্যক্ মিলিত হইবার জন্য যে প্রয়াস তাহাই পুরন্দর নামে অভিহিত । ইনি দেবগণের অধিপতি । সমস্ত দেবশক্তি, অর্থাৎ অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি ইহারই অনুবর্তন করে। যাবতীয় দেবভাব এই পুরন্দরের আজ্ঞানুবর্তী ।

এস্থলে ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক । মনে কর, বিশুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ নির্বিকল্প নিরঞ্জন পরমাত্মসত্তায় একটি অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান রহিয়াছে । ঐ অজ্ঞানের স্বরূপ—'আমাকে আমি জানি না'। এই অজ্ঞানটিও কিন্তু জ্ঞানবক্ষেই বিদ্যমান ; কারণ 'জানি না' এই যে অজ্ঞান, ইহাও বস্তুতঃ একটি জ্ঞান মাত্র। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ অপূর্ব মিলনকেই মায়া বা লীলা বা পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ বলা হয় । জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ, তিনি যদি মনে করেন, 'আমি জানি না,' তাহা হইলে সে মনে করাকে লীলাই বলিতে হইবে । প্রাপ্তবয়স্ক পিতা যেরূপ স্বকীয় জ্ঞান-গৌরব বিস্মৃত না হইয়াও শিশু পুত্রের সহিত বালকের ন্যায় খেলা করিয়া নির্মল আনন্দভোগ করেন, ইহাও ঠিক সেইরূপ ; যাহ হউক, পরমাত্মা— চিন্ময়ী মা 'আমাকে

জানি না' বলিয়া জানিবার জন্য একবার স্পন্দিত হন, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যে আত্মস্বরূপ অবগতির জন্য স্বেচ্ছাকল্পিত একটা স্ফুরণ হয়—একটা চঞ্চল ভাব লক্ষিত হয়—ইহারই নাম রজোগুণ। ঐ প্রথম স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই, উহার উভয়পার্শ্বে আরও দুইটি স্পন্দন অভিব্যক্ত হয় । উহার একটি প্রকাশ এবং অন্যটি স্থিতি। প্রথম স্পন্দনে পরমাত্মার যে বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়, ঐ বিশিষ্টভাবে আপনাকে জানার নাম প্রকাশ বা সত্ত্বগুণ এবং ঐ প্রকাশাত্মক রজোগুণকে যে স্পন্দনে ধরিয়া রাখে, তাহার নাম স্থিতি বা তমোগুণ । ইহারা পরস্পর সংসর্গী— একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি থাকে না । আবার পরস্পর পরস্পরকে সম্যক্ অভিভূত করিবার জন্যও প্রয়াসী । এই গুণত্রয় যেমন বহির্মুখী স্পন্দন-ধর্ম বিশিষ্ট, সেইরূপ অন্তর্মুখী । পূর্বেই বলিয়াছি— জ্ঞান অজ্ঞান সম্মিলিত সত্ত্বার উপরেই এই ত্রিবিধ স্পন্দন হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহাদের যেরূপ অজ্ঞানাভিমুখী অভিব্যক্তি আছে, সেইরূপ জ্ঞানাভিমুখী অভিব্যক্তিও বিদ্যমান । যে স্পন্দনগুলি অজ্ঞান অর্থাৎ 'আমাকে' না জানাটাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয়, তাহাদের নাম অসুর ; আর যে স্পন্দনগুলি জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসত্তা উদ্‌বুদ্ধ করিবার পক্ষে সহায় হয়, তাহাই দেবতা।

বিষয়টি নিতান্ত সহজ নয় । যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তায় অভ্যস্থ নহেন , তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুষ্পাচ্য বলিয়াই মনে হইতে পারে । তাই সংক্ষেপে ও সরলভাবে আবার পূর্বোক্ত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক । 'আমাকে আমি জানি না' বলিয়া জানিবার জন্য যে একটা উদ্যম বা চেষ্টা উহারই নাম রজোগুণ । সেই চেষ্টার ফলে যে একটু একটু করিয়া আমাকে জানা বা বোধ করা , তাহাই সত্ত্বগুণ । আর সেই একটুখানি 'আমি' বোধটিকে ধরিয়া রাখার নাম তমোগুণ। ইহাই যোগশাস্ত্রোক্ত প্রখ্যা, প্রবৃত্তি এবং স্থিতি, অথবা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় অবস্থা ! গীতায় ইহাই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেশ ধীরভাবে এই ত্রিগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া না লইলে, দেবাসুর-সংগ্রাম বুঝিবার উপায় নাই । আবার বলি সত্ত্বগুণ —প্রকাশশীল ভাব, রজোগুণ—ক্রিয়াশীল ভাব এবং তমোগুণ—এতদুভয়ের ধৃতি বা ধারণশীল ভাব। ইহারা নিয়ত পরিণামী, অর্থাৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল । জড় জগৎ এই গুণত্রয়ের পরিণাম । ব্রহ্মাবধি জড় পরমাণু পর্যন্ত, সকলই এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগ ও সংমিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

সুখ দুঃখাদিও এই ত্রিগুণাত্মক । যেখানে বেশী চেষ্টায় অর্থাৎ অত্যধিক ক্রিয়াশীলতায় ঈষৎমাত্র আত্মবোধ স্ফুরিত হয়, তাহাকেই লোকে দুঃখ বলে । কারণ সেস্থানে ক্রিয়াভাব বেশী, প্রকাশ ভাব কম। যেস্থানে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রকাশ ভাব বেশী, রজোগুণের ক্রিয়া অর্থাৎ চাঞ্চল্য কম, তাহাই সুখ । আর যখন তমোগুণের ক্রিয়া প্রবল হয়, প্রকাশভাব মোটেই থাকে না,সুখ দুঃখ কিছুই বোধ থাকে না , উহার নাম মোহ ।

সত্ত্বগুণের চরম পরিণতি—অখণ্ড প্রকাশ অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মবোধের স্ফুরণ, যাহাকে বিশুদ্ধ-আত্মবোধ কহে । ঐ অবস্থায় উপনীত হইলেই রজোগুণেরও চরম পরিণাম হয় । ইহারই নাম পরবৈরাগ্য অর্থাৎ 'আমি কে' তাহা জানার জন্য যে উদ্যম, তাহার অভাব। এইরূপ তমোগুণের চরম পরিণতি নিরোধ, অর্থাৎ পুনরায় রজোগুণের যে উদ্বোধ, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা ।

এইরূপ গুণত্রয়ের দুই দিক পাওয়া গেল । একদিকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—জীব জগৎ জন্ম মৃত্য সুখ দুঃখ ইত্যাদি । আর অন্য দিকে অখণ্ড প্রকাশ, পর-বৈরাগ্য এবং নিরোধ । কথাটা আরও সহজ করিয়া বলিলে বলিতে হয়—এক দিকে ভোগ অন্য দিকে অপবর্গ বা মুক্তি । গুণত্রয়ের এই ভোগাভিমুখী গতির নাম অসুরভাব এবং অপবর্গাভিমুখী গতির নাম দেবভাব। এই দেবাসুর সংগ্রাম অনাদিকাল হইতে প্রতি জীবে সংঘটিত হইতেছে । যেদিন এই সংগ্রামের অবসান হইবে, সেইদিন জীব গুণত্রয়ের পরপারে চলিয়া যাইবে ; ভোগ বা অপবর্গ , বন্ধন কিংবা মুক্তি, এই উভয় ধাঁধাই চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইবে ।

এই মধ্যম চরিত্রে আমরা যে সকল অসুরের নাম পাইব, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া রাখিতেছি । মহিষাসুর—অসুরগণের রাজা এবং চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, করাল, উদ্ধত, বাস্কল, তাম্র, অন্ধক, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য, মহাহনু , বিড়াল, দুর্দ্ধর, দুর্মুখ ও অসিলোমা—সর্বশুদ্ধ

এই ষোলজন প্রধান অসুরের নাম পাওয়া যাইবে। উহারা যথাক্রমে—রজোগুণ, বিক্ষেপ, আবরণ, দর্প, ভয়, দম্ভ, ভোগাভিলাষ, লোভ, মোহ, ক্রোধ, শারীরিক বল, অভিমান, দোষদৃষ্টি, অক্ষমা, নিষ্ঠুরতা এবং দ্বেষ নামে ব্যাখ্যাত হইবে। যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এইবার আমরা প্রকৃত প্রস্তাবের সম্মুখীন হইব। মহিষ ও পুরন্দর শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে ? যখন এক দিকে মহিষ ও অন্য দিকে পুরন্দর যথাক্রমে অসুর দেবগণের অধিপতি হইয়া পরস্পর পরস্পরের শক্তিক্ষয় করিতে উদ্যত হয়, তখনই এই দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া থাকে ! যদিও প্রত্যেক জীবদেহে প্রতিনিয়ত এই দেবাসুর সমরাভিনয় চলিতেছে, একদিকে ভোগের বাসনা অন্যদিকে অপবর্গের আকর্ষণ, এই উভয়ের পরস্পর সংঘর্ষ প্রতি পরমাণুতে প্রতিক্ষণে সংঘটিত হইতেছে ; তথাপি জীব যতদিন মনুষ্যত্বে উপনীত না হয়, যতদিন বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ সংহরণ করিতে না পারে, ততদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। বহু জন্মসঞ্চিত সুকৃতির ফলে, মায়ের অসীম করুণাবলে, শ্রীগুরুর অহৈতুক অনুপ্রেরণায় যখন সাধক-হৃদয়ে এই সংগ্রাম অনুভূত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে। শীঘ্রই এই সংগ্রামের অবসান হইবে। সাধক ! দেখ — একদিকে তোমার সঞ্চিত সংস্কারসমূহ আসুরিক শক্তি প্রয়োগে তোমায় নির্জিত করিতেছে, তোমার মাতৃ-অঙ্ক লাভের প্রাণাকুল পিপাসাকে দমিত করিয়া রাখিতেছে। বুঝিতে পারিতেছ—অভয় সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি দেবশক্তি—যাঁহারা তোমার মাতৃ-অঙ্কলাভের একান্ত সহায়, যাঁহারা তোমাকে শান্তির–অমৃতের হিরন্ময় মন্দিরে উপনীত করিবার অদ্বিতীয় সহচর, সেই দেবশক্তি অধুনা দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি অসুর কর্তৃক নিয়ত লাঞ্ছিত —উৎপীড়িত। দেখিয়া ব্যথিত হও, আর্ত হও, শরণাগত হও, আর ভূমিতলে লুটাইয়া কাতর স্বরে 'মা' বলিয়া ডাক ! মহাশক্তির কাছে সজল নয়নে শক্তি ভিক্ষা কর। সরল প্রাণে আপনাকে যথার্থ উৎপীড়িত বলিয়া অনুভব কর। দেখিবে — 'মা' স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অসুরকুলের বিলয়, দেবকুলের আনন্দ এবং তোমাকে মধুময় অব্যয় মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিয়া ধন্য করিবেন। এস, 'আমার মা' বলিয়া সরলপ্রাণ শিশুর মত মাতৃ-চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম হই।

যাহা হউক, এই দেবাসুর সংগ্রাম পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী হইয়াছিল—**পূর্ণমব্দশতম্‌** । মানুষের আয়ুর পরিমাণ শতবর্ষ—**'শতং বৈ পুরুষাণামায়ুঃ'** । সত্যযুগে লক্ষ-বর্ষব্যাপী আয়ু ছিল বলিয়া যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে উহার তাৎপর্য অন্যপ্রকার। সকলযুগেই মানুষের সাধারণ আয়ুর পরিমাণ শতবর্ষ। তবে যোগাদি শক্তির প্রভাবে কেহ উহার মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী মতে গ্রহগণের দশা গণনার রীতি প্রচলিত আছে, উহাও কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ আয়ুর প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। ঐ উভয় মতে মানুষের আয়ুর পরিমাণ একশত আট, এবংএকশত কুড়ি বৎসর মাত্র পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়—একশত বংসর পরও মানুষ কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহাতে শ্রুতির মর্যাদা বিনষ্ট হয় না। তৎকালিক মাস, বর্ষ প্রভৃতি গণনার সহিত, বর্তমান গণনারও কিঞ্চিত পার্থক্য আছে ; সুতরাং ও সকল কথা লইয়া বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

পূর্ণ শতবর্ষ শব্দের তাৎপর্য—একটি পূর্ণ মনুষ্যজীবন। অর্থাৎ পূর্ণ এক জীবন ধরিয়া এই দেবাসুর সংগ্রাম অনুভূত হইতে থাকে। **'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে'**। বহু বহু জন্মের পর মানুষ জ্ঞানবান হয়, তারপর আমাকে—আপনাকে—'মাকে' জানিতে পারে। একটু একটু করিয়া 'মাকে' জানিতে আরম্ভ করিলে তখন এই সমরের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ণ একটি মনুষ্য-জীবনব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম অনুভব করিতে হইলে, বহু জন্ম-মৃত্যু অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ, সাধারণতঃ আমাদের আয়ুর পরিমাণ ষাট বৎসর মাত্র। তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসর আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্যে অতিবাহিত হয়। বাকী ত্রিশ বৎসরের বাল্য, বার্দ্ধক্য এবং রোগ-শোকাদি অবস্থার সময় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অতি সামান্যমাত্র। সে সময়টাও অর্থোপার্জন, বিষয়-চিন্তন প্রভৃতি কার্যে অতিবাহিত হয়। সুতরাং একটা জীবনের মধ্যে কয় মুহূর্ত আমরা দেবাসুর সংগ্রাম অনুভব করিতে পারি ?

আমাদের বর্তমান জীবন যথার্থ জীবন পদবাচ্যই নহে। কারণ, জীবন বলিলে গতিশক্তি-বিশিষ্ট জীবন বুঝা যায়। মনে কর—একখানা বাষ্পীয় শকট (ইঞ্জিন)। প্রত্যহ কয়লা, জল ও অগ্নির সংযোগে বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে ; কিন্তু শকটখানি একটুও অগ্রসর হইল না। যেখানে নির্মিত হইয়াছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া ষাট বৎসর ব্যাপিয়া কেবল কয়লা জল ও বাষ্প অপচয় করিল মাত্র। ঠিক সেইরূপই আমাদের এক একটা জীবন বৃথা ব্যয়িত হইতেছে না কি ? প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় এই দেহটার ভিতর প্রদান করা হইতেছে ; উদ্দেশ্য—অগ্রসর হওয়া, উদ্দেশ্য—দেবাসুর সংগ্রাম অনুভব করা, উদ্দেশ্য—অসুরনিধন-কারিণী মায়ের চণ্ডমূর্তি দর্শন ; কিন্তু তাহা হয় কি ? **'যত্রৈব জায়তে তত্রৈব ম্রিয়তে'**। এইরূপ জীবনের এক জীবন কেন, শত জীবন অতিবাহিত হইলেও বোধ হয় পূর্ণ একটি মনুষ্যজীবন-ব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম দর্শন হয় না।

যাঁহারা বলিবেন—আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে ওরূপ যুদ্ধ দেখিবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছাপূর্বক খাল কাটিয়া নিজের বাড়িতে কুমির আনিবার কোন আবশ্যকতা নাই, সাধ করিয়া কেন আমরা অশান্তি ভোগ করিতে যাইব ? এ সাধন-সময় তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা সুরথ হইয়াছেন, যাহারা আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত বলিয়া আপনাকে বুঝিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই এই সংগ্রাম দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, দেবাসুর-সংগ্রাম বহুবর্ষব্যাপী হইয়া থাকে ; সুতরাং এই মন্ত্রে বহুকাল অর্থে 'শতবর্ষ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিলে কোন ক্ষতি নেই। আর—পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতেই যে এই যুদ্ধের সুচনা হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'পুরা' শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, আজ যে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিবার বা আলোচনা করিবার মত ধী-বৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, উহা দুই এক জন্মের সুকৃতির ফল নহে। বহু জন্ম ধরিয়া সুকৃতি অর্জন করিলে, তবে 'মায়ের কৃপা' নামে একটা জিনিস উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এবং তাহারই ফলে ক্রমে এ সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা আসে। তবে একটা কথা—যদি কেহ নিজের ভিতরে অহর্নিশ ঐরূপ দেবাসুর সংগ্রাম অনুভব করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবন পুণ্যময়, তাঁহার দর্শন সুকৃতি দান করে, তাঁহার আশীর্বাদ অমোঘ, তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার, তাঁহার দেহস্পর্শে বায়ুমণ্ডল পূত হয়, তাঁহার চরণ স্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্রীকৃত হয়। জীব ! তুমি কি আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে এরূপ যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছ ? না দেখিয়া থাক, তবে গুরু বলিয়া 'মায়ের' চরণ জড়াইয়া ধর, মা-ই তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবেন। তখন দেখিতে পাইবে— তোমার হৃদয়ক্ষেত্র ভীষণ সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

———○———

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সেই যুদ্ধে মহাবীর্য অসুরগণ কর্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইয়াছিল এবং দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্র হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অসুর বল—অমিতবীর্য। বহুজন্ম হইতে বহির্মুখ কর্মপ্রবণতার অভ্যাসে এমনি একটি অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের চিত্ত নিয়ত রূপ-রসাদি বিষয়াভিমুখী বৃত্তিপ্রবাহ লইয়া অবস্থান করিতেই স্বস্তিবোধ করে। কিছুতেই অন্তর্মুখী—মাতৃ-মুখী হইতে চাহে না। সেই নিস্তরঙ্গ চিন্ময় উদারক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে চায় না। ইহাই অসুরগণের অসীম বীর্যবত্তার লক্ষণ। অন্য দিকে দেবসৈন্য—ভগবৎমুখী বৃত্তি-নিচয়, উহারা বড়ই দুর্বল ; কারণ, অতি অল্পদিন মাত্র উহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সদ্ভাবনিচয় এখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ অসুরগণ-কর্তৃক দেবশক্তিকে নির্জিত হইতে হইবে।

মনে কর—একখণ্ড বৃহৎ ইস্পাত (স্প্রিং)। তুমি উহাকে ঘুরাইয়া সঙ্কোচভাবাপন্ন করিয়া দিলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা শক্তির প্রভাবে উহা প্রতিক্ষণে প্রসারণের দিকেই বেগ দিতে থাকে। কিন্তু একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর যদি উহার উপর চাপ দিয়া রাখা যায়, তবে সেই ইস্পাতের যে স্বাভাবিক প্রসারণী শক্তি, তাহা প্রতি মুহূর্তে গতিযুক্ত হইয়াও নিরুদ্ধবৎ অবস্থায়ই থাকে ; অসুরকর্তৃক দেবতাবর্গের নিগ্রহও কতকটা এইরূপ।

সাধক ! তোমার চক্ষুকে তুমি **'রূপং দেহি'** বলিয়া জগৎময় যে মায়েরই রূপরাশি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য নিযুক্ত করিলে ; প্রাণপণে তোমার দৃক্‌শক্তিকে মায়ের রূপে নিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলে ; কিন্তু চক্ষু জগতের রূপ লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইল । এইরূপ কর্ণকে— সকল শব্দের অন্তর্নিহিত নিত্যনাদ প্রণব ধ্বনিতে, কিংবা স্বোচ্চারিত কোন বিশিষ্ট মন্ত্রাদি শ্রবণে নিযুক্ত করিলে ; কিন্তু সে ক্ষণকাল মধ্যে জগতের ব্যর্থ শব্দ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল । মনকে কেন্দ্রস্থ করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় নিলিত করিয়া দিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সে পূর্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ বৈষয়িক সঙ্কল্প-বিকল্প করিতে লাগিল । এইরূপে দেবাসুর যুদ্ধ সংঘটিত হয় । যিনি যথার্থ সৌভাগ্যবান—যাহার অমৃতলাভ নিকটবর্তী হইয়াছে, মাত্র তিনিই এই যুদ্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন ।

সে যাহা হউক, এই যুদ্ধে প্রথমতঃ দেবগণ পরাজিত হন । অন্তর্মুখী আকর্ষণশক্তি নির্জিত হয় । যদিও অন্তরে অন্তরে একটা মাতৃ-মুখী আকর্ষণ নিয়তই রহিয়াছে ; তথাপি বিকর্ষণ অর্থাৎ অনুলোম গতির প্রভাব যতদিন বেশী থাকে, ততদিন এই যুদ্ধ উপলব্ধিই হয় না । তারপর যখন মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে আকর্ষণ শক্তি একটু প্রবল হইতে থাকে, তখনই বিরোধী দলের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । এই সংঘর্ষের প্রথম ফল—পরাজয় । কেন এ পরাজয় সংঘটন হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

যখন দেবগণ নির্জিত, তখন মহিষ—(রজোগুণের বহির্বিকাশ) ইন্দ্রত্ব লাভ করিল । সমস্ত দেবশক্তির উপরে প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য লাভ করিল । মহিষ এতদিন মাত্র অসুরশক্তির পরিচালক ছিল এইবার দেবশক্তিও উহার অধীন হইয়া পড়িল ।

ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর— রজোগুণের অন্তর্মুখী চরম পরিণতির ফল—পর-বৈরাগ্য। যাবতীয় শক্তি-প্রবাহকে সম্যক্ ভাবে সংহরণ করাই রজোগুণের অন্তর্মুখী ক্রিয়া । ইহারই নাম পুরন্দর । এই পুরন্দর (পুরবিদারণকারী) যখন দেবশক্তির অধিপতি থাকে, তখন বহির্মুখী বৃত্তি প্রবাহের পূর্ণরূপে সংহরণ কার্য চলিতে থাকে । এবং তাহারই ফলে পর-বৈরাগ্য সমাগত হয় । কিন্তু এইবার মহিষ দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছে । বাহিরের দিকে বা বিষয়ের ক্রিয়াশীলতাই উহার স্বভাব ; সুতরাং দেবশক্তি সমূহকেও সে বহির্মুখ করিয়া ফেলিবে । দয়া, ক্ষমা, উদারতা, নিস্পৃহতা প্রভৃতি দেবভাব অসুর কর্তৃক নির্জিত থাকিলে আর পর-বৈরাগ্যের আশা নাই । কার্যতঃ যাবতীয় কর্মের বীজ ধ্বংস না হইলে কিছুতেই পর-বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে না ।

খুলিয়া বলি—রজোগুণের দুই দিক । উহার একদিকে পর-বৈরাগ্য অন্য দিকে ভোগাসক্তি । উহারাই যথাক্রমে পুরন্দর ও মহিষাসুর । পর-বৈরাগ্যের স্বরূপ—সর্বস্বত্যাগ, দেহ, মন, ইন্দ্রিয় পর্যন্ত পরিত্যাগ ; আর ভোগাসক্তির স্বরূপ— সর্বস্ব গ্রহণ । পুরন্দর চায় মোক্ষ, মহিষ ভোগ । যতদিন মোক্ষবাসনা প্রবল না হয়, ততদিন মহিষকর্তৃক পুরন্দর নির্জিত হইবেই । মহিষ ইন্দ্রত্বলাভ করিবেই ।

———০———

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ গরুড়ধ্বজৌ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । অনন্তর পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া, যেখানে শিব এবং বিষ্ণু ছিলেন, তথায় গমন করিলেন ।

ব্যাখ্যা । পদ্মযোনি ব্রহ্মা । ইনি যাবতীয় ভাবের অধিপতি ; তাই ইহাকে প্রজাপতি কহে । ভাব ও প্রজা যে একই কথা, ইহা প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে । উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,**'উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ'** অর্থাৎ সুর এবং অসুর—উভয়েই প্রজাপতি হইতে সমুদ্ভূত। দেবশক্তি এবং অসুরশক্তি উভয়েই মনের ভাব । মনের যে অংশে অসুরের আধিপত্য বিস্তার হয়, সেই অংশ প্রজাপতি হইলেও পদ্মযোনি নহে । নাভি বা মণিপুরপদ্ম হইতে নিম্নদিকে অসুরের ক্ষেত্র, এবং ইহার ঊর্ধ্বে দেব-ক্ষেত্র । নাভি-কমল হইতেই ব্রহ্মার উদ্ভব । মনের যে অংশ পরমাত্মাভিমুখী হইয়াছে— যে অংশে যথার্থ মাতৃলাভের বাসনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই পদ্মযোনি । তাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্য-বৃন্দ বিষ্ণু ও শিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন । বিষ্ণু —প্রাণশক্তি , শিব—জ্ঞানশক্তি । বিষ্ণুর স্থান হৃদয়পদ্ম বা অনাহত, এবং শিবের স্থান—ললাট বা আজ্ঞাচক্র।

অতএব পরাজিত দেবতাগণ পদ্মযোনিকে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, কথাটির তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মাভিমুখী ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত মন আসুরিক ভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ ও জ্ঞানের সমীপস্থ হইলেন।

সাধকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন—সবটা মন দিয়ে মাকে চাওয়া যায় না, আবার সবটা মন দিয়ে জগদ্‌ভোগও করা যায় না। মনের একদিকে যেমন মাতৃ দর্শন লালসা, মাতৃ-মহত্ব শ্রবণে ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠে, অন্য দিকে ঠিক সেইরূপই স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়বাসনার বিলাস চলিতে থাকে। মনের একদিকে দেখিতে পাই—দেবরাজ পুরন্দরের কর্তৃত্ব, অন্যদিকে অসুররাজ মহিষের আধিপত্য—উৎপীড়ন। এই উৎপীড়নের ফলে প্রথমতঃ দেবশক্তি নির্জিত হয়। প্রাণ ও জ্ঞানশক্তি সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-মুখী না হইলে, মনের পূর্ণ বল লাভ হইতে পারে না ; তাই মনকে বাধ্য হইয়া উহাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইতিপূর্বে যে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া মধুকৈটভ নিধন করিয়াছে, যে বিজ্ঞানময় গুরু মেধসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞান দূর করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহাদের চরণে পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই এই অসুর অত্যাচার বিদূরিত হইবে ; ইহাই প্রজাপতির আশা।

মন কিরূপে প্রাণ ও জ্ঞানের শরণাপন্ন হইবে ? প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির সত্তা ব্যতীত মনের যে কোন পৃথক সত্তা নাই, মন যে সম্যক্‌ভাবে তাঁহাদের সত্তায়ই সত্তাবান, এইরূপ উপলব্ধির নামই মনের শরণাগত হওয়া। জীব যতদিন আমিত্বকে বড় শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে, যতদিন তাহার অভিমানের উচ্চশির কিছুতেই অবনত হইতে চায় না, ততদিন এই শরণাগত ভাব কিছুতেই আসে না। এই শরণাগত ভাব ও আত্মনিবেদন একই কথা। 'আমি কিছু জানি না , আমি অক্ষম, আমি দুর্বল, আমি অজ্ঞান শিশু', এই বলিয়া আপনাকে ধরিয়া, তৃণগুচ্ছের মত বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে অর্পণ করিতে হয়। ইহারই নাম আত্মনিবেদন। যাঁহারা দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়াও অমৃতের সন্ধান পান না, বুঝিতে হইবে—তাঁহাদের সাধনা আত্মনিবেদনরূপ ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত নহে। আত্ম-নিবেদন ব্যতীত সাধনার আরম্ভই হয় না। আত্মদান ব্যতীত সাধনার আরম্ভই হয় না। আত্মদান ব্যতীত আত্মলাভ কখনই হইতে পারে না। ওগো মায়ের সন্তান-বৃন্দ ! তোমার যে কোন যায়গায় আপনাকে ছাড়িয়া দাও — প্রণিপাত কর, দেখিবে আত্মলাভ হইয়াছে। প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না, এই কথাটা সর্বদা মনে রাখিও। জড় কি চেতন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান এসকল বিচার না করিয়া যে কোন জায়গায়—প্রাণকে ঢালিয়া দাও, দেখিবে — মহাপ্রাণময়ী স্নেহময়ী মায়ের বুকে তুমি নিত্য অবস্থিত। যাহা হউক, শরণাগত ভাবই যে সর্ববিধ সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য বা আলম্বন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই শেষ সিদ্ধান্ত। তাই দেখিতে পাই—স্বয়ং প্রজাপতিও ঈশ এবং গরুড়-ধ্বজের শরণাগত হইল। স্বয়ং ভগবানও একদিন আদর্শ ভক্ত অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—'**মামেকং শরণং ব্রজ**'।

———o———

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথায়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। দেবতাগণ তাঁহাদের (শিব ও বিষ্ণুর) নিকট মহিষাসুরের কার্যকলাপ এবং দেবগণের পরাজয় বিবরণ যথাযথরূপে বর্ণনা করিলেন।

ব্যাখ্যা। অসুর-অত্যাচারে উৎপীড়িত মন, প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির শরণাপন্ন হইয়া, বহির্মুখী প্রবৃত্তির অত্যাচার-কাহিনী, এবং নিবৃত্তিমুখী বৃত্তি নিচয়ের দুরবস্থার কথা যথাযথরূপে জ্ঞাপন করিতে থাকে। অর্থাৎ মনের সাহায্যেই প্রাণ ও জ্ঞান, বিক্ষেপ শক্তির যাবতীয় কার্য-বিবরণ পরিজ্ঞাত হয়। প্রাণ ভোক্তা, এবং জ্ঞান প্রকাশক। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় আহরণ করিয়া প্রাণকে উপহার দেয়। প্রাণ উহা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া ভোগ করে। মনকর্তৃক আহৃত-বিষয়সমূহের প্রকাশ করাই জ্ঞানের কার্য ; এবং ঐ প্রকাশিত বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ , উহাই প্রাণের কার্য। এক কথায়, মন—অহর্তা বা স্রষ্টা ; প্রাণ-কর্তা বা ভোক্তা এবং জ্ঞান—প্রকাশক বা লয়কারক। আমরা এ স্থলে যে জ্ঞনের কথা বলিতেছি উহা বৌদ্ধ-জ্ঞান। সরলভাষায় উহাকে বুদ্ধি বলিলেই ভাল হয়। ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয় প্রকাশ হয়, তাহার পর্যবসান বুদ্ধিতত্ত্বেই হইয়া থাকে। বুদ্ধির পরপারে বৈষয়িক প্রকাশ নাই। এইজন্য বুদ্ধিকে বা বৌদ্ধজ্ঞানকে প্রলয়ের

দেবতা বলা হয়।

মন অসুরের অত্যাচার কাহিনী প্রাণ ও জ্ঞানের নিকট বিবৃত করিল। এতদিন সে অত্যাচাররূপে বর্ণনা করে নাই ; যাহা আসিয়াছে—যেরূপ বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করিয়া প্রাণকে উপহার দিয়েছে। প্রজাপতি এতদিন তাঁহার চিরাভ্যস্ত কার্যই করিয়া যাইতেছিলেন, তাই প্রাণ এবং জ্ঞানও এতদিন ইহাকে অসুরের অত্যাচাররূপে গ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু আজ স্বয়ং প্রাণই বৈষয়িক প্রকাশকে আসুরিক অত্যাচাররূপে বর্ণনা করিতেছে ; সুতরাং উহারাও সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাণশক্তিরও (মধুকৈটভ-বধের সময়ে) যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জ্ঞানশক্তিও বিজ্ঞানময় গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এতদিন তাঁহারা বৈষয়িক স্পন্দনগুলিকে অত্যাচাররূপে গ্রহণ না করিলেও, এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা অসুরের অত্যাচার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

খুলিয়া বলি—যত দিন রূপ-রসাদি বিষয়কে বা কামিনী-কাঞ্চনকেই পরমপুরুষার্থরূপে বোধ করা যায়, ততদিন মন প্রাণ ও জ্ঞান সর্বোতোভাবে উহাতেই মুগ্ধ থাকে, তারপর যখন ধীরে ধীরে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন সেই মন প্রাণ ও জ্ঞানই উহাদিগকে আসুরিক স্পন্দন বলিয়া বুঝিতে পারে।

সাধক ! তুমিও যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিতান্ত উৎপীড়িত হইবে তখন ইতস্ততঃ পরিধাবিত হইও না। প্রবৃত্তির দমনকল্পে স্বয়ং বহ্বায়াসসাধ্য কঠোর হঠযোগাদি অবলম্বন করিয়া, উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। তুমিও প্রজাপতির মত হৃদয়ানুভূত চৈতন্যের —প্রাণের শরণাগত হও ! তোমারই অন্তরস্থিত জ্ঞানময় গুরুর চরণে শরণ লও ! আর কাঁদিয়া বল গুরো ! প্রাণময় ! এই অসুর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা কর ! আমি কত চেষ্টা করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল ; কিছুতেই অসুর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ধরিতে পারিলাম না ! কিছুতেই তোমাকে আমার একান্ত আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না ! যখনই একটু একটু করিয়া তোমাকে বুঝিবার জন্য অগ্রসর হই ; তখনই অসুরনিকর আমাকে তোমার দিক হইতে টানিয়া অন্যদিকে লইয়া যায়, আবার সেই চিরাভ্যস্ত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আর কত দিন এই অসুর উৎপীড়ন সহ্য করিব ? আর কত দিন দৈত্যের আদেশ মাথায় করিয়া জীবনের দুঃখময় দিনগুলির গণনা করিব ? গুরো ! দয়া করিয়া এই সঞ্চিত কর্মের বিপরীত আকর্ষণ হইতে রক্ষা কর। প্রভু, আর কাহার চরণে আশ্রয় লইব, তুমিই যে আমাদের —'**গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ং স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্**'। এমনই করিয়া কাঁদ। কাঁদিতে পারিলেই অসুরের অত্যাচার প্রশমিত হইবে। কিন্তু, সাবধান, কাঁদিবার জন্য কাঁদিও না। কেবল রোদন স্ত্রী-জনোচিত দুর্বলতা মাত্র। উহা সত্য-প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

———o———

সূর্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং যমস্য-বরুণস্য চ।
অন্যেষাং চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, অনিল, ইন্দু, যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণের অধিকার মহিষাসুর স্বয়ং অধিকার করিয়া লইয়াছে।

ব্যাখ্যা। দুইটি মন্ত্রের দেবতাগণের অভিনব কাহিনী বর্ণিত হইতেছে। সূর্য— চক্ষুর অধিপতি দেবতা ; ইন্দ্র —পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি ; অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়াধিপতি ; অনিল—ত্বগ্‌ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ; ইন্দু—মনের অধিপতি ; যম—পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ; এবং বরুণ—রসনার অধিপতি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতাগণ অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দের যে বিভিন্ন অধিকার ছিল, তাহা মহিষাসুর স্বয়ং অধিকার করিয়া লইয়াছে।

এস্থলে দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা হইলেই এই অধিকার গ্রহণের রহস্য সহজবোধ্য হইবে। চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা তাহাই দেবতাপদবাচ্য ; অর্থাৎ বিশিষ্ট চৈতন্যই দেবতা। চৈতন্য যখন সর্ববিশেষ-বর্জিত, তখন তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন নির্গুণ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হন। আর যখন কোন না কোনও বিশেষ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তিনি দেবতা। মনে কর—একটি বৃক্ষ। বিশুদ্ধ চৈতন্যের যে অংশে 'আমি বৃক্ষ' এইরূপ সম্বেদন ফুটিয়াছে, সেই

অংশটির নাম বৃক্ষাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতা। যে চৈতন্য 'আমি সূর্য' রূপে প্রকাশিত, তিনিই সূর্যদেব। যে চৈতন্য 'আমি বুদ্ধি' রূপে প্রতিভাত, তিনি বুদ্ধির অধিপতি দেবতা অচ্যুত। যে চৈতন্য সৃষ্টিকার্যে 'অস্মিতা' বোধ করেন, তিনি ব্রহ্মা। এইরূপ সর্বত্র। সাধারণতঃ এই দেবতার সংখ্যা ত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি। পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। আমাদের দশ বা একাদশ ইন্দ্রিয় (মনও ইন্দ্রিয় বিশেষ) সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণে গুণিত হইয়া ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ সংখ্যা বিশিষ্ট হয়। অবান্তর বিষয় ভেদে উহাদের অসংখ্য ভেদ হয়। কোটি শব্দ এই অসংখ্যের বোধক। এই হিসাবে ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ কোটি কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে যে পৃথক্ পৃথক্ চিতি-শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যে চিৎপ্রবাহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই চক্ষুরাদির অধিপতি দেবতা। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার যে সকল বিশিষ্ট মূর্তির ধ্যান বর্ণিত আছে, উক্ত ধ্যান-প্রতিপাদ্য মুর্তিতে সমাধিস্থ হইলে, উহাদের যে স্বরূপ ও শক্তি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঐ সকল দেবতা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। অবশ্য, অন্তর বলিতে যাহারা বুকের মধ্যে একটুখানি কিছু বুঝিয়া থাকেন, তাহাদের ঐরূপ উপলব্ধি কখনই সম্ভবপর নহে। বাস্তবিক বাহির বলিয়া কিছু নাই, সকলেই 'অন্তর'; কিন্তু সে অন্য কথা—

আবার অন্যরূপেও এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে যে চিৎপ্রবাহ প্রকাশিত আছে, উহাতে সমাহিত হইলেও, উক্ত সূর্যাদির স্বরূপ ও শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং সাধকগণ বুঝিয়া রাখবেন —সূর্যাদি দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে কিংবা অসাক্ষাৎ অবস্থায়ও তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হয়। মাত্র একটি ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া উহাতে সমাহিত হইলে উক্তরূপে দেবতার সাক্ষাৎকার কিংবা কৃপালাভ করা অসম্ভব। উপাসনার আলম্বন যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হইবে; অন্যথা উপাসনা আশানুরূপ ফল প্রদান করে না। ইহাই সাধনার রহস্য। ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও ইহা বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু, জল, সূর্য, অন্ন, মন, প্রাণ প্রভৃতির একটিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরূপে দর্শন করতে হয়! ব্রহ্ম বলিলে একটা অজ্ঞেয় কিম্ভূতকিমাকার বস্তু বুঝিও না 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—যাহা হইতে এই জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হয়, যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আমার সম্মুখস্থ এই প্রতীকরূপে অবস্থিত, এই প্রতীকরূপ কেন্দ্র হইতেই সমগ্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, ইনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, ইনিই আমার এবং সর্ব ভূতের অন্তররূপে অবস্থিত। এইরূপ বোধ-প্রবাহকে ধরিয়া রাখার নামই প্রতীকের ব্রহ্মভাবে উপাসনা।

মনে কর— যদি তুমি ইন্দ্র দেবতার সাক্ষাৎ বা কৃপা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে ইন্দ্রের যে বীজমন্ত্র আছে, (কোনও শক্তিমান সাধকের নিকট হইতে মন্ত্রটি শিক্ষা করিলেই ভাল হয়)। ঐ মন্ত্রের সাহায্যে স্বকীয় পাণি-ইন্দ্রিয়কে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। উপাস্য-বিষয়ক যে যথার্থ বোধ তাকে—সেই বোধকে ধরিয়া রাখার নাম উপাসনা। এইরূপ করার ফলে, যখন পাণি-ইন্দ্রিয়টি তোমার বেশ অনুভূতিযোগ্য হইবে, তখন ঐ অনুভূতিকে ব্রহ্মরূপে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী যে বিরাট পাণি বা আদানশক্তি রহিয়াছে সেই শক্তিরূপে ধারণা করিতে থাকিবে। ক্রমে ঐ ধারণা ঘনীভূত হইয়া ধ্যান ও সমাধি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই অবস্থায় ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে তোমার যেরূপ সংস্কার আছে, তদনুরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ হইবে। অথবা কোন বিশিষ্ট মূর্তির সংস্কার না থাকিলেও তোমার যথার্থ ইন্দ্রদেবতার দর্শন হইবে; তুমি ব্যুত্থিত হইয়াই দেখিতে পাইবে — ইন্দ্রদেবের নিকট হইতে অভিলষিত বর লাভে ধন্য হইয়াছ। দেবতাসাধন সম্বন্ধে ইহাই সংক্ষিপ্ত রহস্য।

তবে কথা এই যে, সাধারণভাবে এই সকল বিশিষ্ট দেবতার উপাসনা না করিয়া, যে মহতীশক্তি এই পরিদৃশ্যমান জীবজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই 'জন্মাদ্যস্যযতঃ'এর উপাসনা করিলে, সকল দেবতারই তৃপ্তি সাধন বা কৃপা লাভ হয়। যেরূপ উত্তমাঙ্গ স্নিগ্ধ থাকিলে সর্বাবয়বই স্নিগ্ধ থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। তাই মন্ত্রবাক্যে উক্ত

হইয়াছে—'**তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ**'। তাঁর—পরমাত্মার—মায়ের আমার তুষ্টি হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই পরিতুষ্ট হয়। মায়ের তৃপ্তি হইলেই সর্বলোক পরিতৃপ্ত হয়। কারণ, সবই যে মা! মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। বিশেষভাবে এটা ওটাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া মাকে তৃপ্ত করিতে উদ্যত হও, সকলের তৃপ্তি আপনি সম্পাদিত হইবে।

কেহ এরূপ আপত্তি করিও না—নিত্যতৃপ্তার আবার তৃপ্তি কি? তিনি কি চাটুকারপ্রিয়? তিনি কি আমাদের স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তোষামোদ-প্রিয় ধনীর ন্যায় আমাদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন? সাধন-সমর প্রথম খণ্ড পড়িয়াও যাহার এরূপ তর্ক প্রাণে ফোটে; তাহাকে পুনরায় ভাল করিয়া প্রথম খণ্ড পড়িতে হইবে। যতক্ষণ তুমি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পার নাই যে, তিনি নিত্যতৃপ্তা—নিত্যসন্তুষ্টা, ততক্ষণ তুমি শুধু মুখেই বল—তার আবার তৃপ্তি অতৃপ্তি কি? যতদিন দেখিবে বিপদে পড়িলেই তাঁর তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা বুকে ফুটিয়া উঠে, ততদিন তুমি দিবানিশি প্রত্যেক কর্মের ভিতর দিয়া, তাঁহার তৃপ্তি সাধনেই নিরত থাকিও। ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ প্রতিনিয়ত তাঁহার তৃপ্তি সাধনই যেন তোমার জীবনের ব্রত হয়। এইরূপ করিলেই বুঝিতে পারিবে কার্যতঃ তুমিই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছ; কারণ তিনি যে তোমার আত্মা।

আমার অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, চল, আবার প্রকৃত প্রস্তাবের সমীপস্থ হই। মহিষাসুর সূর্যাদি দেবতাগণের অধিকার অপহরণ করিয়াছে, ইহাই মন্ত্রের স্থূল মর্ম। ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দ আপনাদের চিৎভাব—পরমাত্ম সংযোগভাব বিস্মৃত হইয়া স্থূলাভিমানী জড়ত্বপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে—জড়শক্তিরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশসমূহ পরমাত্মাভিমুখী গতি পরিত্যাগপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা কাহার প্রভাব? ঐ মহিষাসুরের—রজোগুণের।

মনে কর—একটি অখণ্ড চিৎসমুদ্র, তাহার মধ্যে কতকটা লাল রং ঢালিয়া দিলে। তাহাতে সমুদ্রের যতটুকু অংশ রঞ্জিত হইল, সেই অংশটি যতক্ষণ আপনাকে চিৎ সমুদ্র হইতে পৃথক মনে না করে, ততক্ষণ তাহার দেব ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যেইমাত্র আপনাকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া, প্রকৃত স্বরূপটির কথা ভুলিয়া যায়, অমনি সেই আপনার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ঐ স্বাধিকার হইতে বিচ্যুতির কারণ—তাদৃশ সংস্কার। ঐ সংস্কারসমূহই অসুর রজোগুণ এই সংস্কারের পরিচালক, সুতরাং রাজা। তাই এখানে দেখিতে পাই—মহিষাসুর দেবতাবৃন্দকে স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বয়ং সেই অধিকার গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব চিদ্‌ভাব পরিত্যাগপূর্বক জড়ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সাধারণতঃ জড়ত্বপ্রিয়—জড়বস্তুতে আকৃষ্ট, জড়ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। উহাই মহিষাসুরের অত্যাচার। দেখ, তোমার চক্ষুকে সহস্র বার বুঝাইয়া দিলে—রূপমাত্রেই মায়ের রূপ; কিন্তু চক্ষু সর্বদাই ভৌতিকরূপ গ্রহণ করে। কর্ণকে বলিয়া দিলে—যাবতীয় শব্দই মাতৃ-কণ্ঠস্বর, মাতৃ-আহ্বান বা প্রণব-তরঙ্গ মাত্র; কিন্তু কর্ণ দিবানিশি মানবের ভাষাই আহরণ করে। ত্বক্‌কে বলিয়া দিলে—জগৎময় যতরকম স্পর্শ আছে, উহা মাতৃ-আলিঙ্গন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; কিন্তু সে প্রতিনিয়ত জাগতিক স্পর্শ আনিয়া উপস্থিত করে। এইরূপ সর্বত্র। কেন এরূপ হয় বুঝিতে পার কি? ঐ মহিষাসুরের অধিকার; ঐ জড়ত্বের—ঐ কর্ম চঞ্চলতার অধিকার। তাই উহারা ঐরূপে তোমায় প্রবঞ্চিত করিতেছে। হায়! যদি ইহাদের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচার না হইত, যদি জড়ত্বের আধিপত্য না থাকিত, তবে এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গই অখণ্ড চৈতন্যের সন্ধান আনিয়া দিত, সর্বত্র মাতৃস্নেহের সম্বেদন ফুটাইয়া তুলিত, জড়ত্বের ধাঁধা চিরদিনের মত বিদূরিত হইত।

মানুষ যখন মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে আত্মবোধের সমীপস্থ হইতে থাকে, তখনই একটু একটু করিয়া এই অত্যাচার উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যময় ভাবটি ফুটিয়া উঠে, আবার ক্ষণে ক্ষণে আসুরিকভাবে বা জড়ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের উভয়মুখী ভাব পরিলক্ষিত হয়। এক দিক চৈতন্যপ্রিয়, অন্য দিক জড়ত্বমুগ্ধ। এক কথায় এই জড় চেতনের যুদ্ধই দেবাসুর সংগ্রাম। সাধারণতঃ মনুষ্যকুলে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত জীবের এই সংগ্রাম উপলব্ধি হয় না। তখন ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দও সম্যক্ জড়ভাবাপন্ন থাকে।

তারপর জীব যখন মানুষক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন ধীরে ধীরে তাহার এই জড়ভাব অপনীত হইতে থাকে । মনে রাখিও সাধক—জড় কর্তৃক চৈতন্য উৎপীড়িত । ইহাই দেবাসুর-সংগ্রামের প্রকৃত রহস্য । বাস্তবিক কিন্তু জড় বলিতে কিছুই নাই । একটা জড়ত্ব-প্রতীতি আছে মাত্র। এই জড়ত্ববোধেরই নাম বন্ধন। ইহাই অসুর-ভাব । আর চৈতন্য মাত্র উপলব্ধির নাম মুক্তি। উহাই দেবভাব। শাস্ত্রকারগণ জড় ও চেতনের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে জানিয়া রাখা আবশ্যক— যে আপনাকে জানে এবং অন্যকেও জানিতে পারে, তাহার নাম চেতন, আর যে আপনাকে জানে না এবং অন্যকেও জানিতে পারে না, তাহার নাম জড় । এই হিসাবে গুণত্রয় বা বুদ্ধি মন, ইন্দ্রিয় অবধি যাবতীয় দৃশ্যবর্গের নাম জড়, এবং যিনি এই যাবতীয় দৃশ্যের স্রষ্টা বা প্রকাশক, তিনিই চেতন । এ সকল তত্ত্ব ক্রমে আরও স্ফুট হইবে ।

সে যাহা হউক, সাধক ! যতদিন তোমার বিন্দুমাত্র জড়ত্ব প্রতীতি থাকিবে, ততদিন বুঝিবে— তোমার প্রতি অসুর অত্যাচার চলিতেছে । সুতরাং যে কোন উপায়ে উহাকে বিদূরিত করিতেই হইবে । জড়ত্বজ্ঞানই অজ্ঞান । জড় বলিতে—দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিতে পারে না ; এইরূপ উপলব্ধি হইলেই যথার্থ জ্ঞানময় স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় ।

———o———

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি ।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৬॥

অনুবাদ । সেই দুষ্টস্বভাব মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া, দেবতাবৃন্দ মরণ-ধর্মশীল জীবগণের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা । মহিষাসুর দুরাত্মা— অসৎ প্রকৃতি । প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি— সৎস্বরূপ পরমাত্মা যখন লীলাবশতঃ ঈষৎ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশিত হন, তখনই তিনি অসৎপদবাচ্য হইয়া থাকেন । যখন প্রকৃতি এই অসৎ অর্থাৎ ঈষদ্ অভিমুখে পরিচালিত হয়, তখনই ইহাকে দুরাত্মা বলা হয় । সাধারণ কথায় বুঝিতে হইবে — পরিচ্ছিন্ন রূপরসাদি ভোগ করাই যখন আত্মার স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখনই আত্মার দুরবস্থা । প্রাক্তন কর্মের বীজসমূহ আত্মাকে ঐরূপ পরিচ্ছিন্নভাবে বা অসদ্‌ভাবে প্রতিভাত করিবার জন্য নিয়ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। রজোগুণ উহাদের মূল কেন্দ্র ; সুতরাং দুরাত্মা। ইহার অত্যাচারে দেবগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ স্বর্গ হইতে— চৈতন্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছে । উহারা জড়ত্বের অধিকারে আসিয়া অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপ মাতৃ-অঙ্কে নিত্যাবস্থানরূপ স্বর্গসুখ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, অমর হইয়াও মর্ত্যের ন্যায়— মরণ-ধর্মশীল জীবের ন্যায়, ভূতলে অর্থাৎ পার্থিব ভাবে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে ।

দেখ জীব, চৈতন্যই তোমার স্বরূপ । তোমার ইন্দ্রিয়নিচয় চৈতন্যেরই প্রবাহ মাত্র, যেখানে চৈতন্য সেখানেই অমৃত, সেইখানেই আনন্দ নিত্য বিরাজিত । কিন্তু তুমি অসুর কর্তৃক এমনই হৃত সর্বস্ব হইয়াছ যে, প্রাণপণে অন্বেষণ করিয়াও আনন্দের কণামাত্র সম্ভোগ করিতে পারিতেছ না । অমৃত-সমুদ্রে—মাতৃ-বক্ষে নিত্য অবস্থান করিতেছ, অথচ প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছ ! এইরূপ একদিন নয়, দুই দিন নয়, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া তোমার এই দুর্দশা চলিতেছে । ইহাই **'বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা'**। জীব ! ধীরে সাবহিতে এই অসুরের অত্যাচার প্রত্যক্ষ কর।

এ জগতে যাহারা পার্থিব সুখে সুখী বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে, তাহারাও যে যথার্থ সুখ হইতে একান্ত বঞ্চিত, ইহা একটু ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । কাম-কাঞ্চনের সম্ভোগে যে সুখ, উহা এত চঞ্চল ও এত দুঃখমিশ্রিত যে উহাকে সুখ না বলিলেই ভাল হয় । তথাপি যাহারা উহাতেই পরম সুখজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে উহা উষ্ট্রের কণ্টকচর্বণ সদৃশ । উট কাঁটা ঘাস খাইতে ভালবাসে । কাঁটা খায়, একটু তৃপ্তিও যে না পায় এমন নহে ; কিন্তু মুখ ও জিহ্বা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়, রক্ত পড়ে,ব্যথাও পায় । পার্থিব সুখও ঠিক সেইরূপ । বার বার স্মরণ করিও— জড়বস্তুতে সুখ নাই । সুখ বস্তুটা চিৎএরই স্বরূপ । যতক্ষণ জড়ত্ববোধ সম্যক্ বিদূরিত না হয় ,ততক্ষণ সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না । উপনিষদ্ বলেন,—**'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে**

সুখমস্তি।' যাহা ভূমা, যাহা মহৎ, তাহাই সুখ । অল্পে অর্থাৎ অসৎভাবে সুখ নাই । সুখেরই অন্য নাম স্বর্গ (সু— অর্জ+ঘঞ্) । সুকৃতি দ্বারা যাহা অর্জন করা যায়, তাহাই স্বর্গ । দেবতাগণ এই ভূমাসুখের সহিত সংযুক্ত । তাই দেবলোককে স্বর্গ কহে । জড়ত্বের প্রবল আকর্ষণে দেবতাবৃন্দ অধুনা স্ব স্ব চৈতন্য ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিতেছে না । তাই মন্ত্রে দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে নিরাকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্য অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহ মাত্র । বিজ্ঞানময় কোষে আমিত্বকে লইয়া গেলে, এই অস্মিতার স্বরূপ উপলব্ধি হয় । উহাই স্বর্গ । ইন্দ্রিয়বর্গের বৈষয়িক স্পন্দন উপস্থিত হইলেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ।

———○———

এতদ্বঃ কথিতং সর্বমমরারিবিচেষ্টিতম্ ।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । আপনাদের নিকট অসুরের কার্যবিবরণ সকলই বর্ণনা করা হইল । আমরা আপনাদের শরণাগত হইয়াছি ; আপনারা তাহার বধের উপায় চিন্তা করুন ।

ব্যাখ্যা । মহিষ—অমরারি । অমরত্বের—অমৃতলাভের বিরোধী । তাহার অত্যাচার কাহিনী— দেবতাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন-বিবরণ সকলই বর্ণিত হইল । দেবতাবৃন্দ এখন জড়ত্বের অসৎপ্রিয়তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন ; তাই বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইয়াছেন । এই শরণাগত ভাবই সাধনার একমাত্র অবলম্বন । যাহার এই লক্ষণটি প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সাধনার সফলতা অবশ্যম্ভাবী । শরণাগতভাব ব্যতীত যাবতীয় যোগ, তপস্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না । শরণাগত-ভাবরূপ ভিত্তির উপরেই সাধনা-মন্দির দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত । যাঁহারা বহুদিন নানারূপ সাধন-প্রণালী অনুষ্ঠান করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন না, বুঝিতে হইবে —তাঁহারা শরণাগতভাব পরিত্যাগ করিয়া অথবা অসম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কি জাগতিক কার্যে, কি সাধনারাজ্যে সর্বত্রই ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা, ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । উহাতে কর্ম শক্তি বর্দ্ধিত হয় ।

পুনরুক্তি হইলেও এই কথাটি বহুবার আলোচনার যোগ্য—পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেই লৌহকীলক কাষ্ঠ-মধ্যে সুপ্রবিষ্ট হয় । যাঁহারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য, সর্বপ্রথমে মায়ের চরণে শরণ না লইয়া হঠক্রিয়ার সাহায্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা উহাতে কতদূর কৃতকার্য হন —জানি না । আমরা কিন্তু এখানেও দেখিতে পাই—অসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ **'শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মঃ'** বলিয়া শিব ও বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন । এই শরণাগত-ভাব যদি কৃত্রিমতা শূন্য হয়, সরল প্রাণে অকপট হৃদয়ে যদি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পার, তবেই সাধক, তুমি অনাবিল শান্তি ভোগের অধিকারী এবং সর্ববিধ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের যোগ্য হইবে । মনে রাখিও —তোমার যত কিছু সাধনা, সকলই ঐ শরণাগত ভাবটি আনিবার জন্য । যেমন দেখিবে—হৃদয়ের সমস্ত কপটতা বিদূরিত করিয়া সর্বতোভাবে মাতৃ-চরণে শরণাগত হইতে পারিয়াছ, সেই দিনই তোমার সকল সাধনার অবসান হইবে, জীবন মধুময় হইবে ।

জীব যখন স্বকীয় দুর্দশা হইতে অর্থাৎ অমরত্বের বিঘাতক ক্ষুদ্রতা ও জড়ত্ব হইতে মুক্তি চায়, তখন তাহাকেও এইরূপ প্রাণ ও জ্ঞান-শক্তির শরণাপন্ন হইতে হয় । পূর্বে বলিয়াছি— বাহিরে যিনি বিষ্ণু, অন্তরে তিনি প্রাণ, বাহিরে যিনি শিব, অন্তরে তিনি জ্ঞান । যতদিন এই প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান না পাওয়া যায়, যতদিন জ্ঞানকে শিব ও প্রাণকে বিষ্ণু বলিয়া বুঝিতে না পারা যায়, অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণমাত্র যাহার লক্ষ্য অন্তরস্থ জ্ঞান ও প্রাণের কেন্দ্রকে স্পর্শ না করে, ততদিন সে কিরূপ শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে ? শরণ না লইলে মহিষাসুর বধের উপায় হয় না । তাই আবার বলি—সাধক ! যে কোন স্থানে আপনাকে ছাড়িয়া দাও । ভগবান বলিয়া ছাড়িও ! তোমার আশ্রয়, জড়পদার্থ হইলেও সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না । জড়প্রতিমা কিংবা জড়দেহ তোমার ভগবৎ জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইবে না । নিষাদপুত্র একলব্য মৃন্ময় দ্রোণমূর্তির নিকট অভূতপূর্ব অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল । অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যে তোমারই অন্তরে অবস্থিত ! বাহ্য বস্তু— বাহ্য আশ্রয় সেই জ্ঞান উন্মেষের অবলম্বন মাত্র ।

———○———

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। দেবতাবর্গের এইরূপ শোচনীয় অত্যাচার শ্রবণ করিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ক্রোধান্বিত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল-ভ্রূকুটি কুটিলভাব ধারণ করিল।

ব্যাখ্যা। সন্তান উৎপীড়িত ! জড়ত্ব কর্তৃক চৈতন্যের কল্পিত আবরণ মা আর কতদিন সহ্য করিবেন ! প্রাণশক্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রলয়ের দেবতা গুরু—শম্ভু ক্রোধোদ্দীপিত হইয়াছেন। মায়ের রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইবার সময় হইয়াছে, আর রক্ষা নাই। এইবার মহিষাসুরের নিধন অনিবার্য।

সাধক ! সত্যসত্যই যে মুহূর্তে তুমি নিজেকে উৎপীড়িত বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে, সত্যসত্যই যে মুহূর্তে তুমি কাঁদিয়া বলিবে—'মা ! আমি বড়ই উৎপীড়িত আর এই অসুরের অত্যাচার ,আর এ জগদ্ভার বহন করিতে পারি না। একবার তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও।' সেই মুহূর্তেই দেখিতে পাইবে তোমার প্রাণ, —যিনি ইতিপূর্বে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রাণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি শম্ভু, যিনি জগন্মঙ্গল বিধায়ক, মাতৃ-যজ্ঞের সর্ব প্রধান হোতা, তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল, ভ্রূকুটি কুটিল হইয়াছে।

প্রাণ ও জ্ঞান যতদিন আত্মশক্তি— আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া বহুত্বের মোহে জগতের খেলায় মুগ্ধ থাকে, ততদিন এই ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হয় না ; কিন্তু এখন তাঁহারা মনের নিকট হইতে অসুরের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যখন দেখিলেন যে অপূর্ব গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধক-বরেণ্য অর্জুন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করিতেছেন না, শুধু আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়া যাইতেছেন, তখন অর্জুনের প্রাণে ব্যথা দিয়া ক্রোধের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য, অভিমন্যুবধের চক্রান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইরূপ সাধক যতদিন পূর্ণোদ্যমে—সম্যক্ অধ্যবসায় প্রয়োগে সাধন-সমরে অবতীর্ণ না হয়, ততদিন মা আমার ধীরে ধীরে অসুরবল পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেবশক্তির উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিতে থাকেন। একটু প্রবল আঘাত—প্রবল অত্যাচার না হইলে, সত্যই আমাদের আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হয় না। আমরা যে মহাশক্তিমান, আমাদের মধ্যে যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী মহাশক্তি বিদ্যমান, ইহা আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই অসুর-অত্যাচাররূপে মাতৃ করুণাধারা প্রবাহিত হয়। রূপ-রসাদি বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করার একমাত্র উদ্দেশ্য—আত্মশক্তি স্ফুরণ। প্রথম প্রথম উহারা উপেক্ষিত থাকে। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সহিষ্ণুতা ও উপেক্ষার সীমা অতিক্রম করে, তখন আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। প্রাণ ও জ্ঞানশক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সাধকগণ ইহা আত্মজীবনে নিশ্চয়ই অনুভব করিয়া থাকেন। এ সকলই মহামায়ার—মায়ের আমার অচিন্তনীয় লীলা,অভূতপূর্ব আনন্দময় বিলাস মাত্র।

———○———

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অনন্তর অতি কোপপূর্ণ চক্রধারী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা ও শিবের বদনমণ্ডল হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে দুইটি 'ততঃ' শব্দ আছে। প্রথমটির অর্থ—অনন্তর এবং অন্যটির অর্থ—প্রসিদ্ধ, উহা বদনের বিশেষণ। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব অতিশয় কোপান্বিত হইয়াছিলেন ; তাই তাহাদের স্ব স্ব তেজ স্বকীয় শরীরে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বাহিরে নির্গত হইল। যেরূপ কোনও জলপূর্ণ কটাহের নিম্নে অগ্নিসন্তাপ প্রদান করিলে, সেই জল কটাহের বহির্দেশে নির্গত হয়, ইহাও সেইরূপ। এই মন্ত্রের তাৎপর্য একটু বিশেষ রহস্যপূর্ণ। এস সাধক ! আমরা- মাতৃ চরণে প্রণত হইয়া ধীরভাবে অগ্রসর হই। মা বিজ্ঞানময়-মূর্তিতে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অতি গহন রহস্যপূর্ণ চণ্ডীতত্ত্ব উদ্ভাসিত করুন, আমরা ধন্য হই।

ক্রোধ বা তেজ বস্তুটা কি ? মন, প্রাণ ও জ্ঞানের যে পরমাত্মাভিমুখী বিশেষ উদ্বেলন, তাহাই অসুরের অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তিনিচয়ের পক্ষে ক্রোধ। ক্রোধের উদয় হইলেই তেজ প্রকাশ পায়। মানুষ যখন কোন কারণে

কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। উহাই ক্রোধ-জন্য তেজের বহিঃপ্রকাশ। এ স্থলেও উক্ত দেবতাত্রয়ের যে পরমাত্মাভিমুখী রজোগুণাত্মক অভিস্পন্দন, তাহাই ক্রোধ। পূর্বে মহিষাসুরকে কাম ক্রোধাদির মূলীভূত রজোগুণরূপে বুঝিয়া আসিয়াছি। এখানে আবার দেবতাগণেরও সেই ক্রোধ—সেই রজোগুণেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছি।

এইরূপই হইয়া থাকে। যেইরূপ কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ ক্রোধের দ্বারা ক্রোধের নিপাত করিতে হয়। ইহা মনোবিজ্ঞানের একটি সুন্দর রহস্য। অনেকে বলেন—'অক্রোধের দ্বারা ক্রোধের, নিষ্কামের দ্বারা কামের ও অহিংসার দ্বারা হিংসার জয় করিতে হয়। অর্থাৎ কোন বিরোধী বৃত্তির উদ্বেলন দ্বারা অপর বিরুদ্ধ বৃত্তিকে দমন করিতে হয়।' আমরা কিন্তু দেখিতে পাই—উহাতে অনেক বেগ পাইতে হয়, পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য হইতে হয়। বহুদিন ঐরূপ অনুশীলনের ফলে—ধৈর্যশীল সাধক কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিতে পারেন। দেবীমাহাত্ম্যের ঋষি কিন্তু এরূপ কথা বলেন না। তাঁহার অভিপ্রায় ক্রোধকে জয় করিবে ত' ক্রোধের প্রতি ক্রোধ কর। এইরূপ কামকে জয় করিবে ত' কামের কামনা কর। (সে কথা শুম্ভবধে দেখিতে পাইবে)। যে ব্যক্তি কোপনস্বভাব, তাহার ক্রোধবৃত্তি অতিশয় উদ্দীপনশীল—অনায়াসেই উদয় হয়। একবার যদি তাহাকে ক্রোধের উপর ক্রোধ করিবার কৌশল শিখাইয়া দেওয়া যায়, তবে সে অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারে। কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে অক্রোধ অর্থাৎ ক্ষমাবৃত্তির অনুশীলন করিতে বলিলে, তাঁহার কৃতকার্যতা লাভ কষ্টসাধ্য।

এইরূপ যদি হিংসাকে দূর করিতে চাও, তবে হিংসাই কর; কিন্তু হিংসার প্রতি। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি—সাধকগণের মধ্যে যাঁহার যে বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল, তিনি সেই বৃত্তি দ্বারাই মাকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবেন। কেবল শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সাধু বৃত্তি দ্বারাই যে মাতৃযুক্ত হইতে হইবে, এমন কথা মা বলেন না। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসাধু বৃত্তিগুলিও যোগযুক্ত হইবার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বৃন্দাবনে গোপীগণ কামবৃত্তি দ্বারা, মথুরায় কংস ভয়বৃত্তি দ্বারা, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু হিংসাবৃত্তি দ্বারা, চেদিরাজ শিশুপাল দ্বেষবৃত্তি দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। ভগবানও তাহাদিগকে স্বকীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে কৃপণতা করেন নাই। ওরে, মা আমাদিগকে এমন কথা বলেন না যে তোদের ভাল ভাল বৃত্তিগুলি বাছিয়া লইয়া আমার কাছে আয়। তিনি বলেন—সর্বভাবেন শরণং গচ্ছ—ভাল হউক, মন্দ হউক, সাধু হউক, অসাধু হউক, প্রশংশিত হউক অথবা নিন্দিত হউক, যে কোন ভাবের সাহায্যে আমার শরণাগত হও, যে কোন বৃত্তি দ্বারা শুধু আমার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা কর। যে কোনরূপে আমার সমীপে আসিতে চেষ্টা কর। আমি তোমাদিগকে সাযুজ্য প্রদান করিব। আমি মা, তোমরা সন্তান, তোমাদিগের কি ভাল, কি মন্দ, তাহা দেখিবার চক্ষু আমার নাই। আমি দেখি—শুধু আমার দিকে তোমরা মুখ ফিরাইতে পারিয়াছ কি না। তোমরা জগতের দিক্ হইতে ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ ফিরাইবে, ইহাই আমার লক্ষ্য। মুখ ফিরাইতে কি রূপ বৃত্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা বিচার করিবার অবসর আমার নাই। আমি যে তোমাদের মা!

জানি মা, তুমি স্নেহে অন্ধা—আমার ভাল মন্দ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই; কিন্তু আমরা যে কোনও বৃত্তির দ্বারাই তোমাতে নিত্যযুক্ত হইতে পারিতেছি না; কি ভাল, কি মন্দ, কোন একটা বৃত্তির সাহায্যেও তোমাতে আত্মহারা হইতে পারি না। পারিয়াছিল হিরণ্যকশিপু। এমনভাবে বিদ্বেষ-বৃত্তি দ্বারা তোমার সহিত যোগযুক্ত হইয়াছিল যে, তাহার আহার, নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্যগুলি পর্যন্ত ভগবদ্ বিদ্বেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইত। তোমার প্রতি এমনই বিদ্বেষভাব সে পোষণ করিতে পারিয়াছিল—যাহার বশবর্তী হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকেও মৃত্যুর কবলে প্রেরণ করিতে বহুবার চেষ্টা করিয়াছে। সে ভগবদ্‌বিদ্বেষ ভগবৎপ্রিয় আত্মজকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইতে পারে, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। যে বিদ্বেষের ফলে মা—তুমি জড় স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া নৃসিংহ-মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর স্থূল দেহের প্রত্যেক তন্ত্রীগুলি পর্যন্ত

তোমার পবিত্র অঙ্গে বেষ্টিত করিয়াছিলে, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত ! যে ভগবদ্ বিদ্বেষীর আত্মজ সন্তান —প্রহ্লাদ, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত, তাহা কি আমরা ধারণাও করিতে পারি ? আমরা দুর্বল সন্তান ! আমাদের মনে অত বল নাই মা ? ওরূপ বল থাকিলে ত' তুমি স্বয়ংই আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে ধন্য করিতে ! তাহাতে তোমার মাতৃত্ব-ধর্মের বিশেষ বিকাশ হইত কি ? যে বলবান, সে ত আত্মলাভ করিতে পারিবেই ; কিন্তু যাহারা আমাদের মত দুর্বল, যাহাদের চিত্ত সংশয়ের দ্বারা আকুল, অবিশ্বাসের দ্বারা কলুষিত, যাহারা কাম ক্রোধাদি আসুরিক বৃত্তিদ্বারা-উৎপীড়িত, এমন সন্তানগণকে যদি তুমি বুকে টানিয়া লও, বাহু বেষ্টনে চির আবদ্ধ করিয়া রাখ তবেই, ত' মা তোমার মাতৃত্ব-ধর্মের সম্যক্ স্ফুরণ হয় । দুর্বল মেষশিশুর ন্যায় আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের সংশয়-আন্দোলিত মাতৃ-আহ্বান যদি তোর স্নেহপূর্ণ বিশাল বক্ষে বিন্দুমাত্র আন্দোলন তুলিতে পারে, যাহার ফলে তুই দুর্বলের মা—জগতের মা বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারিস, তবেই তো তোর মা নাম সার্থক হয় আর আমরাও ধন্য হইয়া যাই।

সাধক ! তোমার যে বৃত্তি যখন অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে প্রকাশ পাইবে তখন সেই বৃত্তি দ্বারাই মাকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে । এই উপায়ে অতি সহজে বৃত্তি নিগ্রহ সাধিত হয়। এখানেও ক্রোধমূলক মহিষাসুরকে দমন করিবার জন্য আবার ক্রোধেরই উদ্বেলন দেখিতে পাইতেছি । কিরূপে ইহা হয় ? শুন, একই রজোগুণ, উহার দ্বিবিধ বিকাশ। এক বহির্মুখ —যাহার স্থূল বিকাশ—কাম ক্রোধ ইত্যাদি । অপর অন্তর্মুখ যাহার স্থূল প্রকাশ—পরবৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ইত্যাদি । যে রজোগুণ মহিষরূপে কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপে সংসারগতিকে একান্ত প্রিয় বোধে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী, সেই রজোগুণই আবার পরবৈরাগ্য রূপে প্রকাশ পাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী । ইহাই ত' মহিষাসুরের সহিত সংগ্রাম । যখন বহির্মুখী যে বৃত্তি প্রবল হয়, তখন অন্তর্মুখে সেই বৃত্তির সমজাতীয় বৃত্তি প্রবাহ উদ্বোধিত করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় । **'সমঃ সমং শময়তি'** কথাটা খুবই মূল্যবান । সাধকগণ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । তবে যোগাদিশাস্ত্রে যে ক্রোধাদি-বৃত্তিনিগ্রহের উপায়স্বরূপ তদ্‌বিরোধী অক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তির সাধনা বিহিত আছে ; উহাকে সাধনার ফল বলিয়া বুঝিবে —অর্থাৎ ক্রোধকে দমন করিতে হইলে ক্রোধের প্রতি ক্রোধ করিতে হয়, তাহার ফল হইবে অক্রোধ । এইরূপ হিংসার প্রতি হিংসা করিলে, তাহার ফল হইবে অহিংসা । এইরূপ সর্বত্র ।

এখানেও ঠিক এইরূপেই আমরা অসুরের প্রতিকূলে ব্রহ্মাদির ক্রোধ দেখিতে পাইলাম । জীব ! যেদিন তোমার মন প্রাণ ও জ্ঞান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, 'আর অসুর অত্যাচার সহ্য করিব না' বলিয়া উদ্বেলিত হইবে, সেইদিনই বুঝিবে—অসুর নিগ্রহের সময় আসিয়াছে ।

নিশ্চক্রাম মহত্তেজঃ—তেজ শব্দের অর্থ জ্যোতি —প্রকাশ । মনোময়, জ্ঞানময় এবং প্রাণময় জ্যোতি উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিল অর্থাৎ স্থূল প্রত্যক্ষ হইল । সত্য সত্যই এই জ্যোতি দর্শন হয় । মনোময় জ্যোতি রক্তবর্ণ ; প্রাণময় জ্যোতি শ্যামবর্ণ এবং জ্ঞানময় জ্যোতি শুভ্রবর্ণ । যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন অর্থাৎ জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রশান্ত উদার মহান চিদ্‌ব্যোমের সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহাদের উহা আয়ত্তীভূত হইয়াছে—অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রই উদিত হয় এবং অভীষ্ট কাল পর্যন্ত স্থির থাকে, তাঁহারা ঐ ব্যোমকে মনোময় ধারণা করিলেই ব্রহ্মতেজ বা রক্তবর্ণ জ্যোতি দেখিতে পাইবেন । এইরূপ প্রাণময় ধারণায় শ্যামবর্ণ এবং জ্ঞানময় ধারণায় রজতগিরিনিভ শুভ্রবর্ণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ ঐ তেজ আজ্ঞা চক্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ; তাই মন্ত্রে 'বদনাৎ' কথাটি বলা হইয়াছে ।

আবার সাংখ্যযোগ দৃষ্টিতেও ঐ মহৎ তেজই মহৎতত্ত্বরূপে পরিলক্ষিত হয় । মহৎতত্ত্বের উদয় অর্থাৎ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য চঞ্চলতা, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞানজন্য সুখ দুঃখের উৎপীড়ন, এসকল বিদূরিত হয় না । কিন্তু মহৎতত্ত্বে একবার মাত্র আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলে, জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বোধ সমূলে বিলয় হয় । এই মহৎতত্ত্ব ঈশ্বর । তাই ইহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সম্বন্ধীয় তেজ বলা হইয়াছে । সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় মহৎতত্ত্বেই হইয়া থাকে । ঋগ্বেদে— পুরুষসূক্তে ইনি হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন । এ সকল তত্ত্ব ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে।

———○———

অন্যেষাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের শরীর হইতেও সুমহৎ তেজ নির্গত হইল, এবং ঐ সকল তেজ একত্র সম্মিলিত হইল ।

ব্যাখ্যা । দেবতাতত্ত্ব পূর্বে বলা হইয়াছে । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবশক্তিও ব্রহ্মাদির ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । তাহার ফলে —প্রত্যেক দেবতার অঙ্গ হইতে সুমহৎ তেজ নির্গত হইল । এবং ঐ সকল তেজ একত্র পুঞ্জীভূত হইল, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই দেব ও অসুর ভাব আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । মনে কর —চক্ষু । সে একদিকে যেমন ভৌতিকরূপে আকৃষ্ট, অন্যদিকে তেমনই রূপাতীত বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে উৎসুক । যতদিন মানুষের এই ভাবটি না আসে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিচয় কেবল বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট থাকে, ক্ষণকাল তরেও ভগবৎমুখী হইতে না চায়, ততদিন বুঝিতে হইবে —এখনও চণ্ডীতত্ত্ব বুঝিবার মত সময় হয় নাই । সে যাহা হউক, অসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবশক্তিবৃন্দ যখন দেখিতে পাইল— তাহারা যাঁহাদের আশ্রিত, যাঁহাদের সত্তায় তাহাদের সত্তা তাঁহারাই যখন সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাহাদেরও ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী । মন, প্রাণ ও জ্ঞান যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তখন তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? সাগরে জোয়ার হইলে নদী নালায়ও জোয়ার হয় । মন— ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, প্রাণ— ইন্দ্রিয়ের ধারক, জ্ঞান—ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক । যখন উহাদের তেজ নির্গত হইয়াছে, তখন তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়বর্গ হইতেও তেজ নির্গত হইতে লাগিল ।

ইন্দ্রিয়ের তেজ বস্তুটা কি ? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই পৃথক পৃথক প্রকাশ শক্তি আছে । চক্ষু, কর্ণাদি কিংবা বাক, পাণি প্রভৃতি প্রত্যকেরই স্বতন্ত্র প্রকাশ শক্তি বিদ্যমান । জ্ঞানের প্রকাশেই উহারা প্রকাশময় । যেরূপ সব জলই সমুদ্রের জল, তথাপি নদীর ভিতর যে জল থাকে, তাহাকে নদীর জল কহে ; সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশময় হইলেও প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকাশসত্তা আছে । উহারা এতদিন ব্যষ্টিভাবে কার্য করিতেছিল, সকলে পৃথক পৃথক ভাবে অসুরবিজয়ে যত্নবান ছিল, তাই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । আজ সকল ব্যষ্টিশক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, এইবার দেবশক্তি পূর্ণবলে বলীয়ান ; সুতরাং অসুর দমনও অনিবার্য । জাগতিক ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়—যখন কোন জাতি বিশেষের অভ্যুদয় আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের ব্যষ্টিশক্তিসমূহ সমবেত করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । সাধনা জগতেও ঠিক সেইরূপ ।

ইন্দ্রিয়নিচয় স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্বক একই উদ্দেশ্যে সমবেতশক্তি নিযুক্ত করিয়াছে । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— **'তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত'** । একতাই কার্যসিদ্ধির অমোঘ উপায় । ইন্দ্রিয়ের একতাই বা কি আর পৃথকভাবই বা কি ? মনে কর যতদিন কেবল চক্ষু ইন্দ্রিয়টি ভৌতিকরূপে আকৃষ্ট না হইয়া বিশ্বময় মাতৃরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি তাহার সহায় হয় না, ততদিন শত চেষ্টাতেও সে সম্যক কৃতকার্য হইতে পারে না ; কিন্তু যখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সম্মিলন হয়, তখন উহা অসীম শক্তিসম্পন্ন হইয়া অভীষ্টলাভে সর্মথ হয় । অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে । এতদ্ভিন্ন উহাদের পরস্পর সহায়তাও আছে । প্রত্যেক সাধক স্বকীয় জীবনে এই বিষয় সকল একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন ।

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক পৃথক প্রকাশ শক্তি প্রত্যক্ষ করিবার উপায়— বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে সমাহিত হওয়া । মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধন-সমরে রাজা সুরথ সমাধির সহিত অগ্রসর হইতেছে । জীব যখন সমাধিস্থ হইতে সমর্থ হয়— তখনই এই সকল তত্ত্ব স্ফুরিত হইতে থাকে । যে একমাত্র অখণ্ড ঘন চিদ্রস ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই পরিচ্ছিন্ন চিৎশক্তিতে সমাহিত হইলেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকাশসত্তা পরিলক্ষিত হয় । এইরূপ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব ও অবস্থা ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তিত করা যায় । ইহারই নাম ইন্দ্রিয় জয় । সে যাহা হউক, ঐ সকল বিভিন্ন প্রকাশ বা জ্যোতি, বিভিন্ন বর্ণের পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । আবার সাধকগণের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনুসারেও উহাদের বর্ণগত বিভিন্নতা হয় । যাহার যে গুণ অতিরিক্ত মাত্রায়

প্রকাশশীল, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশও সেই গুণের বর্ণবিশিষ্ট হয়। সত্ত্বগুণ— শুভ্র, রজোগুণ— রক্ত এবং তমোগুণ—কৃষ্ণবর্ণ। ইহাই গুণত্রয়ের মৌলিক বর্ণ। ইহাদের সংমিশ্রণতারতম্যে ইন্দ্রিয়শক্তির বর্ণগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

এখানেও **'মহৎতেজঃ'** শব্দের মহৎতত্ত্বই বুঝিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশশীলতাহেতুই এই মন্ত্রে মহৎকে তত্ত্ব না বলিয়া, তেজ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ যতদিন স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায়, ততদিন সাধক এ তেজের সন্ধানই পায় না। যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গত ব্যষ্টিপ্রকাশ এক সমষ্টি প্রকাশকেন্দ্রে উপনীত হয়—অর্থাৎ যাহার প্রকাশে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশ, সেই মূল প্রকাশে উপনীত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় ইহাই মহৎতত্ত্ব, ইনি ধী বা গায়ত্রী, ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বরী। এখানে উপনীত হইলে **'ঐক্য'** অর্থাৎ একভাবই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। কি মনোরম এ স্থান। যুগপৎ একত্ব ও বহুত্বের প্রকাশ যে কিরূপে হয়, তাহা এই স্থানে আসিয়া সাধকগণ বুঝিতে পারেন। বিস্ময়ে, আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া থাকেন। আচার্য শঙ্কর এই স্থানে দাঁড়াইয়াই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন— **'বিশ্বং-দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরী তুল্যং নিজান্তর্গতম্'**।

———০———

অতীবতেজসঃকূটং জ্বলন্তমিবপর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। সেই দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন —প্রজ্বলিত পর্বতের ন্যায় তেজোরাশির শিখাসমূহ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়াছে, তাই এত স্থূল ও ঘন হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দেবতাগণ উহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সাধনাপথে এইরূপ প্রত্যক্ষতা যতদিন না আসে, ততদিন সাধকের গতি খরতর হয় না। অনুমানের উপর সাধনা কতদিন চলে? অতিশয় ধীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তিরও শেষে একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসিয়া পড়ে। যোগদর্শনেও উক্ত হইয়াছে— **'অলব্ধভূমিকত্ব'** সাধনার অন্তরায়। সুতরাং প্রত্যক্ষতার একান্ত প্রয়োজন। মাতৃ-কৃপায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার অন্তর্মুখী হইয়া একটু স্থির হইলেই এইরূপ দিগন্তব্যাপী জ্যোতিদর্শন হইয়া থাকে। জগতে কোন জ্যোতির্ময় পদার্থের সহিত উহার তুলনা হয় না। যোগশাস্ত্র যাহাকে **'বিশোকা'** বা **'জ্যোতিষ্মতী'** বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার উদয়ে সাধকের সর্ববিধ শোক দূরীভূত হয়, যাহার প্রকাশ হইলে জীব তীব্রবেগে ভগবৎমুখী গতি অবলম্বন করে, সাধকগণ যাহাকে ঈশ্বরীয় জ্যোতি বা মায়ের গাত্রপ্রভা বলিয়া থাকেন; উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই সাধক মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে **'দদৃশুঃ'** পদটি প্রয়োগ হইয়াছে।

এইবার একটু সাধনার কথা বলিতেছি— পূর্বে যে চিদাকাশের বিষয় বলা হইয়াছে, উহাতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ আরোপ করিতে হয়। দিক্‌সত্তা, অনন্তসত্তা, জ্যোতিঃ-সত্তা, ও মন-প্রাণসত্তা—ব্রহ্মের এই চারটি পাদ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। চিদাকাশে যথাক্রমে দিক্ ও অনন্তসত্তা আরোপ করিয়া, তৃতীয় পাদ জ্যোতিঃসত্তা আরোপে অভ্যস্ত হইলে, ঐ আকাশ দিগন্তব্যাপী জ্যোতির্ময় হইয়া প্রকাশ পায়। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুৎ, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্পাদ। উহার আরোপে দিগন্তব্যাপী অতুলনীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। ইহা জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম-দর্শনের একপ্রকার উপায়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সত্তায় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধীরে ধীরে মন, প্রাণ ও বুদ্ধিতে উপনীত হইলে অর্থাৎ কেবলমাত্র অস্মিতায় উপস্থিত হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই **'অতীব তেজসঃ কূটম্'**!

———০———

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। সমস্ত দেবতার শরীর হইতে সমুদ্ভূত সেই অতুলনীয় তেজ একস্থ অর্থাৎ সম্মিলিত হইলে, তাহা একটি নারী মূর্তিতে পরিণত হইল। তাঁহার কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। পূর্বে যে জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, উহা মাত্র তেজস্তত্ত্ব নহে, অর্থাৎ তত্ত্ববৎ একটা জ্যোতির্ময় সত্তামাত্র নহে। উনি **'একজন'**—উহার ব্যক্তিত্ব আছে। যাবতীয় ব্যক্তিধর্ম ইহাতে পূর্ণভাবে পরিব্যক্ত। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন, গ্রহণ, নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তি ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম উক্ত জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজিত। ইহা

বুঝাইবার জন্যই **'একস্থং তদভূন্নারী'**। জ্যোতিটি যে একটি নারী বা শক্তিবিশেষ, তাহাই মন্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে। নারী শব্দে কেবল একটি স্ত্রীমূর্তি বুঝায় না। নারী শব্দের অর্থ শক্তি ; উহাই সাধকের ইষ্টদেব। এস্থলে নারী শব্দে—কৃষ্ণ-কালী-শিব প্রভৃতি যে কোন মূর্তি বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মূর্তিই শক্তিবিশেষ। শক্তি যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই বিশিষ্টমূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এখানে নারী শব্দের অর্থ—মূর্তি। মূর্তি শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই মন্ত্রে নারী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কি প্রকারে বিশিষ্টমূর্তি দর্শন হয়, এস্থলে **'একস্থং তদভূন্নারী'** শব্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সকল সাধকেরই এইরূপভাবে ইষ্টদর্শন হয়। কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আবির্ভাবের ইহাই রহস্য — সর্বপ্রথমে একটি ঘন চিন্ময় জ্যোতি বা প্রকাশসত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। পরে উহা সাধকের ভক্তি হিমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুরূপ মূর্তিতে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে মনের কল্পনা ঘনভূত হইয়াও বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন হইতে পারে ; কিন্তু তাহা মুক্তি প্রদান কিংবা সাধকের অভীষ্টপূরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সাধক ! তুমি কি তোমার ইষ্টমূর্তিকে এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে চাও ? উহা একটু কষ্টসাধ্য হইলেও নিতান্ত অসম্ভব বা দুর্লভ নহে। তুমি যতই চঞ্চলচিত্ত হওনা কেন, যত বিক্ষিপ্ততাই তোমার থাকুক না কেন, সযত্নে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, চিদাকাশ প্রকাশিত হউক ; তাহাতে জ্যোতিঃসত্তার আরোপ করিয়া অভীষ্ট মূর্তিদর্শনের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা কর। দেখিবার জন্য সরল-প্রাণ শিশুর ন্যায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাক। দেখিবে অচিরাৎ তোমার আশা পূর্ণ করিয়া, স্থূল দেহের ন্যায় দেহবিশিষ্ট ইষ্টদেব আবির্ভূত হইবেন। ইহা শুধু বাক্যবিন্যাস নহে, সত্যসত্যই মানুষ এইরূপ দেখিতে পায়। কিন্তু মনে করিও না সাধক, শুধু এইরূপ একটি বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন করিলেই তোমার জীবন ধন্য হইবে। যতদিন ঐ মূর্তি মহত্বযুক্ত না হয়, যতদিন প্রাণময় মূর্তি দর্শন না হয়, ততদিন উহা তোমাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে না।

যাহারা প্রথম হইতেই কোন বিশিষ্ট মূর্তি লইয়া সাধনা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা ঐ মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহতীশক্তি ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। যেরূপ সূর্য একস্থানে থাকিয়াও তাঁহার প্রকাশ ও আকর্ষণী শক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ; ঠিক সেইরূপ তোমার ইষ্টমূর্তিও বিশ্বব্যাপী মহতী শক্তিসমন্বিত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। এইরূপ অনুভাব করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ মহত্ত্বযুক্ত মূর্তিদর্শনই যথার্থ দর্শন। এইরূপ দর্শনের পর, উহাতে আত্মভাবে সংস্থিত হইতে অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ যিনি আমার অন্তরে আত্মারূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে মহত্ত্ব-মণ্ডিত ইষ্ট-মূর্তিতে প্রকাশিত ; এইরূপ বুঝিতে হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—**'তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'**। যতদিন মূর্তি আত্মভাবস্থ না হয় অর্থাৎ যতদিন ইষ্টদেবতা স্বয়ং অনুকম্পাপূর্বক সাধকের আত্মরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন অজ্ঞান-অন্ধকার কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। সুতরাং কেবল ইষ্টমূর্তি কেন, জগতের প্রত্যক মূর্তিকেই আত্মভাবস্থ করিয়া দর্শন করিতে হয়। তবে কথা এই যে, ইষ্টমূর্তিতে আত্মভাবস্থ হইতে পারিলে, অন্যত্র উহা সহজ সাধ্য হয়। এইরূপ সর্বত্র আত্মভাবস্থ হইতে পারিলেই সাধকের সর্ববিধ সংশয়ের উচ্ছেদ হয়, অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন অমৃতের আস্বাদ পাইয়া সাধক অমর হয়, আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে।

কি উপায়ে মূর্তি আত্মভাবস্থ হয় ? প্রথমে ইষ্টমূর্তিকে আত্মীয় করিয়া লইতে হয়। আত্মীয়তাই আত্মার ধর্ম। তিনি যে আমার একান্ত আত্মীয়, ইহা বুঝিতে হয়। জগতে আত্মীয়গণকে যতটুকু ভালবাস, অন্ততঃ ততটুকু ভালবাসাও তাঁহার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা কর। একবার যদি তোমার ঐ অশুদ্ধ বিন্দুমাত্র প্রেম তাঁহার চিন্ময় অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে তিনিই উহাকে বিশুদ্ধ ও সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিবেন। তখন তুমি প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। যে মুহূর্তে আত্মহারা হইবে, সেই মুহূর্তেই ইষ্টমূর্তি তোমার আত্মভাবস্থ হইবেন। মনে রাখিও—আত্মহারা না হইলে আত্মভাব ফোটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—ব্রজধামে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা পর্যন্ত করিয়াছিল ; কিন্তু যতদিন শ্রীকৃষ্ণই যে **'আত্মা'** এই পরাভক্তি, এবং উনিই

যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বর, এই মহত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইয়াছিল, ততদিন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও পায় নাই। তাই তিনি গোপীগণকে নিজ নিজ আত্মারূপে সাধনার উপদেশ দিয়া দীর্ঘকালের জন্য দূরস্থ হইয়াছিলেন । তাই বলিতেছিলাম— মূর্তিদর্শন করিলেই ভগবদ্‌লাভ হয় না । উহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা চাই । যে পরিমাণে মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, অর্থাৎ যতটুকু মহত্ত্ব নিয়া তিনি প্রকাশিত হইবেন, একবার মাত্র দর্শনে সাধক স্বয়ং ততটুকু মহত্ত্বযুক্ত হইবেন । জীব ? তুমি মাকে যতটুকু দেখিবে, মায়ের ততটুকু লক্ষণ তোমাতে প্রকাশ পাইবেই পাইবে । মাকে দেখিলে অথচ তোমার সংসার আসক্তি কমিল না, সুখ-দুঃখ-হর্ষ বিষাদের দ্বন্দ্ব কমিল না, চিত্তে একটা প্রশান্তভাব আসিল না, মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল না, ইহা হইতেই পারে না । মা যে আমার সর্বতঃ স্পৃহাশূন্যা, মা যে আমার নির্বিকারা, মা যে আমার অমৃতস্বরূপা, মা যে আমার এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্যে নিত্য নিরত থাকিয়াও ধীরা-স্থিরা-নির্বিকল্পা । ওগো ! তোমরা এমন মাকে একবার দেখিয়াও সাধারণ জীবের মত সুখ-দুঃখ চঞ্চল, মৃত্যু ভয়ে ভীত, সংসার আসক্তিযুক্ত থাকিবে ? তা কি হয় ! কখনই নয় । কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণের যে প্রকাশভাব, তাহাই তেজ। উহা একীভূত হইয়াছে । একটা মহাপ্রকাশে সমস্ত বিশ্ব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে । হ্যাঁ, প্রকাশের এমনই ক্ষমতা বটে ! সমগ্র বিশ্ব বিলুপ্ত হয় । কথাটা একটু খুলিয়া বলিতেছি— তোমরা 'এক্সরে' নামক আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের বিষয় অবগত আছ । ঐ যন্ত্রটির দ্বারা চিকিৎসকগণ শরীরাভ্যন্তরস্থ অস্থি পরীক্ষা করিয়া থাকেন । সে যন্ত্রের কিরণরেখাগুলির এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা যে চর্ম, মাংস, রক্ত প্রভৃতি কোমল জিনিষগুলি ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে, জগতের সমস্ত পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায় । সুতরাং জগৎসত্তা বিলুপ্ত হয় এমন কি , দেশ কাল পর্যন্ত প্রতীত হয় না । 'এক্সরে' যন্ত্র কেবল অস্থি বা তদনুরূপ কঠিন জিনিষেই প্রতিহত হয় ; কিন্তু বিজ্ঞানজ্যোতি কিছুতেই প্রতিহত হয় না ।

ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক— আলো বা প্রকাশ যে স্থলে প্রতিহত অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই প্রকাশিত করে । সূর্যাদির কিরণে যে আমরা রূপাদি প্রত্যক্ষ করি, তাহারও রহস্য এই । সূর্যরশ্মি যে বস্তুতে প্রতিহত হয়, অর্থাৎ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, সেই বস্তুই আমরা দেখিতে পাই । আকাশ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্যকিরণ চলিয়া আইসে তাই উহা অদৃশ্য । কিন্তু পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিহত হয় বলিয়াই পার্থিব বস্তুসমূহ আমরা দেখিতে পাই । আরও দেখ, তুমি ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইতেছ, ইহার অর্থ এই—তোমার নেত্রপথ দিয়া যে প্রকাশশক্তি নির্গত হইতেছে , তাহা প্রাচীর পর্যন্ত গিয়া আর যাইতে পারিল না। উহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে ; তাই তুমি প্রাচীর দেখিতেছ । প্রাচীরের অপরপার্শ্বে কি আছে, তাহা তোমার নেত্র নির্গত প্রকাশশক্তির দেখাইবার সামর্থ্য নাই। এইরূপ আমরা যখনই যাহা কিছু দেখি, শুনি, গন্ধ লই, আস্বাদ করি, স্পর্শ করি, অর্থাৎ এককথায় জানি ; উহার অর্থ— 'অনেকাংশই জানি না' । জানি মানেই— এক অংশ মাত্র পরিজ্ঞাত । আমার জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে, জ্ঞেয় বস্তুর সম্পূর্ণ অংশ আমাকে জানাইতে পারে না । সেইজন্যই জাগতিক জ্ঞানের নাম—অজ্ঞান বা ঈষৎ জ্ঞান । একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ—যে মুহূর্তে তুমি বল —**'আমি বৃক্ষটি জানি'**, সেই মুহূর্তেই ঐ জানার পার্শ্বেই একটা মস্ত বড় অজ্ঞান থাকিয়া যায় । **'বৃক্ষ জানি'** বলিলেই—সেই মুহূর্তে **'বৃক্ষভিন্ন অন্য কিছু জানি না '**এইরূপ একটা অজ্ঞান ঐ জ্ঞনের পার্শ্বেই দাঁড়ায় ; সুতরাং জগতের প্রত্যেক বিষয়ই এই জানা ও অজানার উপরেই প্রতিষ্ঠিত । অজ্ঞান যে আছে, তাহা জ্ঞানই জানাইয়া দেয় । বেদান্ত দর্শন বলেন— এই জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানের নাম মায়া । সে যাহা হউক, প্রকাশ বলিলে —একমাত্র জ্ঞানই বুঝায় ! অন্তরে যাহা জ্ঞান, বাহিরে তাহাই তেজ ; অন্তরে যাহা অজ্ঞান বাহিরে তাহাই অন্ধকার। জ্ঞানটি হইতেছে চিৎ অর্থাৎ চেতন । এই জ্ঞান বা চৈতন্যের উপলব্ধি করিতে পারিলেই স্বপ্রকাশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় । ঐ স্বপ্রকাশ বস্তু তখন দিগন্তপ্রসারী হইয়া পড়ে । এমন কোন পদার্থ নাই যে, সেই প্রকাশকে প্রতিহত করিতে পারে । সর্বতোভেদী সে প্রকাশ যাবতীয় পদার্থসত্তা ভেদ করিয়া—প্রত্যেক

পরমাণুকে শতধা সহস্রধা ভেদ করিয়া মহতী ব্যাপ্তি লাভ করে। সুতরাং জগৎসত্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কোন পদার্থই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

এই অবস্থায় দেশ এবং কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। কারণ পদার্থদ্বয়ের অন্তরাল দ্বারা আমরা দেশনামক বস্তু অনুভব করি। যদি কোন পদার্থই প্রতীতিগোচর না হয়, তবে দেশের জ্ঞান থাকিতে পারে না। তার পর কাল। কাল কি ? ক্রিয়াদ্বয়ের অন্তরালদ্বারা আমাদের কাল নামক একটা বস্তুর অনুভব হয়। কেহ বলেন ক্রিয়ার —অধিকরণই কাল। কেহ বলেন — ক্রিয়াই কাল। ও সকল মতভেদে বস্তুসত্তা অববোধের কোন হানি নাই। উহার সকল মতই সত্য। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ক্রিয়ার দ্বারাই কালকে বুঝি। একবার সূর্যোদয় দেখিলাম, আবার সূর্যোদয় দেখিয়া বলি—একদিন গেল। বস্তুতঃ কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান, কাল যায় না। আমরা চঞ্চল — গতিশীল বলিয়াই দেখি—'**কালোগচ্ছতি**'। বাস্তবিক তাহা নহে। দ্রুতগামিশকটারূঢ় ব্যক্তি যেমন পথিপার্শ্বস্থ ভূভাগকে গমনশীল দেখিতে পায়, ইহাও সেইরূপ। যাক্ সে কথা, আমরা বলিতেছিলাম—স্বপ্রকাশ জ্ঞানের উদয়ে কালবোধ তিরোহিত হয়। পূর্বে বুঝিয়াছি — পদার্থ সত্তা বিলুপ্ত করিয়া সে জ্ঞান উদয় হয়। পদার্থের অভাবে ক্রিয়াবোধ থাকিতে পারে না। ক্রিয়াবোধ তিরোহিত হইলে, কালের জ্ঞান সুতরাং বিলুপ্ত হয়। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি—এই দেশ ও কালের অতীত স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় সত্তায় উপনীত হইয়াই আচার্য শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা ভ্রান্তি বা অধ্যাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাস্তবিক সেখানে জগৎ বলিতে কিছু থাকে না, কখনও ছিল বা হইবে, এমনও মনে হয় না।

আমরা অনেক অবান্তর কথা আলোচনা করিয়াছি ; এইবার পুনরায় একবার সংক্ষেপে মন্ত্রের অর্থটি আলোচনা করিয়া লই। দেবতাবৃন্দের যে ব্যাষ্টি প্রকাশ তাহা সমষ্টিভূত হইলে একটা দিগন্তপ্রসারী জ্যোতিঃ বা প্রকাশ উপলব্ধি হইতে থাকে। প্রথমতঃ উহা একটি আকাশীয় তত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হয়। বাস্তবিক উহা তত্ত্বমাত্র নহে। উক্ত দিগন্তব্যাপী জ্যোতিঃসত্তার সর্বেন্দ্রিয় ধর্ম আছে। যদিও কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই, তথাপি সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম উহাতে পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত। এক কথায়, উহার ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব বুঝাইবার জন্য '**একস্থং তদভূন্নারী**' কথাটি বলা হইয়াছে। উহা যে মাত্র একটা জ্যোতিঃ নহে—উনি একজন ; ইহাই এই মন্ত্রের বিশেষ তাৎপর্য। এতদ্ভিন্ন সাধকের ইষ্টমূর্তিও যে ঐরূপ স্বপ্রকাশ দিগন্তব্যাপী জ্যোতিঃসত্তার মধ্য হইতেই প্রকাশ পায়, এ কথাও প্রথমেই বলা হইয়াছে।

———○———

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥১৩॥

অনুবাদ। শম্ভুর তেজে সেই মূর্তির মুখমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ যমের তেজে কেশ এবং বিষ্ণুর তেজে বাহু গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে পাঁচটি মন্ত্রে উক্ত মূর্তির বিভিন্ন অবয়বসংস্থান বর্ণিত হইতেছে। যদিও সম্মিলিত দেবতাবৃন্দের সমষ্টিভূত তেজোরাশিই মূর্তিরূপে প্রকটিতা, তথাপি ঋষিগণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমষ্টির ভিতর ব্যষ্টি অংশটিও পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই, কোন্ দেবতার তেজে মায়ের কোন্ অবয়ব গঠিত হইয়াছিল,তাহাই বলা হইতেছে। শাম্ভব তেজ—শিব, তৎসম্বন্ধীয় তেজ, অর্থাৎ জ্ঞানময় প্রকাশশক্তি। তাহার দ্বারা মায়ের মুখমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। মুখেই পঞ্চ জ্ঞানন্দ্রিয়ের দ্বার বিদ্যমান। যদিও স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্— সর্বশরীরব্যাপী, তথাপি অধর ওষ্ঠেই তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি। জ্ঞানের যে পঞ্চবিধ প্রবাহ, তাহা মুখমণ্ডলেই বিশেষভাবে প্রতিভাত ; তাই জ্ঞানময় দেবতা শিবের তেজে মুখ।

যাম্য—যম সম্বন্ধীয় তেজ। যম—সংযমন কর্তা এই পরিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড প্রকাশ বা উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া অখণ্ড মহাকাল সাগরে নিমজ্জিত করেন বলিয়া ইহার নাম যম। শাস্ত্রে ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। বহুত্ব অর্থাৎ সর্ব বর্ণ যে স্থানে সম্যক্ মিলাইয়া যায়, তাহা জগতের পক্ষে ঘোর অন্ধকার স্বরূপই বটে। যথার্থই যে স্থানে সর্বভাবের বিলয় হয়, সে স্থান যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন উহাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না বলিয়া থাকা যায় না। তাই যমের তেজে মায়ের ঘনকৃষ্ণ অলকা বা কেশরাশি গঠিত হইয়াছিল। মায়ের পশ্চাদ্ভাগে আগুলফলম্বিত

কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি যেমন সন্তানদিগকে বলিয়া দেয়, আমরা পশ্চাদ্ভাগে কি আছে, তাহা দেখিতে পাইবে না। মহাকাল-শক্তির পরপারে কি আছে, তাহা বাক্য এবং মনের অগোচর। তাই মা আমার মুক্তিকেশী হইয়া মহাকাল প্রকাশের পশ্চাদ্ভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিষ্ণুর তেজে বাহু। বিধারণশক্তি বাহুতেই অভিব্যক্ত হয়; তাই মায়ের বাহু, জগদ্বিধারক বিষ্ণুর তেজে সম্ভূত হইয়াছিল। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—মন্ত্রে '**বাহাবঃ**' এই বহুবচনান্ত বাহু-শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং এই মূর্তি চতুর্ভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা কিংবা সহস্রভুজাও হইতে পারে। বৈকৃতিক রহস্যে উক্ত হইয়াছে—'**অষ্টাদশভুজা পূজ্যা, সা সহস্রভুজা সতী**।' এই মহালক্ষ্মী মূর্তি অষ্টাদশভুজা, অথবা সহস্রভুজা, উভয়বিধই হইতে পারে। যে সাধকের যেরূপ সংস্কার, মূর্তির আবির্ভাবও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং উহা লইয়া বিবাদ করিবার কোন হেতু নাই। স্থূল কথা—মায়ের আমার বিশিষ্ট কোনও রূপ নাই, অথচ এই সব রূপই তাঁর। সে সাধক যেরূপ সংস্কার দিয়া মাতৃ-মূর্তি গঠিত করেন মা আমার সেরূপ মূর্তিতেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

আসল কথা হইতেছে—ঐ '**নির্গতং সুমহত্তেজঃ**'। মহত্তেজটিই মূর্তিরূপে সাধকের অভীষ্ট পূরণের জন্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েন। যে বস্তুটির দ্বারা মূর্তি গঠিত হয়, সে বস্তুটি যদি লাভ হয়, তবে সংকল্প অনুযায়ী যে কোন মূর্তি যে কোন সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কুম্ভকারের মৃত্তিকাদি, উপকরণগুলি আয়ত্তীভূত, সে যেরূপ বারমাসই বিভিন্ন প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ধনোপার্জন করিতে পারে, সেইরূপ যে সাধকের মহত্তেজটি আয়ত্তীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি ইচ্ছামাত্রেই মহৎ-তত্ত্ব পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি যখন যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই মূর্তিরই পূজা করিয়া বিশিষ্ট আনন্দলাভ করিতে পারেন। তাই হিন্দুশাস্ত্রে প্রায় বারমাসই বিভিন্ন দেবমূর্তি গঠনপূর্বক বিভিন্ন পূজাবিধি পরিদৃষ্ট হয়, এবং এই জন্যই ভারতবর্ষে এত বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিপূজা প্রচলিত। ইহা অন্য কোন দেশে নাই। যাহারা অল্পজ্ঞ, তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা ভেদ-বুদ্ধিজনক হইতে পারে; কিন্তু মনে রাখিও—ঋষিবৃন্দের পদধূলিতে পবিত্রীকৃতদেশে এমন কোন বিধান দেখিতে পাইবে না—যাহার অভ্যন্তরে সুগভীর আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি নাই। বর্তমান শিক্ষার দোষে সাধনা-জগতেও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে; তাই বহু দেবদেবী মূর্তির পূজাবিধি দেখিতে পাইয়া, অল্পজ্ঞগণ নিঃসঙ্কোচে হিন্দুগণকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। হায়! এরূপ নিন্দাবাদ অধুনা কোন কোন ভারতবাসীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। ধন্য কালের অলঙ্ঘনীয় শক্তি! যাঁহারা যথার্থ একেশ্বরবাদী,যাঁহাদের বাণী—'এক আমি বহু হইব', যাঁহারা সেই 'একেশ্বরকে' নিজের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে, প্রতি পরমাণুর মধ্যে অবিকৃত ভাবে দেখিতে পান; তাঁহারা যে দেশের লোক, সেই দেশবাসীর মুখে ওরূপ কথা যথার্থই মর্ম পীড়াদায়ক। যাক্ সে অন্য কথা।

আমাদের দেশে এই দেবতা ভেদবিষয়ক জ্ঞান এত প্রবল—এত মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যাঁহার ধর্মচর্চা করেন, যাঁহারা যথাবিধি সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই মুখে বলেন—কৃষ্ণ-কালী-শিব-দুর্গা-রাম-বিষ্ণু সবই এক, শুধু আকার ও নামের ভেদমাত্র; অথচ অন্তরে অন্তরে পূর্ণ ভেদজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকেন। যিনি যে মূর্তিতে বিশেষভাবে অনুরক্ত তিনি সেটি ব্যতীত অন্যমূর্তি দেখিলে সেইটিও যে 'আমারই ইষ্টমূর্তি' এরূপ বোধ কিছুতেই করিতে পারেন না। কেন এরূপ হয়? শুধু জ্ঞানের অভাব। যে জ্ঞানে ভেদবোধ দূরীভূত হয়, যাহাতে ভেদের সংস্কার উন্মুলিত হয়, সেরূপ জ্ঞানের অনুশীলন না করাই উহার হেতু। তাই বলিতেছিলাম—যে জিনিষ দিয়া মূর্তি গঠিত, তাহার দিকে যদি লক্ষ্য ও অনুরাগ থাকে, তবে আর বহুমূর্তিতেও ভেদজ্ঞান কিছুতেই থাকিতে পারে না।

সাধক! এখনও যদি বিভিন্নমূর্তি দেখিয়া তোমার বহু ঈশ্বরবোধের কলঙ্কিত সংস্কার থাকে, তবে কেবল দেখিতে থাক—কোন জিনিষটি মূর্তির আকারে প্রকটিত। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সমরস, যে আনন্দঘন একত্ব—অখণ্ড ভাবে বিরাজিত, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাও, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে। সাধনার কোথায় দোষ, তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেখানে

দেখিবে—ভেদবাদ, বহুবাদ, পরমতের নিন্দাবাদ, বুঝিবে —তাহা ঠিক পথ নহে। সাধনার প্রারম্ভে এই বহুত্ববিষয়ক সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিতে হয়। যিনি উহা পারেন—যিনি শিষ্যহৃদয়ের বহুত্ববিষয়ক ঘোর অন্ধকার নাশ করিয়া দিতে পারেন, শুধু মুখে নয়, উপদেশে নয়, কার্যে যিনি ইহা পারেন—তিনিই যথার্থ গুরুর কাজ করিয়া থাকেন। যথার্থই তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। মনে রাখিও—জীব! যতদিন তোমার ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হইবে, ততদিন মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শ্রুতি বলেন—'**মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি**'—যে ব্যক্তি এই জগতে নানাত্ব অর্থাৎ বহুভাব দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অগণিত জন্মমৃত্যুর সংপেষন, সুখ দুঃখের প্রবল কশাঘাত ততদিন কিছুতেই বিদূরিত হয় না, হইতে পারে না—যতদিন এই নানাত্ব দর্শন থাকে।

সে যাহা হউক, আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যাঁহারা মূর্তি বিরোধী, নামরূপ কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা মনে রাখিবেন—ঐ যে '**সুমহত্তেজঃ**' যাহা নারীরূপে—মূর্তি-রূপে প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথার্থ অবয়ব নহে, তত্তৎ অবয়বের ধর্ম মাত্র। যেমন মুখ নাই, অথচ মুখের ধর্ম আছে, হস্ত নাই, অথবা হস্তের ধর্ম আছে। এক কথায় '**সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্**' বলিলে যাহা বুঝায়, অথবা '**অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ**' বলিলে যাহা বুঝায়, সেই রহস্য বুঝাইবার জন্যই এই মূর্তি ও তাহার অবয়ব-সংস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে। সুমহত্তেজ বা মহৎতত্ত্ব-রূপ যে প্রকাশ, উহা সর্বেন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সর্বেন্দ্রিয়ধর্ম সমন্বিত। ইহাই হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থান বর্ণনার উদ্দেশ্য।

আধুনিক বেদান্তবাদিগণ—যাঁহারা নেতি নেতি মার্গের সাধক, তাঁহারা যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন পর্যন্ত পরিত্যাগ পূর্বক বিজ্ঞানে আরোহণ করিয়া সুমহত্তেজ প্রত্যক্ষ করেন, সেই সময় ঐ বিজ্ঞানকে সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত অথচ সর্বেন্দ্রিয়ধর্মসমন্বিত বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেই, চণ্ডীর এই উপদেশ—এই '**একস্থং তদভূন্নারী**' বাক্যটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এখানে আসিলে ভক্তিভাব আপনি উপস্থিত হয়। ইহা দুই চারি ফোঁটা নয়ন জলের ভক্তি নহে; ইহা যথার্থই ভক্তিশব্দবাচ্য। যতই নেতি নেতি বলুন না কেন, বিজ্ঞানময় কোষের সে বিশালতা, সে মহত্ত্ব, সে ব্যাপ্তি, সে বিভূত্ব, সে ঈশ্বরধর্ম দেখিলে, তাঁহাকে একান্ত আশ্রয় না বলিয়া থাকা যায় না। এই আশ্রয়-আশ্রিতজ্ঞান ফুটিলেই যথার্থ ভক্তির ভাব আবির্ভূত হয় এবং এই আশ্রয় জ্ঞান হইতেই বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে।

আবার যাঁহারা সাংখ্য ও যোগমার্গাবলম্বী, তাঁহারা সমাধি যোগে রূপ রসাদি তত্ত্ব সকল সাক্ষাৎ করিয়া, যখন এই মহত্তত্ত্বে উপনীত হন, যখন উহাকে একটি তত্ত্বমাত্র না বুঝিয়া ঈশ্বরভাবে দর্শন করিলেই এই নারী বা মূর্তির রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাংখ্যমতে যদিও ঈশ্বর স্বীকার নাই, তথাপি মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারকে 'জন্য ঈশ্বর' বলা হয়। সুতরাং মহত্তত্ত্বে উপনীত হইলে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে আপত্তি কি? যথার্থই যাবতীয় ঈশ্বরধর্ম এইখানেই অভিব্যক্ত। আর উপাসনা ঈশ্বরেরই হয়। পরমাত্মা বা পুরুষের উপাসনা নাই। ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলে, পুরুষ বা পরমাত্মা অর্থাৎ নির্গুণ-স্বরূপে অবস্থান অনায়াসসাধ্য হয়। উহা স্বয়মাগত একটি অবস্থা বিশেষ। কোন উপায় বা কৌশলের সাহায্যে তাহা হয় না। যতক্ষণ তুমি কোনরূপ উপায় বা কৌশলের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছ, ততক্ষণ তুমি উপাসক বা সাধক। উপাসনা বা সাধনা এই সুমহত্তেজেরই হইয়া থাকে। যে তেজ—'**একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা**'।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামুনি মেধস সমাধিসহায় সুরথকে যে উপাখ্যান শুনাইয়াছেন—উহা যে সকল দর্শন-শাস্ত্র সিদ্ধ আধ্যাত্মিক রহস্য, ইহা বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিতে হইল। মনে রাখিও—সমাধিসহায় জীবাত্মা প্রজ্ঞানরূপী গুরুর নিকট বসিয়া চণ্ডীতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাই প্রথম খণ্ডেই বলিয়াছি—চণ্ডী বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। সাধকগণ যত বিভিন্ন প্রণালী দিয়াই অগ্রসর হউন না কেন, সকলেই সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্তের মধ্য দিয়াই চলিতেছেন। বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্মবিচার, সাংখ্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং যোগশাস্ত্রের অষ্টাঙ্গযোগ—এ সকল ঋষি প্রদর্শিত পন্থা; ইহা পরিত্যাগ করিয়া কাহারও একপদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, উহার মধ্যে দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সেই জিনিষটাই

পুরাণাদি শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে নানাবিধ উপাখ্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

———০———

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্য ভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব দেশ গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। চন্দ্র—মনের অধিপতি দেবতা। সুধাক্ষরণই চন্দ্রের স্বভাব ; তাই সুধাকরের তেজে মায়ের পীন-পয়োধরযুগল অভিব্যক্ত হইল। আমরা যে রূপরসাদি বিষয়, কিংবা সুখ-দুংখ-হাসি-কান্না প্রভৃতি ভাব নিয়া থাকি, উহা বস্তুতঃ মন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সাধারণ চক্ষুতে লক্ষ্য হয়-যেন মনই আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রও বলেন **'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'** ; কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য কি বলেন—শুন —**'মনই মায়ের স্তনযুগল'**। কথাটি একটু ভাবিবার বিষয়। সাধারণতঃ যাহা অজ্ঞান, যাহা পাপ, যাহা সঙ্কীর্ণতা, পরিচ্ছিন্নতা, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। অথচ এই মনই— মাতৃ-স্তন্য। ব্যাপারটা কি ? কল্পিত শিশুচৈতন্যকে মনোরূপ নিতান্ত চঞ্চল, অথচ মুখরোচক কোন একটা কিছুর আশ্রয় না দিলে, উহা অবীচিলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্মসত্তা বোধই করিতে পারে না। যতক্ষণ এই কল্পিত শিশুভাবাপন্ন চৈতন্য কোন একটা উত্তেজক স্পন্দন না পায়, ততক্ষণ সে আপনার অস্তিত্ব বোধই করিতে পারে না। এই দেখ— সাধারণ মানুষের মন একটু স্থির হইলেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। 'আমি আছি', —এই বোধটিও জাগাইয়া রাখিতে পারে না। মন যেন জীবচৈতন্যর আশ্রয় যষ্টি। যতদিন জীব এই কল্পিত শিশুভাবকে না ছাড়িবে, অর্থাৎ 'আমাকে' না চিনিবে, ততদিন যিনি জীবের একান্ত হিতৈষী, যিনি জীবকে যথার্থ ভালবাসেন, তিনি কি করিবেন ? যাহাতে জীব তাহার 'আমি' কে হারাইয়া না ফেলে, যাহাতে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপটি চিনিতে পারে, এরূপভাবে পরিচালিত করিবেন। 'ইহাই ত' বন্ধুর কাজ।

সাধক ! মা তোমাকে উৎপীড়ত করিবার জন্য —যাতনা দিবার জন্য, তোমার ভক্তি বিশ্বাসের বল পরীক্ষার জন্য, মনোরূপ শয়তানকে ছাড়িয়া দেন নাই। তোমাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই দিন দিন তোমাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই, স্নেহময়ী মা মনোরূপ স্তন সুধা দিতেছেন। একবার চাহিয়া দেখ—তোমার ঐ মনটির দিকে। যাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা-অসূয়া-পরনিন্দা প্রভৃতি রহিয়াছে, ঐ মনটিই মায়ের স্তন। তুমি দিবা রাত্রি উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া কি করিতেছ ? মাতৃ-স্তন্য পান করিতেছ। রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতি মুহূর্তে মন আকারিত হইতেছে। হ্যাঁ, ইহাই ত মাতৃ-স্তন্য ! এই চঞ্চলতা, এই কামাদিবৃত্তির তাড়না, উহাই তোমাকে দিন দিন পরিপুষ্ট করিয়া লইতেছে। কার্যতঃ উহাই মায়ের আমার স্নেহসুধা। তুমি মনের ভাবগুলিকে বিষয় বলিয়া ভোগ কর, তাই পরিণামে বিষের জ্বালা সহ্য করিতে হয়। মাতৃ-স্তন্যজ্ঞানে ভোগ কর— পরিণাম অমৃতময় হইবে। ইহা শুধু কবিত্বের উচ্ছ্বাস নহে। যথার্থই সাধনার রহস্য।

আর একদিক দিয়া দেখ— চন্দ্রের একটি নাম ওষধিপতি। চন্দ্রকিরণেই ধান্যাদি শস্য পুরিপুষ্ট হয়, তাহারই পরিণাম— অন্ন। অন্ন দ্বারাই আমাদের স্থূলদেহ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং আমরা অন্নরূপ যে মাতৃ-স্তন্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছি, তাহাও চন্দ্রের তেজ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ কি অন্নময়কোষ, কি মনোময়কোষ, কি বিজ্ঞানময় কোষ, সকল কোষেই আমরা মাতৃ-স্তন্য পান করিতেছি। সাধক, শুধু এই একটি কথা ধারণা করিতে পারিলেই যে জীবন ধন্য হয় ! সাধনার প্রয়োজন পর্যবসিত হয় ! 'আমাদের যাহা মন তাহা বাস্তবিকই মাতৃ-স্নেহ'।

আবার অন্যদিক দিয়া দেখ—মাতৃস্নেহই ঘনীভূত হইয়া স্তনযুগল রূপে জননীর বক্ষোপরি অভিব্যক্ত হয়। ইহা ধারণা করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হ্রাস পায়। কামিনীর পীনস্তনে ভোগের চিহ্ন না দেখিয়া, ঘনীভূত স্নেহ দেখিতে অভ্যাস কর। নারী হৃদয়ে সন্তান স্নেহ এত বেশী যে, ঘনীভূত হইয়া বাহিরে স্তনের আকারে প্রকাশ পায়। পুরুষের স্নেহ তত অধিক হয় না বলিয়াই, পুরুষের স্তন তাদৃশ বৃদ্ধি পায় না।

এস্থলে একটি সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি — কোন অপোগণ্ড শিশুর মাতৃবিয়োগ হয়, এবং অন্য

কোন স্ত্রীলোক তাহার প্রতিপালনের ভার না লওয়ায়, স্বয়ং পিতাই উহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন । ঐ শিশুটি পূর্বসংস্কারবশতঃ পিতার বক্ষে মুখ দিয়া স্তনপানের অভিনয় করিত । ক্রমে উহার প্রতি পিতার স্নেহ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি দিবারাত্রি শিশুটিকে নিয়াই থাকিতেন । অল্পদিন পরেই তাহার বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে যথার্থই একটি স্তন দেখা দিল ; এবং উহা হইতে যথার্থই দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইত ! এই লোকটির বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, ইনি জাতিতে—কায়স্থ । আমি স্বয়ং ইহার সহিত পরিচিত । সে যাহা হউক, আমাদের শুধু এই কথাটি মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে, অন্তরস্থ সন্তানস্নেহ অতিশয় ঘন হইলেই, উহা স্থূল দেহে স্তনের আকারে প্রকাশ পায় । নারী—মূর্তিমতী অপত্য-স্নেহ ; তাই সাধারণতঃ নারীদেহেই স্তন-যুগলের প্রকাশ।

এই ত' গেল মূর্তির দিকে । আধ্যাত্মিকতত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়—পূর্বোক্ত তেজোরাশি যে একটি জড় জ্যোতিমাত্র নহে, উহাতে যে মাতৃ-স্নেহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, ইহা বুঝাইবার জন্যই **'সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মম্'** বলা হইয়াছে ! এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । বারংবার সে কথার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন ।

ইন্দ্রের তেজে দেবীর মধ্যভাগ গঠিত হইয়াছিল । ঐশ্বর্যার্থক ইন্দ্র ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন । ইন্দ্র দেবাধিপতি, সর্বৈশ্বর্যসমন্বিত । দেহের মধ্যভাগেই যাবতীয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ । ভূরাদি পঞ্চলোক স্থূল দেহের মধ্যদেশেই বিরাজিত । মূলাধারাদি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি হইতেই যাবতীয় ঐশ্বর্য অর্থাৎ বিভূতির বিকাশ হয় । তাই ঐন্দ্রতেজই মায়ের মধ্যদেহরূপে উক্ত হইয়াছে। (বিভূতির রহস্য ইহার পরেই ব্যক্ত হইবে)।

বরুণের তেজে জঙ্ঘা, উরু এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্বদেশ গঠিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ স্থূল দেহে কণ্ঠের উপরিভাগই চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান। মধ্যদেশ তদপেক্ষা জড়ভাবাপন্ন। তথাপি কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, লিঙ্গমূল এবং মূলাধার প্রভৃতি স্থানে, বিশিষ্ট প্রযত্ন দ্বারা চৈতন্যের বিশেষ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেহের যেটা নিম্নভাগ অর্থাৎ জঙ্ঘা, উরু ও নিতম্বদেশ উহা অতিশয় জড়ভাবাপন্ন। ঐ সকল স্থানে চৈতন্যের কোনরূপ বিশেষ অভিব্যক্তি নাই। তাই প্রকৃতির সর্বশেষ পরিণাম—অত্যন্ত জড়ধর্মী জল ও ক্ষিতি তত্ত্বের অধিপতি বরুণ এবং বসুন্ধরার তেজে দেবীর জঙ্ঘা, উরু ও নিতম্বদেশ গঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল অবয়বে বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়-প্রবাহ পরিচালিত হয় না। জঙ্ঘা এবং উরুদেশ দিয়া বরং পাদেন্দ্রিয়-প্রবাহ পরিচালিত হয় ; তাই প্রবাহশীল জলতত্ত্বাধিপতি বরুণের তেজে ঐ অবয়ব, এবং অত্যন্ত জড়ধর্মী ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতির তেজে নিতম্ব প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

এস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল দেবমূর্তিতে কোনরূপ জড়ধর্মের বিকাশ নাই, চৈতন্য বা প্রকাশধর্ম দ্বারাই এ সকল গঠিত। এ দেহের কোনস্থানেই জড়ত্ব নাই। তাই সমুদয় অবয়বই দেবতার তেজ বা বিশিষ্ট চৈতন্য দ্বারা গঠিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তবে কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা থাকিলেই, প্রথম দৃষ্টিতে উহা জড়ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়, তাই নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে জড়ধর্মের উল্লেখ আছে ! বস্তুতঃ উহা জড় নহে। যে চৈতন্য জড়াকারে প্রতীয়মান হয় সেই চৈতন্য দ্বারাই দেবীর দেহ গঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেহ এবং এই সকল দিব্যদেহে, এই জড় ও চৈতন্যের বিভিন্নতা। জীবদেহ স্থূল জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত, এবং দেবদেহ জড়াধিষ্ঠিত চৈতন্য দ্বারা গঠিত।

এ ত' গেল বিশিষ্ট মূর্তির কথা। আধ্যাত্মিক রহস্যে দেখিতে পাওয়া যায়— আত্মার যে মহত্তত্ত্বরূপ অভিব্যক্তি সাধকগণ তাহাতে ঐ সকল অবয়ব ধর্ম উপলব্ধি করিয়া থাকেন ; কারণ, যাবতীয় ব্যক্তি-ধর্মই সেখানে বিকাশ পায়। সূক্ষ্মে ঐরূপ সর্বাবয়ব-ধর্ম থাকে বলিয়াই স্থূলে উহার অভিব্যক্তি হয়। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্যে থাকিতে পারে না। **'কারণগুণাঃ কার্যগুণমারভন্তে'** — কারণের গুণসমূহই কার্যের যাবতীয় গুণের আরম্ভক হয়। তাই, পরমেশ্বররূপ আদিকারণে সৃষ্টির — অর্থাৎ স্থূলের যাবতীয় ধর্ম, যাবতীয় গুণ অব্যাহতভাবেই থাকে, যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা দেখিতে পান।

কোন অবয়ব নাই অথচ সকল অবয়বেরই ধর্ম আছে, ইহা কিরূপ ? এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠিতে পারে। যদিও ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, তথাপি বলিতেছি— মনে কর, এমন

একটি প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্যময়-সত্তার নিকট তুমি উপস্থিত হইয়াছ, যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, অথচ দর্শনাদি ব্যাপার রহিয়াছে। যেন দেখিতেছে, যেন শুনিতেছে, যেন কথা কহিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। 'যেন' শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া, ঐ সকল একটা মনের কল্পনামাত্র বুঝিও না ; কারণ, যে স্থলে এ ধর্ম বিকাশ পায়, তাহা কল্পনারাজ্যের অনেক উপরে। উহা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধির স্থান। মনে যে সকল কল্পনা হয়, তাহা প্রায়ই কার্যে পরিণত হয় না, স্থূলে —প্রকাশ পায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ 'যেন' গুলি এত সত্য, এত স্থির, এত নিশ্চিত যে, ইহার অন্যথা কখনও হয় না। আর একটি কথা—মানসকল্পনাগুলির কিছুদিন পরে বিস্মৃতি হয় ; কিন্তু এখানে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার স্মৃতি দীর্ঘকাল থাকে।

———o———

ব্রহ্মণাস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্যের তেজে পাদাঙ্গুলি, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি এবং কুবেরের তেজে নাসিকা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার তেজে মায়ের রক্তচরণ দুখানি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সাধক-রচিত বহুজনবিদিত একটি সঙ্গীতের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। যদিও ঐ সঙ্গীতের মাত্র একটি অংশের সহিত আমাদের এই মন্ত্রস্থ প্রথম পাদের সাদৃশ্য আছে, তথাপি সঙ্গীতটি এত সুন্দর এবং উচ্চ ভাবযুক্ত যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে আকৃষ্ট হইবেন। গ্রন্থকারের কর্মজীবনের সহিতও উহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে ! গানটি আগমনী। উমা বহুদিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। জননী মেনকা তাঁহার আভরণহীন দেহখানি দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন উমা মাকে বুঝাইতেছেন—

আমার নাই আভরণ অমন কথা মুখে এনো না মা আর।
আমিই কেবল এ জগতে করতে পারি অলঙ্কারের অহঙ্কার॥
এ জগৎ বটে আমার অলঙ্কারে সাজান থাল,
প্রাতর্মধ্য সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল।
আবার নিশাকালে বদলে পরায়, তাতে আলো আঁধার দুই দেখায়
আহা, বলনা ভবে কার বা আছে এমন অলঙ্কার॥ ১॥
কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সূতায় গাঁথা তারার ফুল।
প'রে থাকি বলে বলি ইন্দ্রধনু একাবলী ;
তা বই জয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়ন্ত-হার॥ ২॥

জীবের জীবন নাসার নোলক, তাত জানে সর্বজন ;
পদ্মপত্র-জলের মত দোলে যে তা সর্বক্ষণ।
জ্ঞান-সমুদ্রের মহারতন উপনিষদ্ আমার কর্ণভূষণ ;
মুকুট আমার সদানন্দ নাশেন ভবের অন্ধকার॥ ৩॥

ও মা, বরাভয় মোর হাতের বলয় সে ত' সবার জানা কথা,
করুণাকঙ্কণে পরি মুক্তিফলের মুক্তা গাঁথা।
মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি সতত সঙ্গোপনে থাকি,
নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধু চন্দ্রহার॥ ৪॥

ও মা অষ্ট সিদ্ধির নূপুর পরি, তাতেই বেশী অনুরাগ,
পুণ্যগন্ধ-স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ।
ব্রহ্মা আমার অলক্ত জল কেশব আমার চোখের কাজল
কালান্তক তাম্বূল আমি চর্বণ করি বারবার॥ ৫॥

এ সব 'গোবিন্দ' দেখেছে ভাল সুধাইলে বলবে সেই,
বাছা বাছা কালমেঘের আমলা বাটা কেশে দেই।
পোহাইলে বিভাবরী শিশুসূর্যের সিন্দূর পরি,
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাকি অনিবার॥ ৬॥

এই সঙ্গীতচ্ছলে মায়ের যে রূপটি সাধক-সমীপে উদ্ভাসিত করা হইল, ঐরূপে একবার মাকে দেখিতে চেষ্টা কর দেখিবে—**'ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ'** এবং 'ব্রহ্মা আমার অলক্তজল' এই দুইটি কথাই অভিন্ন। আর, যে সাধক মাকে আমার এই মূর্তিতে দেখিয়াছেন, তিনিই চণ্ডীর রহস্য সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, ব্রহ্মা— সৃষ্টিশক্তি। সৃষ্টিশক্তিই মায়ের পদদ্বয়, অর্থাৎ চরণস্থানীয়। নিশ্চলা মা আমার সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া চলা অর্থাৎ গতিবিশিষ্টা হইয়াছেন। নিরঞ্জনসত্তা হইতে ভাবরঞ্জনাময় অবস্থায় উপনীত হইয়া, আবার নিরঞ্জনসত্তায় যাওয়া—ইহাই ত' মায়ের সৃষ্টিচক্র বা জগৎলীলা। তাই, মায়ের চরণ বা গতি বলিলে, এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা ব্রহ্মাকেই বুঝায়। গম্ ধাতু হইতেই জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাদ শব্দের অর্থই গতি। পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি—মা আমার ইন্দ্রিয়

বিহীনা অথচ ইন্দ্রিয় ধর্মবিশিষ্টা। তাই, স্থূল পদদ্বয় না থাকিলেও গতিশক্তি আছে। মা যে আমার গতিরূপিণী।

মন্ত্রে **'পাদৌ'** এই দ্বিবচনান্ত পাদশব্দের প্রয়োগ আছে। মায়ের গতি দ্বিবিধ। এক জগৎ-মুখী, অপর আত্মাভিমুখী। একটি বিকর্ষণ, অন্যটি আকর্ষণ । এই উভয়বিধ গতির সাধারণ নাম সৃষ্টি। দ্বিবিধ গতিবিশিষ্টা হইয়াই মা আমার এই অপূর্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছেন। এস্থলে ব্রহ্মা শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ —যেখানে সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয়।

সূর্যের তেজে পাদাঙ্গুলি। সূর্য তেজস্তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থূল বিকাশক্ষেত্র। তেজস্তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি এবং কর্মেন্দ্রিয়—পাদ বা গতিশক্তি। গতিশক্তি পাদাঙ্গুলিতেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। তাই, অর্কতেজেই মায়ের পাদাঙ্গুলি গঠিত হইয়াছিল।

বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ—বসুদেবতাগণের তেজে করাঙ্গুলি। বসু শব্দের অর্থ ধন। রূপরসাদি বিষয়গত বিষয়ত্ব হইতে ঈশরত্ব পর্যন্ত সকলই ধন বা বসু। উহা পাণি-ইন্দ্রিয়ের বা গ্রহণশক্তির বিষয়। এক কথায় উহাকে গ্রাহ্য বলা যায়। গ্রাহ্য বস্তুর গ্রহণ উদ্দেশ্যেই গ্রহণশক্তিরূপ পাণি-ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলেন—**'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ'** —ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ। বিষয়সমূহের জন্যই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আগে রূপ, তারপর রূপকে গ্রহণ করিবার জন্য চক্ষু। আগে শব্দ, তারপর কর্ণ। এইরূপ আগে ধন, তারপর পাণি গ্রহণেন্দ্রিয়। করাঙ্গুলি—আদানশক্তির বিশেষ প্রকাশস্থান, অর্থাৎ পাণীন্দ্রিয়ের চরম পরিণতি। উহা সর্ববিধ ধনের গ্রাহক। তাই, বসুর তেজে মায়ের করাঙ্গুলি।

কুবেরের তেজে নাসিকা। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ক্ষিতিতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উহার বিকাশ হয়। ক্ষিতি বা পৃথিবী কুবের-লোকপাল পরিবারের মধ্যে অন্যতমা। আবার কুবের ধনাধিপতি। পঞ্চবিধ বিষয়ত্বই ধন। ক্ষিতিতে পঞ্চবিধ ধনই আছে। কুবের উহার অধিপতি বলিয়াই তাহার তেজে মায়ের নাসিকা গঠিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, ছান্দোগ্য-শ্রুতির উপদেশ অনুসারে দেখিতে পাই—প্রাণই সর্বধনাধিপতি। এই প্রাণই স্থূলে আসিয়া বায়ুরূপে—শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে নাসিকা-দ্বার দিয়া প্রবাহিত হয়। এভাবেও ধনাধিপতির তেজেই নাসিকা, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

———০———

তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥ ১৬॥

অনুবাদ। প্রজাপতির তেজে তাঁহার দন্তসমূহ এবং অগ্নির তেজে নয়নত্রয় গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা । আনন্দময়ী মায়ের আনন্দময় জগৎরূপ হাস্যের বিকাশস্থান দশনপংক্তি। বিশ্বপ্রজাসমূহ যে শক্তি হইতে সমূদ্ভূত, তাহাই প্রজাপতি। জীবজগতের এই যে জন্মাদি ষড়্ভাববিকার, ইহাই মায়ের হাসি। তাই, প্রাজাপত্য তেজে মায়ের দন্তসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছিল। আবার অন্যদিকে, দন্তই চর্বণসাধন অবয়ব। বিশ্বসংহারিণী মায়ের বিশ্বসংহরণলীলা দন্তেই অভিব্যক্ত হয়। তাই অর্জুন বিশ্বরূপদর্শন করিতে করিতে দংষ্ট্রাকরাল অতি ভীষণ বিশ্বগ্রাসী মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে—আমরাই মায়ের অন্ন। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মায়ের খাদ্যমাত্র। বেদান্তসূত্র বলেন—**'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'**। এই চরাচরের গ্রহণ অর্থাৎ সংহরণ করেন বলিয়াই আত্মা—মা আমার **'অত্তা'**। চরাচর যাবতীয় বস্তুকে অদন বা ভক্ষণ করেন, তাই তিনি অত্তা। প্রজাপতি মায়ের এই সংহার লীলার সহায়ক। দেখ সাধক, প্রজাপতি মহোল্লাসে এই বিশ্বপ্রজারূপ খাদ্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া, জগৎপালক বিষ্ণুর হাতে তুলিয়া দিতেছেন ; তিনি উহা যথাযথ পাক করিয়া প্রলয়ের দেবতা বিজ্ঞানময় শিবের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, আর মাতৃচরণের একনিষ্ঠ অধিকারী মহেশ্বর এ সুপক্ক অন্নরাশি মায়ের—অত্তার দংষ্ট্রা-করাল মুখমণ্ডলে আহূতি দিতেছেন। একবার সত্য সত্যই এই ব্রহ্মাণ্ডযজ্ঞের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর—তোমার সংকীর্ণতা, তোমার দুর্বলতা বিদূরিত হইবে। দেখ—এ জগৎ মায়ের ভোগ মাত্র ; ইহা দর্শন করিলে জীবের দুর্ভোগের অবসান হয়।

ত্রিনয়ন—চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি। ইহাই মায়ের ত্রিকালদর্শী নয়নত্রয়। ঋষি এস্থলে চন্দ্র সূর্যাদির উল্লেখ না

করিয়া একেবারে তন্মূলীভূত তেজস্তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন। নেত্রই প্রকাশসাধন ইন্দ্রিয়। চক্ষু তিনটি। (১) স্থূল চক্ষু — ইহা দ্বারা সন্নিহিত ভৌতিক রূপের অতি সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়। (২) মনশ্চক্ষু — ইহা দ্বারা অসন্নিহিত স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হয় (৩) জ্ঞান চক্ষু — ইহা দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, অতীত, অনাগত — অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যে প্রকার-সত্তার প্রভাবে সূর্যচন্দ্রাদির প্রকাশ, সেই মূলীভূত প্রকাশই মাতৃ-নয়ন। একমাত্র জ্ঞানই উহার স্বরূপ। শাস্ত্রে জ্ঞানই অগ্নিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই, মন্ত্রে অগ্নির তেজে নয়নত্রয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—'**তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।**'

জীব ! দেখ— মা আমার চন্দ্র সূর্য অগ্নিরূপ ত্রিনয়নে অহর্নিশ তোমার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ওগো, সূর্য সূর্য নহে—মাতৃচক্ষু, চন্দ্র চন্দ্র নহে—মাতৃচক্ষু, অগ্নি অগ্নি নহে— মাতৃচক্ষু। ইহা শুধু শিখিয়া রাখিলে কিছুই ফল হইবে না, যথার্থই মায়ের চক্ষু বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। মায়ের চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া কাতর প্রাণে মা, মা বলিয়া ডাক, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

———○———

ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাং চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥ ১৭॥

অনুবাদ। সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে মায়ের ভ্রূদ্বয়, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং অন্যান্য দেবতার তেজে অন্যান্য অবয়ব ; এইরূপে মঙ্গলময়ী মায়ের বিশিষ্টমূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। প্রাতঃকালীন এবং সায়ংকালীন সৌন্দর্যই মায়ের ভ্রূদ্বয়। মা যে আমার সুষমাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরূপে নিয়ত সুপ্রকাশিতা, ইহা উভয় সন্ধ্যায় একটু প্রাণময় দৃষ্টিতে দর্শন করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যদিও একটি ক্ষুদ্রতম বালুকণার ভিতরেও তাঁহার মহত্ত্ব, তাহার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত, তথাপি সেরূপ দর্শনের উপযুক্ত চক্ষু, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় সন্ধ্যায় এই বিশ্বপ্রকৃতি যে অনির্বচনীয় শোভাবিমণ্ডিত হইয়া মাতৃ-সুষমার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেয়, ইহা প্রায় সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এস্থলে ভ্রূদ্বয়ের কথা বলিতে গিয়া সৌন্দর্যের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে ভ্রূদ্বয়ই দেহের সৌন্দর্য-বিকাশের স্থান। ভ্রূর লোম-শাতন করিলে, অথবা ভ্রূলোমে রং মাখাইয়া দিলে, শরীরের অন্য কোনও পরিবর্তন না করিলেও আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বলিয়া বোধ হয় ; শারীরিক সৌন্দর্যের সহিত ভ্রূদ্বয়ের এতই নিকট সম্বন্ধ। তাই, ঋষি বলিলেন — যে চৈতন্য সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই সন্ধ্যাভিমানী দেবতার তেজে মায়ের ভ্রূযুগল গঠিত হইয়াছিল।

আবার আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—জীব এবং ঈশ্বরের মিলনরেখা এক সন্ধ্যা ; ঈশ্বর ও পরমাত্মার মিলনরেখা অপর সন্ধ্যা। প্রথমটি প্রাতঃসন্ধ্যা—অন্ধকারময় জীবভাবীয় অজ্ঞানতার নাশ এবং জ্ঞানময় শুভ প্রকাশসত্তার আবির্ভাব। অন্যটি সায়ংসন্ধ্যা— যাবতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের বিলয় এবং নির্বিশেষে সর্বভাব-বিরহিত নিরঞ্জন সত্তার প্রবেশ। মায়ের সন্তান মাতৃ-ভ্রূতে স্নেহ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না ; তাই, সাধকগণ এই জীবেশ্বর-মিলনরূপ প্রাতঃসন্ধ্যায় এবং ঈশ্বর ও পরমাত্মার মিলনরূপ সায়ংসন্ধ্যায় একমাত্র মাতৃ-স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হন।

অনিলের তেজে মায়ের শ্রবণ-যুগল। যদিও আকাশ হইতেই শব্দের উৎপত্তি, তথাপি বায়ুই উহার পরিচালক। বায়ু ব্যতীত শব্দ প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং বায়ুদেবতার তেজেই মায়ের কর্ণদ্বয় গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ অন্যান্য দেবতার তেজে মায়ের অপরাপর অবয়ব সংগঠিত হইয়াছিল। এবং এইরূপেই শিবা— মঙ্গলময়ী মা আমার অসুরনিধনকল্পে বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

প্রকাশসত্তা হইতে কি প্রকারে বিশিষ্ট মূর্তির দর্শন হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশ হইলে, অর্থাৎ রজস্তমোগুণ নির্দ্ধুত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে—সাধক যখন ঐ প্রকাশময় অবস্থায় অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখন স্বকীয় সংস্কারানুরূপ বিশিষ্টমূর্তির আবির্ভাব হয় এবং বরাভয় প্রদানে সাধককে উৎসাহিত ও ধন্য করেন। তারপর সাধক দ্রুতগতিতে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্বে বলিয়াছি— দেব-দেবীর মূর্তি দর্শন করিতে পারিলেই, সাধনার শেষ অথবা

জীবনের চরিতার্থতা লাভ হয় না। মূর্তিদর্শন হইলেই ঈশ্বরলাভ অথবা মুক্তি হয় না। উহা ঈশ্বর লাভ বা মুক্তির পথে বিশেষ অনুকূল গুরুকৃপামাত্র। যে বস্তু মূর্তিরূপে প্রকাশ পায়, তাঁহাকে জানিতে হইবে— তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। অবশ্য এই যে 'জানা বা বুঝা' তাহাও উঁহারই কৃপায় হইয়া থাকে। ঈশ্বর লাভ হইলে—সাধক-হৃদয়ে ঈশ্বরধর্ম কিছু না কিছু অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

সে যাহা হউক, সাধকের বিশিষ্টমূর্তি দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন তিরোহিত হয়, তখন ঐ যে সর্বদেব শরীর-সমুদ্ভূত তেজোরাশি, উহাই বিশ্বময় বিরাটমূর্তিতে পরিণত হয় এবং বিশ্বই যে পরমেশ্বরের স্থূলমূর্তি, সাধক উহা উপলব্ধি করিতে পারে। ভক্তপ্রবর অর্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখিয়াই সমস্ত সংশয়ের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। মায়াবচ্ছিন্ন চিদাভাসই বল, হিরণ্যগর্ভই বল, কিংবা মহদাত্মাই বল, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; আসল কথা— ঐ সর্বেন্দ্রিয়ধর্মসমন্বিত স্বরূপটির আবির্ভাব যতদিন না হয় ততদিন জড়ত্বজ্ঞান অপনীত হয় না, হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয় না, সংশয় বিদূরিত হয় না। এই কথাটি ভালরূপে বুঝাইবার জন্যই চণ্ডীতে এত স্পষ্টভাবে মায়ের বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থাপন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে দারুময় জগন্নাথমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাও এই সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত সর্বেন্দ্রিয়ধর্মের স্থূল প্রতিবিম্বমাত্র। কোনও ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়েরই ধর্ম আছে, এরূপ একটি দুরধিগম্য ভাবকে স্থূলে দেখাইতে হইলে, উহা হস্তপদাদিহীন জগন্নাথ মূর্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপে অভিব্যক্ত করা যায় না। কি সুন্দর ! সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ দারুময় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্তি ! হস্ত-পদ-নেত্র-শ্রবণ প্রভৃতির আভাসমাত্র আছে, অথচ উহার একটি অবয়বও নাই ! ধন্য তিনি, যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বিশাল মায়াজলধির তীরে **'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'** পুরুষোত্তম বিরাজমান। বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম সেখানে বিলুপ্ত। সকলেই সমনা— একরস। সমত্বের সমীপে বর্ণভেদ, জাতিভেদ তিরোহিতা। পূজা নাই, অর্চনা নাই, শুধু দর্শন— আর ভোগ ! শুধু দর্শন— আর ভোগ ! অতীন্দ্রিয় বস্তুকে এইরূপে ইন্দ্রিয়ভোগ্য করিবার উপায়— এই ভারতে যত বেশী, তত বুঝি আর কোনও দেশে নাই। এই দেশের ঋষিগণ, এ দেশের সাধক-পুরুষগণ সেই বাক্যমনের অতীত বস্তুকে কত ভালবাসিতেন, কিরূপ ঘনীভূত প্রেমে সেই পরমপুরুষের সহিত আবদ্ধ থাকিতেন, তাহার একটু প্রমাণ— এ দেশের তীর্থ, এ দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, এ দেশের গৃহদেবতা ! অতীন্দ্রিয় প্রেম কত ঘন হইলে—আত্মহারা হয়, জড় হইয়া যায়, স্থূলে অভিব্যক্তি লাভ করে, তাহা আমরা ধারণাই করতে পারি না। যতদিন স্থূল দেহ আছে, ততদিন স্থূলের অতীত বস্তুর প্রতি যতই আমরা আসক্তিযুক্ত হই না কেন, স্থূল যে একান্ত প্রিয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। আমরা যে অত্যধিক মাত্রায় স্থূলত্বপ্রিয়, আমাদের দেহই তাহার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। সুতরাং আমরা আমাদের প্রিয়তমকে ঠিক আমাদেরই মত স্থূলে আনিয়া আদর করিব, সেবা করিব, ভোগ করিব, ইহা কত স্বাভাবিক। কত সুন্দর ! এ তত্ত্ব চিন্তা করিতে গেলেও—বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইতে হয়।

যাঁহারা তীর্থ, দেবমূর্তি প্রভৃতিকে অজ্ঞান-কল্পিত ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের অর্থোপার্জনের কৌশলমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা একবার ধীরভাবে এ তত্ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ঐসকলের মধ্যে অজ্ঞান, ভ্রান্তি এবং প্রবঞ্চনা যে মোটেই নাই— একথা বলিতে পারি না ; কিন্তু একটা মহাসত্যজ্ঞান ও ঘনীভূত প্রেম যে ভারতবাসীর মজ্জাগত সংস্কার, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তীর্থ এবং দেবমূর্তিসমূহই উহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। যদিও স্থূল দেবদেবী মূর্তির পূজা করিয়া, যাত্রা থিয়েটারের কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিব-দুর্গা দেখিয়া এবং কথক-ঠাকুরের মুখে পৌরাণিক গল্প শুনিয়া অধিকাংশ নরনারীই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে, তথাপি ঐ ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে ধরিয়াই তাহাদিগকে যথার্থ জ্ঞানের পথে সহজে আনয়ন করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই ঐরূপ ভ্রান্তি বা বিপরীত ফল দাঁড়ায়। তাই বলি—ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না ! যাহা আছে তাহাকেই উজ্জীবিত কর—প্রাণময় কর। নূতন কিছু শিখিতে হইবে না, নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে না। যাহা আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর ; নিজে বুঝিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দাও, দেশের অজ্ঞান দূর হইবে।

প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ এমন কিছু বলিতে বা প্রকাশ করিতে বাকী রাখেন নাই, যাহা, আমাদের মস্তিষ্ক ধর্মের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। শুধু তাঁহাদের আদেশ পালন, তাঁহাদের প্রবর্তিত বিধি-নিষেধগুলির অনুশীলন করিলেই মানুষ ধন্য হইতে পারে।

ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতাঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ। অনন্তর সমস্ত দেবগণের তেজোরাশি সমুদ্ভবা সেই দেবীমূর্তিকে দেখিয়া, মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। অসুর-অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ অতিশয় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বিশিষ্ট চৈতন্য-সমূহ সঞ্চিতকর্ম-সংস্কারের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। মহিষকর্তৃক অর্দিত না হইলে, তেজোরাশিসমুদ্ভবার আবির্ভাব হয় না। জীবমাত্রকেই এই অর্দন বা উৎপীড়ন উপলব্ধি করিতে হয়। 'আমি বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়বর্গের অত্যাচারে জর্জরীভূত', এইরূপ বোধ যে মুহূর্তে যথার্থভাবে প্রাণে ফুটিবে, সেই মুহূর্তেই মা আমার চণ্ডীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইবেন। আরে, সন্তান উৎপীড়িত হইলে, মাতা কি কুপিতা না হইয়া থাকিতে পারেন ? এ ত আর পাতান মা নয়, সত্যি মা যে ! যতক্ষণ দেখিবে—তুমি খুব আর্ত হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতেছ, অথচ মায়ের আবির্ভাব বুঝিতে পারিতেছ না, ততক্ষণ বুঝিবে—তুমি যথার্থ আর্ত হইতে পার নাই, শুধু আর্তের মত ভাণ করিতেছ। উহাও নিন্দনীয় নহে, ঐ রকম আর্তের ভাণ করিতে করিতেই একদিন যথার্থ আর্তভাব ফুটিবে।

মা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মহিষকর্তৃক উৎপীড়িত করিতে থাকেন। যতদিন না ঐ উৎপীড়ন আমাদের বোধে আসিতে থাকে, যতদিন এই সংসারকে সত্যই অনিত্য এবং অসুখময় বলিয়া প্রতীতি না হইতে থাকে, ততদিন মা আমার উৎপীড়নরূপেই আসিয়া থাকেন। তারপর যখন এই সংসার, এই দেহধারণ, এই দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধির মধ্য দিয়া বিচরণ, এইগুলিকেই একটা মহা উৎপীড়ন বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তখনই জীব কাতর হইয়া সজলনেত্রে বলিতে থাকে—'আর সহ্য হয় না মা। আমরা বড়ই উৎপীড়িত দীন সন্তান, একবার এসে দেখ মা, আমাদের জীবন কি দুর্বিসহ যন্ত্রণাময়, আর যে সহিতে পারি না। বুঝি—ইহা উৎপীড়ন, অথচ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না।' ঠিক এইরূপ ভাবটা যখন প্রাণের অন্তস্থল হইতে ফুটিয়া উঠে, তখনই মা পরিত্রাণ পরায়ণা মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। সাধক ! মুখে সহস্রবার 'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণ-পরায়ণা' বলিলে বিশেষ ফল কিছুই হয় না। তোমাকে শরণাগত, দীন এবং আর্ত হইতে হইবে। এই তিনটি লক্ষণ তোমাতে প্রকাশ পাইলেই মা পরিত্রাণ-পরায়ণা-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তোমারই ইন্দ্রিয়াষ্ঠিত দেবতাবৃন্দের প্রকাশসত্তা হইতে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হইবে। দেবগণ মুদান্বিত হইবেন। তুমিও পরমানন্দ লাভ করিবে !

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ। ত্রিশূলধারী শিব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণপূর্বক সেই দেবীমূর্তিকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণও স্বকীয় চক্র হইতে চক্র উৎপাদন পূর্বক তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্র হইতে ক্রমান্বয় একাদশটি মন্ত্রে দেবগণের অস্ত্রাদি সমর্পণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি বিশিষ্ট অস্ত্র আছে। ঐ অস্ত্রই তত্তৎ দেবতার শক্তি। মনে রাখিও সাধক, বিশেষ বিশেষ ভাবান্বিত চৈতন্যই দেবতা। যদিও একথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তথাপি ঐ মূল তত্ত্বটি বিস্মৃত হইলে প্রকৃত বিষয়টি দুরধিগম্য হইয়া পড়িবে, তাই, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। যাহা হউক, চৈতন্য যেরূপ কোনও বিশেষ ভাব নিয়া প্রকাশ পাইলে দেবতা-শব্দবাচ্য হয়েন, সেইরূপ তত্তৎভাব প্রকাশের যে শক্তি অর্থাৎ যে বিশিষ্টশক্তি-প্রভাবে চৈতন্য ঐরূপ খণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পান, সেই শক্তিই দেবতার অস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমর্পণ শব্দে স্ব স্ব ব্যষ্টিশক্তি সমর্পণ বুঝিতে হইবে। পূর্বে যে বিভিন্ন দেবতার তেজ নির্গত হওয়ার কথা বলা

হইয়াছে, উহা দেবতাগণের বিভিন্ন প্রকাশভাবের নির্গম, আর এই অস্ত্র-সমর্পণ শব্দে স্ব স্ব কার্যকারী শক্তির সমর্পণ, ইহা বুঝিতে পারিলেই অস্ত্র অর্পণের রহস্য উপলব্ধি হইবে। ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

এই শক্তি সমর্পণ ব্যাপারটা কি ? স্ব স্ব খণ্ড শক্তিকে এক অদ্বিতীয় মহতী অখণ্ড শক্তিরূপে বুঝিতে পারার নামই শক্তিসমর্পণ। একমাত্র সর্বশক্তিময়ী মাতৃ-শক্তিই যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই শক্তি সমর্পণ হয়। শক্তিসমুদ্রের যে ক্ষুদ্র অংশটুকুকে আমার শক্তি বলিয়া গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছি, এক কথায় যাহাকে আমরা পুরুষকার— যত্ন বা অধ্যবসায় বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, উহা যে একমাত্র মাতৃ-শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে—যিনি একমাত্র পুরুষ, তাঁহারই কৃতির নাম যে পুরুষকার, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, শক্তি সমর্পণ করা হয়। শুধু মুখে বলিলে হইবে না—'**ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি**।' উহা উপলব্ধি করিতে হইবে—যথার্থই ইন্দ্রিয়াধীশকে হৃদয়ে দেখিতে হইবে। হৃষিকেশ-দর্শনের পূর্বে ওরূপ বলা মিথ্যাচার মাত্র। এই হৃষিকেশ-দর্শন এবং শক্তি-সমর্পণ প্রায় এক কথা। এক অখণ্ড চৈতন্যরূপিণী মা-ই যে আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রণালীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকাররূপে, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবায়ুরূপে, ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি পঞ্চভূতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই শক্তি সমর্পণ হইয়া যায়।

একদিনে উহা হয় না, প্রথমে ঐ শক্তিগুলি যেন আমারই শক্তি, এইরূপ ভাবে ধরিয়া ধরিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে হয়। পত্র, পুষ্প, ফলাদির অর্পণ বা দ্রব্যযজ্ঞ হইতে উহার আরম্ভ হয়, ক্রমে ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি তপোযজ্ঞ এবং যম-নিয়মাদি যোগযজ্ঞের ভিতর দিয়া সর্বশেষে স্বাধ্যায়ে বা জ্ঞানযজ্ঞে উপনীত হইতে হয়। তখন সাধক স্ব-কে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান বা পরমাত্মার সন্ধান পায়। ইহাই চরম সমর্পণ। এইরূপ সমর্পণের নাম আত্মসমর্পণ। আত্মলাভ আত্মসমর্পণ ব্যতীত হয় না —হইতে পারে না। সাধক ! যতদিন দেখিবে তোমার '**সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি**' এই অবস্থার উপলব্ধি আসে নাই, ততদিন বুঝিতে হইবে— আত্মসমর্পণ হয় নাই। 'আমি' কে সম্যক্‌রূপে মাতৃ চরণে অর্পণ করিতে হইলে—প্রতি কর্মে মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়। '**নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর**' বলিয়া প্রতিদিন আত্ম-নিবেদন করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে তবে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ হয়। শক্তি-সমর্পণ উহার মধ্যাবস্থা। এই যে দেখিতেছি, এই দর্শন শক্তি আমার নহে, মায়ের। মা ! তুমিই আমার অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিয়া এই দৃক্‌শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছ। এই যে শব্দ শুনিতেছি, এই শ্রবণশক্তিরূপেও তুমি মা ! এইরূপ ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি, আস্বাদনশক্তি এবং আদান, গমন, বাক্যপ্রয়োগ, প্রজনন, বিসর্জনরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তিরূপেও তুমি মা নিত্য বিরাজিতা। আবার স্মৃতি, কল্পনা, অভিমান ও বিবেকরূপ অন্তকরণ শক্তিও তুমি মা ! এইরূপ সর্ব বিশেষশক্তিকে যখন মাতৃ-শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন যথার্থ শক্তিসমর্পণ করা হয়। ইহার পরে হয় আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ হইলেই জীবত্ববোধ তিরোহিত হইয়া যায়, পরমানন্দময় পরমাত্মবোধ উদ্ভাসিত হয়।

মা মা ! আমরা যে কিছুই দিতে জানি না, মুখেই শুধু বলি—ইহা আমার নয়—তোমার। কার্যতঃ কিন্তু সকলই আমার বলিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখি। ওগো, আমরা যে এই ছোট আমিটাকে—এই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপিষ্ট, সংসার তাপে জর্জরীভূত আমিটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই ; তাই তোমাকে কিছু দিতে পারি না ; দিতে ইচ্ছাও হয় না, দিবার সামর্থ্যও নাই। মা ! মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কেই ধরিয়া তোমার পায়ে দিব, আমার 'আমি'কে ধরিয়া তোমার চরণে উৎসর্গ করিব, এসব ত' সূক্ষ্ম, অতি দূরের কথা। যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর— যাহা অতি স্থূল, যাহার সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই— সেই অতি তুচ্ছ, ধন, বস্ত্র, ভূষণ ইত্যাদি ধরিয়া অকপট প্রাণে তোমার চরণে নিবেদন করিতে পারি না ! এত সঙ্কীর্ণ আমরা, এত ক্ষুদ্রতার গণ্ডির ভিতরে আমাদের অবস্থান ! হায় ! ইহা ভাবিতেও বক্ষ বিদীর্ণ হয় ! কল্যাণময়ি ! তুমি দিবারাত্র আমাদের কল্যাণ-কামনায় বলিতেছ— '**ময্যেব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়**' কিন্তু কই মা, তোমার সে আশীর্বাদবাণী, আমরা ত' শুনিয়াও শুনি না ! যদি

শুনিতাম, তবে তোমাকে মন-বুদ্ধি সমর্পণরূপ যোগ-যজ্ঞের যাহা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান, সেই অতি স্থূল দ্রব্য-যজ্ঞ করিতেই কুণ্ঠা প্রকাশ করিতাম কি ? আমাদের মনে হয়—তোমাকে কিছু দিতে গেলে, তোমার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্রব্যসম্ভার উৎসর্গ করিতে হইলে, আমার অপচয় হইবে। যে তোমাতে আমার আমিত্ব পর্যন্ত অর্পণ করিতে হইবে, সেই তোমাকে আমার অতিদূর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্যসম্ভার অর্পণ করিতেও কৃপণতা করি ! মা ! আমাদের এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দাও ! দ্রব্য-যজ্ঞে অধিকারী কর ! তবেই আমরা দিন দিন শক্তি সমর্পণের মধ্য দিয়া আত্ম সমর্পণের অধিকারী হইব—মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব। মা, তোমার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা যে সহস্রগুণে গুণিত হইয়া আবার আমাতেই ফিরিয়া আসে, শত প্রমাণ পাইয়াও এ ধারণা দৃঢ়রূপে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারি না ! তুমি যে আত্মা—তোমাকে দিলে, তাহা যে আমাকেই দেওয়া হয়, ইহা কবে বুঝিতে পারিব ! ইহা বুঝি না বলিয়াই ত' মা তুমি উৎপীড়নরূপে মহিষাসুর মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, নানা উপায়ে আমাদিগের মর্মস্থানে শত আঘাত দিয়া, জাগাইতে চেষ্টা কর। দেবতাগণের শুভদিন সমাগত, তাই তাঁহারা স্ব স্ব শক্তিরূপ অস্ত্র-শস্ত্র তোমার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন।

যতদিন ব্যষ্টিশক্তিসমূহের উপর একটা অভিমান থাকে অর্থাৎ 'আমার শক্তি' বলিয়া প্রতীতি হয়, ততদিনই উহার ক্ষয়-উদয় থাকে, ততক্ষণই উহারা আগমাপায়িরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু যেদিন জীব বুঝিতে পারে— সমস্ত শক্তিবিন্দুগুলি সেই মহতীশক্তি-সিন্ধুরই বিন্দুমাত্র, সেদিন কি আর উহাকে 'আমার শক্তি' বলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে ? তখন যাঁহার শক্তি তাঁহাকে দিবার জন্য স্বতঃই একটা উদ্বেলন আসিতে থাকে, অথবা তখন আর দেওয়া বা অর্পণ বলিয়া কিছু থাকে না, শুধু দর্শন—ওগো, তুমিই যে সব গো ! আমার সব তুমি, আমার সর্বস্ব তুমি ! আমার আমিটাই যে তুমি। এতদিন ইহা দেখি নাই—'আমার জ্ঞান, আমার ধন, আমার পুত্র, আমার ইন্দ্রিয়, আমার যশঃ' ইত্যাদি বলিয়া, তাহাতেই মুগ্ধ ছিলাম ; তাই, বার বার অসুরের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি। এতদিন আমিত্ববোধ লইয়া জীবত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, অসুরের বিরুদ্ধে স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া কত লাঞ্ছিত হইয়াছি ! আর পারি না মা ! এইবার তোমার শক্তি তুমি গ্রহণ কর, আমাদিগকে অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ কর।

উপনিষদে এ বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। একদা অসুরগণকে পরাজিত করিয়া, দেবতাবৃন্দ গর্ব অনুভব করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় মা আমার হৈমবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া, অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমার কি শক্তি আছে ? অগ্নি বলিলেন—আমি এই বিশ্বকে ভস্মীভূত করিতে পারি। মা বলিলেন, আচ্ছা ভাল, এই সম্মুখস্থ তৃণটিকে দগ্ধ কর ! অগ্নি তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। এইরূপ পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের প্রত্যেকেই একটি তৃণের প্রতি স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন এবং অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন— আমাদের বাস্তবিক কোন শক্তিই নাই, আমরা সকলেই এই হৈমবতীর শক্তিতে শক্তিমান।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই উপাখ্যান অর্থাৎ অসুর-উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দের তেজোরাশি হইতে দেবীর আবির্ভাব এবং তদুদ্দেশ্যে দেবতাগণের অস্ত্রাদি অর্পণ প্রভৃতিও এই শ্রুতিমূলক কি না, তাহা সাধকগণ বিবেচনা করিবেন। সে যাহা হউক, এইবার আমরা মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শিব তাঁহার শূল হইতে অপর এক শূল নিষ্ক্রমণপূর্বক দেবীকে অর্পণ করিলেন। শিব—বিজ্ঞানময় গুরু, কেবল জ্ঞানমূর্তি। ত্রিশূল তাঁহার অস্ত্র। জ্ঞানশক্তি ত্রিপুটি। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই ত্রিপুটি হইয়াই জ্ঞানের বিকাশ হয়। 'আমি বৃক্ষ দেখিতেছি', এস্থলে আমি জ্ঞাতা, বৃক্ষ জ্ঞেয় এবং বৃক্ষবিষয়ক যে প্রতীতি, উহার নাম জ্ঞান। সাধারণতঃ জ্ঞান এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পায়। যেখানে জ্ঞান সেখানেই এই ত্রিপুটি। তাই, শিবের হস্তে নিত্যই ত্রিশূল বিরাজিত। (অবশ্য ত্রিপুটিশূন্য জ্ঞানও আছে, সে স্বতন্ত্র কথা)। জ্ঞানের এই ত্রিপুটিভাব মহতী শক্তিরই বিশেষ বিকাশমাত্র। ইহা উপলব্ধি করার নামই ত্রিশূল-সমর্পণ। যে শক্তি-প্রভাবে একই জ্ঞান ত্রিধা বিভক্ত হয়, উহা যে মহামায়ার শক্তি, ইহা বুঝিতে পারিলেও ত্রিপুটি

একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তাই, শূল হইতে শূল নিষ্ক্রমণের কথা উক্ত হইয়াছে। শিবের ত্রিশূল শিবেরই থাকে ; শুধু ত্রিশূলগত যে মমত্বাভিমান তাহাই দূরীভূত হয়। পরবর্তী বিষ্ণুর চক্রাদি অর্পণস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে !

সাধক। তুমিও দেখ—তোমার অখণ্ডজ্ঞান প্রতিনিয়ত রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হইতে গিয়া জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইতেছে। যিনি ঐরূপ ত্রিপুটি নিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, উনিই মা। তুমি 'আমার জ্ঞান' বলিয়া অভিমান করিও না। জ্ঞানরূপিণী মা-ই যে তোমার ভিতর দিয়া ঐরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ইহাই শিবকর্তৃক ত্রিশূল সমর্পণের রহস্য।

বিষ্ণু স্বকীয় চক্র হইতে চক্র উৎপাদনপূর্বক দেবীকে অর্পণ করিলেন। বিষ্ণু প্রাণময় বিশ্বব্যাপী পুরুষ। চক্র শব্দের অর্থ প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। এই সংসারই বিষ্ণুর চক্র। সংসারস্থিতিরূপ সুদর্শনচক্রে এতদিন 'আমার' বলিয়া অভিমান ছিল ; তাই মহিষাসুর-কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে। এখন উহা যে মায়েরই শক্তি, ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করিয়া বিষ্ণু নিশ্চিন্ত হইলেন। সাধক ! তুমিও দেখ ! তোমার ঐ ক্ষুদ্র সংসারটি, ঐ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, যাহাদিগকে তুমি ভরণ-পোষণ করিতেছ বলিয়া অভিমান করিতেছ, উহা অজ্ঞান মাত্র ! ঐ ভরণ পোষণের শক্তিরূপে যিনি তোমার ভিতর দিয়া প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, উনিই মা। উঁহাকে আদর কর, উঁহার জিনিষ উঁহাকেই অর্পণ কর ! মা-ই যে তোমার অন্তরে ঐ শক্তিরূপে বিরাজিতা, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই অর্পণ সিদ্ধ হয়। এবং এইরূপ অর্পণে সিদ্ধ হইলেই দেখিবে, সাংসারিক বিবিধ চিন্তারূপ গুরুভার তোমার মস্তক হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

———০———

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২০॥

অনুবাদ। সেই দেবমূর্তিকে বরুণ দিলেন— শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি এবং বায়ু দিলেন— বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় সহ ধনু।

ব্যাখ্যা। দেবতা-প্রধান শিব ও বিষ্ণু যখন স্বকীয় শক্তি মাতৃ চরণে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন অন্যান্য দেবতাবৃন্দও তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বরুণ জলাধিপতি। সমষ্টিজল যে বোধে অবস্থিত, তাহাই জলাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা বরুণদেবতা। তিনি শঙ্খ অর্পণ করিলেন। এই শঙ্খ শব্দটি নিয়া একটি মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন শঙ্খ বিষ্ণুর অস্ত্র। পূর্ব মন্ত্রে বিষ্ণুর চক্র অর্পণের কথা আছে ; আর এ মন্ত্রের প্রথমেই শঙ্খ শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে— উহা বিষ্ণুরই অস্ত্র। এ মতে বরুণ এবং বহ্নি উভয়ই **'শক্তিং দদৌ'** স্ব স্ব শক্তি অর্পণ করিলেন, এইরূপ অর্থ করিতে হয়। আবার ইহার পরেই উক্ত হইবে **'পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ'** অম্বুপতি অর্থাৎ বরুণ পাশ-অস্ত্র দিয়াছিলেন। বরুণের পাশ অস্ত্র প্রসিদ্ধ। (ইহার অর্থ সেই মন্ত্রে করা হইবে)। আবার কেহ বলেন পূর্ব মন্ত্রে 'চক্রঞ্চ' এই 'চ'কার থাকায় চক্র এবং গদা এই উভয় অস্ত্রই বুঝা যায়। এ সকলের প্রকৃত মীমাংসা করিতে গিয়া, কেহ বা বৈকৃতিক রহস্যোক্ত মহালক্ষ্মীমূর্তির অষ্টাদশ ভুজে যে অষ্টাদশ অস্ত্র আছে, তাহার গণনা করিতে বাধ্য হন। বাস্তবিক তাহাতেও গোলোযোগ দূর হয় না। যাহা হউক, আমরা শঙ্খকে নাদ-শক্তির প্রতিভূস্বরূপ বুঝিয়া লইব। তারপর উহা বিষ্ণু সমর্পণ করুন, আর বরুণ সমর্পণ করুন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে বিষ্ণুর সমর্পণ পক্ষই উত্তম ; শঙ্খ— অব্যক্ত নাদশক্তি— যাহা হইতে ব্যক্তনাদরূপ এই শব্দময় বিশ্ব প্রকাশিত, সেই শক্তিও যে মা, উহা উপলব্ধি করার নামই মাতৃচরণে শঙ্খ সমর্পণ। নাদ-রহস্য পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

জলের শক্তি— ক্লেদন বা আর্দ্রীকরণ, হুতাশনের শক্তি—দাহ। এই উভয় শক্তিই যে মাতৃ-শক্তিমাত্র, উহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বহ্নি বরুণের অস্ত্র সমর্পণ রহস্য বুঝা যায়। জলাধিষ্ঠিত চৈতন্য এবং তেজস্তত্ত্বাধিষ্ঠিত চৈতন্য, এতদিন আর্দ্রীকরণ ও দাহিকা শক্তিতে অভিমানাবদ্ধ ছিল, এইবার তাহা বিদূরিত হইল। এইরূপ মারুত অর্থাৎ বায়ুদেবতা ধনুঃ এবং শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় দিয়াছিলেন। ধনুঃ ও শর— প্রবাহ-শক্তির পরিচায়ক। তূণীর—বাণাধার। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভেদে

প্রবাহশক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ ; তাই, মন্ত্রে দুইটি তূণীরের উল্লেখ আছে। যে বায়ুমণ্ডলমধ্যে বসুন্ধরা অবস্থিত, সেই বায়ু যে চৈতন্য সত্তায় অধিষ্ঠিত, তাহাই বায়ুদেবতা। প্রবহণ তাহার শক্তি। এতদিন ঐ শক্তিতে 'আমার' বলিয়া অভিমান ছিল ; আজ তাহা মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়া সে যথার্থ শক্তির সন্ধান পাইল।

সাধক ! তুমিও দেখ—তোমার স্থূল শরীরে অপ্ তেজ এবং মরুত্তত্ত্বের যে বিভিন্ন শক্তি, তাহা একা অদ্বিতীয়া মহতী শক্তিরই বিভিন্ন প্রকার বিকাশমাত্র। যাঁহার শক্তি তোমার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাকে অর্পণ কর। দেখিবে—তুমি একটি ভৌতিক দেহধারী সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র নও। তুমি উহার অনেক উচ্চে। কিরূপে অর্পণ করিবে ? প্রথমে অপতত্ত্বই ধর—তোমার শরীরমধ্যগত যে জলীয় অংশ, উহাকে বোধ কর। (যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে এইরূপ বোধ একান্ত সহজ।) মুখে বল 'জল সত্য' আর অন্তরে ঐ জল-বোধকে ধরিয়া রাখ। (স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্রে বরুণবীজ অবলম্বনে ঐরূপ ধারণা অনেকটা সহজসাধ্য হয়) যখন ঐ জলবোধটি ঘনীভূত হইয়া আসিবে, তখন উহাকেই মা বলিয়া—আত্মা বলিয়া আদর কর। তারপর উহাকে বাহিরেও ধারণা কর অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। দেখ ঐ জলময়সত্তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে জলধারা রূপে, ভূপৃষ্ঠে নদ-নদী-সমুদ্র ইত্যাদি রূপে, বৃক্ষাদিতে রসরূপে, পর্বতে প্রস্রবণরূপে, আকাশে মেঘরূপে অবস্থিত। দেখ—তোমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অন্তরে বাহিরে অন্তরীক্ষে—প্রতি পরমাণুর মধ্যে জলময়সত্তা। দেখ, আর বল—**'ইদং জলং সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য জলস্য সর্বাণি ভূতানি মধু'**। দেখ — তোমার অন্তরে-বাহিরে-ঊর্ধ্বে-নিম্নে জল ব্যতীত আর কিছুই নাই। তারপর বল —**'অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম্ অমৃতম্, ইদং সর্বম্।'**

এইরূপ তেজস্তত্ত্বকে বোধ কর। শরীরস্থ তাপ ও জঠরাগ্নি হইতে আরম্ভ কর ; (মণিপুর কেন্দ্রে বহ্নিবীজ অবলম্বনে এইরূপ ধারণা সহজসাধ্য হয়।) মুখে বল — 'অগ্নি সত্য', আর ঐ অগ্নিবোধকে প্রসারিত কর —ভূমধ্যে তাপরূপে, ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় বস্তুতে তাপরূপে, জলে বাড়বাগ্নিরূপে অরণ্যে দাবানলরূপে, সূর্যে চন্দ্রে জ্যোতিষ্কমণ্ডলে বিদ্যুতে প্রকাশরূপে, এইরূপে, সর্বত্র দেখ। তোমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর তোমার জ্ঞানচক্ষু প্রসারিত হইতে থাকে, দেখ—অগ্নি ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, বিশ্বময় এই অগ্নিময় সত্তাটি বোধ করিয়া বল দেখি ভক্তির সহিত—**'অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যাগ্নেঃ ভূতানি মধু'** দেখিতে দেখিতে তোমার বোধটা অগ্নিময় হইয়া উঠিবে। তখন বলিবে—**'অয়মেব সঃ — যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম্ অমৃতম্, ইদং সর্বম্।'**

এইরূপ মরুৎতত্ত্ব। মুখে বল—'বায়ু সত্য', তারপর দেখ—তোমার শ্বাস প্রশ্বাস এবং সর্বশরীরগত বায়ুপ্রবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্বত্র বায়ুময় (অনাহতকেন্দ্রে বায়ুবীজ অবলম্বনে এইরূপে ধারণা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।) তোমার অন্তরে বাহিরে বায়ুছাড়া কোথাও কিছু নাই ; এইরূপ বোধ করিতে করিতে পূর্ববৎ ঋষির স্বরে স্বর মিলাইয়া উপনিষদের মন্ত্র পড়—**'অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু'**। আর দেখ—ঐ মা, যাঁকে তুমি চাও, যাঁর অন্বেষণে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিতেছ, সেই মা এই রূপে—এই বিশ্বব্যাপী বায়ুরূপে তোমার সম্মুখে বিরাজিত, উহাকে আত্মদান কর— আত্মা বলিয়া আদর কর। বল—**'অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম্ অমৃতম্, ইদং সর্বম্'**।

এইরূপ করিতে অভ্যস্ত হইলে বুঝিবে—শক্তি সমর্পণ বা দেবতাগণের অস্ত্রত্যাগের রহস্য কি। যদিও এ সকল সাধনার রহস্য পুস্তকে লিখিয়া এরূপভাবে প্রকাশ করায় অনধিকারীর হস্তে পড়িলে গুরু-বেদান্ত-বাক্যের অবমাননা হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ; তথাপি বর্তমান দেশকাল পাত্র বিবেচনায় প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। যদি সহস্রের মধ্যে একজনও এ পথে অগ্রসর হয় অথবা এসকল তত্ত্বকে সত্য বলিয়া আদরের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করে, তবে এই আত্মকৃত বিধিবিগর্হিত কর্মজন্য অনুশোচনার মধ্যেও একটা অনাবিল আনন্দভোগের সুযোগ ঘটিবে।

———o———

বজ্রমিন্দ্র সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষোঘণ্টামৈরাবতাদ্‌গজাৎ ॥ ২১॥

অনুবাদ। অমরাধিপ সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন এবং ঐরাবত গজ হইতে ঘণ্টা আনয়নপূর্বক সেই দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্র—দেবাধিপতি। বজ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ ইহার অস্ত্র বা শক্তি। আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরা যে একটি তড়িৎ-যন্ত্রমাত্র ইহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণও এতদিনে স্বীকার করিতেছেন। যদিও তাঁহাদের চক্ষুতে উহা এখনও একটি জড়শক্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তথাপি আমরা উহাকে জড়রূপে প্রকাশিত চিৎশক্তি বলিয়াই বুঝি। যে চৈতন্যসত্তা স্থূলে তড়িৎ-শক্তিরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ তড়িৎশক্তির অধিষ্ঠিত যে চৈতন্য, তিনিই ইন্দ্রদেবতা নামে অভিহিত। ইতিপূর্বে পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণ ইন্দ্রিয়াধিপতিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; আর এখানে শক্তির দিক্ হইতে বর্ণিত হইতেছে। চিন্তাশীল পাঠক ইহাতে কোন বিরোধ দেখিতে পাইবেন না। ইন্দ্রিয়ের দিক দিয়া পাণীন্দ্রিয়কে এবং শক্তির দিক হইতে তড়িৎ শক্তিকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রদেবতাকে বুঝিতে হয়। আর বাস্তবিক পক্ষে আদান ও তড়িৎ শক্তি পরস্পর অবিনাভাবযুক্ত। যাহা হউক, ইন্দ্রদেব এতদিন বিশ্বময় তড়িৎশক্তি বা বজ্রকে আমার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকে মহিষাসুরকর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। আজ ইন্দ্রদেব উহা চিন্ময়ী মাতৃচরণে উপহার দিয়া মহিষাসুর নিধনের পূর্বায়োজন সম্পন্ন করিলেন। বজ্ররূপ যে শক্তির উপর ইন্দ্রদেবের আধিপত্য, ঐ শক্তি যে তাঁহার নয়, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করার নামই বজ্রসমর্পণ। বজ্রটি ইন্দ্রেরই রহিল, মাত্র বজ্রবিষয়ক মমত্বাভিমান বিদূরিত হইল। তাই বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদনপূর্বক অর্পণের কথা মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্রাদি প্রদান সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে। পূর্বেও একবার একথা বলা হইয়াছে।

সাধক ! তুমিও দেখ— তোমার দেহস্থ তড়িৎশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জলে স্থলে অন্তরিক্ষে বিশ্বব্যাপী যে তড়িন্মণ্ডল রহিয়াছে, উনিই চিন্ময়ী মা। উহাকে সরলপ্রাণে সত্যজ্ঞানে মা বল ! দেখ—**'ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধু', 'অস্যা বিদ্যুতঃ সর্বানি ভূতানি মধু'**। সর্বভূতে বিদ্যুৎ পূর্ণভাবে, মধুরূপে, আত্মারূপে, অমৃতরূপে বিদ্যমান। আবার সর্বভূত এই বিদ্যুৎসত্তায় সত্তাবান হইয়া বিদ্যুতের মধুরূপে— অমৃতরূপে অবস্থিত দেখ—শুধু মধুময় জগৎ। শুধু আত্মদানের বিশুদ্ধ আনন্দ। পরস্পর পরস্পরের প্রিয়তম — মধু — আত্মা— বড় ভালবাসার বস্তু। দেখ—শক্তিরূপিণী মা আমাদিগকে বড় ভালবাসেন ; আবার আমরাও মাকে কত ভালবাসি ! দেখ— মায়ের বুকে আমরা, আবার আমাদের বুকে মা। আমরা মায়ের মধু, মা আমাদের মধু ! ও কি সাধক ! তোমার বুক ফেটে কান্না আসছে ? কাঁদ আর বল— মা, তুমি আমার প্রাণ। তুমি আমার প্রাণ ! ওগো দেখ— শুধু প্রাণের আদান প্রদান। আমি তোমাদের প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ। বুঝিবে কি এ তত্ত্ব ? বল, এই জড়বিদ্যুৎকেই বল— **অয়মেব সঃ— যোঽয়মাত্মা, ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ অমৃতম্ ইদং সত্যম্**। দেখিবে মহিষাসুরবধ কত সহজ। কিন্তু সে অন্য কথা।

ইন্দ্রদেব ঐরাবত হইতে ঘণ্টা দিয়াছিলেন। ইর্ ধাতুর অর্থ গতি বা বেগ। ইরাবান্ শব্দের অর্থ গতিশক্তি-বিশিষ্ট। ইরাবানের অপত্য বা তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে ঐরাবত কহে। ঐরাবত—ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্রের অপর একটি নাম মেঘবাহন ! মেঘ ও ঐরাবত অভিন্ন। তবে ঐরাবতকে হস্তী বলা হয় কেন ? পূর্বে বলিয়াছি—ইন্দ্র বজ্রের অর্থাৎ তড়িৎশক্তির দেবতা। ঐরাবত ঐ তড়িৎশক্তির পরিচালক। যে স্থূল গমনশীল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া তড়িৎশক্তি পরিচালিত হয়, তাহার নাম—ঐরাবত হস্তী। যদিও পৃথিবীর বহুবিধ পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই এই শক্তি পরিচালিত হয়, তথাপি বিশেষভাবে মেঘই ইহার বাহন অর্থাৎ পরিচালক। মেঘগুলি বর্ণে বা গঠনে অনেক সময় হস্তীসদৃশই হইয়া থাকে। অদ্যাপি প্রবল ঘূর্ণাবর্ত সময় যে জলস্তম্ভ উত্থিত হয়, লোকে তাহাকে স্বর্গ হইতে ঐরাবতের অবতরণ বলিয়া থাকে। ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেন জলভারে অবনত হইয়া পড়ে, আর প্রবল ঘূর্ণবায়ু প্রভাবে নদী প্রভৃতি হইতে উৎক্ষিপ্ত স্তম্ভাকৃতি জলরাশি শুণ্ডের আকারে যেন মেঘকে স্পর্শ করে ; দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিলে—সত্যই বলিতে হয়—স্বর্গ হইতে ঐরাবত নামিয়া আসিয়া জলপান করিতেছে ! যে যাহা হউক, যে বস্তু বিদ্যুৎপরিচালক, তাহাই শব্দবাহী ; কারণ গতি বা কম্পন হইতেই শব্দ প্রকাশ পায় ; তাই ঐরাবতকণ্ঠে শব্দ-উৎপাদিকা ঘণ্টা দোদুল্যমান। ইন্দ্রদেব বজ্র-অর্পণের সঙ্গে

সঙ্গে বজ্রসহকৃত ধ্বনি পর্যন্ত অর্পণ করিলেন। অর্থাৎ বজ্রধ্বনিটি পর্যন্ত যে মাতৃ শক্তিমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিলেন। ঘণ্টা-সমর্পণের ইহাই রহস্য।

এস্থলে আবার আমরা পাঠকবর্গের সংশয়-নিরসনকল্পে বলিয়া রাখি—ইন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতির এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া গজারূঢ়, বজ্রপাণি ইন্দ্রমূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হইবেন না। যদিও পূর্বমীমাংসা-দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি ইন্দ্রাদি দেবতার মূর্তির অপলাপ করিয়া মাত্র মন্ত্রাত্মক দেবতা স্বীকার করিয়াছেন ; তথাপি আমরা মূর্তিবিশেষের অস্বীকার করিতে পারি না ; কারণ, একেত' ইহাতে পরিপূর্ণা সর্বশক্তিময়ী মায়ে একটা অভাব কল্পনা করিতে হয়, তা ছাড়া যথার্থই ঐ সকল বিশিষ্ট মূর্তির দর্শন হয়। (কিরূপে মূর্তির আবির্ভাব হয়, তাহা অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে।) আর মহর্ষি জৈমিনি যে মন্ত্রময় দেবতা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নহে ; কারণ দেবমূর্তিসকল ভাবময়। সাধকের বিশিষ্টমূর্তি-বিষয়ক ভাব (ভাববস্তু চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে) ঘনীভূত হইয়া স্থূলে মূর্তির আকারে প্রকাশ পায়। মন্ত্রসমূহ ঐ ভাবের উদ্দীপক। ভাব বলিলেই সেই ভাবমূলক কোন শব্দ আছে, ইহা বুঝিতে হয়। শব্দশূন্য ভাব হইতেই পারে না। একমাত্র 'ভাবাতীত' স্বরূপকে অশব্দ বলা হয়। শব্দই মন্ত্র। যে শব্দ যেরূপ দেবমূর্তি বিষয়ক ভাবকে সহজে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, সেই শব্দই সেই দেবতার মন্ত্র। সুতরাং মন্ত্রময় দেবতা বলায় কিছুই দোষ হয় না। তারপর যদি কেহ বলেন— দেবতাদিগের মূর্তি থাকিলে দুইটি অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ— একজন দেবতা এককালীন বহু স্থানে পূজা গ্রহণ করিতে পারেন না, দ্বিতীয়—গজারূঢ় বজ্রপাণি ইন্দ্রদেব যদি পূজাস্থলে আবির্ভূত হয়েন তবে মৃন্ময়মূর্তি কিংবা ঘটাদি চূর্ণ হইয়া যাইবে। (এসকল শৈশবীয় আপত্তি মীমাংসাদর্শনেই আছে) তাহার উত্তরে বলিতে হয়— ঐরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ; কারণ দেবতাসমূহ প্রত্যেক সাধকের অন্তরেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। সুতরাং এককালীন বহুস্থানে পূজাদি গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। তারপর দেবতাদিগের মূর্তি আমাদের দেহের মত ভৌতিক নহে যে, উহার আবির্ভাবে ঘট চূর্ণ হইয়া যাইবে। দেবমূর্তি চিন্ময় অর্থাৎ কেবল চৈতন্য দ্বারা গঠিত। সাধকের ভক্তি-হিমে— প্রবল প্রার্থনায় সাধকেরই অন্তরস্থিত চৈতন্যময় দেবতাবিষয়ক ভাব ঘনীভূত হইয়া স্থূলে প্রকাশ পায়। এ সিদ্ধান্তে হয়ত অপর কেহ আপত্তি করিবেন—দেবতাগণ যদি সূক্ষ্মরূপে প্রতি জীবের অন্তরেই অবস্থান করেন, তবে জীবভেদে দেবতাভেদ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইন্দ্রাদির মত এক এক দেবতাই যে অসংখ্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে ত' এরূপ উল্লেখ নাই ! একথা সত্য ; ইহার উত্তর এই যে, চৈতন্য যেরূপ বস্তুত এক—অভিন্ন হইয়াও প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, ইহাও সেইরূপ। পূর্বেও এই দেবতাতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দেবতাদিগের মূর্তিসম্বন্ধে এত কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে, একদল লোক আছেন তাঁহারা মাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব স্বীকার করেন। অপর একদল—দেবমূর্তি প্রভৃতিকে অজ্ঞলোকদিগের জন্য রূপকমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির যথার্থ রহস্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মনে করেন—দেবতাদিগেরও আমাদেরই মত বাড়ি ঘর আছে, বিবাহাদি ব্যাপার আছে, তাঁহাদের দেহও আমাদের মত পঞ্চভূতে নির্মিত ইত্যাদি। এ সকলই জ্ঞানের একাংশমাত্র। এইজন্য পুনঃ পুন এ সকল তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। শুধু একটা কথা স্মরণ রাখিয়া শাস্ত্রীয় রহস্যে অবতীর্ণ হইলে, আর কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় না ! সে কথাটি এই যে— স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ তিনই সত্য। এবং এই তিনের সামঞ্জস্যই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। তবে এই তিনটির মধ্যে কারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সূক্ষ্ম ও স্থূলের গতি যেন কারণাভিমুখী থাকে। কারণের দিকে লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল অথবা কেবল সূক্ষ্মবিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই তাহা ভ্রমপূর্ণ হইবে। স্থূল যেন সূক্ষ্মাভিমুখী থাকে এবং সূক্ষ্ম যেন কারণাভিমুখী হয়। এরূপ হইলে আর শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে সংশয়াকুল হইতে হয় না। পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ কি তাহাও বলিয়া রাখিতেছি। কারণ— পরমাত্মা বিশুদ্ধচৈতন্য ; সূক্ষ্ম— শক্তি— মায়া বা প্রকৃতি এবং স্থূল—কার্য অর্থাৎ এই জীবজগৎ।

এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই —দেবলোক সূক্ষ্ম, ইহাদের বিশিষ্টমূর্তি স্থূলভাবাপন্ন

হইলেও, সূক্ষ্মলোকেরই অন্তর্গত। তড়িৎ — স্থূল। যে চৈতন্যের বহির্বিকাশ তড়িৎ, উহাই ইন্দ্রশক্তি। যদি কেহ ঐ বিশিষ্ট চৈতন্যে সমাহিত হইয়া ইন্দ্রমূর্তি দর্শনের অভিলাষী হয়, তবে সে অনায়াসে ধ্যানানুরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহার অন্যথা কখনও হয় না—হইতে পারে না।

———○———

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্ ॥ ২২॥

অনুবাদ। যম (স্বকীয়) কালদণ্ড হইতে দণ্ড, (এইরূপ) বরুণ— পাশ, প্রজাপতি— অক্ষমালা এবং ব্রহ্মা—কমণ্ডলু দান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। যম—মৃত্যুপতি। যে চৈতন্য মৃত্যুরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম যম। সর্বজীবের সংযমন-কর্তা এই মৃত্যুপতি ; তাই ইহাকে যম বলা হয়। কালদণ্ড ইহার অস্ত্র। জীব যতই উচ্ছৃঙ্খল গতিতে চলুক না কেন, ইনি কালরূপ দণ্ডপ্রভাবে জীবকে সংযত করিবেনই। তাই কালদণ্ডই যমের অস্ত্র।

বরুণ—অম্বুপতি। পূর্বে ইহার শক্তি বা শঙ্খ-অর্পণের বিষয় বলা হইয়াছে। এইবার ইহার প্রধান অস্ত্র পাশ-অর্পণের কথাও বলা হইল। পাশ—বন্ধন-সাধন, রজ্জু-বিশেষ। অনুরাগ বা আসক্তিই জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে ; তাই অনুরাগই পাশ। রসতত্ত্ব হইতেই অনুরাগ সঞ্জাত হয় ; সুতরাং বরুণের বিশেষ অস্ত্র পাশ। আপত্তি হইতে পারে—কেবল অনুরাগ হইতেই ত' জীবনের বন্ধন হয় না ; দ্বেষ হইতে হয়। সত্য, দ্বেষ অনুরাগেরই রূপান্তর মাত্র। অনুরাগ যেখানে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেইখানেই উহা দ্বেষের আকারে প্রকাশ পায়।

প্রজাপতি— অক্ষমালা। পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণমালাই অক্ষমালা। বর্ণময় এই জগৎ। যাঁহারা মাতৃকান্যাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন— জীবের দেহ বস্তুতঃ অকারাদি পঞ্চাশটি বর্ণদ্বারাই রচিত। পূর্বে বলিয়াছি—ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই মূর্তি, ভাবসমূহ শব্দমূলক, শব্দ আবার কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি মাত্র। এইরূপে বর্ণমালা হইতেই জীবজগৎ বা প্রজা সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই, প্রজাপতির শক্তি অক্ষমালা।

ব্রহ্মা—কমণ্ডলু। সৃষ্টির বীজসমূহ যে স্থানে অব্যক্তভাবে থাকে, সেই অব্যক্ত বীজাধারই কমণ্ডলু। আমরা যে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করি অথবা জীবনকালেই মুহুর্মুহু ভাবচাঞ্চল্য অনুভব করি, উহা অব্যক্ত বীজের ব্যক্ত ভাবমাত্র। এই অব্যক্ত আধারটি অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টির বীজসমূহ গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে, উহাই ব্রহ্মার কমণ্ডলু।

এইরূপে যম, বরুণ, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা, ইহারা যথাক্রমে কালদণ্ড, পাশ, বর্ণমালা এবং কমণ্ডলু অর্পণ করিলেন, —তাঁহাদের ঐ সকল শক্তি যে মায়েরই শক্তিমাত্র ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। সাধক ! তুমিও তোমার মৃত্যুভয়, অনুরাগ, স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহগত গঠনশক্তি এবং অব্যক্ত সংস্কারসমূহ মাতৃচরণে উপহার দিয়া, মমত্ব হইতে—অভিমান হইতে মুক্ত হও। মুক্তিমার্গে অগ্রসর হও ! কিরূপে এই সকল অর্পণ করিতে হয়, তাহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি ধরিয়া দেখাইতে হইলে, পুস্তকের কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমাদেরও ধৈর্যচ্যুতি অসম্ভব নয়।

———○———

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম চ নির্মলম্ ॥ ২৩॥

অনুবাদ। দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকূপে স্বকীয় রশ্মি প্রদান করিলেন। এবং কাল খড়্গ ও নির্মল চর্ম দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। সূর্যের প্রকাশশক্তি মায়ের সমস্ত অঙ্গময় প্রতি রোমকূপে উদ্ভাসিত হইল ; অর্থাৎ সূর্যদেব বুঝিতে পারিলেন— যে প্রকাশ শক্তির প্রভাবে আমি বিশ্ব-প্রকাশক, উহা মাতৃ-প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; আমার নিজস্ব কোনও প্রকাশশক্তি নাই। ইহারই নাম মাতৃ অঙ্গে সূর্যের রশ্মিদান। উপনিষদও বলেন—**'ন তত্র সূর্যোভাতি' 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্'**।

কাল—খড়্গ ও চর্ম প্রদান করিলেন। কাল—কালাত্মক চৈতন্য—যাহাতে জগৎ পরিধৃত। **'কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে'** কালই জগতের আধার, কালের আধার কেহ নাই। পূর্বে মৃত্যুপতি দেবীকে কালদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। সে কাল সংহরণশক্তিস্বরূপ। আর এখানে কালশব্দে জগদাধারস্বরূপ মহাকাল বুঝিতে হইবে। কাল

সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাল আমাদের নিকট ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ কাল এক অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য বর্তমান। 'জগৎ আছে' ; এস্থলে 'আছে' এইটি কালের দ্যোতক, অর্থাৎ বর্তমানকালরূপ আধারে জগতের বিদ্যমানতা বুঝায়। এই রূপ 'জগৎ ছিল' 'জগৎ থাকিবে' ইত্যাদি স্থলেও কাল আধাররূপেই অনুভব হয়। এইরূপ সর্বত্র। যদিও আমরা অনেক সময় 'কাল আছে' এইরূপ অর্থ প্রয়োগ করি এবং তাহার একটা অস্ফুট অর্থও বোধ করিয়া লই ; উহা কিন্তু বস্তুশূন্য একটা বিকল্প জ্ঞানমাত্র ; কারণ, কাল আছে বলিলে — কালের অধিকরণ বুঝায়। কালের বস্তুতঃ অধিকরণ নাই। কালই নিত্য আধার। এ আধারে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা অতীত বা ভবিষ্যৎ বলি, তাহাও 'আছে' এই বর্তমানবাচক শব্দ দ্বারাই বুঝি। জিজ্ঞাসা হইবে—তবে অতীত এবং ভবিষ্যৎ অংশদ্বয়কে কেন আমরা বর্তমানরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ? তাহার হেতু—স্মৃতি ও আশা। আমাদের স্মৃতি, কল্পনা এবং আশা — এই তিনটিই কালের স্থূল প্রকাশ। যদি আমরা অন্তর হইতে স্মৃতি, কল্পনা এবং আশাকে মুছিয়া ফেলিতে পারি, তবে আর কাল বলিয়া কোন প্রতীতিই থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ তিনের একটিও থাকে না, সুতরাং কালজ্ঞানও থাকে না। স্মৃতি—অতীত কাল এবং আশা — ভবিষ্যৎ কালরূপ একটি প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয় ! যাঁহারা ত্রিকালদর্শী হন, তাঁহারা চিত্ত হইতে ঐ দুইটিকে সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া দেন ; তাই তাঁহাদের অতীতানাগত জ্ঞান হয়। আমাদের কোন কল্পনাই বিশুদ্ধ নহে ; উহা অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ আশার সহিত মিশ্রিত হইয়া জ্ঞানশক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে, তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ অংশ অপ্রত্যক্ষ থাকে।

যাহা হউক, জগদাধার কাল — বিচ্ছেদকারক খড়্গ এবং আচ্ছাদনকারক চর্ম প্রদান করিলেন। কালের প্রধানতঃ ঐ দুইটি শক্তি। একটি বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত বিচ্ছেদ, অন্যটি উহার অপ্রকাশ। পরমাত্মায় সর্ব প্রথম দিক্ ও কাল কল্পিত হয়। পরমাত্মা যখন কালাত্মক হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই শুদ্ধ নিরঞ্জনসত্তা হইতে আপনাকে বিভিন্ন বোধ করেন, ইহাই খড়্গ। এবং ঐ বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরঞ্জনসত্তা আবৃত হয়, ইহাই চর্ম। আবার অন্যদিক দিয়াও দেখা যায়—কালই সকলকে বিচ্ছিন্ন করে এবং স্বকীয় স্বরূপকে অপ্রকাশিত রাখে। ইহাকেও খড়্গ চর্ম বলা যায়। এতদিন কাল, ঐ দুই শক্তিতে মমত্ববোধে অভিমানবদ্ধ ছিল, আজ তাহা মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইল।

সাধক ! তুমিও তোমার কালজ্ঞানকে মাতৃ-চরণে অর্পণ কর। তোমার স্মৃতি, কল্পনা ও আশাকে মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। যখন অতীতের স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতের মোহিনী আশা আসিয়া তোমাকে ব্যথিত কিংবা উৎসাহিত করিবে, তখন কাঁদিয়া বলিবে— 'মা ! তুমি নিত্য বর্তমানস্বরূপা হইয়াও কেন আমার বুকে স্মৃতির আকারে, আশার আকারে ফুটিয়া উঠিতেছ ? আমার চিরসন্তপ্ত বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ ! মা ! একবার কালাতীত স্বরূপে দাঁড়াও, অন্তর হইতে অতীত ও ভবিষ্যতের ছবি চিরতরে মুছিয়া যাউক ! আমি শান্তি লাভ করি। এরূপ কাঁদিতে পারিলে তুমিও কালাতীত-স্বরূপের সন্ধান পাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে।

———○———

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৪॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্বাবাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্‌গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্।
অঙ্গুলীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ॥ ২৫॥

অনুবাদ। ক্ষীরোদসমুদ্র দেবীকে মনোরম হার, চিরনূতন বস্ত্রযুগল, মস্তকভূষণ চূড়ামণি, কর্ণভূষণ দিব্যকুণ্ডলদ্বয়, বলয়সমূহ, অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুভূষণ কেয়ূর, পাদভূষণ বিমল নূপুরদ্বয়, কণ্ঠভূষণ অনুত্তম গ্রৈবেয়ক (হার) এবং অঙ্গুলিসমূহে রত্ননির্মিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ক্ষীরোদসমুদ্র—শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। অর্থাৎ রজস্তমোগুণ কর্তৃক অনভিভূত প্রকাশশীল নির্মল বুদ্ধি-সত্ত্ব। কথায়ও বলে জীবদেহেই সপ্তসমুদ্র বিদ্যমান। এস্থলে সংক্ষেপে আমরা সেই জীবদেহস্থ সপ্ত-সমুদ্রের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। (১) বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ— ক্ষীরোদ বা দুগ্ধসমুদ্র। (২) ঈষৎ রজোগুণ দ্বারা

উপরক্ত সত্ত্বগুণ—সর্পিঃসমুদ্র। (৩) ঈষৎ তমোগুণ দ্বারা উপরক্ত সত্ত্বগুণ—দধিসমুদ্র। (৪) রজোগুণ—সুরাসমুদ্র। (৫) সত্ত্ব গুণোপরক্ত রজোগুণ — ইক্ষুসমুদ্র। (৬) তমোগুণাভিভূত রজোগুণ— লবণসমুদ্র (৭) তমোগুণ —জলসমুদ্র। গুণত্রয় অনাদি এবং অসীম ; তাই, সমুদ্রের সহিত উপমিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমুদ্র শব্দটি নিরুক্তি হইতেও ঐ উপমার সার্থকতা রক্ষা হয় — উন্দ্ ধাতুটি ক্লেদন অর্থাৎ আর্দ্রীকরণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। সম্যক্ প্রকারে ক্লিন্ন করে বলিয়াই ইহার নাম সমুদ্র। বিশুদ্ধ চৈতন্যকে লীলারসে আর্দ্রীভূত করে ; তাই গুণত্রয় সমুদ্র স্থানীয়। পরস্পর সংযোগ তারতম্যে উহাদের সপ্তধা ভেদ হয়। উহাই পুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত **'লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ জলান্তকাঃ'** নামক সপ্তসমুদ্র।

এইরূপে জীবদেহে সপ্তসমুদ্রের বিদ্যমানতা দর্শিত হইল বলিয়া, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তসমুদ্রের অভাব কল্পনা নিন্দনীয়। যেহেতু পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি—ভগবৎসৃষ্টির এমনই মহিমা — যাহা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান, তাহাই প্রতি জীবদেহে বর্তমান রহিয়াছে। তাই, আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ যেন একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ইহাকে ভালরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারিলেই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলেন —**'আত্মনো বা অরে বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'**।

যাহা হউক, এই সপ্তসমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদসমুদ্রই এস্থলে প্রস্তাবিত এবং উল্লেখযোগ্য। ইনি অনন্তরত্নের আকর। দেবতাবৃন্দ ইহাকে মন্থন করিয়া নানাবিধ রত্ন এবং অমৃত লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। আবার এদিকে দেখ— বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল হইলেই, নানারূপ যোগবিভূতি লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ লাভ— অমৃত। যাহা পান করিয়া জীব অমর হয়। একমাত্র পরমাত্মাই অমৃত, বুদ্ধি নির্মল হইলেই পরমাত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়, জন্মমৃত্যু-সংস্কার দূরীভূত হয়, জীব অমর হয়। সাধারণতঃ রজোগুণ-জনিত চাঞ্চল্য এবং তমোগুণ-জনিত আবরণ, বুদ্ধিসত্ত্বেরও প্রকাশশীলতাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে ; কিন্তু তীব্র ঈশ্বর প্রণিধানে— মাতৃ কৃপায় যখন উহারা অভিভূত হইতে থাকে, তখনই নানারূপ যোগৈশ্বর্য লাভ হয়। যিনি মাত্র ঐ সকল ধনরত্নাদির লোভে মুগ্ধ থাকেন, তাহার পক্ষে কিছুদিন অমৃতলাভের পথ রুদ্ধ থাকে ; বরং হলাহল উৎপন্ন হয়। তারপর বিজ্ঞানময় মহেশ্বর — শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং আসিয়া সে বিষপান করেন। জীবকে— শিষ্যকে অমৃতপান করাইয়া, অমর করিয়া দেন। তাই বলি সাধক, যোগৈশ্বর্য-লাভের আশায় সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইও না। শুধু আত্মদান —আত্মাহুতিই এ সমরের অবসান। মাতৃ-চরণে আত্মবলি দাও, মাতৃ লাভ হইবে। পথের ধূলি—যোগৈশ্বর্য, আপনা হইতে আসিবে। তুমি উপেক্ষা করিয়া শুধু মা মা বলিয়া ছুটিয়া চল ! আপনাকে মায়ের পায়ে ঢালিয়া দাও ! ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে— শাশ্বৎ শান্তির নিত্যাধিকারী হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা—

ক্ষীরোদসমুদ্র দেবীকে কি কি আভরণ দিয়াছিলেন ; এস এইবার আমরা তাহার আলোচনা করি।

(১) অমলহার, (২) অজরঅম্বরযুগল, (৩) দিব্যচূড়ামণি, (৪) কুণ্ডলদ্বয়, (৫) কটকসমূহ, (৬) শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, (৭) কেয়ূর, (৮) বিমল নূপুর, (৯) অনুত্তম গ্রৈবেয়ক এবং (১০) অঙ্গুলীয়ক রত্ননিচয়। অনন্ত রত্নের আকর ক্ষীরোদসমুদ্র স্বকীয় অনুত্তম রত্নরাজিদ্বারা মাতৃ-পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ধন রত্ন অনেকেরই থাকে ; কিন্তু উহা যদি মাতৃ অঙ্গের সৌষ্ঠব সম্পাদন না করে —মাতৃ যজ্ঞের আহুতি না হয়, 'আমার ধন বলিয়া অভিমান থাকে, তবে সে ধনের অর্জন রক্ষণ ও অযথা ব্যয়জনিত বহুবিধ সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। অসুরগণ ছলে বলে সে ধন হরণ করে। আর যদি কেহ উহা মায়ের ধন বলিয়া, অভিমানকে অকপটচিত্তে বলি দিতে পারে, তবে দেখিতে পায়—ধনের সদ্ব্যবহার জনিত নির্মল শান্তি ধনীকে দিন দিন অমরত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। তাই, আজ ক্ষীরোদসমুদ্র তাহার সমগ্র ঐশ্বর্য দিয়া মায়ের বরবপু সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

(১) অমলহার—বিশুদ্ধ প্রকাশশক্তি। বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল হইলে প্রকাশ-শক্তি অক্ষুণ্ণ হয়। যাবতীয় বৈষয়িক প্রকাশ বুদ্ধিতে গিয়া পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির পরে আর বৈষয়িক প্রকাশ নাই। রজোগুণের চাঞ্চল্যবশতঃ সাধারণ জীবের ঐ প্রকাশশক্তি অতি ক্ষীণ— যে কোন পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার অতি সামান্য অংশকে প্রকাশিত করে। মনে কর, তুমি বৃক্ষ দেখিতেছ। তোমার বুদ্ধিসত্ত্ব বা প্রকাশ শক্তি বলিয়া দিল—'ইহা বৃক্ষ'। বৃক্ষের

কিন্তু সামান্য অংশই তোমার জ্ঞানগোচর হইল। উহার অতীত অনাগত অবস্থা, অভ্যন্তরস্থিত রস প্রবাহ ইত্যাদি সকলই তোমার অজ্ঞাত রহিল। বুদ্ধিসত্ত্বের মলিনতাই উহার একমাত্র হেতু। কিন্তু সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হইলে, এরূপ হয় না ; বিষয়ের যাবতীয় অংশ যুগপৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই শক্তির নাম অমলহার। উহা যে একমাত্র সর্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, উহাতে যে আমার বলিয়া অভিমান করিবার কিছু নাই ; উহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই মাকে অমলহার পরাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষীরোদসমুদ্রের অমলহার অর্পণের ইহাই রহস্য। অন্যান্য আভরণ অর্পণও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা পুনঃ পুনঃ অর্পণের রহস্য না বলিয়া, মাত্র আভরণগুলির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(২) অজর অম্বরযুগল — অবিনাশী বস্ত্রদ্বয়। মায়া এবং অবিদ্যা—ইহারাই মায়ের হেম বপুর আচ্ছাদন। পূর্বে বলিয়াছি— মা বলিতেছেন 'মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি সতত সঙ্গোপনে থাকি।' মা যেখানে ঈশ্বরবোধে উদ্বুদ্ধা, সেখানেই মায়াশক্তির বিকাশ। আর যেখানে জীববোধে উদ্বুদ্ধা, সেখানেই অবিদ্যাশক্তির বিকাশ। এতদুভয় অনাদি, তাই মন্ত্রে 'অজর' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। মায়া এবং আবিদ্যাশক্তির স্বরূপ কি, উহারা কিভাবে মাতৃ-অঙ্গের আচ্ছাদন, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলেই বুঝিতে পারা যায়।

(৩) দিব্য চূড়ামণি— স্বর্গীয় শিরোভূষণ। ইহা দিব্য জ্ঞানশক্তি—যে জ্ঞানের ফলে জগতের সমস্ত তত্ত্ব অসঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। সাধারণতঃ আমরা যে জ্ঞানে বিচার করি, উহা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত জ্ঞান। আমাদের যখন বৃক্ষজ্ঞান হয়, তখন উহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ত্বক্, বর্ণ, অবকাশ প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন জ্ঞানের সাঙ্কর্যমাত্র হয়। বৃক্ষত্ববিশিষ্ট একটি অবিমিশ্র জ্ঞান হয় না। এইরূপ কোন একটি বস্তুরও যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা সাধারণ জীবের জ্ঞানগ্রাহ্য নহে। কিন্তু দিব্য জ্ঞানশক্তি লাভ হইলে, আর ঐ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। তখন প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম অসঙ্কীর্ণভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বুদ্ধিসত্ত্ব-নির্মলতার উহাই অবিসংবাদি লক্ষণ।

(৪) কুণ্ডলদ্বয়—কর্ণভূষণ। অতিদূরে যে সকল ধ্বনি হয় এবং অন্তরে যে অনাহত শব্দ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিবার সামর্থ্যকেই দিব্য শ্রবণ-শক্তি কহে। ইহাই যথার্থ কর্ণভূষণ।

(৫) কটক—হস্তাভরণ, বলয়বিশেষ। ইহা দিব্য গ্রহণশক্তির দ্যোতক। একস্থানে অবস্থান করিয়া, বহুদূরস্থিত কিংবা ব্যবহিত বস্তু পরিগ্রহণের যে শক্তি, তাহাই কটক বা হস্তাভরণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৬) শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র — ললাটভূষণ, দিব্যজ্যোতিঃ। আজ্ঞাচক্র হইতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। উহার প্রভাবে বিপ্রকৃষ্ট ব্যবহিত ও সূক্ষ্ম বস্তু অনায়াসে দর্শন করা যায়। ইহাকে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদর্শন শক্তি বলা হয় ! যোগশাস্ত্রে ইহা 'প্রবৃত্ত্যালোক' নামে অভিহিত।

(৭) কেয়ূর — বাহুভূষণ, বিধারণশক্তি। ইহাকেই দিব্য ধারণ শক্তি বলা হয়। যে শক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্বত ধারণ করিয়াছিলেন।

(৮) নূপুর—পদভূষণ, দিব্য গতিশক্তি। এই শক্তি-প্রভাবে দুর্গম স্থানে গমন, মৃত্তিকা কিংবা প্রস্তরাদি মধ্যে প্রবেশ, আবদ্ধ স্থান হইতে অনায়াসে নির্গম প্রভৃতি অলৌকিক কার্য সিদ্ধ হয়। কিংবদন্তী আছে—মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইলে, তিনি অনায়াসে বাহিরে আসিয়াছিলেন। উহা এই দিব্য গতিশক্তিরই ফল।

(৯) গ্রৈবেয়ক — গ্রীবার আভরণ, কণ্ঠভূষণ। ইহা দিব্যকণ্ঠ। যাহার বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল তাহার কণ্ঠস্বর জনপ্রিয় হয়। তাহার কথাগুলি যেন সকলেরই নিকট মধুর প্রতীত হয়। সে গালি দিলেও মানুষ বিরক্ত হয় না। ইহাকে 'স্বর-প্রসাদ' বলে।

(১০) অঙ্গুরীয়ক রত্ন— দিব্য স্পর্শশক্তি। এই শক্তি প্রভাবে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুকে অনায়াসে স্পর্শ করিয়া, তাহার কাঠিন্য বা কোমলতা প্রভৃতি ধর্ম অবগত হওয়া যায়।

বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল হইলেই প্রাতিভ জ্ঞান হয়। যোগসূত্রে আছে — '**প্রাতিভাৎ বা সর্বম্**।' প্রাতিভ নামক জ্ঞান হইলে, সর্ববিধ যোগবিভূতি লাভ হয়। পূর্বে বলিয়াছি —শুদ্ধসত্ত্বগুণই ক্ষীরোদ সমুদ্র। উহাতে যে সকল রত্ন বা অলৌকিক শক্তি আছে, সে সকলই মাতৃ-শক্তি অর্থাৎ মাতৃ-অঙ্গের আভরণ জ্ঞানে তাহাকে অর্পণ করিয়া,

সাধক সর্ববিধ অভিমান হইতে বিমুক্ত হয়। যাঁহারা যথার্থ মুক্তিকামী সাধক, যাঁহারা যথার্থ মাতৃস্নেহে আত্মহারা সন্তান, তাঁহাদেরও প্রারব্ধফলে ঐ সকল যোগবিভূতি লাভ হইতে পারে ; কিন্তু কর্তৃত্ববোধ না থাকাতে, উহা দ্বারা তাঁহারা কোন অলৌকিক কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। যাঁহারা শরণাগত ভাবের সাধক তাঁহারা সর্বতোভাবে আত্মকর্তৃত্ব মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন ; যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত জগতের কার্যগুলি করিয়া যান। তথাপি কিন্তু সময় সময় তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। উহা তাঁহাদের অভিমানকৃত নহে, মাতৃ-প্রেরণাই ঐ সকল শক্তিপ্রকাশের হেতু। যাঁহারা যথার্থ মাতৃস্নেহে মুগ্ধ, তাহাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া জগতে খ্যাতিমান হওয়ার সাধ বিন্দুমাত্রও থাকে না। এ জগতের জয়ধ্বনি তাঁহাদের নিকট পৌঁছায় না। মহতী শক্তির অঙ্কে আত্মকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারা জগতের স্তুতি-নিন্দার অনেক উপরে চলিয়া যান। কিন্তু সে অন্য কথা।

———○———

বিশ্বকর্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্মলম্।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥ ২৬॥

অনুবাদ। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অতি নির্মল পরশু, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা। বিশ্বকর্মা — ত্বষ্টা। শ্রুতিতে আছে— **'ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু**।' বিশ্বকর্মাই জগতের রূপ ও নাম ব্যাকৃত করেন। অব্যাকৃত মূল-প্রকৃতিকে যিনি বিশিষ্ট নামে ও রূপে পরিণমিত করেন, তিনিই বিশ্বকর্মা। যেরূপ শিল্পী একখণ্ড প্রস্তর কাটিয়া নানাবিধ মূর্তি বা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ বিশ্বকর্মাও নামরূপ-হীন অব্যক্ত প্রকৃতিকে নামরূপাদি স্বরূপে ব্যক্ত করেন। এই বিশ্বসংগঠন শক্তি যে মায়েরই শক্তি, ইহা উপলব্ধি করার নামই বিশ্বকর্মার পরশু এবং অন্যান্য অস্ত্র প্রদান। অভেদ্য কবচ প্রদানেরও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে—বিশ্বকর্মা এত বৈচিত্র্যময় — এত বহুভাবময় জগৎকে প্রকটিত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। যেরূপ অভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া যোদ্ধা অগণিত শত্রুকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াও স্বয়ং অক্ষত থাকে, সেইরূপ বহু নামে বহুরূপে ব্যাকৃত হইয়াও বিশ্বকর্মা স্বয়ং অব্যাকৃত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বরূপে অবস্থান করেন। ইহা যে শক্তির প্রভাব উহাই বিশ্বকর্মার অভেদ্য কবচ। উহাও যে, মায়েরই শক্তি, ইহা উপলব্ধি করার নামই বর্ম সমর্পণ।

———○———

অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্।
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্ ॥ ২৭॥

অনুবাদ। সমুদ্র একটি অম্লানপঙ্কজের মালা মস্তকে ধারণ করিবার জন্য এবং অপর একটি মালা বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অতি সুশোভন আরও একটি পঙ্কজ (হস্তে ধারণ করিবার জন্য) দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। জলধি—জলসমুদ্র। পূর্বে সপ্তসমুদ্র প্রস্তাবে বলা হইয়াছে— তমোগুণই জলসমুদ্র। পঙ্কজমালা —সংস্কারশ্রেণী। পঙ্ক শব্দের অর্থ কর্দম এবং পাপ উভয়ই হয় ; সুতরাং পাপ হইতে যাহা জন্মে, তাহাকেও পঙ্কজ বলা যায়। পঙ্ক বা পাপ কি ? একমাত্র 'অহং' ভাবই পাপ। দেহাদিতে যে অহংবুদ্ধি, তাহাই মূল পাপ। তাই মন্ত্রবর্ণেও উক্ত হইয়াছে—**'পাপোঽহং'**। আমিবোধ অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে যে আত্মবোধ তাহাই সর্বপাপের আকর। পৃথিবীতে যত রকম পাপ আছে, তাহা এই আমিবোধের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। কেবল পাপ নহে, যাহাকে সাধারণ কথায় পুণ্য বলে, তাহাও এই 'পাপোঽহং' ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং এ দৃষ্টিতে পুণ্যও পাপেরই অন্তর্গত। যেরূপ পরিণামাদি দোষহেতু পুণ্য বা জাগতিক সুখও বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; সেইরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে অনাত্মবোধমাত্রই পাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই পাপ-পুণ্যেরই দার্শনিক নাম—সংস্কার। সংস্কার সমূহ 'পাপোঽহং' হইতেই জন্মে ; এইজন্য ইহাকে পঙ্কজ বলা যায়। সংস্কার অসংখ্য বলিয়াই মন্ত্রে মালা শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সংস্কারই বেদান্তের ভাষায় মায়া, সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি, মীমাংসকের ভাষায় অপূর্ব, নৈয়ায়িকের ভাষায় অদৃষ্ট। সংস্কার অনাদি ; তাই মন্ত্রে 'অম্লান' এই সার্থক বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের নিকট

হইতে মায়া বা প্রকৃতি সরিয়া দাঁড়ায় মাত্র ; উহার সর্বথা ধ্বংস বা অপচয় নাই, উহা প্রবাহরূপে নিত্য ; তাই অম্লান। আচার্য শঙ্করও উপনিষদ্ ভাষ্যে বলিয়াছেন —'**অমৃতং কর্মফলম্**।'

যাহা হউক, এই পঙ্কজমালা বা সংস্কারশ্রেণী তমোগুণেই বিধৃত থাকে। 'প্রখ্যা বা প্রকাশ' সত্ত্বগুণের ধর্ম, প্রবৃত্তি বা উদ্বেলন রজোগুণের ধর্ম, এবং স্থিতি বা ধারণ তমোগুণের ধর্ম। তমোগুণের অন্তর্নিহিত অর্থাৎ বীজভাব প্রাপ্ত সংস্কারগুলি রজোগুণ কর্তৃক উদ্বেলিত হয় ; এবং তাহারই ফলে—আত্মসত্তা-প্রকাশরূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম উদ্বোধিত হয়। সুতরাং তমোগুণ বা জলধিই মাকে আমার অম্লান পঙ্কজ মালায় সুশোভিত করিতে সমর্থ। সাধক ! মনে রাখিও যদি সত্য সত্যই মাতৃ চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তবে যে সকল সংস্কারের জ্বালায় তুমি নিয়ত উৎপীড়িত, নিয়ত বদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ঐ সংস্কার-শ্রেণীই মাতৃ অঙ্গের ভূষণরূপে শোভা পাইবে।

এই মন্ত্রে আরও রহস্য আছে— দুইটি পঙ্কজমালা এবং পৃথক একটি পঙ্কজ অর্পণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সংস্কারসমূহের ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত করে। আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ, এই তিন শ্রেণীতে সংস্কাররাশি বিভক্ত। এ সকল কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। মাতৃলাভ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, উত্তর এবং পূর্ববর্তী সংস্কার সমূহের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। মাত্র প্রারব্ধ অবশিষ্ট থাকে। উহা ভোগের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আগামী সংস্কারশ্রেণী মায়ের 'শিরসি' অর্থাৎ শিরোভূষণরূপে শোভা পায়। সঞ্চিত সংস্কারশ্রেণী মায়ের 'উরসি' অর্থাৎ বক্ষস্থলে শোভা পায়। আর বাকী থাকে প্রারব্ধ। যদিও উহা কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র, তথাপি একটি জন্মেই উহার ক্ষয় হইয়া যায়। তাই প্রারব্ধ কর্ম সংস্কারসমূহকে পঙ্কজের মালা না বলিয়া, একটিমাত্র পঙ্কজ বলা হইয়াছে। উহা মায়ের হস্তস্থিত লীলা-কমলরূপে শোভা পায়। বাস্তবিকপক্ষে, আত্মদর্শীর জীবনকালের প্রত্যেক কার্যই লীলামাত্র ; কারণ তাঁহারা সাধারণ জীবের মত রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন না। মাতৃ চরণে কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া, মাতৃহস্ত-চালিত যন্ত্রের ন্যায় জাগতিক কার্যগুলি নিষ্পন্ন করেন ; তাই, এই পঙ্কজটি মাতৃকরস্থিত লীলাকমলরূপে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে একটি আত্মসম্বেদনও আছে— '**ব্রহ্মাত্মদ্রষ্টুর্ব্যবহৃদ লীলৈব**'। যাহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন লীলামাত্র।

———০———

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ। হিমবান—দেবীর বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্নরাজি ধনাধিপতি কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। হিমবান— ঘনীভূত দেহাত্মবোধ। হিমালয় পর্বত স্থূলত্বের অর্থাৎ জড়াত্মবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মনুষ্যদেহটিও জড়ের বা দেহাত্মবোধের চরম আদর্শ। জীব এই স্থূল দেহকে 'আমি' মনে করিয়া এমনই বদ্ধ হয় যে, তাহাকে হিমালয়বৎ চৈতন্য-বিমূঢ় না বলিয়া থাকা যায় না।

সিংহ—দেবীর বাহন। প্রথম খণ্ডে এ বিষয়টি বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানুষ যখন স্বকীয় দেহাত্মবোধের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়, তখনই তাহাকে সিংহধর্মী বলিতে হয়। এই জীবভাবের প্রতি হিংসা এবং ব্রহ্মভাব উদ্বোধনের জন্য প্রয়াস, ইহা একমাত্র মনুষ্য দেহেই সম্ভব। সেইজন্যই মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ, সিংহও পশুশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য যখন স্বকীয় জীবভাবটিকে মায়ের বাহনরূপে অর্থাৎ মাতৃ-শক্তির পরিচালক একটি যন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই এই সিংহ-অর্পণ সিদ্ধ হয়। যতদিন অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি না হয়, অর্থাৎ আমার 'আমিই যে মা' ইহা সম্যক্‌রূপে অনুভূত না হয়, ততদিনই জীবভাবের প্রতি হিংসা বা সিংহভাব থাকে ; কিন্তু মাতৃলাভের পর এই হিংসাভাব আর থাকে না ; তখন সে মায়ের বাহনরূপে পরিচালিত হইতে থাকে।

নানাবিধ রত্নের অর্থ বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মফলসমূহ। মানবদেহই যথার্থ কর্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। এই দেহেই কর্ম হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিয়মান কর্মসমূহ যজ্ঞরূপে মাতৃপূজা সম্পন্ন করে। অন্যান্য দেহ অর্থাৎ দেব কিংবা পশুদেহ ভোগভূমিমাত্র—সে সকল দেহে কর্ম হয় না। সাধক যখন '**প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং**' মন্ত্রে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ

যখন সাধকের প্রতি কর্মই একমাত্র মাতৃ পূজারূপে এবং প্রতি কর্মফল মাতৃ-তৃপ্তিরূপে পরিণত হয়, তখনই এই রত্নরাজির অর্পণ সিদ্ধ হয়। গীতায় অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের মত অসক্ত জীবের জন্য স্বয়ং ভগবান কর্মফল ত্যাগরূপে যে অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, দেবীমাহাত্ম্যের এই হিমবানকর্তৃক বিবিধ রত্ন রাজির মাতৃ চরণে সমর্পণই তাহার যথার্থ সফলতাময় পরিণাম। এইজন্যই পূর্বে উক্ত হইয়াছে গীতা সাধনা এবং চণ্ডী সিদ্ধি। সে যাহা হউক, যেরূপ রত্নের লোভে মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও গভীর সমুদ্রে অবগাহন করে, ঠিক সেইরূপ ফলের লোভেই জীব দুস্তর কর্মসমুদ্রে অবগাহন করে। তাই, কর্মফলই রত্ন। সাধক ! এই রত্নরাজি মাতৃ-চরণে উপহার দিয়া কর্ম বন্ধনের হাত হইতে মুক্ত হও।

এস্থলে আর একটু বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সিংহ-সমর্পণ না হইলে রত্ন-অর্পণ হইতেই পারে না। প্রথমেই জীব-ভাবকে মাতৃ বাহনরূপে উপলব্ধি করিতে হয় ; তারপর দেখা যায়—কর্মফল অর্পণ আপনা হইতে হইয়া যাইতেছে। তজ্জন্য আর পৃথক কোন চেষ্টারই আবশ্যক হয় না। সাধক ! তোমার জীব-কর্তৃত্বাভিমানকে ধরিয়া মাতৃ-চরণে অবনত কর, দেখিবে—ফলের দিকে লক্ষ্যহীন হইয়াও তুমি বহু বৈচিত্র্যময় কর্মানুষ্ঠানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছ।

ধনাধিপ—জীবনীশক্তি। জীবনই সর্বধনের অধিপতি। তিনি নিয়ত বিষয়ানন্দরূপ সুরাপানেই মুগ্ধ থাকেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই— এ মদিরা কোথা হইতে আসে। এই যে কামিনী-কাঞ্চনের ভোগজনিত তৃপ্তি সুরা, ইনি কে ? ইহা না জানিয়াই ত' ধনাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট। এতদিনের এই অত্যাচারের ফলেই আজ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—এই মদিরাপূর্ণ বিষয়রূপ চষকটিও (পানপাত্র) মা ব্যতীত অন্য কেহ নহে। বহু সৌভাগ্যের ফলে মানুষ এই পানপাত্রটিকেও মা বলিয়া বুঝিতে পারে। বিষয়ানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আজ ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মযজ্ঞে বিষয়ানন্দপূর্ণ পানপাত্রটি পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া ধনাধিপতি ধন্য হইলেন।

———o———

শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৯॥

অনুবাদ। যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই সর্বনাগাধিপতি শেষনাগ (অনন্ত) দেবীকে মহামণি-বিভূষিত নাগহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। শেষ— অবশেষামৃত সংস্কারবীজ। যোগের ভাষায় ইহাকে 'কর্মাশয়' বলা যায় ; কর্মাশয় হইতেই জীবের জাতি, আয়ু এবং ভোগ নিষ্পন্ন হয়। পার্থিব দেহেই উহা সম্ভব, যেহেতু কর্মাশয় নিয়তই পৃথিবীকে অর্থাৎ পার্থিবভাবসমূহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাই, মন্ত্রে **'ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাং'** বলা হইয়াছে। আমরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করি, উহা সূক্ষ্ম বীজধাররূপ কর্মাশয় হইতে অঙ্কুরিত হয়। প্রতিজীবনে নূতন নূতন কর্মাশয় গঠিত হয়, সুতরাং প্রতি জীবনেই নূতন নূতন কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কর্মের শেষ অবস্থা বলিয়া ইহাকে—এই সংস্কার বীজকে 'শেষ' বলা হয়।

ইহাকে সর্প এবং সর্বনাগাধিপতি বলা হয় কেন ? কর্ম বলিলেই একপ্রকার শক্তির স্ফুরণ বুঝায়। দর্শন শ্রবণাদি প্রতিকর্মই এক এক প্রকার শক্তির স্ফুরণ মাত্র। এই শক্তি সমূহ যখন অব্যক্ত বা বীজাবস্থায় থাকে, তখন ইহাদিগের স্বরূপ অনুভূত হয় না ; কার্যরূপে প্রকাশ পাইলেই শক্তির সত্তা উপলব্ধি হয়। শক্তি যখন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রবাহশীলা হইয়া কার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ইহার গতি সর্পবৎ হইয়া থাকে। সৃপ্ ধাতুর অর্থ— কুটিল গতি। সর্প শব্দও কুটিলগতি-বিশিষ্ট জীব-বিশেষেই প্রসিদ্ধ। শক্তিপ্রবাহ কখনও সরল ভাবে পরিচালিত হয় না। আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। (আমাদের নিকট কিন্তু শক্তি জড় নহে। শক্তি বলিলেই আমরা চিৎ বা চৈতন্যসত্তাই বুঝিয়া থাকি।) সে যাহা হউক, আমাদের অনেক দেবমূর্তি আছেন, যাঁহারা সর্পভূষণ বা সর্পসংস্থিত।

উহার রহস্য এই যে, যে শক্তি ঘনীভূত হইয়া যেরূপ স্থূল মূর্তিতে প্রকাশিত হয়, সেই শক্তির প্রবাহময় অবস্থা সূচনা করিবার জন্যই, ঐ সকল মূর্তির সর্পাভরণ দৃষ্ট হয় ; এবং এই সত্য অনুধাবন করিয়াই জীবভাবীয় শক্তিকে

'কুলকুণ্ডলিনী' বলা হয়। বস্তুতঃ সাধকগণ যখন বিশিষ্ট ক্রিয়াদি করেন, তখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভবও করিয়া থাকেন— শক্তিপ্রবাহ যেন সর্পগতিতে প্রবাহমান হইয়া উর্ধ্বাভিমুখে উত্থিত হইতেছে, অথবা উর্ধ্ব হইতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছে।

যাহা হউক, কর্মাশয় হইতেই ক্ষুদ্র মহৎ যাবতীয় শক্তির বিকাশ হয় ; তাই 'শেষ' কে 'সর্বনাগেশ' বলা হইয়াছে। ইনি মাকে মহামণি বিভূষিত নাগহার দিয়াছিলেন। মোক্ষফল সুশোভিত কুলকুণ্ডলিনীই মণি-বিভূষিত নাগহার। যদিও বাস্তবিক বদ্ধ বা মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই ; কারণ, পরমাত্মা নিত্যমুক্তস্বরূপ ; তথাপি জীবভাবকে অপেক্ষা করিয়া বদ্ধ এবং মোক্ষ উভয়ই আছে, যেহেতু সত্যসঙ্কল্প-ব্রহ্মেই জীবভাব পরিকল্পিত হয়।

সাধক ! মূলাধারই কর্মাশয় ; উহাতে জীবভাব অবস্থিত। জীবভাবের নামই কুলকুণ্ডলিনী। একটা সর্প কল্পনা করিয়া বিপথগামী হইও না। জীবেরই মুক্তি হয়, তাই কুণ্ডলিনীর মস্তকে মোক্ষরূপ মহামণি সুশোভিত। সর্পগতিতে জীবশক্তি ব্রহ্মাভিমুখী হয় ; তাই উহাকে সর্প বলা হয়। এই জীবশক্তিও যে একমাত্র মা, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নাগহার অর্পণ সিদ্ধ হয়। মূলাধারস্থিতা সুষুপ্তা ভুজঙ্গরূপিণী মাকে বল— 'মা ! তুমি কবে উদ্বুদ্ধা হইবে ? কবে এ জীবত্বের নিগড় খসিয়া পড়িবে ? মা ! যাহারা যোগী, যাহারা শমদমাদি-সাধন-সম্পন্ন, তাহারা নানা উপায়ের সাহায্যে তোমাকে উদ্বুদ্ধা করিতে প্রয়াস পায়। আমাদের যে কোন বল নাই, কোন সাধনাই নাই মা! তাই বলিয়া কি মা আমার, চিরকাল নিদ্রিতাই থাকিবে ? একবার জাগো, একবার পরমেশ্বরী মূর্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার এই অধম পুত্রকে আদরে কোলে তুলিয়া লও। এইরূপভাবে সরল প্রাণে প্রার্থনা কর। দেখিবে—মা কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়াছেন, তোমার জীবত্ব মাতৃ-অঙ্গে মুক্তিরূপ-মহামণি-ভূষিতহাররূপে শোভা পাইতেছে। আর তুমি—তুমি মায়ে মিলাইয়া গিয়াছ।

———০———

অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩০॥

অনুবাদ। এইরূপ অন্যান্য দেবগণকর্তৃক বহুবিধ, ভূষণ ও আয়ুধ দ্বারা সম্মানিতা হইয়া দেবী মুহুর্মুহু অট্টহাস এবং উচ্চনাদ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। প্রধান দেবতাগণের শক্তি সমর্পণ ব্যক্ত করিয়া অন্যান্য দেবগণেরও আয়ুধ ভূষণাদি দানের বিষয় উল্লেখপূর্বক ঋষি এ প্রস্তাব শেষ করিলেন। ঠিক এইরূপই হয়— জীব যখন সর্বতোভাবে মাতৃ-লিপ্সু হইয়া পড়ে, তখন তাহার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি স্থূল দেহের প্রত্যেক পরমাণুটি পর্যন্ত মাতৃনামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। মাতৃনামে—প্রণবাদি মন্ত্রজপে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেও জপাদি চলিতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় অনতি-প্রযত্নে জপ নিষ্পন্ন হইতে থাকে। জপ বলিলে কেহ মালা কিংবা হাতের জপ বুঝিবে না। **'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'**। মাতৃস্বরূপের কিংবা মহত্ত্বের অনুচিন্তনই যথার্থ জপ। যোগযুক্ত অবস্থাই জপের বিশেষ লক্ষণ। সে যাহা হউক, ঐরূপ যোগযুক্তভাব ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে। ক্রমে ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়া সংস্কারানুরূপ ইষ্টমূর্তিরূপে প্রকাশিত হয় ; অথবা বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই সময় সাধক বেশ বুঝিতে পারে— ইনিই একমাত্র কর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। ইনি এক হইয়াও সর্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও সর্বভাবে অনুস্যূত। এতদিন যাহাতে আমি অভিমান করিতাম, অর্থাৎ আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি ইত্যাদিরূপ যে অভিমানের দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া মূঢ় ছিলাম, উহা অজ্ঞানমাত্র। এখন মাতৃ কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিলাম— আমি বলিতে, মা ব্যতীত অন্য কেহ নাই, আমার বলিতেও মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সর্বস্বরূপা মা, সর্বেশ্বরী মা এবং সর্বশক্তিসমন্বিতাও মা, এই তিন স্বরূপে মা আমার জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মভাবে নিত্য বিরাজিতা।

'মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই' এই মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই অভিমানের নিগড় খসিয়া পড়ে। তখন সাধক যাহা কিছু পায়, বস্ত্র ভূষণ আয়ুধ ইত্যাদি যাহা কিছু— সকলই ধরিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে থাকে। পূর্বে যে সকল বস্তুতে অভিমান অর্থাৎ মমত্ববোধ ছিল, সে সকলই অকপটভাবে মাতৃপূজার উপকরণরূপে অর্পণ করিয়া মাকে সম্মানিত করে ! আরে, মায়ের আবার

অসম্মান বলিতে কিছু আছে না কি যে,— দেবতাবৃন্দ ভূষণআয়ুধাদিদ্বারা মাকে সম্মানিতা করিবে ? না গো তা নয় ; মা আমার সম্মান অসম্মান উভয়েরই উপরে, তবে দেবতাগণ ঐরূপে পূজা করিয়া নিজেরাই পূজিত বা সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদিও মান্ ধাতুর অর্থ পূজা এবং এস্থলে সম্মানিত শব্দটি সম্যক্‌প্রকারে পূজিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে[১] ; তথাপি প্রচলিত ভাষায় যাহাকে 'মানা' অর্থাৎ মানিয়া লওয়া বা স্বীকার করা বলে, আমরা এখানে সম্মানিত শব্দের সেই অর্থই করিব। সম্যক্‌রূপে মানিয়া লইলেই, মা আমার সম্মানিতা হন।

মা গো ! শুধু তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই যে, তোমাকে মানা হয়, তুমি সম্মানিতা হও, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে এই কথাটি বুঝাইয়া দাও। শুধু 'তুমি আছ' এই একটা কথা মনে রাখিয়া জীব যদি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পথে চলে, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইয়া যায় ! আমরা মুখে বলি 'ভগবান আছেন' কিন্তু কার্যকলাপগুলি ঠিক তাহার বিপরীত। এক সূর্যোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত যতগুলি কার্যের অনুষ্ঠান করি, তাহার মধ্যে কয়টা কার্য ভগবানের অস্তিত্ব সম্মুখে রাখিয়া করা হয় ? হিন্দুগৃহে কুলললনাগণের স্বামী আছেন কি না, ইহা যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না, তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতিই স্বামীর অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয় ; ঠিক সেইরূপ যে মানুষ জগৎস্বামীর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছে, তাহার আকৃতি, তাহার প্রতি কার্যই ভগবৎসত্তা প্রকাশ করে। মা ! আমরা যে তোমার সত্তাই মানি না, তবে আর কোন মুখে বলিব—আমায় দেখা দাও ? যাঁহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস নাই, তাঁহার দর্শনাভিলাষ কিরূপে হয় ! হয়ত 'মা আমায় দেখা দাও' বলিয়া কত কাঁদিলাম, কত চক্ষুর জল ফেলিয়া লোকের দৃষ্টিতে ভক্ত প্রেমিক সাজিলাম, হয়ত বা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনিতে নিজেকেই কৃতার্থ মনে করিলাম ; কিন্তু বড় সত্য কথা এই যে—যথার্থই তোমার সত্তা মানিয়া লওয়া হয় নাই। তাই বলি মা ! তোমার স্বরূপ বুঝিতে চাহি না, তোমার অচিন্ত্য অব্যয় মোহনমূর্তি দেখিয়া ধন্য হইতে চাই না, শুধু তোমায় মানিতে দাও, তুমি 'আমার একজন'— তোমার সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক শুধু তুমি 'আছ', এই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান কর। তোমার সত্তা মানিতে দাও ! আমার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্বরে বলিয়া উঠুক—'মা সত্য'। স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, সংসার আছে, দেহ আছে, এই 'আছে'গুলি কত ঘনভাবে বুকে ফুটিয়া উঠে। বাস্তবিক কিন্তু এই 'আছে'গুলিকে নাই বলিলেও কিছুই ক্ষতি হয় না—উহা অজ্ঞানমাত্র। আর যাহা যথার্থই 'আছে'—যাহার সত্তা এত ঘন যে, সে সত্তার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অমনি জগৎসত্তা—এই ছোট ছোট 'আছে'গুলি একেবারে বিলুপ্ত হয় ; সেই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

মা গো ! বহুদিন বহুজন্ম বহুযুগ ধরিয়া, এই জীবত্বের অসহনীয় পেষণ সহ্য করিয়া আসিতেছি, শুধু ঐ একটির জন্য, শুধু তোমায় মানি না বলিয়াই, আমাদের জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দুঃখ কষ্ট যত কিছু ! এই যে মহিষাসুরের উৎপীড়ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বাসনাগুলির অত্যাচার, বহুদিন বহুদিন, মা গো ! এইগুলিদ্বারা জর্জরীভূত হইতেছি। আর পারি না মা ! ওগো, তুমি তোমার সত্তাটি লুকাইয়া রাখ বলিয়াইত' আমরা তোমাকে মানিতে পারি না। আর তারই ফলে এই ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া মরি। কিন্তু আর না। একবার প্রকাশিত হও, একবার দেখ তোমার বড় সাধের সন্তান আজ সংসার সন্তাপে কত উৎপীড়িত !

ঐ দেখ সাধক ! যে মুহূর্তে তুমি মাতৃ-সত্তা মানিয়া লইয়াছ, যে মুহূর্তে তুমি ঠিক ঠিক বুঝিয়াছ তোমার দুঃখহারিণী মা একজন আছেন, যে মুহূর্তে তুমি আপনাকে অসুরকর্তৃক উৎপীড়িত মনে করিয়া অজ্ঞেয় সত্তার দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিয়াছ 'এস মা, আমি বড় উৎপীড়িত', ঠিক সেই মুহূর্তেই মা আমার আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে **'উচ্চৈঃ ননাদ' 'সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ'**। মা হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন, অট্টহাসিতে দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, মা আমার চণ্ডীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। কে রে ! পুত্রের প্রতি অত্যাচার। মা ভৈঃ ! আমি মা তোমার। আমি আসিয়াছি। আর তোমাকে উৎপীড়িত হইতে হইবে না। সন্তান !

[১] গৌরবিত ব্যক্তির প্রীতিহেতু যে সকল অনুষ্ঠান করা যায়, তাহারই নাম পূজা।

তোমার উৎপীড়ন-বোধ আমার ক্রোধের উদ্দীপন আনিয়াছে ; আমায় চণ্ডী করিয়াছে ! আর ভয় নাই ! আর তোমাকে অনাত্মভাব বা জড়ত্বকর্তৃক মথিত হইতে হইবে না। আমি যাবতীয় জড়ভাবের— অসুরের বিনাশ সাধন করিব। আর উহাদের রক্ষা নাই।

সাধক ! মায়ের এই অভয়বাণী, এই উচ্চনাদ, এই অট্টহাসি—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, জন্ম জীবন সার্থক কর। ভাবিও না ইহা ভাষার ঝঙ্কার বা ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র। সত্যই তুমি যে দিন আপনাকে অসুরের অত্যাচারে জর্জরীভূত বলিয়া বুঝিতে পারিবে, সত্যই তুমি যে দিন মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইবে, সত্যই যেদিন তুমি শরণাগত দীনার্ত-পরিত্রাণ পরায়ণা বলিয়া মাতৃ-আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে, সেই দিনই বুঝিতে পারিবে —এইরূপ পরিত্রাণ-পরায়ণা মূর্তিতে মাতৃ-আবির্ভাব কত সত্য ! কিন্তু সে অন্য কথা।

পুনঃ পুনঃ বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য যে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, যখন উহা সমষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে উপলব্ধিযোগ্য হইতে থাকে, তখন সাধক দেখিতে পায়— উহাতে কোন বিশিষ্ট ধর্মের অভিব্যক্তি নাই ; অথচ সর্বধর্মসমন্বিত এক অনির্বচনীয় আনন্দময় সত্তা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। এতদিন অন্ধের ন্যায় বিষয়রূপ যষ্টি অবলম্বনপূর্বক আত্মসত্তা উদ্বুদ্ধ করিতে হইত কিন্তু এখন তার তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অধিষ্ঠান চৈতন্যে বা চিৎসমুদ্রে অবগাহন করিয়া, সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াও সাধক পূর্ণ ঘন আত্মসত্তায় উদ্বুদ্ধ থাকিতে পারে। মরি মরি ! সে কি অপূর্ব ! কি লোভনীয় অবস্থা। যদিও এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করা যায় না, তথাপি, যতটুকু থাকা যায়, তাহার মধুময় স্মৃতিই সাধককে ব্যুত্থানকালে আনন্দময় করিয়া রাখে। আবার ঐ অখণ্ড সত্তার মধ্য হইতেই অভীষ্ট মূর্তিদর্শন করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হয়।

যাহা হউক, এ স্থলে দেবতাবৃন্দের তেজোরাশি সমুদ্ভূতা যে বিশিষ্ট মূর্তির বিষয় বৈকৃতিক রহস্যে উক্ত হইয়াছে, উহা মহালক্ষ্মী মূর্তি। এই মূর্তি সমগ্র ঐশ্বর্যবীর্যাদি সমন্বিতা পূর্ণ ভোগময়ী। তাই ইহার নাম ভোগমায়া। আমরা প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ-নিধনে যে তামসী মহাকালী মূর্তির আবির্ভাব দেখিয়াছি, উহা মহাকালী বা যোগমায়া মূর্তি। বিষ্ণুর যোগনিদ্রার অপনয়ন জন্যই সে মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। আর এই অধ্যায়ে মায়ের অসীম মহিমময়ী অনন্ত ভোগময়ী মূর্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দেব-শক্তি-সম্মিলিত এই মহালক্ষ্মীমূর্তিতে মা আবির্ভূত হইয়া, যেমন একদিকে দেবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করেন তেমনি অন্যদিকে অসুর কুলের নিধন করিয়া, জীবের মুক্তিমার্গ অন্তরায়-শূন্য করেন। ক্রমে ইহার রহস্য আরও উদঘাটিত হইবে।

তস্যানাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দোমহানভূৎ॥ ৩১ ॥
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥ ৩২॥

অনুবাদ। তাঁহার (দেবীর) ঘোর নিনাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। অপরিমেয় অতি মহান সেই নাদের মহান প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাতে লোকসকল বিক্ষুব্ধ, সমুদ্রসকল কম্পিত, বসুন্ধরা চালিত এবং মহিধরগণ প্রচলিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইলে, ব্যষ্টিনাদও সমষ্টি ভাবপ্রাপ্ত হয়। যেরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মিকা মহাশক্তি প্রতিজীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও ভাবাকারে প্রকাশিত হইতে গিয়াই, ব্যষ্টিভাব বা পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয় ; ঠিক সেইরূপ এক মহান অব্যক্ত নাদও বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ তালু জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি যন্ত্রে প্রতিহত হইয়া বিভিন্ন নাদরূপে প্রকাশ পায়। যেরূপ শক্তি এক অখণ্ড, সেইরূপ নাদও এক—অখণ্ড। যতদিন এই অখণ্ড শক্তির বা নাদের সন্ধান না পাওয়া যায় ততদিনই উহারা বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি—অনির্বচনীয়া, উহার প্রথম অভিব্যক্তি— নাদ। নাদ ও শক্তি পরস্পর অবিনাভাবী। যেখানে শক্তির অভিব্যক্তি, সেইখানেই নাদ। সাধকগণ মাতৃ-কৃপায় মহতী শক্তির সন্ধান পাইলেই এই সুমহান্ নাদেরও সন্ধান পায়। এ জগতে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্তরে যে কোনও ভাবের উদয় হয়, উহা, এক একটি শব্দমাত্র। শব্দ নাই অথচ পদার্থ কিংবা ভাব আছে, ইহা হয় না। জীব

এতদিন এক একটি বিশিষ্ট শব্দে আসক্ত ছিল, তাই বহুত্বের বন্ধন— মহিষাসুরের অত্যাচার ছিল। কিন্তু বহু সুকৃতির ফলে আজ অখণ্ডনাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহা মায়েরই নাদ। অব্যক্তা মা আমার নাদময়ী মূর্তিতে প্রকটিতা হইয়াছেন। প্রথমতঃ উহা অনাহত নাদরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, সমুদয় ব্যোমমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সে নাদ উত্থিত হয় ; পরে শরীরের প্রতি পরমাণুতে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়া, দেহটি নাদময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সেই অবস্থায় এই সমগ্র বিশ্ব একটি অখণ্ড নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না। সেই অখণ্ড নাদে আমিত্বকে মিলাইয়া সাধক যে অনুপম আনন্দ ভোগ করেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইহাই মায়ের ঘোর নাদ, উহাতে লোকসকল বিক্ষুব্ধ হয়, সমুদ্রসকল কম্পিত হয়, বসুধা চালিত হয় এবং মহীধরগণ প্রচলিত হইতে থাকে।

লোক—দর্শনার্থক লুক্ ধাতু হইতে লোক শব্দ নিষ্পন্ন। **'লোক্যতে ইতি লোকঃ'**। যাহা দর্শন করা যায়—জানা যায়, তাহাই লোক। অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাবে নাম ও রূপের সাহায্যে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাকে লোক বলে। এককথায় গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের সাধারণ নাম লোক। সমুদ্র— গুণত্রয়ের সংযোগবৈচিত্র্যজন্য সপ্তবিধ ভেদ। ইহা পূর্বে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বসুধা—পার্থিব দেহ। বসুকে ধারণ করে, অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান-রত্নের আকর বলিয়াই ইহাকে বসুধা বলা হয়। মহীধর — ঘনীভূত জড়ত্ববোধ। মহী জড়ত্বের চরম পরিণতি, যে বোধ তাহাকে ধারণ করে— অর্থাৎ যে চৈতন্য জড়াকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে মহীধর কহে। এই সকলই ক্ষুব্ধ, প্রকম্পিত ও প্রচলিত হইয়া উঠে। এ ক্ষুদ্রতা, এ জড়তা, এ মায়া কল্পিত ইন্দ্রজাল বুঝি আর থাকে না! সচ্চিদানন্দময়ীর ঘোরনাদ উঠিয়াছে, সে নাদ বুঝি সর্বভাবকে—বহুত্বকে দলিত মথিত করিয়া পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্য-রাজ্যে মিলাইয়া দিবে ! বুঝি বা জড়ত্বের অধিকার বিলুপ্ত হয় ! তাই ইহাদের ক্ষুব্ধভাব বা কম্পন। যে নাদ মহাশক্তিরূপিণী মাতৃকণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া সপ্তলোক ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, সে নাদের কি অপূর্ব প্রভাব !

সাধক ! কখনও মাতৃ আহ্বান— মায়ের সে ঘোর আকর্ষণময় কণ্ঠস্বর শুনিয়াছ কি ? যতদিন মাতৃ-অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসবান না হইবে, যতদিন মাতৃ-চরণে পূর্ণভাবে তোমার নিজত্বটি অর্পণ না করিবে, ততদিন সে আহ্বান শুনিতে পাইবে কি ? অথবা পাইলেও উহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে কি ? সেই চিদানন্দ ক্ষেত্রের অপূর্ব আহ্বান— অনির্বচনীয় নাদ— যদিও ঘোর, যদিও মহান, যদিও অমেয় তথাপি বড় মধুর ! বড় প্রাণ মাতান সে ধ্বনি। চণ্ডীর চণ্ডস্বরের অভয়বাণী ! সে যথার্থই অতুলনীয়া মা ! তুইত' দিবানিশি অশ্রান্ত অনাহত নাদে আমাদেরই হৃদয় মধ্য হইতে ডাকিতেছিস। আমরা যে তোর আহ্বান শুনিয়াও শুনি না। জগতের কোলাহল, ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-সন্ধানে ছুটাছুটির গোলমালে, তোর সে ডাক আমাদের কানে পৌঁছায় না। তাইত' মা ঘরের ছেলে ঘরে যাই না, বাহিরে প্রচণ্ড রৌদ্রে—শোক দুঃখের প্রবল দাবানলে পুড়িয়াও মোহের খেলনা নিয়ে মত্ত আছি। কত রক্তচক্ষু করে, কত ক্রোধের ভান করে আমাদিগকে ডাক্‌ছিস, কিন্তু আমাদের এই দুর্বার মোহ কিছুতেই ভাঙে না।

কেন মা আমরা তোর ডাক শুনি না ? আমাদের শোনবার মত কেন ডাক না ? যেমন করিয়া ডাকিলে আমাদের বধির কর্ণেও পৌঁছায়, তেমনি করিয়া ডাক মা। শুনিয়াছি—তোর আহ্বান যে শুনিতে পায়, সে নাকি কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসে। আমাদের কানে একবার সেইরূপ ধ্বনি শুনাও মা ! যে নাদে বৃন্দাবনে গোপীগণ লাজ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিত, যে নাদে পশুপক্ষী ব্যাকুল হইত, যে নাদে যমুনা উজান বহিত, সেই নাদ মা, সেই নাদ, সেই সপ্তরন্ধ্র বিশিষ্ট মোহন বংশীনাদ ; একবার—একবারমাত্র আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দে ! আমরাও এই বিষয়-রূপ কূল ছাড়িয়া অকূলে —শ্যামকলঙ্ক সাগরে ভাসি। আমরাও মাতৃহারা বৎসের মত মা মা বলিয়া ছুটি।

মায়ের সে নাদ ও এ নাদে বিভিন্নতা আছে। সে আকর্ষণময় মধুর বংশীনাদ, আর এ উৎপীড়িত সন্তানের অসুরভীতি-নিবারক ঘোরনাদ। নাদ একই, কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। যাহা পুত্রের নিকট মোহন আকর্ষণমন্ত্র, তাহাই পুত্রের বৈরি-সংহারে ঘোর অভিচার-মন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয়। মা চণ্ডমূর্তিতে আবির্ভূতা। অসুরকুলের ক্ষয় উদ্দেশ্যে বিরাট ঐশ্বর্য-

সম্ভারে সমগ্র বিশ্বশক্তি সমবায়ে মাতৃদেহ বিভূষিত। যদিও পুত্রের দৃষ্টিতে এ মূর্তি অভয়া— আনন্দদায়িনী, তথাপি শত্রুর চক্ষুতে ইহা অতীব ভীষণা— ভীতিদায়িনী। তাই এস্থলে মাতৃ-হুঙ্কার ঘোর—সুমহান। ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

সাধক ! তুমিও যখন মা বলিয়া সিংহনাদ ছাড়িবে, সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সত্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ববিধ দুর্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যখন সত্যনাদ তুলিবে—তখন যেন সে নাদে সমস্ত ব্যোমমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠে, তোমায় জড়দেহ যেন সত্যনাদে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রতি পরমাণু যেন সত্যের সম্বেদনে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। সত্যকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া 'জয় সত্য,—জয় মা' বলিয়া এমনই উচ্চধ্বনি করিবে, যেন সমগ্র বিশ্ব—স্থাবর জঙ্গম, তোমার সে নাদে কম্পিত হইয়া উঠে ; এ জগৎ যেন জড়ত্ব ছাড়িয়া প্রাণময় ভাব ধারণ করে। এমনই ভাবে মা মা বলিয়া ডাকিবে, যেন সে ডাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মর্মে ভীতির সঞ্চার হয়। ঠিক এমনি অসুরকুলের প্রাণে ভীতি উৎপাদন করিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত সাহসী পুত্রের মত, একবার মা বলিয়া ডাক দেখি ! ওরে, একদিন সমগ্র বিশ্বমানবমণ্ডলী সমবেত কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিবে, সে ঘনীভূত ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্য একত্র করিয়া দিবে ! আর আমি—আমি দূরে দাঁড়াইয়া, সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইব। আসিবে সে দিন—আসিবে।

সে যাহা হউক, এস্থলে নাদতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। নাদই ব্রহ্ম। নাদতত্ত্বে অবগাহন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মদর্শন বা মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় ? প্রথমতঃ স্মরণ কর— এ জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা মাত্র। শ্রুতিও বলেন — **'যথা পূর্বমকল্পয়ৎ'**। কল্পনা—মনের ধর্ম। **'সঙ্কল্প কর্ম মানসম্'**। সঙ্কল্প বা কল্পনাই মানসকর্ম। মনে যাহা কল্পিত হয়, তাহা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র। শব্দশূন্য কল্পনা হয় না। যদি জগতে শব্দ না থাকিত, তবে কল্পনা বলিয়া কিছু থাকিত না। মনে মনে কতকগুলি শব্দের অনুচিন্তন করাই কল্পনা। সুতরাং 'ব্রহ্ম কল্পনা করিলেন' বলিলে, বুঝিতে হয়—কতকগুলি শব্দ করিলেন। যেমন—সূর্য চন্দ্র বৃক্ষ লতা মনুষ্য পশু জগৎ ইত্যাদি। এইরূপ শব্দময় মানস কল্পনা-গুলিই এই পরদৃশ্যমান জগৎ। সুতরাং এ জগৎ শব্দময়।

আবার অন্যদিক দিয়াও ইহা বুঝিতে পারা যায় — জাগতিক বস্তুনিচয়ের সাধারণ নাম পদার্থ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দকে পদ কহে। পদের যাহা অর্থ, তাহাই পদার্থ। পদ—কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি। উহাও শব্দ মাত্র। প্রত্যেক পদের বা শব্দের এক একটি অর্থ আছে। ঐ অর্থ ঐশ্বরিক সঙ্কেত বিশেষ— 'এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থ প্রতীতি হইবে' এইরূপ একটা অনাদিসিদ্ধ সঙ্কেত আছে। 'বৃক্ষ' একটি শব্দ। উহা কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। মনে বা মুখে উহা ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায় ! সুতরাং ব্যাকরণ মতে যাহা শব্দ, তাহা শুধু বর্ণ সমষ্টি নহে —ধ্বনিস্বরূপ। যাহা হউক 'বৃক্ষ' এই পদের অর্থ বা অনাদিসিদ্ধ একটি সঙ্কেত আছে। শাখাপল্লবাদি বিশিষ্ট একটা বস্তুই ঐ সঙ্কেত। কারণ, বৃক্ষ শব্দ উচ্চারণ মাত্র ঐরূপ একটা বস্তুকে প্রতীত করাইয়া দেয়। এইরূপ সর্বত্র। যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটু ধীরভাবে তৎকালীন মানস ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পদার্থগুলি একটি শব্দময় ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রুতিও বলেন **'বাচারম্ভনং নামধেয়ং বিকারঃ'**। পদার্থরূপে যাহা কিছু প্রতীত হয়, উহা বাক্য অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং এ জগৎ যে কতকগুলি শব্দসমষ্টিমাত্র, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেদান্তমতে জগৎ নামরূপ মাত্র। নাম—বস্তুতঃ শব্দ বা নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এই নাদ দ্বিবিধ। ধ্বন্যাত্মক ও শব্দাত্মক। শঙ্খ মৃদঙ্গাদি হইতে যে নাদ উত্থিত হয়, তাহা ধ্বন্যাত্মক। উহাতেও জীবের হর্ষ বিষাদ ক্রোধ প্রভৃতির উদ্দীপনা হয় ; ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় শঙ্খনাদ, ধার্তরাষ্ট্র-দিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। যখন জড়যন্ত্রাদি হইতে নির্গত নাদের এত ক্ষমতা, তখন চেতন যন্ত্র অর্থাৎ জীবকণ্ঠ হইতে নির্গত শব্দময় নাদ যে, জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি কার্যে সমর্থ হইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? দুর্যোধন বলিল— 'সুচ্যগ্র ভূমি দিব না', এই একটি শব্দে ভারতীয় সমুদয় রাজন্যবৃন্দ স্বেচ্ছাপূর্বক পতঙ্গের ন্যায় সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অসংখ্য আছে। পক্ষান্তরে আবার একটি শব্দই, শুধু উচ্চারণগত পার্থক্যে অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের তারতম্যে শ্রোতার মনে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক করে। সহধর্মীণীর

সহোদরকে ব্যঙ্গকণ্ঠে 'শালা' বলিলে, তাহার ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি প্রকাশ পায়। আবার উহাকেই ঐ শব্দটি কর্কশকণ্ঠে প্রয়োগ করিলে, সেও কঠোরস্বরে ঐ শব্দটি সুদের সহিত প্রয়োগকর্তাকে ফিরাইয়া দেয়। ইহাই জগতের নিয়ম। শুধু কতকগুলি শব্দদ্বারা এই জগৎ রচিত, কতকগুলি শব্দদ্বারা পরিচালিত এবং কতকগুলি শব্দ দ্বারা ইহার প্রলয় হইতেছে। এই জগৎ কতকগুলি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রত্যেক পরমাণুরই একটা স্বাভাবিক শব্দ আছে। এই স্বাভাবিক শব্দ হইতেই আণবিক স্পন্দন নির্বাহিত হয়। স্পন্দনের সংযোগবিয়োগের বৈচিত্র্যবশতঃ, এই বিচিত্র জগৎ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ স্বাভাবিক শব্দটি আমাদের 'অ'কার বর্ণের ন্যায়। কতকগুলি 'অ'কার একসুরে একতানে দীর্ঘপ্লুতভাবে উচ্চারিত হইলে যেরূপ হয়, এই জগতের মূল বা স্বাভাবিক নাদ সেইরূপ। উহাই আদিম শব্দ। ভগবানও বলিয়াছিলেন— **'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'** অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অ-কার। ব্রহ্মে যখন জগৎ সৃষ্টি বিষয়ক কল্পনা হয়, তখন ঐ 'অ'কারটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত বা গতিপ্রাপ্ত হয়, তখন উহা দীর্ঘপ্লুত 'উ'কার বর্ণের ন্যায় ধ্বনিত হইতে থাকে। সৃষ্টি কল্পনা যখন পরিসমাপ্ত হয়, তখন তজ্জন্য গতি বা স্পন্দনও স্তব্ধ হইয়া যায়, সেই সময় উহা 'ম্ ম্ ম্' ইত্যাকার শব্দে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই 'অউম্' বা 'ওঁ' সৃষ্টির সর্বপ্রথম নাদ। সাধকগণ কর্ণবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অথবা অন্য প্রক্রিয়াদ্বারা এই নাদ, অনাহত কেন্দ্র হইতে শুনিতে পান। জগদব্যাপী সে নাদ আকর্ষণময়। সেই প্রাণমাতান 'অউম্' 'অউম্' শব্দে মনে হয়, যেন—'আয় মা আয় মা' বলিয়া মা আমায় প্রবল স্নেহের তাড়নায় ডাকিতেছেন ! সে যে কি অপূর্ব স্বর, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সত্যই বলিতে হয় —'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ'। যে যাহা হউক, যেরূপ কোন স্বরযন্ত্রের যে মৌলিক স্বর আছে, বাদকের অঙ্গুলি চালনার বৈচিত্র্যবশতঃ উহা হইতে নানারূপ স্বর প্রকাশ পায় ; সেইরূপ এই মৌলিক প্রণব নাদ, গুণত্রয়রূপ অঙ্গুলিত্রয়ের সংযোগ-বিয়োগের তারতম্যবশতঃ, এই বিভিন্ন নাদময় বিচিত্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি—শক্তির স্পন্দনই এই জগৎ। অখণ্ড জ্ঞান-বক্ষে যে মহতীশক্তি বিরাজিতা, তাঁহারই বিভিন্ন স্পন্দন— রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হয়। স্পন্দন—শব্দমূলক। অর্থাৎ নাদ হইতেই স্পন্দন প্রকাশ পায়। ইহা প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের হস্তপদাদি অবয়বস্থ মাংস-পেশীগুলির যে সংকোচ-প্রসাররূপ স্পন্দন হয়, উহাও কতকগুলি শব্দকে আশ্রয় করিয়াই নিস্পন্ন হয়। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির উদয়ে বিভিন্ন অবয়বস্থ মাংসপেশীগুলি কিরূপ অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। ঐরূপ স্পন্দনের হেতু—ঐ জাতীয় বৃত্তির উত্তেজনামূলক নাদ বা শব্দ মাত্র ! মনে বা মুখে যখন কাম ক্রোধাদি বিষয়ক শব্দ সকল উচ্চারিত হইতে থাকে, তখনই বিভিন্ন অবয়বে ঐরূপ বাহ্যিক স্পন্দন প্রকাশ পায়। এইরূপ ভগবদ্ভাবের উদ্দীপক শব্দগুলিও অনেক সময় সাধকের অঙ্গ-বিক্ষেপের হেতু হয়। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে। যাহা হউক, আমাদের চিন্তাতরঙ্গ বা ভাবগুলি যে নাদময়, এবং ঐ নাদই যে মহতী শক্তির বিভিন্ন স্পন্দনরূপে প্রকাশ পায়, ইহা অবিসংবাদি-সিদ্ধান্ত।

পূর্বকালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই নাদ ও স্পন্দন-তত্ত্বে এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, মাত্র শব্দের সাহায্যে বিভিন্ন শক্তির স্ফুরণ করিয়া, অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্তী কালের তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি এই নাদ ও স্পন্দনতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার। ঐ সকল মন্ত্রের সাহায্যে এখন—এই অবিশ্বাসী সত্য-জ্ঞানহীন যুগেও অনেক অলৌকিক প্রত্যক্ষফল লাভ হইয়া থাকে। এখনও এ দেশের নিরক্ষর রোজাগণ, শুধু মন্ত্র পাঠ করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকে। হাতচালা, বাটিচালা, নলচালা প্রভৃতি বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া লোককে বিস্মিত করিয়া থাকে।

অল্পদিন হইল—আমাদের পল্লীতে জনৈক পশ্চিম-দেশীয় ভৃত্যের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। অন্ততঃ ডাক্তারগণ তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া মৃত বলিয়াই স্থির করেন। অনন্তর তাহার আত্মীয়গণ সন্ধ্যার পর শবদাহ করিবার জন্য শ্মশানঘাটে যাইতেছিল ; পথিমধ্যে মৃতব্যক্তির পরিচিত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুটি উহার

সর্পাঘাতে মৃত্যুর বিবরণ জানিতে পারিয়া, উহাকে দাহ করিতে নিষেধ করে। পরে স্বয়ং শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়া মৃতের পদাঙ্গুলিতে দড়ি বাঁধিয়া কি কতকগুলি মন্ত্র পড়িয়া দড়ি টানিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মাথায় চপেটাঘাত করিতে লাগিল। এরূপ তিনঘণ্টাব্যাপী কঠোর যত্নের ফলে মৃতদেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সমুদয় রাত্রি ঐরূপ মন্ত্রপাঠ ও চেষ্টার ফলে, সে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঐ ভৃত্যটি যেদিন স্বয়ং আমাদের নিকট ঐ কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, সেদিনও তাহার পায়ের ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই।

গ্রন্থকারও কোনরূপ যোগশক্তি প্রয়োগ না করিয়া 'শুধু মন্ত্রশক্তি প্রভাবে কুক্কুরদষ্ট বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন কামলা প্রভৃতি কতকগুলি রোগও এইরূপ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আরোগ্য করা যায়। যে যাহা হউক, এই মন্ত্রই— নাদ। ঐ নাদের সহিত রোগাদি আরাগ্যকারিণী বিভিন্ন শক্তির যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, ইহা যাঁহারা প্রথম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ধন্য তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন ! ধন্য তাঁহাদের দয়া। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌ কর্ম, অভীষ্টমূর্তি দর্শন ইত্যাদি ব্যাপার, শুধু মন্ত্রশক্তি প্রভাবেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। নাদের যে এরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে, ইহা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু যথার্থ নাদতত্ত্বে প্রবেশপূর্বক উহার শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ।

যাহা হউক, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যেরূপ স্থূলজগৎ প্রকাশ পায়, সেইরূপ অব্যক্ত নাদ হইতেই স্থূল বা ব্যক্তনাদ প্রকাশ পায়। গুণত্রয়ের সাম্যবস্থা প্রকৃতি। সে অবস্থায়ও নাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; অন্যথা গুণক্ষোভ অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরস্পর অভিভবরূপ স্পন্দন হইতে পারে না। পূর্বে বলিয়াছি—যেখানে স্পন্দন বা শক্তি বিদ্যমান, সেইখানেই নাদের সত্তা আছে। তবে এ নাদ অতীন্দ্রিয়, তাই ইহাকে শাস্ত্রকারগণ 'পরা' আখ্যা দিয়াছেন। প্রকৃতির যেরূপ 'পরা' নাম আছে, ব্রহ্মকে যেরূপ 'পর' বলা হয়, সেইরূপ এই অব্যক্ত নাদকেও পরাবাক্‌ কহে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা স্পন্দন —মহতত্ত্ব। ইহা যাবতীয় বৈষয়িক প্রকাশের ক্ষেত্র ; এইখানে যে নাদ আছে, তাহার নাম পশ্যন্তী। মাত্র যোগিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা মহৎতত্ত্বে আত্মবোধ লইয়া যাইতে পারেন ; তাঁহারাই এই নাদের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়াই ইহাকে পশ্যন্তী বলে। তারপর মধ্যমা, ইহা মনোময় ক্ষেত্রে উপলব্ধি হয়। একটু স্থির হইয়া, স্বকীয় সঙ্কল্প প্রভৃতি ভাবগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে, মানুষ মাত্রেই ঐ নাদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহা ধ্বনি-হীন অথচ শব্দ। অনন্তর ভাবগুলি একটু ঘনীভূত হইলেই, কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে এক একটা স্পন্দন প্রকাশ পায়। তাহারই ফলে ব্যক্ত বা স্থূল নাদ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রকারগণ উহাকে বৈখরী বলেন। ইহা সর্বপ্রাণি-সাধারণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। প্রাচীন আচার্যগণ 'নাদ' শব্দটির ব্যবহার না করিয়া 'বাক্‌' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্‌ ও নাদ অভিন্ন ! এস্থলে বাক্‌ শব্দটি ইন্দ্রিয় অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাক্‌- স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; তাই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারটি সংজ্ঞাই স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। বৈখরীবাকের আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে তিন প্রকার ভেদ আছে। সে সকল আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আর্যশাস্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বাক্‌ ও নাদ প্রকাশক বর্ণমালার নাম অক্ষর। গীতায় উক্ত হইয়াছে **'অক্ষরং পরং ব্রহ্ম।'** অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝা যায়। যে অক্ষর শব্দটি পরব্রহ্মের বাচক, তাহাই এ দেশের বর্ণমালার বাচক শব্দ। ইহা অপেক্ষা উচ্চ বিজ্ঞান নাদতত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশে কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। আরও একটি জ্ঞাতব্য কথা আছে—'অ' কার হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত স্বর ব্যঞ্জন মিলিত পঞ্চাশটি বর্ণমালার নাম 'মাতৃকা'। সৃষ্টি-স্থিতি, প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার বর্ণময়ী নাদময় হইয়া, নিত্য সুপ্রকাশ রহিয়াছেন। মাতৃকাধ্যানে আছে—**'পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদয়োঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্‌।'** পঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারাই মায়ের আমার মুখ-হস্ত-পদ-মধ্যদেশ-বক্ষস্থল প্রভৃতি অবয়ব গঠিত। সাধক ! তোমরা কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও ! দেখ—তোমার কণ্ঠনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দ-রূপেই মা, এই জগৎময় যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, ঐ উহাই মা ! তুমি যে ইষ্টমন্ত্র জপ কর—ঐ মন্ত্রই ত' মা ! মনে মনে যে অপ্রকাশিত বাক্‌ উচ্চারণ কর বা চিন্তা কর—ঐ ত' মা ! তুমি মা বলিয়া ডাকিলে, ঐ 'মা' শব্দটিই

যে মা ! ওগো নাম ও নামী যে অভেদ ! তোমরা মাকে দেখিতে চাও না বলিয়াই দেখিতে পাও না। মা ত' আমার সর্বত্র নাদরূপে সুপ্রকাশরূপা। শুধু ইচ্ছার অভাব বলিয়া মাকে পাও না। কিন্তু সে অন্য কথা।

প্রত্যেক জীবদেহে—প্রত্যেক পদার্থই ঐ পঞ্চাশদ্‌বর্ণ-রূপিণী মাতৃকাদ্বারা বিরচিত। তান্ত্রিক ন্যাসগুলিও (মাতৃকান্যাস, বর্ণব্যাস, সোঢ়ান্যাস ইত্যাদি) এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই '**অং নমো ললাটে, আং নমঃ শিরসি, ইং নমো দক্ষিণচক্ষুষি, ঈং নমো বামচক্ষুষি**' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ঐ সকল স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ন্যাস সমাপ্ত করেন। কিন্তু হায় ! উহাতে কি ন্যাসের যাহা যথার্থ ফল, তাহা লাভ হয় ? যে উদ্দেশ্যে ঐ সকল বিধান, তাহার দিকে লক্ষ্যহীনতা-বশতঃ ঐরূপ অনুষ্ঠান—অঙ্গসঞ্চালনাদিরূপ একটা কসরৎ মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। এস্থলে একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি—যদি একজন লোকও অগ্রসর হয়, তথাপি উদ্দেশ্য সফল হইবে। ললাটাদি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বোধশক্তি অর্থাৎ অনুভূতি লইয়া যাইতে হয়, এবং যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ স্পন্দন অনুভূত হয়, ততক্ষণ ঐ অংশ ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে (বাক্‌যন্ত্র যাহাতে বেশী কম্পিত না হয়) উচ্চারণ করিতে হয়। মানস উচ্চারণই শ্রেষ্ঠ। প্রথম অভ্যাস করিবার সময় ইহাতে একটু অসুবিধা ও কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিছুদিন পরে, ঐ কষ্ট আর থাকে না ; তখন ইচ্ছামাত্রে অনুভূতি পরিচালনা করিবার সামর্থ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বীজ উচ্চারণ করিতে থাকিলে অনুভূতি স্পন্দন এবং বীজ যেন এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে হইতে থাকে। এইরূপ মন্ত্র, স্পন্দন এবং অনুভূতি—তিনই যখন এক সুরে বাজিয়া উঠে অর্থাৎ যুগপৎ অভিন্নরূপে বোধ হইতে থাকে, তখনই বুঝিবে— ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ চৈতন্যময় ন্যাস করিবার সময়ই, একটা অভূতপূর্ব সুখময় অনুভূতি হইতে থাকে। ইহার আরও বিশেষ ফল আছে— আমি যে দেহবিশিষ্ট একটা জড়পদার্থ মাত্র, এ বোধ তিরোহিত হয়— দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল হয়। শারীরিক ব্যাধি নাশ করিবার পক্ষেও ইচ্ছা অব্যর্থ উপায়। এতদ্‌ভিন্ন যথাযথ ন্যাসপুটিত সাধকের অনেক অলৌকিক শক্তিও লাভ হয়।

———○———

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তাম্‌ চুঃ সিংহবাহিনীম্‌।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ॥ ৩৩॥

অনুবাদ। দেবতাবৃন্দ আনন্দে সেই সিংহবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া জয়ধ্বনি, এবং মুনিগণ ভক্তিবিনম্র অন্তঃকরণে বিনত শরীরে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এতদিনে দেবগণের আশা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্বে ব্যষ্টি শক্তিসমূহ মহতী শক্তি হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন বোধ করিয়াছিল ; তাই অসুর-অত্যাচারের নিবারণকল্পে, বহু যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে ভাব দূরীভূত হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ মহতী শক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই দেবগণের আনন্দ — তাই জয়ধ্বনি। খুলিয়া বলি— মহৎতত্ত্বে বা বিজ্ঞানময়কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, অস্মিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই অবস্থায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বা বিভিন্ন বৈষয়িক প্রকাশকে আর পৃথক সত্তা বলিয়া মনে হয় না। সকলই একমাত্র অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতীত হইতে থাকে। তখন দেবতাগণের— ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চেতনবর্গের আর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব থাকে না। এক মহৎ কর্তৃত্বে, সকলের কর্তৃত্ব পর্যবসিত হইয়া পড়ে। মহতী শক্তিরূপিণী মা-ও, তখন সিংহবাহিনী মূর্তিতে প্রকটিতা হন ! জীবত্ব-হননেচ্ছু সাধকই সিংহ। সাধক তখন যথার্থই স্বকীয় জীবভাবকে হিংসা করিতে আরম্ভ করে। তাই সাধারণ লোক তাহাকে নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে। তখন তাহার দেহটি মাতৃ-শক্তির পরিচালক যন্ত্র বা বাহনরূপে পরিণত হয়। কি অভূতপূর্ব সংযোগ। এ অবস্থায় মায়ের ঘোরনাদ— অত্যুচ্চ অভয়বাণী একদিকে যেমন অসুর-কুলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, অন্য দিকে তেমনি দেবতাগণের হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া দেয়। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবতাগণ আনন্দে 'জয় মা, জয় মা' ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিল। আবার মুনিগণ — যাহারা এতদিন মৌনভাবাপন্ন ছিল, সেই সাত্ত্বিক প্রকাশসমূহ, উপযুক্ত অবসরে মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া মায়ের স্তুতি-মঙ্গল গান করিতে লাগিল। ভক্তিভরে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে তাহাদের দেহ মন মাতৃ চরণে সম্যক্‌ অবনত হইয়া পড়িল।

সাধক ! তুমিও যখন অন্তরে অন্তরে মাতৃ-আবির্ভাব

উপলব্ধি করিবে, তখন পূর্ণ বিশ্বাসে পূর্ণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিও। যে মুহূর্তে দেখিবে—একটু সত্যের আভাস পাইয়াছ, বিন্দুমাত্র মাতৃ-করুণার প্রমাণ পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের সর্ববিধ অবিশ্বাস সন্দেহ দুর্বলতাকে তাড়াইবার জন্য, আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিবে এবং ভক্তি-বিনম্র অন্তঃকরণে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকিবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই দেখিতে পাইবে— দিন দিন তোমার অন্তঃকরণ নির্মল হইতে নির্মলতর হইয়া উঠিতেছে। হৃদয়খানা মাতৃ-সিংহাসনরূপে পরিণত হইয়াছে। চিত্ত শুদ্ধির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। উপনিষদ্ যুগের ঋষিগণ এই উপায়েই চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিতেন।

———○———

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ॥ ৩৪॥

অনুবাদ। সমস্ত ত্রিলোককে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া, অমরারিগণ অগণিত সুসজ্জিত সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ উদ্যত সমুত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা। মহর্ষি মেধস দেবপক্ষের আয়োজন বর্ণনা করিয়া, রাজা সুরথকে একবার অসুরকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। দেখ সাধক ! মায়ের ঘোর নাদ দেবতাবৃন্দের জয়নাদ এবং মুনিগণের স্তোত্রনাদ একীভূত হইয়া, সমগ্র ত্রিলোক কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক—মূলাধারাদি চক্র-ত্রয় সে নাদে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঐ তিন কেন্দ্রই অসুরভাব সমূহের বিকাশস্থান ! অমরারিগণ—অমরত্বের বিরোধিদল, অর্থাৎ যাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতু, তাহারাও এই উদ্যমের প্রতিকূলে সজ্জীভূত হইয়া, স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অসুরগণ ইতিপূর্বে পুনঃ পুনঃ দেবশক্তি মথিত করিয়াছে। তাই এবারও পূর্বসংস্কারবশতঃ জয়লাভের আশায়ই তাহাদের এই সমুত্থান। কিন্তু হায় ! অসুরকুল জানে না যে, এবার দেবতাগণ নহে—স্বয়ং মা আমার সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা।

———○———

আঃকিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ॥ ৩৫॥

অনুবাদ। আঃ একি ! ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া, মহিষাসুর অগণিত অসুর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ্যে অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এতদিনে সন্তানের আনন্দধ্বনি-মিশ্রিত মাতৃ-হুঙ্কার মহিষাসুরের প্রাণে ভীতি এবং উদ্বেগ আনয়ন করিয়াছে। আঃ শব্দটি কোপ ও পীড়ার ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। সঞ্চিত কর্ম সংস্কার সমূহের মূলীভূত রজোগুণের মর্মস্থল পীড়িত করিয়া, মাতৃনাদ উত্থিত হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে—গুণত্রয় পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক ধর্মবিশিষ্ট, সত্ত্বগুণ প্রকট হইলেই অপর গুণের অভিভব হয়। আবার অপরগুণও অভিভূত হইবার উপক্রম হইলেই সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এস্থলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। সত্ত্বগুণের প্রকট ভাব লক্ষ্য করিয়াই আজ রজোগুণও সত্ত্বপ্রকাশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ ত্রিলোক-সংক্ষুব্ধকারী জয়ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মহিষাসুর সহকারীবৃন্দের সহিত 'কোথা হইতে এই নাদ আসিতেছে' তাহার সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। সহকারি অসুরবৃন্দের নাম পরে পাওয়া যাইবে। সাধক ! তুমিও দেখ—যখনই তুমি মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ কিংবা-মাতৃ মহত্ব-কীর্তন প্রভৃতি কোনরূপ সাধনা করিতে থাক, তখনই সঞ্চিত বৈষয়িক সংস্কারগুলি অলক্ষিতভাবে তোমার সেই সাধনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়।

———○———

স দদর্শ ততোদেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥ ৩৬॥
ক্ষোভিতাশেষ পাতালাং ধনুর্জ্যানিস্বনেন তাম্।
দিশোভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥ ৩৭॥

অনুবাদ। অনন্তর সে (মহিষাসুর) দেখিতে পাইল—এক দেবীমূর্তি বিরাজিতা। তাঁহার কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, পদভরে পৃথিবী অবনমিত হইয়াছে, কিরীট আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ধনুর জ্যাধ্বনিতে সমগ্র পাতাল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং সহস্র ভুজ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্বে মহিষাসুর যতবার দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, ততবারই দেখিতে পাইত— এক একটি ব্যাষ্টিশক্তি আপন কর্তৃত্ব লইয়া তাহার বিরুদ্ধে

যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবারই তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এবার এ কি দেখিল। দেখিল —এক দেবীমূর্তি। দেবী—দ্যোতনশীলা। স্বপ্রকাশরূপিণী মহতী চিৎশক্তি। তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্রই বুঝিতে পারিল—এ যে **'ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।'** তাঁহার প্রকাশে ত্রিলোক প্রকাশিত। স্বয়ং মহিষাসুরও তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এমনই দেবীর কান্তি — এমনই সে প্রকাশশক্তি। **'তমেবভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি।'** কেবল সর্বলোক প্রকাশক কান্তি নহে—তাঁহার চরণ স্পর্শে ভূতল অবনত হইয়াছে। ভূতল—জড়ত্ব। চিন্ময়ীর পাদাক্রমণে—গতিশক্তি প্রভাবে সর্বত্রগামিনী অচিন্তনীয়া শক্তির প্রভাবে ক্ষিতিতত্ত্ব বা জড়ত্ব অবনত অর্থাৎ অপ্রকাশ প্রায় হইয়াছে। চৈতন্যময়ী মাতৃ-শক্তির প্রকাশে জড় বলিয়া আর কিছুই প্রতীতি হয় না তাই মা আমার **'পাদাক্রান্ত্যা নতভূবম্'**। প্রকাশ জিনিষটা গতিবিশিষ্ট বলিয়াই, গমনার্থক পাদ শব্দের প্রয়োগ। আবার পাদ শব্দের অর্থ কিরণও হয়। চিন্ময়ী মায়ের সর্বতোভেদী প্রকাশসত্তার উদয়ে ভূ অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব বা জড়বস্তু সমূহের সত্তা বিলুপ্তপ্রায় হয়। এই বিলুপ্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই **'নতভূবম্'** বলা হইয়াছে। তারপর কিরীট মস্তকভূষণ — বিশুদ্ধবোধ। উহা অম্বর স্পর্শ করিয়াছে। বোধবস্তু আকাশবৎ—নির্লিপ্ত ও সর্বব্যাপী। তবে আকাশ—জড়, কিন্তু বোধ—চৈতন্যস্বরূপ। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—**'ব্রহ্মব্যোম্নোর্ন ভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্'**।

মায়ের ধনুর জ্যাধ্বনিতে অশেষ পাতাল বিক্ষোভিত। ধনুর জ্যাধ্বনি— প্রণবধ্বনি। শ্রুতি বলেন **'প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে'**। প্রণবধ্বনিতে সপ্ত অজ্ঞান ভূমিকা বিক্ষোভিত হইয়াছে। পাতাল সাতটি, তাই মন্ত্রে অশেষ পাতাল বলা হইয়াছে। বদ্ধ, বদ্ধতর, বদ্ধতম, মূঢ়, মূঢ়তর, মূঢ়তম এবং জড় এই সপ্ত অজ্ঞানভূমিকাই যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল ও মহাতল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চৈতন্যময়ী মায়ের আবির্ভাবে, চৈতন্যময় প্রণবাদি মন্ত্রের ধ্বনিতে যাবতীয় অজ্ঞানভূমিকা —অসুরনিবাস বা নাগলোকসমূহ প্রকম্পিত হইয়া উঠে। যেরূপ সপ্ত অজ্ঞানভূমিকা সপ্ত পাতাল নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ সপ্ত জ্ঞানভূমিকাই সপ্তস্বর্গ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে সপ্তস্বর্গের বিবরণ বলিয়া রাখিতেছি—মুমুক্ষু, মুমুক্ষুতর, মুমুক্ষুতম, ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ—এই সপ্তবিধ জ্ঞানভূমিকাই সপ্তস্বর্গ।

মায়ের সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য ভুজে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ মনে হয়, দিক্‌সমূহ শূন্য বা আকাশ মাত্র ; কিন্তু মাতৃ আবির্ভাবে দিক্ বা দেশ বলিয়া কোন প্রতীতি থাকে না। সকলই মাতৃময় হইয়া পড়ে ; সর্বব্যাপী ঘন চৈতন্যসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন আর শূন্য বলিয়া কিছুই থাকে না, সবই পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এক কথায় মাতৃ আবির্ভাবে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সাধক যখন মাতৃলাভ করে অর্থাৎ মাকে দেখে, তখন তাহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহার চৈতন্য বা আমিত্ব ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, জড়ত্ব তিরোহিত হয়, আকাশের ন্যায় বোধ সর্বতঃ প্রসৃত হইয়া পড়ে, শব্দহীন প্রণবধ্বনিতে অজ্ঞান, সংশয় ও জড়তা পলায়ন করেন, এবং একমাত্র চৈতন্যসত্তাই যে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে।

যতদিন এরূপভাবে মাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ সাধনার আরম্ভই হয় না। এইখানে দাঁড়াইয়া তবে সাধনা, অর্থাৎ ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে আত্মশর নিক্ষেপ করিতে হয়। মা আমার এইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেই অসুর অত্যাচার নিবারণের উপায় হয়।

———○———

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যাসুরদ্বিষাম্।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধামুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের বহুধা বিমুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের তেজে দিগন্ত দীপ্তিময় হইল।

ব্যাখ্যা। এইবার সুরদ্বিষগণের সহিত মায়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ! যদি বল—মায়ের আবার যুদ্ধ কি ? তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রেই ত' অসুরগণ নিহত হইতে পারে, তবে আবার যুদ্ধের প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তরে বলিতে

হয়—যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। মাতা-পুত্রের আনন্দক্রীড়াই এই যুদ্ধ। মাতা-পুত্রের রণ অতি বিস্ময়কর— বড় মনোহর ! পুত্র বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে চায়, আর মা বলপূর্বক বিষয় ছাড়াইয়া কোলে তুলিয়া নিতে চান। সেই সময়ে মাতা-পুত্রের যে লীলাভিনয় হইয়া থাকে তাহাই বাহিরে যুদ্ধরূপে অভিব্যক্ত হয়। সাধক পুত্রদিগকে এ কথার উত্তর, ইহা অপেক্ষা আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না।

গীতায় দেখিতে পাই—অর্জুন ভগবানকে বলিয়াছিলেন, **'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপুয়াম্'** —'আমি যাহাতে শ্রেয়োলাভ করিতে পারি, সেইরূপ একটি নিশ্চয় করিয়া বল'। সেখানেও 'আমি' শ্রেয়োলাভ করিব, এইরূপ ভাব ছিল। তাই মা আমার সারথিরূপে—গুরুরূপে অবস্থান করিয়া অর্জুনের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া, তাহা দ্বারাই ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিধন করাইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীতে দেখিতে পাই—পুত্র মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্নশিশু, কর্তৃত্ববোধ সর্বতোভাবে মাতৃচরণে সমর্পিত। আমি বলিয়া পৃথক একজন নাই, থাকিলেও সে মাতৃক্রীড়নক মাত্র। এখানে সুখ দুঃখে মা হর্ষ বিষাদে মা, কাম-ক্রোধে মা, দয়ায় ক্ষমায় মা, হিংসা-দ্বেষে মা, এখানে পুত্র মা ভিন্ন আর কিছুতেই থাকিতে চায় না ; সুতরাং অগত্যা মাকেই সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। মা স্বয়ং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুত্রের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে অসুরের অত্যাচার নিবারণকল্পে দণ্ডায়মান হন। যদিও মায়ের ইচ্ছামাত্রেই এই অসুর-নিধন ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি মা সন্তানের ইচ্ছার অনুরূপ সংস্কারের সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন।

আরে অসুরকুলও ত' মায়ের সন্তান ! আমাদের যাহা জীবভাব, তাহাই ত' যথার্থ অসুর ; আমাদের মুখ হইতে যথার্থ মাতৃ-আহ্বান নির্গত হইবে বলিয়াই ত', মা অসুর-অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। আমরা মা বলিয়া ফেলিয়াছি—শোকে দুঃখে উৎপীড়নে আনন্দে, যে ভাবেই হউক, সত্যই একবার মা বলিয়া ফেলিয়াছি, আর কি মা স্থির থাকিতে পারেন ! আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইবেন, আমাদের সংস্কারশ্রেণীকে বা অসুরবৃন্দকে একে একে বিনাশ করিবেন, আর আমরা তাহা দেখিয়া, মহোল্লাসে 'জয় মা' ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিব। এস মায়ের সন্তানগণ, আমরা কোটি কণ্ঠে একবার সত্যই মা বলি বলিয়া ডাকি।

ওগো ! কিরূপে ভাষায় বুঝাইব যে, মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। সাংখ্যের ভাষায় যাহারা ইহাকে প্রকৃতি বল, তাহারা চাহিয়া দেখ—ঐ প্রকৃতিই যতদিন অপবর্গমুখী না হয়, ততদিন মুক্তির আশা নাই। প্রকৃতি যখন বিশেষভাবে পুরুষাভিমুখী গতিলাভ করে, তখনই ভূত ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তত্ত্বগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া প্রলয়াভিমুখী হয় ; ইহাই ভক্তের ভাষায় মাতা-পুত্রের রণক্রীড়া। যাহারা যোগের সাহায্যে বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইতে অভিলাষী, তাহারাও দেখ—কিরূপ অন্তর্মুখী আকর্ষণী মহাশক্তি বহির্মুখ-বৃত্তিনিচয়কে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া প্রলয়াভিমুখী করে। পুত্রের ভাষায় ইহাই মায়ের সমর-লীলা। আবার যাহারা বেদান্তবাদী, তাহারা এই জগৎকে অজ্ঞানকল্পিত অধ্যাসমাত্র বল, ক্ষতি নাই ; ঐ অজ্ঞান বা মায়া যখন তোমার সমুজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানে বিলীন হইতে থাকে তখন আকাশাদি ভূতবর্গ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং প্রাণ অপান প্রভৃতি প্রাণবর্গ, ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞায় লীন হইতে থাকে, তখন দেখিতে পাইবে—প্রজ্ঞার স্বপ্রকাশকত্ব, মায়াকল্পিত বৈষয়িক প্রকাশকে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া প্রলয়াভিমুখী করিয়া দেয়, ইহাই চণ্ডীর ভাষায় মাতৃ সমর। আমরা এখন মায়াকে বা প্রকৃতিকে, মিথ্যা বা জড় বলিতে চাই না ; মায়াই ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মই মায়া। মায়াহীন ব্রহ্ম অথবা প্রকৃতি-সম্বন্ধহীন পুরুষ, সাধ্য-সাধনাদি সর্বভাবের অতীত। যখন অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা, নির্মল বুদ্ধিসত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা লাভ হয়, তখন পর্যন্তও ব্রহ্ম মায়াযুক্ত। এই পর্যন্ত হইলেই যে মানুষের জন্ম ও জীবন সার্থক হয় ! আর ঐ পর্যন্ত যাইতে পারিলে তৎপরবর্তী স্বরূপ অর্থাৎ মায়াহীন ব্রহ্ম বা প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য পুরুষ স্বতঃই অধিগত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এসকল কথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা জানি—মা স্বয়ংই যুদ্ধ করেন। সাধক ! তুমি **'প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী'** মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডে পড়িয়াছ ? স্বপ্রকৃতিকে মা বলিয়া বুঝিতে পরিয়াছ ? আত্মপ্রকৃতিকে আদর করিতে— ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতে

অভ্যস্ত হইয়াছ ? মা বলিলেই তাহাকে মনে পড়ে ত' ? তাহা হইলেই বুঝিবে, প্রত্যক্ষ করিবে—যথার্থই মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ-রহস্য পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

———○———

মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাক্ষোমহাসুরঃ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর এবং চামর, অন্যান্য অসুরগণের সহিত চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুরের দুইজন প্রধান সেনাপতি —চিক্ষুর এবং চামর। দেবীভাগবতে ইহাদের রণ-বর্ণনা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। চিক্ষুর—বিক্ষেপ শক্তি। বিক্ষেপার্থক চিক্ষ্ ধাতু হইতে চিক্ষুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। চামর—আবরণ শক্তি। ভক্ষনার্থক চম্ ধাতু হইতে চামর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিক্ষেপ ও আবরণ—ইহারা একদিকে যেমন ব্রহ্মময়ী মা হইতে সন্তানকে বিচ্যুত করিয়া দেয়, তেমনই অন্যদিকে মাকে আবৃত করিয়া রাখে। মাকে—আত্মাকে—আমাকে কে না দেখে ? দিবারাত্রি জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে জীব কাহাকে দেখে ? আত্মাকে—আমাকে—মাকে। কিন্তু কই, দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বোঝে না কেন ? ঐ চিক্ষুর ও চামরের অত্যাচার। একদিকে যেমন চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ-শক্তি, মাকে ক্ষণমাত্র দেখিবার সুযোগ দেয় না, তেমনই অন্যদিকে আবরণ-শক্তি মায়ের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে হয়।

তুমি দেখিলে—একটি বৃক্ষ। বস্তুতঃ বৃক্ষাকারে আকারিত চিৎ বা আত্মা। কিন্তু তুমি আত্মদর্শন না করিয়া, বৃক্ষ এই নাম এবং উহার আকৃতি মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া থাক। যে তোমাকে ঐ যথার্থ আত্মবস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া নামে ও রূপে আকৃষ্ট করে, উহারই নাম চিক্ষুর। আবার ঐ নাম ও রূপ বা বিষয়জ্ঞান যথার্থ চিৎবস্তুকে বা আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে—দেখিতে দেয় না ; উহারই নাম চামর। অথবা তুমি বরফ খণ্ড দেখিতেছ। যদিও তুমি উহাকে ঘনীভূত জল বলিয়া জান, তথাপি তোমার জ্ঞানে একখণ্ড সাদা প্রস্তরের ন্যায় একটা বস্তু মাত্র প্রকাশিত হয়। জলীয় পরমাণুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গেলেও, তোমার সে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া যে ঐ বিশিষ্ট রূপের দিকে লইয়া যায়, উহারই নাম মহাসুর চিক্ষুর। উনিই মহিষাসুরের প্রধান সেনাপতি। আর সঙ্গে আছেন আবরণকর্তা চামর ; যিনি নাম ও রূপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করিয়া তোমাকে প্রকৃত স্বরূপটি হইতে বঞ্চিত করেন। আরও দেখ—চিনির খেলনা, হাতী, ঘোড়া, মঠ ইত্যাদি, কত নাম ও রূপ আছে। বস্তুতঃ উহা যে চিনি মাত্র, অন্য কিছু নহে, ইহা জানিয়াও জানিতে চাও না ; শুধু নামে রূপে মুগ্ধ হও, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হইতে বঞ্চিত হও। ইহাই পূর্বোক্ত অসুরের অত্যাচার।

এইবার এই অত্যাচারের পরিমাণ একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তুমি সুরথ, তোমার গুরু লাভ হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি মেধসের বাক্য শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ ও মনন করিবার ফলে, বেশ বুঝিতে পারিয়াছ— জগৎটা মা বা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কিন্তু সহস্রবার বুঝিয়া, সহস্র উপদেশ শুনিয়া, সহস্রবার মনন করিয়া, অনুভব করিয়াও জগৎ দেখা মাত্রই যে জগৎ জ্ঞান হয়, উহা কাহার অত্যাচার ? ঐ চিক্ষুর ও চামরের। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় না বলিয়াই, এই জগৎকে আত্মা বলিয়া, মা বলিয়া, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছ না। মাত্র যে সময়টা তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া, জোর করিয়া ইহাকে মা বলিয়া ধর, কেবল তখনই উহারা অভিভূত থাকে ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহাদের কার্য চলিতে থাকে। এইরূপ একদিন দুইদিন নয়, বহুদিন ব্যাপিয়া এই অসুরের অত্যাচার চলিতেছে। তাই প্রথমেই বলা হইয়াছে— পূর্ণ শত-বৎসর ব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, তথাপি অসুরবল বিধ্বস্ত হয় নাই। কিন্তু আর ভয় নাই ! এবার মা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ। যিনি বিক্ষেপ ও আবরণরূপিণী হইয়া এতদিন প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনিই আজ উহাদিগকে বিলয় করিতে উদ্যতা। সুতরাং আর আশঙ্কা কি ?

সাধক ! একদিন তুমি আনন্দের মোহে উহাই চাহিয়াছিলে, চক্ষু বাঁধিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিলে তোমার আনন্দ-ক্রীড়ার রস ভোগ হয় না ; তাই মা আমার স্নেহের পীড়নে বাধ্য হইয়া আবরণ শক্তিরূপে তোমার চক্ষু বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং বিক্ষেপ শক্তিরূপে

বহুত্বের সাধ মিটাইতেছেন। বহুজন্মব্যাপী এই বহুত্বের খেলা করিয়া আজ আবার শিশুর মত বলিয়া উঠিয়াছ—না মা আর বহুত্ব চাহি না, বহুত্বে আনন্দে নাই। তাই মায়ের কৃপায় মধু ও কৈটভ নিহত হইয়াছে। কিন্তু যে বহুত্ব চাহিয়া আসিয়াছ, যাহার এখনও ভোগ হয় নাই, সেই সঞ্চিত কর্মের মূলীভূত বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তিকে এইবার বিলয় করিবার জন্য মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছ। যাহা তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলে, আজ তাহাকেই আবার বিলয় করিতে বলিতেছ! তাও কি বলিতে পার ? একবার বল ত' আবার পরমুহূর্তেই উহাদের বিলয় চাও না। তাইত' মা এক একবার তোমার মুখের দিকে তাকান—সত্যই কি তুমি চাও — তোমার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি চিরদিনের জন্য বিদূরিত হউক ! চক্ষু বাঁধিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি চিরদিনের জন্য থামিয়া যাউক ! সত্যই কি তুমি ইহা চাও ? না—মিথ্যা কথা ; তুমি তাহা চাও না। তুমি চাও—মা ও জগৎ উভয়ই থাকুক। তুমি চাও—'মাকে নিয়া খুব আনন্দে জগদ্ভোগ করিব', তাই ত' তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না ! কিন্তু যে পুত্র সত্য সত্যই বলে—'মা। আর চাই না জগৎ, আর চাই না রূপ-রসাদি-বিষয়, আর চাই না দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি, চাই—শুধু তোকে ! নিত্যা স্থিরা নির্বিকল্পা মা ! আমার, তোকেই চাই' যে পুত্র সরল প্রাণে ইহা বলিতে পারে, মাত্র তাহারই জন্য মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। তাহারই জন্য চিক্ষুর ও চামরকে নিহত করেন। তুমিও বল সাধক ! তুমি সুরথ হইয়াছ, সমাধি তোমার সঙ্গী ! ব্রহ্মর্ষি গুরু তোমার সহায়—আশ্রয় ! তুমিও একবার বল—সত্যই জগৎ চাই না, দেখিবে মা তোমার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে চিক্ষুর ও চামরের চতুরঙ্গ বলের উল্লেখ আছে, এইবার আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক, ইহাই সেনার চারিটি অঙ্গ। বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি হইতেই জীবের ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় সঞ্চিত হইয়া থাকে ! হস্তী স্থানীয় ক্লেশ, অশ্ব স্থানীয় কর্ম, পদাতিক স্থানীয় বিপাক ও রথ স্থানীয় আশ্রয়। এই চতুরঙ্গ সেনায় সজ্জিত হইয়াই মহিষাসুরের সেনাপতিদ্বয় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। জীব প্রথম ঐ সেনাপতিদ্বয়ের, অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপের সন্ধানই পায় না। চতুরঙ্গ সেনার অত্যাচার মাত্র বুঝিতে পারে।

প্রথমতঃ ক্লেশ — চিত্তের বৃত্তিমাত্রই ক্লিষ্ট। জগতে যাহা সুখ বলিয়া খ্যাত, বিবেকীর চক্ষুতে তাহাও দুঃখ বা ক্লেশ মাত্র ; কারণ পার্থিব সুখ, দুঃখের মুকুট পরিধান করিয়াই আগমন করে। একদিকে যেমন উহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, অন্যদিকে তেমনই ভবিষ্যতে উহার নাশের আশঙ্কা থাকায়, পার্থিব সুখের ভোগকালও দুঃখদায়ক হয়। দ্বিতীয়তঃ কর্ম। ক্লেশের মূলই কর্ম। কর্ম হইতেই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। কর্মের ত্রিবিধ স্বরূপ পূর্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বিপাক । বিপাক শব্দের অর্থ পরিণাম ; চিত্তের বৃত্তি প্রবাহরূপ কর্ম নিয়তই পরিণামশীল । চতুর্থ—আশয়। ইহাকে কর্মাশয় বল। কর্মের সঙ্কল্পসমূহ সূক্ষ্মভাবে ইহাতে সঞ্চিত থাকে। পূর্বোক্ত আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই ইহারা পরিচালিত হয়। ইহাই জীবের স্বরূপ। আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা পরিচালিত ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়, ইহাই জীব পদবাদ্য।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি— জীব ! দেখ, তুমি কে ? সর্বপ্রথমেই তুমি নিজের চক্ষু নিজে বাঁধিয়াছ। আমি কে ? তাহা জানি না বলিয়া, একটি অজ্ঞান স্বীকার করিয়া লইয়াছ। ইহাই মূল আবরণ। ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণে অবস্থান করিয়া, প্রতিনিয়ত তুমি রূপ রসাদি বিষয়ে ছুটাছুটি করিতেছ ; ইহাই বিক্ষেপ। উহার ফলে তোমার সুখ ও দুঃখ নামক জন্মজন্মান্তরব্যাপী ক্লেশভোগ হইতেছে। ঐ ক্লেশ হইতে কর্ম বা পুনঃ পুনঃ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ সাধিত হইতেছে। কর্মসমূহ ক্রমে বিপাক বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ক্লেশের বীজ প্রস্তুত করিতেছে। বীজসমূহ আবার সূক্ষ্মভাবে কর্মাশয় গঠন করিতেছে। ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখ—ইহাই তোমার জীবত্ব। একবার যদি এই চতুরঙ্গ সেনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় কর্তৃক অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষের বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করিতে পার, তবেই তুমি জীবত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। পরমেশ্বরী মা তোমাকে এই জীবত্বরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে চিরমুক্ত করিবেন বলিয়াই, চতুরঙ্গবলসমন্বিত চিক্ষুর ও চামরকে নিহত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

——০——

রথানামযুতৈঃ ষড়্‌ভিরুদগ্রাখ্যোমহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ। উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত এবং মহাহনু নামক অসুর সহস্র অযুত রথ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে অসুরবল বর্ণিত হইতেছে। চিক্ষুর ও চামর ব্যতীত উদগ্র, মহাহনু প্রভৃতি আরও অনেক মহাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে ইহদের নাম ও বলের পরিচয় পাওয়া যাইবে। উৎ—উর্ধ্বদিকে, অগ্র অর্থাৎ মস্তক যাহার, সেই উদগ্র। অহং কর্তৃত্ব অভিমানই উদগ্র অসুর। সে কিছুতেই মাথা নীচু করিতে চায় না। একমাত্র মা ব্যতীত আর কেহ যে কর্তা নাই, বা থাকিতে পারে না, ইহা শত সহস্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণে বুঝিতে পারিলেও 'আমি কর্তা'—এইরূপ অভিমানের উচ্চশির জীব কিছুতেই অবনত করিতে পারে না, বা চায় না। সাধক ! এই ভাবটিকেই উদগ্র অসুর বুঝিয়া লইও। আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে— জীব আপন কর্তৃত্ব মাতৃ-চরণে অর্পণ করার পর, মা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তবে এখন আবার অহং-কর্তৃত্বাভিমানরূপ উদগ্র অসুর কোথা হইতে আসে ? ইহার উত্তর প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি— অনুলোম ও বিলোম ভেদে প্রকৃতির গতি দ্বিবিধ। অনুলোম গতিজন্য জীবভাবীয় কর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমানসত্ত্বেও, অন্তর্মুখী আত্মসমর্পণ ভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ হইলে ত' মুক্তিই হইয়া যায় ! আর যুদ্ধই থাকে না। যতক্ষণ যুদ্ধ চলিতেছে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে — সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ বা আত্মজ্ঞান হয় নাই ; জীব যখন মাতৃ-কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হয়, অথচ তাহা পারিয়া উঠে না, অনাদি কর্তৃত্বাভিমান তাহাকে বাধা দেয়, তখন অগত্যা মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলে—'আমি ত' আর আত্মসমর্পণ করিতে পারিলাম না মা ! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণের যোগ্য করিয়া লও !' এই ভাবটি যখন ঠিক ঠিক আসিতে থাকে, অর্থাৎ কোনরূপ কপটতা থাকে না, যথার্থই সরলপ্রাণে শিশুর মতন আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভের জন্য মায়ের নিকট আব্দার করিতে থাকে, তখনই মা এই উদগ্র অসুর বধের আয়োজন করিতে থাকেন।

সে যাহা হউক, এই অসুরের শক্তি বড় কম নহে। ছয় অযুত রথ সহ ইহার যুদ্ধ বা প্রতিরোধ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ছয় অযুত রথ কি ? শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—দেহই রথ। দেহ ছয়টি। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ; এই ছয়টি কোষ দ্বারা পরমাত্মা যেন আচ্ছাদিত থাকেন। এই ছয়টি দেহই উদগ্র অসুরের রথ। বেদান্তে অনেক স্থলে পঞ্চকোষের উল্লেখ থাকিলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানভেদে বিজ্ঞানময় কোষের দুই প্রকার ভেদ ধরিয়া, ষট্‌কৌষিক দেহের উল্লেখও শাস্ত্রসিদ্ধ। জ্ঞানময় কোষকে বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানময় কোষকে মহদাত্মা বলা যায়।

অন্নাদি খাদ্যদ্রব্যের বিকার হইতে যে কোষ গঠিত বা পরিপুষ্ট হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহ কহে। ইহাই উদগ্রের প্রথম রথ। জীব প্রথমত এই স্থূল দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে। ইহাই জীব কর্তৃত্বাভিমানীর প্রথম আশ্রয়। যত দিন দেহ থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে একটু না একটু অভিমান আছেই। যে মুহূর্তে দেহাভিমান সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্তেই দেহপাত হয়। সমাধির যত উচ্চস্তরেই যাওয়া যাউক না কেন একটু বীজ থাকিয়া যায়, তাই আবার দেহবোধে ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে সাধারণ জীবের দেহাভিমান আর আত্মজ্ঞপুরুষের দেহাভিমানে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা বলাই বাহুল্য। আত্মজ্ঞপুরুষ মৃত্যুভয় হইতে চিরবিমুক্ত, এই একটি লক্ষণ দ্বারাই বলা যাইতে পারে যে তাঁহার দেহাভিমান নাই ; সাধারণ জীব কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত সুতরাং দেহাভিমানী। আত্মজ্ঞ পুরুষ যে একটু দেহাভিমান রাখেন, তাহাকে প্রারব্ধ ক্ষয়ই বল, অথবা দয়া পরবশ হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিবার ইচ্ছাই বল, কিংবা কতিপয় প্রিয়তম অন্তরঙ্গকে বন্ধন বিমুক্ত করিবার ইচ্ছাই বল, কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু সে অন্য কথা।

উদগ্রের আর একখানা রথ প্রাণময় কোষ। যাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ ক্রিয়াশীল থাকে, সেই জীবনীশক্তিই প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত। সাধারণভাবে ইহাকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বলা হয়। বস্তুতঃ উহা স্থূল বায়ুমাত্র নহে। জীবনী-শক্তিই যথার্থ প্রাণময় কোষ। এইখানেও জীবের অহংবোধ আবদ্ধ থাকে। তৃতীয় — মনোময় কোষ বা ইন্দ্রিয়সমন্বিত মন। এই স্থানেও আমি মনোময়, ইন্দ্রিয়ময় এইরূপ বোধ থাকে। চতুর্থ — বুদ্ধিময় বা জ্ঞানময়। এই

কোষ সর্ববিধ স্থূল বৈষয়িক প্রকাশের আশ্রয়। আমি জ্ঞানময়, স্থূল, বিষয়সমূহ আমি জানিতেছি, এ কোষে এইরূপ অভিমান থাকে ; তারপর বিজ্ঞানময় কোষ। এই স্থানে সূক্ষ্ম ও স্থূল—উভয়বিধ বিষয় সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা পঞ্চম অভিমান-স্থান। সর্বশেষ আনন্দময়। আমি আনন্দ-স্বরূপ, এইটি ষষ্ঠ অভিমান স্থান। এই ছয়খানি বিশিষ্ট রথ, আবার স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য নাম রূপাদি বিষয়ভেদে, অসংখ্য ভেদ-বিশিষ্ট হয়। তাই মন্ত্রে অসংখ্য বোধক অযুত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা অযুত শব্দের অর্থ অমিলিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত ভেদবিশিষ্ট। একমাত্র মা-ই যে যথার্থ অহং পদের বাচ্য বা লক্ষ্য, এই কথা ভুলিয়া গিয়া জীব অন্নময়াদি ষট্‌কৌষিক দেহে অভিমানাবদ্ধ হয়। উদগ্র অসুরের ছয় অযুত রথের ইহাই আধ্যাত্মিক রহস্য।

মহাহনু জীবভাবীয় শারীরিক বা মানসিক বল। সাধারণতঃ পুরুষকার শব্দে যাহা বুঝায়, উহাকেই মহাহনু বলে। যতদিন পুনঃ পুনঃ দৈবপ্রতিকূলতা দ্বারা এই জীবভাবীয় পুরুষকার খণ্ডিত না হয়, ততদিন ইহা অমিতবলসম্পন্ন। 'আমি পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানার্জন করিয়াছি, ধন উপার্জন করিয়াছি, কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি' ইত্যাদি—এই ভাবটিই মহাহনু। ইহার সহস্র অযুত রথ। এই সকল স্থলে সহস্র শব্দ অসংখ্যবোধক। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগরূপ কর্ম — সংখ্যাতীত। এই অসংখ্য অর্থেই এস্থলে সহস্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অযুত শব্দের অর্থ অমিলিত ; ইহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। পুরুষকারের পুরুষটিই যে মা, ইহা না বুঝিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিষ্পন্ন করা-রূপ পুরুষকার প্রয়োগই, মহাহনু নামক অসুরের সহস্র অযুত রথ সহ যুদ্ধের আধ্যাত্মিক রহস্য।

———০———

পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলোযুযুধে রণে ॥ ৪১॥

অনুবাদ। মহাসুর অসিলোমা এবং বাস্কল, রণক্ষেত্রে যথাক্রমে পঞ্চাশ নিযুত ও ছয় শত অযুত রথে পরিবৃত হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। অসিলোমা — অসির ন্যায় লোম যাহার। যাহার গাত্রস্পর্শে অর্থাৎ সংসর্গে আসিলেই ক্ষতবিক্ষত হইতে হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহাকে দ্বেষ বলা হয়। দ্বেষ যথার্থই অসিলোমা। ইহা যে কেবল অপরকেই ক্ষতবিক্ষত করে, তাহা নহে, আশ্রয়াশ হুতাশনের ন্যায় স্বাশ্রয়কেও বিধ্বস্ত করে। ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি এই দ্বেষেরই অন্তর্গত। পরগুণে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভাবগুলি মানুষকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও সন্তপ্ত করে। পরদুঃখে দুঃখী হয়—পরের চক্ষুতে জল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করে, এরূপ মহানুভব ব্যক্তি জগতে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু পরের সুখে যথার্থ আনন্দিত হয়—পরের হাসিতে সরল প্রাণে আপন হাসি মিলাইয়া দেয়, এরূপ লোক এ জগতে খুবই দুর্লভ। কেন এরূপ হয় ? ঐ অসিলোমা অসুরের অত্যাচার।

আবার অন্যদিকে যাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক—জোর করিয়া বিষয়বিদ্বেষ অভ্যাস করেন, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে—বৈরাগ্য সাধনের উপায় স্বরূপ, বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারাও ঐ অসিলোমা অসুর কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন। কারণ অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়ই তুল্য শৃঙ্খল। বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগ যেরূপ ভগবৎলাভের পথে অন্তরায়, ঠিক সেইরূপ বিষয়-বিদ্বেষও প্রবল অন্তরায়। বরং অনুরাগের পরিসমাপ্তি একদিন না একদিন ভগবানেই হইয়া থাকে ; কিন্তু বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ভগবানে হওয়া একান্ত দুরূহ। হ্যাঁ, বিদ্বেষ করিয়াছিল—কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি। তাহাদের বিদ্বেষ ভগবানে পর্যবসিত হইয়া মহামোক্ষ আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে উহা একান্ত অসম্ভব ; কারণ তাহাদের চিত্ত অতিশয় দুর্বল।

সে যাহা হউক, এই অসিলোমা অসুরের রথসংখ্যা —পঞ্চাশ নিযুত বা পাঁচশত লক্ষ। রূপ-রসাদি পঞ্চ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়। উহাদের অবান্তর অসংখ্য ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই শতলক্ষ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা নিযুত শব্দের অর্থ অমিলিত। আধ্যাত্মিকভাবে অযুত ও নিযুত শব্দ পরমাত্মযোগশূন্য ভাবকেই বুঝাইয়া দেয়। আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রতিনিয়ত রূপাদি বিষয়পঞ্চকের যথাযোগ্য সংযোগ

হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সংযোগ আমাদের অনুকূল, অপরগুলি প্রতিকূল। প্রতিকূল সংযোগে চিত্তের যে বিকার হয়, তাহারই নাম বিদ্বেষ। ইহা জ্ঞান ও কর্ম—উভয়বিধ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়। সুতরাং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়ের সহিত গুণিত হইয়া বিদ্বেষের পঞ্চাশ প্রকার স্থূল ভেদ হয়। তাই মন্ত্রে পঞ্চাশ নিযুত শব্দের উল্লেখ আছে। যতদিন অনাত্ম বস্তুর বোধ থাকে, অর্থাৎ মা ছাড়া অন্য কিছু আছে বলিয়া বোধ থাকে, ততদিন এই বিদ্বেষ-ভাব সম্যক্ দূর হওয়া একান্ত অসম্ভব। বাস্কল শব্দের অর্থ ভোগাভিলাষ। এই অসুরের অত্যাচারই আমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপে আসিয়া থাকে। কোন্ অনাদিকাল হইতে জগদ্‌ভোগে অভ্যস্ত হইয়াছি, কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া, একই জগৎকে নানাভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কিছুতেই অভিলাষের নিবৃত্তি হইতেছে না ; এমনই দুর্দান্ত ও দুর্জয় এই অসুর । ইহার রথসংখ্যা ছয়শত অযুত অর্থাৎ ছয় নিযুত। ভোগায়তন-ক্ষেত্র দেহই ভোগাভিলাষরূপী বাস্কল অসুরের যুদ্ধোপকরণ বা আশ্রয়স্থান। উহাতে —**'জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি'** এই ছয়টি বিকার সংঘটিত হয়। এই ষড়্‌ভাব বিকারযুক্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোগাভিলাষের প্রবল প্রেরণায় কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিলেও স্তব্ধ হইতে হয়। নিযুত শব্দের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে।

———০———

গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।
বৃতোরথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥ ৪২॥

অনুবাদ। পরিবারিত নামক অসুর সেই যুদ্ধস্থলে, বহু সহস্র হস্তী অশ্ব এবং কোটিসংখ্যক রথে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। পরিবারিত— পরিবার প্রতিপালন বিষয়ক কর্তব্য বুদ্ধি। ইহাও অসুর বিশেষ[১]। সাধারণভাবে এ কথাটা অনেকেরই অপ্রীতিকর হইতে পারে ; কারণ সমাজনীতি ও ধর্মনীতির অনুশাসন যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ একান্ত কর্তব্য। না করিলে অধর্ম হয়, সমাজ-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। ইহা মনুসংহিতা প্রভৃতি বেদানুগামী শাস্ত্রকর্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন, গীতারহস্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এক কথায় যাহারা মোক্ষকামী অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম উভয়েরই অতীত অবস্থায় যাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া আর কিছু থাকে না। যতদিন অহঙ্কার বা জীবভাবীয় কর্তৃত্বজ্ঞান থাকে, বিশ্বময় একমাত্র মহতী শক্তির স্বতঃস্ফূরণ দেখিতে না পায়, ততদিনই কর্তব্যজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম বিচার, এ সব থাকে। আর যাঁহারা জীবভাবীয় আমিত্বকে মায়ের আমিত্বে মিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের নিকট কর্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। তাঁহাদের দেহ মাতৃ-শক্তি বিকাশের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া, অসংখ্য কর্মসম্পাদন করে বটে কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নহে তখন তাঁহারা গীতার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে থাকেন—**'ন মে পার্থাস্তিকর্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন !'**

যাহা হউক যতদিন জীবের এই অবস্থা না আসে, অথচ ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগিতে থাকে, ততদিন ঐ কর্তব্যজ্ঞানই অসুরের অত্যাচাররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। সাধকের বিশিষ্ট প্রাণ চায়—মহাপ্রাণে মিলাইয়া যাইতে, কিন্তু ঐ পরিবারিত নামক অসুর কর্তব্যের সাজে দণ্ডায়মান হইয়া, সে মহামিলনে বাধা দেয়। প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, ধর্মকর্ম গুলিও বন্ধনবিশেষ। এই পরিবার-প্রতিপালন-বিষয়ক কর্তব্যজ্ঞানও এক প্রকার বন্ধন মাত্র। আরে কর্তব্য শব্দটার সঙ্গেই যে কর্তৃত্বজ্ঞান রহিয়াছে। একমাত্র মা ব্যতীত আর যে কোনও কর্তা নাই—থাকিতে পারে না ; এই জ্ঞানে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'কর্তব্য' বলিয়া একটা বোধ থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে—যাঁহারা বিশ্বময় একমাত্র মাতৃ-কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কি তবে কর্তব্যবোধে কর্ম করেন না ? ইহার

[১]বোম্বাই প্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তকের টীকায় 'পরিবারিত' নামক একটি পৃথক অসুরের উল্লেখ আছে। এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকায়ও উহা স্বীকৃত হইয়াছে।

উত্তরে সকল ধর্মশাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ এক সুরে বলিয়াছেন—তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানই করেন ; কিন্তু কর্তব্য অর্থাৎ কর্তৃত্ববোধ থাকে না। যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত কর্মগুলি করিয়া যান। মাতৃলাভের ইহাই ত' ফল ! অহঙ্কার—অর্থাৎ 'আমি কর্তা'—এইরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়াই আত্মদর্শনের বাহ্য লক্ষণ। অবশ্য তারপরও যৎকিঞ্চিত অভিমান বা অহংবোধ থাকে কিন্তু উহা বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় বন্ধনরূপ বিষ উদ্‌গীরণ করিতে পারে না।

একটা কথা এস্থলে বিশেষ প্রণিধান করিবার যোগ্য যে, পরিবার প্রতিপালনরূপ গুরুভার বহন ও তজ্জন্য নানাবিধ অসুখ অশান্তি হইতে দূরে থাকিবার লোভে, ধর্মের নামে অলসতার প্রশ্রয় দিয়া গৈরিক বসনে সজ্জিত হওয়া পাষণ্ডের লক্ষণ ! যদি কেহ যথার্থ মুমুক্ষু হয়, যদি কাহারও আত্মপ্রেম-প্রবাহ কুলপ্লাবী হয়, তবে এই পরিবারিত অসুরের অত্যাচার হইতে তাহাকে মা-ই রক্ষা করেন। সাবধান—কেহ মায়ের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত বা সদ্‌গুরুর আদেশ ব্যতীত সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মপঙ্কে নিমগ্ন হইও না ! যতক্ষণ ধর্মাধর্ম-বিচার প্রাণে জাগিবে, ততদিন সংসারাশ্রম-পরিত্যাগ একান্ত নিষিদ্ধ । সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী হওয়া যায়, এবং ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক। তবে, যখন তুমি মাতৃস্নেহে মুগ্ধ, মাতৃ-অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান, মাতৃ কর্তৃত্বে পূর্ণ নির্ভরশীল, তখনও দেখিতে পাইবে—এই পরিবারিত অসুর তোমায় উৎপীড়িত করিতেছে ! এই অবস্থায় কাতর প্রাণে মাকে জানাও—মা ! আর যে পারি না ! সহস্রবার বুঝি—একমাত্র তুমিই কর্তা, তবু ঐ কর্তব্যজ্ঞান অসুরের সাজে আসিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের সুখ দুঃখ জানাইবার আর ত' দ্বিতীয় স্থান নাই। আমাকে এই পরিবার প্রতিপালনরূপ কর্তব্যজ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি শুধু ঐ একটি মাত্র 'কর্তব্যের' অনুরোধে শত সহস্র কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছি। তুই যে মা, আমার পূর্ণ স্বাধীনতার অদ্বিতীয় ক্ষেত্র। তুই আমার উন্মুক্ত হৃদয়ের বিলাসনিকেতন, আমার সর্বস্ব তুই, আমার সর্ববিধ সঙ্কোচের অবসান তুই, তোকে ধরিয়া আবার সংসারের দাসত্ব কেন করিব মা ? তুই রাজরাজেশ্বরী, আর তোরই পুত্র আমি কাঙ্গালের মত বিষয়ের দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতে কেন যাইব ?

এইরূপে সরলপ্রাণে মাকে জানাও। দেখিবে—মা অচিন্ত্য উপায়ে তোমাকে এই পরিবারিত অসুরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। যতদিন মা স্বয়ং এই অসুর নিধনে উদ্যুক্তা না হন, ততদিন হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া, নিজ কর্তৃত্বে অসুরবধে উদ্যোগ করিও না। মনে রাখিও—মায়ের প্রতি নির্ভরশীল সন্তানের কোন আবদারই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। তাইত' অনেক সময় বলি—যখন যাহা ইচ্ছা মায়ের কাছে চাইতে দোষ নাই, যদি ছেলে যেমন করিয়া মায়ের কাছে চায়, তেমন করিয়া চাইতে পার। ওগো ! তোমরা যে ভিখারীর মত চাও ! মা যে আছেন, তাহাতেই সংশয় ! কাজেই নিতান্ত পাতান মায়ের কাছে, সন্দিগ্ধচিত্তে ভিক্ষুকের মত মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা কর। আশঙ্কা পাছে মা দিবেন কি না ? সুতরাং ফলও সেইরূপ হয়। চাইবে ত' ছেলের মত চাও, ভিখারীর মত চাইও না ! কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, এই পরিবারিত অসুরের রথ—কোটি-সংখ্যক, গজ বাজিও সহস্র সহস্র। গজ শব্দের অর্থ বন্ধন, বাজি শব্দের অর্থ দ্রুতগতি। মাত্র পরিবার প্রতিপালনরূপ একটি মাত্র কর্তব্যকে আশ্রয় করিলেই, অগণিত কর্তব্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, এবং উহারাই জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখে ও অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত করায়। গজবাজি শব্দের অর্থ পূর্বেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৩॥

অনুবাদ। অনন্তর বিড়ালাক্ষনামক অসুর, পঞ্চাশ অযুত রথে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। বিড়ালাক্ষ—বিড়ালের ন্যায় অক্ষি যাহার। আধ্যাত্মিকভাবে ইহাকে দোষদৃষ্টি বলে। বিড়ালনেত্রের বিশেষত্ব এই যে, তারকাদ্বয় পীতবর্ণ এবং দিবারাত্রি উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। যেরূপ কামলারোগগ্রস্ত ব্যক্তি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পায়, সেইরূপ জীবগণও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে বহুভাবে

বিরাজিত জগৎরূপে দর্শন করিয়া থাকে। সহস্রবার বুঝিয়াছ, সহস্রবার আলোচনা করিয়াছ— **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্বং, সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ, ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** ইত্যাদি কত শুনিয়াছ, কত উপদেশ পাইয়াছ ; তথাপি এই জগৎকে ত' ব্রহ্মরূপে দর্শন করিতে পার না। কিছুতেই জগৎকে আত্মা বলিয়া —মা বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিতেছ না। ইহাই বিড়ালাক্ষ অসুরের অত্যাচার। কি করিব মা ! আমরা কেবল আজ নয়, বহু জন্ম হইতে এইরূপে প্রবঞ্চিত হইতেছি, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নহে, ইহাতে কিছুতেই নিরন্তর ভাণ হয় না। অনাত্ম বস্তুর দর্শনরূপ পীতনেত্রের অত্যাচার হইতে কোন ক্রমেই ত' পরিত্রাণ পাওয়া যায় না! দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ বিড়ালনেত্রের অত্যাচারে অদ্বিতীয় চিন্মাত্র বস্তুতে জড় পদার্থের আকারে পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হই ; ঠিক সেইরূপই রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় অনাত্মবস্তুর পরিগ্রহে মুগ্ধ থাকি। এইরূপে দিবারাত্রি আমরা বিড়ালাক্ষের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছি।

কিন্তু মা, এবার আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে ; কারণ জগৎদর্শন যে অসুরের অত্যাচার ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাই তুমি স্বয়ংই অসুরের নিধনকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছ। আর আমাদের ভয় কি মা ? মা ! প্রতি জীবহৃদয়ে এমনই করিয়া চণ্ডীমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া, দোষদৃষ্টি বা বিষয়দর্শনরূপ বিড়ালাক্ষ অসুর নিধনের উদ্যোগ কর। জগতে আবার সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হউক।

আধিভৌতিকভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিড়ালাক্ষ অসুর বা দোষদৃষ্টিই মানুষকে নিয়ত অশান্ত রাখে ও দুঃখের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। অপরের দোষ দেখিতে আমরা সহস্রলোচন হইয়া থাকি। হায়, আমরা বুঝিতে পারি না যে, অপরের দোষ দেখিবার সময়ে সেই দোষগুলি আমারই চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকে। অপরের দোষ দেখিবার চক্ষু সম্যক্ মুদ্রিত থাকিলে মানুষ যে কত সুখী হয়, তাহা সহজে ধারণাই করিতে পারি না। তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি— মা, তুমি আমাকে এই দোষদর্শনরূপ বিড়ালাক্ষ অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ কর। আমি যেন ভ্রমেও পরের দোষ দর্শন না করি। মানুষমাত্রেরই দোষ এবং গুণ উভয়ই থাকে। মা গো ! আমার দৃষ্টি যেন প্রতিনিয়ত কেবল গুণ অংশের উপরই নিপতিত হয়। আমি যেন কাহারও দোষের আলোচনা করিতে গিয়া নিজের চিত্তকে কলুষিত না করি। তুমি আমায় শক্তি দাও। মা মা মা !

সে যাহা হউক, এই বিড়ালাক্ষের রথসংখ্যা পঞ্চাশ অযুত। একই পরমাত্মবস্তুকে আমরা পঞ্চ বিষয়রূপে, দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিগ্রহ করি। এইরূপে ইহার স্থূলতঃ পঞ্চাশ প্রকাশ ভেদ হয়। অযুত শব্দের অর্থ অসংখ্য বা অমিলিত। ইহা পূর্বেও অনেক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে।

অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥ ৪৪॥

অনুবাদ। অন্যান্য মহাসুরগণ অযুত অযুত হস্তী অশ্ব ও রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণস্থলে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহে প্রধান প্রধান অসুরগণের নাম ও বলের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এইবার অন্যান্য অসুরকুলের বিবরণ সাধারণভাবে উল্লেখিত হইল। তন্মধ্যে উদ্ধত দুর্দ্ধর দুর্মুখ করাল উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্য নামক কয়েকটি অসুরের বধবিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই নামগুলি অন্বর্থ। ধীমান্ সাধকগণ অনায়াসে নিজের ভিতরেই ঐ সকল নামধারী অসুর দেখিতে পাইবেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—**'দেহস্থা দেবতাঃ সর্বা দেহস্থাশ্চ মহাসুরাঃ। দেহস্থানি চ তীর্থানি পশ্যন্তি যোগচক্ষুষঃ॥'** যোগচক্ষুষ্মান ব্যক্তি আপনাতেই দেবতা, অসুর ও তীর্থসমূহ দেখিতে পান। ব্রহ্মর্ষি মেধস অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক রাজা সুরথকে দেখাইয়া দিলেন চিক্ষুর চামর প্রভৃতি অসুরগণ কিরূপ শক্তিসহায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত। মানুষ যখন তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অতিপ্রিয় বৃত্তিগুলিকে এইরূপ অসুর বলিয়া বুঝিতে পারে (মুখে বলিলে বোঝা যায় না—বুকে বুঝিতে হয়), তখনই দেখিতে পায়—এই অসুরগণ তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া, মায়ের সহিতই যুদ্ধ করিতেছে ; তাই মন্ত্রে **'দেব্যা সহ যুযুধুঃ'** বলা হইয়াছে। সাধক ! যতদিন দেখিবে যে, তুমি স্বয়ং অসুরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছ, ততদিন বুঝিবে —এখনও অসুর-নিধনের যথার্থ উপায় পাও নাই। তুমি

মায়ের ছেলে, মায়ের বুকে থাকিয়া শুধু দেখ, অসুরগণ কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে— আর মা-ই বা কি প্রকারে উহাদিগকে আপনাতে বিলয় করিয়া লয়েন। কিন্তু সে অন্য কথা।

———০———

কোটীকোটীসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতোযুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপে মহিষাসুর বহু কোটি রথ, হস্তী এবং অশ্বে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

ব্যাখ্যা। সাধক ! এইবার একবার অসুরবলের দিকে দৃষ্টিপাত কর—তোমরা দেহমধ্যে—অন্তর রাজ্যে অসুরগণ কিরূপ বলে বলীয়ান হইয়া তোমাকে বিধ্বস্ত করিতেছে, কিরূপ শক্তিসহায়ে তোমাকে আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদিগকে অন্তরের ভাব-মাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলে, এখন দেখ—তাহারা ভাবমাত্র নহে—অসুর। এইরূপই হয়—সাধকমাত্রেই রাজা সুরথের ন্যায় প্রথমতঃ আত্মীয়, স্বজন, কোষাগার, ভূমি প্রভৃতিকেই সাধনার বা মাতৃলাভের অন্তরায় মনে করে, পরে একটু অগ্রসর হইলেই বেশ বুঝিতে পারে, বাহিরে যাহাদিগকে বিঘ্ন স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহারা বাস্তবিক বিঘ্ন নহে। বিঘ্ন আমার মনের ভাবগুলি। এই ভাবগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই মাতৃলাভ হইতে পারে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারে। এ ভাবসমূহ সামান্য নহে, ইহারা মহাসুর। কোটি কোটি সৈন্যসহায়ে স্বয়ং মহিষাসুর সাধককে চিরতরে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য উদ্যম করিতেছে ; কিন্তু সাধক— নির্ভয় নিশ্চিন্ত ; কারণ, সে মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া অসুরকুলের নিধন প্রতীক্ষায় উৎসুক নেত্রে চাহিয়া থাকে।

জীব ! যতদিন তুমি মাত্র আপন কর্তৃক লইয়া সাধনা করিবে— যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া অসুরকুলকে নির্মূল করিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন আশঙ্কা আছে —হয়ত' সাধনা নিষ্ফলও হইতে পারে, কারণ, তোমার কর্তৃত্বজ্ঞান রহিয়াছে। আর যখন মা স্বয়ংই সাধনারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আর নিষ্ফলতার আশঙ্কা থাকে না। তাই বলি, যে যাহাই কর না কেন, মায়ের কর্তৃত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে অভ্যাস কর। দেখিবে কোন অজ্ঞেয় শক্তি তোমার সকল বাধা বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া দিতেছেন। মাতৃ-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান সাধকের কেবল যে সাধনমার্গই অন্তরায়শূন্য হয়, তাহা নহে—ব্যবহারিক জীবনযাত্রাও বিঘ্নশূন্য হইয়া থাকে।

———০———

তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ। তোমর ভিন্দিপাল শক্তি মুশল খড়্গ পরশু এবং পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। অসুরগণের মধ্যে যেরূপ চিক্ষুর চামর প্রভৃতি সাত জন প্রধান অসুরের নাম পাওয়া যায়, সেইরূপ তোমর ভিন্দিপাল প্রভৃতি সাতটি প্রধান অস্ত্রের বিষয়ও উল্লেখ আছে। যাঁহারা পরিবারিত নামক একজন পৃথক অসুর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতেই অসুর-সপ্তক হয় ; আমরা কিন্তু উহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি ; সুতরাং আমাদের গণনায় প্রধান অসুর আট জনই হয়। ইহার মীমাংসা পরে হইবে। প্রথমে অস্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

তোমর—**'স্তোমং রাতি ইতি তোমর'** (সকার লোপ)। যে স্তোম অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা একত্রীকৃত ভাবকে দান করে, তাহাকে তোমর কহে। যুগপৎ বহুভাবকে রাশীকৃত করিয়া একটি পদার্থের ন্যায় প্রতীতিযোগ্য করিয়া দেওয়াই, তোমর নামক অস্ত্রের কার্য। ইহা সর্বপ্রধান সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুরের অস্ত্র। বিক্ষেপ-শক্তির স্বভাবই বহুভাবকে সঙ্কীর্ণরূপে জ্ঞানগোচর করাইয়া দেওয়া। তুমি বৃক্ষ দেখিতেছ ; তোমার মনে হয়, বৃক্ষনামে একটিমাত্র পদার্থ জ্ঞানগোচর হইল। বাস্তবিক কিন্তু উহা একটি পদার্থ নহে, ক্ষণ-পরিণামী বহুজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। নদীর প্রবাহ দেখিতেছ। প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রবাহের যে অংশ দেখিয়াছিলে, দ্বিতীয় ক্ষণে সে অংশ নাই—অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে ; এইরূপ তৃতীয় চতুর্থ ক্ষণে তোমার পূর্বদৃষ্ট প্রবাহের অংশ নাই, প্রত্যেক ক্ষণেই নূতন নূতন আসিয়া তোমার নেত্রগোচর হইতেছে। তুমি কিন্তু একই জলপ্রবাহ দেখিতেছ বলিয়া মনে করিতেছ।

দ্রুতসঞ্চালিত অলাতচক্রস্থিত বিন্দুমাত্র বহ্নি তোমার চক্ষুতে স্থিত রেখার আকারে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক উহা বহ্নিরেখা নহে, অতি দ্রুতবেগে ভ্রাম্যমাণ বহ্নিকণাই রেখার আকারে প্রত্যক্ষ হয়। দেখ—তোমার অণুপরিমাণ মনকে বিক্ষেপ-শক্তিরূপ চিক্ষুরাসুর তোমরাস্ত্র প্রভাবে কত বড় বৈচিত্র্যময় জগদ্‌ভোগ করাইতেছে। যে কোন একটিমাত্র বোধকেও কেন যে ক্ষণকাল ধরিয়া রাখিতে পার না, তাহা এইবারে বুঝিতে পারিলে ? মুহূর্তমধ্যে চিত্তক্ষেত্রে কত শত সহস্র বৃত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, কোন একটিকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমষ্টিভূত হইয়া একটি পদার্থের ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উহাই চিক্ষুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরাস্ত্রের প্রভাব। একটু ধীরভাবে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিলেই মানুষ এই অস্ত্রাঘাত লক্ষ্য করিতে পারে। সূক্ষ্ম বিক্ষেপগুলি আরও ভয়ানক, যোগচক্ষু ব্যতীত উহার উপলব্ধিই হয় না। বড় ভয়ানক এই তোমরাস্ত্র ! বুঝিবার উপায় নাই—উহার আঘাত কোথায় কিভাবে হইতেছে। অথচ মর্মে মর্মে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। পুত্রের হাস্যময় মুখখানি দেখিলে—কত আনন্দ হইল ! ঐ দর্শন যে কতকগুলি ক্ষণপরিণামী, দেশ পরিণামী, পরমাণু-বিষয়ক দর্শন বা প্রতীতির সমষ্টিমাত্র—ইহা বুঝিতে দেয় না। মনে হয়—পুত্রমুখ বলিয়া একটি বস্তুই দেখিলাম। এইরূপ সমষ্টিভাবে, সঙ্কীর্ণভাবে পদার্থোপলব্ধি কারক অস্ত্রই তোমর।

ভিন্দিপাল—ভেদজ্ঞানকে পালন বা পোষণ করে বলিয়া, ইহার নাম ভিন্দিপাল। ইহা মহাসুর চামরের অস্ত্র। আবরণ-শক্তির স্বভাবই হইতেছে—বিষয়কে অর্থাৎ অনাত্মবস্তুকে পরমাত্মা হইতে পৃথকভাবে উপলব্ধি করান। মনে কর, তুমি গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস-বশতঃ সত্য প্রতিষ্ঠার সাহায্যে জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেও মুহূর্ত-মধ্যে চামর অসুর ভিন্দিপাল অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জগদাকারে আকারিত করিয়া দিল। তুমি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলে। এই অস্ত্রের কি মারাত্মক প্রভাব !

শক্তি—এইটি উদগ্র-অসুরের অস্ত্র। অভিমান অর্থাৎ জীবভাবীয় কর্তৃক-জ্ঞান সর্বদা সর্বকার্যেই স্বকীয় শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়। এমন কি, সংসার-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে জীব যখন বিপন্ন হইয়া পড়ে, সর্ববিধ পুরুষকার-প্রয়োগ নিস্ফল হয়, তখন একবার উপরের দিকে চাহিয়া কোন অজ্ঞেয় শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে বটে ; কিন্তু কার্যসিদ্ধির পরেই, উহাকে আপন শক্তিরূপেই বুঝিয়া লয়। এমনই এই অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল ! শক্তি একমাত্র চৈতন্যেই অবস্থিত। তদ্ভিন্ন আর কোথাও শক্তি নাই—থাকিতে পারে না, ইহা না বুঝিয়া জড় পদার্থে শক্তি দর্শনই উদগ্র-অসুরের শক্তি প্রয়োগের ফল।

মুশল—মুষ্ ধাতু স্তেয়ার্থক। **মুষং লাতি ইতি মুশল** ; স্তেয় অর্থাৎ অপহরণভাবকে অর্পণ করে বলিয়া ইহার নাম মুশল। ইহা মহাহনু নামক অসুরের অস্ত্র। বল বা সামর্থ্য যে একমাত্র ঈশ্বরের আছে, পুষ্টি যে একমাত্র মহামায়া মা, ইহা না বুঝিয়া শারীরিক বা মানসিক বলকেই কার্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করাই, এই মুশলাস্ত্র প্রয়োগের প্রভাব। ঐশ্বরিক প্রভাবকে অপহরণপূর্বক জীবের পুরুষকার-ভাবের প্রকটন করাই ইহার কার্য।

খড়্গ—দ্বিধাকারক অস্ত্র ! ইহা অসিলোমার অস্ত্র। অসি অসিলোমারই অস্ত্র হওয়া উচিত। তুমি আমি বস্তুতঃ এক—অভিন্ন হইয়াও, যে বুদ্ধির প্রভাবে তোমাকে পরজ্ঞান করিয়া থাকি ; উহাই ঐ খড়্গাঘাতের ফল।

পরশু—**পরান শবতি ইতি পরশুঃ**। শু ধাতু ভ্বাদিগণীয় গমনার্থক। **'গমের্জ্ঞানার্থকত্বং।'** পরকে বা অন্যকে প্রতীতি করায় বলিয়া ইহার নাম পরশু। ইহা বাস্কল-অসুরের অস্ত্র। আত্মভিন্ন অনাত্মনামক বস্তুর প্রতীতি দ্বারাই ভোগাভিলাষ সিদ্ধ হয়। **'যদা সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিঘ্রেৎ'** যখন সকলই আত্মময় হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শ্রবণ কিছুই থাকে না, সুতরাং ভোগ বা ভোগ্য থাকে না তাই বাস্কল-অসুর প্রতিক্ষণে পরশুর আঘাতে পরপ্রতীতি জন্মাইয়া থাকে।

পট্টিশ—ইহা বিড়ালাক্ষের অস্ত্র। পট্টিশ একপ্রকার জৃম্ভক অস্ত্র। ইহার প্রয়োগে লোকে বিকৃত হইয়া পড়ে—অন্ধকার দেখে। দোষদৃষ্টি হইতে অজ্ঞান-অন্ধকার ঘন হয়। এতদ্ব্যতীত পরিবারিত-অসুর আছেন, তাহার বিশেষ কোন অস্ত্রের নাম এ মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। পরবর্তী মন্ত্রে পাশনিক্ষেপের কথা আছে। ঐ পাশটিই পরিবারিতের অস্ত্র। পরিবার-প্রতিপালন-বিষয়ক কর্তব্য-

জ্ঞান হইতেই, পাশ বা বন্ধন দৃঢ় হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রেও পুনরায় ঋষি বলিলেন—**'দেব্যা সহ যুযুধুঃ'** অসুরগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। আমার সহিত নহে— মায়ের সহিত। সাধক যখন সত্য সত্যই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে মাতৃ-অঙ্কস্থিত সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন দেখিতে পায়—অসুরগণ মায়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আমি নিমিত্তমাত্র—সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত।

তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অস্ত্রগুলির এরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ দেখিয়া, একদিকে যেমন উহার যথাশ্রুত অর্থের প্রতি কেহ সন্দিহান হইবেন না, আবার, অন্যদিকেও কষ্টকল্পিত বলিয়া উক্ত প্রকার অর্থের আনর্থক্য মনে করিবেন না। শাস্ত্রবাক্যমাত্রেরই আত্মাভিমুখী লক্ষ্য, ইহা সকল দর্শন ও মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত। যে স্থলে সহজেই শাস্ত্রার্থ আত্মলক্ষ্যে উপস্থিত হয়, সেস্থলে যেরূপ কোন সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত হয় না ; সেইরূপ যেস্থলে একটু কষ্ট করিয়া আত্মাভিমুখী গতির অনুকূল অর্থ করিতে হয়, তাদৃশ অর্থের প্রতিও সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত না করিয়া সম্যক্ শ্রদ্ধাবান হওয়াই পিপাসিত সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয় একমাত্র 'আমি' বা মা, 'আমি' কে চিনিবার জন্যই জগৎ। ইহা যেন চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে।

———০———

কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৭॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর শক্তিঅস্ত্র-প্রয়োগে, কতকগুলি পাশঅস্ত্র-প্রয়োগে এবং অপর অসুরগুলি খড়্গপ্রহারে দেবীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল !

ব্যাখ্যা। বন্ধন-অর্থবোধক পশ্ ধাতু হইতে পাশ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা রজ্জুর ন্যায় বন্ধনসাধন অস্ত্রবিশেষ। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি— ইহা পরিবারিত নামক অসুরের আয়ুধ। যখন চারদিক হইতে কর্তব্য-জ্ঞানরূপ বন্ধন আসিয়া জড়াইয়া ধরে, তখন সাধক দেখিতে পায়—এবার বুঝি মাতৃ-শক্তি নির্জিত হইয়া পড়িবে। কেবল কর্তব্যজ্ঞান নহে, অন্যান্য অসুরকুলের নিক্ষিপ্ত শক্তি—খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ, বুঝি বা এবার মাকে হত্যাই করিয়া ফেলে।

সাধক ! ভাবিও না মাতৃ-চরণে শরণ লইতে পারিলেই, তোমার আসুরিক বৃত্তিনিচয় একেবারে নির্মূল হইয়া যাইবে। মাকে কত কষ্ট করিয়া যে এই দুরন্ত অসুরকুলের নিধন সাধন করিতে হয়, তাহা যে যথার্থ একবারও মা বলিয়া ডাকিয়াছে, মাত্র সেই জানে।

বলিও না— যিনি সর্বশক্তিময়ী পরমেশ্বরী, তাঁহার আবার অসুরনিধনের জন্য কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি ? স্মরণমাত্রেই ত' অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ওরে, তাঁর যে নিজের কোন ইচ্ছাই নাই, শুধু তোমার ইচ্ছার জন্যই তাঁহাকে ইচ্ছাময়ী সাজিতে হয়। তোমার সংস্কারের ভিতর দিয়া—তোমার ইচ্ছায় অনুপ্রেরিত হইয়াই যে তাঁহাকে কার্য করিতে হয়। তিনি যে মা ! তিনি যে তোমারই প্রকৃতি, তিনি যে তোমারই স্নেহে আকুলা আত্মহারা ; তাই তাঁহার মহতী আত্মপ্রকৃতি বিকাশের সুযোগ হইতেছে না। তুমিই যে তাঁকে—যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও প্রসূতি, তাঁকে ছোট করিয়া রাখিয়াছ ; তোমার মত চির-মলিন সন্তানের শক্তিহীনা মা করিয়া রাখিয়াছ ; তাই অসুর-সমরে মাকে অসহনীয় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। যদি সত্যই মাকে মহতী শক্তিময়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতে, তবে একবার স্মরণমাত্রেই অসুরকুল অস্তিত্ববিহীন হইয়া যাইত। যখনই মায়ের মহতী শক্তির দিকে তাকাও, তখনই যদি নিজের বুকের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, সেখানে—তোমার বুকের মধ্যে সংশয়ের তরঙ্গ উঠিতেছে। 'সত্যই কি মা আমার এই বিপদ দূর করিবেন বা করিতে পারেন'—এরূপ সংশয় থাকে বলিয়াই এক মুহূর্তেই ফল পাও না। ওরে, আমরা রাজ-রাজেশ্বরীর পুত্রের মতন জোর করিয়া, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। কেন পারি না ? ডাকিতে ইচ্ছা নাই। সহস্রবার বলিব—লক্ষবার বলিব, ইচ্ছা নাই বলিয়াই পারি না। ইচ্ছা নাই বলিয়াই বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়াই সংশয় আছে। আমরা যেমন একটু একটু করিয়া মা বলি, মাও তেমনি একটু একটু করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন ! আমার সংশয়ের জন্যই ত' মা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না ; এবং পারেন না বলিয়াই তাঁহাকে অসুর যুদ্ধে অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তাই, অসুরগণ আমার মায়ের অঙ্গে অস্ত্র প্রহার করিতেছে, আমার মায়ের অঙ্গে

রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমার মায়ের কমনীয় চিন্ময় বপু মলিন করিতেছে। ওঃ আমরা কি, অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান! মা মা মা! আমরা যে তোমার নিকট ক্ষমা চাইবারও অযোগ্য।

সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী॥ ৪৮॥

অনুবাদ। চণ্ডিকাদেবীও তখন স্বকীয় অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া অসুরনিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রগুলিকে অবলীলাক্রমে ছিন্ন বিছিন্ন করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র অসুরগণের আছে, সেই সকল অস্ত্র মায়েরও আছে। ইতিপূর্বেই দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্রাদি-দ্বারা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। মায়ের আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই, সবই যে সন্তানদিগকে দিয়া ফেলিয়াছেন। কেবল সব নয়, আপনাকে পর্যন্ত দিয়াছেন। এমনই পুত্রস্নেহ-বিমূঢ়া মা আমার! ওগো, সে আমার নিজের বলিতে কিছু রাখে নাই, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া উলঙ্গিনী হইয়াছে। শূন্যই যাঁহার রূপ, পূর্ণতাই যাঁহার ধর্ম, প্রকাশ যাঁহার জ্যোতি, সেই মা আমার— তোমারই জন্য, আর কাহারও নয়— কেবল তোমার জন্য, তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া তোমাকে জগদ্‌ভোগ করাইতেছেন। আবার দৈবী প্রকৃতিরূপে অসুরকুলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। একবার দেখিতে ক্ষতি কি ?

পূর্বে বলিয়াছি— প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম হয়। এক— বহির্মুখ বা অনুলোম। অন্য— আত্মাভিমুখ বা বিলোম। একদিকে যেমন অসুরশক্তি, অন্যদিকে তেমনই দেবশক্তি ; সুতরাং উভয় পক্ষেরই অস্ত্রাদি তুল্য! যতদিন ঐ শক্তি-অংশের অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্রগুলির প্রতি 'আমার' বলিয়া অভিমান ছিল, ততদিন দেবগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এবার তাহারা সমস্ত শক্তি মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়াছে ; সুতরাং মায়ের নিজের কিছু না থাকিলেও এবার তিনি সর্বায়ুধবিমণ্ডিতা-রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে সাধকের সংস্কারানুযায়ী মাতৃ-মূর্তি গঠিত হয়। মায়ের নিজের কোন বিশিষ্ট মূর্তি নাই। সন্তান তাঁহাকে যে মূর্তিতে সাজায়, যে মূর্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করে, স্নেহ বিহ্বলা মা আমার সেই মূর্তিতেই প্রকটিতা হন। ইহাকেই বলে—**'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।'** মনে রাখিও এই কল্পনা সাধকের নহে, ব্রহ্মের। **'ব্রহ্মণঃ'** এই পদটিতে কর্তরি ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে! দেখ সন্তান! দেখ পুত্র! দেখ, তোমারই জন্য মা আজ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী, সর্বায়ুধমণ্ডিতা-মহিষমর্দিনী-মূর্তিতে প্রকটিতা। যদি পুত্র হও, যদি যথার্থই মা বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তোমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে, চক্ষু ফাটিয়া জল উচ্ছ্বসিত হইবে, নিজের অকৃতজ্ঞতায় মাটিতে মিলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে। আর বলিবে মা মা! আমি চিরদিন এইরূপ অসুরের অত্যাচারে বিমথিত হই, অনন্তকাল নরকে থাকি— সেও ভাল, তবু তুমি অরূপা অমেয়া নিত্য-শান্তিময়ী মা হইয়া, আমার জন্য এই অশান্ত অসুর-সমরে অবতীর্ণ হইও না। আমারই জন্য তোমাকে এই ক্ষুদ্রতা—এই পরিচ্ছিন্নতার সাজ নিতে হইয়াছে। ওগো ! তোমাতে যে কোন বিশিষ্টতা নাই। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই। তুমি শুদ্ধ নির্লেপ নিষ্কল ; তথাপি তুমি শুধু আমারই জন্য ভাবময়ী মূর্তিতে প্রকটিত হইতে বাধ্য হইয়াছ। এত স্নেহ তোর বুকে মা ! ওঃ মা—

অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী॥ ৪৯॥

অনুবাদ। অক্লিষ্টমুখী দেবী দেবতা এবং ঋষিবৃন্দ-কর্তৃক স্তূয়মানা হইয়া ঈশ্বরী মহতী ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশপূর্বক অসুরদেহে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মা আমার অক্লিষ্টমুখী। সতত অসুরবৃন্দের শাণিত শরে আহতা হইয়া, দুর্বার সংগ্রামে অসহনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও মা আমার অনায়স্তাননা—অক্লিষ্টমুখী। মুখে কোনরূপ ক্লেশের চিহ্ন নাই—সুপ্রসন্না। রক্তিম ওষ্ঠে সদাই হাসি। সাধক ! যেদিন তুমি আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ— বুঝিয়াছ, সেদিন হইতেই মা মহাদেবী-মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া, মহা-অসুর মূর্তির বিরুদ্ধে সমরের উদ্যম করিতেছেন। (এইস্থানে একবার প্রথম খণ্ডের মহাদেবী মহাসুর ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্মরণ

করিয়া লও।) এতদিনে আপনার মাকে চিনিয়াছ ; তাই দেখ মা সর্বদাই স্মিতমুখী ; কারণ **'স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।'** দেবতা ও ঋষিবৃন্দ মায়ের স্তুতিমঙ্গল গান করিতেছেন —মাতৃ-মহত্ত্ব-সূচক গাথা পাঠ করিতেছেন, তাই মা আমার সমরক্লেশেও সমুৎফুল্লা। দেখিতে পাও না ? দেখ, যখন তোমার অন্তরে-বাহিরে দুর্দমনীয় আসুরিক বৃত্তির অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখনই তোমার দৈবী প্রকৃতিকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয়। আর সেই সময় তোমারই অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ, তোমার বাগাদি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিয়া উঠে, স্তুতিপাঠ, মাতৃ-মহত্ত্ব কীর্তন করিতে থাকে ! এইরূপে মহাদেবী মূর্তির অনুস্মরণে মহাসুরীকর্তৃক উৎপীড়িতা মাতৃ-মূর্তিতে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। তখন হতাশ, অবসন্নতা দূর হয়, আশায় উৎসাহে বুক ভরিয়া উঠে। আসুরী প্রকৃতির অত্যাচার প্রশমিত হয়। এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ত' সাধক হৃদয়ে সংঘটিত হয়।

উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিপাঠের বিষয় পূর্বেও বলা হইয়াছে। পুনরুক্তি হইলেও আবার কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না ! বেদ উপনিষদ্ তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাইবে — স্তব স্তুতিই প্রধান উপাসনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে যে সকল স্থলে পূজা হোম শ্রাদ্ধ তর্পণাদির উল্লেখ আছে, তাহাও স্তব স্তুতিরই প্রকার ভেদ—স্তুতির সহিত দ্রব্যাদি অর্পণমাত্র। এই স্তুতি জিনিসটা কি ? **'দেবানাং স্বরূপকীর্তনং স্তুতিঃ।'** দেবতাদিগের স্বরূপ কীর্তন করার নামই স্তুতিঃ। এই স্বরূপকীর্তন যে কত তূর্ণফলপ্রদ উপাসনা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একসঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের তীব্র অনুশীলন, একমাত্র স্তুতিপাঠেই হইয়া থাকে। অপর সর্ববিধ সাধনার ফললাভ কালসাপেক্ষ ; কিন্তু এই বহিরঙ্গ সাধন— স্তুতির ফল পাঠকালেই লাভ হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গদেব এই স্তুতি জিনিষটাই মৃদঙ্গ করতালি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সুর তান যোগে আরও মধুর এবং প্রসারিত করিয়া, অশিক্ষিত, স্থূলবুদ্ধি মানবগণেরও ভগবৎমুখী গতি সহজসাধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ উপনিষদাদি উচ্চতম শাস্ত্রেও স্তুতিকেই সাধনার সর্বপ্রধান আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর্যযুগে ঋক্ মন্ত্রে সামগানে যজুমন্ত্রে পরমেশ্বরের উপাসনা হইত। ভগবদ্গীতায় অর্জুন বিশ্বরূপদর্শনে স্তুতি করিয়াছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা-বৃন্দ ক্ষীরোদকূলে বিষ্ণুর স্তুতি করিয়াছিলেন। চণ্ডীতেও অসুর-উৎপীড়িত সুরগণ মাতৃস্তোত্রে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে এমন অধ্যায় খুব কমই আছে — যাহতে দুটি একটি স্তোত্রের উল্লেখ নাই। এইরূপ ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্তের সাধনার দিকে লক্ষ্য করিলে, বেশ প্রতীতি হয় যে—কাল দেশ পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রণালী বহুধা পরিবর্তিত হইলেও স্তুতি জিনিষটা প্রায় অপরিবর্তনীয় আছে।

স্তুতির দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। এক আর্তের স্তুতি, অপর কৃতজ্ঞতার স্তুতি। এক— বিপদে পড়িয়া, অপর অভীষ্ট সিদ্ধির পর। এই উভয়বিধ স্তুতিদ্বারা প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেরই অর্দ্ধাঙ্গ পরিপূর্ণ। স্তুতির যে কি অপূর্ব শক্তি, তাহা মন্ত্রচৈতন্যকারী সাধকগণ একবার-মাত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। (মন্ত্রচৈতন্য প্রথম খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যতদিন মন্ত্রসমূহ চৈতন্যযুক্ত না হয়—রস ও ভাব-সমন্বিত না হয়, ততদিন স্তোত্রাদিপাঠের ফল অতি সামান্যমাত্র—ততদিন উহার প্রত্যক্ষফল অনুভূতিযোগ্য হয় না। বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকগণের পক্ষে অনর্থক ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ উৎকৃষ্টতর সাধনা ; কারণ ধ্যান করিতে হয় না—উহা আপনি আসে। অপ্রত্যক্ষ পদার্থের ধ্যানই হয় না। যখন মা আসেন, যখন তিনি প্রত্যক্ষযোগ্যা হন, তখনই সাধক আত্মহারা হইয়া মুগ্ধনেত্রে পরম প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে, ইহারই নাম ধ্যান। অনেকে মনে করেন—স্তোত্রপাঠ বহিরঙ্গ সাধনা ; সুতরাং পরিত্যাজ্য। অবশ্য যাঁহাদের সর্বদা ধ্যানাবস্থা আসিয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র ও নিরোধভূমিক হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই একথা বলিতে পারেন। বর্তমান যুগের মহাপুরুষ আচার্য শঙ্কর এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও কিন্তু ইচ্ছাপূর্বকই হউক, আর লোকহিতৈষণা-প্রযুক্তই হউক, বিক্ষিপ্তচিত্তের আদর্শই নিয়াছিলেন, অন্যথা বহুশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন, দিগ্‌বিজয়, ধর্মপ্রচার, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ যে শীঘ্র ফলপ্রদ, ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে। স্তোত্রপাঠ সাধককে যত শীঘ্র

ধ্যানাবস্থায় আনয়ন করে ; ধ্যানের ভাণ তত শীঘ্র করে না। বেদান্তশাস্ত্রে যাহাকে মনন বলে, যোগশাস্ত্রে যাহাকে ধারণা বলে, স্তোত্রপাঠ তাহারই অন্তর্গত। ধ্যানের বিষয় পরে বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

স্তোত্রপাঠের দ্বিবিধ প্রণালী আছে। একাকী এবং সমভাবাপন্ন বহু—একসঙ্গে। গৌরাঙ্গদেব এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুশীলন বেশী করিয়াছিলেন। একাকী নির্জন স্থানে বসিয়া চিত্তবৃত্তিকে বহুক্ষণ ভগবৎমুখী ধরিয়া রাখিতে পারেন, এরূপ সাধক খুব দুর্লভ। যাঁহারা মনে করেন নির্জনে গেলেই সাধনা খুব ভাল হয়, তাঁহারা যদি নিজেকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন— খুব নিভৃতস্থানে একাকী বসিয়া চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎমুখী করিতে গেলেই, অন্তররাজ্যে বহু জনকোলাহল উপস্থিত হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেই বুকের দরজা বন্ধ হয় না। সেখানে অনবরত নানাবিধ বিষয় চিন্তা আসিয়া ভগবৎ-চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে— বাহিরের নির্জনতা তাহাকে নির্জন বা একাকী করিতে পারে নাই। বরং তদপেক্ষা সমভাবাপন্ন কতিপয় সংঘবদ্ধ হইয়া মন্ত্রচৈতন্যপূর্বক স্তোত্রাদি পাঠ করিলে চিত্তক্ষেত্রে নির্জনতার আস্বাদ পাওয়া যায়। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকের সহিত উপাসনায় নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; তজ্জন্য নির্জন স্থানে অবস্থানই যে শ্রেয়ঃ, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু প্রথমতঃ একেবারে একাকী না হইয়া সমভাবাপন্ন কতিপয় একত্র হইলেই যথার্থ নির্জনতার উপকার বুঝা যায়। সংঘবদ্ধ উপাসনায় যে সকল দোষ বা বিঘ্ন আছে, তাহাতে যাঁহাদের মন্ত্রচৈতন্য হইয়াছে— তাঁহাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এইরূপ সংঘবদ্ধ উপাসনার ফলে, গুরুকৃপায় অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিসত্ত্ব সমধিক নির্মল হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন সাধক সাধনার লক্ষ্য বা কেন্দ্র লাভ করিয়া একাকী উপাসনা করিতে পারেন। অথবা তখন সাধনা এত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায় যে, তাহার ব্যবহারিক দৈনন্দিন নিত্য কর্মগুলিও সাধনাময় হয় ; সুতরাং সে অবস্থায় একাকী বা সংঘবদ্ধ উভয়ই প্রায় তুল্য হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেবতা ঋষি মহাপুরুষ এবং আচার্যগণ নির্বিচারে যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনরূপ তর্ক বা সংশয় উত্থাপন করাই অন্যায়। আর যদিও বাহিরে দেখা যায়—ভগবানের স্তুতিপাঠ করা হইতেছে, তথাপি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পায়, অন্তররাজ্যে সাধকই ভগবৎময় হইয়া পড়িতেছে ! মনে কর, তুমি বলিতেছ— হে দয়াময়, হে শান্তিময়, হে মঙ্গলময়, যদি ঐ শব্দগুলি যথার্থ ভাবের সহিত অর্থবোধ করিয়া সত্যজ্ঞানে বলিতে পার, তবে তৎকালে তুমি স্বয়ংই দয়া শান্তি ও মঙ্গল লাভ করিবে। তোমার চিত্তে ঐ সকল দেবভাব তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিবে।

একজন গঙ্গাজল দেখিয়া বলিল— 'ছিঃ ! যে ঘোলা ময়লা জল, এতে আবার নাইতে আছে ?' আর একজন কিন্তু 'পতিতপাবনি পাপহারিণী সুখদায়িনি গঙ্গে মা আমার !' এই বলিয়া সানন্দে অবগাহন স্নান করিয়া উঠিল। ভাবিয়া দেখ দেখি— সেই মুহূর্তেই এই উভয়ের মধ্যে কে লাভবান হইল ? একজন বলিল —'অমুক লোকটা বড় অহঙ্কারী, ধরাকে সরা জ্ঞান করে।' আর একজন বলিল—'তা হোক আহা ! লোকটা বড় পরোপকারী, বিপন্ন দেখিলেই কেবল সরল প্রাণে উপকার করে।' একবার ভাব দেখি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার সমধিক লাভ হইল ? পূর্বে বলিয়াছি, তোমার মনই জগৎ আকারে আকারিত। তুমি যেরূপ ভাবনা করিবে, সেইরূপ ফল লাভ করিবে। **'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'** বড় সুন্দর ও সত্য প্রবচন। তুমি পরমেশ্বরের মহত্ত্ব কীর্তন করিলে, বস্তুতঃ তুমিও মহত্ত্বময় হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলাভ, মানুষের আর কি হইতে পারে ?

আর একদল আছেন, তাঁহারা বলেন ভগবান বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁকে আবার স্তব কি করিবে ? **'স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতং যন্ময়া।'** প্রমাণ-স্বরূপ এই বচনটি আবৃত্তি করিয়া বলেন— অনির্বচনীয় বস্তুর আবার স্তুতি কি ? কথাটা সত্য। বাবা। তুমি কি সেই অনির্বচনীয় বস্তু উপলব্ধি করিয়াছ ? যদি করিয়া থাক, তবে এ কথা বলিতে পার না, কারণ অনির্বচনীয়-স্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, তুমিও তাহাকে বচনীয় করিয়া লও। আর যদি উপলব্ধি না করিয়া থাক, তবে তোমায় এই

বচনীয়স্বরূপ ধরিয়াই অনির্বচনীয়-স্বরূপে যাইতে হইবে ; সুতরাং উভয়পক্ষেই তুমি স্তোত্রপাঠ স্বীকার করিতেছ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, **'কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'** —ভগবৎকথা পরস্পর আলোচনা করিয়া সাধকগণ তুষ্টি ও প্রীতিলাভ করেন। আগে ঐটাই হউক না, আগে বাক্য এবং মন দিয়াই তাঁকে পাও, তারপর বাক্য মনের অতীতরূপে পাইবে। আগে নামেই রুচি হউক, তারপর স্বরূপে প্রীতি হইবে। না না, তা কি কখনও হয় গো ? যতদিন স্বরূপে রুচি না হয়, ততদিন নামেই রুচি হয় না ; হইতে পারে না। তাই শুনতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সিদ্ধিলাভের চরম অবস্থায় 'নামে রুচি হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। দিবা নিশি নাম জপ, নাম কীর্তন প্রভৃতি নামে রুচির যথার্থ লক্ষণ নহে। উহা একটি অভ্যাসের ফল মাত্র। রুচি যখন নামে হয়, তখন বিষয়ে অরুচি প্রকাশ পাইবে। মুখে নাম জপ করিতে করিতে যদি এমন দিন আসে যে, বিষয়ে অরুচি প্রকাশ পাইয়াছে, মুখে নয় বুকে ; তবেই বুঝিবে, নামে রুচি আসিতেছে। পরমহংসদেব বলিতেন 'ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হইলে, তবে ভগবৎ কথায় রুচি হয়, কাম কাঞ্চনে অরুচি হয়।' কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, মা যে আমার 'অনায়স্তাননা' অক্লিষ্টমুখী, সদা উৎফুল্লা, সদা হাস্যময়ী, তাহা স্তবস্তুতি, দ্বারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে **'স্তুয়মানা সুরর্ষিভিঃ'**। এইরূপে মা আমার হাসিমুখে অসুর দেহে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। **'মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী'**। মা আমার ঈশ্বরীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া অসুরশক্তি সংহরণ করিতে উদ্যত হইলেন। স্তুয়মানা হইলেই মায়ের ঈশ্বরীমূর্তি —সর্বভাবাধিষ্ঠাত্রী মূর্তি প্রকাশ পায়। খুলিয়া বলি—সাধক ! তোমারই আত্মপ্রকৃতিকে—অন্তরস্থ মাতৃ মূর্তিকে স্তবস্তুতি দ্বারা সতত ঈশ্বরত্বের মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখ, কখনও দীনা মলিনা অবসন্না করিয়া রাখিবে না। **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানাং নাত্মানমবসাদয়েৎ'** ভগবদ্-গীতার এই মহাবাক্যের কার্যকরী অবস্থা যদি উপলব্ধি করিতে চাও, তবে নিয়ত মাকে ঈশ্বরীমূর্তিতে দেখ। উহা একদিনে হয় না, পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরত্বের মহিমাযুক্ত বাক্যাদির উচ্চারণ, অর্থাৎ স্তবস্তুতির দ্বারাই সহজসাধ্য হইয়া থাকে। যত মাকে ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে, ততই সহজে অসুরশক্তি বিলয় হইতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ইচ্ছার অভিঘাতরূপে অনৈশ্বর্য বা জীবত্ব দূর হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরত্ব কি ? ইচ্ছার অনভিঘাত। ইচ্ছার অভিঘাত না হওয়াই অর্থাৎ পূর্ণ হওয়াই ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্ব। আর ইচ্ছার অপূর্ণতাই অনৈশ্বর্য বা জীবত্ব। ঈশ্বরীমূর্তির দর্শন ব্যতীত জীবত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই জীবমাত্রেরই নিয়ত আত্ম-প্রকৃতিকে, ঈশ্বরীমূর্তিতে উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। স্তবস্তুতিই উহার সহজ ও সুনির্দিষ্ট উপায়। আরে, 'আমি ভাল হইব, সুখে থাকিব, অসৎ-প্রবৃত্তি দূর করিব, সংসারে আসক্ত হইব না, ভগবানকে বিশ্বাস করিব—ভক্তি করিব' ইত্যাদি ইচ্ছা আমাদের মনে কতবার জাগে, কিন্তু ঐ সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না কেন ? ইচ্ছার অভিঘাত হয় কেন ? মাকে ঈশ্বরী বলিয়া ডাকি না, ডাকিলেও বিশ্বাস করি না, মা যে আমার ঈশ্বরী। তাঁহাতে যে কোন ইচ্ছারই অভিঘাত নাই ! ইহা প্রাণ মানিতে চায় না। তাই অনৈশ্বর্য দূর হয় না।

———o———

সোঽপি ক্রুদ্ধোধুতশটোদেব্যাবাহনকেশরী।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ॥ ৫০॥

অনুবাদ। দেবীর বাহন সেই কেশরীও ক্রুদ্ধ হইয়া কেশর কম্পিত করিয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশনের ন্যায়, অসুরসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মা ঈশ্বরীমূর্তিতে সমরোদ্যতা ; সুতরাং তাঁহার বাহন অসুরভাব হননেচ্ছু। পূর্বে বলিয়াছি—জীব যখন সিংহভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ স্বকীয় জীবভাবের উপর হিংসাভাব পোষণ করে, তখনই মা অসুরমর্দিনী মূর্তিতে তদুপরি অধিষ্ঠিতা হন। অথবা মা যখন অসুর-সংহারিণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন জীব আর সিংহধর্মী না হইয়া থাকিতে পারে না। আজ মাতা স্বয়ং সমরোদ্যতা, তাই সন্তানও সিংহ-ধর্মী—অসুরদলনে সমুদ্যত।

সাধক ! যখন দেখিবে—কে যেন জোর করিয়া জগতের যাবতীয় কার্য হইতে টানিয়া আনিয়া, মধ্যে মধ্যে তোমাকে সাধনায় নিযুক্ত করিতেছে, যেন কোনও অজ্ঞেয় শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া হঠাৎ দুই চারিটা

সাধনোপযোগি-কর্ম করিয়া ফেলিতেছ, তখনই বুঝিও —মায়ের আকর্ষণ আসিয়াছে, মা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময় তুমিও মায়ের ইচ্ছার অনুকূলে যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিও, স্বকীয় জীবভাবকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিও ; তবেই তোমাতে সিংহধর্ম আবির্ভূত হইবে। মা তোমার অঙ্গে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়া দিবেন।

যাঁহারা বলেন — 'মা যেদিন আসিবেন, সেইদিন আমি সিংহধর্মী হইব — মা যেদিন সাধনা করাইবেন, সেইদিন আমি সাধনা করিব', বুঝিতে হইবে— তাঁহারা এখনও পর্যন্ত দুর্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। ঐরূপ ভাব একান্ত নিন্দনীয়। জগতের সকল কার্য করিবার সময়—'আমি কর্তা', 'আমার অধ্যবসায়', এরূপভাবটি বেশ আছে ; আর কেবল মাকে স্মরণ করিবার বেলাই, মায়ের উপর নির্ভরতা। উহা আত্মবঞ্চনা মাত্র। নিতান্ত দুর্বলচিত্ত মানুষই ঐরূপ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে মনকে প্রবোধ দিয়া, অন্ধ গড্ডলিকা প্রবাহে পরিচালিত হয়। মনে রাখিও—দুর্বলের পক্ষে আত্মলাভ একান্ত অসম্ভব। **'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'** 'জগতের যাবতীয় কার্যের প্রারম্ভেই ঈশ্বর কর্তৃত্ব দর্শন করিতে হয় ; কিন্তু সাধনারূপ কার্যের অবসানে ঈশ্বর-কর্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়। জগতের সকল কার্যেরই কিছু না কিছু নিষ্ফলতা আছে ; কিন্তু সাধনা কার্যের একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পর্যন্ত পূর্ণ সফলতাময়।' 'আমি সাধনা করিব' এইরূপ সাধু সঙ্কল্পটি পর্যন্ত নিষ্ফল হয় না। তাই বলিতেছিলাম—জীব ! তুমি সিংহধর্মী হও, মা তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেনই ! তুমি **'বনেষু হুতাশন-ইব'** অসুর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে থাক।

এই মন্ত্রস্থ দৃষ্টান্তটি বড় সুন্দর ! অরণ্যস্থ শুষ্ককাষ্ঠ সমূহের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে সমুদয় বনকেই ভস্মীভূত করে। বনই বনকে দগ্ধ করে। তুমিও নিজেই নিজেকে হিংসা করিতে থাক। তোমার এই জীবভাব, এই অসুরভাব, এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার, ইহার প্রতি নিজেই হিংসাপরায়ণ হও। ইহাই তোমার কার্য। ইহাই তোমার স্বধর্ম। গীতায় যাহাকে স্বধর্ম বলা হইয়াছে, দেবী-মাহাত্ম্যে তাহাই দেবীর বাহন সিংহরূপে উক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব সাধকগণের একান্ত উপাদেয়।

———o———

নিঃশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানারণেঽম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতাগণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নিশ্বাসগুলিই তৎক্ষণাৎ শত সহস্র গণ (অসুর নিধনকারী গণ নামক সৈন্যদল) রূপে সম্ভূত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মা স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা, ইহা আত্মসমর্পণকারী সাধকেরই উপলব্ধিযোগ্য। পূর্বে অনেকবার এ কথা বলা হইয়াছে। মাতৃ-নিশ্বাস সেই আত্মসমর্পণের চরম লক্ষণ। সাধক যখন প্রতিকর্মে মাতৃপ্রেরণা মাত্র দেখিতে পায়, তখন ধীরে ধীরে এই অম্বিকার নিশ্বাসরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। নিশ্বাসটি পর্যন্ত আমার নহে, উহা মায়ের। মা আমার অন্তরে প্রাণময়ী মূর্তিতে বিরাজিতা রহিয়াছেন ; তাহারই বহির্লক্ষণ— শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন ক্রিয়া। নিশ্বাস বলিয়া— সামান্য বায়ুপ্রবাহ বলিয়া আমরা যাকে উপেক্ষা করি ; উহাই যে মাতৃ নিশ্বাস ! ওগো তোমরা মাকে অন্বেষণ করিতে কোথায় ধাবিত হও ? দেখ চাহিয়া —তোমার নাসাপুট হইতে যে প্রাণন ক্রিয়া হইতেছে, ঐ উহাই ত' মায়ের সত্তা বলিয়া দিতেছে। ঐ যে মা, ধর উহাকে ! উহারই গতি লক্ষ্য করিয়া মা মা বলিয়া ডাক ; মায়ের সন্ধান পাইবে, মা ধরা দিবেন। বিনা রোধে বায়ু কুম্ভকে স্থির হইয়া যাইবে, চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে — যথার্থ স্থৈর্য ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য হইয়া যাইবে ! কিন্তু সে অন্য কথা—

সাধারণতঃ নিশ্বাসই চিত্তবিক্ষেপের বহির্লক্ষণ। চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত, তাহার শ্বাসের গতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। তাই অধিকাংশ যোগী বহিঃপ্রাণায়ামের সাহায্যে বিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা করেন ! পুরক-রেচক কুম্ভক অভ্যাস করিয়া, শ্বাসের গতিকে সংযত করেন। চিত্তকে স্থির করিবার জন্য এই সকল অতি স্থূল উপায়। উহা দ্বারা চিত্ত স্থির হইতে পারে, কিন্তু আত্মলাভ হয় না। কারণ বহুদিন ঐরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রশান্ত ভাবটিই যোগীর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। যদিও প্রশান্তচিত্ততা আত্মলাভের বহির্লক্ষণ, তথাপি মনে রাখিও—চিত্ত প্রশান্ত হইলেই আত্মলাভ হয় না। যে আত্মাকে চায়—বরণ করে, মাত্র সেই তাহাকে পায়। তাই শ্রুতি বলেন— **'যমেবৈষ**

বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ।' যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'** তুমি চিত্তস্থৈর্য চাও—তাহাই পাইবে। মা যে আমার কল্পতরু ! মাকে পাইলে চিত্ত যে স্বতঃই প্রশান্ত হয় ইহা না বুঝিয়া, কৌশলের সাহায্যে শ্বাস রুদ্ধ করিলে, কদাপি অজ্ঞান দূর হয় না, অমৃতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং যাহারা বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্যে অভ্যস্ত নহে, এরূপ গৃহস্থ লোকের পক্ষে ওরূপ হঠ প্রাণায়াম অনেক স্থলেই যে যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের হেতুস্বরূপ হইয়া পড়ে, ইহাও অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

সে যাহা হউক, নিশ্বাসগুলিকে অম্বিকার— মায়ের নিশ্বাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, উহারা গণসৈন্যরূপে অসুরনিধন উদ্দেশ্যে মাতৃসহায়তাকল্পে দণ্ডায়মান হয়। নিশ্বাসগুলি যে মায়ের, ইহা বুঝিবার উপায় কি ? যে নিশ্বাস মায়ের, তাতে কিছু না কিছু মাতৃ চিহ্ন থাকিবেই। ঐ চিহ্ন —মাতৃ-নাম, প্রণবাদি মন্ত্র। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ যাহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের ঐ জপই আসুরিক বৃত্তি দমনের পক্ষে বিশেষ সহায়। যখন দেখিতে পাইবে— তোমার নিশ্বাসগুলি মাতৃ-নামসহ আসিতেছে, তখনই বুঝিতে থাকিবে, অম্বিকার নিশ্বাসগুলি কিরূপে গণসৈন্য হইয়া অসুরনিধন করে। পরবর্তী-মন্ত্রে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

আর একটি কথা— নিশ্বাসকে মাতৃ-নিশ্বাসরূপে উপলব্ধি করাই যথার্থ আত্মসমর্পণ। আমার বলিতে কিছুই যে নাই, নিশ্বাসটি পর্যন্ত মা তোমার, আমার আমিই যে তুমি গো, আমার আমি-রূপে তুমিই ত' নিত্য বিরাজিত। আমি-রূপী তোমারই নিশ্বাস এই নাসাপুটে প্রবাহিত হইতেছে। হে আমার আমি ! হে আমার আমি ! ওঃ কি আনন্দ ! কি সত্য ! কি অমৃত ! ওগো অমৃতের পুত্রগণ ! একবার এই সত্য উপলব্ধি কর। তোমার পায়ের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত, কি সুখময় অমৃতময় মধুময় স্পর্শে সঞ্জীবিত পুলকিত হইয়া উঠিবে ! সে আনন্দ ধরিয়া রাখিবার স্থান নাই। এত মহান, এত ঘন, এত নিবিড়। একবার দেখ দেখি—তোমার আমিটাই মা, একবার অনুভব কর দেখি —তোমার এই নিশ্বাসগুলি তোমার নহে, তোমারই অন্তরস্থ তাঁর ; দেখিবে—আমিত্ব কোথায় পলায়ন করিয়াছে। যে আমিত্বকে লয় করিবার জন্য কত জন্মব্যাপী প্রাণপাত কঠোর তপস্যা ; সেই আমিত্বের লয় কত সহজে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। যে গূঢ় রহস্য মা আজ অকপটে চক্ষুর জলের সহিত বড় আদরের সন্তানগণের সম্মুখে ধরিলেন—তাহা যেন অনাদৃত, উপেক্ষিত ও বাক্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়া, হাটে মাঠে বিক্রীত না হয়। দেখিও যেন কেহ মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না।

যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ৫২॥

অনুবাদ। তাহারা (সেই গণ নামক সৈন্যদল) দেবীর শক্তিতে বর্দ্ধিত পরাক্রম হইয়া পরশু ভিন্দিপাল অসি এবং পট্টিশ দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যতদিন নিশ্বাসগুলিতে আমার বলিয়া অভিমান থাকে, ততদিনই উহারা নির্বীর্য ; পরন্তু পলে পলে মৃত্যুর করাল কবলে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করে। আর যখন মাতৃনিশ্বাসরূপে প্রীতীতিযোগ্য হইতে থাকে তখন উহারা **'দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ'** মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হইয়া, অমিতবীর্যে অসুরসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অমরত্বের সন্ধানে ধাবিত হয়। ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে—নিশ্বাসগুলিকে মাতৃ-নিশ্বাস বলিয়া ধরিতে —বুঝিতে পারিলে, আসুরিক বৃত্তির দমন এবং মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়। ইহা বহুধা পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য। সে যাহা হউক, নিশ্বাসগুলি যে মায়ের, তাহা বুঝিবার উপায় পূর্বেই বলা হইয়াছে— জপ। মৃত জপ নহে—চৈতন্যময় জপ— চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র-জপ। এ জপ, করিতে হয় না ; আপনি হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ চেষ্টা করিয়া করিতে হয় না, ইহাও সেইরূপ বিনা চেষ্টায় নিষ্পন্ন হয়। একদিনে না হইতে পারে। প্রথম কয়েকদিন একটু যত্নের সহিত অভ্যাস করিলেই জপ স্বাভাবিক হইয়া যায়। আত্মসমর্পণ এবং মন্ত্রচৈতন্য উভয়ের সার্থকতা, এই মাতৃ নিশ্বাসের উপলব্ধিতেই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—সর্ববিধ সাধনার উহাই মেরুদণ্ড। ঐ দুইটি মূলধন লইয়া অবতীর্ণ হইলে, সকল সাধনাই অচিরে সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

সন্ন্যাসিগণও আত্মসমর্পণ সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য

অজপা অর্পণরূপ একটি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহার সারমর্ম এইরূপ—আমরা অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয়শত অজপা অর্থাৎ—'হংস'—মন্ত্র জপরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া থাকি। উহাই আমার আমিত্ব। বাস্তবিকই জীবভাবীয় আমিত্বকে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, কতকগুলি শ্বাস প্রশ্বাসের সমষ্টিমাত্র পাওয়া যায়। ঐ সমষ্টি-সংখ্যাকে কতিপয় অংশে বিভক্ত করিয়া গুরু, গণেশ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত অর্পণ করিয়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং আমি বলিয়াও আর কিছুই রহিল না। শেষে একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মসত্তাই রহিয়া গেল। এই অনুষ্ঠানটি অনেক স্থলেই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রে পর্যবসিত হইয়া থাকে। মাত্র এরূপ কয়েকটি মন্ত্রপাঠের দ্বারা কতদিনে যে আমিত্ব লয় হয়, তাহা বলিতে পারি না। তবে এইরূপ মাতৃ-নিশ্বাসের উপলব্ধিতে যে অচিরেই আমিত্ব লয় হয় তাহাতে কোন সংশয় নাই।

আমিত্ব লয় শব্দে কেহ এমন মনে করিও না যে, 'আমি থাকিব না'। স্মরণ কর—প্রথম খণ্ডে লণ্ঠনের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে— বহু আমি বাস্তবিক নাই। এক আমিই, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে গিয়া, বহু আমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ অজ্ঞান-কল্পিত আমিত্বকে বিলয় করিতে পারিলেই, আমির প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে। যাহা যথার্থ আমি, যিনি এক আমি, তিনি—সেই আত্মা, মা আমার নিত্যই যে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহা উপলব্ধিযোগ্য হইয়া থাকে।

ভগবদ্গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞাদিও এই আত্মসমর্পণেরই ক্রম মাত্র। জীবের যখন একটু একটু করিয়া ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাস আসিতে থাকে, তখন হইতে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ — ভগবৎ উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ আরম্ভ হয়, আমিকে অর্পণ করিবার ইহাই পূর্বলক্ষণ। এইরূপ কিছুদিন করিবার পর, জীব আর মাত্র দ্রব্য অর্পণ করিয়া তৃপ্তি পায় না, একটু একটু করিয়া সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করে, উহার নাম তপোযজ্ঞ। ইহার উদ্দেশ্য —আমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। যখন দেখিতে পায়—আমি বড় মলিন—অতিশয় বিষয়াসক্ত, এ অপবিত্র আমিকে লইয়া যে পরম পবিত্রের চরণে অর্পণ করা যায় না, তখনই তপস্যা দ্বারা আমিকে পবিত্র করিতে প্রয়াস পায়। একটু পবিত্র হইলে— তবে যোগযজ্ঞের অধিকার হয়। তখন ভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া যাবতীয় কর্মই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এ অবস্থায়ও আমিটি পৃথক থাকিয়া যায়। কিছুদিন ভগবানের সহিত যোগ বা মিলন সংঘটিত হইলে ; ভালবাসা, আসক্তি বা ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেমে পরিণত হয়—তখনই স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বরূপের অধ্যায় বা উপলব্ধি হয়। এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ মহাজ্ঞান অধিগত হইয়া থাকে। প্রেমে আত্মহারা হওয়ার নামই যথার্থ আত্মদান। এইরূপ আত্মদানের নামই আমিত্ব-বিলয়। ইহাই **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** মন্ত্রের চরম সার্থকতা।

ভাবিও না, এইরূপ আত্মদান করিতে পারিলেই আর কখনও জীব-ভাবীয় আমিত্বের স্ফূরণ হইবে না। ভগবান তোমার আমিকে আবার তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তিনি একবার একবার তোমাকে আত্মহারা করিয়া আপন বুকে মিলাইয়া লইবেন, আবার তোমার আমি তোমারই কাছে ফিরিয়া যাইবে। তখন সে আমি বড় সুন্দর ! বড় পবিত্র। বিন্দুমাত্র অভিমান নাই। বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই ! তখন সে আমি, সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তখন সে শাস্ত্রবিহিত কর্মই করুক, অথবা নৈষ্কর্ম্যই অবলম্বন করুক, সকল অবস্থাতেই ভগবৎশক্তি বিকাশের যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতে থাকে। ইহাই আত্মসমর্পণের চরম লক্ষণ।

যে যাহা হউক, মাতৃ-শক্তিতে শক্তিমান গণসৈন্য-সমূহ, অর্থাৎ প্রণবাদি মন্ত্রময় নিশ্বাসগুলি ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগে অসুরবল ক্ষয় করিতে লাগিল। ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। যদিও ঐ অর্থ অসুর পক্ষেই প্রযুজ্য, তথাপি তৎপরবর্তী 'নিজশস্ত্রাস্ত্র-বর্ষিণী' ইত্যাদি মন্ত্রে মাতৃপক্ষেও ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগের রহস্য বিবৃত হইয়াছে ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ নিশ্বাস যে চিত্ত-বিক্ষেপের চিহ্ন, অর্থাৎ অসুরভাবেরই পরিপোষক, ইহা পূর্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু যখন এই নিশ্বাস মাতৃনামময় হয়, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র জপময় হইয়া, মাতৃনিশ্বাসরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই উহা আসুরিকভাবের বিঘাতক হয়। ইহাই গণসৈন্যবৃন্দের অসুর-নাশ।

সাধক ! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও— তোমার চিত্ত যখন নানারূপ বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত হয়, আসুরিক ভাবগুলি যখন একটার পর একটা আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে, তখন তোমার নিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিও। নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন জপ চলিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে বোধ করিবে—তোমারই অন্তরস্থ মায়ের নিশ্বাস তোমার নাসাপুট দিয়া যাতায়াত করিতেছে। দেখিবে —অনতি-বিলম্বে আসুরিক ভাব প্রশমিত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত হইবে। এসকল ক্রিয়ার ফল তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে।

———০———

অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চতথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥ ৫৩॥

অনুবাদ। সেই যুদ্ধমহোৎসবে গণসৈন্য সমূহের কেহ কেহ পটহ, কেহ বা শঙ্খ, অপর সকলে মৃদঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রেও একপ্রকার সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। শ্বাসের গতি ধরিয়া কর্ণবৃত্তি নিরোধপূর্বক, অনাহত চক্রে গমন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই পটহ, শঙ্খ ও মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ঝিল্লী, ভেক, মেঘ, বজ্র ও ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনিও শোনা যায়। মন্ত্রে কেবল পটহ, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ মাত্রের উল্লেখ আছে, উহারাই প্রধান ; ঝিল্লি, মেঘ প্রভৃতির ধ্বনি উহার অন্তর্ভুক্ত। সকল সাধকেরই একপ্রকার ধ্বনি শ্রবণগোচর হয় না। প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য-বশতঃ এই ধ্বনিশ্রবণেরও বৈচিত্র্য হয়। তবে উল্লিখিত প্রকারের ধ্বনিগুলি অধিকাংশ সাধকই শুনিতে পান।

এইরূপ অনাহতস্থ কোন নির্দিষ্ট নাদের সহিত যখন ইষ্টমন্ত্র মিলিয়া যায়, তখনই সাধক জপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ইহাই তান্ত্রিক মন্ত্র-চৈতন্য। এই অবস্থায় আর চেষ্টা করিয়া জপ করিতে হয় না, স্বাভাবিক শক্তিবশেই জপ হইতে থাকে। এই নাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন একটা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। সাধককে উন্মাদবৎ ছুটাইয়া লইয়া চলে। কোথাও কিছু নাই, অনবরত মৃদঙ্গধ্বনি, বংশীধ্বনি ! সে ধ্বনি কি আকর্ষণময় ! যেন প্রাণটিকে টানিয়া লইয়া চলে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি। যাঁহার আকর্ষণে গোপিকাগণ কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসিয়াছিল, সত্যই গো সে ধ্বনি কুলনাশক ! মানুষকে উন্মাদবৎ করিয়া তোলে। বংশী, পটহ, শঙ্খ, মৃদঙ্গ—ইহার যে কোনও ধ্বনি প্রকৃতিগত হইলে, সাধক একটা অভূতপূর্ব আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। ঐ নাদের সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলে চিত্ত আপনা হইতে প্রশান্ত হয় ; বৈষয়িক চাঞ্চল্য তিরোহিত হয় ; সুতরাং আসুরিক অত্যাচার বিদূরিত হইয়া যায়।

তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি— কেবলমাত্র উক্তপ্রকার ধ্বনি শুনিবার জন্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করিও না। উহা সত্যলাভের অন্তরায়। নাদ শুনিলেই সত্য লাভ হয় না। সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইলে, ঐ সকল আপনা হইতেই আসিতে থাকে। তুমি মাতৃ আহ্বান শুনিবার জন্য কাতর প্রাণে উৎকর্ণ হইয়া অনাহত কেন্দ্রে অবধান প্রয়োগ কর— দেখিবে যথার্থই মায়ের আমার আকর্ষণময় কর্ণামৃত-রসায়ন আহ্বান আসিতেছে। আর তুমিও সেই সঙ্গে 'যাই মা' 'যাই মা' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে থাক। সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে—মাতৃলাভ আমার লক্ষ্য, পথিমধ্যে কত কি আসিবে, যাইবে, সকলই দেখিব, সকলই শুনিব, কিন্তু কোনটাতেই আসক্ত হইব না। ধ্বনি ত সামান্য কথা, নানারূপ যোগ বিভূতিতেও যেন মুগ্ধতা না আসে।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে যুদ্ধকে মহোৎসব বলা হইয়াছে। যথার্থই যে যুদ্ধে মা স্বয়ং অবতীর্ণা, যে যুদ্ধ মাতৃ-নিশ্বাসসম্ভূত গণসৈন্যবৃন্দের মৃদঙ্গাদি ধ্বনি দ্বারা মুখরিত, তাহাকে উৎসব ব্যতীত ব্যসন কিরূপে বলা যায় ? যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেই আমার মুক্তি-মন্দিরের হিরণ্ময় বিজয়-নিকেতন নয়নগোচর হয়, যে যুদ্ধে আমার আসুরিক শক্তিনিচয় প্রলয়াভিমুখী হয়, সে যুদ্ধকে উৎসব ব্যতীত ব্যসন কিরূপে বলা যায় ? সাধক ! একবার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ক্ষতি কি !

———০———

ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া-শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশোনিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৫৪॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তি এবং খড়্গ প্রভৃতির প্রহারে শত শত মহাসুর নিহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। সিংহ এবং গণসৈন্যবৃন্দের যুদ্ধ-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এইবার মাতৃ-যুদ্ধের বর্ণনা হইতেছে। প্রথমেই ত্রিশূলাঘাতে অসুর নিধনের উল্লেখ আছে। ত্রিশূল কি ? ত্রিপুটি জ্ঞান। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ; এই ত্রিপুটিই ত্রিশূল পদবাচ্য। ইহা বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের অস্ত্র। ইতিপূর্বে স্বয়ং মহেশ্বর স্বকীয় শূল হইতে শূল নিষ্কাসনপূর্বক দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুটির সাহায্যে কিরূপে অসুরনিধন হয় ? রূপ, রসাদি, বিষয়, কিংবা কামাদি বৃত্তি যখন চিত্তক্ষেত্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তখনই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিপুটি প্রয়োগ করিতে হয়। বিষয় কিংবা বৃত্তিনিচয় যে ত্রিপুটি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচারের সাহায্যে দৃঢ় ধারণা করিতে হয়।

খুলিয়া বলিতেছি—মনে কর, তুমি কোনও কমনীয় কান্তিতে মুগ্ধ। ঐ কান্তিতে দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে থাক। এই যে কান্তি, ইহা আমারই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। আর 'আমি জানিতেছি' এই আমি অংশটির নাম জ্ঞাতা, এবং 'জানিতেছি' এই অংশটির নাম জ্ঞান। ইহা একই জ্ঞানসমুদ্রের তিনটি তরঙ্গ মাত্র। প্রথম খণ্ডে **'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে'** ইত্যাদি শ্লোকে যে সর্বপ্রাণিসাধারণ অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, একবার উহার সমীপবর্তী হও, অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধারণা কর। এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রেরই তিনটি তরঙ্গ আমার নিকট জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কি রূপ রসাদি বিষয়, কি কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, সকলই ঐ ত্রিপুটি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিচারকেই ত্রিশূলাঘাত, অর্থাৎ ত্রিপুটি প্রয়োগ কহে। যে শক্তিপ্রভাবে জ্ঞানসমুদ্র জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিরূপে তরঙ্গায়িত হয়, ঐ শক্তিই দেবী—মা আমার। এই মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখ—দেখিতে থাক, মা একদিকে বিষয়াকারে অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ; আবার অন্যদিক দিয়া স্বয়ংই ত্রিশূলাঘাতে অর্থাৎ ত্রিপুটি প্রয়োগ রূপ বিচারের সাহায্যে, উহাদিগকে নিহত করিতেছেন। সাধক ! তুমি এইরূপ ত্রিপুটি বিচার করিতেছ বলিয়া, উহাতে নিজ কর্তৃত্বের আরোপ করিও না। কারণ ঐ বিচারশক্তিরূপেও মা-ই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিশূলরহস্য খুব ধীরভাবে বুঝিয়া কিছুদিন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বারংবার অনুশীলন দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লইতে পারিলে, সাধন-সমরে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

ত্রিশূলের পর গদা, গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্ত-বাক্য। ত্রিশূলাঘাতে—ত্রিপুটি প্রয়োগে যেরূপ অসুর নিধন হয়, গদাঘাতে—ব্যক্তবাক্য প্রয়োগে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠেও সেইরূপ অসুরবল ক্ষীণ হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত শক্তিবৃষ্টি এবং খড়্গাঘাতেও অসুরনিধনের উল্লেখ আছে। আসুরিক বৃত্তিনিচয়ও যে মহতী শক্তির বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ মাত্র, ইহা পুনঃ পুনঃ ধারণা করার নামই শক্তিবৃষ্টি। যতক্ষণ বিষয় কিংবা বৃত্তিপ্রবাহমাত্র প্রতীতিগোচর হয়, ততক্ষণ উহারা অমিতবীর্য অসুর। আর যখন উহাদিগকে মাতৃ-শক্তিরূপে বুঝিতে পারা যায়, তখনই ঐ শক্তিবৃষ্টির প্রভাবে অসুরবল প্রক্ষীণ হইতে থাকে। বিষয়সমূহকে সর্বদা শক্তিমাত্র রূপে উপলব্ধি করার নামই শক্তিবৃষ্টি। অবশেষে খড়্গ। ইহা দ্বিধাকারক অস্ত্র। জ্ঞানই মাতৃ-হস্তস্থিত খড়্গ। একমাত্র আত্মা— মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, সেই সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, যাবতীয় অনাত্মভাব বিনষ্ট হয়। এইরূপ বিজ্ঞান খড়্গের আঘাতে সমস্ত বৈষয়িক প্রকাশ— অসুরভাব দূরীভূত হয়। সাধক। যদি তুমি সত্য-প্রতিষ্ঠ হইয়া থাক, যদি সত্য-প্রতিষ্ঠা তোমার প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে বিষয়ের সম্মুখীন হইবামাত্রই, তোমার জ্ঞান উহাকে সত্যরূপে— মা রূপে গ্রহণ করিবে, ইহাই অসুরগণের উপর জ্ঞান খড়্গের আঘাত। এইরূপে শত শত অসুর নিহত হইয়া থাকে।

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥ ৫৫॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুরকে মা ঘণ্টাধ্বনিতে বিমুগ্ধ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। অপর কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। ঘণ্টাধ্বনি— অনাহত নাদ। গণসৈন্যবৃন্দের যুদ্ধে পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি ধ্বনির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঘণ্টাধ্বনি তাহার অন্যতম। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের ঘণ্টা হইতে এই ঘণ্টা আনয়ন পূর্বক দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বিক্ষেপ নিবারণে ও একাগ্রতা সাধন পক্ষে এই ঘণ্টাধ্বনি অতি সহজ উপায়। দূর হইতে কোনও বৃহৎ ঘণ্টা ধ্বনিত হইলে, টম্‌ম্‌ম্ এইরূপ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ঐরূপ দীর্ঘ প্লুতস্বরে ম্ কারের ধ্বনির

ন্যায় একটি ধ্বনি অনাহত হইতে উত্থিত হয়। উহা এত মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, আর বাহ্যবিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে চায় না। ঐ ম্ ম্ ম্ ধ্বনির সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলেই স্বাভাবিক জপ হইতে থাকে। ঐরূপ জপে চিত্ত একান্ত মুগ্ধ থাকে ; সুতরাং আসুরিক ভাবসমূহের আত্মবল প্রকাশের সুযোগ থাকে না।

এতদ্‌ভিন্ন মা আর একটি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, উহার নাম পাশ। মা আমার অপর কতকগুলি অসুরকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন— নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। সমুদয় অসুরকে নিহত করিলে মায়ের আনন্দলীলা চলে না ; তাই কতকগুলিকে লীলার সহায় স্বরূপ মনে করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন। শোন —রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিলে, আর সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তিই হইতে পারে না ; তাই যে পরিমাণ রজঃশক্তি বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, সেই পরিমাণ শক্তিকে আসুরিক ভাব হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইতে হয়। আরও দেখ, চিত্তের যাবতীয় বৃত্তিকে একেবারে নিরুদ্ধ করিলে জগদ্‌ব্যাপারই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাই উহাদিগের সকলকেই বিনষ্ট না করিয়া কতকগুলিকে বশীভূত করিয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ জীব ইন্দ্রিয়বৃত্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়, ইহাই অসুরের অত্যাচার। ইন্দ্রিয় জয় করাই যথার্থ অসুরবিজয়। নানা উপায়ে উহা সিদ্ধ করিতে হয়। কেবল অস্ত্রাঘাত —কেবল সংযম দ্বারা উহা সুসিদ্ধ হয় না। কখনও বা উহাদিগকে সাত্ত্বিক ভোগের মধুর আস্বাদ বুঝাইয়া দিয়া সাধনার সহায়রূপে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাই পাশবন্ধন-পূর্বক অসুর আকর্ষণের রহস্য।

এই মন্ত্রে আর একটি শব্দ প্রণিধানের যোগ্য। ঐ শব্দটি 'ভূবি'। ভূ বা ক্ষিতিত্ত্বের কেন্দ্র মূলাধার চক্র। রজঃশক্তির যে অংশ সত্ত্বগুণের উদ্বোধক, উহার স্থান মূলাধার। এই স্থানে সংযম প্রয়োগ করিলে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলভাব প্রত্যক্ষ হয় উহাই মাতৃস্নেহ-পাশে আবদ্ধ অসুর।

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গাপাতৈস্তথাপরে।
বিপোথিতানিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৬॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, কতকগুলি নিপাতের দ্বারা বিপোথিত, অপর কতকগুলি গদাঘাতে ভূমিতলে শায়িত হইল।

ব্যাখ্যা। এক্ষণে অসুরসমূহের দুরবস্থার কথা বর্ণিত হইতেছে। কতকগুলি আসুরিক সংস্কার জ্ঞান-খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। অপর কতকগুলি আসুরিক সংস্কারকে, নিপাতের দ্বারা অর্থাৎ আছাড় মারিয়া বিপোথিত করা হইল ; ইহাদের আর কোন চিহ্নই রহিল না, অর্থাৎ অব্যক্তে মিলাইয়া গেল। আর কতকগুলি গদাঘাতে অর্থাৎ চৈতন্যময় মন্ত্র জপ বা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠের সাহায্যে ভূমিশায়ী হইল—ক্ষিতি তত্ত্বে অর্থাৎ মূলাধারে সূক্ষ্ম বীজাকারে সত্ত্বগুণ উদ্বোধের সহায়রূপে অবস্থান করিতে লাগিল।

বেমুশ্চ কেচিদ্ রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ৫৭॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর মুষল প্রহারে অত্যন্ত আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কতকগুলি বক্ষে শূলবিদ্ধ হইয়া নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। রুধির-বমন অর্থে শক্তিহীন হওয়া। যে শক্তিপ্রভাবে চিত্তক্ষেত্রে রাজসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সেই শক্তির নাম রুধির। রজোগুণ রক্তবর্ণ। রজঃশক্তিই রুধির। সুতরাং রুধিরবমন শব্দের অর্থ— রজোগুণের শক্তিহীনতা। শূল—ত্রিশূল। ইহার অর্থ পূর্বেই করা হইয়াছে। ভূমিতলে নিপতিত হইল, বাক্যটির তাৎপর্য —আসুরিক সংস্কারসমূহ মাতৃ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে, দগ্ধবীজবৎ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তিহীন হইয়া, মূলাধারে অবস্থান করিল। যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন উহারা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তবে থাকিয়াও আর সাধারণ জীবের ন্যায় মায়ের সন্তানকে শোক মোহাদি দ্বারা অবসন্ন করিতে পারে না।

নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমু চুস্ত্রিদশার্দনাঃ ॥ ৫৮॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর সেই রণাজিরে — সমরাঙ্গনে (দেবী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) শরসমূহের দ্বারা এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাদের দেহ নিরন্তর হইয়াছিল

অর্থাৎ তাহাতে তিল ধারণের যোগ্য স্থানও ছিল না। অমরবৃন্দের উৎপীড়ক অসুর-সেনাপতিগণ এইরূপভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যখন অসুরবল সাধকের প্রশান্তচিত্ততার ব্যাঘাত ঘটাইতে থাকে, যখন সাধকের চিত্তক্ষেত্র সমরাঙ্গনে পরিণত হয়, তখন আসুরিক বৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ শর প্রয়োগ করিতে হয়। প্রণবাদি মন্ত্র অর্থাৎ মাতৃ আহ্বানই উপনিষদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য শর। মা মা মা, এই তুমি এই তুমি, এত ক্ষুদ্র মূর্তি লইয়া আমার বুকের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছ ! মা মা, তুমি যে মা। কেন এরূপভাবে আসিয়া আমায় উৎপীড়িত করিতেছ ? মা মা, তুমি স্থিরা প্রশান্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হও। মা মা মা ! এমনই করিয়া পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপ করিতে হয়, যেন তিলমাত্র সংস্কারের অবকাশ না থাকে। এত ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে হয়, এত ঘন ঘন ব্রহ্মলক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন একটুও ফাঁক না থাকে '**নিরন্তরাঃ শরৌঘেন**' শব্দের ইহাই তাৎপর্য। এইরূপ করিতে পারিলেই ত্রিদশার্দনগণ অর্থাৎ সাধকের দেবভাবনাশক আসুরিক শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সাধক প্রতিদিনই এইরূপ উপায়ে অসুর বিজয় হয় কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ বিফলতা আসিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জয় লাভ সুনিশ্চিত।

———o———

কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ ৫৯॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুরের বাহু ছিন্ন হইল, কতকগুলির গ্রীবা এবং কতকগুলির মস্তক ছিন্ন হইল। অপর কতকগুলির মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইল।

ব্যাখ্যা। বাহুচ্ছেদ শব্দে— গ্রহণ-শক্তির অপলাপ। আসক্তিসম্ভূত রূপ রসাদি বিষয় গ্রহণের অভিলাষ দূর হওয়াই অসুরের বাহুচ্ছেদ। গ্রীবাচ্ছেদ শব্দে শব্দোচ্চারণ শক্তি-হীনতা। শব্দকে আশ্রয় করিয়াই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। শব্দ না থাকিলে ভাব ফুটিতে পারে না। এ সকল বিষয় পূর্বে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাব বা সংস্কার-সমূহের মূলীভূত উপাদান শব্দ। এই শব্দের উৎপাদনশক্তি রহিত হওয়াই কণ্ঠচ্ছেদ পদের তাৎপর্য। মধ্যদেশ বিদীর্ণ হওয়া অর্থে কার্যোৎপাদন শক্তিহীনতা। কার্য শব্দে এস্থলে আসুরিক ভাবমূলক কার্যই বুঝিতে হইবে। কার্যমাত্রেরই তিনটি অবস্থা। প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, মধ্যক্ষণে স্থিতি এবং অন্তক্ষণে লয়। আসুরিক সংস্কারসমূহের মধ্যদেশ বিদীর্ণ হওয়া অর্থে কার্যের স্থিতিভাব বিনষ্ট হওয়া বুঝিতে হইবে। স্থিতিভাব বিনষ্ট হইলে কার্যের উৎপত্তি ও লয় সুতরাং বিলয় প্রাপ্ত হয়।

———o———

বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্যাং মহাসুরাঃ ।
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ॥ ৬০॥

অনুবাদ। অপর অসুরগণের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা ভূমিতলে নিপতিত হইল। কতকগুলি অসুর দেবীকর্তৃক এরূপভাবে দ্বিখণ্ডিত হইল যে, এক এক খণ্ডে একটি বাহু, একটি অক্ষি ও একখানি মাত্র চরণ থাকিল, অর্থাৎ মস্তকের মধ্যেভাগ হইতে পায়ু স্থান পর্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইল।

ব্যাখ্যা। জঙ্ঘাচ্ছেদ শব্দে গতিশক্তি-হীনতা। সংস্কারসমূহের যে মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলতা, তাহাই গতিশক্তি নামে অভিহিত। সংস্কার মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট মূর্তি আছে, ঐ মূর্তি ভাবময়ী অভিলাষ বা গ্রহণ উহার বাহু, প্রকাশ উহার অক্ষি এবং গতি উহার চরণ। উহাদিগকে শিরোদেশ হইতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, সংস্কারের বিশিষ্ট মূর্তি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ করার ফলে উহাদের পুনরায় ফলোৎপাদন শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যেরূপ ঋণতড়িৎ এবং ধনতড়িৎ নামক পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয় সম্মিলিত হইলে বৈদ্যুতিক কার্য উৎপন্ন হয়, যেরূপ পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির বিকাশস্বরূপ দক্ষিণ ও বামার্দ্ধ দেহ ভাগদ্বয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমাদের এই ভোগায়তন ক্ষেত্র দেহটি প্রস্তুত হয়, ঠিক সেইরূপই আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপ পরস্পরবিরোধী শক্তিদ্বয়ের সম্মেলনেই ভাব বা সংস্কারসমূহ ফুটিয়া উঠে। ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ নিধনের প্রণালী অনুসারে যদি উক্ত শক্তিদ্বয়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে আর উহাদের কার্যোৎপাদনসামর্থ্য থাকে না। অসুর-সমরে অবতীর্ণা মাও কতকগুলি অসুরকে ঠিক সেইরূপভাবেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, উহাদের কার্যোৎপাদনশক্তি সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

———▪———

ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ।
কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ॥ ৬১॥
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্যলয়াশ্রিতাঃ।
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥ ৬২॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥ ৬৩॥

অনুবাদ। অপর কতকগুলি অসুর ছিন্নশির হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক কবন্ধরূপে পুনরুত্থান করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি কবন্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে তূর্যধ্বনির তান লয় অনুসারে নৃত্য করিতে লাগিল। অন্যান্য মহাসুরগণ খড়্গ শক্তি ও ঋষ্টি অস্ত্র (উভয়তোধার খড়্গবিশেষ) হস্তে ধারণপূর্বক দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' (থাক থাক) বলিতে বলিতে দেবী কর্তৃক ছিন্নশির হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। কতকগুলি আসুরিক সংস্কার এমনই দুরপনেয় যে, উহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় না। মায়ের কৃপায় যে সকল সাধকের আসক্তির মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, 'যথার্থই এ জগতে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য কিছুই নাই', এরূপ দৃঢ় জ্ঞানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ সাধকগণও মধ্যে মধ্যে কবন্ধ অসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া থাকেন। উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পদস্খলন, পরাশরের চিত্তচাঞ্চল্য, দুর্বাসার প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়, উহারা সকলই মস্তকবিহীন অসুরের যুদ্ধ বা অত্যাচার মাত্র। নবম অবতার বুদ্ধদেবের উপরও মায়ের অত্যাচার হইয়াছিল। বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাসের ফলেই এরূপ হইয়া থাকে। উহাতে মাতৃলাভের কোনও ব্যাঘাত হয় না। কত শত সমুন্নত সাধক মহাপুরুষদিগের নামেও সত্য মিথ্যা কত রকম দুর্বলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, উহাতে বিস্মিত বা শ্রদ্ধাহীন হওয়ার কোনও হেতু নাই। কারণ ওসকলই ছিন্নশির কবন্ধ অসুরের সাময়িক অত্যাচার মাত্র। মায়ের লীলা-বৈচিত্র্যের অনুধাবন যে মানব-বুদ্ধির অতীত, এ সকলও তাহারই প্রমাণ মাত্র ! যাঁহারা যথার্থ কল্যাণকামী পুরুষ তাঁহাদের সাময়িক দুর্বলতায় কিছুই ক্ষতি হয় না। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—**'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'** কল্যাণকারী কোনও ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং সাধারণ চক্ষু লইয়া কেহ সাধু মহাপুরুষগণের দুর্বলতার বিচার করিতে যাইও না। যাহা সাধারণ জীবের চক্ষুতে দোষ বা দুর্বলতা, হয়ত মহাপুরুষদিগের পক্ষে তাহার মধ্যেও কোনও গভীর রহস্য নিহিত আছে। মা কখন কোথায় কিরূপ ভাবে খেলা করেন, তাহা নির্ণয় করা সাধারণ বিবেকশক্তির কার্য নহে।

কতকগুলি অসুর রণবাদ্যের তান, লয় অনুসারে নৃত্য করিতেছিল। যখন সাধকের বাহ্য বিষয় গ্রহণজন্য চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়, তখনও অন্তরে বৈষয়িক সংস্কার ফুটিয়া উঠিতে থাকে। যদিও উহারা স্থূলে আসিয়া কার্য উৎপাদন করিতে পারে না, (কারণ আসক্তিহীন হওয়ায় মস্তকহীন হইয়াছে) তথাপি মানসিক ভাবরূপে আসুরিক সংস্কারসমূহ নৃত্য করিতে থাকে ; সাধক মাত্রেই উহা অনবরত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। গীতায় যাহাকে, **'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'** বলা হইয়াছে, দেবী মহাত্ম্যে তাহাই কবন্ধ অসুরের নৃত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সকল সাধককেই প্রথমে কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিতে হয়। কর্মেন্দ্রিয়সংযম স্থির হইলে তখন দেখিতে পায় যে, অন্তরেন্দ্রিয় এখনও সংযত হয় নাই। যাহা কর্মের দ্বারা অনুষ্ঠান করি না, অবলীলাক্রমে তাহা মনের দ্বারা চিন্তা করি, ইহাকেই মিথ্যাচার কহে। এই মিথ্যাচার অবলম্বন ব্যতীত কেহই সত্য আচারে উপনীত হইতে পারে না। যাহারা যথার্থ সত্য আচারে অধিষ্ঠিত, তাহাদের সকলকেই এরূপ মিথ্যাচারের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে। ইহাই ছিন্নশির অসুরগণের নৃত্য। আসক্তি নাই, অনুষ্ঠান নাই, তথাপি চিত্তক্ষেত্রে আসুরিক সংস্কার ফুটিয়া উঠে। উহারা তূর্যধ্বনির তানে তানে নৃত্য করে। প্রণবাদি মন্ত্রজপই রণবাদ্য। সাধক ! তুমি হয়ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছ, আর অন্তরে নানারূপ বৈষয়িক ব্যর্থ সংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে ! তোমার জপও চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অসুরের নৃত্যও চলিতেছে। এ অবস্থায় আসিয়া কেহ হতাশ হইও না, রণবাদ্য বন্ধ করিও না, যতই নৃত্য করুক না কেন, মনে রাখিও উহারা কবন্ধ অসুর। অচিরেই উহাদের তাণ্ডব নৃত্য প্রশমিত হইবে। শুধু মায়ের দিকে তাকাইয়া থাক। আপনাকে মিথ্যাচারী বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ঐরূপ মিথ্যাচার করিয়াই সত্যাচারে উপনীত হইতে হয়। ঐ মিথ্যাচার—ঐ মস্তক বিহীন অসুরের নৃত্য, ও সকলই মায়ের ছদ্মবেশ— মায়ের লীলামাত্র। সুতরাং

নিজের দুর্বলতা দেখিয়া কখনও আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিও না।

আর কতকগুলি মহাসুর খড়্গাদি অস্ত্রধারণপূর্বক দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে দেবী কর্তৃক ছিন্নশির হইল। কোন বলবান শত্রুকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া আত্মগোপন করিবার সময় দুর্বল ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষকে বলিয়া থাকে 'আচ্ছা থাক্ থাক্—আবার দেখা যাইবে।' উহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এক্ষণে আমি তোমার কিছু অনিষ্টসাধন করিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে উপযুক্ত দেশ কাল ও পাত্রের সমবায় ঘটিলে, পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিব। সত্যসত্যই কর্মেন্দ্রিয়াদির সংযম দ্বারা সংস্কারসমূহের প্রবুদ্ধ ভাব মাত্র তিরস্কৃত থাকে, আবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহারা কর্মরূপে ফুটিয়া উঠে। **'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ'** —ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা বিষয়গ্রহণ নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু **'রসবর্জং'** অর্থাৎ অনুরাগটি থাকিয়া যায়। সুযোগ পাইলেই অর্থাৎ দৈবাৎ সংযমের একটু শিথিলতা আসিলেই আসুরিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে সাধক কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ নহে, সে যে মাতৃ চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এখানে মা স্বয়ং তাহাদিগকে ছিন্নশির করিয়া দিলেন। পুনরায় কার্যোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ভগবানও বলিয়াছেন— **'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** ; পরমাত্মাকে দেখিলেই বিষয়ানুরাগ সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। এখানে সাধক সর্বত্র সত্য-প্রতিষ্ঠায় মাতৃ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ। অনুরাগ মাতৃ চরণে— পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিষয়ের প্রতি অনুরাগের অবকাশ নাই ; তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে বলিতেই মহাসুরগণ দেবী কর্তৃক ছিন্নশির হইল।

———○———

পাতিতৈরথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ॥ ৬৪॥

অনুবাদ। যে ভূভাগে সেই মহারণ সংঘটিত হইয়াছিল, নিপতিত রথ, হস্তী, অশ্ব এবং অসুরসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সেই বসুন্ধরা অগম্য হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। যথার্থই সাধকের চিত্তক্ষেত্র এইরূপ অগম্য হইয়া উঠে। যদিও ইহা বসুন্ধরা, যদিও অনন্ত রত্নরাশির আকর, যদিও উহা সিদ্ধি, শক্তি, শান্তি প্রভৃতি বসুকে ধারণ করে, তথাপি এখন অসুরগণের শব-দেহে সে স্থান অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন আসুরিক সংস্কারের শেষ—(শবদেহগুলি) সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত না হয়—ততদিন চিত্তক্ষেত্র—বসুন্ধরায় লুক্কায়িত রত্নরাশি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। শরীরস্থ যে সকল স্থূল যন্ত্রাদির সাহায্যে আসুরিক সংস্কারসমূহ উদ্বুদ্ধ হইয়া সুভাবকে বিধ্বস্থ করে, তাহাই রথ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি আসুরিক শক্তির পরিচালক যান-বাহনাদি ! আসুরিক শক্তি বিলীন হইয়াছে, অথচ তাহার স্থূল অংশ এখনও অবশিষ্ট ; তাই চিত্তক্ষেত্র এখনও প্রশান্ত হয় নাই, তাই সাধক এখনও চিত্তের গভীর তলদেশে অবগাহন করিয়া সিদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি রত্নসমূহ অন্বেষণ করিয়া পায় না। আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—যেরূপ বহুদিনের ক্ষতরোগ আরোগ্য হইলেও দাগ অর্থাৎ ক্ষতচিহ্ন সহসা মিলাইয়া যায় না, সেইরূপ মাতৃ-কৃপায় চিত্তের রাজসিক-চাঞ্চল্য উপশান্ত হইলেও, অসুরের শবদেহরূপ সংস্কারের অবশেষ একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হয় না। সাধকগণ ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। চিত্তের বহির্মুখী আসক্তি বিলয় প্রাপ্ত হইলেও বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ উহার ভাবময় স্বরূপ একেবারে বিনষ্ট হয় না বলিয়াই, যথার্থ প্রশান্ত স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। তাই মন্ত্রে বসুন্ধরাকে অগম্যা বলা হইয়াছে।

———○———

শোনিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ৬৫॥

অনুবাদ। সেখানে— সেই অসুর-সৈন্যমধ্যে হস্তী, অসুর এবং অশ্বসমূহের শোণিতরাশি মহানদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অসুরসমূহের মধ্যে রক্তনদী বহিয়া গেল। রক্তনদী কি ? বিশুদ্ধ রজোগুণমূলক শক্তিপ্রবাহ। রক্তবর্ণই রজোগুণের বহির্বিকাশ। সমগ্র অসুরবৃন্দ এই যুদ্ধে এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটা চঞ্চলতাময় ঘোর রক্তবর্ণ শক্তিপ্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই

উপলব্ধি হয় নাই। এই সময় সাধক দেখিতে পায়—তাহার শুভ্র চিদাকাশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া শোণিতবাহী মহানদীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ অসুর সংস্কার-সমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে আর বিশিষ্টভাবে অসুরগণকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ থাকে না। শুধু একটা গাঢ় রক্তবর্ণ শোণিত-প্রবাহবৎ রজঃশক্তির পূর্ণ উদ্বেলন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। মূলাধারাদি চক্রত্রয় এই সময় রক্তবর্ণ জ্যোতির্ময় শক্তিকেন্দ্ররূপে অভিন্নভাবে উপলব্ধিযোগ্য হয়। ইহাই, **'শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ।'**

———o———

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৬॥

অনুবাদ। বহ্নি যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে তৃণকাষ্ঠ-সমূহের মহাস্তূপকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ মা অম্বিকাও অসুরকুলের বিপুল বাহিনীকে ক্ষণকালমধ্যে ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। ভগবদ্গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটি শ্লোক আছে—**'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।'** জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় কর্মসংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। এখানেও দেখিতে পাই, মা আমার স্নেহময়ী অম্বিকামূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, যাবতীয় অসুরসংস্কারেরই ক্ষয় করিয়া দিলেন। যাহারা 'জগৎ মিথ্যা' এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, জগৎ অংশ পরিত্যাগপূর্বক বিচারের সাহায্যে 'ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানই যে সর্বকর্মের বিলয়সাধক, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না ; তথাপি কেবল বিচারের সাহায্যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, উহা হইতে নেত্র অপসারিত করিলে, কখনও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিচারের সাহায্যে যাহার লাভ হয়, উহা জ্ঞান নয় —জ্ঞানের আভাস মাত্র। জ্ঞান মানে জানা, অনুভব করা। যে পর্যন্ত সে বিষয় জানা না যায়, সে পর্যন্ত তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই হয় না। শ্রবণ বা অধ্যয়নজ জ্ঞানে কর্মক্ষয় হয় না। জ্ঞানের উপলব্ধি আবশ্যক। ঈশোপনিষদ্ বলেন— বিদ্যা এবং অবিদ্যা এতদ্ উভয়ই মুক্তির সাধক। অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে অতিক্রম এবং বিদ্যার সাহায্যে অমৃত লাভ করিতে হয়। কর্মসংস্কার অবিদ্যা— উহাকে মিথ্যা বলিয়া চক্ষু বুজিলে মৃত্যুভয় বিদূরিত হইতে পারে না। যতদিন জ্ঞানে নানাত্ব থাকিবে, ততদিন উহা জীবকে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর ভিতরে প্রেরণ করিবেই। তুমি কর্মসমূহ দেখিতেছ—বহুত্ব উপলব্ধি করিতেছ, অথচ মুখে সহস্রবার মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া আর একটা নূতন সংস্কারের গঠন করিয়া তুলিতেছ, এরূপ করিলে কখনও মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না। ঐ কর্মরাশিকে ব্রহ্মময় করিতে হইবে। কর্ম বলিয়া পৃথক কিছুই নাই, সর্বই ব্রহ্ম— এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। কর্ম ব্রহ্মময় হইলেই কর্মসংস্কার বিদূরিত হয়। এইটিই প্রথম কার্য। ইহাই ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপের উপলব্ধি বা অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুভয় অতিক্রম। এইটি হইলে তারপর নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি বা বিদ্যার সাহায্যে অমৃতলাভ। এইরূপে জীব যথাক্রমে অবিদ্যার ও বিদ্যার আশ্রয়ে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অমৃতভোগের অধিকারী হয়।

এইবার দেখ, মা কিরূপে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য অসুরের ক্ষয় করেন। তোমার চিত্তে অসংখ্য কর্মসংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে, উহারাই ত' অসুর। উহাদের প্রত্যেকটিকে ধরিয়া ধরিয়া মাতৃসংস্কারে পরিণত করিতে হয়। প্রত্যেক সংস্কারটিকে ছদ্মবেশী মাতৃ-মূর্তি বলিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন মাতৃ-সংস্কার ঘনীভূত হইয়া যায়, সংস্কারের আকার মাত্র থাকে, অথচ উহার সর্বাবয়বই মাতৃময় হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—মা অসুরকুলকে গ্রাস করিয়া লইয়াছেন। ইহা একদিনে হয় না, দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়, ইহা যোগমার্গের কথা। কিন্তু তুমি মায়ের ছেলে, তুমি মা মা বলিয়া ডাকিতেছ, মাতৃলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ —চিন্ময়ীর বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানই যখন তোমার একান্ত অভীষ্ট, তখন চিত্তক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত অসুরবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মায়ের দিকে অচল নেত্রে তাকাইয়া থাক, আপনাকে উৎপীড়িত আর্ত সন্তান বলিয়া কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাকিতে থাক, মাতৃ-মহিমায় আবিষ্ট হইতে অভ্যস্ত হও ; দেখিবে—মা

'ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যং ক্ষয়ং নিন্যে' ক্ষণকাল মধ্যেই তোমার আসুরিক সংস্কারসমূহের ক্ষয় করিয়া দিয়াছেন।

———◦———

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৭॥

অনুবাদ। সেই সিংহও মহাগর্জনপূর্বক কেশর-সমূহ প্রকম্পিত করিয়া, অসুরগণের শরীর হইতে প্রাণগুলিকে যেন বিশেষরূপে চয়ন করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলিবার জন্য এই মধ্যম চরিত্র বর্ণনের উদ্যম তাহা এইখানেই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। সাধক ! এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই তোমার প্রাণময় গ্রন্থি অর্থাৎ বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে। এ রহস্য গুরুপরম্পরাগতরূপে বিনীত শ্রদ্ধাবান ও সত্য-প্রতিষ্ঠ সাধকেরই অধিগমযোগ্য। পক্ষান্তরে যাহারা ভগবৎ-সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসবান নহে, যাহাদের গুরুবাক্যে, বেদান্তবাক্যে অবিচল শ্রদ্ধা নাই, যাহাদের সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ রহস্যের আলোচনায় বিশেষ কিছুই ফল হইবে না। যাহা হউক, এস অধিকারী সাধক ! আমরা আমাদের একান্ত আশ্রয় মাতৃ-চরণ অনুস্মরণপূর্বক মন্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সচেষ্ট হই। মা, তুমি ধীরূপে উদ্‌ভাসিত হও, তোমার সাধনরহস্য তুমি বোধগম্য করাইয়া দাও। অজ্ঞানান্ধ জীবজগৎ আবার জ্ঞান ভক্তির পবিত্র আলোকে উজ্জ্বল হউক।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সিংহ অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণ চয়ন করিতে লাগিল। সিংহ— মাতৃ-শক্তিবিকাশের যন্ত্র-স্বরূপ জীব। পূর্বে বলিয়াছি— সাধক যখন স্বকীয় জীবভাবের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়—যখন দেহাত্মবোধকে বিলয় করিবার জন্য যত্নবান হয়, তখনই জীব সিংহ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। তখনই মা আমার কৃপাপূর্বক শ্রীচরণস্পর্শে তাদৃশ জীবকে ধন্য করিয়া দেন। সেই জীব তখন দেহ হইতে প্রাণের চয়ন করিতে থাকে। ইহাই সাধনা, ইহাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। যতদিন জীব কেবল শরীর নিয়াই মুগ্ধ থাকে, সে ততদিন সাধারণ জীবমাত্র। আর যখন শরীর হইতে প্রাণের চয়ন করে, তখন সে জীবশ্রেষ্ঠ সিংহ। শরীর— জড়, প্রাণ— চৈতন্য। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অন্বেষণ। প্রত্যেক জড় পদার্থই যে প্রাণের —চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র, ইহা ধরিয়া ধরিয়া বুঝিবার নামই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

তোমার বালক পুত্রটি আনন্দে খেলা করিতেছে, আর তুমি মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছ। একবার ভাবিয়া দেখ— কাহাকে তুমি পুত্র বলিয়া বুঝিতেছ ? কে তোমাকে মুগ্ধ করিতেছে ? পুত্রের দেহ, না প্রাণ ? দেহ নহে। যদি রক্তমাংসের পিণ্ডটাই তোমায় মুগ্ধ করিত, যদি রক্তমাংসের দেহই তোমার আত্মজ হইত, তবে গত-প্রাণ পুত্রের দেহটাকে, কেহই শ্মশানে পাঠাইয়া দিত না। তবে কে তোমার পুত্র ? ঐ প্রাণ, যে আছে বলিয়া, দেহ—প্রাণী। যাহার অভাবে শরীর শবমাত্র। সাধারণ জীব দিবারাত্রি প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের দিকে লক্ষ্য-হীন হইয়া, মাত্র জড় নিয়া থাকে—শব নিয়া খেলা করে। যাহারা এইরূপ প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া—শিবকে অবমাননা করিয়া দিবারাত্রি শব নিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গললাভ কিরূপে হইবে ? শ্মশানেই যাহাদের বাস, শ্মশানে যাহাদের রতি, অথচ যাহারা শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের দিকে লক্ষহীন, তাহারা রোগ-শোক-মৃত্যু-হাহাকার-কাতর-ক্রন্দন হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ? ওগো, তোমরা কেবল নামরূপে মুগ্ধ থাকিবে—শ্মশানে বাস করিবে, আর মুখে অমৃতের কথা বলিবে, এরূপ করিলে কি অমৃত লাভ হয় বাবা ! দেখ—প্রত্যেক দেহই শ্মশান। যতদিন দেহীর লক্ষ্য না পড়ে, ততক্ষণ তুমি যে শ্মশানেই রহিয়াছ। তোমার গৃহ যতই বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হউক, যতই আলোক মালায় সুশোভিত হউক, যতই পুত্র কলত্র ভৃত্যাদির কলকোলাহলে মুখরিত হউক, যদি গৃহাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকে, তবে উহা শ্মশান মাত্র। তোমার দেহ যতই মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিত হউক, যতই বিদ্যা বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউক, যতই উচ্চ গৌরবের পাত্র হউক, যদি প্রাণের দিকে—মায়ের দিকে লক্ষ্য না থাকে, যদি দেহকে মাতৃ-মন্দির বলিয়া বুঝিতে না পার, তবে উহাও শ্মশান বা শবদেহ মাত্র। আরে যে জনা তোমার বুকের ভিতরে থাকিয়া 'আমি আমি' করে, যে জনা তোমার বুক থেকে

নামিয়া দাঁড়াইলে ঐ কমনীয় দেহও অমঙ্গল বলিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া যাইবে, সেই মঙ্গলময়ী, সেই শ্মশানবাসিনী মাকে দেখ, প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক দেহে দেখ— চির-মঙ্গল লাভ করিবে ; অমঙ্গল বলিয়া জগতে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

যাহারা শ্মশানবাসিনীর অন্বেষণ করিতেছ, কত কঠোর যোগ তপস্যা সাধনা করিতেছ, তাহারা দেখ —তোমারই বুকের ভিতর প্রাণরূপে তিনি নিত্য বিরাজিতা রহিয়াছেন। জানা কথা বলিয়া উপেক্ষা করিও না ! শ্রদ্ধার সহিত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উহারই শরণাগত হও, শ্মশানবাসিনীর সন্ধান মিলিবে ! কিছু দেখিতে পাও না। কিছু বুঝিতে পার না ! কাহার চরণে শরণ লইবে ? ঐ যে প্রাণ বলিয়া বোধ আছে, প্রাণ বলিয়া একটা বেদন আছে—অনুভূতি আছে ; যাহা সুখের সময় যেন ফুলিয়া উঠে, দুঃখের সময় যেন বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ঐ উহাকে লক্ষ্য করিয়া, উহার দিকে চিত্তের বৃত্তি প্রবাহিত করিয়া মা মা বলিয়া কাঁদ ! উহারই উদ্দেশ্যে তোমার যাবতীয় ভোগ অর্পণ কর, উহারই নিকট তোমার সুখ-দুঃখের সকল কথা নিবেদন কর। তোমার যাবতীয় ভোগ উহারই উদ্দেশ্যে অর্পণ কর, তোমার শ্মশানবাসিনী লাভ হইবে। তুমি শ্যামা মায়ের আদর পাইয়া জীবন ধন্য করিবে।

শুন, 'প্রাণ' বলিলেই একটা অব্যক্ত অথচ সত্য চৈতন্যবোধ নিশ্চয়ই তোমার বুকে ফুটিয়া উঠে। ঐ বোধকে প্রত্যেক পদার্থে লইয়া যাও। রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাণদর্শন করিতে থাক। শরীরে শরীরে প্রাণের চয়ন কর। ইহারই নাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সত্য-প্রতিষ্ঠা যেরূপ প্রথম শিক্ষার সময় নকল বলিয়া মনে হয়, ইহাও প্রথম প্রথম সেইরূপ নকল করা মাত্র মনে হইতে পারে। যথাপি ছাড়িও না। কয়েকদিন নকল করিলেই ইহার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। অথবা যাহারা সত্য-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইয়াছ, যাহাদের চিদাকাশ স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে আর নকল বলিয়া মনেই হইতে পারে না। মনে কর, একটা বৃক্ষ দেখিতেছ, সত্য-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে উহাকে সত্য বলিয়া, মা বলিয়া ধারণা করিলে। প্রাণই সেই সত্যের স্বরূপ। চৈতন্যহীন সত্য নাই, থাকিতে পারে না ; প্রাণের অনুভূতি, প্রাণের উপলব্ধি কিরূপ, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। স্ব স্ব প্রাণের একটা অস্ফুট উপলব্ধি মানুষমাত্রেরই আছে। সেই প্রাণই সম্মুখস্থ বৃক্ষের আকারে দেখা যাইতেছে, এইরূপ ধারণা করিবে। বৃক্ষ দর্শনমাত্র যেন একটা প্রাণময় সম্বেদন ফুটিয়া উঠে। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থে করিতে পারিলেই বিশ্বব্যাপী একটা অখণ্ড প্রাণময় সত্তা বোধে ফুটিতে থাকিবে। ওঃ সে কি লোভনীয় ! কি মধুময় ! এ বিশ্ব একটা ঘন চৈতন্যময় সত্তারূপে উপলব্ধি হইতে থাকে। রূপ রসাদি বিষয় সকলের যে বিভিন্ন সত্তা, তাহা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে জগৎটাকে যেরূপ একটা ঘন সত্য পদার্থ বলিয়া মনে হয়, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে আর তাহা থাকে না। তখন জগতের পৃথক সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল ঘন চৈতন্য। তোমরা যে চিদ্‌ঘন শব্দটা শুনিয়া থাক, উহা যে বাস্তবিক কি বস্তু, তাহা এইখানে আসিলে উপলব্ধি করিতে পারিবে। যথার্থই উহা প্রস্তর অপেক্ষাও ঘন। এইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যিনি সিদ্ধ, মাত্র সেই সাধকই বাহ্য পূজা অর্থাৎ প্রতিমা পূজা করিতে সমর্থ। মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে, উহা যে যথার্থই চিন্ময়ী মূর্তিতে পরিণত হয়, যথার্থই যে বাক্য মনের অতীতা মা আমার সন্তান-স্নেহে আকুলা হইয়া স্থূল ঘনীভূত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তানকে ধন্য করিয়া থাকেন, ইহা প্রাণ-প্রতিষ্ঠ-সাধকগণেরই উপলব্ধিযোগ্য। কিন্তু সে অন্য কথা।

যাহা হউক, সাধককে শরীর হইতে প্রাণের চয়ন করিতেই হইবে। ঐরূপ করিতে করিতেই মহাপ্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় এবং প্রাণই যে জড়ের আকারে আকারিত, তাহারও সম্যক্ উপলব্ধি হয়। জীব ! তোমার বুকের ভিতর যে একটুখানি ক্ষুদ্র চৈতন্যের অনুভব করিয়া থাক, উনিই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী মহাপ্রাণময়ী মা, ইহা না বুঝিয়াই ত' তোমাকে দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, জন্ম-মৃত্যুর উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। রাজরাজেশ্বরী মাকে কাঙ্গালিনী সাজাইয়া মলিন গৃহে বসাইয়া রাখিয়াছ বলিয়াই ত তোমার এই দীনতা এই অবসাদ দূর হয় না। ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, পদার্থে পদার্থে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ; মনে রাখিও—প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না।

জগৎকে সত্য বলিয়া, মা বলিয়া বুঝিয়াছ, উহারই চরণে প্রাণ ঢালিয়া দাও, দেখিবে—তোমার প্রাণই জগৎ আকারে সাজিয়া রহিয়াছে।

প্রাণময়ী মা আমার ! জানি তোমাকে প্রাণ দিলেই জীবত্বের অবসান হয়। জানি, তোমার চরণে সকল প্রাণ নির্বিচারে ঢালিয়া দিতে পারিলেই এই অসুরের অত্যাচার চিরতরে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পারি না যে মা, কিছুতেই তোমার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া আত্মহারা হইতে পারি না। অনাথ দুর্বল ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞান সন্তান আমরা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লও। কেমন করিয়া তোমাকে প্রাণ অর্পণ করিতে হয়, তাহা কিছুইত' জানি না। আমাদের প্রাণ যে সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসাবে একান্ত বিমূঢ়। কেমন করিয়া তোমাকে দিব মা ? তুমি কৃষ্ণ, মহা আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের এই প্রাণবিন্দু তোমার মহাপ্রাণসিন্ধুতে মিলাইয়া লও ! আমরা ধন্য হই, তোমার পতিতপাবনী মা নাম সার্থক হউক। শুনিতে পাই—শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে তুমি গোপ-গৃহে ননী চুরি করিতে গিয়া গোপীগণের প্রাণও নাকি হরণ করিয়াছিলে, আমাদের প্রাণও তেমনি করিয়া হরণ কর। আমি ত' স্বেচ্ছায় তোমাকে কিছুতেই প্রাণ দিব না। আমাকে জানাইয়া আসিলে, আমার সম্মুখ দিয়া আসিলে যে তোমাকে তাড়াইয়া দিব ; পাছে তোমার সেই ত্রিলোক-মোহিনী মূর্তি দেখিয়া অকস্মাৎ যদি প্রাণ দিয়া ফেলি, এই ভয়ে আমার সকল দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি। তাই বলি, তুমি লুকাইয়া চোরের মত অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার প্রাণ চুরি কর। ওগো দয়া করে চুরি কর। তাহা হইলেই আমরা সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদ লইয়া এ বিতপ্তবক্ষ শীতল করিতে পারি। সাধক ! যতদিন প্রাণ অর্পণ পরিসমাপ্তি না হয়, এস ততদিন এমনই করিয়া কাঁদি। দয়া করিয়া— না না দয়া নয়, পুত্রস্নেহে আকুলা হইয়া একদিন না একদিন মা নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

সে যাহা হউক, সাধক ! তুমি জগৎময় মাতৃদর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছ ; ঐ মা-ই যে প্রাণ, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। অন্তরে যখন অসুরভাবসমূহ একটির পর একটি আসিয়া শান্তির উপকূল ভাঙিয়া দিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটিকে ধরিয়া প্রাণরূপে দর্শন করিতে হয়। প্রাণই যে ঐ সকল বিভিন্ন মূর্তিতে আসিতেছে, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হয়। স্মরণ কর প্রথম খণ্ডের লিখিত সন্দেশের দৃষ্টান্ত বাহিরের আকার যেরূপই হউক, উহা যে প্রাণ ব্যতীত অন্য কেহ নয়, এরূপ বোধ জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাই অসুর-শরীরে প্রাণের চয়ন। কয়েকদিন এইরূপ অনুশীলন করিলেই প্রাণময় গ্রন্থি খুলিয়া যাইবে। প্রাণ বলিলেই যে বুকের মধ্যে একটুখানি ছোট প্রাণ মনে হয়, এই অজ্ঞান দূরীভূত হইবে। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে। তখন দেখিতে পাইবে—এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ তোমার প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তখন আত্ম-প্রাণের মহাপ্রসার দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, নিজেকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত নিত্য শান্তিময় বলিয়া বুঝিতে পারিবে। অথবা তখন সাধকের যে কি আনন্দ কি মধুময় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

এই মন্ত্রে সিংহের দুইটি বিশেষণ আছে—**'মহানাদ-মুৎসৃজন্'** এবং **'ধূতকেশরঃ'**। সিংহ যখন অসুরদেহে প্রাণ চয়ন করিতেছিল, তখন ভীষণ শব্দ করিতেছিল এবং তাহার কেশরসমূহ কম্পিত হইয়াছিল। প্রথম বিশেষণে উল্লাস এবং দ্বিতীয় বিশেষণে ক্রোধ সংসূচিত হইয়াছে। আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে সমূলে বিলয় করিবার জন্য উল্লাস ও ক্রোধ আবশ্যক। পূর্ণ উদ্যমে আসুরিক বৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয় ! মাতৃচরণস্পর্শে ধন্য ও মহান উৎসাহসম্পন্ন জীব— সিংহ, মাতৃ-প্রেরিত ক্রোধ ও উল্লাসের অভিনয় করে। ইহা বন্ধনের হেতু নহে ; বন্ধনবিমুক্তির উপায় বা বাহ্যলক্ষণ মাত্র। সাধক ! তুমিও উচ্চৈস্বরে মা মা বলিয়া অগ্রসর হইবে। যখন অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে স্বকীয় প্রাণের মহাপ্রসার দেখিতে পাইবে তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না, আর নিজেকে দুর্বল অবসাদগ্রস্ত জীব বলিয়া মনে করিতে পারিবে না, বিরাট প্রাণের উল্লাস দেখিয়া তুমিও মহোল্লাসে মা মা রবে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। তোমার সে মাতৃ-আহ্বানে বায়ুমণ্ডল পবিত্র হইবে। যাহারা সে আহ্বান শুনিবে, তাহারাও প্রজ্বলিত অনলাভিমুখে পতঙ্গের ন্যায় মা মা বলিয়া আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইবে। ওঃ সে অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াও প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

———o———

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৬৮॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধঃ।

অনুবাদ। সেই যুদ্ধস্থলে দেবীর সেই সৈন্যসমূহ, অসুরদিগের সহিত এরূপভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, স্বর্গে দেবতাগণ (সন্তুষ্ট হইয়া) তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় উপাখ্যানে
দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে মহিষাসুরসৈন্যবধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। গণসৈন্য ও তাহাদের যুদ্ধ বিবরণই ইতি-পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেবতাগণের পুষ্পবর্ষণের তাৎপর্য—আশীর্বাদ ও শক্তিদান। জীব যখন মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মাতৃ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ অব্যর্থ অস্ত্র লইয়া অসুরকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকে, তখন দেবতাবৃন্দ শক্তি ও বিজয়াশীর্বাদ দিয়া জীবকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতে থাকেন। জীব যতদিন অসুরশক্তির পোষণ করে, ততদিন দেবশক্তি নির্জিত থাকে, কিন্তু একবার সাহস করিয়া অসুরশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইলেই দেবশক্তি উৎসাহসম্পন্ন ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গীতায়ও ঠিক এই কথাই আছে—জীবগণ দেবশক্তির পোষক, আবার দেবতাবৃন্দও জীবগণের শ্রেয়োবিধায়ক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের অভ্যুদয়-সাধক। জীব যতদিন এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, ততদিনই দেবতাদের নিকট হইতে আশীর্বাদ ও শক্তি লাভ করিয়া উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ মায়ের কৃপায় জীবের নিশ্বাস পর্যন্ত অসুরশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। আজ জীব সর্বতোভাবে অসুরশক্তি বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত, তাই দেবশক্তি প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ ও শক্তি দান করিতেছেন।

সাধক ! তুমি যদি অতি অল্পমাত্রও সাধনার পথে অগ্রসর হও, অমনি দেখিবে অন্তরস্থ দেবতাবৃন্দ তোমার সাধনার গতিকে আরও খরতর করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিতেছেন ; যতদিন নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম বলিয়া সাধনা হইতে দূরে থাকিবে, ততদিন যথার্থই উহা বন্ধুর ও কণ্টকময় প্রতীতি হইবে। কিন্তু তুমি একপাদমাত্র অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে—ভগবান তোমার দিকে তিন পাদ অগ্রসর হইয়াছেন ! 'আমি সংসারী, আমি বিষয়াসক্ত, আমি কামিনী-কাঞ্চনপ্রিয়, সুতরাং আমার পক্ষে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব'—এই বলিয়া ভীত বা পশ্চাৎপদ হইও না। যে যেরূপ অবস্থায় আছ, ঐ অবস্থার ভিতর দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়। কিছুই ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হয় না, শুধু পাইবার ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তখন সমস্ত দেবশক্তি তোমার অনুকূলে দাঁড়াইয়া তোমাকে আশীর্বাদ ও শক্তিপ্রদানে অগ্রগতির সামর্থ্য প্রদান করিবে।

এস ভীত সন্ত্রস্ত সন্তান ! এস ত্রিতাপদগ্ধ সন্তান ! এস সকলে মিলিয়া সমস্বরে মা বলিয়া ডাকি, দেবতাগণ আমাদের মস্তকেও পুষ্পবৃষ্টি করুন। আমরা ধন্য হই।

—o—

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋষিরুবাচ।

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্॥ ১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর অসুরসৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য সক্রোধে অম্বিকার প্রতি ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এ পর্যন্ত অসুর-সৈন্যদলের নিধন-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ; এইবার সেনাপতিগণের যুদ্ধ ও নিধন-কাহিনী ব্যাখ্যাত হইবে। মাতৃ কৃপায়—আত্মাভিমুখী প্রকৃতির আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে আসুরিক ভাবসমূহ নির্জিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা রজোগুণের প্রধান কার্য-শক্তি—যাহাদের বিলয়সাধন না করিলে পুনরায় আসুরিক বৃত্তির উৎপীড়ন-আশঙ্কা বিদূরিত হয় না, এতদিনে তাহাদের প্রতি সাধকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি—বিক্ষেপশক্তিই চিক্ষুর। যে শক্তি-প্রভাবে আমরা মাকে দেখিতে পাই না, যাহার প্রভাবে আমার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে না করিতেই রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হইয়া পড়ি, উহাই অজেয় অসুর চিক্ষুর। এই চিক্ষুর অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যতটা বেগ পাইতে হয়, বোধ হয় এতটা বেগ আর কিছুতেই দরকার হয় না। কত সাধক এই বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য কত রকম যোগ কৌশল হঠক্রিয়া প্রাণায়াম, কত রকম কঠোর ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা—কোন উপায়ে চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত হইলে, পরমাত্মস্বরূপ স্বতঃই উদ্ভাসিত হইবে ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ জলচন্দ্রের উল্লেখ করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে—জলের তরঙ্গায়িত অবস্থার নিবৃত্তি হইলেই চন্দ্রবিম্ব পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ হয় ; তজ্জন্য কোন প্রয়াস প্রয়োজন হয় না। এ সিদ্ধান্তও যে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে এরূপ সাধক কেহ আছেন কিনা বলিতে পারি না, যিনি বিক্ষেপের হাত হইতে পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। যতদিন দেহ আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে যে বিক্ষেপ আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবের নামই জীব। তবে কঠোর সংযম, তীব্র বৈরাগ্য ও দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে বিক্ষেপের মাত্রা কথঞ্চিৎ হ্রাস পায় মাত্র।

আমরা কিন্তু অন্য পথের সন্ধান পাইয়াছি— যাহা বর্তমান দেশ, কাল ও অধিকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মা আমাদিগকে সেই সরল সহজ পন্থায় যাইবার জন্য ভূয়োভূয় ইঙ্গিত করিতেছেন। উহা ঋষিজন সেবিত বৈদিকমার্গ। আমরা বিক্ষেপ বিক্ষেপ করিয়া ব্যস্ত হইব না। আমরা সরল প্রাণ শিশুর মত মাতৃ-চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া পূর্ণ নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থান করিব। বিক্ষেপই হউক আর আবরণই হউক, কিংবা যত রকম অত্যাচারই হউক, সর্বাবস্থায়ই মাতৃ-চরণে পূর্ণ নির্ভরতামাত্র লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইব। ও সকলের ব্যবস্থা যাহা করা আবশ্যক, তাহা স্বয়ং মা-ই করিয়া দিবেন। আমরা মাতৃ-অঙ্কস্থিত আনন্দময় নগ্ন শিশু। ও সকলের বিচার বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। সে অধিকার কিংবা সামর্থ্যও আমাদের নাই। এস সাধক ! আমরা মা বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে মহাশক্তির স্নেহময় অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ি। আমাদের যত কিছু সাধনা তপস্যা সবই মা করাইয়া লইবেন। আমাদের কিসে ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে, সে বিবেচনা আমাদিগের অপেক্ষা মা-ই বেশি বুঝিতে পারেন ; সুতরাং কেন আমরা দিবারাত্র বিষয় নিয়া কিংবা সাধনা নিয়া মাথা ঘামাইতে যাইব ! যুদ্ধ করিতে হয়, মা করিবেন, বিক্ষেপ দূর করিতে হয়, মা-ই করিবেন, আমরা দ্রষ্টা মাত্র— মায়ের বিচিত্র লীলা দেখিয়া যাইব। সুখে-দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে, বিক্ষেপে-স্থৈর্যে, সর্বাবস্থায়ই আমি দ্রষ্টা, আমি মাতৃ-অঙ্কস্থিত আনন্দময় নির্বিকার নগ্ন শিশু।

আরে, যদি বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারি যে সত্য-সত্যই আমার প্রাণই আমার মা, তিনি পুত্রস্নেহে আকুলা, যাহাতে আমাদের ভাল হয়, প্রতিনিয়তই তাহা করিতেছেন, তবে আর আমার ভাবিবার বিষয় কি থাকিতে পারে ? তাই মন্ত্রেও দেখিতে পাই—'**যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্ !**' অসুর অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। আমার সহিত ত' যুদ্ধ করিতে আসে নাই। বিক্ষেপই হউক, আবরণই হউক, কিংবা দম্ভ, দর্প, অভিমান, মোহ

প্রভৃতিই হউক, তাহাতে আমার কি ? আমার সহিত কোন যুদ্ধ নাই। আমি ধীর, স্থির, লীলাদর্শী মাত্র। তাই অসুরগণ আমাকে ছাড়িয়া অম্বিকার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেখ, আত্মসমর্পণ-যোগীর কত সুবিধা। মহাসুর চিক্ষুর যুদ্ধ করিতে গেল মায়ের সঙ্গে। যোগী অসুর-নিধনমাত্র দেখে না, দেখে মায়ের খেলা। আত্মসমর্পণ-যোগীর— **'মামেকং শরণং ব্রজ'** মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ সাধকের যে সকল অবস্থা—বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই চণ্ডীতত্ত্বে বর্ণিত। এ কথা পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে, এখানে আবার তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আত্মসমর্পণই সাধনা। অনেক অবস্থার ভিতর দিয়া সাধক ইহার সন্ধান পায়। এই সাধনায় সিদ্ধ হইলে, সাধকের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মাতৃশক্তি বিকাশের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। ইহা দেখাইতে গিয়াই দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি, সুরথ সমাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া অভূতপূর্ব রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন। অসুরনিধন অবলম্বনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উন্মেষ করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

পূর্ব পরিচ্ছেদে দেবীর বাহন সিংহের যুদ্ধবিবরণে জীবের যে পুরুষকার প্রয়োগ বলা হইয়াছে, উহার সহিত আত্মসমর্পণ বা পূর্ণ নির্ভরতার কোন বিরোধ নাই। কারণ মাতৃশক্তিই জীবদেহরূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া পুরুষকার-রূপে প্রযুক্ত হয়। জীব যতদিন আত্মসমর্পণের আস্বাদ না পায়, ততদিন পুরুষকার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। ওরে, পুরুষকারের পুরুষই যে মা ! পুরুষকে না জানিলে, তাহার কৃতি বা কার্য কিরূপে দেখিতে পাইবে ? স্বপ্নেও কেহ ভাবিও না—মাতৃ-চরণে পূর্ণ নির্ভরতা আসিলে মানুষ জড়বৎ অবস্থান করে। যথার্থ কর্মশক্তি আত্মসমর্পণ-যোগীর ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়। তাই বলি সাধক, আত্মসমর্পণের সাধনা কর। আত্মসমর্পণে অগ্রসর হও। মনে রাখিও, আত্মসমর্পণ ব্যতীত আত্মলাভ হয় না। মহাপ্রাণ চাও ত' তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ মায়ের প্রাণে মিলাইয়া দাও ! তোমার ছোট আমিটাকে ভুলিয়া যাও, মায়ের আমিকে—শ্রীগুরুর আমিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধর। দেখিবে কত শত অসুর নিহত হইবে, কত লীলার অভিনয় হইবে ; অথচ তোমাতে কর্তৃত্বের লেশও স্পর্শ করিবে না। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। তুমি যে চিরদিনই দ্রষ্টা সাক্ষিমাত্র, ইহা যথার্থ উপলধি করিয়া, বন্ধনমুক্তির কল্পিত ধাঁধা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥ ২॥

অনুবাদ। সুমেরু পর্বতের শিখরে মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় সেই অসুর সমরক্ষেত্রে দেবীর প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রোক্ত দৃষ্টান্তটি বড় সুন্দর। মেঘ যে জল বর্ষণ করে, তাহা সুমেরু পর্বতের শিখরদেশে নিপতিত হয় না, কারণ সুমেরুশৃঙ্গ এত উচ্চ যে তথায় মেঘসমূহ যাইতেই পারে না।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন **'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাম্'**, মেঘসমূহ হিমালয় পর্বতের মেখলা অর্থাৎ কটিদেশ পর্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে ; তদূর্ধ্বে উঠিতে পারে না। সুমেরুশিখর হিমালয় অপেক্ষাও অনেক অধিক উন্নত ; সুতরাং সেস্থানে মেঘসমূহের জলবর্ষণ কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। ঠিক এইরূপ মহাসুর চিক্ষুর অজস্র বাণবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু তাহা দেবীর অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারিল না।

মা যে আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপা অবাঙ্মনোগোচরা, —মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দৃশ্যবর্গের পরপারে অবস্থিতা ; সুতরাং চিত্তবিক্ষেপজনিত অত্যাচার তাঁহাতে স্পর্শ করিবে কিরূপে ? তাই চিক্ষুরের শরজাল মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারে নাই। আরে, মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যাঁহার সত্তায় ও প্রকাশে মনের সত্তা ও প্রকাশ, মনশ্চাঞ্চল্য তাঁহাকে উৎপীড়িতে করিবে কিরূপে ? যতদিন মায়ের স্বরূপ জানা না যায় ততদিনই অসুরের ভয়, ততদিনই বিক্ষেপনিবারণকল্পে কত কি আয়োজন উদ্যম। মা যে আত্মা, তিনি নিত্য অসঙ্গ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। বিক্ষেপ যেরূপ চিত্তধর্ম, নিরোধও সেইরূপ চিত্তেরই ধর্ম। সমাধি ও চাঞ্চল্য উভয়ই চিত্তের উপরে যাইতে পারে না, সুতরাং চিত্তের ধর্ম চিন্ময়ীর অঙ্গ কিরূপে স্পর্শ করিবে ?

তস্য ছিত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈযন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ৩॥
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতি সমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ॥ ৪॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবী অবলীলাক্রমে তাহার (চিক্ষুরের) শরনিকর ছেদন করিয়া, বাণসমূহের দ্বারা অশ্বগণ ও অশ্বচালক সারথিকে নিহত করিলেন। এবং শরপ্রয়োগে তৎক্ষণাৎ ধনু ও অতিসমুচ্ছ্রিত ধ্বজচ্ছেদন-পূর্বক, সেই ছিন্নধনু অসুরের গাত্র বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে চিক্ষুর নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারে নাই। এইবার মাতৃবিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মা ছয়টি কার্য দ্বারা আত্মশক্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। (১) চিক্ষুরনিক্ষিপ্ত বাণচ্ছেদন (২) অশ্বনিধন (৩) সারথিনিধন (৪) ধনুঃকর্তন (৫) উন্নত ধ্বজচ্ছেদন (৬) চিক্ষুরের সর্বাবয়ব বাণবিদ্ধকরণ। এস সাধক ! ক্রমে আমরা এই ছয়টি ক্রিয়ার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি।

প্রথম — চিক্ষুরের বাণচ্ছেদন। চিত্তক্ষেত্রে বৈষয়িক চঞ্চলতা-উৎপাদক বেগই চিক্ষুরের বাণ। উহা ছেদনের উপায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ শরনিক্ষেপ। যখনই চিত্তে বৈষয়িক স্পন্দন উঠিবে, অমনি উহাকে বিরাট প্রাণের স্পন্দন বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। মহাপ্রাণময়ী মা আমার অন্তরে থাকিয়া বিষয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। রূপরসাদি কিংবা কাম কাঞ্চনাদি সকলই আমার প্রাণ—আমার মা। এইরূপ বোধের প্রবাহ কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে পারিলেই বিষয়ের স্পন্দন নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

দ্বিতীয়—অশ্ব-নিধন। অশ্ব শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। শ্রুতি বলেন— ইন্দ্রিয়সমূহই অশ্বস্থানীয়। চিত্তক্ষেত্রস্থ বৈষয়িক স্পন্দনগুলি ইন্দ্রিয়-অশ্বের সাহায্যেই বিষয় পর্যন্ত উপস্থিত হয়। রূপরসাদি বিষয় পঞ্চকই ইন্দ্রিয়-অশ্বের গম্য বা ভোগ্যস্থান। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগ কৌশলে বৈষয়িক স্পন্দনকে প্রাণরূপে দর্শন করিলেই ইন্দ্রিয়বেগ সমূহও প্রাণময়ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহাদের বিষয়াভিমুখ গতি নিবৃত্ত হয়। ইহাই অশ্ব-নিধনের তাৎপর্য।

তৃতীয়— অশ্বচালকনিধন। ইন্দ্রিয়-অশ্বের চালক —মন ; ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণময় হইলে, তাহার পরিচালক মন সুতরাং প্রাণময় হইয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়বাহিত বিষয়সমূহ মনেই আহিত হয়। যতক্ষণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কেবল রূপরসাদি বহন করিয়া মনকে উপহার দেয়, ততক্ষণ মন বৈষয়িক পরিচ্ছিন্নতা ও জড়তায় মুগ্ধ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণময় হইলে উহারা রূপরসাদি আকারে একমাত্র প্রাণকেই বহন করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের নিকট যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সকলই প্রাণরূপে আসে, সুতরাং মনের বৈষয়িক ভাব, বহুত্ববিষয়ক সংকল্প-বিকল্প সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই অশ্বচালক নিধন রহস্য।

চতুর্থ— ধনুচ্ছেদ। ধনুচ্ছেদ অর্থে কর্মধনুর ছেদন। সর্বত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে, অন্তরে বাহিরে মহাপ্রাণের প্রসার দেখিয়া কর্মেন্দ্রিয়নিচয় এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, বিষয়-আহরণরূপ অহঙ্কারমূলক কর্ম হইতে বিরত হয়। ইহাই চিক্ষুরের ধনুচ্ছেদন।

পঞ্চম—উচ্ছ্রিত ধ্বজচ্ছেদন। অহংকর্তৃত্বজ্ঞানই উন্নত ধ্বজ। বিশ্বময় প্রাণ দর্শন করিতে থাকিলে, বিশ্বের যাবতীয় কর্ম যে প্রাণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। 'কই আমি ত' কিছুই করি না, সবই ত' প্রাণময়ী মায়ের মহতী ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে !' **'প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্'**। ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই ত' আমার প্রাণস্বরূপিণী মায়ের বশে রহিয়াছে। এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর কর্তৃত্ব জ্ঞানের উচ্চ ধ্বজ কিরূপে থাকিবে ?

ষষ্ঠ—চিক্ষুরের সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধকরণ। পূর্বোক্ত প্রকারে মহাসুর চিক্ষুর যখন ছিন্নধজা ও বি-সারথি হয়, তখন মা উপযুক্ত অবসর পাইয়া উহার সর্বাঙ্গ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকেন। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগই মায়ের বাণ-নিক্ষেপ। চিত্তগত প্রত্যেক স্পন্দনটিকে প্রাণরূপে বুঝিবার চেষ্টাই মায়ের বাণ-নিক্ষেপ। যখন বিক্ষেপশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন দৃঢ় অধ্যাবসায়ের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিলেই চিক্ষুর বা বিক্ষেপশক্তি (প্রাণময় হইয়া) বৈষয়িক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

অভূতপূর্ব রণকৌশল ! যাহারা প্রাণ প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত

সাধক, তাঁহারাই এই সংগ্রাম রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিবারাত্রিমধ্যে অন্ততঃ একবারও যদি এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে সাধনমার্গ নিশ্চয়ই অতিশয় সুগম হইয়া পড়ে ! আরে, পূর্বে সত্য-প্রতিষ্ঠার অভ্যাসকালে মা বলিলে একটা অজ্ঞেয় বস্তুর সত্তামাত্র বুঝিতে পারিতে, মাকে দূরে দেখিতে, কোথায় কোন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরপারে মা আছেন বলিয়া বুঝিতে ; কিন্তু মায়ের স্বরূপ জানিতে না। এখন গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিতেছ, তোমার হৃদয়ানুভূত প্রাণই মা। এত নিকটে তিনি, এত প্রিয় তিনি, যাঁর সত্তায় তোমার সত্তা, যাঁর অস্তিত্বে তোমার সকল অস্তিত্ব, যিনি আছেন বলিয়া, তোমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ—যত কিছু ; সেই প্রাণই তোমার মা। যিনি এই মুহূর্তে তোমার বুক হইতে নামিয়া দাঁড়াইলে, আর তোমার বলিতে কিছুই থাকে না ; সেই প্রাণই তোমার মা। প্রত্যেক পদার্থে পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে ভাবে চয়ন করিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমার ঐ একটুখানি প্রাণই বিশ্বপ্রাণ। আবার চিত্তের বিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেও বুঝিতে পারিবে—চিত্ত বলিতে বা বিক্ষেপ বলিতে যাহা কিছু সকলই প্রিয়তম প্রাণ। একান্ত আশ্রয় প্রাণরূপিণী মা ব্যতীত কোথাও কিছু নাই।

———○———

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। এইরূপে চিক্ষুরের ধনুঃ ছিন্ন, রথ ভগ্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, সেই অসুর খড়্গ ও চর্ম ধারণপূর্বক দেবীর প্রতি ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। খড়্গ ও চর্ম শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই এই মন্ত্রের অর্থ সুগম হইবে। খড়্গ দ্বিধাকারক অস্ত্র। ভেদজ্ঞানের নাম খড়্গ। প্রাণ ব্যতীত—মা ব্যতীত আমার এবং এই জগতের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, এইরূপ উপলব্ধির অভাববশতঃই অজ্ঞান উপচিত হয়। মনে হয়, মা একজন, আর এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও, দীর্ঘকাল বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও অন্তর হইতে ঐ ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইতে চায় না। ইহাই বিক্ষেপের অস্ত্র—ইহাই চিক্ষুরের খড়্গ। মা হইতে আমাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার ইহাই সর্বপ্রধান সাধন।

চর্ম—চলিত কথায় ইহাকে ঢাল বলে। মিলনের অন্তরায় মলিনতাই চর্ম স্থানীয়। ভেদজ্ঞান যেরূপ আত্মা হইতে জীবকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন করায়, মলিনতাও সেইরূপ ভেদবুদ্ধি দূর করিবার উদ্যমকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমরা যখনই মা বলিয়া ঝাঁপ দেই—যখনই মাতৃ-বক্ষে একেবারে মিলাইয়া যাইবার আশায় অগ্রসর হই, তখনই জীবত্বের মলিনতা মাতৃ-মিলনের অন্তরায় স্বরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। মা যে আমার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মা, আর আমরা অশুদ্ধ, অনিত্য, অজ্ঞান ও অনাত্মবোধযুক্ত ; তাই আমরা মিলাইতে পারি না। তাই চিরসন্তপ্ত বুকখানা মায়ের স্নেহশীতলবক্ষে স্থাপন করিয়া আত্মহারা হইতে পারি না। তাই অনেক সময় বলিতে বাধ্য হই, মুক্তির কোনও প্রয়োজনই ছিল না, যদি অমুক্ত অবস্থায় থাকিয়া পূর্ণভাবে মাতৃস্নেহ ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায় ! তাহা যে কোনমতেই হইতে পারে না। মাকে ভালবাসিতে গেলে, যথার্থ মাতৃস্নেহ ভোগ করিতে হইলে, আমাদিকেও মায়ের মত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত হইতেই হইবে। যতদিন আমাদের আমিত্বের রেখামাত্রও আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে, আমরা মাকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, মহাপ্রাণময়ী মায়ের অঙ্গে আমার ব্যষ্টি প্রাণবিন্দুটুকু ঢালিয়া দিতে পারি নাই। বদ্ধ প্রাণ কিরূপে মুক্ত আত্মাকে ভালবাসিবে ! তাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, 'জীব কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। জীব চিরদিনই জীব থাকিবে। জীবের পক্ষে ঈশ্বর হওয়ার চিন্তা করাও পাপ।' কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বিন্দুমাত্র জীবভাব থাকিতেও ঈশ্বরত্ব লাভ হইতে পারে না।

জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব আলোক অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ। জীবত্ব থাকিতে ব্রহ্মত্ব অধিগত হয় না, আবার ব্রহ্মত্বে উপনীত হইলে জীবত্বের গন্ধও থাকে না। তবে জীব যখন পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সন্ধান পায়, তখন একটু একটু করিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে পরিপক্কাবস্থায় ঐ প্রেম ঘনীভূত হইয়া, জীবকে আত্মহারা করিয়া দেয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সত্তাই খুঁজিয়া পায় না। এই অবস্থায় জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন

হইয়া যায়। তাই গীতায় রাজগুহ্যযোগে ভগবান বলিয়াছেন— **'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'**—যাঁহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন, এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় জীবের সহিত ভগবানের একটা ভেদের রেখামাত্র থাকে, বস্তুতঃ ক্ষণে ক্ষণে অভেদ অদ্বয় স্বরূপটিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। বিদেহ বা কৈবল্য অবস্থায় ঐ ভেদের রেখাও থাকে না। ইহাই পূর্ণ প্রেম বা পরম সাযুজ্য।

যাহা হউক, আমরা প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মহাসুর চিক্ষুরের খড়্গ ও চর্ম অর্থাৎ ভেদজ্ঞান ও মলিনতাই আমাদের এই পূর্ণ প্রেমময় অবস্থায় উপনীত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। সাধক ! যখন তুমি 'প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে' বলিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াও, মাকে প্রাণরূপে —আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, তখন কে তোমাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় ? ঐ **'খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ'**। ঐ খড়্গচর্মধারী মহাসুর চিক্ষুর। একবার অন্তরে অন্তরে এ অত্যাচার উপলব্ধি কর।

———○———

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৬॥

অনুবাদ। অতি বেগবান মহাসুর চিক্ষুর তখন তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত করিয়া, দেবীর বামহস্তে আঘাত করিল।

ব্যাখ্যা। খড়্গ— অতি তীক্ষ্ণধার। মা একজন, আর আমি একজন, এই ভেদবুদ্ধি অনাদিজন্মসঞ্চিত। তাই দুরপনেয়, তাই অতি তীক্ষ্ণ। মুখে সহস্রবার **'ব্রহ্মাস্মি, সোঽহমস্মি'** বলিলে কি হইবে ? ঐ তীক্ষ্ণধার অসির তীব্র আঘাত হইতে পরিত্রাণ নাই। এই ভেদজ্ঞানের প্রথম কার্য— সিংহের মস্তকে আঘাত—জীবের উত্তমাঙ্গ বা অভেদজ্ঞানবিষয়ক সংস্কারকে খণ্ডিত করা। চিক্ষুরের খড়্গাঘাত প্রথমে সিংহের মস্তকেই হইয়া থাকে। আরে, জীবই ত' মনে করে—আমি অশুদ্ধ, আমি ক্ষুদ্র জীবমাত্র, আমি কি করিয়া ব্রহ্ম হইব ; বড় সুন্দর রণকৌশল। সাধক ! একবার নিজ নিজ অধ্যাত্ম-জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, এই কথাটি— সিংহের মস্তকে চিক্ষুরের খড়্গাঘাতটি কত সত্য ! শুধু উহারই জন্য তুমি মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছ। শুধু উহারই জন্য তুমি অনন্ত জন্মমৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতেছ !

তারপর আর এক আঘাত মায়ের বামহস্তে। মা আমার দক্ষিণ হস্তে শত্রু-নিপীড়ন এবং বাম হস্তে পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুহূর্তের তরেও অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করেন না, তাই অসুর মায়ের বামহস্তে আঘাত করিয়া আমাদিগকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। আমাকে মাতৃ-অঙ্ক-চ্যুত করিতে পারিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা ত' মাকে ধরিয়া রাখি নাই। মা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাই পরাক্রান্ত অসুরগণ আজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় —আকর্ষণী শক্তি মায়ের বাম হস্ত। প্রকৃতির আত্মাভিমুখী গতির নাম মায়ের আকর্ষণী শক্তি। বস্তুতঃ আত্মার দিক হইতে একটা আকর্ষণ আরম্ভ হয় বলিয়াই বহির্মুখী প্রকৃতি আত্মাভিমুখী হইতে থাকে। ইহাই বৃন্দাবনধামে কদম্বতরু-মূলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আকর্ষণে গোপীগণের কুলত্যাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন অন্তরে অন্তরে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকে, তখন বাহিরে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহারই নাম নিবৃত্তি। তখন ধীরে ধীরে বিষয়াসক্তি হ্রাস পায়। এই নিবৃত্তিই মায়ের বাম হস্ত। অন্তরে যাহা মাতৃ-আকর্ষণ, বাহিরে তাহাই নিবৃত্তি-ধর্মরূপে প্রকাশ পায়। যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র এই নিবৃত্তি-মার্গেরই উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের দক্ষিণ হস্ত প্রবৃত্তি নামে অভিহিত। সে সকল কথায় এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই, অথবা বাম হস্ত ভালরূপে বুঝিতে পারিলে, দক্ষিণ হস্ত অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

এখন দেখ, অসুর যদি মায়ের বাম হস্তকে দুর্বল, অকর্মণ্য করিতে পারে, তবেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না কি ? যদি আমাকে নিবৃত্তি ধর্ম হইতে বিচ্যুত করতে পারে, তবে আবার আমি অসুরের কিঙ্কর হইয়া চিরজীবনের তরে দাসখত লিখিয়া দিব ; এই আশায়ই চিক্ষুর মায়ের বাম হস্তে আঘাত করিয়াছে। বলিয়াছি, মা আমাদিগকে বাম হস্তে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সেই কথাটাও এইবার বুঝিয়া লও। নিবৃত্তি-ধর্মের সাহায্যেই সাধক আত্মসমর্পণের পথে অগ্রসর হয়। সমস্ত ভার মায়ের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে ! দেখ— তোমার চিত্তক্ষেত্রে এই যে অসুরের অত্যাচার চলিতেছে, এই যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বিক্ষোভ চলিতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র তোমাকে বিব্রত হইতে হয় না, ইহার কারণ কি ? মা তোমায় আকর্ষণশক্তি বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, তুমি যথাসাধ্য আত্মসমর্পণযোগের সাহায্যে মাতৃ-অঙ্কস্থ হইয়াছ, তাই তোমার নিশ্চিন্ততা, তাই তোমার অভয় ভাব। শত ঝঞ্ঝাবাত, সংসারে সহস্র উৎপীড়ন আসিয়াও যে তোমাকে ব্যথিত করিতে পারে না, তাহার একমাত্র হেতু, মা তোমাকে অঙ্কে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তোমাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিবার আশায়ই চিক্ষুর মায়ের সব্যহস্তে আঘাত করিল।

———○———

তস্যা খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৭॥

অনুবাদ। হে নৃপনন্দন সুরথ ! সেই অসুরের খড়্গখানা দেবীর হস্তস্পর্শে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন সে ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল।

ব্যাখ্যা। বিশারণ বা ভঙ্গ অর্থবোধক ফল্ ধাতু হইতে পফাল পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। পফাল শব্দের অর্থ ভগ্ন হইয়াছিল। মায়ের বামহস্তখানি অকর্মণ্য করিয়া আমাকে অঙ্ক-চ্যুত করিবার আশায় চিক্ষুর যে খড়্গাঘাত করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল, খড়্গাঘাত ব্যর্থ হইল, আমাকে মাতৃ-আকর্ষণ হইতে, নিবৃত্তির পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। কেন ? আমি ত' আর মাকে ধরি নাই যে, আমার হাতখানা ছাড়াইতে পারিলেই অসুরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি দুই হাত তুলিয়া —প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়হস্ত উত্তোলিত করিয়া, মায়ের জয়ধ্বনি ও আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আমার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই। উভয়হস্ত উত্তোলিত দেখিয়া মা আমায় দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন ; সুতরাং ভয় কি? আমার হস্তে অসুরের খড়্গাঘাত হইলে, নিশ্চয়ই হস্তস্খলিত হইত ; কিন্তু এ যে মায়ের হাত, এখানে অসুরের খড়্গই ভগ্ন হইয়া গেল।

জীব ! যতদিন তুমি নিজে সাধনা করিয়া মাকে পাইবার চেষ্টা করিবে, ততদিন প্রতিপদে অসুরের আঘাত সহ্য করিতে হইবে। তুমি কেবল নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বনই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিও না, আবার প্রবৃত্তির বশেও উচ্ছৃঙ্খল হইও না ; নিত্যই যে মায়ের কোলে অবস্থিত রহিয়াছ, ইহা মর্মে মর্মে বুঝিয়া লও। নিবৃত্তির প্রয়োজন হয়, মা করাইয়া দিবেন। প্রবৃত্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, মা করাইয়া দিবেন। তুমি শুধু দৃঢ় বিশ্বাসে ধারণা করিয়া লও—'আমি আশ্রিত, মা আশ্রয়'।

যাহা হউক অসুরের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভেদজ্ঞান কার্যকরী হইল না দেখিয়া চিক্ষুর শূল গ্রহণ করিল। এই শূল কি ? মূল অজ্ঞান। 'আমাকে আমি জানি না', ইহাই মূল অজ্ঞান। অগণিত জন্মমৃত্যু, অসংখ্য জীব জগৎ, এই একটিমাত্র অজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অতি সূক্ষ্মাগ্রভাব লৌহনির্মিত অস্ত্রকে শূল কহে। এই মূল অজ্ঞানও অতি সূক্ষ্ম, ইহার যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করা বড়ই দুরূহ। যাবতীয় বিষয়জ্ঞান বা অজ্ঞান, একমাত্র আত্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ সূক্ষ্মাগ্র শূলের উপরে অবস্থিত। এই যে এত বড় জগৎ-প্রপঞ্চ, এই যে অনন্ত বৈচিত্র্য, এই যে অনাদি জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ, এই যে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এই যে সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং আগামী কর্ম-বীজরাশি, এই সকলই 'আমাকে আমি জানি না' রূপ মূল অজ্ঞান স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি গুরুর কৃপায় ঐ মূল অজ্ঞানটি কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তবে ভিত্তিহীন রাজপ্রাসাদের ন্যায় অকস্মাৎ জগৎপ্রপঞ্চ বিলয় প্রাপ্ত হয়। বহু সাধনার ফলে সাধকগণ এই মূল অজ্ঞানের সমীপস্থ হইতে পারেন। ভগবান বলিয়াছেন—'বহু বহু জন্মের পর জীব জ্ঞানবান হয়।' জ্ঞান অর্থই— অজ্ঞান যে কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্য জ্ঞানলাভ হইলে, মানুষ যথার্থ জ্ঞানবান হয় না। 'আমি যে একটি অজ্ঞানমাত্র' ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান। ভেদ জ্ঞানের সংস্কারও যে অসুরের অস্ত্র অর্থাৎ উৎপীড়নমাত্র, এরূপ উপলব্ধি হইলে, তারপর এই মূল অজ্ঞান ধরা পড়ে। মায়ের চরণে যথার্থ শরণ লইতে পারিলে, কিরূপে মুক্তি-মন্দির সন্নিহিত হয়, তাহাই এই চণ্ডীতত্ত্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একটির পর একটি করিয়া বন্ধনগুলি কিরূপে শিথিল হইয়া যায়, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। জীবত্বের যতগুলি গ্রন্থি

আছে, মা আমার দয়া করিয়া তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ছিন্ন করিয়া দিতে থাকেন। জীব জানে না—তাহার কোথায় অজ্ঞান, কোথায় ভেদজ্ঞান, কোথায় বন্ধন, কোথায় মুক্তি ; কিন্তু মায়ের চক্ষুতে কিছুই লুকাইয়া থাকিতে পারে না। মা যে আমার অজ্ঞেয় রোগের বীজাণুগুলিকে প্রকট করিয়া, সুচিকিৎসকের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। তাই বলি জীব ! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শুধু মা বলিয়া আত্মনিবেদন কর, তোমার ভবব্যাধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে।

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্জ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৮॥
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবীশূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। অনন্তর মহাসুর (চিক্ষুর) ভদ্রকালীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল। সূর্যমণ্ডলের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান সেই শূল আকাশ হইতে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দেবীও শূল ত্যাগ করিলেন। সেই শূলের আঘাতে অসুর-নিক্ষিপ্ত শূল এবং সেই মহাসুর উভয়ই শতধা খণ্ডিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা। অসুর-শক্তি একদিকে যেমন আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া চিরতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়, অন্যদিকে তেমনি আবার মুক্তিমন্দিরের সুদৃঢ় অর্গল উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। বর্ষাকালে ভাগীরথীর সলিলরাশি পঙ্ককলুষিত হয় বটে, কিন্তু অচিরেই শরৎ সমাগমে উহা যে সুনির্মল হইবে, তাহারও পূর্বসূচনা করিয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত রোগবীজাণুগুলি, দেহময় প্রকট ব্যাধির আকারে প্রকাশিত হইয়া মানুষকে অতিশয় যন্ত্রণা দেয় বটে কিন্তু দেহটিকে সর্বথা রোগ শূন্য করিবার পক্ষে উহাই প্রয়োজন। সাধক এতদিন কেবল পরিচ্ছিন্ন ভাবাসুরগণের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ সেই অসুরই তাহাকে ভাব-বৃন্দেরমূলকেন্দ্রে উপনীত করিয়াছে। অসুর শূল নিক্ষেপ করিয়াছে, সাধক মূল অজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছে। এইরূপ যে মুহূর্তে জীব 'আমাকে আমি জানি না' রূপ মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায়, সেই মুহূর্তেই অজ্ঞানের মূল শিথিল হইয়া যায়। নিজের দোষ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেই দোষের প্রতিকার হইতে থাকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন— এ কথাটা আর কে না জানে যে, আমরা আমাদের স্বরূপ জানি না বলিয়াই বদ্ধ জীব হইয়া আছি। বাবা ! মুখে বলিলেই জানা হয় না, জানা মানে উপলব্ধি করা ; বেদান্তের ভাষায় ইহাকে কারণ-শরীর বা আনন্দময় কোষ কহে, বিজ্ঞানময় কোষে স্বাধীনভাবে বিচরণের যোগ্যতা হইলে, তবে এই অজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সকল কথা উপস্থিত করিয়া বিষয়টি জটিল করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; স্থূল কথা—মাতৃচরণে নির্ভরশীল, মাতৃ-লাভেচ্ছু সন্তান কিরূপে অনায়াসে বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানময় স্বরূপে উপনীত হয়, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য। জীব জ্ঞানে-অজ্ঞানে, সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, সর্বাবস্থায় যখন পূর্ণভাবে মাতৃ-চরণে নির্ভরশীল হয়, তখনই এরূপ অঘটন সংঘটন হইয়া থাকে। তাই অসুর ভদ্রকালীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল—জীব মূল অজ্ঞানের সন্ধান পাইল। যিনি মহাকাল শক্তিরও উপরে অধিষ্ঠিতা, যিনি সর্বতোভদ্র-স্বরূপা—নিত্য মঙ্গলময়ী, সেই ভদ্রকালী মা-ই-জীবের সকল ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া জীবকে এইরূপে মূল অজ্ঞানের সন্ধান দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের সুযোগ প্রদান করেন।

যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— জাজ্জ্বল্যমান সূর্যবিম্বের ন্যায় সেই শূল আপতিত হইতেছে দেখিয়া দেবী স্বকীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে অসুর ও তন্নিক্ষিপ্ত শূল উভয়েই বিনষ্ট হইল। সাধকও যখন পূর্বোক্ত মূল অজ্ঞানের সমীপস্থ হয়, অর্থাৎ একটু একটু করিয়া মূল অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে থাকে, তখন ইহাকে তেজঃপুঞ্জ সূর্যবিম্বের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্যই মনে করে ! যেরূপ মার্তণ্ডমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র নেত্র নিমীলিত করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ মূল অজ্ঞানের নিকটস্থ হইতে না হইতেই বৈষয়িক জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। এই মূল অজ্ঞান যে যথার্থই দুর্নিরীক্ষ্য তাহা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। সাধকগণ যখন যাবতীয় বৈষয়িক স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করিয়া, অতি সন্তর্পণে আত্মসংস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখন ধীরে ধীরে এই মূল অজ্ঞান উপলব্ধিযোগ্য হইতে থাকে এবং নিমেষার্দ্ধ কালের মধ্যেই লক্ষ্যচ্যুত হইয়া, আবার বৈষয়িক স্পন্দন গ্রহণ করে। ইহাই নিক্ষেপশক্তির সর্বশেষ প্রযত্ন। কিন্তু উহা

যতই দুর্নিরীক্ষ্য হউক না কেন, মাতৃ-শূলাঘাতে উহারও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। মায়ের শূল কি ? আত্মজ্ঞান। আমার স্বরূপ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সেই মুহূর্তেই জীবের যাবতীয় অজ্ঞান ও তজ্জন্য জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি ফল উভয়ই যুগপৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আরে, আমি যে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ—মাত্র 'জ্ঞ' পদার্থ, এইরূপ উপলব্ধি হওয়া মাত্রই ত' মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কার বিলুপ্ত হয়। সাধক ! পুনঃ পুনঃ এই সকল বিষয় আলোচনা কর, অজ্ঞান দূর হইবে।

———○———

হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ॥ ১০॥

অনুবাদ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নিহত হইলে দেবতাগণের উৎপীড়ক চামর, গজারোহণে যুদ্ধার্থ আগমন করিল।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ-শক্তির বিলয় হইয়াছে, এইবার আবরণ-শক্তির যুদ্ধ ও বিলয়ের বিষয় কথিত হইবে। সর্বপ্রধান সেনাপতিই যখন মাতৃ-শূলাঘাতে অনায়াসে নিহত হইয়াছে, তখন অন্যান্য সেনানীগণ যে অচিরাৎ বিধ্বস্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? চামরাদি অসুরের বিবরণ ইতিপূর্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে ; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই মন্ত্রে চামরের দুইটি বিশেষণ দেখিতে পাই—একটি ত্রিদশার্দন এবং অন্যটি গজারূঢ়। ত্রিদশার্দন শব্দের অর্থ দেবতাগণের উৎপীড়ক। অনাত্মবস্তুর প্রতীতিই আবরণ-শক্তির কার্য। আত্মার নাম অমৃত। দেবতাগণ সেই অমৃত-ভোগী, অর্থাৎ সর্বদাই আত্মসংস্থ। কিন্তু আবরণ-শক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত অনাত্ম বস্তুর ভাণ হয় ; সুতরাং দেবতাগণ অমৃত হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহাই দেবতা-গণের প্রতি চামরাদি অসুরের উৎপীড়ন ! দ্বিতীয় বিশেষণ গজারূঢ়। গজ ধাতুর অর্থ বন্ধন। যেখানে আবরণ সেইখানেই ত' বন্ধন। আত্মা—মা যে আমার নিত্য স্বপ্রকাশ-স্বরূপা, ইহা বুঝিতে না পারাই জীবের বন্ধন ! আত্মা ব্যতীত অপর একটা বস্তুর সত্তা উদ্ভাসিত করিয়া, আবরণ শক্তি যেন আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে। আত্মা যতদিন আবৃত, জীব ততদিনই বদ্ধ ! তাই গজ অর্থাৎ বন্ধনই চামরের যোগ্য বাহন।

———○———

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥ ১১॥

অনুবাদ। এই চামরও দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা তাহা অভিহিত ও নিষ্প্রভ করিয়া তাকে সত্বর ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেহাদি অনাত্ম বস্তুর প্রতীতি আবরণশক্তির কার্য, ইহাই চামর নিক্ষিপ্ত শক্তি-অস্ত্র। অম্বিকা-মা আমার অতি অল্পকাল মধ্যেই হুঙ্কার প্রয়োগে উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। হুঙ্কার একটি শব্দবিশেষ। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে বাগ্‌যন্ত্র হইতে ঐরূপ শব্দ নির্গত হয়। আমি স্বপ্রকাশ স্বরূপ— আমারই প্রকাশে সকল প্রকাশময়। আমাকে আবৃত করিয়া রাখিবে কে ? এই ক্রোধমূলক ভাবের উদ্বেলন হইলেই, আবরণ-শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে হুঙ্কারটি স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র বা প্রণবের উপলক্ষণ। তন্ত্রশাস্ত্র হুঙ্কারকে কূর্চবীজ বলিয়া থাকেন। তন্ত্রোক্ত ঐ সকল মন্ত্রকে চৈতন্যময় করিয়া জপ করিলে, আবরণ-শক্তিকে নির্বীর্য করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। সাধকগণ ঐ সকল মন্ত্রের সাহায্যে চিত্তকে অনাত্মভাব হইতে আকৃষ্ট করিয়া আত্মসংস্থ করিতে প্রয়াস পান। যতদিন এইরূপ স্বয়ংকৃত অধ্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য থাকে, অর্থাৎ 'আমি মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিব' এইরূপ বোধ থাকে, ততদিন প্রায়ই ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়। আর যখন দেখে—মাই-ই হুঙ্কারাদি মন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনাত্মভাবের বিলয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই অনায়াসে আবরণশক্তির কার্য বিনষ্ট প্রায় হইয়া থাকে।

খুলিয়া বলি—যদিও আত্মা স্বপ্রকাশ নিরাবরণস্বরূপ, তথাপি যখনই আমরা বিষয় দর্শন করি, তখনই অনাত্ম-বস্তুর ভাণ হয় ও আত্মস্বরূপ আবৃতবৎ থাকে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও প্রারব্ধ সংস্কারবশতঃ অনাত্মবস্তুর ভাণ হয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই অনাত্মভাব দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। প্রথমতঃ মায়ের—আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার নাম সত্য প্রতিষ্ঠা। তারপর প্রাণই যে

মা, প্রাণই যে আত্মা ইহা বুঝিতে হয়। প্রাণই জগৎময় পরিব্যাপ্ত, বিষয়ের আকারে প্রাণেরই বিভিন্ন মূর্তি আমরা যে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছি, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। হুঙ্কারাদি মন্ত্র ঐ প্রাণ প্রতিষ্ঠা রূপ সাধনার সহকারী আলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে হয়। এ সকল তত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত বিনীতভাবে শ্রীগুরুর মুখ হইতে শিক্ষা করিলেই অচিরে ফলদায়ক হইয়া থাকে।

———o———

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১২॥

অনুবাদ। শক্তি অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া চামর সক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিল, দেবীও বাণ প্রয়োগে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ-শক্তির শেষ চেষ্টা যেরূপ মূল অজ্ঞানের উদ্বোধ, আবরণ-শক্তিরও সর্বশেষ প্রযত্ন সেইরূপ শূলনিক্ষেপ বা মূল অজ্ঞানের উদ্বোধ। সাধকগণ আবরণ ও বিক্ষেপ—উভয় শক্তি ধরিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলেই এই মূল অজ্ঞানের সমীপস্থ হইতে পারেন। এখানে আসিলে মাতৃ-কৃপায় অনায়াসে এই অজ্ঞান ভেদ হয়। মা বাণপ্রয়োগে—স্বকীয় আকর্ষণী-শক্তিপ্রভাবে অচিরাৎ সন্তানকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানময় অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকেন।

কিরূপে ইহা সম্ভব হয় ?—'আমাকে আমি জানি না' এই যে মূল অজ্ঞান, উহাও জানামাত্ররূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানেই অবস্থিত। এইখানেই জ্ঞান অজ্ঞানের অনির্বচনীয় সম্মিলন। সাধক যখন গুরুকৃপায় ধীরে ধীরে বিক্ষেপ ও আবরণশক্তির মূল অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তখন এই অনির্বচনীয় অজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয় ; বহু সৌভাগ্যের ফলে বহুজন্মার্জিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের ফলে এই মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায়। এখানে দাঁড়াইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। যেহেতু এই অজ্ঞান, বিশুদ্ধ আত্মাবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এস, অজ্ঞানান্ধ জীব ! এস, দুঃখিত শোককাতর সংসারক্লিষ্ট জীব ! এস মা বলিয়া, গুরু বলিয়া, আত্মা বলিয়া, সত্য বলিয়া, প্রাণ বলিয়া ছুটিয়া এস। তোমরা অজ্ঞানের পরপারে পৌঁছিবে ! অমৃতের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইবে।

———o———

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৩॥

অনুবাদ। অনন্তর সিংহ উল্লম্ফনপূর্বক গজকুম্ভদ্বয়ের অন্তরে অবস্থান করতঃ, সেই ত্রিদশারির সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ ও আবরণশক্তির সর্বশেষ প্রযত্নের ফলেই জীব মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানময় স্বরূপের উপলব্ধি করে। অসুরগণ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাই দেখিতে পাই—চিক্ষুর ও চামর উভয়ই দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিল এবং তাহারই ফলে জীব যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান পাইল। অসুরগণের অত্যাচারের মাত্রা যত বেশি হয়, সাধকের আত্মপ্রতিষ্ঠাও তত শীঘ্র হইতে থাকে। এই দেখ—অসুরগণ মনে করিয়াছিল, মূল অজ্ঞানের স্বরূপটি সাধকের সম্মুখে ধরিতে পারিলেই সে চিরদিনের মত বশ্যতা স্বীকার করিবে, কিন্তু কার্যতঃ তাহার বিপরীত ফল হইল। সাধক মূল অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারের পার্শ্বেই আত্মজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া, সিংহ-বিক্রমে চামর অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

জীব এতদিনে জ্ঞান-অজ্ঞানের সম্মিলন স্থানে —বন্ধন ও মুক্তির মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই **'গজকুম্ভান্তরস্থিত'**। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—মহাসুর চামর গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। যেখানে বন্ধনের শেষ ও মুক্তির আরম্ভ, সেই স্থানকে 'গজকুম্ভান্তর' বলা হয়। মূল অজ্ঞানই বন্ধনের শেষ বিন্দু, ঐ স্থান হইতেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই বন্ধন ও মুক্তির মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সিংহ—জীব প্রাণপণে অসুর-বিনাশের জন্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি—জীব যখন প্রথম মুমুক্ষু হয়, তখন স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনকেই বন্ধন বলিয়া মনে করে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইহারাই বন্ধন ; কিন্তু সর্বশেষে দেখিতে পায়—আমার যথার্থবন্ধন—এই মূল অজ্ঞান। 'আমাকে আমি জানি না' এই অজ্ঞানই বন্ধনের যথার্থ স্বরূপ। কোন্

অনাদিকাল হইতে, কি খেয়ালে এই অজ্ঞানটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, ঐ একবিন্দু অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কত জন্ম মৃত্যুরই স্রোত বহিয়া যাইতেছে, কত সুখ, কত দুঃখের স্বপ্নই দেখিতেছি! আবার ঐ অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়াই উহাকে বিলয় করিতে কত চেষ্টা, কত প্রাণপাত তপস্যা, কত কঠোর ব্রত-নিয়ম ধর্মচর্চার অনুষ্ঠান হইতেছে ! এ চিত্র একবার নয়নপথে পতিত হইলে, আনন্দময়ী লীলাময়ী মহামায়ার চরণে প্রণত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

ধন্য মা তোর এই অনির্বচনীয় লীলা ! মা গো, সহস্রবার বুঝিলেও আবার যে ভুলিয়া যাই ! এই জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, বন্ধন-মুক্তি যা কিছু এ সকলই যে ইচ্ছাময়ি তোরই ইচ্ছামাত্র, এ কথা কিছুতেই এ পোড়া প্রাণ মানিয়া লইতে চায় না। মাগো ! তোমার ইচ্ছায় অজ্ঞান, তোমার ইচ্ছায় বন্ধন, আবার তোমারই ইচ্ছায় মুক্তি ! আর কত কাল এ বন্ধন দেখবি মা ! তুই দুই হাতে কি কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিস, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ ত্রিনয়নি ! কত কাল, কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এ অজ্ঞানের বন্ধন-যাতনা সহ্য করিয়া আসিয়াছি। আর যে পারি না মা ! বুক যে ভাঙিয়া যায় মা ! এক একটা তরঙ্গ আসে আর মর্মস্থলে কি ভীষণ আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত এক একটা ভাব আসিয়া কোন অনাদিকাল হইতে এমনই সজোরে আঘাত করিতেছে। মাগো কতদিনে এ মর্মব্যথার অবসান হইবে ? দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কত আশায় বুক বাঁধিয়া দিন গণনা করি ; কিন্তু কই, তুই ত' তেমন করিয়া আমাদের ব্যথা দূর করিতে—চিরদিনের মত জীবত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে, স্নেহময়ী মায়ের মত ছুটিয়া আসিলি না ! আমাদের এই ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে একবারও ত' যথার্থ মুক্তির অমৃতময় স্পর্শ দিলি না ! মা মা মা ! আর বলিবার কিছুই নাই। শুধু বুঝিতে দাও — তুমি আমায় যথার্থই ভালবাস। সত্যই তুমি আমার প্রাণ ! সত্যই তুমি আমার আত্মা ! সত্যই তুমি আমার আমি ! ওগো, এই একটা কথা বুঝিতে পারিলেই যে আমাদের সকল যাতনার অবসান হয়।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে চামরের সহিত সিংহের বাহুযুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে বাহুযুদ্ধের রহস্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব যখন একবার অজ্ঞানের পরপারের সন্ধান পায়, তখন সেই জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, সর্ববিধ বৈষয়িক স্পন্দনকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় হস্তে ধরিয়া ধরিয়া জ্ঞানবক্ষে বিলীন করিতে প্রয়াস পায়

———○———

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। তাহারা উভয়ে (চামর এবং দেবীর বাহন সিংহ) যুদ্ধ করিতে করিতে হস্তী হইতে ভূতলে অবতরণ করিল এবং অতিশয় ক্রোধবশতঃ পরস্পর অতি দারুণ প্রহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। জীব যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহায্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ—উভয় হস্তদ্বারা বৈষয়িক স্পন্দনগুলিকে মহাপ্রাণময়ী মাতৃ অঙ্কে মিলাইয়া দিতে থাকে, অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুর ভাণকে পূর্ণরূপে বিলয় করিয়া, বিশুদ্ধ আত্মবোধে অবস্থান করিতে প্রয়াস পায়, তখন এক একবার সেই বন্ধন মুক্তির মধ্য বিন্দু হইতে অবতরণ করিতে হয়। এক একবার সেই সূক্ষ্ম বোধময় অবস্থা হইতে স্থূলে নামিয়া আসিতে হয়। উদ্দেশ্য—যাবতীয় স্থূল জ্ঞানকেও বোধময় সত্তায় লইয়া যাওয়া। ইহাই গজকুম্ভান্তর হইতে মহীতলে অবতরণ ও পরস্পর দারুণ প্রহার। আরে, পার্থিব ভাবগুলি বহুদিন হইতে সাধকের চিত্তে যে ঘন স্থূল সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে, ইহার বিলয় সাধন করিতে হইলে, পুনঃ পুনঃ উহাদিগকে বোধময় সত্তায় লইয়া আসিতে হয়। যাহাকে আমরা জল, মাটি, বৃক্ষ, পর্বত, জীব, জন্তু বলিয়া অতি স্থূল জড় পদার্থরূপে দেখি, উহার বাস্তব সত্তা যে বোধ বা প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এইরূপ উপলব্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে এইরূপ বাহুযুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সাধক ! শুধু দেখিতে থাক—তোমার প্রবৃত্তি যাহা চায়—গ্রহণ করে এবং নিবৃত্তি যাহা চায় না—পরিত্যাগ করে ; উহার সকলেই তোমার প্রাণ—তোমার বোধ ! তুমি একবার মূল অজ্ঞান হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুকে ধরিয়া প্রাণময় সত্তায় মিলাইয়া দিতে চেষ্টা কর।

ইহাই আবরণ-শক্তির সহিত জীবের অতি দারুণ বাহুযুদ্ধ। অসুরের পক্ষে— জড়ভাবের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা অতি দারুণ প্রহার। কত জন্ম হইতে জড়ত্বের ভাণ নিয়া রহিয়াছ, আর আজ সকলেই চৈতন্যময়—বোধময় হইতে চলিয়াছে। অসুরকুলের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দারুণ আঘাত আর কি থাকতে পারে ? আবার জীবের পক্ষেও ইহা অসুরের দারুণ আঘাত। কারণ জীব গুরুকৃপায় বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, ইহা আমারই প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; কিন্তু তথাপি জড় বস্তুর প্রতীতি ত' একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই মন্ত্রেও পরস্পর দারুণ প্রহারের কথাই উক্ত হইয়াছে।

———o———

ততোবেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥ ১৫॥

অনুবাদ। অনন্তর মৃগারি সবেগে আকাশে উল্লম্ফন-পূর্বক, কর-প্রহারে চামরের শরীর হইতে শিরকে পৃথক করিয়া দিল।

ব্যাখ্যা। এখানে জীবকে মৃগারি বলা হইয়াছে। মৃগারি শব্দের অর্থ অন্বেষণের শত্রু। অন্বেষণার্থক মৃগ্ ধাতু হইতে মৃগ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। জীব যখন মাতৃ-অন্বেষণের শত্রু হয়, তখনই তাহাকে মৃগারি বলা হয়। কই মা কোথায় ? এইরূপ অন্বেষণের ভাবটা যখন একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই জীব মৃগারি হয়। সাধক ! তোমার অন্বেষণের চক্ষু মুদ্রিত করিতেই হইবে। তোমাকে মৃগারি হইতেই হইবে। তাহা না হইলে যে চামর নিধন হইবে না, আবরণ-দোষ বিদূরিত হইবে না। আরে, কাহার অন্বেষণ করিবে ? যে বস্তু লুকাইয়া থাকে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মা যে আমার সর্বতঃ সুপ্রকাশ-স্বরূপা ! মা ছাড়া কোথাও যে কিছুই নাই। তাঁকে আবার অন্বেষণ করিবে কি ? যাহা দেখ, যাহা শোন, যাহা ভাব সবই ত' মা। তোমার উর্ধ্বে-নিম্নে, দক্ষিণে-বামে সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্রই ত' মা রহিয়াছেন, আরও নিকটে ঐ যে তোমার বুকের ভিতরে তিনি নিত্য বিরাজিতা ! ওরে, এত সুলভ, এত সহজ আর কি আছে ! শুধু মা বলিবার অভাব, মায়ের অভাব কোথাও নাই। যতক্ষণ দেখিবে—তুমি ধ্যান ধারণার সাহায্যে মাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছ, ততক্ষণই বুঝিব-তুমি মাকে অন্বেষণ করিতেছ। অন্বেষণের চক্ষু মুদ্রিত কর ! সর্বত্র মাকে দেখ ! মা বলিয়া, প্রাণ বলিয়া, আদর কর ! আপনার প্রাণকে কত আদর কর, কত ভালবাস ! ঐ প্রাণই ত' মা, ঐ মা-ই ত' বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আর অনাদর করিও না, আর অবিশ্বাস করিও না। প্রত্যেক ভাবে, প্রতি প্রচেষ্টায় মাকে দেখিতে থাক ! তুমিও মৃগারি হইবে, তোমার বহু জন্ম-সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণ বিদূরিত হইবে।

যতদিন জীব শিশু থাকে—অজ্ঞান থাকে, ততদিনই কই মা কোথায়, মা বলিয়া অন্বেষণ করিতে থাকে ; কিন্তু একবার যদি বুঝতে পারে—**'পূর্ণমন্তর্বহির্যেন', 'ত্বয়া ততং বিশ্বং', 'স এব সর্বং'** তখন কি আর তাঁহাকে খুঁজিতে হয় ! যাহা দেখে, যাহা ধরে, যাহা জানে, সবই যে প্রাণ—সবই যে মা। সাধক ! যদি তুমি মাটিকে ধরিয়া 'মা'টি বলিতে না পার, জলকে ধরিয়া রসময়ী মায়ের সত্তা বুঝিতে না পার, যদি সমীরণস্পর্শে মাতৃ-স্পর্শ বলিয়া পুলককণ্টকিত না হও, তবে কোন্ বলে কি সাহসে তত্ত্বাতীতা ভাবাতীতা মাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইবে ? একটি আত্মসম্বেদনে উক্ত হইয়াছে—**জগদ্দর্শন-মাত্রেণ নচেদাত্মস্মৃতির্ভবেৎ বিশ্বাতিগং পরং ব্রহ্ম কথং গচ্ছেন্নিরঞ্জনম্**॥ জগদ্দর্শন মাত্রে যাহার আত্মস্মৃতি না হয়— মাকে মনে না পড়ে সেকি করিয়া বিশ্বের অতীত নিরঞ্জন পরব্রহ্ম তত্ত্বে উপনীত হইবে ?

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মৃগারি আকাশে উৎপতিত হইয়া, চামরের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল। জীবেরও যখন অন্বেষণের ভাবটা দূরীভূত হয়— সাধক যখন চক্ষু চাহিলেই মাকে দেখিতে পায়, তখনই মৃগারি হইয়া আকাশে উৎপতিত হয়—নির্মল চিদাকাশে অবস্থান করে এবং তথা হইতে অনাত্মভাবের আবরণকে বিলয় করিয়া, পরমাত্মরসের আস্বাদে অমর হইয়া যায়।

এইরূপে চিক্ষুর ও চামর অসুর নিহত হয়—বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তি বিলয় হয়। বিশুদ্ধ বোধ ফুটিয়া উঠে। সাধক ! মনে করিও না—একদিন একবার মাত্র বিক্ষেপের কিংবা আবরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই বাকী জীবনকালের মধ্যে আর কখনও চিত্তক্ষেত্রে বিক্ষেপ আসিবে না, অথবা অনাত্মভাব ফুটিয়া উঠিবে না। তাহা

নহে—যতদিনই দেহ আছে, ততদিন বিক্ষেপ এবং আবরণ আছে। তবে উহারা আর কখনও তোমাকে মাতৃ-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না, মাতৃ-অস্তিত্বে সংশয় আনিতে পারিবে না, মাতৃ-প্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারিবে না। উহারা থাকিবে—কিন্তু মস্তক বিহীন ! আর উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। যতদিন প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, ততদিন উহারা মস্তকবিহীন শবদেহের ন্যায় অবস্থান করিবে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব।

———o———

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৬॥

অনুবাদ। দেবী উদগ্র অসুরকে শিলাবৃক্ষাদি প্রহারে এবং করাল অসুরকে দন্তমুষ্টি ও তল প্রহারে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ ও আবরণশক্তিই যাবতীয় অসুর-কুলের আশ্রয় ! মূল বিনষ্ট হইলে শাখাপ্রশাখাগুলি সহজেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উদগ্র—দর্প—কর্তৃত্বাভিমান, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দেবী উহাকে শিলাবৃক্ষাদি প্রহারে নিহত করিলেন। গাছ, পাথর, মাটি অর্থাৎ পার্থিব পদার্থই ত', আমাদের দর্পের বিষয়। উহারই কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া, আমার বলিয়া ধরিয়া রাখি ও মনে মনে গর্ব অনুভব করি। অনেক সময় বাক্যের আকারেও সে গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু চিন্ময়ী মায়ের আবির্ভাব হইলে—সর্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শনে অভ্যস্ত হইলে, ঐ দর্প সমূলে বিনষ্ট হয়। কারণ, তখন একদিকে যেমন জড়ত্ব জ্ঞানের অভাববশতঃ সঞ্চয় করিবার মত কিছুই পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তেমনি 'আমার' বলিতেও কিছুই থাকে না। এইরূপে উদগ্র অসুরের উন্নত মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়। মনে রাখিও সাধক ! অহঙ্কারনাশই মাতৃ-দর্শনের ফল। যতদিন মাকে—যথার্থ আমিকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিনই এই কল্পিত আমিটাকে নিয়া দর্প করিবার অবসর থাকে। কিন্তু একবার 'আমির' সন্ধান পাইলে —আর দর্পের লেশও থাকে না। তখন আচার্য শঙ্করের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়, **'কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্। আত্মনা পূরিতং সর্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা।'**

তারপর করাল অসুর। ইহার নাম ভয়। আত্ম-অস্তিত্বনাশের কল্পনাজন্য চিত্তের এক প্রকার সঙ্কোচভাব। আমি থাকিব না—আমি মরিব, এইরূপ একটা কল্পিত সঙ্কোচ, শিশুজীবগণের একান্ত স্বাভাবিক । অজ্ঞানের জন্যই ঐরূপ কল্পিত ভয় উপস্থিত হয়। করাল অসুর ইহাকেই বলা হয়। এই মৃত্যুভয় মানুষকে স্বাধীনভাবে আনন্দভোগ করিতে দেয় না, শিশু জীবের পক্ষে উহা অতিশয় হিতকর ; কারণ উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া রাখে। মৃত্যুভয় না থাকিলে, মানুষ বোধ হয়, পশুরও অধম হইত। এই করাল অসুরের অত্যাচারই আমাদিগের মৃত্যুমুখী গতি ফিরাইয়া দেয়। সাধারণ মনুষ্যগণ যে দিবারাত্র মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, তাহা বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই। বেশ খায় দায় বেড়ায়, হাসি গল্প করে আমোদ উৎসবে যোগ দেয়, ভয় আবার কোথায় ? কিন্তু একটু ধীরভাবে দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে—জীব মৃত্যুভয়ে কত সঙ্কুচিত, খোলা প্রাণে, স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারে না। আহার বিহার অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ হইলেও অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে বাধ হয়। পাছে অসুখ করে—রোগ হয়। এরূপ স্বাধীনভাবে কেহই বিষয় ভোগ করিতে পারে না। মৃত্যু ভয়ে ভোগ সঙ্কুচিত হয়, তাই মানুষমাত্রেই ভোগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—**'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'** পৃথিবীতে সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। মাকে—অভয়াকে না পাইলে, বৈরাগ্য আসে না। বৈরাগ্য না আসিলে, করাল অসুর নিহত হয় না। যতই যোগ কৌশল অবলম্বন করা হউক না কেন, মৃত্যুভয় জীবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। মৃত্যুর করাল চিৎকার পাছে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাই মানুষ দিবারাত্রি বিষয়চিন্তা, কাম-কাঞ্চনের সেবা করিতে বাধ্য হয়। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সে চিৎকারকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে —আমাদের এই যে আহার নিদ্রা বিষয়চিন্তা—এ সকলই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। জীবনটাই যেন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করা। কিছুদিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়া, শেষে কিন্তু একদিন উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মায়ের কৃপা ব্যতীত উহার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ লাভের অন্য উপায় নাই। তুমি মাকে ধরিয়া আছ, তাই মা তোমাকে এই মৃত্যুভয়রূপ করাল অসুরের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দন্ত, মুষ্টি এবং তল-প্রহার করিলেন। প্রথমতঃ মা দংষ্ট্রাকরাল মুখ ব্যাদান করিয়া, করাল অসুরকে জগৎ গ্রাসকারিণী দন্তপংক্তি-দর্শন করান। দ্বিতীয়তঃ মুষ্টির দ্বারা উহাকে গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ করতলদ্বারা অভয় প্রদান করেন। আধ্যাত্মিক রহস্যে দেখ— কালজ্ঞান হইতে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়! এই কালশক্তি যেখানে নিরুদ্ধ, সেই মহাকালী চিতিশক্তির দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিলে সর্বভাবরূপ মৃত্যুভয় স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়। মুষ্টিপ্রহারশব্দে আদানশক্তি বুঝিতে হইবে। মা আমার সহস্র হস্তে সহস্র মুষ্টিতে সর্বভাবকে ধরিয়া ধরিয়া, আপনার অঙ্গে বিলীন করিয়া দেন, তারপর উত্তান হস্তে করতল প্রদর্শনপূর্বক জীবকে অভয় প্রদান করেন। অভয় জ্ঞানই মায়ের করতল, শ্রুতিও বলেন— **'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।'** দ্বিতীয়-প্রতীতি হইতেই ভয় আপতিত হয়। একত্ব-জ্ঞানে উপনীত হইলে, অর্থাৎ সর্বভাবের— বহু ভাবের সম্যক্ বিলয় হইলেই জীব অভয় হয়। মৃত্যুভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

———o———

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৭॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্যঞ্চ তথৈবচ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥ ১৮॥
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্মুখং চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ১৯॥

অনুবাদ। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধত অসুরকে গদাঘাতে, বাস্কল অসুরকে ভিন্দিপাল অস্ত্রে, তাম্র ও অন্ধক অসুরকে বাণ প্রয়োগে নিহত করিলেন। এইরূপ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূলের আঘাতে উগ্রাস্যা, উগ্রবীর্য এবং মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে নিহত করিয়াছিলেন। অসির আঘাতে বিড়ালাক্ষ নামক অসুরের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্ধর দুর্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রে মহিষাসুরের অন্যান্য সেনানীগণের নিধন-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে মহিষাসুর সৈন্যসজ্জার ব্যাখ্যানাবসরে বাস্কল মহাহনু এবং বিড়ালাক্ষের রহস্য উক্ত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন এস্থলে উদ্ধত প্রভৃতি আরও কয়েকটি অসুরের নাম পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান — **'দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ'** ইত্যাদি বাক্যে অর্জুনকে যে অসুর-সম্পদের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত এই অসুরগণের নামানুযায়ী সামঞ্জস্য করিয়া লইলেই, পাঠকগণ অনায়াসে এ রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন। উক্ত অসুরগণের নাম প্রায়ই অন্বর্থ। উদ্ধত—দম্ভ, তাম্র—পারুষ্য (পুরুষভাব), অন্ধক — মোহ, উগ্রাস্য— ক্রোধ, উগ্রবীর্য— পশুবল, দুর্দ্ধর— অক্ষমা, দুর্মুখ— পরুষবাক্য-প্রয়োগ। মাতৃ-কৃপায় এই দম্ভ, পারুষ্য প্রভৃতি আসুরিক বৃত্তি-নিচয় অল্পকাল মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। একমাত্র শরণাগত ভাব আসিলেই সাধক অনায়াসে এই সকল বৃত্তির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায়। পুনঃপুনঃ ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু ইহাই এস্থলে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় আসুরিক বৃত্তি বিদ্যমান থাকিতেও জীব মায়ের কৃপা লাভ করিতে পারে। একবার মাতৃকৃপার অনুভূতি আসিলে ঐ সকল বৃত্তি অল্পকাল মধ্যে হীনবল হইয়া পড়ে।

ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমাদিগকে যে অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, চণ্ডীতে তাহারই কার্যকরী অবস্থা অসুর নিধনচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে— **'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥'** ভগবান বলিয়াছেন—'জীব! তুমি যত বড় দুরাচারই হও না কেন, আমাকে আশ্রয় করিবার, আমার শরণাগত হইবার যোগ্যতা তোমার আছে। অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে একান্ত আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তোমার আছে। তোমার দুরাচারিতা সে সামর্থ্যকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। যদি আমার দিকে মুখ ফিরাও, তবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তুমি ধর্মাত্মা সাধু হইয়া উঠিবে। তোমার দুরাচারনিচয়কে আমিই বিলয় করিয়া দিব। মনে রাখিও— আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই অভয়বাণী কিরূপে কার্যে পরিণত হয়,

তাহা দেখাইবার জন্যই মায়ের এই অসুরবধের লীলা। এ তত্ত্ব ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। গীতায় যাহা উপদেশ—চণ্ডীতে তাহাই কার্যরূপে পরিণত। যাহারা সর্বভাবেই প্রাণময়ী মায়ের বিকাশ দেখিতে অভ্যস্ত, তাহাদের দম্ভ, পারুষ্য, মোহ, ক্রোধ, পশুবল, অক্ষমা, কঠোর বাক্যদ্বারা অপরের প্রাণে ব্যথা দেওয়া প্রভৃতি দোষরাশি অচিরেই বিদূরিত হইয়া যায়।

———০———

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২০॥

অনুবাদ। এইরূপে স্বকীয় সৈন্যবল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া মহিষাসুর মহিষের রূপ ধারণ করিয়া দেবীর গণসৈন্যবৃন্দকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুরের যাবতীয় সেনানী একে একে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজোগুণের যত রকম বৈষয়িক স্পন্দন, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এইবার সৈন্যবলবিহীন স্বয়ং মহিষাসুর একবার শেষ উদ্যম করিল। প্রথমেই মহিষরূপ ধারণ করিয়া গণসৈন্যবৃন্দকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। **'মহীং ইষ্যতি ইতি মহিষঃ'** (ঈকার হ্রস্ব)। যে মহীকে, ক্ষিতিতত্ত্বকে অর্থাৎ স্থূলভাবকে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, সে-ই মহিষ। স্থূলাভিমানী রজোগুণ সহায়বিহীন হইয়া স্বকীয় সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে, চরম সম্বল পার্থিব দেহটিকেই বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরে। যখন সাধকের দর্প অভিমান প্রভৃতি রজোগুণ-সমুদ্ভূত দোষ-নিচয় দূরীভূত হয়, তখনও সে দেহাত্মবোধের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্থূলদেহের প্রতি অতিশয় আসক্তিই উহার হেতু। ইহাই মহিষাসুরের শেষ আক্রমণ। যতদিন সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে সঞ্চিত কর্মসমূহের অশ্লেষ না হয়, ততদিন কিছুতেই দেহাত্মবোধ শিথিল হইতে চায় না। অথবা যতদিন দেহাত্মবোধ ছিন্নমূল না হয়, ততদিন সঞ্চিত কর্মের অশ্লেষ হয় না। মনে রাখিও সাধক— অন্তররাজ্যে কার্য-কারণভাবের যথাযোগ্য পৌর্বাপর্যভাব স্থির করা যায় না। জগতে দেখিতে পাই—আগে কারণ, তারপর কার্য ; কিন্তু এখানে কারণ ও কার্য যেন যুগপৎ একত্র অবস্থিত। অনেকে বলেন— আগে সাধনা তারপর সিদ্ধি। আমরা কিন্তু দেখি— আগে ফল, তারপর ফুল। বাস্তবিক সূর্য ও রশ্মির ন্যায়, সিদ্ধি ও সাধনা যেন সহাবস্থিত।

সে যাহা হউক, সঞ্চিত সংস্কারসমূহ ফলোন্মুখ না হইলেও, উহা প্রারব্ধ ক্ষয়ের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। কারণ পশ্চাদ্বর্তী পুঞ্জীভূত সংস্কাররাশির চাপ পড়িয়া, প্রারব্ধ সংস্কারগুলি বিনাশের পথ রুদ্ধ হয়। স্থূল দেহের প্রতি একান্ত আসক্তি উহার বহির্লক্ষণ, ইহাই মহিষ-রূপধারী মহিষাসুরের অত্যাচার। ইহার প্রথম আক্রমণ —গণসৈন্যের উপর। গণসৈন্যের রহস্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসই গণসৈন্য। শ্বাসপ্রশ্বাস ধরিয়াই দেহাত্মভাব ফুটিয়া উঠে। সাধকগণ ইহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। যে মুহূর্তে তাঁহারা মাতৃযুক্ত হন, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে অবস্থান করেন, সেই মুহূর্তেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যায়। আবার যখন দেহাত্মবোধ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তখনই বাহিরে শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ধরিয়াই পার্থিব দেহে বোধ নামিয়া আসে ; তাই ঋষি বলিলেন— মহিষরূপী অসুর প্রথমে গণসৈন্যকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল।

———০———

কাংশ্চিৎতুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্॥ ২১॥
বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২২॥

অনুবাদ। মহিষাসুর কতকগুলি গণসৈন্যকে তুণ্ডাঘাতে, কতকগুলিকে খুরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গুলাঘাতে, কতকগুলিকে স্বকীয় বেগের দ্বারা, কতকগুলিকে গর্জন করিয়া এবং অন্য কতকগুলিকে নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে দেখিতে পাই—মহিষাসুর গণসৈন্যকে বিমথিত করিবার অন্য অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল (১) তুণ্ডপ্রহার (২) খুরক্ষেপ (৩) লাঙ্গুলাঘাত (৪) শৃঙ্গাঘাত (৫) বেগ (৬) নাদ (৭) ভ্রমণ (৮) এবং নিশ্বাস। সাধক ! তুমিও দেখ স্থূলদেহের প্রতি একান্ত আসক্তিরূপ মহিষমূর্তি অসুর অর্থাৎ স্থূলত্বপ্রিয় রজোগুণ-সমুদ্ভূত কাম—**'স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-**

নিষ্পত্তিরেব চ।' এই অষ্টবিধ উপায়ে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া, একেবারে স্থূল—পার্থিব বিষয়ে নামাইয়া আনিতেছে। তোমাকে বিশুদ্ধ বোধ হইতে, মায়ের স্নেহময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এস, একবার আমরা মায়ের নাম করিয়া, এই অষ্টবিধ উৎপীড়নের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে চেষ্টা করি।

প্রথমেই স্মরণ, অর্থাৎ রূপরসাদি কাম্য বিষয়ের স্মৃতি উপস্থিত হয়। ইহাই মহিষরূপী অসুরের প্রথম উৎপীড়ন। মনে রাখিও, যে শক্তিপ্রভাবে কাম্য বিষয়ের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়, উহাই রজোগুণ বা মহিষাসুর। কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইলেই ক্রমে তদ্‌বিষয়ক কীর্তন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ কাম্য বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা চলিতে থাকে। তারপর অকস্মাৎ কোনও স্থানে উক্ত বিষয়ের সহিত সঙ্গ হইয়া পড়ে, ইহারই নাম কেলি। একবার সঙ্গ হইলেই, বিষয় ভোগের যে সুখ, তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারে ; তখন প্রেক্ষণ বা অন্বেষণ আরম্ভ হয়। অন্বেষণে অভিলষিত বিষয়ের সন্ধান পাইলে উহা সংগ্রহ করিবার জন্য গুহ্যভাষণ অর্থাৎ গোপনে পরামর্শ চলিতে থাকে। এরূপ পরামর্শ একাকীও অর্থাৎ কেবল মনবুদ্ধির সহিত চলিতে পারে। পরামর্শ স্থির হইলেই, ইহা লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। এইরূপ ক্রমে সঙ্কল্প হইতে অধ্যবসায় বা তীব্র প্রযত্ন ও তাহারই ফলে ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ কাম্য বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে। এই আটটি উপায় যে কেবল কামেন্দ্রিয় চরিতার্থতাকল্পে প্রযুক্ত হয়, তাহা নহে। যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত অভীষ্ট বিষয়ের সংযোগ হইলেই বুঝিতে হইবে—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যথাযোগ্যভাবে পূর্বোক্ত অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

মনে কর—তোমার অভীষ্ট অর্থলাভ হইল। দেখ, কিরূপে উহার মধ্যে এই অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। প্রথম অর্থের স্মরণ হয়। (এই স্মৃতিটা যাহা হইতে হয়, তাহার নাম সংস্কার। ঐরূপ যাবতীয় সংস্কারই রজোগুণের উদ্বেলন মাত্র। এই রজোগুণেরই নাম মহিষাসুর। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।) অর্থবিষয়ক স্মৃতি হইতেই উহার কীর্তন বা আলোচনা হয়। তারপর কোনও অর্থশালী পুরুষের সঙ্গ হয়, অর্থাৎ কোন ধনী লোকের আচার-ব্যবহার ও কার্য প্রণালীর সংসর্গে আসিয়া পড়িতে হয়। ইহারই নাম কেলি বা ক্রীড়া। তারপরই আরম্ভ হয় প্রেক্ষণ—কোথায় অর্থ আছে, তাহার সন্ধান। অনন্তর গুহ্যভাষণ—কি উপায়ে উহা লাভ করা যায়, তাহার পরামর্শ। এইরূপ ক্রমে সংকল্প ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়া, উহা ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অভীষ্ট অর্থ লাভ হয়। এইবার দেখ—তোমার স্বস্থ চিত্তকে মহিষাসুর কিরূপ উপদ্রুত, বিমথিত করিয়া তোলে। স্বস্থ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ বা নাসাভ্যন্তরচারী থাকে, আর এই অষ্টবিধ উৎপীড়নে উহাদের গতি অস্বাভাবিক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তুণ্ডপ্রহার, খুরক্ষেপ প্রভৃতি উপায়ে সৈন্যগণকে বিমথিত করার ইহাই তাৎপর্য। মন্ত্রেও **'পাতয়ামাস ভূতলে'** অর্থাৎ গণসৈন্যসমূহকে তুণ্ডপ্রহার প্রভৃতি অষ্টবিধ উপায়ের সাহায্যে ভূতলে নিপাতিত করার কথাই উক্ত হইয়াছে। বোধময় স্বরূপ হইতে চিত্ত কিরূপে ভূতলে অর্থাৎ স্থূল ভাবে নামিয়া আসে, তাহাই এস্থলে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইল। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিদ্বারাই চিত্তের অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রাণবায়ুর চাঞ্চল্য চিত্তচাঞ্চল্যেরই বহির্লক্ষণ।

শাস্ত্রকারগণ এই স্মরণ কীর্তন প্রভৃতিকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বা অব্রহ্মচর্য বলিয়াছেন। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ মিথুনভাব হইতেই উহার উৎপত্তি। তাই ইহাকে মৈথুন বলা হয়। যে কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই, এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিষ্পন্ন হয়। ইহা ব্রহ্মচর্যের বিরোধী অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করিবার পক্ষে মহান অন্তরায়। ভাবিও না সাধক, শুধু উপস্থসংযম বা বিন্দুনিরোধ করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য রক্ষা হয়। **'বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্যম্'** ইহা ব্রহ্মচর্যের বহির্লক্ষণ মাত্র। তুমি চক্ষুদ্বারা ফুলমাত্ররূপে ফুলটি দেখিলে, কর্ণ দ্বারা শব্দমাত্ররূপে শব্দ শুনিলে ; এগুলিও মৈথুন—ইহাও ব্রহ্মচর্যের বিরোধী। যথার্থ ব্রহ্মচর্য তখনই নিষ্পন্ন হইবে—যখন ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও, ব্রহ্মসম্বেদন ব্যতীত অপর কোনরূপ অনুভূতি আনয়ন করিবে না। যখন তুমি **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'**—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন 'ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই' এই দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেবল তখনই—তুমি প্রকৃত ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু হায় ? ঐরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও আবার **'ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ'** ! ইন্দ্রিয়গণ পূর্বাভ্যাসবশতঃ বিষয় গ্রহণ

করিয়া ফেলে। দীর্ঘকাল সৎকারপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মচর্যের অনুপালন ও অনুশীলন না করিলে, পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন বা অব্রহ্মচর্যের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশা নাই।

আবার সাধনার দিক দিয়া দেখ— এই স্মরণ কীর্তন কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান যদি আত্মাভিমুখী হয়, তবে উহাই ব্রহ্মচর্যের চরম আদর্শ হইয়া থাকে। আরে ব্রহ্মেবিচরণ করার নামই ত' ব্রহ্মচর্য ! ব্রহ্ম ত' আত্মা মা আমার ! আচ্ছা, এইবার এক একটি করিয়া দেখিতে থাক। প্রথমেই স্মরণ—মাতৃ-স্মৃতি। যদি গুরুর কৃপা লাভ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছ। ঐ বিশ্বাসই তোমার মূলধন, উহাই রজোগুণের অন্তরমুখী বিকাশ বা পুরন্দর। মহিষাসুর যেরূপ বিষয়ের স্মৃতি লইয়া আসে, পুরন্দর তেমনই মাতৃ-স্মৃতি লইয়া আসিবে। নিশ্চয়ই আসিবে। যে পরিমাণে স্মরণ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কীর্তন আরম্ভ হয়—মায়ের স্নেহ দয়া মহত্ত্ব স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে। গীতাও বলিয়াছেন— **'কীর্তয়ন্তশ্চ মাং নিতং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'**। কীর্তনের পর হয় কেলি—খেলা, স্তব, জপ, পূজা, বন্দনা ইত্যাদি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! যাহাকে তোমরা সাধনা বল, উপাসনা বল, ঐগুলিই খেলা। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি, যিনি বাহ্য মনের অতীত, তাঁকে নিয়া যখন আমরা সাধনা উপাসনা করি, তখন উহাকে খেলা ভিন্ন আর কি বলা যায় ? শাস্ত্রও বলেন— **'বালক্রীড়নবৎ সর্বং নামরূপাদিকল্পনম্'** —সাধন-মাত্রই বালকোচিত ক্রীড়ামাত্র। যত কঠোর তপস্যাই কর কিংবা যত যোগকৌশল অবলম্বনই কর, মায়ের কাছে উহা ছেলেখেলা মাত্র। শুন—মাকে পাওয়ার অর্থই— মায়ের হওয়া বা মা হওয়া। অনেকে মনে করেন— ভগবানকে পাওয়া বুঝি, জগতেরই কোন বস্তু পাওয়ার মতন একটা কিছু। তা নয়, তাঁকে পাওয়া মানেই—আপনি তাঁর হওয়া, আপনাকে তাঁর চরণে অর্পণ করা। তাই ত' বলি—মাকে পাওয়া, আমাকে দেওয়া, ও মা হওয়া, এই তিনই এক কথা। ইহা কি সাধনা করিয়া —খেলা করিয়া হয় ? না হইতে পারে ? হয়—তাঁর দয়ায়, তাঁর ইচ্ছায় ! তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন ; তাই জীব আপনাকে দিয়া ফেলে, অথবা আপনাকে হারায়। তবে জগতে যে একটা সাধনার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—উহার তাৎপর্য অন্য প্রকার—যখন মা আত্মপ্রকাশ করেন—আসেন, তখন তাঁহার আগমনের পূর্বলক্ষণস্বরূপ কতকগুলি ঘটনা জীবের মধ্যে সংঘটিত হইতে থাকে, উহারই নাম সাধনা। যেরূপ জোয়ার হইলে জলগুলি ফুলিয়া উঠে—ঠিক সেইরূপ মাতৃ-আগমনের পূর্বলক্ষণস্বরূপ, জীব সাধন ভজনের অনুষ্ঠান করে। আজ পর্যন্ত যত লোক মাকে পাইয়াছেন তাঁহারা কেহই একথা বলেন নাই যে, আমি সাধনা করিয়া মাকে পাইয়াছি। সাধনা এবং মা, ইহারা পূর্ব পশ্চিম সমুদ্রবৎ অত্যন্ত বিভিন্ন। যতক্ষণ মাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণই মনে হয়, 'আমি কঠোর সাধনা করিতেছি। কিন্তু মাকে পাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সাধনা করিয়া এ জিনিস পাওয়া যায় না, এমন কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা মাকে ধরা যায়। আরে, সাধনা বা উপায়গুলি ত' মন বুদ্ধি নিয়া নড়া চড়া ভিন্ন আর কিছুই নয় ! মা যে আমার ইহা হইতে বহুদূরে অবস্থিতা। যাহা হউক আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এস সাধক, আবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই।

বলিয়াছিলাম— কীর্তন হইতে কেলি বা খেলা হয়। খেলা হইতে প্রেক্ষণ বা অন্বেষণ আরম্ভ হয়। মায়ের পথ চাহিয়া সাধক-সন্তান অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, অথবা মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তারপর গুহ্যভাষণ, মায়ের সন্নিহিত হইয়া যতকিছু আবেদন নিবেদন, যত কিছু সুখ দুঃখের কাহিনী গোপনে প্রাণে প্রাণে চলিতে থাকে। অনন্তর মাতৃ লাভ বিষয়ক দৃঢ় সঙ্কল্প ও তদনুযায়ী অধ্যবসায় বা তীব্র প্রযত্ন আরম্ভ হয়। পূর্বের কেলির সময় অর্থাৎ সাধনকালে যে চেষ্টা যত্ন থাকে, তাহা মৃদু বা ভাসা ভাসা কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র, আর এই অধ্যাবসায় যখন উপস্থিত হয় (মনে রাখিও, মাকে পাওয়ার পূর্বে যথার্থ অধ্যবসায় আসে না) তখন সাধক-প্রাণের টানে, প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মহাপ্রাণে মিলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সর্বশেষে—ক্রিয়ানিষ্পত্তি-সর্বকর্মের অবসান বা নৈষ্কর্ম্য। জীব তখন ব্রহ্ম হইয়া যায়। **'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।'**

আবার বিষয়ের দিক্ দিয়া দেখ—তুমি গোলাপ ফুল

ভালবাস। ফুলকে ফুলমাত্র না বুঝিয়া প্রাণ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। ফুলের স্মরণ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের — মায়ের স্মরণ কীর্তন আরম্ভ হইবে ! এইরূপে অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণেই তোমার ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইবে। যখন গোলাপ ফুলটি পাইবে, তখন আর মনে হইবে না যে, আমি ফুল পাইলাম। তখন দেখিবে—সত্যই উপলব্ধি করিবে—আমার প্রাণই গোলাপ ফুলের রূপ ধরিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে আসিয়াছেন। এইরূপে যখন বিষয়গুলিকে একমাত্র প্রাণের মূর্তিরূপে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তখনই তুমি যথার্থ রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, আসক্তিবর্জিত। সুতরাং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অধিকারী হইতে পারিবে। ইহা শুনিতে যত কঠোর, কার্যে পরিণত তত কঠিন নহে। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই ইহা প্রকৃতিগত হইয়া যায়। তখন আর চেষ্টা করিয়া বিষয়কে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হয় না। আপনা হইতেই উহা নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে প্রেমলক্ষণ ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহাও এই স্মরণ কীর্তন প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে। অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি—গো। ইন্দ্রিয়-প্রবাহ বা শক্তিগুলি—গোপী। পরমাত্মার আকর্ষণে বিষয়াসক্তিরূপিণী গোপীগণ বিষয়রূপ কুল ছাড়িয়া, কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসে। বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া, কৃষ্ণ স্বরূপে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলেই স্মরণ কীর্তনাদি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণেই পর্যবসিত হয়। সুতরাং জাগতিক কার্যগুলির মধ্য দিয়াও একমাত্র কৃষ্ণসেবা বা পরমাত্মপ্রীতি ফুটিয়া উঠে। উহাই শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্বকথিত স্মরণ কীর্তনাদি অষ্টাঙ্গ মৈথুন অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ যখন এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-রূপেই পর্যবসিত হয়, তখনই উহা ‘প্রেম নাম ধরে’ ; আর তাহার বিপরীতভাবে যতদিন কেবল স্বকীয় ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতেই পর্যবসিত থাকে, ততদিন উহা কাম নামেই পরিচিত হয়। প্রেমে ও কামে এই প্রভেদ। কিন্তু সে অন্য কথা—

———○———

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥ ২৩॥

অনুবাদ। গণসৈন্যদিগকে নিপাতিত করিয়া, সেই অসুর মহাদেবীর সিংহকে হত্যা করিবার জন্য অভিধাবিত হইল। ইহাতে অম্বিকা কোপ প্রকাশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর পূর্বোক্ত অষ্টবিধ উপায়ে গণসৈন্যদলকে বিত্রস্ত করিতে লাগিল। চিত্তকে একবার বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই, সাধকের জপাঙ্গ শ্বাস প্রশ্বাস সাধারণ জীবের মতই হইতে থাকে, মহিষাসুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সাধক ! যখন তুমি শ্বাস প্রশ্বাসগুলিকে মাতৃ-নিশ্বাসরূপে উপলব্ধি করিয়া, দেহাত্মবোধকে শিথিল করিতে যত্ন করিতেছ, ঠিক সেই সময় অন্তরে কোন বৈষয়িক স্মৃতি ফুটিয়া উঠিল, ক্রমে উহা কীর্তন কেলি প্রভৃতির মধ্য দিয়া—ক্রিয়া নিষ্পত্তিরূপে পরিণত হইল, এইরূপে যেন তুমি স্থূলে বাহ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইলে, অমনি দেখিবে—তোমার সেই যে মাতৃ নিশ্বাসের উপলব্ধি তাহা হারাইয়াছ। সেই যে আত্ম-সমর্পণের বিপুল আনন্দ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছ। আর তোমার সে বৃত্তিনিরোধের অবস্থা নাই। মনে রাখিও ইহাই মহিষাসুর কর্তৃক গণসৈন্যের বিনাশ।

কেবল এই পর্যন্ত করিয়াই অসুর নিরস্ত হয় না, সিংহকেও আক্রমণ করে। তোমার জীবভাবের প্রতি যে হিংসা, তাহা রহিত হয়। সাধারণ জীবের মত বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অতিকষ্টে একবার দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে বিশুদ্ধ বোধময় মাতৃ স্বরূপে অবস্থান প্রয়াসী হইয়াছিলে, তাহা হইতে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। তুমি যে সত্যই দেবীর বাহন— মাতৃ-শক্তির পরিচালক যন্ত্রমাত্র, এ বোধ হইতেও তুমি বিচ্যুত হইয়া পড়। সাধক ! দেখিও একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষ করিয়া তোমার এত যত্ন, এত সাধনা, এক মুহূর্তে যেন সব ব্যর্থ করিয়া, অসুর-শক্তি স্বকীয় সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বসে। যদি সাধক হইয়া থাক, তবে এ অত্যাচার বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতে পারিবে। কিন্তু ভয় নাই। **‘কোপঞ্চক্রে ততোম্বিকা’** মা আমার ক্রোধময়ী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অচিরাৎ এই অসুরের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

———○———

সোঽপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরঃক্ষুণ্নমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৪॥

অনুবাদ। (অম্বিকার ক্রোধভাব দেখিয়া) সেই মহাবীর্য মহিষাসুরও ক্রুদ্ধ হইয়া, খুর দ্বারা ধরণীপৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চউচ্চ পর্বত সকল নিক্ষেপ এবং ভয়ানক শব্দ করিতেছিল।

ব্যাখ্যা। গণ-সৈন্য নিপাতিত হওয়ায় কিছুকালের জন্য সাধক আপনাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করে ; ইহাই দুর্বলতা। এইরূপ দুর্বলতা সাধক মাত্রেরই আসিয়া থাকে। অন্তর্নিহিত কামনার বীজগুলি যুগপৎ অঙ্কুরিত হইয়া, সাধককে অতিশয় বিব্রত করিয়া তোলে। নির্বাপিত হইবার পূর্বে দীপ-শিখা যেরূপ অতিশয় উজ্জ্বল হয়, মৃত্যুর পূর্বে রোগীর যেরূপ আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মহিষাসুরের এই আক্রমণও ঠিক সেইরূপ। জীবের যখন প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলিত হয়, আবরণ বিক্ষেপাদি নিবীর্য হইয়া পড়ে, তখন মনে হয়—যেন তাহার অন্তর হইতে কামনার মূল উন্মূলিত হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তখন পর্যন্তও সে নিষ্কাম পুরুষ হইতে পারে নাই। তখনও সাধকের অন্তরে কামনার বীজসমূহ লুক্কায়িত থাকে। ঐ গুপ্ত বীজগুলিকে প্রকট করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই মায়ের এই লীলা। ইহাই রাজোগুণরূপী মহিষাসুরের চরম আক্রমণ। সাধক ! যখন তুমি আপনাকে নিষ্কাম পুরুষ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, তখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিও— তোমার অন্তরে কামনার বীজগুলি গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। অথবা অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই, মা স্বয়ংই উহাদিগকে প্রকট করিয়া, অত্যাচারের আকারে তোমার সম্মুখে ধরিবেন ! তখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে—উহারা মহীতল খুরক্ষুণ্ণ করিতেছে, অর্থাৎ তোমার পার্থিব দেহ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; কেবল মনই যে বিষয়ের পশ্চাৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, তাহা নহে ; তোমার স্থুল দেহ— বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়গুলিও বিষয় আহরণে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ ও মন যে পরিমাণে বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে 'আমি মুক্ত হইব, আমি মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থান করিব' প্রভৃতি পর্বততুল্য আশাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; এবং চিত্তক্ষেত্রে নানারূপ বৈষয়িক গোলযোগরূপ নাদ অর্থাৎ কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে অধিকাংশ সাধকই হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। 'আমি বুঝি মোক্ষমার্গে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না' বলিয়া একান্ত বিষাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

———○———

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ॥ ২৫॥
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যুযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥ ২৬॥

অনুবাদ। তাহার ভ্রমণের বেগে মহী ক্ষত বিক্ষত হইয়া বিশীর্ণ ভাব ধারণ করিল। লাঙুলের আঘাতে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দিক প্লাবিত করিতে লাগিল। শৃঙ্গের আঘাতে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইতেছিল। এবং নিশ্বাস-বায়ুর বেগে উৎক্ষিপ্ত পর্বতসমূহ আকাশ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতেছিল।

ব্যাখ্যা। কি শোচনীয় অত্যাচার ! ইহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। মুমুক্ষু সাধকগণ যখন অন্তর হইতে কামনার বীজ সকলকে সমূলে উৎপাটিত করিতে উদ্যত হন, তখন তাহাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ এইরূপ অত্যাচার হইতে থাকে। পূর্বে মহিষাসুরের যে অষ্টবিধ অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহাই তাহার একমাত্র সম্বল। কোথাও দুইটি, কোথাও চারটি, কোথাও ছয়টি, কোথাও আটটি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়া থাকে। অসুরের এতদ্ অতিরিক্ত অস্ত্র বা অত্যাচার আর কিছুই নাই। এ স্থলে বেগে ভ্রমণ, লাঙুলাঘাত, শৃঙ্গকম্পন এবং শ্বাসানিলরূপ চারটি অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা যথাক্রমে মহী, অব্ধি, ঘন এবং নভঃ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ঘন শব্দটি বায়ু ও তেজস্তত্ত্বের উপলক্ষণ। যদিও মেঘ জলেরই পরিণামমাত্র, তথাপি বায়ুমার্গেই উহার গতি স্থিতি ও উৎপত্তি বলিয়া ঘন শব্দে এখানে মরুৎতত্ত্বই বুঝিতে হইবে। মন্ত্রে তেজস্তত্ত্বের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও বিদ্যুৎযুক্ততা নিবন্ধন ঘনশব্দে তেজস্তত্ত্বও বুঝিতে হইবে। স্থূল কথা পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়

ইহাদের উপরই কামনার যত কিছু অত্যাচার। ক্ষিতিতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা ও কর্মেন্দ্রিয় পায়ু। অপ্ তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা, কর্মেন্দ্রিয় উপস্থ। তেজস্তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও কর্মেন্দ্রিয় পাদ। মরুৎতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্, কর্মেন্দ্রিয় পাণি এবং ব্যোম তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ, কর্মেন্দ্রিয় বাক্। এইরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় ; এই পর্যন্তই কামনার ক্ষেত্র। ইহার উপরে কামনা বলিয়া কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূতেরই সাত্ত্বিক বা রাজসিক পরিণামমাত্র। সুতরাং কামনার ক্ষেত্র বলিলে, সংক্ষেপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পর্যন্তই বুঝা যায় ; তাই মন্ত্রে দেখিতে পাই—মহিষাসুরের অত্যাচার, মহী অব্ধি ঘন (তেজ ও মরুৎ) এবং নভঃ, এই পঞ্চতত্ত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। সাধারণ জীবে ও সাধকে এইখানেই প্রভেদ। বিষয়কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে গেলে উহা যে অসুরের অত্যাচার হয়, ইহা সাধারণ জীব কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও ধারণা করিতে পারে না। সে মনে করে—উহা পাগলের প্রলাপ মাত্র। আমি চক্ষু দিয়া গোলাপ ফুলটি দেখিলাম, ইহার মধ্যে আবার অসুরের অত্যাচার কি ? এই জন্য প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মাত্র তাঁহাদের পক্ষেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই আধ্যাত্মিক রহস্য অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ হইবে।

সে যাহা হউক, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বিষয়রূপ কামনা ক্ষেত্রে যাহাদের আবির্ভাব হয়, উহারাও যে বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, চৈতন্য বা প্রাণই যে উহার একমাত্র সত্তা, এইরূপ উপলব্ধি হইতে সাধক যে মুহূর্তে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্তেই উহারা পৃথকরূপে সত্তাবান হইয়া চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ইহা মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দিবার জন্যই অত্যাচারের অভিনয়।

সাধক ! তুমিও তোমার চিত্তক্ষেত্রে লুক্কায়িত কামনারাশির কার্যকলাপ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ কর। দেখিবে—উহারা যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সত্য সত্যই মহী বেগভ্রমণ-বিক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ আকস্মিক কামনার বেগে কত সাধক যে আপনাদিগকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে স্খলিত বলিয়া মনে করে, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যখন প্রবলভাবে কামনার বেগ প্রবাহিত হয়, তখন যথার্থই নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও হীন বলিয়া মনে হয়। উচ্চ সাধনা, কঠোর তপস্যা, অলৌকিক যোগশক্তি, সকলই যেন মুহূর্ত মধ্যে ভাসাইয়া দেয়।

তারপর **'লাঙুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ'**। পুচ্ছদ্বারা আহত হইয়া সমুদ্র সর্বত্র প্লাবিত করিয়া দেয়। অব্ধি শব্দে কেবল জলসমুদ্র না বুঝিয়া রসের সমুদ্র, এবং পুচ্ছ শব্দে কর্মফল বুঝিয়া লও। পুচ্ছ—কামনারূপ অসুরের চরম অবয়ব। কর্মফলই কামনার চরম প্রতিষ্ঠা। উপনিষদেও পুচ্ছ প্রতিষ্ঠারূপেই উক্ত হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট কর্মফলের মোহে সাধক একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হইতে পারে—উহা অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য ; কিন্তু যে রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া, সাধক যাবতীয় বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষার পরপারে চলিয়া যাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সেই রসসমুদ্র নগণ্য বিষয়াসক্তি দ্বারা তরঙ্গায়িত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কেবল ইহাই নহে, শৃঙ্গাঘাতে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইতে থাকে। শৃঙ্গ—উত্তমাঙ্গ। মেঘ—তেজ ও মরুৎ তত্ত্ব। বিষয়-চিন্তনে দেহস্থ তেজ ও মরুৎতত্ত্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উহারা প্রতিনিয়ত বৈষয়িক স্পন্দন নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে, শ্বাস প্রশ্বাসের যে সমতা— নাসাভ্যন্তরচারিতা, তাহাও দূরীভূত হয়। উহারা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বৈষয়িক চিন্তা উপস্থিত হইলেই, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যে অস্বাভাবিক হয়, ইহা একটু ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন। যতক্ষণ মাতৃ-নিশ্বাস বলিয়া বোধ থাকে, ততক্ষণ উহাদের গতি অতি মৃদু— উদ্বেলনশূন্য থাকে ; কিন্তু যেই বিষয় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি উহারা অতি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-লাভ বিষয়ক অন্তরের পর্বত প্রমাণ উচ্চ আশাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইতে থাকে। ইহাই মন্ত্রস্থ—শ্বাসানিলের বেগে পর্বত পতন কথাটির তাৎপর্য।

এইরূপ যত অত্যাচারই আসুক, তুমি সাধক, তুমি মাতৃলিপ্সু সন্তান, তুমি অবসন্ন হইও না, হতাশ হইও না। নিজের অঙ্গে বিরুদ্ধ কর্মফলের মলিনতা দেখিয়া, মায়ের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইও না। নিজের মলিনতার চিন্তা

করিও না, বিষয়ের—সংসারের চিন্তা করিও না। চিন্তা যদি করিতে হয়, মাতৃ চিন্তাই করিও। বিষয়ের মধ্যে চিন্তা করিবার মত কিছু নাই। জগতের কার্যগুলি উপস্থিতমতে সাধারণ জ্ঞানেই বেশ সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। চিন্তা করিয়া মাথা খাটাইয়া জগতের কোন কার্যই করিতে হয় না! আমরা বহুদিন যাবৎ বিষয় চিন্তা করিয়া করিয়া এমনই অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে চিন্তা বলিলেই বিষয় চিন্তা বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক কিন্তু জগতের কার্যগুলি চিন্তা ব্যতীতও বেশ সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। যেরূপ ক্ষুধা হইলে আহার করি, মলমূত্রের বেগ আসিলে উহার নিঃসারণ করি, এ সকল বিষয় পূর্ব হইতে একটা চিন্তা করিতে হয় না; ঠিক সেইরূপ অর্থোপার্জন, বিষয়সংরক্ষণ ইত্যাদিও চিন্তা ব্যতীত বেশ নিষ্পন্ন হইতে পারে—যদি মাতৃ মুখী চিন্তাপ্রবাহ থাকে। ভগবানও বলিয়াছেন—'**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**'। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই! সুতরাং চিন্তা করিবে ত' আমারই চিন্তা কর। এইরূপ করিলেই তোমার যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করিব—তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আমি বহিয়া আনিয়া দিব।'

মা, বুঝিলাম তোমাকে ভাবিতে পারিলে, আর আমাদের অন্য কোন ভাবনাই থাকে না। কিন্তু তাহা যে পারি না! বারংবার অনাবশ্যক বিষয় চিন্তা আসিয়া চিত্তক্ষেত্রকে আকুল করিয়া তোলে। তোমার ভাবনা ছাড়িয়া, কতক্ষণে বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত হইব, সেই অবসর খুঁজিতে থাকি। একটু যদি তোমার কথা নিয়া বসি, তবে কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকি—কতক্ষণে বিষয় চিন্তায়, বাজে কার্যে নিযুক্ত হইব।

মাগো, এমনই আমাদের বহির্মুখী প্রকৃতি। এমনই আমাদের প্রতি মহিষাসুরের অত্যাচার। বুঝি—ইহা অন্যায়, বুঝি—ইহা অত্যাচার; তথাপি মা, উহাই যে ভাল লাগে। বিষয় যে বড় প্রীতিকর! মাগো! কতদিনে আমাদের আসুরিক প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে? কতদিনে আমরা কেবল তোমারই চিন্তায় কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইব? কতদিনে আমাদের সর্ববিধ বৈষয়িক প্রীতি তোমাতে পর্যবসিত হইবে? কতদিনে আমাদের সকল ভালবাসা কেন্দ্রীভূত হইয়া আত্মারূপিণী মা তোমাতেই পর্যবসিত হইবে? কতদিনে পরমপ্রেমের আস্বাদে আমাদের জীবন ধন্য হইবে? মাগো! সন্তানের এ আশা কতদিনে পূর্ণ হইবে?

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ ॥ ২৭॥

অনুবাদ। এইরূপে সেই মহাসুর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অভিপতিত হইতেছে দেখিয়া চণ্ডিকা তাহাকে বধ করিবার জন্য কোপ প্রকাশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্বে এই মহিষ যখন সিংহের প্রতি প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল তখনও মা একবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে ক্রোধে জীবের যাবতীয় সঞ্চিত কামনার মূল শিথিল হইয়াছে। আবার কিছু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, আবার দেবতাগণ বলিতেছেন—'**রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্**'। মা রুষ্টা হইলেই সন্তানের যাবতীয় কামনা বিধ্বস্ত হয়। এখানেও মায়ের কোপে তাহাই হইতেছে—জীব এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, সে আর সঞ্চিত কামনার বিন্দুমাত্র উদ্বেলন দেখিতে চায় না। অথচ লুক্কায়িত কামনার বীজগুলি মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধককে উৎপীড়িত করে। তাই মা দেখিলেন—এখন আর নীরব থাকিলে চলিবে না, শুধু ক্রোধ করিলে চলিবে না। এ অসুরকে নিহত করিতেই হইবে। যে পরিমাণ ক্রোধের উদ্দীপনা হইলে উহার নিধন সাধন হইতে পারে, মা আমার সেই পরিমাণ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—'**তদ্বধায় কোপমকরোৎ**।' অসুর-নিধনোপযোগী ক্রোধের বিকাশ হইয়াছে। ইহাই মায়ের আমার চণ্ডিকা-মূর্তি! তাই ঋষিও মন্ত্রে 'চণ্ডিকা' শব্দটির প্রয়োগ করিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি—সন্তান যেখানে উৎপীড়িত, মাতা সেখানে কুপিতা; ইহাই চণ্ডিকা মূর্তির রহস্য। আমরা যে শত অত্যাচারেও উৎপীড়িত হই না! তাইত' মা আমার চণ্ডিমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন না। যে মুহূর্তে আমরা সত্যসত্যই আমাদিগকে উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই মাতৃ বক্ষে স্নেহের বন্যা উঠিবে, মা সন্তানকে অসুরত্রাস হইতে মুক্ত করিবেন। ইহাই মাতৃত্ব। নতুবা মা কি? ওরে মাকে বলতে হয় না—'মা! আমায় ভয় হইতে পরিত্রাণ কর।' যথার্থ ভীত হইলে, মা স্বয়ংই পরিত্রাণ করেন। আমরা মুখে সহস্রবার বলি—'**ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ**।' কিন্তু প্রাণে কি সত্যই ভবসাগরকে

দুঃখদায়ক বলিয়া বুঝিয়াছি ! তাহা নহে, উহা দশজনে বলে, তাই আমিও বলি মাত্র ! মা আমাদের প্রাণ দেখেন। যেদিন বুঝিব এই ভবটা যথার্থই দুস্তর সাগর, সেদিন আর **'ত্রাহি মাং'** বলিতে হইবে না। বলিবার পূর্বেই মা বক্ষে তুলিয়া লইবেন। আমরাও দুস্তর ভবসিন্ধু অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাইব। ঐ দেখ সাধক। তোমার প্রাণে যথার্থ উৎপীড়ন বোধ ফুটিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য স্নেহময়ী মা নির্নিমেষ-নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। ওগো, কবে তোমরা সত্য সত্যই মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে ?

———○———

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৮॥
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ২৯॥
ততএবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥ ৩০॥
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্জ চ।
কর্ষতস্তু করন্দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩১॥
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২॥

অনুবাদ। দেবী পাশ নিক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বদ্ধ করিলেন, সেও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়াই মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্বক তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিলে দেবী তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন সে খড়্গপাণি পুরুষরূপে দেখা দিল। দেবী সেই খড়্গ-চর্মধারী পুরুষমূর্তিকে বাণদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অসুরও তখন মহাগজের রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর বাহন মহাসিংহকে শুণ্ড দ্বারা আকর্ষণ ও ভয়ানক গর্জন করিতে লাগিল। দেবীও সেই আকর্ষণকারী হস্তীর শুণ্ড খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন। অনন্তর সেই মহাসুর পুনরায় মহিষ-রূপ ধারণপূর্বক পূর্ববৎ সচরাচর ত্রিলোককে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। তাৎপর্যবোধে সুবিধা হইবে বলিয়া পাঁচটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা একত্র সন্নিবেশিত হইল। এই মন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—মহিষাসুর যখন সিংহের প্রতি অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল তখন দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাশবদ্ধ মহিষ তখন সিংহমূর্তি ধারণ করিল। সিংহের মস্তকচ্ছেদন করিতে না করিতে, সে খড়্গপানি পুরুষরূপে দেখা দিল। দেবী বাণ প্রহারে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। অমনি মহাগজমূর্তি ধারণ করিয়া শুণ্ডদ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ ও গর্জন করিতে লাগিল। দেবী তাহার শুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। তখন সে মহিষমূর্তিতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পূর্ববৎ অষ্টবিধ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল।

বড় সুন্দর রহস্য ! এস সাধক আমরা মাতৃ-চরণ স্মরণ করিয়া এই রহস্যে অবগাহন করি। তিনি আমাদের ধী উন্মেষিত করুন। আমরা চণ্ডীর রহস্য সম্যক্ অবগত হইয়া সংশয়ের পরপারে চলিয়া যাই।

প্রথম মহিষাসুরের পরিবর্তিত রূপগুলির বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক। (১) মহিষ (২) সিংহ (৩) খড়্গপাণি পুরুষ (৪) মহাগজ (৫) পূর্ণমহিষ। ইহাদের পূর্ব পূর্বটি নিহত হইলে, পর পর মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সঞ্চিত কামনারাশির প্রথম অত্যাচার মহিষ রূপধারী অসুরের উৎপীড়ন। ইহা পূর্ব মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় মূর্তি—সিংহ ! জীব যখন কামনার প্রতি হিংসা করিতে আরম্ভ করে, তখনই মহিষ সিংহরূপে পরিবর্তিত হয়। কথাটা একটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। জীব সঞ্চিত কামনারাশির উৎপীড়নে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া, উহার ধ্বংস করিবার জন্য সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে। স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল বা পর্বত কন্দর আশ্রয় করে। ইহারই নাম কামনার মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্বক সিংহরূপ ধারণ। জীব এতদিন শুধু বাসনা দ্বারা উৎপীড়িত হইত, এইবার বাসনা-ত্যাগের বাসনা দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে। মনে রাখিও— বাসনা-ত্যাগের বাসনাও বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অন্তরে বাসনার বীজগুলি পুঞ্জীভূত থাকে ; আর বাহির হইতে নানারূপ কঠোর সংযম ব্রত নিয়মাদির সাহায্যে উহাদিগের উদ্বেলন নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা খুব উচ্চতম অবস্থা সন্দেহ নাই , কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহা বাসনার বেশ পরিবর্তনমাত্র। গৈরিক বস্ত্র পরিধান কিংবা বৃক্ষতলে বাস করিবার বাসনাও বাসনা। তত্ত্বজ্ঞগণ এতদুভয়ের মধ্যে

কোনও পার্থক্য দেখিতে পান না। একজন সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যদি মনে করেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছি ; তবে তাহা অপেক্ষা, যিনি অট্টালিকাস্থিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, মাতৃ-অঙ্কে শয়নের সম্বেদনে পুলক কণ্টকিত হন, তিনি যে সমধিক ত্যাগী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম বাসনা-ত্যাগের বাসনাও অসুরের অত্যাচার। মা এইরূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের শিরশ্ছেদ করেন অর্থাৎ বাসনার প্রতি হিংসাভাব পোষণ করাও যে, বাসনারই রূপান্তর মাত্র, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তখন আর ত্যাগের বাসনাও থাকে না। এই অবস্থায় কামনা অন্য মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। সে মূর্তি —খড়্গাপাণি পুরুষ! খড়্গাপাণি শব্দটি ছেদ — তাৎপর্যবোধক ! মাতৃ-কৃপায় জীব যখন বুঝিতে পারে—ত্যাগের বাসনাও বাসনা, তখন আর তাহাতে চিত্তক্ষেত্রে কামনার বীজ কোনরূপে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্ব করে ; সে উপায়— বৃত্তি নিরোধ। ইহাই খড়্গাপাণি পুরুষ। কোনরূপে যদি চিত্তের বৃত্তি-প্রবাহকে নিরুদ্ধ করা যায়, ভাল-মন্দ, ত্যাগ-গ্রহণ কোনরূপ বৃত্তিকে আর প্রকাশিত হইতে দেওয়া না যায়, তবেই সকল আপদ বিদূরিত হয় ; এইরূপ মনে করিয়া জীব প্রাণপণে বৃত্তি-নিরোধে যত্নবান হয়। কাটিয়া ছাটিয়া সব বাদ দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য, ইহাই খড়্গাপাণি পুরুষের আবির্ভাব। কিন্তু মা অচিরে বাণনিক্ষেপে এই পুরুষকেও দ্বিখণ্ডিত করেন, অর্থাৎ স্নেহের সন্তানকে ধীরে ধীরে দেখাইয়া দেন—বৃত্তি-নিরোধরূপ ব্যাপারটিও চিত্তের ধর্ম। ব্যুত্থান, চঞ্চলতা, বিক্ষেপ, ওগুলি যেরূপ চিত্ত-ধর্ম, ঐ নিরোধনামক অনুষ্ঠানটিও ঠিক সেইরূপ চিত্তেরই একপ্রকার ধর্মমাত্র। যোগসূত্রকার স্বয়ং পতঞ্জলিদেবও ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের উদ্দেশ্য আত্মলাভ। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ চিত্ত-ধর্ম লাভ করা তাহার লক্ষ্য নহে। অবশ্য এরূপ নিরোধেও একটা অব্যক্ত সুখ আছে। পাঁচ মণ ভারবাহী ব্যক্তির মস্তক হইতে যদি ভারটি নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে যেরূপ অনেক স্বস্তি বোধ করে, বৃত্তি নিরোধেও ঠিক সেইরূপ সুখ আছে। মুহুর্মুহুঃ একটার পর একটা তরঙ্গ আসিয়া চিত্তক্ষেত্রকে স্পন্দিত করিতেছে, একটি বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতেই, আর একটি আসিয়া চিত্ত-ক্ষেত্রে উঁকি মারিতেছে। এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কোনরূপে যদি ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই ত' পরম লাভ। এইরূপ মনে করিয়াই জীব বৃত্তি-নিরোধে যত্নবান হয়। কিন্তু পরম সুখ বা যথার্থ শান্তি এইখানে নাই। চিত্তটা শান্তিক্ষেত্রে নহে। নিরুদ্ধই হউক বা বিক্ষিপ্তই হউক, ওখানে যথার্থ শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি পাইতে হইলে বুদ্ধিরও উপরে উঠিতে হইবে। আত্মক্ষেত্রে—অমৃতময় মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিতে হইবে। যেখানে চিত্ত বলিতে, বৃত্তি বলিতে নিরোধ বলিতে, কিংবা বিক্ষেপ বলিতে কিছুই নাই, সেখানে যাইতে হইবে। শুধু মাথার বোঝা ফেলিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে যথার্থ শান্তিলাভ হয় না, রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়। যে আসন মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই—স্নেহময়ী মায়ের মধুময় অঙ্কে অবস্থান করিতে হইবে—আত্ম-সংস্থ হইতে হইবে, যেখানে গেলে ভ্রান্তি সংশয় অজ্ঞান চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়, সেই আমার পরমধামে অবস্থান করিতে হইবে, এই তত্ত্ব মা যখন কৃপা করিয়া জীবকে উপলব্ধি করাইয়া দেন, তখনই বৃত্তি নিরোধের প্রতি জীবের যে প্রবল আসক্তি তাহা দূরীভূত হয়। ইহাই দেবী কর্তৃক খড়্গা-পানি পুরুষের নিধন।

অতঃপর মহাগজরূপে আবির্ভাব ! গজ ধাতুর অর্থ বন্ধন। মহাগজ শব্দের অর্থ মহাবন্ধন। যে বন্ধন ছেদন করা দুরূহ, তাহাই মহাবন্ধন। এই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে ; বৃত্তি নিরোধ, বাসনা ত্যাগ কিংবা সাময়িক মাতৃ-অঙ্কে অবস্থান—যাহাই করি না কেন, বাসনার অত্যাচার হইতে একেবারে পরিত্রাণ কিছুতেই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ কৌশলের সাহায্যে বৃত্তি-নিরোধপূর্বক শূন্যবৎভাবে, সুষুপ্তবৎ অবস্থান করা যায়, ততক্ষণ বেশ কাটিয়া যায় ; কিন্তু নিরোধ ত' চিরস্থায়ী হয় না, আবার ব্যুত্থিত হইতে হয়। অথবা মা-ও ত' দীর্ঘকাল স্বকীয় অঙ্কে স্নেহের পরশে সন্তানকে ধরিয়া রাখেন না, আবার ছাড়িয়া দেন ! তখন যে পুনরায় কামনা দেখা দেয় ! যতক্ষণ আত্ম-সংস্থ হইয়া থাকা যায়, ততক্ষণ উহাদের নাম গন্ধও থাকে না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার অনাত্মবোধ ফুটিয়া

উঠে। পুনঃপুনঃ এইরূপভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় কামনা-জয় একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সাধক তখন অতিশয় ব্যথিত হইতে থাকে। 'হায় ! এই অব্যক্ত, অচ্ছেদ্য বন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছুই উপায় নাই !' এইরূপ ভাবিয়া জীব কিছু দিনের জন্য যেন হতাশ হইয়া পড়ে। ইহাই **'তঞ্চকর্ষ জগর্জ চ'** — ইহাই মহাগজরূপধারী মহাসুরের আকর্ষণ গর্জনরূপ আক্রমণ। তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখা যায়—জীব যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তখনই সে বদ্ধ ! বাস্তবিক, বন্ধন বা মুক্ত বলিতে কিছুই নাই। নিত্য মুক্ত, নিত্য স্বাধীনপরমাত্মার বন্ধনজ্ঞান কল্পনামাত্র—একটা লীলামাত্র। তথাপি জীবের পক্ষে কিন্তু এই বন্ধনজ্ঞানই সুদুর্লভ। বহু জন্মের পর, বহু সাধনার ফলে মায়ের কৃপায় জীব আপনাকে যথার্থই বদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। ওরে ! বন্ধনজ্ঞান হওয়াটাই ত' সাধনার ফল ! মুক্তি সাধনার ফল নহে। মুক্তি তো নিত্য ; চিরমুক্ত। বন্ধনবোধ হয় কই ? মুখে সহস্রবার বলা যায় — আমি বদ্ধ ; কিন্তু বন্ধন যে কোথায় তাহা জীব প্রথমে বুঝিতে পারে না। সাধারণ জীবের বন্ধনজ্ঞান —সংসারের উৎপীড়নজন্য একপ্রকার আনুমানিক জ্ঞানমাত্র। বদ্ধ অবস্থার যথার্থ উপলব্ধি তাহাদের হয় না। কিন্তু মা আমার স্নেহের সন্তানকে মুক্তির আস্বাদ ভোগ করাইবেন ; তাই আজ মহাবন্ধনের স্বরূপটি জীবের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিলেন। তাই আজ মহিষাসুর মহাগজ মূর্তিতে আবির্ভূত হইল। ক্ষণকালের তরেও মুক্তির আস্বাদ না পাইলে, যথার্থ বদ্ধভাবের উপলব্ধি হয় কি ?

বন্ধন বন্ধন বলিয়া একটা আর্তনাদ জগতে বহুদিন হইতে উঠিয়াছে। আজকাল নয়, দার্শনিক যুগের বিষয় আলোচনা করিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় — বন্ধন-জ্ঞানটা এদেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। 'আমরা বদ্ধ জীব' এইরূপ ভাবনা করিতে ভারত যেদিন হইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে কেবল যে মায়ার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা নহে, বাহিরের বন্ধনও ভারতবাসীকে জর্জরীভূত ও অবসন্ন করিতেছে ! কিন্তু সে অন্য কথা—

ওগো ! আমরা যে কল্পতরু-মূলে বসিয়া আছি ! এখানে বসিয়া যাহা ভাবিব তাহাই যে পাইব ! তাহাই যে সত্য হইবে ! শোন —একটা গল্প বলিতেছি। একজন পথিক অতিশয় শ্রান্ত হইয়া, প্রান্তর-মধ্যস্থ এক বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। তখন গ্রীষ্মকালের দারুণ মধ্যাহ্ন, পিপাসায় পথিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত ! সে ভাবিতে লাগিল—আহা, এই সময় একটা ডাব নারিকেল যদি পাই, তবে প্রাণটা রক্ষা পায় ; নতুবা আজ পিপাসায় প্রাণ গেল ! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই পথিক দেখিতে পাইল — তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর ডাব নারিকেল রহিয়াছে। দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু উহাকে কাটিবার মত কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে না থাকায় হতাশভাবে অস্ত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ কাটারি নিপতিত দেখিয়া, আহ্লাদে নারিকেলটি কাটিয়া জল পান করিল ও সুস্থ হইল ! তখন আস্তে আস্তে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় একখানা শয্যার আবশ্যকতা অনুভব করিল। অমনি পার্শ্বদেশে একখানি শয্যা খট্টাসহ স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। তখন প্রফুল্লচিত্তে সেই বৃক্ষচ্ছায়াস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি ! যাহা ভাবি, তাহাই পাই এত বড় চমৎকার ! আচ্ছা ভাল, এ সময়ে যদি কোন স্ত্রীলোক আসিয়া আমার পদসেবা করে তবে বড়ই আনন্দে নিদ্রা যাইতে পারি। এই চিন্তা করিতে না করিতেই দেখিতে পাইল—একটি সুন্দরী রমণী পদতলে উপবিষ্টা। সে হাত বাড়াইয়া পদসেবা করিতে উদ্যত হইলে, পথিকের মনে বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। তাইত' ! এই সব ভৌতিক ব্যাপার নাকি ? জনহীন প্রান্তরে এই সকল ঘটনা ভূতের কার্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এ নিশ্চয়ই ভূত আসিয়াছে। এই স্ত্রী মূর্তি ভূত ! সর্বনাশ, এখনই যদি আমার ঘাড় ভাঙিয়া দেয়, তবে কি হইবে ? যেমন চিন্তা, অমনি সেই স্ত্রীলোকটি ভূতরূপে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া অদৃশ্য হইল ! পথিক জানিত না, সে যে বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছিল, উহা কল্পবৃক্ষ।

ঠিক এইরূপেই আমরাও নিত্য কল্পতরু মূলে বসিয়া ভাবিতেছি— 'আমি বদ্ধ' তাই আমাদের বন্ধন কিছুতেই বিদূরিত হয় না। প্রথমে স্ত্রীপুত্রাদিকেই বন্ধন মনে করি, তারপর এই দেহটাকে বন্ধন বলিয়া বুঝিয়া লই, আর যাহারা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে বন্ধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ত' শীর্ষ স্থানীয়। জগতে তাঁহারা

সাধুমহাপুরুষ নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। যদিও বর্তমানে বেদান্তদর্শন এ সকল বন্ধনকেই কল্পিত, মিথ্যা, ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি উহার হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পান নাই। তাঁহারা বলেন—জ্ঞানলাভ হইলে, অর্থাৎ একবার ভ্রান্তি দূর হইলেও ভ্রান্তির ফল কিছুকাল থাকে। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া, ভয়-পলায়ন-হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হইবার পরমুহূর্তেই, রজ্জুজ্ঞান হইলেও অর্থাৎ সর্পভ্রান্তি বিদূরিত হইলেও, পূর্বলব্ধ ভীতিভাব—হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণগুলি কিছুক্ষণ থাকিয়া যায় ; ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও কিছুকাল মায়ার অধ্যাস থাকে। থাকুক, যাঁহারা মায়াকে বন্ধন বলেন, তাঁহারা বন্ধন দেখুন। আমাদের মায়াও মা ; সুতরাং মায়ার বন্ধন আমাদিগের নিকট মায়ের স্নেহালিঙ্গন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আমরা নিত্য মুক্ত ! আমরা মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্ন শিশু ; সুতরাং আমাদের বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। আরে জগৎটা যে মায়ার বা মায়ের খেলা ; ইহা ঠিক ঠিক যেদিন বুঝিতে পারিবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে—এ জগৎ আমারই খেলা ! আবার আমার খেলা বলিয়া যেদিন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে—খেলা বলিয়া কোথাও কিছুই নাই। কেবল 'আমি' আছে। না তখন আমি শব্দও থাকে না ; যাহা থাকে, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব ? যদি 'আমি' শব্দশূন্য 'আমি' বস্তুটাকে ধারণা করিতে পার, তবে তাহার কিছু আভাস পাইবে। ওঃ সে কি মধুময় অবস্থা ! কি আনন্দময় সে স্বরূপ। জানিনা কোন কোন সাধক কি করিয়া বলেন—'চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।' তাঁহারা বুঝি মনে করেন — নির্বিকল্প অবস্থাটা সুষুপ্তিবৎ আমিবোধশূন্য অন্ধকারময় একটা কিছু। তা নয় গো, তা নয়। উহা পরম জ্ঞানময়, পরম আনন্দময়, পরম প্রেমময় অবস্থা। ভোগ্য নাই, ভোক্তা নাই, কেবল আনন্দস্বরূপ। ওগো এখানে যে চিনি না হইলে, চিনির আস্বাদ পাওয়া যায় না। ইহা ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করিব ? যাহা হউক, সে অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া, আবার জগৎ-খেলা দেখি— সে যে আমারই খেলা ! আ-মা'রই খেলা গো ! আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই খেলা করি। **'স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি'** ; আমার ইচ্ছা হয়েছে—স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগের লীলা বিলাস করবো, তাতেই আমি সুখী হব তাই খেলছি। যেদিন আর ভাল লাগবে না, যে দিন আর এই জগৎস্বপ্ন দেখবার ইচ্ছা হবে না, সেই দিন সব ছেড়ে একেবারে উলঙ্গ আমি এ খেলার পরপারে চলে যাব। তখন একবার 'আমিকে' দেখবো, আবার জগৎ খেলায় যোগ দিব। ইহার মধ্যে বন্ধনই বা কোথায়, আর মুক্তিই বা কোথায় ? যোগশাস্ত্র বলেন—বিষয়াসক্ত চিত্তই বন্ধন, আর নির্বিষয়-চিত্তই মুক্তি। যাঁহারা বিষয়কে 'আমি' হইতে পৃথক্ একটা সত্তারূপে দেখেন, তাঁহাদের চিত্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, বিষয়াসক্তি থাকিবে ; সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধন দেখিবেন ও প্রাণপণে বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা দেখেন—সবই আমি, সবই মা, তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নাই, বিদ্বেষও নাই। ত্যাগ নাই, গ্রহণও নাই ; তাই তাঁহাদের বন্ধন নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু এ সকল অন্য কথা নিয়া আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

মহাগজ বা মহাবন্ধন-জ্ঞান হইতেই জীবের নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ হয়। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলেই, জীব নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রস্থ 'চকর্ষ' পদের তাৎপর্য। মা আমার দয়া করিয়া জীবের এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণটা দূর করিয়া দেন। ইহাই— **'কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত'**রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাহারা মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারা যতই বন্ধন-জ্ঞানের নিকটবর্তী হউক না কেন, তাহাতে তাহাদের নিম্নগতি সূচিত হয় না ! কারণ, তাহারা জানে—'আমি' নিত্যমুক্ত। যাহারা সর্বাবস্থায়ই মাতৃ-চরণ জড়াইয়া ধরিয়া আছে— আকর্ষণ তাহাদের কি করিবে ? না না, তাহারা মাকে ধরে নাই। মা স্বয়ং তাহাদের হাত ধরিয়াছেন, সুতরাং মহাগজ যতই আকর্ষণ করুক না কেন, কিছুতেই অধঃপাতিত করিতে পারিবে না। আমাদের দুর্বল হস্ত দ্বারা মাকে ধরিয়া থাকিলে বরং হাত ছাড়াইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে ; কিন্তু আমরা যে সর্বতোভাবে মায়ের হাতে ধৃত হইয়া রহিয়াছি ; সুতরাং সে হাত হইতে আমাদের স্খলন কখনই সম্ভবপর নহে।

সে যাহা হউক, এইরূপে মায়ের খড়্গাঘাতে মহাগজমূর্তি দ্বিখণ্ডীকৃত হইল—বিমল বিজ্ঞান-আলোকে

কল্পিত বন্ধনের স্বরূপ অপনীত হইল। তখন অসুর পুনরায় মহিষমূর্তি ধারণ করিল। সঞ্চিত কামনার বীজগুলি নানারূপে মূর্তি পরিবর্তন করিয়াও যখন কিছু করিতে পারিল না, বরং প্রত্যেক ছদ্মবেশটিই মায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন অগত্যা পুনরায় সেই মহিষমূর্তিতে প্রকাশ্য কামনা বাসনার আকারে পূর্বোক্ত স্মরণ কীর্তনাদি অষ্টবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিল। ঐ আটটি ব্যতীত কামনার অন্য কোন অস্ত্র নাই, তাই মন্ত্রে **'তথৈব ক্ষোভয়ামাস'** বলা হইয়াছে। পূর্বে ভূতল এবং ব্যোমমণ্ডলকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল, এইবার ত্রিলোকব্যাপী অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। মূলাধার হইতে মণিপুর পর্যন্ত এক লোক, মণিপুর হইতে বিশুদ্ধ পর্যন্ত এক লোক, এবং বিশুদ্ধ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত অপর এক লোক। সহস্রার লোকাতীত, তাই সেখানে অসুর অত্যাচার পৌঁছায় না। মণিপুর পর্যন্ত ভূলোকীয় বা পার্থিব অত্যাচার, অর্থাৎ পুত্র ধন যশ প্রতিপত্তি প্রভৃতির কামনা। বিশুদ্ধ পর্যন্ত ভুব বা দেবলোকীয় অত্যাচার, অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, উদারতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতির কামনা, আর আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সিদ্ধিশক্তি, সর্বজ্ঞতা, সর্বভাবাধিপত্য ইত্যাদি ঐশ্বরিক শক্তিবিষয়ক কামনার অত্যাচার। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— মহিষাসুর সচরাচর ত্রিলোককে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মনে রাখিও—এ সকল কামনা আগন্তুক নহে, সঞ্চিত সংস্কারমাত্র। অসুর ক্রমে উচ্চ উচ্চ লোকীয় কামনার বীজগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া, তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে। উদ্দেশ্য —তোমার অলক্ষ্য দুর্বলতা তোমাকে দেখাইয়া দিয়া চিরদিনের তরে আত্মরাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখিবে। কিন্তু ভয় নাই সাধক, যখন তুমি মায়ের কৃপায় এই উচ্চস্তরীয় কামনাগুলিকে অসুরের অত্যাচার বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমার কোন ভয় নাই। মাতৃ-কৃপায় অচিরে এ অত্যাচার হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইবে।

———○———

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৩॥

অনুবাদ। অনন্তর ক্রুদ্ধা জগন্মাতা পুনঃ পুনঃ উত্তম মধু পান এবং আরক্ত নয়নে হাস্য করিতে লাগিলেন!

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নানাপ্রকারে আত্মরূপ পরিবর্তিত করিয়া সিংহকে বিমথিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্তু মাতৃ-অস্ত্র প্রভাবে সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে ; ইহা দেখিয়াও যখন আবার পূর্ববৎ অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইল না, তখন মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, এইবার স্বহস্তে তাহাকে নিধন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মধুপান করিতে লাগিলেন। মধুপান-রহস্য কিছু পরে বিবৃত হইবে! মা পুনঃ পুনঃ মধুপান করিয়া আরক্ত নয়নে হাস্য করিতে লাগিলেন ! ইহাই মহিষাসুর নিধনের পূর্বরূপ। দেখিয়াছ সাধক, মায়ের আমার সে হাস্যময়ী আরক্ত নয়নের মুখভঙ্গিমা ? স্নেহ ও ক্রোধ, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, রক্ষা ও ধ্বংস, অভয় ও ভীষণ—এই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধভাব যুগপৎ যে মুখে ফুটিয়া উঠে, সেই মুখ গো, সেই মুখখানা ! মায়ের আমার সে হাস্য ক্রোধময়ী মুখভঙ্গিমার কথা স্মরণ করিলেও যে বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠে! মা যে আমাদিগকে কত ভালবাসেন, তাহা মায়ের সেই মুখভঙ্গি মায়েই সম্যক্ প্রতিভাত। তাই বলিতেছিলাম—মায়ের সে রক্তিম আননের অপূর্ব ভঙ্গিমা যদি না দেখিয়া থাক, তবে এখনও আপনাদিগকে যথার্থ উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পার নাই। এখনও বিষয়রস পানকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছ। তাই মা আমার চণ্ডিকা মূর্তিতে এখনও দেখা দেন নাই। ঐ বিষয়রসই যে অসুরের অত্যাচার ; আর সেই অত্যাচারে তুমি জর্জরীভূত। শত পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াও তুমি সেই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছ না দেখিয়া যখন **'ত্রাহি মাং শরণাগতম্'** বলিয়া একবার কাতর প্রাণে মায়ের দিকে তাকাইবে, তখনই দেখিবে— মা আমার রণচণ্ডিকা মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আনন্দমধুপানে মায়ের নয়নত্রয় আরক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে। ওষ্ঠাধরে অপূর্ব হাস্য বিকাশ পাইতেছে।

বিপদে পড়িয়া রোগে শোকে অভাবে উৎপীড়িত হইয়া, অনেক সময়ে আমরা মায়ের শরণাগত হইতে চেষ্টা করি। সে সময়েও আমরা মাকে চাই না, মায়ের কৃপামাত্র প্রার্থনা করি। উদ্দেশ্য — বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং মা-ও সে সকলস্থলে যথাযোগ্য কৃপামাত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। আত্মস্বরূপটি প্রকাশ করেন না। কিন্তু যখন আমরা এই জীবত্বকেই একটা মহা উৎপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিব, এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া

প্রকাশিত হওয়াটাকেই আসুরিক অত্যাচার বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই মা আমার অসুরদলনী চণ্ডিকা-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন !

———○———

ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৪॥

অনুবাদ। বলবীর্য মদগর্বিত সেই অসুরও ভয়ানক গর্জন এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। সাধক ! মায়ের প্রতি এই পর্বতনিক্ষেপের ব্যাপারটা একবার বুঝিয়া লও, পর্বত প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য কামনারাশি— আমাদিগের অন্তর্নিহিত বহুজন্মসঞ্চিত বাসনারাশিই পর্বত আকারে মাতৃ-অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ওগো দেখ— আমাদের এক একটা শৈশব-প্রার্থনা—ছেলেমানুষের মত চাওয়াগুলি পূর্ণ করিতে মাকে কত কষ্ট, কত দুঃখ পাইতে হয়। জ্ঞানে অজ্ঞানে যাহা চাহিয়া ফেলিয়াছি, তাহা দিতে গিয়া সেই বাসনাগুলির মূল উৎপাটন করিতে গিয়া, স্থিরা শান্তিময়ী মাকে কতই অস্থিরা হইতে হয়, কতই অশান্তি ভোগ করিতে হয়। ভাবিও না জীব, তোমার তুচ্ছ বাসনাটিও ব্যর্থ হইবে ! প্রত্যেক বাসনাই পর্বত। উহা মহিষের শৃঙ্গাঘাতে —রজোগুণকৃত উদ্দীপনা প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাতৃ-অঙ্গে আঘাত করিতেছে। ওগো, মায়ের আমার কমনীয় বপু। আমারই বাসনা-পর্বতের গুরুতর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ! তবু মা আমারই— আর কাহারও নয়, শুধু আমারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন— কবে আমি একটিবার—বেশি নয়, একবার মাত্র মা বলিয়া ডাকিব, এ স্নেহ কি ভাষায় ব্যক্ত হয় ? মা ! আর না, আর কখনও কিছু চাহিব না ; কিন্তু যাহা চাহিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে কত ব্যথাই সহ্য করিতে হইতেছে ! মাগো, এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, বাসনার আঘাত আমাকে যত ব্যথা দেয়, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক তোমায় ব্যথিত করে। আমি উদ্দাম লালসার বশবর্তী হইয়া কামিনী-কাঞ্চন চাহিয়াছি, আর তুমি—আমার মা, তুমি স্বয়ং সেই কামিনী-কাঞ্চনের রূপ ধরিয়া আসিয়া, আমার উদ্দাম বাসনা-অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছ। এরূপ একদিন নয়, দুই দিন নয়, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। ওগো, যে তুমি হরি-হর-ব্রহ্মাদিরও ধ্যানের অগম্যা, সেই তুমি আমার কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, কত ছোট হইয়া, কত স্থূল হইয়া প্রকাশ পাইতেছ। কত অজ্ঞাতভাবে আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্যপদার্থরূপে উপস্থিত হইতেছ ! মা, একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম না। একবার সরল-প্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া ডাকিলাম না ! এত অকৃতজ্ঞতার ভার কিরূপে বহন করিব মা ? এতই কঠোর আমাদের হৃদয় যে, এ কৃতঘ্নতার গুরুভারে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায় না ! বুকটা ফাটিয়া শতখণ্ড হয় না ! মা ! আমাদিগের এ বুকটা কি একটা বজ্র দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলি ?

শুধুই কি তাই ! যদি কখনও সত্য সত্যই মা বলিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াই, যদি কখনও তোমার আগমনের বিন্দুমাত্র আভাস পাই অমনি **'হর পাপং হর ক্ষোভং হরাশুভং'** বলিয়া আমাদের যতকিছু মলিনতা, অপবিত্রতা তোমার ঐ বিশুদ্ধ অঙ্গে মাখাইয়া দেই। ওগো ! যাহারা পুত্র, যাহারা মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে ; তাহারা কত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম বিশ্বাসের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তোমার রাতুল চরণ সাজাইয়া দেয়। আর আমরা এমনি অধম অকৃতী সন্তান যে, তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া অকৃতজ্ঞের মত, মূঢ়ের মত বলিতে থাকি 'নাও মা, আমার পাপ-তাপ নাও, মা আমার আধি-ব্যাধি, নাও মা আমার মলিনতা, আর গ্রহণ কর আমাদের অনাদি জন্ম-সঞ্চিত প্রকটিত-অপ্রকটিত বাসনা সংস্কার।' মাগো ! আর কতকাল এমনি করিয়া তোকে কলুষিত করিব ? আর কতদিন আমাদের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, আমাদের মলিন সংস্কাররাশি, তোমাতে অর্পণ করিয়া, তোমার বিশুদ্ধ চিন্ময় দেহ কলঙ্কিত করিব মা ?

———○———

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তি শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধত মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৫॥

অনুবাদ। দেবী সেই অসুরনিক্ষিপ্ত পর্বতগুলিকে শর-নিকর নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, গর্বিতভাবে আরক্ত মুখে তাহাকে বলিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। অনেক জন্ম-সঞ্চিত বাসনার বীজগুলি যখন

রজঃশক্তি প্রভাবে ফলোন্মুখ হয়, তখন মা সেগুলিকে রাশীকৃত করিয়া শর-প্রয়োগে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। যেরূপ একরাশি পত্রকে উপর্যুপরি সজ্জিত করিয়া, একটি শর দ্বারা সকল পত্রকেই যুগপৎ বিদ্ধ করা যায়, সেইরূপ মা আমাদের অপ্রকটিত সংস্কাররাশিকে প্রকট করিয়া, জন্ম-কর্মরূপ শরপ্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া থাকেন। এস্থলে জন্ম-কর্মরহস্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে।

বহুজন্ম-সঞ্চিত বাসনার বীজ নিয়া তবে জীব জন্মগ্রহণ করে। যে জন্মে জীব মায়ের জন্য কাঁদিয়া উঠে, আত্মরাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইতে যত্নশীল হয়, সেই জন্মে অনেক জন্মভোগ্য কর্মসংস্কারগুলি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। যে কর্মগুলির ফলভোগ করিতে দশ বিশটা জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত, সেইগুলির ভোগ মায়ের কৃপায় দুই এক জন্মেই শেষ হইয়া যায়। ইহাই মাকে ডাকিবার ফল। নতুবা তাঁহাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বাভাবিক গতিবশে একদিন নিশ্চয়ই ত' জীব মাতৃ অঙ্কে স্থান পাইবে। তা সে যত বড় পাপী, যত বড় মূর্খই হউক না কেন। মা একদিন কোলে তুলিয়া লইবেনই। তবে আর তাঁকে ডাকিবার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন এই শরবেধ। অনেক জন্ম ধরিয়া যাহা ভোগ করিয়া করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইত, তাহা দুই এক জন্মেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। যখন জীব ভোগ ব্যতীত, অথবা অল্পভোগে বহু কর্মসংস্কার ক্ষয় করিতে অভিলাষী হয়, তখনই জীব মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। যে মহারাজ সুরথের উপাখ্যান লইয়া এই দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে, তিনিও লক্ষ পশুর খড়্গাঘাত লক্ষ জীবনে ভোগ না করিয়া, মাতৃ-কৃপায় এক জীবনেই ভোগ শেষ করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ হয় বলিয়াই ভগবৎমুখী জীবের অনেক স্থলে সাংসারিক জীবনে নানাপ্রকার রোগ-শোক, অসুখ-অশান্তি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়। এই সকল দেখিয়া সাধারণ লোক হয়ত মনে করিবেন — আহা ! অমুক লোকটা এমন সাধু প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ভক্ত, তথাপি ভগবান তাহার উপর কতই না অত্যাচার করিতেছেন ! কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পায়— উহা অত্যাচার বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা নহে। নিষ্ঠুরতার আবরণে অসীম করুণাধারা। দুষ্ট ব্রণ হইতে সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে হইলে, অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকই প্রয়োজন। রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেও, তিনিই যে রোগীর যথার্থ কল্যাণকামী তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সে যাহা হউক, এইবার মা আনন্দ-উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল কণ্ঠে অসুরকে একটি কথা বলিলেন। পরবর্তী-মন্ত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। যে যেরূপ অর্থ করুন, আমরা মদোদ্ধত শব্দের আনন্দ বিহ্বল অর্থই বুঝিয়া লইব। হর্ষ অর্থেই মদ ধাতুর প্রয়োগ হয়।

———◦———

দেব্যুবাচ।

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৬॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন— হে মূঢ় ! আমি যতক্ষণ মধু পান করি, ততক্ষণ তুমি গর্জন কর। আমা কর্তৃক তুমি নিহত হইলে, দেবতাগণ এইখানেই শীঘ্র গর্জন করিবেন।

ব্যাখ্যা। মা মহিষাসুরকে মূঢ় সম্বোধন করিলেন। যাঁহার প্রকাশে সমস্ত অজ্ঞান-গ্রন্থি খসিয়া পড়ে, সেই চিন্ময়ী মা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। জীব আজ মায়ের চরণে শরণাগত হইয়াছে, ভাবাতীতা নিত্যশুদ্ধা মায়ের সন্ধান পাইয়াছে ; তথাপি এখনও মহিষাসুর জীবের প্রতি অত্যাচার করিতে নিরস্ত হয় নাই ; তাই সে মূঢ়। মা বলিলেন — আমি মহাপ্রাণরূপিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি, জীব আমারই স্নেহের সন্তান, সে উৎপীড়িত হইয়া আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, আমাকেই একান্ত আশ্রয় বলিয়া বুঝিয়াছে। এখনও রে মূঢ় ! তুই সঞ্চিত সংস্কারের মোহে আমার সেই স্নেহের সন্তানকে উৎপীড়িত করিতেছিস ? এখনও আমার সন্তান, বাসনা-বিজড়িত-বক্ষে ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল অভিনয় করিতেছে ? এখনও তোকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পূর্ণভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে না ! এখনও আমার মহতী আকর্ষণীশক্তি, তোর অত্যাচারের গণ্ডী হইতে সন্তানকে সবেগে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া আমার বক্ষোলগ্ন করিতেছে না ? তাই তোর গর্জন ! তাই তোর আস্ফালন। তবে শোন্— যতক্ষণ আমার মধুপান শেষ না হইবে, ততক্ষণ তুই গর্জন কর। কিন্তু অচিরাৎ তুই আমারই হস্তে

নিহত হইবি, দেবতাগণ প্রফুল্ল হইবেন।

মধু শব্দের অর্থ— আনন্দ। আনন্দই মায়ের স্বরূপ। **'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'** যিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আর কিছুতেই ভীত হন না। নিরঞ্জন সর্বভাবাতীত ব্রহ্ম যখন আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া, পরস্পর ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে আনন্দ-লীলার অভিনয় করেন, স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যখন তিনি লীলাবশতঃ আপনাকে যেন আনন্দের অভাব কল্পনা করিয়া দ্বৈতভাবাপন্ন হয়েন, তখন হইতেই একদিকে আনন্দের অন্বেষণ চলিতে থাকে। আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার নাম হইল তখন—আনন্দের ভোক্তা বা দ্রষ্টা। আবার অন্যদিকে স্বয়ং তিনিই আনন্দের পসরা লইয়া প্রকৃতিরূপে—বিষয়রূপে ভোক্তার সহিত যেন লুকোচুরি খেলিতে লাগিলেন। ইহারই নাম ভোগ্য বা দৃশ্য। এই যে ভোক্তা ভোগ্যের মিলন ও বিরহ, এই যে আনন্দের অন্বেষণ ও তল্লাভের লীলারস, ইহাই মধু। সাধক ! একবার ধীরে সন্তর্পণে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ— জগৎময় এইরূপে মায়ের আমার অশ্রান্ত মধুপান চলিতেছে। আমরা মায়ের মধু, মা আমাদের মধু। আমরা মধুরূপিণী মহামায়াকে পান করি, আবার মাও আমাদিগকে লইয়া লীলা-মধুপান করেন। প্রতি পরমাণুরূপ জীবাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব ও দেবতাবৃন্দ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মধুর অন্বেষী। মধুই যাঁহার স্বরূপ, তিনি যেন মধুহারা হইয়া মধুর অন্বেষণরূপ লীলা করিতে লাগিলেন। ইহাই সৃষ্টির মূল্য রহস্য। 'কোথায় মধু' বলিয়া একদিন আমরা মধুময় অবস্থা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছি। তিল তিল করিয়া মধুপান করিতে করিতে, একদিন আবার সেই নিত্য মধুময় স্বরূপেই উপনীত হইব। এই যে মধুর অন্বেষণ ও সমাপ্তি, ইহাই সৃষ্টি ও প্রলয়। এই যে দেখিতে পাও— কপর্দকহীন শত মুদ্রার আশা করে। শত মুদ্রা লাভ হইলে, সহস্র মুদ্রার আশা পোষণ করে। সহস্র মুদ্রা লাভ হইলে, লক্ষ মুদ্রার আশা হয়। এইরূপে কিছুতেই যে আশার নিবৃত্তি হয় না, উহার হেতু—যথার্থ মধুর অভাববোধ। মধুর অভাববোধ থাকে বলিয়াই, জীব যতদিন আত্ম-মধুকে না পায়, ততদিন পাগলের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করে। বড় আদরে গোলাপ ফুলটা বুকে ধরিয়া মনে করিল—'মধু পাইলাম।' কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার অন্য একটার জন্য ছুটিতে হয়, তখন আর এ ফুলে মধু পায় না। এইরূপ কত জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে ! যতদিন এই মধুর কেন্দ্র খুঁজিয়া না পাইবে, যতদিন পূর্ণ মধুচক্র নির্মিত না হইবে, ততদিন জীবের এই মধুকরবৃত্তি, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি —লোক হইতে লোকান্তরে গতির নিবৃত্তি হইবে না !

এই মধু কোথায় আছে ? সর্বত্রই আছে, অথবা কোথাও নাই। মধুময়ীকে বাদ দিলে, কোথাও মধু নাই। কেবল তৃষ্ণা, কেবল উৎকণ্ঠা আর মধুময়ীকে দেখিলে —সর্বত্রই মধু বিরাজিত। মধুর অভাব কোথাও নাই। আমরা যে বিষয় ভোগ করিয়া আনন্দ পাই, সে আনন্দ বিষয়ের নহে, উহা আমাদের অন্তরস্থিত মধু—মধুময়ী মায়েরই মধু। প্রথমখণ্ডে এ কথা একবার বলা হইয়াছে ; তথাপি আবার সেই কথার আলোচনা করিব। **'শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ম্', 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ'**।

একটু ধীরভাবে শোন—বুঝতে চেষ্টা কর। একমাত্র পরমাত্মাই আনন্দ বা মধু। মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিই পরমাত্মার সর্বপ্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ! অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতেই পরমাত্মার বিশেষ প্রকাশ। এই বুদ্ধি যতক্ষণ বিষয়ান্বেষী ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্তৃক আহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশ করা রূপ কার্যে ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ জীব কিছুতেই মধুর সন্ধান পায় না। মন প্রতিনিয়ত একটার পর একটা বিষয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরণ করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে ধরিতেছে ও বুদ্ধির আলোকে বিষয়গুলিকে প্রকাশিত করিয়া লইতেছে। যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির লাভ না হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় মনের বিশ্রাম নাই ; সুতরাং বুদ্ধিরও অবকাশ নাই। কিন্তু যেই অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়, অমনি ক্ষণকালের জন্য মন বিষয়াহরণ হইতে নিরস্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিরও একটু বিশ্রাম লাভ হয়। তখন— সেই মুহূর্তে বুদ্ধি আপনাতে প্রতিবিম্বিত পরমাত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া লয় ; ইহারই নাম জীবের মধুপান, বা বিষয়ানন্দলাভ। সাধারণ জীব মনে করে 'আমি বিষয় ভোগ করিয়া— কামিনী কাঞ্চনের সম্ভোগ করিয়া আনন্দ পাইতেছি।' কিন্তু বাস্তবিক বিষয়ে আনন্দ নাই, আনন্দ আমাদেরই অন্তরে। কুক্কুর যেরূপ শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্বণ করিতে করিতে নিজের মুখই ক্ষত বিক্ষত করিয়া, সেই

ক্ষত হইতে নির্গত রুধির দ্বারা লিপ্ত অস্থিকে রসময় বোধ করে, ঠিক সেইরূপ জীব স্বকীয় অন্তরস্থ মধু বিষয়ে মাখাইয়া বিষয় ভোগের আনন্দ সম্ভোগ করে। সাধক ! পুনঃ পুনঃ চিন্তা, বিচার ও অনুশীলনের দ্বারা এই সত্য একবার উপলব্ধি করিয়া লইলে, তোমার বিষয়ের প্রতি আসক্তি নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে।

দেখ জীব ! তোমার ভোগ্য-বস্তুতে আনন্দ নাই, আনন্দ তোমারই অন্তরে। বিষয় সম্ভোগের আনন্দ বিষয়ে নাই, উহা তোমারই অন্তরে। তোমারই অন্তরস্থিত গুপ্ত মধুকে উদ্দীপ্ত প্রকাশিত করিবার জন্যই তোমার এই বিষয়াহরণ —এই জন্ম-মৃত্যু। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যেন মন্থন, বুদ্ধি বা অন্তরটা যেন ক্ষীরসমুদ্র আর এই মন্থনের ফলে উত্থিত হয়—অমৃত বা মধু। একদিকে আত্মাভিমুখে নিবৃত্তিমুখী আকর্ষণ, অন্যদিকে বিষয়াভিমুখে প্রবৃত্তিমুখী বিকর্ষণ। প্রতি জীবে প্রতি মুহূর্তে এই সমুদ্রমন্থন চলিতেছে। কোন্ অনাদিকাল হইতে এই মন্থন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিবে ? বৃহদারণ্যকের ঋষি জগৎময় এই অমৃতের পূর্ণ আস্বাদ পাইয়াই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন — 'এই পৃথিবী সকল প্রাণীর মধু, আবার সকল প্রাণীই এই পৃথিবীর মধু। এই জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই জলের মধু। এই বায়ু সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বায়ুর মধু। এই আকাশ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আকাশের মধু। এই প্রাণ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই প্রাণের মধু। এই আত্মা সর্বভূতের মধু সর্বভূত এই আত্মার মধু।' ওগো দেখ—সকলেই সকলের মধু। যাহারা বিশ্বময় এই মধুর সন্ধান পায়, তাহারা আনন্দে গান করে— '**মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।**'

সাধক ! আর কতদিন অজ্ঞানে মধু পান করিবে ? একবার জানিয়া শুনিয়া এই মধু পান কর। একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ —তোমার অর্থাৎ জীবের মধুপান বলিতে বাস্তবিক কিছু নাই, সর্বত্র একমাত্র মায়েরই মধুপান চলিতেছে। নিত্যানন্দময়ী, নিত্য মধুময়ী প্রতিনিয়ত এই মধুপান করিতেছেন। মা জানেন —'সর্বই যে আমি। সর্বভূতে একমাত্র আমিই সতত বিরাজিতা, সুতরাং এ জগৎ আমারই মধুপান।' তাই বলিতেছেন— 'হে মূঢ় ! যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন কর।' যতদিন জীব মাতৃচরণে সম্যক্ আত্মসমর্পণ না করে ততদিন কিছুতেই মায়ের এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারে না, ততদিন কিছুতেই মায়ের সর্বতোব্যাপী এই মধুপান প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। মা নিজেই যে জীবহৃদয়ে বাসনার অনলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, আবার নিজেই যে বিষয়রূপে সেই অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া আত্ম-মধুপানের অপূর্ব লীলা সম্পাদন করেন, এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মাতৃ-চরণে একান্ত আত্ম-নিবেদন আবশ্যক। যতদিন মায়ের এই মধুপানের নিবৃত্তি না হয়—যতদিন মা এই বহুত্বলীলা হইতে বিরত না হন, ততদিন কিছুতেই এ অসুর গর্জনের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

ওগো ! দেখ তোমরা, একবার মায়ের মধুপান। তুমি কাঞ্চনের আশায় দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছ, উহা মায়েরই মধুপান মাত্র। তুমি রোগের জ্বালায় নরক-যাতনা ভোগ করিতেছ, উহা মায়ের মধুপান মাত্র। তুমি প্রিয়জনের বিরহে দুর্বিসহ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছ, উহাও মায়েরই মধুপান। ইহা যদি বুঝিতে পার, তবেই তোমার জীবনও মধুময় হইবে। দুঃখ-কষ্ট, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক কিছুই থাকিবে না।

আমরা কিন্তু বলি, মা ! তোর আর এই লীলা-মধু পান করিয়া কাজ নাই। নিত্যা মধুমতী মা আমার ! তোমাতে কি মধুর অভাব আছে যে, লীলা করিয়া বিষয় ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া, আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বিন্দু বিন্দু মধুপান করিতে হইবে। ওগো আমার মধু-সিন্ধু ! এ বিন্দু বিন্দু মধুপান পরিত্যাগ কর ! যেখানে পান করিয়া মধুর আস্বাদ লইতে হয় না, যেখানে মধু ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যেখানে ভোক্তা ভোগ্য নাই, যেখানে কেবল মধু ; সেইখানে আমাদিগকে নিয়ে চল মা ! আর যে তোর এ লীলামধুপানের তাণ্ডবনৃত্য সহ্য করিতে পারি না মা ! যদিও ইহা তোমার পক্ষে মধুপান, তথাপি আমাদের পক্ষে কিন্তু ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু, এই হাসি কান্না, এই মন বুদ্ধি, এই বিষয় ইন্দ্রিয়, এই ধ্যান ধারণা, এ সকলই তোর মধুপান হইলেও, আমাদের পক্ষে ইহা বিষপান সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকে এই বিষের হাত হইতে পরিত্রাণ কর মা। একদিন বিশ্বেশ্বর বিশ্বরক্ষাকল্পে সমুদ্রমন্থনজাত বিষপান করিয়া হত চেতন হইয়াছিল, আর তুই সেই সময়

উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার নীলকণ্ঠে তোর মধুময় হস্তামর্ষণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলি। আজ আমরাও এই করাল বিষয়-বিষপানে জর্জরীভূত হইতেছি ; ঠিক তেমনি করিয়া আমার পাগলিনী মায়ের মত, স্নেহের উন্মাদনায় ছুটিয়া আয় মা, আমাদিগকে বিষের জ্বালা হইতে রক্ষা কর মা ! একবার তোর অমৃতময় হস্তে আমাদের এই বিষবিদগ্ধ দেহ স্পর্শ কর, আমরা শান্তিলাভ করি—অমর হইয়া যাই। মাগো, বিষয় যে বিষ নয়, মধু মাত্র ; মধুই যে বিষয়ের আকারে উদ্ভাসিত, এই সত্যে জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দে, জগৎ বিষের জ্বালা ভুলিয়া যাউক, মধুপান করিয়া মধুময় হউক। আর এই দীন সন্তান জগতের সরল সত্য হাসিতে হাসি মিলাইয়া, আনন্দে বাহু তুলিয়া জয় মা ধ্বনি করিয়া ধন্য হউক। কিন্তু সে অন্য কথা।

যতদিন মায়ের মধুপান শেষ না হইবে, ততদিনই অসুরের অত্যাচার থাকিবে। তবে ভরসা এই যে, মা বলিতেছেন—**'ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ'**। 'আমি তোমার আমিত্বকে নিহত করিব এবং দেবতাগণ শীঘ্রই আনন্দে গর্জন করিবেন। এক আমি ছাড়া আর একটা 'আমি' রূপে যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছ, ঐটিকে বিনাশ করিয়া দিব। তখন দেবতাগণও (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গও) শেষবার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আমাতে মিলাইয়া যাইবেন।' এ রহস্য শুম্ভবধে প্রকটিত হইবে। শুম্ভবধ না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ আমিত্বের বিলয় হয় না। মহিষাসুরবধ তাহার পূর্বায়োজন মাত্র। কামনা-বিলয় ও অহংনাশ এক কথা নহে। হ্যাঁ অহং নাশ হইলে, কামনা থাকে না, ইহা সত্য ; কিন্তু মা প্রথমে কামনা বিলয় করিয়া, তারপর অহংনাশ করেন, ইহাই মায়ের লীলা-রহস্য।

———○———

ঋষিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবী এইরূপ বলিয়া উল্লম্ফনপূর্বক সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন এবং পাদদ্বারা আক্রমণ করতঃ তাহার কণ্ঠদেশে শূলাঘাত করিলেন।

ব্যাখ্যা। কামনার উপরে মাতৃ অবস্থানই মহিষের উপর মায়ের আরোহণ। কামনা বলিতে এখানে কেহ পার্থিব ফল কামনামাত্র বুঝিও না ; যাঁহাদের পুত্রবিত্তাদি-বিষয়ক ফলকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা এখনও চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার মত সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে অধিকারী হইয়া অর্থাৎ **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তবে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে যাহা সংঘটিত হয়, তাহাকে সাধনা না বলিয়া মাতৃ লীলাদর্শন বলিলেই ভাল হয়। এই লীলার প্রথমেই ভবিষ্যৎ কর্মবীজ বিনষ্ট হয়। তারপর সঞ্চিত কামনার মূল উৎপাটিত হয়। এস্থলে কামনা শব্দে ইচ্ছা বা আরম্ভ বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্বে আমরা যতবার কামনা বাসনা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার প্রায় সকলস্থানেই ঐ শব্দগুলি আরম্ভ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আসক্তিপূর্বক অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কার্যের অনুষ্ঠানকেই কামনা বলা যায়। পঞ্চদশীকার এই ইচ্ছার ত্রিবিধ স্বরূপ কীর্তন করিয়াছেন। আত্মেচ্ছা, পরেচ্ছা এবং অনিচ্ছা। তন্মধ্যে আত্মেচ্ছায় কার্যের আরম্ভকেই কামনা বা মহিষ বলিয়া বুঝিবে। সাধারণ লোক যেরূপ প্রবৃত্তির তাড়নায়, ফলের লোভে কার্যে নিযুক্ত হয়, এই চণ্ডীতত্ত্বের সাধকগণ সেরূপভাবে কার্য কখনই করেন না, বা করিতে পারেন না। কোনও বিশিষ্টফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তথাপি কার্য করিবার প্রবৃত্তি জাগে, ইহাই চণ্ডীর কামনারূপী মহিষ। সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে—ইহারাও বুঝি আমাদের মতন প্রবৃত্তির দাস, নতুবা কার্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন ? বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা কার্য করেন মাত্র। কেন করেন, তাহার উত্তর হয়ত নিজেও দিতে পারেন না। তবে সমস্ত কার্যের মূলে একটা সিদ্ধান্ত তাঁহাদের স্থির আছে, তাহা মাতৃ-প্রীতি। নিত্যতৃপ্তা মায়ের প্রীতি-সাধন উদ্দেশ্যেই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবিষ্ট সাধকের কর্মানুষ্ঠান। আহার নিদ্রা ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যবহারিক কর্মগুলিও ঐ মাতৃ-প্রীতি-সাধন উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। গীতার সেই **'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'** মন্ত্রের ইহাই সিদ্ধাবস্থা। যে কোনও কার্যেরই আরম্ভ হউক না কেন, উহা মাতৃ-অর্পণময় হইয়াই আরম্ভ হয়। এই অবস্থাটির নাম—মহিষের উপর মাতৃ-আরোহণ। এইরূপে মা যখন মহিষ-মর্দিনীমূর্তিতে সাধকের হৃদয়ে

আবির্ভূতা হন, তখন তাহার সঞ্চিত কর্মাশয় হইতে, যেরূপ কর্মেরই স্ফুরণ হউক না কেন, উহার উপরিভাগে মায়ের পাদাক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্যের আরম্ভরূপ মহিষের অত্যাচার হইতেছে বটে, কিন্তু উহার উপরে মাতৃ-সত্তা বিদ্যমান। মা স্বয়ং কামনার উপরে অধিষ্ঠিতা। পদ দ্বারা মহিষ বিশেষভাবে আক্রান্ত ; তথাপি অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয় না দেখিয়া মা উহার কণ্ঠে শূলাঘাত করিলেন। শূল শব্দের অর্থ পূর্বেই করা হইয়াছে। কণ্ঠ — বাক্যস্থান। যে দ্বার দিয়া সংস্কারগুলি ভাষার আকারে প্রকাশ পায়, সেই স্থানে সংহরণশক্তির প্রয়োগ করিলেন। ইহাই কণ্ঠদেশে শূলাঘাত শব্দের তাৎপর্য। যদি কোনওরূপে ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে আর সংস্কারগুলি আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া, স্থূলে আসিয়া জীবকে অত্যাচার-প্রপীড়িত করিতে পারিবে না। মনে রাখিও— মৌনী হইয়া থাকিলেই, ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ হয় না। ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান না পাইলে, যথার্থ মৌনী হওয়া যায় না। যদিও ভাষাই ভাবের শরীর, তথাপি ভাষাশূন্য ভাবও আছে ; উহা আয়ত্ত হইলেই জীব মুক্তির আস্বাদ পায়। যে চিন্তায়, যে স্মরণে, যে ধ্যানে কোনরূপ শব্দের সাহায্য নিতে হয় না, সেই স্বরূপে উপস্থিত হওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য। যাঁহারা ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা শব্দশূন্য চিন্তা বা ধ্যানের কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি —একদিন সকলেই—সাধক মাত্রেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। যাহা ভাবাতীত যাহা ত্রিগুণরহিত, যাহা হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর জীব যেরূপ অনুভূতি লাভ করে, তাহাই শব্দশূন্য অবস্থা। তাহাকে ধ্যান, সমাধি বা স্মৃতি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। বাস্তবিক কিন্তু ইহার একটাও নহে। যেস্থান হইতে মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে, সেস্থানে শব্দ কিরূপে যাইবে ? যাহা হউক, যদি কোনরূপ ভাব-উদ্বোধক ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবেই কামনারূপী মহিষের শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে ; তাই মহিষ-মর্দিনী মহিষের কণ্ঠদেশে শূলাঘাত করিলেন ! এই অবস্থায় কামনাগুলি সম্যক্ মাতৃময় হওয়ায় আর কামনার উদ্দীপক ভাব বা ভাষা পর্যন্ত থাকে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই অপূর্ব ফল। জগৎময় প্রত্যেক পদার্থে এবং অন্তরে প্রত্যেক চিন্তায়, প্রাণরূপিণী মাতৃ-দর্শনের অভ্যাসে, সাধকের অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। সে সর্বত্র অখণ্ড প্রাণময় সত্তার সন্ধান পায়। তাহার আর জাগতিক কাম্যবস্তু কিছুই থাকে না ; সুতরাং সাধারণ জীবের মত বদ্ধভাবও থাকে না। তাহার কাম কাঞ্চনও মা ; ধ্যান ধারণাও মা ! মা ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পায় না। কারণ মা স্বয়ংই যে মহিষের উপর আরোহণ করিয়াছেন। খুলিয়া বলি—আত্মসমর্পণকারী সাধকের নিজস্ব চেষ্টা বলিয়া কিছু থাকিলেও, কর্তৃত্বাভিমান একেবারে বিদূরিত হয় না ! সেই জীব কর্তৃত্ব নিয়া যতদিন সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভ্যাস করে, ততদিন একটু ত্রুটি থাকিয়া যায়— যথার্থ সত্যের ও প্রাণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সত্যবস্তুকে অনুষ্ঠান-সাধ্য বলিয়া মনে করে। তারপর মা দয়া করিয়া মহিষমর্দিনী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। অর্থাৎ রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের ছদ্মবেশে লুক্কায়িত প্রাণরূপিণী মা বিষয়ের ভিতর দিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। সাধক তখন অন্তরে বাহিরে সর্বত্র মায়ের এইরূপ আবির্ভাব দেখিয়া ধন্য হয়। আরে ! রূপরসাদি বিষয়গুলিই তো কামনা বা মহিষের মূর্তি। ঐ গুলিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই কামনা বা মহিষ বিমর্দিত হয়, অর্থাৎ জড়ত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়, চৈতন্যময় স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই মহিষের পৃষ্ঠে মায়ের আরোহণ বা মহিষমর্দিনী মূর্তিতে মায়ের আবির্ভাব। এই অবস্থায় সাধক মহাপ্রাণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিতে চেষ্টা করে। প্রাণময়ী মা ব্যতীত সাধকের অন্য কোন ভাষাই থাকে না। ইহাই মহিষের কণ্ঠে দেবীর শূলাঘাত।

———০———

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৩৮॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই অসুরও দেবীর পদভরে আক্রান্ত হইয়া, স্বকীয় মুখ হইতে (মহিষমূর্তির মুখ হইতে) অর্ধ নিস্ক্রান্ত হইবামাত্র দেবীর অতিশয় বীর্যবশতঃ নিরুদ্ধ হইয়া রহিল। অর্থাৎ তাহার সমুদয় অবয়ব নির্গত হইতে পারিল না।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর যখন দেখিল এত করিয়া— এত বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হইয়াও জীবের আত্মাভিমুখী গতি

কিছুতেই নিরুদ্ধ করিতে পারা গেল না, তখন অগত্যা স্বকীয় মূর্তিতে আবির্ভূত হইল—মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অসুরমূর্তি অর্ধনিষ্ক্রান্ত হইল। মা যখন মহিষ-মর্দিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়গুলিও প্রাণময়—মাতৃময় হইয়া প্রকাশ পায়, রজোগুণের বহিরাগত স্থূল ভাবগুলি যখন দূরীভূত হয়, তখন স্বয়ং রজোগুণের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। কার্য-শক্তি বিনষ্ট হইলেই কারণ-শক্তির প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এতদিন মূল রজোগুণরূপী কারণ-শক্তির দিকে জীবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, শুধু তাহার অত্যাচার বা কার্যগুলি নিয়াই ব্যস্ত ছিল। এখন কামনাগুলি মাতৃময় হইয়াছে, মা মহিষ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, সুতরাং কার্য-শক্তি বা অত্যাচারও প্রশমিত হইয়াছে। এইবার সাধক অত্যাচারের যাহা মূল স্থান, তাহার সমীপস্থ হইয়া দেখিতে পাইল, একমাত্র রজোগুণই উহার মূল হেতু। উহাই মহিষাসুরের নিজমূর্তি। এবার সেই মূর্তি মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অর্ধনিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই, মা স্বকীয় শক্তি প্রয়োগে উহার বহিরাগমন প্রয়াস ব্যর্থ করিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি—আত্মেচ্ছায় কার্যের আরম্ভই কামনা। আরম্ভগুলি মাতৃময় হইলেও ইহার পাশে পাশে রজোগুণের উদ্বেলন-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যখন মাতৃ স্নেহে এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী যতটুকু আরম্ভ আবশ্যক, তদতিরিক্ত আর কোন কার্যের আরম্ভই সহ্য করিতে পারে না, যখন আরম্ভগুলিকে অতীব কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইতে থাকে, তখন ঐ আরম্ভের মূলের প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তখন সে বুঝিতে পারে—বীজ বা কারণ থাকিলে, সে প্রতিমুহূর্তে প্রকাশিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেই। ইহাই প্রকৃতির শাশ্বতিক নিয়ম। সেখানে কারণ বিদ্যমানসত্ত্বেও কার্য উৎপত্তি হয় না, বুঝিতে হয় —সেখানে কোনও প্রবল প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক থাকিলেও কারণ তাহার কার্য জনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে বিরত হয় না। যদি কখনও কারণের কার্যজনন প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়, তখন আর তাহার কারণত্বই থাকে না। তাহাকেই কারণ বলে—যাহা সতত কার্যজনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট। মনে কর, একটা সুদীর্ঘ ইস্পাতকে (স্প্রীং) কৌশলে সঙ্কুচিত ও বর্তুলাকার করিয়া, তাহার উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চাপা দিয়া রাখিলে, ইস্পাত তাহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তিপ্রভাবে প্রতি মুহূর্তেই প্রসারিত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু গুরুভার প্রস্তরের প্রতিবন্ধকতাহেতু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় না। ঠিক সেইরূপ মাতৃময় কামনাগুলির চাপে পড়িয়া বিষয়কামনারূপে পরিণামযোগ্য রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির প্রতিবন্ধকতা ঘটে। বাহিরে কোনরূপ ক্রিয়াশক্তি না থাকিলেও, রজোগুণ ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠই থাকে। যদি কখনও প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়, তখনই উহার কার্যজনন-শক্তি বাহিরে প্রকাশ পায় অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়, কামনা রূপে প্রকটিত হইয়া পূর্বোক্ত স্মরণ-কীর্তন-কেলি প্রভৃতি অষ্টবিধ অত্যাচার করিতে থাকে। মায়ের কৃপায় এতদিনে জীবের দৃষ্টি, এই মূলীভূত দোষকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। যাহার অত্যাচারে পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, এতদিনে জীব তাহাকে সর্বতোভাবে সহায়-সম্বল বিহীন করিয়া, একাকী পাইয়াছে। তাহাও সম্পূর্ণ নহে, অর্ধনিষ্ক্রান্ত। অর্ধনিষ্ক্রান্ত শব্দটি বলিবার তাৎপর্য এই যে, প্রবল প্রতিবন্ধকতাবশতঃ কারণ-শক্তি পূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ কার্য-জনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। খুলিয়া বলি— পদার্থমাত্রের যাহা সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহারই নাম কারণ আর স্থূল বা প্রকাশ অবস্থার নাম কার্য। যেমন বটবীজ সূক্ষ্মরূপে বটবৃক্ষের কারণ। যতক্ষণ বীজ আকারে থাকে ততক্ষণ বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে ; কিন্তু ঐ সূক্ষ্মবীজের ভিতরেই যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষটি লুক্কায়িত আছে, ইহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঠিক এইরূপ কামনার সূক্ষ্মবীজরূপী মহিষাসুর, পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিয়া, অর্ধনিষ্ক্রান্ত হইল অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মের সংস্কারমাত্ররূপে প্রতীতিযোগ্য হইল। কিন্তু **'দেব্যাবীর্যেণ সংবৃতঃ'**, মাতৃ-শক্তি প্রভাবে আর বাহিরে আসিতে পারিল না—অন্তরেই বীজাকারে রহিয়া গেল। সূক্ষ্ম বীজকে মা আর কার্যরূপে প্রকটিত হইতে দিলেন না।

এই অবস্থায় ভিতরে বাসনার বীজ থাকে, অথচ বাসনার আকারে কার্যরূপে উহা বাহিরে প্রকাশ পায় না। কারণ মাতৃস্নেহে মুগ্ধ সাধক অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সত্য ও

প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে সতত মাতৃসত্তামাত্র দেখিতে অভ্যস্ত। এই যে অবস্থা, ইহারই নাম '**অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ**'। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে মিথ্যাচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কিন্তু সে অবস্থা নহে। সেখানে দেখিতে পাই— কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয়ের অনুচিন্তন করাই মিথ্যাচার। আর এখানে— কি কর্মেন্দ্রিয় কি অন্তরেন্দ্রিয়, কোথাও বিষয়ের গ্রহণ বা অনুচিন্তন নাই। এখানে বিষয়গুলি প্রাণময়—মাতৃময় হইয়াছে ; সুতরাং ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছুই নাই। এখানে বিষয় কামনাগুলি '**দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ**' ; সর্বাবস্থায়ই সাধক মহাপ্রাণের বিকাশ মাত্র দেখিতে অভ্যস্ত। কেবল কামনাগুলির ভবিষ্যৎ উদ্বেলনের আশঙ্কা বিদ্যমান। ইহা মিথ্যাচার নহে।

———○———

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর অর্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায়ই যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু দেবীর মহা অসির আঘাতে বিচ্ছিন্নশির হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। যদিও কামনার সর্বাবয়ব মাতৃময় হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার মূলীভূত রজোগুণের উদ্বেলন সহসা অব্যক্তে পরিণত হইতে চায় না। সে প্রতিমুহূর্তেই কার্যরূপে পরিণত হইতে চেষ্টা করে, আর সাধক জোর করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে। সঞ্চিত সংস্কারসমূহ যে মুহূর্তে স্বকীয় বীজভাব পরিত্যাগপূর্বক, কার্যরূপে প্রকাশিত হইবার জন্য উন্মুখ হয়, সেই মুহূর্তেই সাধক উহাকে প্রাণরূপে দর্শন করে। সুতরাং কামনার আকারে আর বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ রজোগুণের উদ্বেলন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগে তাহার নিরোধ-ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাই অর্ধ-নিষ্ক্রান্ত-অসুরের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাহিরে দেখিবার নহে ; অতি সূক্ষ্মতম ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, সাধকগণ এই যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। পূর্বোক্ত ইস্পাত এবং প্রস্তরের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর। সে স্থলেও ঐ শক্তিদ্বয় পরস্পর ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে। অথচ বাহিরে যুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কোন বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি বেশ দেখিতে পান যে, ইস্পাত ও প্রস্তরে পরস্পরের শক্তির অভিভবরূপ ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোক দেখিতে পায় —একখণ্ড প্রস্তর ইস্পাতের উপরে চাপা রহিয়াছে। ঠিক এইরূপ এই অর্ধনিষ্ক্রান্ত অসুরের যুদ্ধ কেবল বিজ্ঞানময়কোষস্থ সাধকগণই লক্ষ্য করিতে পারেন। এক একটা সংস্কার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, আর মাতৃ-সংস্কার আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে। সাধক ! দেখিবে একবার সেই যুদ্ধ ? তবে ক্ষণকাল স্থির ভাবে উপবিষ্ট হও। মা বলিয়া আত্মপ্রাণে প্রবেশ কর। তারপর উহাকে বিশ্বপ্রাণ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর ! দেখিবে—অন্তর হইতে এক একটা বৈষয়িক সংস্কার উঁকি মারিতেছে, আর তোমার চিত্তকে সে মহাপ্রাণ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তুমি প্রাণময় মাতৃ-স্বরূপে মুগ্ধ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেছ না ; সুতরাং সংস্কারগুলি বিফল মনোরথ হইয়া এক একবার অব্যক্তে মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এইরূপ যুদ্ধ কিছুদিন চলিলে সাধক উহাকেও একটা মহা উৎপীড়ন বলিয়া মনে করিতে থাকে। তখন পর-বৈরাগ্যই তাহার একমাত্র অভীষ্ট হইয়া পড়ে। তখন মা আমার সন্তানের আশা পূর্ণ করিবার জন্য, মহাখড়্গের আঘাতে এই অর্ধনিষ্ক্রান্ত মহিষাসুরের শিরশ্ছেদ করিয়া দেন অর্থাৎ কারণরূপী রজোগুণের কার্যজননশক্তি বিলোপ করিয়া দেন। শিরশ্ছের অর্থে—উত্তমাঙ্গ-কর্তন। যে বস্তুর যে শক্তি, সেই শক্তিই তাহার উত্তমাঙ্গ। শক্তিনাশই উত্তমাঙ্গ নাশ। পূর্বে বলিয়াছি—কারণের যখন কার্যজননশক্তি রহিত হয়, তখন আর তাহার কারণত্বই থাকে না। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে কার্যোৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া রজোগুণও এখন আর নিত্য কামনার সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না। ইহাই মহিষাসুরবধ।

বেদান্ত বলেন—'**পূর্বোত্তরয়োরশ্লেষবিনাশৌ। প্রারব্ধস্য তু ভোগদেব ক্ষয়ঃ।**' জ্ঞানলাভ হইলে, পূর্বে অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মের হয় অশ্লেষ (ফলসংযোগের অভাব), উত্তর অর্থাৎ ভবিষ্যৎকর্মের হয় বিনাশ। বাকী থাকে প্রারব্ধ, উহার ভোগের দ্বারা হয় ক্ষয়। ভবিষ্যৎ কর্মের

বিনাশ প্রসঙ্গ আমরা প্রথমখণ্ডে মধুকৈটভ-বধে পাইয়াছি।

এই মহিষাসুর-বধই পূর্ব-কর্মের অশ্লেষ। 'আর নূতন কিছু চাই না' এই জ্ঞান স্থির হইয়াছে — প্রথম চরিত্রে। 'যাহা চাহিয়াছি, তাহারও ফল ভোগ করিব না', ইহা স্থির হয়—এই দ্বিতীয় চরিত্রে। এই গ্রন্থিই সর্বাপেক্ষা কঠোর। নূতন কিছু চাহি না, সুতরাং কোন গোলযোগও নাই। প্রারব্ধ ত নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল বীজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, এখনও ফলোন্মুখ হয় নাই, তাহার ফলপ্রদান-ক্ষমতা বিনষ্ট করা বড়ই কঠোর, ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থি।

বহু জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে, মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদে এই দুরত্যয় বিষ্ণুগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। বিষ্ণু — স্থিতিশক্তি বা প্রাণ। সঞ্চিত সংস্কারসমূহই ব্যষ্টি প্রাণকে মহাপ্রাণরূপে প্রকাশিত হইতে দেয় না। জীবের বহুজন্মার্জিত বাসনা রাশিকে যিনি ধরিয়া রাখেন, সাধারণ কথায় যাহাকে মমতা বা 'আমার আমার' ভাব বলে পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা বিষ্ণুমায়া নামে উক্ত হইয়াছে, তিনিই স্থিতিশক্তি বা ব্যষ্টিপ্রাণ, সুতরাং উনিই বিষ্ণু। প্রত্যেক জীবেই এই বিষ্ণুসত্তা বিদ্যমান। উহারই নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। আর যিনি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি সঙ্কল্পকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনি লীলাময় মহাবিষ্ণু। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-লীলা বিষ্ণুশক্তিতেই অবস্থিত। তিনি ঐ শক্তিতে মুগ্ধ বা অভিমানাবদ্ধ নহেন ; তাই তাঁহার পক্ষে উহা গ্রন্থি বা অজ্ঞান নহে—লীলা, কিন্তু জীবের পক্ষে ঐ সঙ্কল্পই বন্ধন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, কিংবা স্বপ্ন-জাগরণ ও সুষুপ্তিরূপে প্রকাশ পায়। জীব উহাতে মুগ্ধ ও অভিমানাবদ্ধ ; সুতরাং উহাই গ্রন্থি— অজ্ঞান বা বন্ধন। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবে যাহা বিষ্ণুগ্রন্থি, সমষ্টিভাবে তাহাই পরমেশ্বরে বিষ্ণুলীলা।

খুলিয়া বলিতেছি— সাধক ! তোমার প্রাণ বলিলে যাহা বুঝিতে পার, ঐ প্রাণকে যতদিন বিশ্বপ্রাণরূপে দর্শন করিতে না পারিবে, ততদিন বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে না। তোমার যতকিছু জীবভাবীয় সংস্কার, সকলই ঐ প্রাণে অবস্থিত। উহাকে সংকীর্ণ করিয়া—ছোট করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই, উনি মহাপ্রাণরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন না। তাই তোমার প্রাণময় গ্রন্থির উদ্ভেদ হয় না। ওগো, পরমেশ্বরী মাকে আমার কাঙ্গালিনী সাজাইয়া রাখিয়াছ ! জীবত্বের কালিমা মুখে মাখাইয়া, সংস্কারের ছিন্ন বসন পরাইয়া দেহরূপ জীর্ণ কুটিরে বসাইয়া রাখিয়াছ ! আর তার উপর তোমার যাবতীয় অভাব অভিযোগের প্রতীকার হয় না দেখিয়া, কাঙ্গালিনী বলিয়া কতই বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ! আরে, অমুক কত সুখে আছে ,অমুক কেমন সাধনা করিতেছে, অমুক কেমন সিদ্ধি শক্তি লাভ করিয়াছে, অমুক কেমন প্রেম ভক্তি লাভ করিয়াছে, অমুক কেমন জ্ঞানী হইয়াছে, অমুক কেমন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, আর আমার কিছুই হইল না। এইরূপ যে কোন অভিযোগ লইয়া, যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর, ক্ষুব্ধ হও, তখন একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছ কি—তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ আরক্তিম মুখে কি মর্মপীড়ার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে ! তিনি সর্বেশ্বরী হইয়াও, সেই মুহূর্তেই সন্তানের অভাব অভিযোগ দূর করিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, মায়ের সে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। মা এক একবার তোমাদের মুখের দিকে তাকান, আর একবার নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া আকুল প্রাণে যে ব্যথা সহ্য করেন তাহা ভাবিতে গিয়া, এ পাষাণ বুকটার ভিতরও কেমন করিয়া উঠিতেছে ! ভাবিয়া দেখ— যিনি একদিন রাজরানি ছিলেন, তিনি যদি ভাগ্যদোষে ভিখারিণী হন, আর সেই দুর্দিনে তার শিশুপুত্র, উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ না পাইয়া, মাকে লক্ষ্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, সে দুঃখ বহন করা মায়ের পক্ষে কত কঠিন।

ওগো, যখন দেখিতে পাই — রোগে, শোকে, অনাহারে, অভাবে, চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া, মনুষ্যগণ হা হুতাশ করিতে থাকে, বিষাদের কালিমা মুখে মাখিয়া হতাশ প্রাণে দিন যাপন করিতে থাকে, তখনই যে আমার রাজরাজেশ্বরী মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্তি চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মা মা মা আমার, তুমিই ত' দীন মলিনা মূর্তিতে জীবকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। জীব তোমাকে ভিখারিণী করিয়াছে। জীবের উচ্ছৃঙ্খল কামনা পূর্ণ করিতে গিয়াই আজ তুমি ভিখারিণী। তোমার সর্বস্ব দিয়া ফেলিয়াছ। মাগো, তোমার সেই করুণাশ্রুলিপ্ত মুখখানা দেখিলে বজ্রও বিদীর্ণ হইয়া যায়। আর আমাদিগকে এমন ধাতুতেই নির্মিত করিয়াছ যে, তোমার

সে দুঃখ অনুভব করা ত দূরের কথা, তার উপর তোমাকেই আবার কাঙ্গালিনী বলিয়া তিরস্কার করি ! মাগো আমরা কবে মানুষ হইব ? কবে আমরা মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিব ? মা ক্ষমা কর ! অকৃতজ্ঞ অধম শিশু পুত্রের এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর, আর বলিবার কিছু নাই, ভাবিবার কিছু নাই, মা তুমি ক্ষমা কর।

শোন জীব ! তোমাদের এই কল্পিত অভাব, কল্পিত দীনতা দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া তোমাদের সর্ববিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ! আজ তিনি যে আশীর্বাদ, আশীর্বাদ নহে—বর, যে বর লইয়া কাঙ্গালের মত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, সেই বর গ্রহণ কর। জীব। তোমার সকল অভাব দূরীভূত হইবে। গীতায় শুনিয়াছ—'**যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।**' যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে অবস্থান করিলে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হইতে হয় না, ইহা সেই বস্তু, ইহা সেই বর। এস জীব ! সাদরে গ্রহণ কর।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রাণকে মা বলিয়া আদর কর। প্রাণই যে পরমেশ্বরী, প্রাণেই যে সকল প্রতিষ্ঠিত, প্রাণই যে জগৎ আকারে আকারিত, ইহা বিশ্বাস কর, প্রত্যক্ষ কর, অনুভব কর । জগৎময় প্রত্যেক পদার্থকে আমারই প্রাণের মূর্তি বলিয়া দেখ ; প্রাণের ঘনীভূত অবস্থাই জড়াকারে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, তোমার প্রাণ বিশ্বপ্রাণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে ; মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্তি অপসৃত হইবে ; তোমার সকল অভাব অভিযোগের কান্না থামিয়া যাইবে। মা আমার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণের আরাধ্যা রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে প্রকাশিত হইবেন। তখন তুমি সত্য সত্যই আপনাকে ধন্য ও পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ইহাতে শাক্তবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ভেদ নাই, হিন্দু-মুসলমানাদি জাতিভেদ নাই। সাকার নিরাকারাদির বিতর্ক নাই। সকলেই স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়োচিত আচার অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখিয়া, অভীষ্ট দেবতাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। ঐ প্রাণই বিশিষ্ট মূর্তিতে দর্শন দিবেন। আবার উনিই অমূর্ত অন্তর্বাহ্যব্যাপী অদ্বয় চিৎস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন। জীব ! তোমার হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইবে। যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হইবে।

তবে একটি কথা, এই প্রাণকে মা বলিয়া বুঝিতে হইলে—প্রাণ ঢালিতে হয় ! প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে কোনও জায়গায় তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। সে জন্যও মা-ই আমার ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে আসিয়া, একটু একটু করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। জীব ! তোমার নবদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ ! কিছুতেই প্রাণ-ভিক্ষা দিতে চাও না ? তাই ত' একদিন মা আমার গোপাল মূর্তিতে বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইয়া ননী চুরি বা প্রাণ চুরি করিয়াছেন। আজ আবার ভিখারী হইয়া 'ওগো প্রাণ ভিক্ষা দাও' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। দাও গো সন্তান ! প্রাণ ভিক্ষা দাও—মহা-প্রাণ মিলিবে। অমৃতের সন্ধান পাইবে। নিত্যানন্দে অবস্থান করিবে। কত কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন—প্রাণ দাও। পুত্র ! প্রাণ দাও ! শুনিতে কি পাও না ? প্রাণ দাও ! সবটা প্রাণ দিতে না পার, একটুখানি দাও। ওগো ! তোমার ঐ অতবড় প্রাণটার এক কোণে আমাকে একটু স্থান দাও, একটু ভালবাস ! আমি তোমায় মহাপ্রাণের সন্ধান দিব। দেখ—ব্রহ্মা, বিষ্ণুরও ধ্যানের অগম্যা মা আজ পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া, কাঙ্গালিনীর বেশে তোমার দ্বারে উপস্থিত, তুমি একবার মা বলিয়া ডাক ! একটু প্রাণ ভিক্ষা দাও !

———○———

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ। অনন্তর হতাবশিষ্ট দৈত্যসৈন্যগণ হাহাকার করিয়া অদৃশ্য হইল। দেবতাগণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন !

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ, আবরণ প্রভৃতি প্রধান বৃত্তিনিচয়ের এবং তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণের বিলয়ে, তদঙ্গীভূত সংস্কাররাশি সুতরাং অদৃশ্য হয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ মহাপ্রাণের সম্ভোগে পরম প্রহর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে সাধক সর্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শনে অভ্যস্ত হইলে, আসুরিকবৃত্তি-নিচয়ও প্রাণময় হইয়া উঠে। তখন বহুত্বের ছাঁচগুলি থাকিলেও ভেদজ্ঞান

তিরোহিত হয়। একই প্রাণ বা সচ্চিদানন্দ বস্তু, সংস্কারের ছাঁচে পড়িয়াই যে বিভিন্ন নামরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। চিনির পুতুলের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর। চিনির জ্ঞান হইলে, হাতী, ঘোড়া, মঠ, সকলই যে চিনিমাত্র, ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না ! তখন ঐ বিভিন্ন নাম ও রূপগুলি সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহার যথার্থ স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে না। ইহারই শাস্ত্রীয় পরিভাষা—দগ্ধবীজবৎ সংস্কার।

ভেদজ্ঞান পরিপুষ্ট থাকে বলিয়াই ত্যাগ ও গ্রহণ থাকে। ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে, তখন আর ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না। প্রাণময়গ্রন্থি খুলিয়া গেলে, সঞ্চিত সংস্কারসমূহ দগ্ধবীজবৎ হইয়া পড়ে। উহারা আর কখনও কর্ম বা ফলভোগের হেতু হইবে না। এইরূপে সঞ্চিত সংস্কারগুলির ফল ভোগ না করিয়া, জীব মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিতে পারে। বিষ্ণু-গ্রন্থি ভেদের ইহাই বিশেষ ফল। এই অবস্থায় সাধক শুধু প্রারব্ধ ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে থাকে। সে রহস্য শুম্ভ বধে ব্যাখ্যাত হইবে।

———o———

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৪১॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধঃ।

অনুবাদ। তখন দেবতাগণ দিব্য মহর্ষিবৃন্দের সহিত একত্র হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বপতিগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে মহিষাসুরবধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নিহত হইল— রজোগুণজনিত সঞ্চিত সংস্কার সমূহের ফলোৎপাদন-শক্তি বিলুপ্ত হইল। সাধকের প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইল। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইল। যাঁহার কৃপায়, যাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই অঘটন সংঘটন সম্ভব হইল, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়। তাই দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ সমবেতকণ্ঠে মায়ের স্তুতিমঙ্গল কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই স্তুতি ব্যাখ্যাত হইবে।

এতদিন সংস্কাররাশির কোলাহলে দিব্য অনাহত নাদ শ্রবণগোচর হয় নাই। এইবার সে কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে, তাই অনাহত হইতে নির্গত আকর্ষণময় প্রাণস্পর্শী মধুর প্রণবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ইহাই গন্ধর্বগণের সঙ্গীত। এইরূপ অন্তরে সুমধুর অনাহতধ্বনি, মুখে মাতৃস্তুতিমঙ্গল কীর্তন করিতে থাকিলে সাধকের স্থূল শরীরেও পুলক, স্পন্দন, বিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; ইহাই অপ্সরাগণের নৃত্য।

মায়ের আত্মহারা আলিঙ্গন। মায়ের অচিন্তনীয় বিভূতির উপলব্ধি। মায়ের অতুলনীয় মহত্ত্বের অনুভূতি ! অফুরন্ত মাতৃস্নেহের সম্ভোগ। ওগো, কিরূপে— বুঝাইব —তখন শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় ? ওগো সে সুখের তুলনা নাই, সে আনন্দের অবসান নাই। সে আনন্দরসে শরীরের প্রত্যেক পরমাণুগুলি যেন গলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। পায়ের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত, এমন একটু স্থানও অবশিষ্ট থাকে না, যেখানটা সে সুখময় স্পর্শে আকুল হইয়া না পড়ে। তখন আর দেহকে জড় মাংস-পিণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। শুধু সুখময় অনুভূতি ! এই দেহটা তখন মধুময় অনুভূতি স্বরূপ হইয়া পড়ে। একটা ঘন আনন্দময় বোধ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। 'আমি আনন্দভোগ করিতেছি' এরূপ বোধও থাকে না। ভোগ্য ভোক্তা এক হইয়া যায়। অথচ কেমন একটু ভেদ থাকে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সে অন্য কথা—

অপ্সরাগণের নৃত্য বা এই অঙ্গবিক্ষেপ সম্বন্ধে একটু কথা আছে। যোগশাস্ত্র উহাকে চিত্তবিক্ষেপের সহভাবি সমাধির অন্তরায় স্বরূপ বলিয়াছেন। যৌগিক ভাষায় উহার নাম—অঙ্গমেজয়ত্ব। স্থূলদেহে বিক্ষেপ দেখিলেই বুঝিতে হয়—মনোময় দেহেও বিক্ষেপ চলিতেছে ; সুতরাং উহার নিরোধই যে সর্বোত্তম অবস্থা তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু এই অপ্সরাগণের নৃত্যরূপ অঙ্গবিক্ষেপ দেবভাবের সূচক। সাধক ! প্রথমে ঐ দেবভাবগুলিই প্রকাশ পাউক, তারপর ভাবাতীত স্বরূপে—সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ অবস্থায় প্রবেশ করিবে।

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় মহিষাসুরবধ।

———o———

দ্বিতীয় খণ্ড
বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ
শক্রাদিস্তুতিঃ

ঋষিরুবাচ।

শক্রাদয়ঃ সুরগণাঃ নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ॥ ১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবী কর্তৃক সেই অতি বলশালী দুরাত্মা মহিষাসুর এবং তদীয় সৈন্যগণ নিহত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ—গ্রীবা এবং অংসদ্বয় অবনমন করতঃ প্রণামপূর্বক, বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আনন্দবশতঃ পুলকোদ্‌গম হওয়ায়, তৎকালে দেবতাগণের দেহ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে দেবতাগণের স্তুতি বর্ণিত হইবে। মহিষাসুর—দুরাত্মা—অসৎপ্রকৃতি। প্রকৃতি যতদিন অসৎপ্রিয়, পরিচ্ছিন্নতায় মুগ্ধ, খণ্ডজ্ঞানে পরিতৃপ্ত থাকে, ততক্ষণই উহাকে অসৎস্বভাব বা দুরাত্মা বলা যায়। অমিতবীর্য অসৎস্বভাব মহিষাসুর সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। বহির্মুখ-বৃত্তিপ্রবাহ-সমন্বিত রজোগুণ উপশান্ত হইয়াছে। সুতরাং সাত্ত্বিক প্রকাশস্বরূপ দেবতাবৃন্দ, এইবার স্থিরভাবে মাতৃস্বরূপ দর্শন— উপলব্ধি করিতেছেন। মায়ের সেই বিশ্ববিমোহন রূপ প্রত্যক্ষ হইলে, কেহই নির্বাক থাকিতে পারে না। বহির্লক্ষণে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম তিনটিই যুগপৎ প্রকাশ পাইতে থাকে। তাই ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ আনন্দে মাতৃ-মহত্ত্ব কীর্তনরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

এই স্তবে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ (২) চারুদেহাঃ (৩) এবং বাগ্‌ভিঃ। কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ স্তুতিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমে উহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। দেবতাবৃন্দ এরূপভাবে প্রণত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শিরোধরা (গ্রীবা) এবং অংসদ্বয় (স্কন্ধ—বাহুমূল) সম্যক্ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বাহুমূল এবং গ্রীবা নত হইলে সমুদয় দেহটিই অবনত হইয়া পড়ে। ইহাই কায়িক স্তুতি বা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি। মাকে স্মরণ করিবামাত্রই তাঁহার চরণে সর্বাবয়ব এইরূপ নত হওয়া আবশ্যক। যিনি মা, যিনি অনন্ত জন্ম-মরণের একমাত্র সারথি, যাঁহাকে একটিবার দেখিব বলিয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুর অসহনীয় পেষণ সহ্য করিয়া আসিয়াছি, আজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ; তাঁহার স্নেহ, তাঁহার বিরাট কর্তৃত্ব, তাঁহার মহতী শক্তির কথা স্মরণ হইলে সন্তানের দেহ নিশ্চয়ই অবনত হইয়া পড়িবে, আনন্দে দেহে পুলকোদগম হইবে ! অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ! ইহাই মানসিক স্তুতির লক্ষণ। এই দুইটির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যদ্বারা মায়ের মহত্ত্ব কীর্তন করিতে হয়। উহাই বাক্যের শুদ্ধি। মা তুমি অনির্বচনীয়া— তুমি মন ও বাক্যের অগোচরা ; তথাপি আমরা বাক্যের দ্বারা তোমরা স্তুতি করিতেছি। ইহার ফলে— আমাদের বাক্ বিশুদ্ধা হইবে, রসনার জড়তা দূর হইবে, নিয়ত অসদ্ভাষণ জনিত এই বিদুষ্ট রসনার অপবিত্রতা বিদূরিত হইবে।

উচ্চৈঃস্বরে জপ এবং মনে মনে স্তব, উভয়ই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। মনে মনে স্তুতিপাঠ করিলে উহা প্রায়ই নিষ্ফল হয়। তাই **'বাগ্‌ভিঃ তুষ্টুবু'**। সাধক ! তুমিও যখন মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, (সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে, এইরূপ উপস্থিতি একান্ত সুলভ) তখন এই তিনটির দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্তবের আরম্ভেই মাতৃ-চরণে স্থূলদেহটি সম্যক্ অবনত করিয়া ফেলিবে, মাতৃ-চরণস্পর্শে দেহ পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিবে, এবং উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে থাকিবে। উচ্চৈঃস্বরে স্তবাদি পাঠকালে বহিরাগত শব্দসকল কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারে না। চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হইলে, তোমার উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থের দিকেই লক্ষ্য থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থানুগত ভাব বা অনুভূতি, চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকিবে। সংক্ষেপে ইহাকেই মন্ত্র-চৈতন্য বলা যায়। (মন্ত্র-চৈতন্য প্রথমে খণ্ডে ব্যাখ্যাত

হইয়াছে)। মন্ত্রসমূহ চৈতন্যময় করিয়া পাঠ করিতে, যে সকল বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে **'পুলকোদ্গমচারুদেহাঃ'** পদটিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। কেবল স্তোত্র কেন, যে কোন মন্ত্রসাধ্যকার্য, যথা—জপ, পূজা, হোম প্রভৃতি কার্য করিবার সময়ও, ইহার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। চৈতন্যময় মন্ত্রযুক্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠানে প্রসাদ— চিত্তপ্রসন্নতা, ধন—মাতৃ-মহত্ত্বের অনুভূতি, এবং ভোজন— পঞ্চ কোষের পুষ্টি-বিধান, অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে।[১]

শ্রীমদ্ভাগবতকারও বলিয়াছেন—রসিক এবং ভাবুক না হইলে, ভগবদ্ধর্মে অধিকার হয় না। তাই বলি, সাধক ! যখন যাহা করিবে, সাধ্যানুসারে তখন তদ্ভাবে ভাবুক ও রসিক হইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিতে পারিলেই কর্মসকল সফল হয়। আরে ! উপাসনা ত' ভাবেরই হয় ! ভাবাতীত স্বরূপের কি উপাসনা আছে ? না হয় ! আগে জগদ্ভাবগুলিকে—বিষয়রসগুলিকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত ও রসময় করিয়া লইতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহারই কৃপায় ভাবাতীত স্বরূপে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়।

আমাদের পূর্ববর্তী আচার্যগণও সামাদি বেদ পাঠ করিতেন ঃ অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, সূর্য, পর্বত, নদী প্রভৃতির স্তুতি গান করিতেন। উহা তাঁহাদের সরল প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। উহাতে কোনরূপ কপটতা ছিল না। সর্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শন করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাদের জড়ত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল ; তাই যাবতীয় জড় পদার্থের সহিত তাঁহারা চৈতন্যবৎ ব্যবহার করিতেন। এ দেশের লোক এখনও তুলসীপত্র চয়ন করিতে গিয়া সরল প্রাণে বলিয়া থাকে— 'হে তুলসি ! তুমি অমর ! তুমি কেশবের প্রিয়, কেশবের পূজার জন্যই তোমার পত্র চয়ন করিতেছি। তুমি কিছু মনে করিও না। আমায় ক্ষমা কর।' কেবল তুলসীপত্র চয়ন কেন, হিন্দুর গৃহে এখনও দৈনন্দিন অধিকাংশ কার্যেই— সাধারণত চক্ষুতে যাহা জড়, তাহার সহিত চেতনবৎ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধন্য সে দেশের লোক, যাহারা স্নানকালে মৃত্তিকা লেপন করিতে করিতে **'মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্'** বলিতে পারে, যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষে জল দিয়া **'অশ্বত্থরূপী ভগবান প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ'** বলিতে পারে, যাহারা শিলাখণ্ডকে প্রত্যক্ষ ভগবানরূপে দেখিতে পারে। কিন্তু সে অন্য কথা—

স্তবাদিসম্বন্ধে আর একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি —আধুনিক কোন লোকের কৃত স্তোত্রাদি অপেক্ষা ঋষিগণ প্রবর্তিত মন্ত্র কিংবা স্তবের শক্তি অনেক বেশী। বহুকাল যাবৎ গুরুপরম্পরাক্রমে সাধু মহাপুরুষগণ যে সকল মন্ত্র কিংবা স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া আসিতেছেন, উহাদের সামর্থ্য যে অনেক বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য আধুনিক লোকের কৃত স্তব বা সঙ্গীতে, যে ভাব বা রসের উদ্দীপনা করিতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে না। তবে ঋষি প্রবর্তিত শব্দগুলির শক্তি যেন আরও বেশী, ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে। একটু তত্ত্বের আস্বাদ পাইলে, তখন আর উপরের ভাসা ভাসা রসযুক্ত সঙ্গীত, কিংবা আধুনিক স্তুতিগুলির বড় একটা সৌন্দর্য থাকে না। বৈদিক শব্দগুলি যেন প্রাণ দিয়া গঠিত। উহার উচ্চারণে শরীরের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে একটা পবিত্রতার, সাত্ত্বিকতার স্পন্দন অনুভূত হয়। সে যাহা হউক, স্তব পাঠ করিতে হইলে, স্তব পাঠ কেন, মন্ত্রসাধ্য যে কোনও অনুষ্ঠান করিতে হইলে, সকলেরই পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কায় মন এবং বাক্য, তিনই যেন এক সুরে বাজিয়া উঠে। বৈধ কর্মগুলি যেন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ মাত্রে পর্যবসিত না হয়। অর্থহীন ভাবহীন মন্ত্রের উচ্চারণ, কিংবা কোনও বহুদূরস্থ সত্তার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম, প্রায়ই নিষ্ফল হয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধকগণের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন ঐ প্রণতি পুলক এবং পাঠ, এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলেই, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের যুগপৎ অনুশীলন হইয়া থাকে ! পূর্বে বলিয়াছি— জ্ঞান মানে তাঁকে জানা, ভক্তি মানে তাঁকে ভালবাসা এবং কর্ম মানে তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু করা। যাঁহাকে জানি না, তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু কর্মও করা হয় না। সাধক ! মায়ের স্বরূপ যত

[১]প্রসাদ, ধন ও ভোজন কি, তাহা প্রথম খণ্ডে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জানিবে, মায়ের মহত্ত্ব যত উপলব্ধি করিবে, ততই তোমার জীবভাব অবনত হইয়া পড়িবে। ইহাই জ্ঞানের ফল। উহারই বহির্লক্ষণ— প্রণতি। আর পরম প্রেমময়ী মায়ের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, প্রাণে স্বতঃই একটা ভালবাসার ভাব সঞ্চিত হইবে। উহাই ভক্তি এবং উহারই বহির্লক্ষণ পুলক অশ্রু কম্প ইত্যাদি। তারপর যে পরিমাণে ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহার উদ্দেশ্যে—তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য বৈধ-কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উহাই বাহিরে জপ, পূজা, স্তোত্র পরোপকার কিংবা বিশ্বহিত প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ২॥

অনুবাদ। সমগ্র দেবশক্তি-সম্ভবা যে দেবী, আত্মশক্তি দ্বারা এই সমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ; দেব এবং মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই মাতা অম্বিকাদেবীকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি। তিনি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

ব্যাখ্যা। মা তুমি দেবী, —দ্যোতনশীলা, নিত্য প্রকাশময়ী। জগতের সকল বস্তু প্রকাশ করিবার জন্য অপর কোন প্রকাশক বস্তুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুমি স্বপ্রকাশ স্বরূপা—তোমার প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না। যাহারা বলেন, 'অজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান প্রকাশ পায় অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া নামক প্রকাশ্য বস্তু আছে বলিয়াই, ব্রহ্ম ও জ্ঞান প্রকাশময়। প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে, প্রকাশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যেরূপ এই পৃথিবী না থাকিলে, সূর্যের প্রকাশস্বরূপ থাকিয়াও নাই, ইহা বলা যায় ; সেইরূপ প্রকাশ্য বস্তু বা অজ্ঞান পার্শ্বদেশে অবস্থান না করিলে, জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপত্বের উপলব্ধি হয় না।' মা গো ! এত যুক্তির দ্বারা যাহারা তোমার স্বপ্রকাশ স্বরূপকে নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা প্রমাণের দড়ি কোমরে বান্ধিয়া প্রমাণাতীতা তোমাকে স্পর্শ করিতে চায়। যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে তোমাকে যে ধরা যায় না, যাবতীয় প্রকাশ্য বস্তুকে সম্যক্‌রূপে সংহরণ করিয়া একমাত্র তুমিই যে স্বপ্রকাশ স্বরূপে নিত্য বিরাজমান থাক, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অথবা তুমি তাহাদিগের মধ্যে ঐ পর্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছ, তাই প্রমাণাতীতা, তোমাকে ধরিতে পারে না। আবার একদিন মা তুমিই যখন গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া, তোমারই ঐ শিষ্যমূর্তির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিবে, তখন তাহারাও বলিবে—'**তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।**'

'**ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা**'—মা তুমি আত্মশক্তি দ্বারা এই জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। আত্মা তুমি যখন শক্তিরূপে প্রকাশিত হও, তখনই ত' এ জগৎ ফুটিয়া উঠে। মা ! তোমার এই আত্মশক্তি শব্দটা নিয়া জগতে কতই না মতভেদ চলিতেছে। আত্মা এবং শক্তি, আত্মার শক্তি, আত্মার সহিত শক্তি, যেই আত্মা সেই শক্তি —ইত্যাদি কত বিভিন্ন মত, বিভিন্ন বাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরমত-খণ্ডন ও স্ব-মত প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে কতই না যুক্তি তর্কের অবতারণা আছে। যতক্ষণ তোমাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, যতক্ষণ তোমাকে অনেক দূরে রাখিয়া দেওয়া হয়, ততক্ষণই আত্মা এবং শক্তি নিয়া বাদ, বিতণ্ডা ও বিচার চলে। মা ধন্য তোমার লীলা ! আপনাকে ব্যক্ত করিতে গিয়া, আপনার অজ্ঞানতার ভাণ আপনি দূর করিতে গিয়া, কত লীলাই করিতেছ ! এখানে আবার আর এক লীলা আরম্ভ করিয়াছ ! ইহারই বা পরিণাম কি ? তাহা তুমিই জান। সে যাহা হউক, একবার তোমার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়—আত্মা এবং শক্তি, শব্দমাত্র ভেদ, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।

মা ! তুমি আত্মা, একমাত্র তুমিই ত যথার্থ আমির স্বরূপ। ঐ একটি আমিই ত' প্রতি জীবে প্রতি পরমাণুতে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত। ঐ এক আমিই ত' জীবরূপী বহু আধারের মধ্য দিয়া বহু আমির ভাণ করিতেছে ; ঐ এক আমির নাম আত্মা এবং বহুর ভিতর দিয়া প্রকাশ হওয়াটাই শক্তি। এই যে আত্মা এবং শক্তি, ইহাকে এক, দুই বা বিশিষ্ট এক, যাহাই বলা হউক না কেন, বস্তুতঃ তাহাতে তোমার স্বরূপের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ঐরূপ বিচার করিতে করিতেই একদিন তোমার যথার্থ স্বরূপ জীবের উপলব্ধি যোগ্য হইবে। বহুজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান-অন্ধকার পলায়ন করিবে।

আচ্ছা, একবার তোমার এই আত্মশক্তি শব্দটার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ? 'আমি দেখিতেছি' ইহাতে দুইটি বস্তু পাইলাম ; আমি এবং দর্শন-শক্তি। ইহা এক কি দুই, তাহার মীমাংসা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে প্রত্যেকেই করিয়া লইতে পারেন। তবে একটা কথা এই যে, ব্রহ্ম মায়া, পুরুষ প্রকৃতি, শিব দুর্গা, কৃষ্ণ রাধা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানগত (বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও) ভেদের উপাচার করা হয়। যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ দেহ আছে, যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ উহা অদ্বৈত হইলেও দ্বৈতরূপেই প্রতীত হয়। ভাষার মধ্য দিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, দ্বৈত ভাবটিই ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ ভাষা চিন্তা বা সাধনা আছে, ততক্ষণ ঐ শুকসারীর বিবাদ চলিবেই। শুক বলে—'আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল'। সারী বলে — 'আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নইলে পারবে কেন।' মা আমার লীলাময়ী, যতক্ষণ লীলা করিবেন, ততক্ষণ অভেদে ভেদোপচার কল্পিত হইবেই।

সে যাহা হউক, মা ! তুমি আত্মশক্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। **'ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা'**। সর্বত্রই দেখিতে পাই—একটি আমি, ও তাহার নানা ভাবে প্রকাশ। প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক জীবাণুতে ঐ আত্মশক্তি—ঐ হর-গৌরী মূর্তি ! ঐ রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি ! ইহাই তোমার জগদ্ব্যাপিনী আত্মশক্তি। মা ! তোমার এই বহু মূর্তিকে—জীব সন্তান-গণকে বলিয়া দাও— হে জীব ! তোমাদের যে আমিটার বিদ্যমানতা অনুভব কর, উহাই ঐ অনুভবটিই আত্মা—মা, আর ঐ আমির যতরকম কার্য বা প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় উহাই শক্তি। এইরূপ একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে আরম্ভ করিলেই জন্ম-জীবন সার্থক হইবে, ভয় মৃত্যু বিষাদ চিরতরে পলায়ন করিবে।

'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা'—মা ! আত্মশক্তি-রূপে তুমি জগৎময় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ, ইহা তোমার সাধারণ মূর্তি ; এমূর্তি আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না। তাই তুমি সন্তানস্নেহে বিহ্বলা হইয়া, মধ্যে মধ্যে অসাধারণ মূর্তিতে—স্ব স্ব ইষ্ট মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে বাধ্য হও ! উহা সমগ্র দেবগণের শক্তিসমষ্টি দ্বারা বিরচিত। মহিষাসুর-নিধন উদ্দেশ্যে এরূপ বিশিষ্ট মূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ।

মাগো ! যতক্ষণ জীবশক্তি-বোধ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞান। তারপর দেবশক্তি-বোধ হয়, উহার নাম জ্ঞান আর আত্মশক্তিবোধ উদ্ভাসিত হয়, তখন উহা জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত অনির্বচনীয়। বোধ— এই তিন স্তরেই বিচরণ করে। প্রথমে জীবের শক্তি বোধ হয়। অর্জন, রক্ষণ, ব্যয়, ভোগ, পাপ, পুণ্য, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, এ সকলই যেন 'আমি করি' এইরূপ জীবভাবীয় অভিমান যাবতীয় শক্তিকে আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পায়। তারপর পুনঃ পুনঃ দৈবপ্রতিকুলতা দ্বারা সে অহঙ্কার বা অজ্ঞান চূর্ণ হইতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে দেবশক্তির উপর বিশ্বাস আরম্ভ হয়। ক্রমে বুঝিতে পারে— শক্তি মাত্রেই দেবতা। ইহার নাম জ্ঞান। ইহাই বোধের দ্বিতীয় স্তর। অবশেষে ঐ দেবশক্তি যখন সমষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়, তখন জীব উহাতে পূর্ণভাবে আত্মদর্শন করিয়া, আত্মশক্তির সন্ধান পায়। ও সে কি আনন্দ ! কি পরিতৃপ্তি ! মায়ে আত্মহারা হইলে সাধক দেখিতে পায়— জগদ্রূপে আমিই অভিব্যক্ত। ঐ চন্দ্র, সূর্য, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, প্রতিনিয়ত আমারই আরতি করিতেছে। আমারই ভয়ে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া অনাদিকাল হইতে বিচরণ করিতেছে। এই বায়ু আমারই ভয়ে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। এই স্রোতস্বিনী প্রতিদিন আমারই অঙ্গ প্রক্ষালিত করিতেছে। এই কুসুমরাশি আমারই পূজার জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কত বলিব ! সবই যে আমি গো ! আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই ! সকলই আত্মা ! সকলই শক্তি ! সকলই মা !

সেই যে আমার আমি— অখিল দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া মা ! সেই যে আমার তুমি, সেই যে আমার সে, তাঁহাকে তোমাকে আমাকে **'ভক্ত্যা নতাঃ স্ম'**। ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি ! ভক্তি কোথায় পাব মা। সেও ত' তুমি। তোমাকে আত্মা বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, আত্মদান না করিলে, প্রাণরূপে আদর না করিলে যে, তুমি ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ কর না মা। যাঁহারা **'ভক্ত্যা নতাঃ'** হইতে পারেন, তাঁহারা ত' বলপূর্বক তোর অঙ্কে আরোহণ করিবেন। কিন্তু আমরা যে মা **'অভক্ত্যা নতাঃ'**। ভক্তি যে কাহাকে বলে তাহাই জানি না, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় কেমন করিয়া তোমার

চরণে আপনার প্রাণটা ঢালিয়া দিতে হয়, তাহাই জানি না মা ; আমাদিগকে কি কোলে তুলিয়া নিবি না মা ! আশা আমাদের। ভরসা আমাদের ! শুধু তোর মুখের দিকে তাকাইয়া কত জন্মমৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছি। মাগো, কতদিন তুই ভক্তিরূপে এ পাষাণবুকে ফুটিয়া উঠিবি, আমরাও **'ভক্ত্যা নতাঃ স্ম'** বলিয়া জীবত্বের পরপারে চলিয়া যাইব। প্রভু, পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ, বন্ধু, স্বামী, গুরু, সকলই তুমি। একাধারে আমার সকল ভালবাসা সকল আকর্ষণ, অপহরণ করিয়া তুমিই বসিয়া আছ। জগতে আত্মীয়গণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তবে আমাকে ভালবাসে। আমি যদি তাহাদের অভিপ্রায় অনুসরণ করিতে পারি, তবেই জগতের আত্মীয়গণের ভালবাসার অধিকারী হই। কিন্তু তুমি তোমারই প্রাণের টানে আমায় ভালবাস। তুমি যে আত্মা ! তুমি যে প্রাণ ! তোমার সে অলৌকিক ভালবাসা কবে বুঝিতে পারিব ? কবে আমরা ভক্তিরূপিণী তোমার আবির্ভাব দেখিয়া ধন্য হইব ?

মাগো, ভক্তি নাই ! তথাপি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। **'অভক্ত্যা নতাঃ স্ম—নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।'** নাও মা, ভক্তিহীন কাঙ্গাল সন্তানের প্রণাম নাও।

'বিদধাতু শুভানি সা নঃ'— আমাদের মঙ্গল বিধান কর। আমার একার নহে, আমাদের সকলের— এই বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গল বিধান কর মা। বিশ্বময় সকলেই তোমার মঙ্গল আশীর্বাদ লাভ করুক, বিশ্বের অমঙ্গল দূরীভূত হউক ! বিশ্বপ্রসবিনী মা আমার, দাও আশীর্বাদ, দাও বর, তোমার সন্তানগণ সকলেই সত্য ও প্রেমরূপ যথার্থ মঙ্গল লাভ করিয়া, অমঙ্গলের হাত হইতে চির-পরিত্রাণ লাভ করুক ! মা মা মা আমার !

———o———

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৩॥

অনুবাদ। যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব ও বলের বিষয় বর্ণনা করিতে ভগবান অনন্ত ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর পর্যন্ত অসমর্থ ; সেই দেবী চণ্ডিকা অখিল জগৎপরিপালন এবং অশুভভয় বিনাশের জন্য মতি করুন।

ব্যাখ্যা। মা ! সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব, চতুরানন ব্রহ্মা এবং পঞ্চানন হর, ইহারাও তোমার অতুলনীয় প্রভাব এবং বলের বিষয় বাক্য দ্বারা নির্দেশ করিতে পারেন না। যদিও ইঁহারা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তথাপি তোমার প্রভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ কেন ? মাগো তোমার প্রভাব ও বলের বিষয়সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইলে তোমাতেই মিলাইয়া যাইতে হয়। তোমাতে যতক্ষণ পূর্ণভাবে মিলাইয়া যাইতে না পারা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার মহত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। আবার বাক্য ও মন থাকিতে তোমাতে মিলিত হওয়া যায় না অথবা তোমাতে মিলিত হইলে— বাক্যের সহিত মন নিবর্তিত হইয়া পড়ে। তারপর যখন পুনরায় বাক্য ও মনের রাজ্যে ফিরিয়া আসে তখন তোমার অতুলনীয় মহত্ত্ব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতে হয় সুতরাং কেহই তোমার প্রভাব অবগত হইতে পারে না, তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। মা ! তুমি যে মনোবাণীর অগোচর।

মাগো ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা তোর প্রভাব, তোর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যপাত্র। তাই তাঁহারা তোর অচিন্তনীয় মহত্ত্ব অনুভব করিয়া বর্ণনা করিতে বিমুখ হইয়াছেন, মৌন হইয়াছেন। কিন্তু আমরা নিতান্ত অর্বাচীন, তোর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তোর মহত্ত্বের যতটুকু প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে ; বুঝি বা না বুঝি তাহা নির্বিচারে লোকের কাছে গাহিয়া বেড়াইব। শিশু পুত্র মায়ের মহত্ত্ব কিছুই জানে না ; তবু সকলের কাছে আপন মায়ের গৌরব-কাহিনী বলিয়া বেড়ায়। আমরাও মা ! তেমনি তোমার প্রভাবকাহিনী ঘাটে পথে নির্বিচারে বলিয়া বেড়াইব। আর কিছু না হউক—অসদ্ বাক্য উচ্চারণজনিত এ বিদুষ্ট রসনা পবিত্র হইবেই।

শুন সাধক, আমার মায়ের প্রভাব। এই যে সূর্যটি দেখিতে পাইতেছ, উহা আমাদের বাসভূমি বসুন্ধরা অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দলক্ষ গুণ বৃহৎ। এই পৃথিবীর ন্যায় ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতকগুলি গ্রহ (মঙ্গল, বুধ, শুক্র প্রভৃতি) ঐ সূর্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, উহার

চারিদিকে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক গ্রহের আবার কতকগুলি করিয়া উপগ্রহ আছে। এই সমুদয় গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত সূর্যের নাম সৌরজগৎ। আবার রাত্রিকালে আকাশে যে অগণিত নক্ষত্র দেখিতে পাও, উহার এক একটি নক্ষত্রই এক একটি সুবৃহৎ সৌরজগৎ। এই অসংখ্য সৌরজগৎ কোন অনাদি কাল হইতে কোন অলক্ষ্য কেন্দ্র লক্ষে অনবরত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। সেই যে মহাশূন্য, যেখানে এই অসংখ্য সৌরজগতের অবিশ্রান্ত দ্রুতগতি নিষ্পন্ন হইয়া, আরও কত অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না—সেই যে মহাশূন্য, যে এতবড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটাকে বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই যে আমাদের মা গো ! আমাদের মায়ের বক্ষে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনাদি কাল হইতে অনবরত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। দেখ সাধক, আমার মাকে একবার দেখ !

আবার এইরূপ অচিন্তনীয়, অতুলনীয় প্রভাবসমন্বিতা হইয়াও কোন ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কিরূপ ভাবে সুবিন্যস্ত হইলে, অতি সত্বর মায়ের অঙ্গে চিরতরে মিলিত হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় কোন্ ক্ষুদ্রতম কীটাণুর হৃদয়ে একটু মাত্র-সম্বেদন ফুটিয়া উঠিল, কোথায় কোন্ কীটাণুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিপতিত হইল, এই সকল যিনি স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন এবং অতিশয় তৎপরতার সহিত স্বয়ং তাহার যথা কর্তব্য বিধান করিতেছেন, তিনি—সেই তিনি আমাদের মা গো !

আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই, এত বড় অচিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রজালের মত কোথায় —কোন্ অব্যক্তক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার নিমেষে নিষ্পন্ন হয়, সেই যে আমাদের মা গো ! ইহা ছাড়া মায়ের আরও একটি অচিন্তনীয় প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়— আজ যে দুরাচার মূঢ়, কিছুদিন পরেই সে পুন্যবান জ্ঞানী। ইহা যিনি করিতে পারেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ নয় কি ?

সে যাহা হউক, **'সা চণ্ডিকা'**—সেই চণ্ডিকা মা তুমি ! যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব শিবত্ব পর্যন্ত নিমেষমধ্যে প্রলয়ের অতল গহ্বরে লুক্কায়িত হয়, সেই চণ্ডিকা তুমি মা ! একবার **'অখিলজগৎ পরিপালনায় অশুভভয়স্য নাশায় চ মতিং করোতু'**। এই অখিল জগতকে পরিপালন এবং অশুভভয় বিনাশের উপযোগিনী বুদ্ধির অনুপ্রেরণা কর। অখিল জগৎ পরিপালন করিতে হইলে, অশুভ-ভয়ের বিনাশ করিতে হয়। অশুভ শব্দের অর্থ মৃত্যু, তজ্জন্য যে ভয় তাহাকেই অশুভভয় কহে। মাগো ! চাহিয়া দেখ—এই জগৎ সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত। দেখ মা ! প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে মৃত্যুভয় কিরূপ আধিপত্য করিতেছে ! মৃত্যুভয়রূপ মহাপিশাচ, জীবের বুকের রক্ত প্রতি পলে কিরূপ শোষণ করিতেছে। জগৎময় যত কোলাহল শুনিতে পাও, উহা ঐ মহাপিশাচের তীব্র চিৎকার যাহাতে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়, তাহারই জন্য। অর্জন, রক্ষণ, আহার, নিদ্রা, ভোগ, বিলাস যতকিছু —সকলই ঐ মৃত্যুভয়কে চাপা দিয়া ক্ষণিক কাষ্ঠ হাসির আয়োজন মাত্র। মা ! জগৎময় এই যে মৃত্যুর করাল ছায়া নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অপসারিত করিবার মত বুদ্ধির অনুপ্রেরণা কর। অভয়া মা আমার ! জগতের মৃত্যুভয় বিদূরিত কর। অমৃতময়ী মা আমার ! জগতের মৃত্যুভয় দূর কর। মা ! তুমিই ত' অভয় অমৃত সত্য পরমাত্মা ! মৃত্যু এবং অমৃত, দুইটিই ত' তোমার হাতের ক্রীড়া যন্ত্র ! তাই তুমি সত্য, তাই তুমি অভয়। মা ! জগতে একবার এই অভয় সত্য মূর্তিতে দাঁড়াও ! জগৎ পরিপালন কর ! অমৃতধারায় মৃত্যুভয় দূর হইয়া যাউক। জীবজগৎ তোমার সত্যমূর্তি দেখিয়া অভয় হউক। জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমর হউক। ওগো— মৃত্যু-ভয় নামে যে একটা কিছু আছে, এ কথাটা জগৎশুদ্ধ লোক ভুলিয়া যাউক। তুমি সকলের প্রাণে প্রাণে বলিয়া দাও 'মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। জীব ! তোমরা অমৃতের সন্তান। অমৃতময় মাতৃ-বক্ষে তোমাদের অবস্থান। তোমাদের ঐ মৃত্যু বোধটা অজ্ঞানকল্পিত, মিথ্যা। আমি তোমাদের অভয়া মা, তোমরাও নিত্যনির্ভয় স্বাধীন সন্তান।' মাগো, প্রতি জীবের মর্মে মর্মে এই বাণী ধ্বনিত করিয়া দাও। সকলেই বুঝিয়া লউক— আমরা অভয়, আমরা অমৃত ! আর এ জগতের শোক দুঃখের হাহাকার কাতর চিৎকার শোনা যায় না মা !

আমাদের বুদ্ধি প্রতিনিয়ত বহুত্ব দ্বারা স্পন্দিত, তাই আমরা চিরদিন মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, শোকে-দুঃখে উৎপীড়িত। আমাদের বুদ্ধিতে নানাত্ব দর্শন আছে বলিয়াই

আমরা কেবল মৃত্যু হইতে মৃত্যুর কবলে আত্মাহুতি দেই! বুদ্ধিতে যে একমাত্র অমৃত স্বরূপিণী তুমিই প্রতিবিম্বিতা রহিয়াছ, ইহা না বুঝিয়া আমরা তোমার দিকে না চাহিয়া, বহুত্বের পশ্চাৎ ধাবিত হই, তাই বার বার মৃত্যু-যাতনা ভোগ করি। কিন্তু এবার আমাদের মতি যেন তোমাতেই নিয়ত মুগ্ধ থাকে।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৪॥

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং সুকৃতিশালী জনগণের ভবনে শ্রী, পাপাত্মাদিগের ভবনে অলক্ষ্মী, বিবেকিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনগণের অন্তরে শ্রদ্ধা, এবং সৎকুলসম্ভূত জনগণের হৃদয়ে লজ্জারূপে বিরাজমানা সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি এই বিশ্ব পরিপালন কর।

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সুকৃতিশালী, তাঁহাদিগের ভবনে তুমি শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্যরূপে বিরাজিতা। কেবল ধন-রত্নাদিকেই ঐশ্বর্য বলে না, ইচ্ছার অনভিঘাতই যথার্থ ঐশ্বর্য। ইহা বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মলতার বহির্লক্ষণ। এ দেশে তান্ত্রিক-পূজাদিতে, ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই আটটি পীঠদেবতা পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আটটি বুদ্ধির ধর্ম! বুদ্ধিই যথার্থ মায়ের পীঠ। বুদ্ধিতত্ত্বেই মায়ের অধিষ্ঠান। পূজা, অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা যাহা কিছু সকলই এই বুদ্ধি পর্যন্ত। তাই পূর্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে '**মতিং কারোতু**'। বুদ্ধি নির্মল হইলেই জীব সুকৃতিশালী হয়, সুকৃতিশালী হইলে শ্রী বা ঐশ্বর্য লাভ হয়— অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হয়। তাহার ফলে বৈরাগ্য ধর্ম ও জ্ঞান লাভ হয়, জীব মোক্ষপদী লাভ করে। মা! এইরূপে তোমার শ্রীমূর্তির প্রকাশ সুকৃতিশালী জনগণের ভবনেই পরিলক্ষিত হয়।

মা! আবার যাহারা পাপাত্মা—পাপবুদ্ধি, তাহাদের ভবনে তুমিই আবার অলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। অলক্ষ্মী —অনৈশ্বর্য, অর্থাৎ ইচ্ছার অভিঘাত। যতদিন জীবের বাসনা অপূর্ণ থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে— বুদ্ধিতে পাপ আছে। পাপ শব্দের অর্থ সঙ্কোচ। বুদ্ধি যতদিন কেবল রূপরসাদি বিষয় প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ থাকে, ততদিন উহা রজস্তমঃ কর্তৃক মলিনীকৃত, তাই সঙ্কুচিত, তাই পাপ বুদ্ধি মলিন থাকিলেই অলক্ষ্মী অনৈশ্বর্যের রাজত্ব। অনৈশ্বর্য হইতেই অধর্ম, অবৈরাগ্য এবং অজ্ঞান আসে।

পাপ-পুণ্য এই বুদ্ধি পর্যন্তই। ইহার উপরে আর পাপ পুণ্য নাই। ধর্মা-ধর্ম জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-ভোগ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি—সকলই এই বুদ্ধি পর্যন্ত। জগতে যাহা পাপ পুণ্য নামে পরিচিত, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই পুণ্য। এক অবস্থায় যাহা পাপ, অন্য অবস্থায় হয়ত তাহাই পুণ্য। সুতরাং জাগতিক পাপ পুণ্যের বিচারে স্বাস্থ্য ও সমাজস্থিতির দিকেই প্রধান ভাবে লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। আধ্যাত্মিক পথের কণ্টকসমূহ উন্মুক্ত করাই পাপপুণ্য-বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এইরূপ বিচার করিতে করিতে একদিন জীব বুদ্ধিসত্ত্বে উপনীত হয়। তখন পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, উহা আপেক্ষিক নহে—সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় প্রযুজ্য।

বুদ্ধিতে দ্বিবিধ প্রকাশ বিদ্যমান। এক ইন্দ্রিয় কর্তৃক আহৃত বিষয়ের প্রকাশ, অন্য পরমাত্মার প্রকাশ! ইহার প্রথমটি পাপ, দ্বিতীয়টি পুণ্য। বৈষয়িক প্রকাশে বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়, কিন্তু পরমাত্মার প্রকাশে উহার প্রসার হয়। তাই বলিয়াছিলাম, পাপ— সঙ্কোচ, পুণ্য— প্রসার। ফুল বলিয়া ফুলটি গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়। কিন্তু উহাকে মা বলিয়া, প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির প্রসার হয়। ব্যবহারিক পাপ পুণ্যও এই বুদ্ধির সঙ্কোচ-প্রসারের উপরই অধিকাংশ ব্যবস্থাপিত। বুদ্ধির সঙ্কোচের নামই অজ্ঞান; অজ্ঞান হইতে অনৈশ্বর্য হয়—কামনা অপূর্ণ থাকে! কামনা পূর্ণ না হইলে, বৈরাগ্য আসিতে পারে না। সুতরাং দেখিতে পাই— বুদ্ধির একদিকে শ্রী, অন্যদিকে অলক্ষ্মী। একদিকে ধর্ম ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য, অন্যদিকে অজ্ঞান অধর্ম অনৈশ্বর্য ও অবৈরাগ্য।

মা! এই উভয়রূপেই যে তুমি বিরাজিতা, ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারই '**কৃতধী**' হয়! তাই তুমি '**কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ**'। তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় '**ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ**' বলিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে

প্রকাশিত হইবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মাগো ! বুদ্ধিতে পৌঁছিতে পারিলেই যে জীবের সব লাভ হয়, সকল অভাব চিরতরে দূরীভূত হয় ; তাই ত' সমগ্র জীব-জগতের বুদ্ধিতত্ত্ব উন্মেষের জন্য তোর রাতুল চরণে এই প্রার্থনা '**ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ**'।

'শ্রদ্ধা সতাং'—যাঁহারা সৎ-এর সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে—গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়-রূপে তুমিই মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। যাঁহারা এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিনশ্বর বহু বস্তুর মধ্যেও এক অখণ্ড অপরিণামী নিত্য সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সজ্জন। পূর্বোক্তরূপ কৃতধী হইলেই জীব সৎ-এর সন্ধান পায়। যে উপায়ে উহা হয়, তাহা শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে পর্বতের মত অটল বিশ্বাস। মাগো, যাহাদিগকে তুমি সৎ কর, তাহাদিগের হৃদয়ে তুমিই শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করিয়া, অসতের পরপারে লইয়া যাও। ইহাই তোমার মাতৃত্ব।

'**কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা**'—সৎকুলসম্ভূত জনগণের হৃদয়ে মা তুমি লজ্জারূপে অবস্থিতা। অকার্যবৈমুখ্যই লজ্জা। এই জগতে সজ্জনগণ যে নিন্দিত কর্ম করিতে লজ্জা বোধ করেন, লজ্জারূপে তাঁহাদের হৃদয়ে তুমিই মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। আবার পক্ষান্তরে যাঁহারা সৎ-এর সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা বিষয়রূপ কুলে বিচরণ করিয়াও অকুলের সন্ধান পাইয়াছেন, একমাত্র অখণ্ড সত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে যাবতীয় কর্মের অতীত বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাই সর্বতঃ নির্লিপ্তা তোমাতে কোনরূপ কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন। ইহাই তাঁহাদের অকার্যবৈমুখ্যরূপ লজ্জা।

'**তাং ত্বাং নতাঃ স্ম**'—সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি মা ! তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রী অলক্ষ্মী বুদ্ধি ও লজ্জারূপে প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। তুমি অদৃশ্যা অস্পৃশ্যা অগ্রাহ্যা হইয়াও ঐ সকল রূপে নিয়তই আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাক। মাগো ! তোমার চরণে আমরা প্রণত হইতেছি। শুধু মুখে নয়, কায়মনেও তোমার চরণে সর্বতোভাবে অবনত হইতেছি।

'**পরিপালয় দেবি বিশ্বম্**'—তুমি এই বিশ্বকে পরিপালন কর। মাগো ! তুমি যে বিশ্বকে যথার্থই পরিপালন করিতেছ, বিশ্ববাসী জীবমাত্রেই যে তোমার স্নেহময় অঙ্কে অবস্থিত, এই বিশ্বাস, এই ধ্রুবজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে—প্রতি জীবহৃদয়ে উদ্দীপিত কর। তোমার স্নেহের সন্তানগণ যে ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরীভূত ! দুর্ভিক্ষ মহামারী অকালমৃত্যুর কঠোর সম্পেষণে ছিন্নমর্ম ! ওগো, তাহারা যে নিত্যানন্দময়ীর অঙ্কে পালিত হইয়াও, বিষাদে ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইহা বিদূরিত কর। তুমি গুরুরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া দাও, বহুদিনের অজ্ঞান-কল্পিত দুঃখের পেষণ হইতে জীব পরিত্রাণ লাভ করুক। ইহাত ত' তোমার যথার্থ জগৎপরিপালন। নতুবা জগৎ পরিপালন করিতে বলার অন্য সার্থকতা কি ? তুমিই জগদাকারে আকারিতা, আবার তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী ; সুতরাং তুমি যে জগৎ পরিপালন করিতেছ ও করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

মা ! সত্যই যে আমরা নিরাশ্রয় নহি, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা যে দুঃখে ভয়ে প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, আপনাদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় মনে করিয়া, একান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি, আমাদের এই ভাবটা দূর কর মা ! সত্যই যে তুমি বিশ্বপালনকর্ত্রিরূপে নিয়ত আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমাদিগের মর্মে মর্মে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দাও।

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৫॥

অনুবাদ। হে দেবি ? তোমার অচিন্তনীয় রূপের বিষয় কি বর্ণনা করিব ? অগণিত অসুরক্ষয়কারী তোমার প্রভূত বীর্য, রণক্ষেত্রে প্রকটিত তোমার অলৌকিক চরিত্র, এ সকলই অসুরগণকে ও দেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। মা তোমার রূপ অবর্ণনীয় এবং অচিন্তনীয়। যথার্থই তোমার রূপকে আমরা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিতে অথবা মন দ্বারা ধারণা করিতে পারি না। দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেরই একটা রূপ আছে, ইহা আমরা বুঝিতে

পারি ; কিন্তু ঐ রূপ বস্তুটি যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, মনে মনে চিন্তাও করিতে পারি না। আমরা যাহাকে রূপ বলি বা বুঝি, তাহা ত' বাস্তবিক রূপ নহে— আকৃতিমাত্র। গোলাকার চতুষ্কোণ ত্রিকোণ লাল নীল শুভ্র কঠিন কোমল তরল উচ্চনিম্ন ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ দ্বারা আমরা রূপবস্তুটিকে বুঝিতে বা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাই বটে ; বাস্তবিক উহাতে রূপের কিছুই ব্যক্ত হয় না, আকার বা গঠনের কিয়ৎ অংশ মাত্র ব্যক্ত হয়। রূপ শব্দটি বুঝিতে গিয়া, আমরা যে সুন্দর ও কুৎসিত এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করি, ঐ দুইটি শব্দও আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়। বাস্তবিক রূপ রূপই। উহাতে সুন্দর কুৎসিত কিছুই নাই। রূপ এক ব্যতীত দুই নাই। এই বিশ্ব রূপসাগরেই ভাসিতেছে। এ রূপের স্বরূপ যে কি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহা চিন্তারও অতীত। অথচ রূপ নাই, ইহা বলিবার উপায় নাই। মনে হয়— আমরা সর্বদা রূপই দেখিতেছি। যাহা দেখি, তাহা কিন্তু রূপ নহে— আকার। এক অখণ্ড রূপসাগরে কতকগুলি নাম ও আকার ফুটিয়া রহিয়াছে। আকারগুলি যে রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা যেন বুঝিয়াও বুঝি না। এই আকারগুলিই বেদান্ত প্রতিপাদ্য নাম ও রূপ। বাস্তবিকই যখন আমরা রূপের দিকে লক্ষ্য করি, তখনই সর্বেনিদ্রয়াগম্য একটা মহাসত্যক্ষেত্রে উপনীত হই। সে যে কি, তাহা যথার্থই বাক্য ও চিন্তার অতীত।

মা ! পক্ষান্তরে যদি ধরিয়া লই যে, আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলিয়া বুঝি, উহাই তোমার রূপ ; তাহা হইলেও উহা চিন্তার অতীত হইয়া পড়ে। চন্দ্রে পদ্মে কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে, অর্দ্ধস্ফুটবাক্ পুত্র কন্যার মুখে যে সৌন্দর্যবিন্দু দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, যে সৌন্দর্য-সিন্ধুর একবিন্দু এত মুগ্ধকর, না জানি সেই রূপের সিন্ধু তুমি কত প্রাণারাম—কত মুগ্ধকরী ! মাগো এই ব্যষ্টিরূপ, এই বিনশ্বররূপ, ইহাই যদি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারে— তোমার দিকে তাকাইতে না দিতে পারে তবে সমষ্টি রূপময়ী তোমাতে যাহারা মুগ্ধ, তাহারা যে জগতের রূপকে অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? মাগো তুমিই ত' **'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ।'** যাহারা তোমার এই অপরূপ রূপসাগরে ডুব দিতে পারিয়াছে, আত্মহারা হইতে পরিয়াছে, তাহারা জানে—কুৎসিত বলিয়া কিছু নাই, নিন্দিত বলিয়া কিছুই নাই, সবই রূপময়, সবই সুন্দর ; মা মা ! সে কি লোভনীয় অবস্থা।

মাগো ! কিরূপে তোমার সেই রূপাতীত রূপসাগরে অবগাহন করা যাইতে পারে এস্থলে তাহারও আভাস দেওয়া যাইতেছে। রূপের পাঁচটি অবস্থা। প্রথমতঃ স্থূলরূপ অর্থাৎ আকার। দ্বিতীয়তঃ চক্ষু অর্থাৎ দৃক্শক্তি। চক্ষুতেই রূপজগতের সূক্ষ্মপ্রকাশ। তৃতীয় রূপতন্মাত্র, ইহা রূপের সূক্ষ্মতর প্রকাশ। চতুর্থ অস্মিতা অর্থাৎ রূপের বোধস্বরূপ। ইহা রূপের সূক্ষ্মতম প্রকাশ। এইখানে উপনীত হইলে, রূপ যে একপ্রকার বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহার উপলব্ধি হয়। এতব্যতীত রূপের আরও একটি অবস্থা আছে, উহা পুরুষার্থ। পুরুষের অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মার ভোগসম্পাদন করে বলিয়াই ইহার নাম পুরুষার্থ। উহাই রূপের পঞ্চম অবস্থা বা অতি সূক্ষ্মতম স্বরূপ।

প্রথমে সত্যবোধে স্থূলরূপকে অর্থাৎ যে কোন পদার্থের আকৃতিকে মা বলিয়া ধরিলেই রূপের দ্বিতীয় স্বরূপ দৃকশক্তি উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বময় একটা দৃক বা দর্শন শক্তিই যে যথার্থ রূপের স্বরূপ, তাহা বোধ হইতে থাকে। তারপর উহাতে আবার সত্যবোধ করিয়া মা মা বলিয়া কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেই রূপতন্মাত্রে উপনীত হওয়া যায়। উহা অতি সূক্ষ্ম—জ্ঞানময় রূপ আকাশীয়ভাব, অথচ অতি লোভনীয়, অতিশয় প্রাণারাম। তারপর আরও মা মা বলিয়া অগ্রসর হইলে মা এমন স্থানে উপনীত করেন, যেখানে আমার আমিটাই রূপময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আমিত্ব যে রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ উপলব্ধি যখন আসিতে থাকে, তখন আমি যে কি হইয়া যায়, তাহা ভাষায় কিরূপে ব্যক্ত হইবে ! সে যে অরূপের রূপময় স্বরূপ ! সেখান হইতে আবার মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, তবে এই রূপময় আমির যিনি যথার্থ দ্রষ্টা, যাঁহার করুণ ঈক্ষণে আমি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, চকিতের ন্যায় সেই স্বরূপের অভাস পাওয়া যায়। তারপর পুনরায় স্থূলরূপে নামিয়া আসিয়া সাধকের কি হয় ? তাহার রূপের পিপাসা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে নির্বাপিত হইয়া যায়। আর **'রূপং দেহি'** বলিয়া মায়ের কাছে

কাতর প্রার্থনা করিতে হয় না। 'রূপং দেহি' মন্ত্রের ইহাই সিদ্ধাবস্থা।

মাগো। তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে বলিয়া দাও যে, শুধু 'রূপং দেহি' বলিয়া স্থূলরূপ হইতে সত্য-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলে কত সহজে অনায়াসে রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রূপাতীত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।[১]

'কিঞ্চাতিবীর্যং'— মাগো, অগণিত, অসুরবীর্য-ক্ষয়কারী তোমার অতুলনীয় বীর্যও আমাদের চিন্তার অতীত। মা ! অসুরবীর্যরূপেও তুমি, আবার অসুরবীর্য-ক্ষয়কারী বীর্যরূপেও তুমি। ক্ষয় শব্দের দুইটি অর্থ —বিনাশ এবং নিবাস। 'ক্ষি'ধাতুর নিবাস অর্থেও প্রয়োগ হয় ! সুতরাং অসুরক্ষয়কারী বীর্য বলিতে দুইই বুঝায়। যে বীর্য অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাও তুমি ! আবার যাহা সেই অসুর বীর্য বিনাশ করে, তাহাও তুমি। একাধারে এরূপ পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধভাব তোমাতেই সম্ভব। অসুর এবং সুর, উভয়ই তোমার তুল্য প্রকাশ। কোথাও ন্যূনাতিরেক নাই। তাই মন্ত্রেও দেখিতে পাই **'অসুরদেবগণাদিকেষু'**।

মাগো, তোমার ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তত্ব-রূপ মহাবীর্য প্রকাশ পাইবার পূর্বেই ত' আমাদিগের নিকট এই অসুরবীর্য প্রকাশ পায়, আমরা তোমার এই অতুলনীয়বীর্য দেখিয়াই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই। যখন দেখিতে পাই— তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অসুররূপে প্রকাশিত হও, তখন নিষ্কাম অক্রোধ নির্লোভ প্রভৃতি দেববীর্য কত নির্জিত হইয়া পড়ে। আবার যখন দেবীবীর্য প্রবল হয়, তখন অসুরবীর্য কত নির্জিত হইয়া পড়ে। এইরূপে মা, স্বকীয় হৃদয়ক্ষেত্রে অহর্নিশ তোমারই বীর্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার এইরূপ পরস্পর-একান্ত-বিরুদ্ধবীর্য প্রকাশকালে যে আহব উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে তোমার কি অভূতপূর্ব লোকোত্তর বীর্য প্রকাশ পায় ! মাগো, যখন অসুরবীর্যের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন চিত্তক্ষেত্রে কি লোকবিগর্হিত লীলার অভিনয় হইতে থাকে ! আবার হয়ত পরমুহূর্তেই অসুরবীর্য হৃতপরাক্রম ও সুরবীর্য প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্রে স্বর্গীয় শান্তির বিমল প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দেয়।

এতদ্‌ভিন্ন মা তোমার আর একটি বীর্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যাহা সুরাসুর উভয়েরই অতীত। ওগো, যেখানে সকল বীর্য পরাভূত, উহা সেই অভয় অমৃতময় বীর্য। যাঁহার ভয়ে সূর্যের উদয়, যাঁহার ভয়ে বায়ুর প্রবাহ, যাঁহার ভয়ে পর্জন্যের বর্ষণ, যাঁহার ভয়ে মৃত্যুরও ভীতি উপস্থিত হয়, ইহা সেই বীর্য। সেই সর্ববীর্যাতীত বীর্যময়ী মা আমার তোমার চরণে কোটি প্রণিপাত, মা কোটি প্রণিপাত।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৬॥

অনুবাদ। তুমি সমস্ত জগতের হেতু। ত্রিগুণ-স্বরূপা হইয়াও দোষ নিবন্ধন তুমি অজ্ঞেয়া, সুতরাং হরি-হরাদিরও ধ্যানের অগম্যা। তুমি সর্বাশ্রয়া। এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ মাত্র। তুমিই অব্যাকৃতা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

ব্যাখ্যা। হে মা, একমাত্র তুমিই সমস্ত জগতের হেতু। শুধু যে জগতে আমরা বাস করি, এই একটি জগৎ নহে ; সমস্ত জগৎ-অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই অনাদি সৃষ্টিচক্রের যেখানে যত কিছু পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে, সে সমস্তেরই একমাত্র তুমিই হেতু ; হেতু দ্বিবিধ—নিমিত্ত এবং উপাদান। এই উভয় হেতুই তুমি। আমরা স্বপ্নের দৃষ্টান্তে উহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। স্বপ্ন-দৃশ্য পদার্থগুলির নিমিত্ত অর্থাৎ কর্তা এবং উপাদান উভয়ই যেরূপ মন ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; সেইরূপ এই জাগ্রত অবস্থায় পরিদৃশ্যমান কিংবা অনুভূয়মান জগৎ-প্রপঞ্চের নিমিত্ত এবং উপাদান—উভয়ই তুমি। আত্মা মা আমার, তুমিই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছ।

মা ! হয়ত তোমার কোনও জ্ঞান বৃদ্ধ সন্তান বলিবেন — না, আত্মা জগৎ-কারণ নহে, আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে কোনরূপ কারণতা থাকিতে পারেন না। জগতের

[১]প্রথম খণ্ডে অর্গলাব্যাখ্যায় রূপ শব্দের পরমাত্মা পর্যন্ত অর্থ করা হইয়াছে, এবং রূপের যে সকল স্তর ভেদ করিয়া পরমাত্মস্বরূপে আসিতে হয়, তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে।

উপাদান কারণ—জড় প্রকৃতি। চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ এ জড় প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহাই এই জগৎ। আবার নিমিত্ত কারণতাও আত্মায় নাই ; কারণ প্রকৃতির জগৎরূপে যে পরিণাম হয়, ইহা দর্শন করাও আত্মার ধর্ম নহে। তাহাতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই। স্বরূকাশস্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যধর্ম অবভাসিত হয়, এবং তাহার পরিণাম এই জগৎ। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। আমরা তাহাদের সিদ্ধান্তও সত্যজ্ঞানে স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু মা ! তুমি ত' আমাদের নিকট কেবল এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ কর নাই ! গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছ —ঐ যে জড়া প্রকৃতি, উহাও তুমি—আত্মা মা আমার ! তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে **'ত্রিগুণা'**। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদানও তুমিই, অন্য কেহ নহে।

পরমাত্মা মা আমার ! তুমি চৈতন্যস্বরূপ, আর তোমার প্রকৃতি জড় অচেতন, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব। চেতন আত্মার প্রকৃতি অচেতন হইতে পারে না। বরং অচেতনাকারে চেতনের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। যদি দেখিতাম যে— ত্রিগুণাপ্রকৃতি আত্মা ব্যতীত অন্য কোথায়ও অবস্থান করিতে পারে, তবে না হয় জড়সত্তা মানিয়া লইতাম। যখন সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রকৃতি ও আত্মার একান্ত অবিনাভাব, তখন আর উহাকে জড় কিরূপে বলি। ওগো, যতক্ষণ তোমার আলোচনা, যতক্ষণ আমি, ততক্ষণই তুমি ত্রিগুণা প্রকৃতি। মুখে বলি—'আমার প্রকৃতি।' বস্তুতঃ কিন্তু 'আমিই প্রকৃতি'। যেরূপ 'রাহুর শির' বলিলে, রাহু হইতে শিরকে যেন পৃথকরূপে বুঝিয়া লই, ইহাও ঠিক সেইরূপ। পুরুষ প্রকৃতি, ব্রহ্ম মায়া, আত্মা শক্তি ইত্যাদি যুগ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেও বাস্তবিক উহারা সম্পূর্ণ অভিন্ন। আত্মা যখন প্রকৃতিরূপে, মায়ারূপে বা শক্তিরূপে প্রকাশিত হন, তখনই তিনি প্রকৃতি, মায়া বা শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

আশঙ্কা হইতে পারে— বিশুদ্ধবোধ বা 'জ্ঞ' স্বরূপ আত্মা কিরূপে জড়-প্রকৃতিরূপে অর্থাৎ ত্রিগুণাকারে আকারিত হইতে পারে ? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—ঐ যে 'জ্ঞ' বস্তু, উহাতেই জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপ বিশিষ্ট ভাবত্রয় প্রকাশ পায়। নির্গুণ অবস্থায় উহা অব্যক্ত থাকে, এই জন্যই প্রকৃতির অন্য নাম অব্যক্ত। 'জ্ঞ' হইতেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ধর্ম প্রকাশ পায়। উহাই ত্রিগুণ ! জ্ঞান—সত্ত্ব-গুণ, জ্ঞাতা রজগুণ এবং জ্ঞেয় তমোগুণ, এই তিনটি বস্তু অন্যত্র হইতে আসে না। ঐ 'জ্ঞ' বস্তু হইতেই প্রকাশ পায়। তাই দেখিতে পাই— জীব ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম তিন অবস্থায়ই 'জ্ঞ' বা আত্মবস্তু অক্ষত থাকে। এবং ঐ আত্মাতেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ধর্ম প্রকাশিত হইয়া, নাম-রূপাত্মক জগৎ প্রতিভাত হয়। তাই ত' মা যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই তোমার বিচিত্রবিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। তাইত' মা যেখানেই মা বলিয়া ডাকি, সেইখানেই তোমার সাড়া পাই, তোমার স্নেহাদরের গর্ব অনুভব করি। তাইত' মা দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া **'হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণা'** বলিয়া প্রকৃতিরূপিণী তোমারই রক্তচরণে অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

মা গো ! তুমি ত্রিগুণা মূর্তিতে জগৎরূপে প্রতিভাত, ইহা যদি এত সত্য, তবে দেবতাগণের মত আমরাও জগৎ দেখিয়া তোমাকে দেখি না কেন ? ঘট সরার দর্শনের সঙ্গেই যেরূপ মৃত্তিকা দর্শন হয়, কুণ্ডল দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ সুবর্ণ দর্শন হয়, সেইরূপ জগৎ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন মা তোমার দর্শন লাভ হয় না ? চিন্ময়ী ! তুমিই যদি জগৎ, তুমিই যদি নামরূপ, তবে কেন তোমাকে দেখিতে পাই না ?

'দোষৈর্নজ্ঞায়সে'— দোষবশতঃ তুমি পরিজ্ঞাত হও না ! দোষ কি ? প্রথম দোষ— দেখিতে চাই না। দ্বিতীয় দোষ— সংশয় ও অবিশ্বাস। আমরা যে মাত্র নামরূপই দেখিতে চাই। আমরা যে নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়জগৎ রূপেই ইহাকে দেখিবার অভিলাষী। তাই তোমাকে দেখিতে পাই না। তারপর যদি কখনও বিদ্যুৎ রেখার মত ক্ষণস্থায়ী মাতৃ-দর্শনেচ্ছার ক্ষীণ রেখা জাগে, অমনি সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপনেত্ররূপে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। উহারা বলিয়া দেয়—'তাও কি হয়, এই জড় মাটি কি আর 'মা'টি হয় গো ? এই জড় জল কি আর চিন্ময়ী মা হইতে পারে ?' এইরূপ সর্বত্র উহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করে। উহারাই ত' তোমার এই প্রকট বিশ্বমূর্তিতে জড়ত্বের দুরপনেয় আবরণ ফুটাইয়া

তোলে, আর তাহারই ফলে সেই ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষার রেখাটি চকিতে মিলাইয়া যায়।

হায় মা ! কতদিন আর এইরূপ ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে প্রতারিত করিবে ? তুমিই ত' মা দোষের সৃষ্টিকর্ত্রী। তুমিই ত' নিজেই অবয়ব দোষ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছ ! তাই তুমি ধরা দিতেছ না। আমাদের চক্ষু তোমার দোষময়ী মূর্তি দেখিতে যে বহুদিন হইতেই অভ্যস্ত, তাই গুণময়ী তোমাকে দেখিতে পাই না। যদি দোষকেও মা বলিয়া বুঝিয়া লইতে পারিতাম, যদি মায়াকেই মা বলিয়া স্বীকার করিতাম, যদি প্রকৃতিকেই পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতাম, যদি মনকেই প্রাণ বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতাম, যদি বিষয়কেই ভোক্তারূপে ভোগ করিতাম, যদি দৃশ্যমাত্রকেই দ্রষ্টার স্বরূপে দর্শন করিতাম, যদি জড়কেই চেতনরূপে উপলব্ধি করিতাম, তবে নিশ্চয়ই মা তোমার দোষাবরণ অপসারিত হইত। ওগো, তুমি ছাড়া আর যত কিছু সবই যে দোষ ! চেতন ছাড়া, আত্মা ছাড়া, যা কিছু সবই যে দোষ ! সর্বরূপেই যে এক তুমি, ইহা বুঝিতে পারিলে, আর দোষ কোথায় ? যতদিন দোষ বলিয়া তোমা হইতে পৃথক্ একটা কিছু থাকিবে, ততদিনই তুমি **'ন জ্ঞায়সে।'** যাঁহারা এই দোষকে মিথ্যা ভ্রান্তি অধ্যাস অকিঞ্চিৎকর বা কল্পনামাত্র বলিয়া শুধু তোমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদেরও একটু না একটু দোষলেশ থাকিয়া যায় ! মিথ্যাই বলুন, আর ভ্রান্তিই বলুন দোষের দর্শন ত' হইতেছে ! তাই বলি—যতক্ষণ দোষকে তোমা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তোমার আবরণ রূপে দৃষ্ট হয়, ততক্ষণই তুমি 'ন জ্ঞায়সে'। ততক্ষণই তুমি আবৃতা।

মাগো, গীতায় তুমিই ত' বলিয়াছ—যেরূপ ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত হয়, যেরূপ মলের দ্বারা দর্পণ আবৃত থাকে, যেরূপ উল্ব অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্ম দ্বারা ভ্রূণ আবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। অজ্ঞানই দোষ। অজ্ঞান থাকিতে জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ইহা সত্য। কিন্তু ধূম যেরূপ বহ্নির সহজাত দোষ, মল যেরূপ আদর্শের অবশ্যম্ভাবী আগন্তুক দোষ, উল্ব যেরূপ ভ্রূণের সংরক্ষণী সহজাত চর্মাবরণ দোষ, ঠিক সেইরূপই অজ্ঞান জ্ঞানের সহজাত অবশ্যম্ভাবী দোষ। অজ্ঞানও যে জ্ঞানমাত্র, ইহা বুঝিলেই, দোষ বিদূরিত হয়, জ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর তুমি 'ন জ্ঞায়সে' নও ; 'জ্ঞায়সে'। অথবা তখন তুমি জ্ঞানরূপেই আত্মপ্রকাশ কর।

'হরিহরাদিভিরপ্যপারা' — মা ! আমরা কি করিয়া তোমায় জানিব ? তুমি যে কেবল আমাদেরই অজ্ঞেয়া তাহা নহে, হরি হর বিরিঞ্চিরও ধ্যানের অগম্যা। যতক্ষণ ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয় থাকে, ততক্ষণ ত' তোমার যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না, যতক্ষণ হরিহরাদি বিশিষ্টবোধ থাকে, ততক্ষণ কিরূপে তোমার পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইবে ! ওগো, আমি থাকতে তুমি আসিবে না, আমি গেলে তবে তুমি আসিবে। অপার চিৎসমুদ্রে যতক্ষণ বিশিষ্ট আমিটিকে একেবারে ডুবাইয়া দেওয়া না যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তুমি আত্মারূপে প্রকটিত হও না। তাই তুমি **'হরিহরাদিভিরপ্যপারা।'**

সর্বাশ্রয়া মাগো, এত দুর্জ্ঞেয়া হইলেও আমাদের হতাশ হইবার হেতু নাই ; কেননা—তুমি সর্বাশ্রয়া ! তুমি সকলের আশ্রয়। আমরা তোমার আশ্রিত। সহজ কথায় বলিতে হয়—তুমি আমাদিগকে কোলে করিয়া রাখিয়াছ। তোমায় জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আমরা সর্বতোভাবে তোমারই আশ্রিত —তোমারই অঙ্কস্থিত, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পর্যাপ্ত লাভ হয়। আমরা নিরাশ্রয় অনাথ নহি, আমরা যে তোমাতেই আছি। জন্ম-মৃত্যু, শোক-দুঃখ, অভাব-উৎপীড়ন, যাহাই আসুক না কেন, অবস্থার বিপর্যয় যত রকমই উপস্থিত হউক না কেন, সর্বাশ্রয়া মা তুমি, সর্বাবস্থায় সর্বতোভাবে আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছ। আমরা মুহূর্তের তরেও তোমা ছাড়া নই। ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের বাণী আর কি থাকিতে পারে ? মাগো ! ধন্য আমরা তোমার সন্তান, তোমার বক্ষোলগ্ন নগ্ন শিশু ! মা মা মা !

'অখিলমিদং জগদংশভূতম্'—তুমি যে সর্বাশ্রয়া তাহা কিরূপে বুঝিব ! এই অখিল জগৎ যে তোমারই অংশভূত। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিজে যেমন সর্বতোভাবে জানিতে পারে, অবয়বী যেরূপ অবয়বের আশ্রয়, বৃক্ষ যেরূপ ফলের আশ্রয়, অগ্নি যেরূপ ধূমের আশ্রয়, ঠিক সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ তোমারই অংশভূত বলিয়া তুমি সর্বাশ্রয়া। তোমারই এক অংশ জগৎ আকারে অভিব্যক্ত। শ্রুতিও বলেন —**'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'**। মা ! তোমার একপাদে এই জগৎ, অপর তিন পাদ

স্বপ্রকাশ—সেখানে জগৎ নাই। কল্যাণী শ্রুতি আমাদের মত অল্পবুদ্ধি জীবের সহজবোধ্য করিবার জন্যই অপরিচ্ছিন্ন অনংশ পূর্ণস্বরূপ তোমার অংশ কল্পনা করিয়াছেন। তোমাকে সর্বাশ্রয়া বলিলে — যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় দিতে যতটা পরিমাণ আবশ্যক, তোমার সীমা বুঝি ততটুকু মাত্র ; সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অতি অল্প অংশেই প্রকাশিত রহিয়াছে। অপর অধিকাংশই স্বয়ংপ্রকাশ— নিত্যপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্বরূপ ! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ—**'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।'** এই জগৎ যখন তোমার অংশ, তখন অংশী তুমি যে ইহার একান্ত আশ্রয়, ইহা বলাই বাহুল্য। তাই তুমি সর্বাশ্রয়া।

'অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা'—পরিদৃশ্যমান জগতের চঞ্চলতা ও নিয়ত পরিণাম দেখিয়া, আমাদের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই জগৎ অংশে তুমিও বুঝি চঞ্চলা এবং পরিণামিণী ; তাই দেবতাগণ স্তুতি করিতে গিয়া, তোমাকে অব্যাকৃতা পরমা আদ্যা প্রকৃতি বলিলেন। মাগো ! তুমি এত বহুনামে, বহুরূপে ব্যাকৃত (বিশেষরূপে আকার প্রাপ্ত) হইয়াও অব্যাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ। তুষারখণ্ডরূপে প্রকটিত হইতে গিয়া জলীয় পরমাণুর কোনই ব্যত্যয় হয় না। বস্ত্ররূপে ব্যাকৃত হইয়াও তুলাত্ব অব্যাকৃতই থাকে। বহ্নিরেখারূপে প্রতীয়মান হইলেও অলাতচক্রস্থিত বহ্নিবিন্দুর কোনও বিকার ঘটে না। বোধবস্তুও যতই ব্যাকৃত হউক না কেন, কোন অবস্থায়ই তাহার বোধত্বের বিন্দুমাত্র বিকার সংঘটিত হয় না। তাই তুমি জগৎরূপে ব্যাকৃত হইয়াও স্বরূপতঃ অব্যাকৃতই রহিয়াছ। সুতরাং তুমি নির্বিকার, নিত্যস্থির। কোনরূপ চঞ্চলতা কিংবা পরিণাম তোমাতে নাই। **'জায়ন্তে অস্তি বর্দ্ধতে'** প্রভৃতি ষড় ভাববিকার তোমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তুমি চির অব্যাকৃতা। একমাত্র চিতিশক্তিরূপিণী বলিয়াই এই একান্ত বিরুদ্ধ ঘটনা তোমাতে সম্ভবে। তাই তুমি পরমা আদ্যা প্রকৃতি ! সাংখ্য যাঁহাকে পুরুষ বলেন, বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, উপনিষৎ যাঁহাকে আত্মা বলেন, ভক্তিশাস্ত্র যাঁহাকে ভগবান বলেন, তাহা এই আদ্যা পরমাপ্রকৃতি। আর ত্রিগুণাত্মিক যে প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা অনাদ্যা। মাগো ! বিশুদ্ধ বোধস্বরূপা পরমা প্রকৃতি তুমি যখন জ্ঞাতাজ্ঞেয়জ্ঞানরূপা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা অনাদ্যা প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হও, তখনও স্বরূপতঃ তুমি অব্যাকৃতই থাকিয়া যাও। সুতরাং তোমার প্রভাব যাথার্থই অচিন্তনীয়। যথার্থই তুমি অঘটনঘটন পটীয়সী চিন্ময়ী জননী।

———○———

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৭॥

অনুবাদ। হে দেবি ! সর্ববিধ যজ্ঞে দেবতাগণ যাহার উচ্চারণে তৃপ্তি লাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্র তুমি। আবার পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য তুমিই স্বধামন্ত্ররূপে লোক কর্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাক।[১]

ব্যাখ্যা। মাগো, জগতে যাহারা যথাশাস্ত্র দৈব ও পৈত্র্য কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা এই দুঃখসুলভ সংসার-অরণ্যে বাস করিয়াও সুখে শান্তিতে কালাতিপাত পূর্বক পরমশ্রেয়োলাভ করিতে পারে। তাই গীতায় তুমি বলিয়াছ— 'হে জীব, তোমরা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাবৃন্দের পুষ্টি বিধান করিবে এবং দেবতাগণও অন্নাদিরূপে তোমাদের পুষ্টি বিধান করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া তোমরা পরম শ্রেয় লাভের যোগ্য হইবে। যাহারা দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ অর্পণ না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, তাহারা চোর, তাহারা পাপান্নভোজী ইত্যাদি।' সত্যই মা, আমাদের ইন্দ্রিয় কর্তৃক আহৃত রূপরসাদি বিষয়সম্ভার যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দের উদ্দেশ্যে অর্পিত না হয়, তবে হবির অভাবে অর্থাৎ যথাযথ অনুশীলন অভাবে দেবতাগণ শীর্ণ হইয়া পড়েন—তত্তৎবিশিষ্ট চৈতন্যের বিকাশ-শক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় ; এবং তাহারই ফলে রোগ শোক অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত হইতে থাকে।

[১]প্রথম খণ্ডে 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বাধা ত্বং হি' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

আরও বিশেষ কথা— অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হয় না ! দৈব ও পৈত্র্য কার্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যে তে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণও স্বীকার করিতেছেন ! এই যে মা তোমার মহত্ত্বের এত আলোচনা করিয়াও তোমাকে ধারণা করিতে পারি না, ইহারও হেতু ঐ দেবতাবৃন্দের শক্তিহীনতা। আমরা প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয় আহরণ করি, অন্তঃকরণের সাহায্যে বিষয় ভোগ করি ; যে দেবশক্তির সাহায্যে এই ভোগ নিষ্পন্ন হইতেছে, কই তাঁহার উদ্দেশ্যে একবারও ত' বিষয়রূপ হবিঃ অর্পণ করি না। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি শিথিল, মন-বুদ্ধি-চিত্তাদির সামর্থ্য অতি অল্প। একটু সূক্ষ্মবিষয় চিন্তা কিংবা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। একটুখানি অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধারণা করিতে গেলেই, আমাদের চিত্ত কিংবা বুদ্ধি অক্ষমতা প্রকাশ করে। ইহার একমাত্র হেতু, আমরা উহাদিগকে যথাযথরূপে পরিপুষ্ট করি নাই।

স্বাহা অর্থাৎ দেবকার্য দ্বারা এবং স্বধা অর্থাৎ পিতৃকার্য— শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পরিপুষ্ট ও প্রসন্ন হন এবং তাহারই ফলে দুর্বিজ্ঞেয়া মা তুমিও বিজ্ঞাত—প্রকাশিত হইয়া থাক। এতদ্‌ভিন্ন আরও একটি তত্ত্ব আছে— প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৃপ্তি বিধানের চেষ্টা না করিয়া, যদি কেবল, প্রাণরূপিণী মা তোমার উদ্দেশ্যে যাবতীয় স্বাহা-স্বধা অর্পণ করা যায়, ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়রূপ হবিঃসম্ভার যদি মহাপ্রাণরূপিণী মাতৃ-অনলে আহুতি দেওয়া যায়, তবে দেবতাগণের অপরিসীম পরিতৃপ্তি হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চেতনবর্গ পরিপুষ্ট হয়। বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, সেই রসপ্রবাহ দ্বারা শাখা প্রশাখ পত্র পুষ্প ফল সকলই পরিপুষ্ট হয়। উত্তমাঙ্গে সুস্নিগ্ধ জলধারা বর্ষণ করিলে, সকল অবয়বই স্নিগ্ধ হয়। মাগো ! তোমার তৃপ্তি হইলে যে সকলের তৃপ্তি নিষ্পন্ন হয় ! '**তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ**' তোমার তৃপ্তি হইলেই ত্রিজগৎ—দেবলোক, পিতৃলোক সকলই পরিতৃপ্ত হয়।

মা ! তুমি নিত্যতৃপ্তা, তোমার আবার তৃপ্তিবিধান কি ? আমরা নিয়ত একটা অতৃপ্তি ভোগ করি বলিয়াই তোমাতেও তৃপ্তির অভাব কল্পনা করিয়া, নিত্যতৃপ্তা তোমার তৃপ্তি বিধান করিতে অগ্রসর হই। আর তুমিও ত' মা অতৃপ্তার মত আমাদের দ্বারে আসিয়া প্রতিনিয়ত বলিয়া থাক—'**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ** ॥' যেন তুমি আমাদের দেওয়া ফল ফুল পাতার ভিখারিণী। ঐটি না হইলে যেন তোমার তৃপ্তি হয় না। তাই তুমি বলিয়া থাক—'ওরে মুগ্ধ সন্তান। দে, অর্পণ কর, যাহা পারিস—অন্ততঃ একটুকু জল, তাই দে, আমি উহাই আদরে আহার করিয়া থাকি। জিনিষের দিকে, পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিস না, শুধু ভক্তিপূর্বক দিতে চেষ্টা কর, তাতেই আমার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইবে।' ওগো ভাবিতেও বুকটা কাঁপিয়া উঠে—একদিন তুমি তদ্‌গতপ্রাণা দ্রৌপদীর নিকট এক কণা শাকান্ন ভিক্ষা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলে। এত দয়া তোর প্রাণে মা ! আমার বুকভরা অতৃপ্তি দূর করিবার জন্য তোমাকেও অতৃপ্তা হইতে হয় ! অন্নপূর্ণা নিত্যতৃপ্তা মা আমার ! তুমি আমাদের অতৃপ্তি দূর করিবার জন্য স্বয়ং অতৃপ্ত মূর্তিতে প্রকটিতা হও, জীবের দ্বারে দ্বারে ভক্তি ভিক্ষা কর ! ধন্য জীব।

মানুষকে বৈধকার্যে—দৈব ও পৈত্র্য কার্যে তুমিই নিযুক্ত করাও। উদ্দেশ্য— কিছুদিন এইরূপ স্বাহা স্বধার অনুষ্ঠানে তোমার তৃপ্তিবিধান করিতে প্রয়াস পাইলেই, মানুষ একদিন শুভমুহূর্তে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিবে। তখন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে—তুমি নিত্যতৃপ্তা নিত্যস্থিরা নির্বিকল্পা মা। তখন ধীরে ধীরে কর্ম-সন্ন্যাসের অধিকার আসিবে। জীব নৈষ্কর্ম্য লাভ করিবে। ইহাই ত' মা তোমার দেব ও পিতৃকার্যের স্বরূপ।

———○———

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী ॥ ৮॥

অনুবাদ। যাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত, যাহারা একমাত্র পরম তত্ত্বকেই সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাঁহাদের যাবতীয় দোষ বিদূরিত হইয়াছে, এরূপ মোক্ষার্থী মুনিগণ মুক্তিহেতুভূতা অচিন্তনীয়া মহাব্রত-স্বরূপা যাঁহাকে অভ্যাস অর্থাৎ ধ্যান করিয়া থাকেন ; হে দেবি ! সেই

ভগবতী পরমা বিদ্যারূপিণী তুমি।

ব্যাখ্যা। মা ! পূর্বোক্তরূপ দৈব পৈত্র্য কার্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন আত্মতৃপ্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মাতৃ-তৃপ্তির সন্ধান পায়, তখন জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত হয়—আর বিষয়ের লোভে প্রধাবিত হয় না। সে অবস্থায় একমাত্র আত্মাই যে পরমতত্ত্ব, ইহা বোধ হইতে থাকে ; সুতরাং জীব আত্মলাভের বা মুক্তির আশায় উদ্বুদ্ধ হয়। ইহার নাম মুমুক্ষু অবস্থা। তখন একমাত্র আত্মার দিকেই লক্ষ্য স্থির থাকে বলিয়া বাগ্‌যন্ত্র নিরুদ্ধ হয় —মৌনাবলম্বন করে—মুনি হয়। এরূপ মুনি হইলেই মল বিক্ষেপ ও আবরণাদি দোষরাশি প্রক্ষীণ হইতে থাকে। তখন সেই মননশীল মুনিগণ যাঁহাকে অভ্যাস অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করেন, সেই তুমি গো, সেই তুমি।

এই অভ্যাসের স্বরূপ কি ? **'অভি অস্যসে।'** অসু- নিক্ষেপ। অস্ ধাতুর অর্থ নিক্ষেপ। উপনিষদ্ বলেন — 'প্রণবধনুতে জীবাত্মা বোধরূপ শর যুক্ত করিয়া ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে অপ্রমত্তভাবে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতে হয়।' ইহাই **'অভ্যস্যসে'** কথাটির যথার্থ তাৎপর্য। কোনও কার্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। এস্থলেও ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ আত্মশর নিক্ষেপকেই 'অভ্যাস' বলা হইয়াছে। ইহাকে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান বলিলেও কিছু ক্ষতি হয় না।

মাগো ! জীব যখন এইরূপ অভ্যাসতৎপর হয়, তখনই তুমি অচিন্তনীয় মহাব্রত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ কর। কারণ 'অভ্যাস' রূপ মহাব্রত যথার্থই অচিন্তনীয়। জীব যখন বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত অবাঙ্মনোগোচর পরমাত্মস্বরূপের আভাস পাইতে থাকে, তখনই তদুদ্দেশ্যে জীবাত্মবোধরূপ শর-নিক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং এ ব্রতের স্বরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলেও, উহা বাস্তাবিক অচিন্তনীয়। লিখিয়া, বলিয়া কিংবা ভাবিয়া উহার যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। কারণ যদুদ্দেশে শরনিক্ষেপ, তাহা **'ভাবাতীতং নিরঞ্জনম্'**। কিন্তু, এইরূপ অভ্যাসব্রতই যে মহাব্রত, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত। যেহেতু এই ব্রতের অনুষ্ঠানই চরম অনুষ্ঠান, ইহার পরে আর ব্রত বলিয়া, অনুষ্ঠান বলিয়া কিছু থাকিবে না। ইহাই মুক্তির হেতু।

মা ! এই মুক্তিহেতুভূতা অচিন্ত্য মহাব্রতস্বরূপা তোমার আর একটি নাম আছে—বিদ্যা। **'বিদ্যা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'**। যাহা দ্বারা অক্ষয় পরমাত্মস্বরূপটি অধিগত হয় তাহাই বিদ্যা। যাবতীয় কর্ম, যাবতীয় অনুষ্ঠানই গৌণভাবে পরমাত্মলাভের হেতু হয়, তাই উহাকে অবিদ্যা বা বিদ্যার স্বল্প প্রকাশ বলা হয়। কিন্তু এই অভ্যাসরূপ যে মহাব্রত, উহা সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু বলিয়া, ইহাকে পরমা বিদ্যা বলা যায়। হে দেবি ! হে মা ! তুমিই ত' ভগবতী—ভগবৎশক্তি স্বরূপা পরমা বিদ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, জীবের অজ্ঞানকল্পিত বন্ধনভয়ও চিরদিনের তরে বিদূরিত করিয়া থাক। মা ! বিদ্যাও তুমি, অবিদ্যাও তুমি। বন্ধনও তুমি, মুক্তিও তুমি। আবার বন্ধন মুক্তির অতীতও তুমি।

মাগো ! কতদিনে এ দীন সন্তানগণের হৃদয়ে, এইরূপ ভগবতী বিদ্যা স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া, অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবি ? কতদিনে মা তুই বিদ্যামূর্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া অবিশ্রান্ত জ্ঞানামৃত-ধারা পান করাইবি ? আমরা আর কতদিন তোর অবিদ্যা মূর্তির অঙ্কে অবস্থান করিয়া, তোকে না দেখিয়া বিষয়ের দিকেই চাহিয়া থাকিব ? আমরা তোর অবিদ্যা মূর্তির অঙ্কে রহিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত নহে, তাইত' তোর এই মহাব্রতাস্বরূপা মূর্তির আভাসও পাই না। মা ! কতদিনে আমাদের কাতর আহ্বান তোর কর্ণে পৌঁছিবে মা ?

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥ ৯॥

অনুবাদ। মা তুমি শব্দরূপা। সুতরাং তুমিই সুবিমল ঋক্, যজুঃ এবং উচ্চৈস্বরে গীয়মান রমণীয়পদপাঠ সমন্বিত সামবেদের একমাত্র নিধান। এই সংসারের স্থিতি রক্ষণের জন্য তুমিই দেবী ভগবতী ত্রয়ীমূর্তিতে বিরাজিতা ; আবার বার্তা অর্থাৎ জীবিকা রূপেও তুমিই সমস্ত জগতের আর্তি হরণ করিয়া থাক ! তাই মা তুমিই পরমা—শ্রেষ্ঠা।

ব্যাখ্যা। মা ! দেবতাবৃন্দ তোমার স্তব করিতে গিয়া ইতিপূর্বে তোমাকে মুক্তির হেতুভূতা পরাবিদ্যারূপে দর্শন

করিয়াছেন। এইবার সেই পরাবিদ্যার সাধনভূতা অপরাবিদ্যাও যে একমাত্র তুমি, অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদবিদ্যারূপেও যে তুমিই প্রকটিতা তাহা পরিব্যক্ত করিতে গিয়া, প্রথমেই বললেন— **'শব্দাত্মিকা'**। মা তুমি শব্দস্বরূপা। পরা পশ্যন্তি মধ্যমা ও বৈখরী বাণীরূপে তুমিই প্রতি জীবে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ। প্রণবই আদিম বাণী বা মূল নাদ। বিভিন্ন দেশ কাল ও পাত্র সংযোগে ঐ একই নাদ বহুধা বিভিন্নরূপে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। দেবসমূহ ঐ প্রণবেরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্ত মাত্র। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন— **'তেষামৃক্ যত্রার্থবশনে পাদব্যবস্থিতিঃ। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃ শব্দ ইতি।'** যাহাতে সহজে অর্থবোধ হয়, এরূপ সুবিন্যস্তভাবে যে মন্ত্রগুলির পাদব্যবস্থা আছে, তাহার নাম— ঋক্। যাহা সঙ্গীতরূপে রমণীয় সুরতান সহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যায়, তাহার নাম উদ্‌গীথ সাম। এতদ্ ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট—যাহাতে গান কিংবা, পাদব্যবস্থা নাই, অর্থাৎ যাহা প্রায় গদ্যের মত উচ্চারিত হয়, তাহাকে যজুঃ কহে। ইহাই মা তোমার ত্রয়ীমূর্তি। অথর্ববেদ এবং শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ প্রভৃতি দেবাঙ্গসমূহ ঐ ত্রয়ীরই অন্তর্গত। বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উহার নাম ত্রয়ী। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মরূপ ত্রিবিধ ভাবের প্রকাশক বলিয়া অপরা বিদ্যাকে ত্রয়ী বলা যায়। ভগবানও বলিয়াছেন— **'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ'**। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তে যদিও গুণাতীত স্বরূপের উপদেশ আছে, তথাপি উহাও ত্রয়ীরই অন্তর্গত ; যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, আত্মার মহত্ত্ব বর্ণনা, আত্মার স্বরূপ নির্ণয়, এ সকল যতক্ষণ থাকে ততক্ষণও উহা ত্রিগুণের অন্তর্গত।

সে যাহা হউক, 'ভবভাবনায়' অর্থাৎ লোকস্থিতির জন্যই মা তোমার এই ত্রয়ী মূর্তির বিকাশ। জীবগণ যাহাতে উন্মার্গগামী না হয়, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বন না করিয়া সংযত থাকে, তজ্জন্য সকল দেশেই তুমি শাস্ত্রোপদেশরূপে বেদবিধিরূপে, ত্রয়ীমূর্তিতে বিরাজিত রহিয়াছ। মা ! তোমার মহিমাও অচিন্তনীয়। তোমার এ ত্রয়ীমূর্তিতেও ভগবতী—অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী। যে ঈশ্বরশক্তি শুধু শাস্ত্রাদেশ-রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে তাহাকে দেবী ভগবতী ব্যতীত কি বলিতে পারা যায় ?

আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় —যতক্ষণ কোনও মন্ত্রের (শব্দের) সাহায্যে আত্মানুভূতি-লাভ করিতে হয়, ততক্ষণ উহার নাম ঋক্। শ্রুতিও 'বাক্‌কেই' ঋক্ বলিয়াছেন। ক্রমে ঐ অনুভূতি যখন একটু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সর্বশরীর ব্যাপী একটা আনন্দময় বোধের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তখন ঐ ঋক্‌ই যজুঃ রূপে পরিণত হয়। সে অবস্থায় আর মন্ত্রাদির ছন্দোবদ্ধরূপে উচ্চারণ হয় না, অর্থাৎ ছন্দঃ যতি প্রভৃতি বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। সুর-হীন, তান-হীন কতকগুলি শব্দ মাত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। এই অবস্থার নাম যজুঃ। ক্রমে যখন ভাবরাজ্য আয়ত্তীভূত হইয়া যায়, উচ্ছ্বাসটা কমিয়া যায়, প্রশান্তভাবে অনুভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন ধীরে শান্তভাবে, সুরতান সহকারে শব্দসমূহ উচ্চারিত হইতে থাকে। ইহার নাম সাম। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে, দৈনন্দিন উপাসনার মধ্যেও এই ত্রয়ী মূর্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনাদিতেও অনেক স্থলে ঐ ত্রয়ীর বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেবল কীর্তন কেন, সকল দেশের এবং সকল সম্প্রদায়ের উপাসনার ভিতরই নাদময়ী মহতীশক্তির এই ত্রয়ী মূর্তির অভূতপূর্ব বিকাশ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয়।

ঋক্, যজুঃ, সাম ইহারা বেদ ! বেদন বা অনুভূতিরই নাম বেদ। অন্তরে যে আত্মানুভূতি লাভ হয়, সেই অনুভূতি যখন শব্দের আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে বেদ বলা হয়। উহা সত্য স্বরূপ আত্মসম্বেদন হইতে আসে বলিয়াই, উহার নাম বেদ। উহা কোনও মানুষের মস্তিষ্কধর্ম প্রসূত কতকগুলি শব্দ-বিন্যাস নহে। ইহা সত্যানুভূতি বা অভ্রান্ত বেদন হইতে আবির্ভূত ; এই জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। এই বেদ সকলদেশেই অল্প বিস্তর আছে।

মাগো ! কেবল ত্রয়ী মূর্তিতে— কেবল শাস্ত্রবিধান-রূপে— জ্ঞান বিজ্ঞানরূপেই যে তুমি সংস্কারস্থিতি রক্ষা করিতেছ, তাহা নহে ; বার্তারূপেও জগতের আর্তি —যাবতীয় দুঃখ দূর করিতেছ। বার্তা—জীবিকা। স্থূলদেহ রক্ষার উপযোগী জীবিকারূপে— আহাররূপে সর্বজীবে সর্বদেশে সর্বকালে তুমিই বিরাজিতা মা ! তুমিই যে আমাদের বার্তা, তুমিই যে আমাদের জীবিকা, এই

সত্যজ্ঞান হইতে বিচ্যুত বলিয়াই ত', আজ আমাদের এই জীবনসংকট কাল উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে জীবিকা নির্বাহ হইবে, এই চিন্তায় দেশবাসী আজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। মাগো ! যাহারা জীবিকারূপেও তোমারই অব্যয় মূর্তির বিকাশ দেখিতে পায়, তাহারা যে কখনও জীবিকার অভাবে কষ্ট পায় না, এ কথাটা কবে এ দেশের লোক আবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে ? কবে এ দেশের লোক জীবিকার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরপদলেহন প্রভৃতি হীনকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবিকারূপিণী তোমাকে মা বলিয়া আদর করিবে ও অন্নচিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইবে ? কিন্তু সে অন্য কথা—

মহাভারতে বার্তা শব্দের অর্থ অন্যরূপ দেখিতে পাই—একদিন ছদ্মবেশী ধর্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বার্তা কি ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন **'মাসার্তুদর্বী-পরিবর্তনেন, সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।'** মাস ঋতু অর্থাৎ কালের কল্পিত পরিচ্ছেদ-সমূহরূপ দর্বী (হাতা) পরিবর্তন করিয়া, সূর্যরূপ অগ্নি দ্বারা, দিবারাত্রিরূপ ইন্ধন সহযোগে, এই মহা মোহময় সংসাররূপ কটাহে, ভূতবর্গকে স্বয়ং কাল পাক করিতেছেন। ইহাই বার্তা। মা তুমি, কালরূপে প্রতিনিয়ত এই ভূতসংঘকে পাক করিতেছ। জন্ম, স্থিতি, লয় অর্থাৎ **'জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে'** প্রভৃতি ষড়্ভাব পরিণামের আকারে প্রতি জীবে তুমিই বার্তারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ। জীবিকা উক্ত ষড়্ভাব বিকারেরই অন্তর্ভুক্ত। মাগো ! যাহারা তোমার এই প্রতিনিয়ত প্রকাশমান বার্তামূর্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারা কখনও তোমার এই নিয়ত পরিবর্তনশীল মূর্তিতে মুগ্ধ হয় না। তখন তাহাদের জীবিকার জন্য আর কোন চিন্তাই থাকে না। তুমি তখন স্বয়ং যোগক্ষেম-বহনকারিণী স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া, তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়া থাক। তখন তাহাদের দৃষ্টি প্রধানভাবে তোমার সেই পরম স্নেহময় এক অখণ্ড সত্তার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী যাবতীয় পরিবর্তন, তাহাদের উপর দিয়া প্রায় অজ্ঞাত-সারেই চলিয়া যায়।

মাগো ! ধন্য তোর স্নেহ ! যতদিন আমরা সংসার-স্থিতিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিব, ততদিন তুমি তোমার সেই অব্যয় স্বরূপটি অপ্রকট রাখিয়া আমাদের নিকট বার্তারূপেই আত্মপ্রকাশ করিবে। আমরাও ততদিন জীবিকার জন্য বিষয়ের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় উপস্থিত হইব। আবার যখন এই সংসারস্থিতিকেই যথার্থ কষ্টকর বলিয়া বুঝিতে পারিব, বার্তারূপেও যে তুমি ভিন্ন আর কেহ নয়, ইহা যখন উপলব্ধিযোগ্য হইবে, তখনই আমাদের জীবিকার চিন্তা সম্যক্ দূরীভূত হইবে, আর তখন তুমিও মা, সর্বনাশী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া, আমাদের সর্বভাবকে বিনষ্ট করিয়া, একা অদ্বিতীয়া মূর্তিতে—আর্তিহরাস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। মাগো ! তখনই তোমার 'পরমা' নাম সার্থক হইবে। তুমি যে যথার্থই শ্রেষ্ঠা, তুমি যে যথার্থই পরের অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও 'মা' তখনই তাহা বুঝিতে পারিব। মাগো ! যতদিন না তুমি এইরূপ আর্তিহন্ত্রী মূর্তিতে দাঁড়াইবে, ততদিন আমরা কিছুতেই এই আর্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব না। তাই মা সকাতরে প্রার্থনা করি, একবার দুঃখহন্ত্রী মূর্তিতে সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। এই দুঃখসন্তপ্ত বক্ষ শীতল হউক। ওগো তুমি যে মা ! তুমি যে আর্তিহন্ত্রী পরমা, তুমি যে পরমার্তিহন্ত্রী পরম-দুঃখনাশিনী মা !

———০———

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥ ১০॥

অনুবাদ। হে দেবি ! তুমি অখিল শাস্ত্রার্থ ধারণাবতী মেধা। তুমি দুর্গা, তুমিই দুস্তর ভবসাগরে অসঙ্গা তরণী। কৈটভারির হৃদয়বিহারিণী কমলা, এবং চন্দ্রশেখরের অঙ্কবিহারিণী গৌরীও তুমি।

ব্যাখ্যা। মা ! পূর্বে বলা হইয়াছে—বেদরূপিণী তুমি। এখন দেখিতে পাইতেছি—সেই বেদার্থধারণাবতী ধী বা মেধারূপেও তুমি। তুমিই মেধারূপিণী হইয়া যাবতীয় শাস্ত্রার্থ জ্ঞান ধরিয়া রাখ, তাই আশা আছে—একদিন না একদিন আমরা তোমাকে নিশ্চয়ই পাইব—বুঝিতে পারিব। আমরা যাহা কিছু শিখি, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু গ্রহণ করি, যদি এক একটা মৃত্যুর সঙ্গে সে সকলই

ভুলিয়া যাইতাম, তবে আর কখনও আমাদের এ বন্ধন দূরীভূত হইত না। কিন্তু মা, তুমি মেধারূপে আমাদের সেই বিন্দু বিন্দু জ্ঞান ধরিয়া রাখ ; তাই প্রতি জন্মেই আমাদের জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়। একজীবনে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করি, পরজীবনে আবার ঠিক সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে হয় না। যে শক্তিপ্রভাবে আমাদের এই বহুজন্ম-সঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরিধৃত থাকে, তাহাই—মেধা।

এই মেধার চরম অবস্থা বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ স্মৃতি। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন—**'ব্রহ্মাস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধা'**। একদিন আমাদের বুকে এই মেধারূপে তুমি ফুটিয়া উঠিবে, আমরা 'আমি ব্রহ্ম' এই স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইব। তুমি মেধারূপে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াইত', আমরা তোমাকে বা আমাকে চিনিতে পারি। ইহাই অখিল শাস্ত্রের সার, যাবতীয় শাস্ত্রের সারমর্ম—আত্মস্বরূপাবগতি। আমি কে? তাহা বুঝিতে পারিলেই যাবতীয় শাস্ত্রের প্রয়োজন অবসিত হয়। মা ! উহাই তোমার বিদিতা-স্বরূপ। যখন জীব আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখনই তুমি 'বিদিতা' মূর্তিতে আবির্ভূতা হও। তোমার এই বিদিতা স্বরূপটিকে লক্ষ্য করিয়াই, সমস্ত শাস্ত্রার্থ রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রবাক্যসমূহ পরস্পর-বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয় বটে ; কিন্তু মা, যখন তুমি বিদিতা স্বরূপে জীবহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ কর, তখন আর শাস্ত্রবাক্যসমূহের এই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধভাব থাকে না। সকল শাস্ত্র যে সেই একেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে, ইহা খুব স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—**'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'** যদিও এই শ্লোকটি শাস্ত্রভেদ ও মতভেদের পক্ষে পরিপোষক প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি আমরা উহার যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম 'ন' কারটি প্রথম পাদের সহিত অন্বয় করিলে উহার অর্থ অন্যরূপ হইয়া পড়ে। যথা—বেদসমূহ বিভিন্ন নহে, স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ সকলেই একার্থ লক্ষ্যে অভিব্যক্ত। তিনিই যথার্থ মুনি, যাহার মত ভিন্ন নহে। অর্থাৎ যিনি ভেদদর্শী নহেন, তিনিই মুনিপদবাচ্য। ধর্মের তত্ত্ব গুহায়—হৃদয়ে নিহিত আছে। (উপনিষদ্ অনেক স্থানে গুহা শব্দে হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।) মহাজনগণ—সাধু মহাপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন—যে হৃদয়গুহা পথে গমন করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, **'স পন্থাঃ'** তাহাই যথার্থ পথ। ঐ পথে গমন করিতে পারিলেই, ধর্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

সে যাহা হউক, বলিতেছিলাম—মা ! তোমার ঐ **'বিদিতা'** স্বরূপটিই অখিল শাস্ত্রের সার। তোমাকে জানিবার জন্যই অখিল শাস্ত্রের অবতারণা। কিন্তু মা ! যতদিন তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ং বিদিতারূপে প্রকাশিত না হও, ততদিন কোন শাস্ত্রই তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আবার যখন তুমি স্বয়ং বিদিতা হও, তখন ধান্যার্থী ব্যক্তির পলালের ন্যায়, সাধকের শাস্ত্ররাশিও বিগত-প্রয়োজন হইয়া পড়ে ! মা তুমি ঐ বিদিতা স্বরূপে—বোধ স্বরূপে প্রতি জীবেই সর্বদা প্রকাশমান রহিয়াছ, অথচ কেহই তোমাকে জানিতে—বুঝিতে পারে না ; তাই তুমি দুর্গা—দুর্জ্ঞেয়া—দুরধিগম্যা।

আবার অন্য দিক দিয়া দেখিতে পাই — তুমি মেধারূপে আমাদের অনেক জন্ম সঞ্চিত জ্ঞানরাশি ধরিয়া রাখ বলিয়াই এই দুর্গম ভবসাগরে তুমিই একমাত্র তরণী। জীবগণ মেধারূপ নৌকায় আরোহণ করিয়াই 'ব্রহ্মাহমস্মি' বলিয়া অনায়াসে এই দুর্গম ভবজলধি উত্তীর্ণ হইয়া যায়। পার্থিব তরণীতে কর্ণধার প্রয়োজন। কর্ণধার না থাকিলে, এ জগতে তরী চলে না ; কিন্তু মা তুমি আমাদের অসঙ্গা তরণী। দ্বিতীয় কাহারও সহায়তা আবশ্যক হয় না। তরণীও তুমি, আবার পরিচালকও তুমি। মেধারূপিণী মা আমার, যথার্থই তুমি অসঙ্গা—সঙ্গ-রহিতা—নির্লিপ্তা। যদিও আমাদের বিন্দু বিন্দু জ্ঞানরাশি মেধারূপে ধরিয়া রাখিয়াছ, যদিও পরিচ্ছিন্ন মলিন জ্ঞানরাশিকে অনাদিকাল হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, যদিও সৎ অসৎ যাবতীয় সংস্কারই মেধারূপিণী তোমার অঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে, তথাপি তাহার সংস্পর্শে আসিয়া, তুমি পরিচ্ছিন্না বা মলিনা হও নাই। তুমি যেমন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপা অসঙ্গা মা আমার, ঠিক

তেমনই রহিয়াছ। এত বহুভাব বক্ষে ধারণ করিয়াও তোমাকে বহুত্বের সংলেপ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই, তাই দেবতাগণ তোমায় **'দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা'** বলিয়া স্তুতি করিতেছে।

মা ! তুমি কৈটভারি—বহুত্ববিনাশকারী বিষ্ণুর হৃদয়-বিহারিণী শ্রী। আবার শশিমৌলি চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী গৌরী। বিষ্ণুত্ব এবং শিবত্ব তোমারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ! তাই দেখিতে পাই—এক দিকে তুমি বিষ্ণু ও শিবের প্রসূতি হইয়াও অন্যদিকে বৈষ্ণবী ও শিবানীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। এই যে জগদ্‌ভাব, এই যে বহুত্ব, এই যে আমাদের জীবত্ব, ইহা যে শক্তিতে—যে মেধায় পরিধৃত থাকে, তাহাই বৈষ্ণবীশক্তি বা শ্রী। আবার এই শক্তি, এই মেধাই যখন অসঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ করে—আর কোনও ভাবের ধারণকর্ত্রীরূপে প্রকটিত হয় না, তখনই সর্বভাবের সংহারক শক্তিরূপে পরিচিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তোমার মেধা ও বিদিতা স্বরূপই মা আমাদের নিকট শ্রী ও গৌরী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকে।

———০———

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্‌ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥ ১১॥

অনুবাদ। মাগো ! তোমার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, নির্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় মুখখানি দেখিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধের বশীভূত হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছিল, ইহা বাস্তবিকই অতি অদ্ভুত।

ব্যাখ্যা। যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলের কান্তিতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ হয়, তাঁহার সেই লোকাতীত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যে রজগুণের বহির্মুখী চাঞ্চল্য থাকে—আবার অতিশয় অকিঞ্চিৎকর রূপরসাদি পরিগ্রহের বাসনা থাকে, ইহাই আশ্চর্য। ওগো, **'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'** যাঁহাকে লাভ করিলে আর কিছুরই লাভের ইচ্ছা জাগে না, তাঁহাকে দেখিয়া—প্রত্যক্ষ করিয়া, আবার চিত্ত যে বিষয়লোলুপ হয়, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। যথার্থই ইহা অতিশয় অদ্ভুত নহে কি ?

মাগো ? জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য একিভূত হইলেও, তোমার সেই লোকাতীত সৌন্দর্যসিন্ধুর বিন্দু পরিমাণও হয় না। তথাপি আমরা তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, জগতের দুঃখমিশ্রিত বিষয়ের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হই। তোমার সে অলৌকিক সুষমার কথা ভুলিয়া যাই। ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্যভোগের লালসা দিয়া, তোমার সুষমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখি। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় কি আছে মা ?

সাধক ! আত্মস্বরূপ এক একবার যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধিযোগ্য হইলেও, রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা সম্যক্ তিরোহিত হয় না। তাই বারংবার সেই অনুপম সুষমাময় পরমাত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া বিষয়বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ইহাই মায়ের অনুপম সৌন্দর্য দেখিয়াও মাতৃ-অঙ্গে মহিষাসুরের অস্ত্রপ্রহার। যেরূপ চঞ্চল জলরাশির অভ্যন্তরস্থ চন্দ্রবিম্ব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, যেরূপ বায়ু প্রবাহ পরিচালিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার অন্তরালস্থিত সূর্যবিম্ব সুস্পষ্ট নেত্রগোচর হয় না, ঠিক সেইরূপ—রজোগুণের বিক্ষোভজনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য মায়ের সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য সম্ভোগের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া থাকে। এই অন্তরায়ের নামই মহিষাসুরের প্রহার।

মাগো ! যে বৈষয়িক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তোমার এই লোকাতীত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করি, সেই বিষয়সুষমারূপেও যে তুমিই নিত্য সুপ্রতিভাত রহিয়াছ, এ কথাটা কতদিনে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিব ? মা ! এ জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত, তোমারই রূপ প্রত্যেক পদার্থের প্রতি অবয়বে উদ্ভাসিত, এই সত্যজ্ঞানে এই সরল উপলব্ধিতে যতদিন আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ না হইবে, ততদিন আমরা কি যথার্থই তোমার সেই অতুলনীয় সৌন্দর্যের সন্ধান পাইব ?

———০———

দৃষ্ট্বা তু দেবি ! কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥ ১২॥

অনুবাদ। হে দেবি ! ক্রোধবশতঃ ভ্রুকুটীভীষণ,

অথচ উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় তোমার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া, মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অতীব বিচিত্র। কুপিত অন্তককে দেখিয়া কে জীবিত থাকে ?

ব্যাখ্যা। মা ! তোমার ভ্রুকুটীকরাল কুপিত মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই, ইহাই আশ্চর্য। তোমার যখন কোপপ্রকাশ হয়— যখন তুমি প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে দাঁড়াও, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যান ; আর মহিষাসুর ত' অতি তুচ্ছ। মাগো ! দেবতাগণ তোমার ভ্রুকুটি-করাল কুপিত মুখের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন —**'উদ্যৎশশাঙ্ক-সদৃশচ্ছবি'**। যখন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়, তখন রজনীর অন্ধকাররাশি যেরূপ অদৃশ্য হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপই মা তোমার প্রলয়করাল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিলে, অজ্ঞান-অন্ধকার ও দ্বৈতভাবসমূহ সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই অবাধিত নিয়ম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হইতেছে—মহিষাসুর তোমার করাল মুখচ্ছবি দেখিয়াও জীবিত রহিল, তোমার সহিত যুদ্ধ করিল ; সিংহ, গজ, অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত পুরুষ প্রভৃতি নানা মূর্তিতে তোমায় আক্রমণ করিতে লাগিল, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। কেন এরূপ হইল ?

মা তুমি যে অম্বিকামূর্তিতে কোপ প্রকাশ করিয়াছিলে —**'কোপং চক্রে ততোঽম্বিকা**।' অম্বিকামূর্তি—মাতৃমূর্তি। মায়ের ভ্রুকুটি-করালমুখ সন্তানকে ভীত সন্ত্রস্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। মা ! তুমি নিজেই ত' মধুপান করিবার জন্য মহিষাসুরকে গর্জনের অবসর দিয়াছিলে। তাই সে তৎক্ষণাৎ মরে নাই, যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে। মাগো ! আমরা যাহাকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে করি, অঘটনঘটনপটীয়সী তোমার ইচ্ছায় তাহা অতি সহজ ভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা আমরা একটু অনুধাবন করিলেই দৈনন্দিন জীবনেই লক্ষ্য করিতে পারি। তথাপি তোমার সর্বশক্তিমত্তার সর্বময় অক্ষুণ্ণ কর্তৃত্বে বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারি না, অহং-কর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমানকে তোমার চরণতলে অর্পণ করিয়া যাবতীয় চিন্তার ভার হইতে পরিত্রাণ পাই না, ইহাই ত' আমাদের দুর্ভাগ্য।

মা ! মহিষাসুর নিধন ব্যাপারে তোমার এই স্বাভাবিক নিয়মের অন্যথা দর্শন করিয়া দেবতাগণ বলিলেন—**'কৈ র্জীব্যতে হি কুপিতান্তক-দর্শনেন'** প্রকুপিত অন্তককে দর্শন করিলে, কে জীবিত থাকিতে পারে ? সত্যই মা ! কুপিত অন্তককে দেখিলে কেহই বাঁচে না, কিন্তু কুপিতা মাকে দেখিলে সন্তান কেন বাঁচিবে না ? যতক্ষণ তুমি স্বয়ং অন্তকারিণীরূপে সম্যক্ আত্মপ্রকাশ না কর, ততক্ষণ তোমার ভ্রূকুটি করালকুপিত মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়াও মাতৃত্বের গৌরবময় স্নেহপূর্ণ করুণ বীক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, উদ্যৎ-শশাঙ্ক-সদৃশ মুখ-কান্তির বিকাশ হয় ; তাই ত' মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া, যুদ্ধ করিয়া তোমায় মধু পানের সুযোগ দিয়াছিল। ধন্য মা তোমার অনির্বচনীয় লীলা ! যখন—তুমি আমাদের মুখের মা ডাকটি শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাক, যখন দেখি—আমাদের মুখে মা ডাক শুনিয়া তোর বুকটা সত্য সত্যই মাতৃত্বের গৌরবে ফুলিয়া উঠে, তখন আমাদের এই দুঃখদীর্ণ বুকটাও পুত্রত্বের অপূর্ব গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মা ! তুমি আমাদিগকে এ গৌরব অনুভবের সুযোগ প্রদান কর।

———০———

দেবি ! প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥ ১৩॥

অনুবাদ। দেবি ! প্রসন্ন হও। তুমি শ্রেষ্ঠা—পূজনীয়া। তুমি প্রসন্না হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়। তুমি কুপিতা হইলে সমস্ত কুল সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম ; যেহেতু মহিষাসুরের এই বিপুল বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি পরমা শ্রেষ্ঠা। তুমি পরের অর্থাৎ পরমেশ্বরেরও মা। যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর নামে অভিহিত হন, তাঁহারাও তোমা হইতেই জাত, তোমাতেই স্থিত, তাই তুমি পরমা। তুমি প্রসন্না হও, তবেই আমরা ভব অর্থাৎ মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। অথবা অন্য দিক দিয়া দেখিতে পাই—তোমার প্রসন্নতা এবং ক্রোধ, উভয়ই জীবের পক্ষে পরম হিতকর। তুমি প্রসন্না হইলে জীব ঐহিক পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর

কুপিতা হইলে জীবের সমস্ত কুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাও জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল। কুল বিনষ্ট না হইলে যে অকুলের সন্ধান পাওয়া যায় না। মাগো ! কত জন্ম জন্মান্তর হইতে কুলে কুলে বিচরণ করিয়া— রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিয়াই, এ জীব-জীবন অতিবাহিত হইতেছে। আমরা কিছুতেই কুল পরিত্যাগ করিতে পারি না। এক কুল ছাড়ি, আবার অন্য কুল ধরি ! একদিন দুইদিন নয়, কোন অনাদিকাল হইতে এইরূপ কুলেকুলে বিচরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিবে ? মা তুমি কুপিতা হইলে আমাদের সেই কুলসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। তখন আমরা অকূল সমুদ্রে অবগাহন করিয়া, আপনাকে অকূলে হারাইয়া ফেলি। এই দুঃখমিশ্রিত পরিচ্ছিন্ন সুখের হাত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করি। আমাদের কুলে কুলে বিচরণ চিরদিনের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম — মা ! তোমার প্রসন্নতা এবং ক্রোধ, উভয়ই আমাদের মঙ্গলদায়ক।

মাগো ! যাহারা কেবল তোমার প্রসন্নতাই প্রার্থনা করে, যাহারা কেবল তোমার হাস্যময়ী মুখশ্রী দেখিতে চায়, বুঝিতে হইবে—এখনও তাহারা তোমাকে মা বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যাহারা বুঝিয়াছে— তুমি মা, আমরা সন্তান, তাহারা তোমার ভ্রূকুটি-করাল কুপিত মুখশ্রী দেখিয়াও বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। যাহারা সন্তান, তাহারা মায়ের কোপে এবং প্রসন্নতায়, তুল্যভাবে মাতৃ-স্নেহই দেখিতে পায়। মাতৃ-স্নেহে যাহারা মুগ্ধ হইতে পারিয়াছে, তাহারা মায়ের ক্রোধময়ী মূর্তিতে— সংসারের শত বিঘ্ন বিপত্তিতে, সহস্র অমঙ্গলেও বিন্দুমাত্র অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পায় না। তাই তাহারা নির্ভীক পুরুষের ন্যায় —একান্ত নগ্ন শিশুর ন্যায় তোমার প্রলয়ঙ্করী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে মা বলিয়া তোমারই অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

যদি বুঝিতাম — তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনও আশ্রয় আছে তাহা হইলে বরং তোমার ক্রোধময়মূর্তি দেখিয়া, ভীতচিত্তে তোমাকে ছাড়িয়া অন্য আশ্রয়ের দিকে ছুটিতাম। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিয়াছি— আশ্রয় একমাত্র তুমিই ; জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-প্রসন্নতা— যাহাই আসুক না কেন, সর্বাবস্থায় যখন একমাত্র তুমিই আমাদের আশ্রয় ; তখন আর তোমার ক্রোধময়ী মূর্তি দেখিয়া কেন ভীত পশ্চাৎপদ হইব ? জানি —তুমি কুপিতা হইলে, আমাদিগকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়—রোগ, শোক, অপমান, অত্যাচার, অভাব , উৎপীড়ন চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতে থাকে ; তথাপি উহারই মধ্যে যখন তোমার স্নেহকরুণা মাখা মুখখানা মনে পড়িয়া যায় তখন ওগো চণ্ডি ! মুহূর্ত মধ্যে আমাদের সকল দুর্ভাগ্য অপসারিত হয়। তখন আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া ধন্যই হই।

মা। তুমি এইরূপ কুপিতা মূর্তিতে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরের বিপুলবাহিনী বিনাশ করিয়া দাও— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অকিঞ্চিৎকর রূপরসাদি বিষয়রূপ কুলকে উন্মূলিত করিয়া দাও। আমরা বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া ওগো অকুলের তরণী মা আমার, এস তোমার স্নেহময় অঙ্কে সর্বতোভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ি। একদিন তুমি যমুনাতটে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া মোহন মুরলীধ্বনিতে গোপিকাগণকে কুল ছাড়াইয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণ নাম সার্থক করিয়াছিলে। আবার—একবার সেইরূপ এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া—তোমার সেই মধুময় সত্যের মহা আকর্ষণধ্বনিতে আমাদিগের ভুল ভাঙিয়া দাও, কুল ছাড়াইয়া দাও, আমরাও অকুলে ভাসি ! ওগো বহুদিন—বহুদিন কুলে কুলে থাকিয়া কত তরঙ্গের আঘাত সহিয়াছি, কত আঘাতে বুকের পাঁজর ভাঙিয়া গিয়াছে, কত আঘাতে মর্মস্থল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর যে পারি না মা ! এখন একবার এই গতিশক্তিহীন সন্তানকে তোমার অকুল স্নেহময় বক্ষে স্থান দাও।

———০———

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৪॥

অনুবাদ। মা ! তুমি প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে সর্বদা অভ্যুদয় দান কর, তাহারা জনপদমধ্যে সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন, যশ এবং ধর্মবর্গ অবসন্ন হয় না, তাহাদের পুত্র, ভৃত্য ও পত্নী বিনীত ও সুস্থ হয় ; সুতরাং জগতে তাহারাই ধন্য।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি প্রসন্ন মূর্তিতে যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া থাক, অর্থাৎ যাহারা তোমাকে নিত্যতৃপ্তা নিত্যপ্রসন্নময়ী জননী বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহারা জগতে দেবোচিত সম্মান লাভ করে। যদিও তাহারা জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি ভোগ ঐশ্বর্য সম্মান ও যশকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিয়া লয়, তথাপি মা তাহাদের নিকট ঐরূপ অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তিতেই তুমি আবির্ভূত হইয়া থাক। যাহারা সর্বভাবে তোমায় দেখিতে অভ্যস্ত নহে, পার্থিব অভ্যুদয়রূপে তুমিই যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক, ইহা যাহারা বিশ্বাস করে না—মানে না, তাহারা বিপদে পড়িয়া তোমার ক্রোধময়ী মূর্তিরই আভাস পায়। তোমার সৌম্যা প্রসন্না মূর্তি যে কি, তাহা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং পার্থিব অভ্যুদয় লাভ করিয়াও এ সকল লোক কখনও যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

আর যাহারা সুখ-দুঃখ, অভ্যুদয়-অধঃপতন, সর্বাবস্থায়ই আপনাদিগকে মাতৃ-অঙ্কস্থিত পুত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাদের **'ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ'** —ধর্মবর্গ অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুবর্গ কখনও অবসন্ন হয় না। তাহারা এই জগতে থাকিয়াই যথাক্রমে পূর্বোক্ত চতুবর্গ ফল লাভ করিয়া থাকে। মাগো ! যাহারা তোমার ধর্মময়ী মূর্তির সেবা না করিয়া, কেবল অর্থ-কামের সেবা করে, তাহারাই দুঃখতাপে পুনঃ পুনঃ জর্জরীভূত হইয়া থাকে। মা ! দেখ—তোমার বড় সাধের মানব সন্তানগণের অধিকাংশই অধুনা ধর্মহীন হইয়া, কেবলমাত্র অর্থ-কামের সেবা করিতে করিতে, কি শোচনীয় দুর্দশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। চতুর্দিক হইতে অভাবের দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! দুর্ভিক্ষ মহামারী অকালমৃত্যু রোগ শোক প্রভৃতি দ্বারা এত উৎপীড়িত হইতেছে যে, শান্তি বা আনন্দ বলিয়া যে একটা জিনিষ এ জগতে আছে, এ কথাটাই যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরীভূত হইয়া —আনন্দময় জগৎকে দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

মাগো ! তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও—তুমি তাহাদের মর্মে বুঝাইয়া দাও—ধর্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না। এ জগৎ যে আনন্দঘন, ইহা বুঝিতে হইলে—সেই আনন্দ ভোগ করিতে হইলে, সর্বাগ্রে ধর্মের সেবা করিতে হয়। জীব যে পরিমাণে ধর্মপরায়ণ হয়, সেই পরিমাণে চিত্তপ্রসাদ লাভ করে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই অভাববোধ তিরোহিত হয়। অভাববোধ না থাকিলে, অর্থেরও অভাব হয় না ; সুতরাং ধর্মানুমোদিত কামনা পূরণের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কামনা পূর্ণ হইলেই জীব নিষ্কাম হয় ! তখন তুমি মোক্ষরূপিণী মা স্বয়ং আসিয়া কল্পিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, জীব-সন্তানকে অমৃতের আস্বাদ ভোগ করাও।

এরূপ সহজ সরল উদার পন্থা বিদ্যমান সত্ত্বেও, অধিকাংশ জীব পথভ্রান্ত হইয়া কেন যে উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বনপূর্বক অশেষ নির্যাতন ভোগ করে, তাহা ওগো ভ্রান্তিরূপিণী মা, তুমিই জান ! মা একবার ভ্রান্তিহরা মূর্তিতে দাঁড়াও, আমাদের অনাদিকালের এ ভ্রান্তি বিদূরিত হউক। ভ্রান্তিরূপেও যে, তোমারই প্রকাশ, ইহা বুঝিয়া আমরা ভ্রান্তির পরপারে চলিয়া যাই।

মা ! তুমি অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তিতে যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখ, তাহাদের ভৃত্য পুত্র পত্নী পরিজনবর্গ, সকলেই অনুগত শিষ্ট সুস্থ সাধুচরিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্মলাভের আশায় কিংবা মুক্তিলাভের আশায়, তাহাদিগকে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গিরিকন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাহারা ইহলোক ও পরলোক, উভয়ই জয় করিতে সমর্থ হয়। গীতায়ও উক্ত হইয়াছ—**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'**। যাঁহাদের চিত্ত সমত্বে অবস্থিত অর্থাৎ সর্বত্রাবস্থিত সম, স্বরূপ মাতৃ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা এই জগতে থাকিয়াই, স্বর্গলোককে জয় করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই ধন্য। তাই দেবতাগণও মা তোমার স্তব করিতে করিতে **'ধন্যাস্তএব'** বলিয়া, তোমার প্রিয়তম সন্তান-বৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

আধ্যাত্মিক পক্ষে আত্মজ ভৃত্য এবং দারা শব্দের, যথাক্রমে বিবেক, বিজিত ইন্দ্রিয় এবং আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিরূপ অর্থ করিলেই এ মন্ত্রের রহস্য সহজবোধ্য হইবে।

———○———

ধর্ম্যাণি দেবী সকলানি সদৈব কর্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবী তেন॥ ১৫॥

অনুবাদ। দেবী ! তোমারই প্রসাদে সুকৃতিশালী জনগণ প্রতিদিন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত, যাবতীয় কর্মকে ধর্মময় করিয়া সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবং তাহারই ফলে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। অতএব হে দেবি ! এইরূপে তুমি তিন লোকেই ফলদায়িনী।

ব্যাখ্যা। পূর্বমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'**ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ**।' একমাত্র ধর্মের সেবা করিলেই যথাক্রমে অর্থ কাম ও মোক্ষ ফলের অধিকারী হওয়া যায়। কিরূপে সেই ধর্মের সেবা করিতে হয়, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। '**প্রতিদিনং সকলানি কর্মাণি অত্যাদৃতঃ ধর্ম্যাণি করোতি এবঞ্চ সুকৃতি ভবতী**।' প্রতিদিন সকল কর্মই অতিশয় আদরের সহিত ধর্মময়রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং এইরূপ করিতে পারিলেই মানুষ সুকৃতিশীল হয়, তাহারই ফলে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়। বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা — কর্ম তিন প্রকার। কতকগুলি ধর্ম কর্ম, যথা—সন্ধ্যাবন্দনাব্রত, নিয়ম, উপবাস ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম। কতকগুলি অধর্ম কর্ম, যথা—হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাভাষণ, পরস্বহরণ ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম। আর কতকগুলি সাধারণ কর্ম, যথা আহার নিদ্রা ভ্রমণ অর্থোপার্জন ইত্যাদি। উহাতে ধর্মও নাই অধর্মও নাই। কর্মের এরূপ শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও আমরা কিন্তু দেখিতে পাই—কর্ম একপ্রকার মাত্র। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই কর্ম হয়। গীতায় কর্ম অকর্ম ও বিকর্মভেদে কর্মের যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাও একমাত্র বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগরূপ কর্মেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই মন্ত্রে যে ঐ মূলীভূত কর্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা মন্ত্রস্থ 'সকলানি' শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সকল কর্মেরই ধর্মরূপে শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; অশ্রদ্ধায় করিলে হইবে না। 'অত্যাদৃতঃ' অতিশয় আদরের সহিত করিতে হইবে। কি হইলে সকল কর্মই ধর্ম হইতে পারে ? মাতৃ-কর্তৃত্বের দর্শনে। মাতৃ-যুক্ত হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান নামই ধর্ম কর্ম। ইহা গীতায় সেই '**তৎ কুরুষ মদর্পণম্**' মন্ত্রের সাধনময় অবস্থা। অহংবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তারপর ঈশ্বরার্পণ করা কনিষ্ঠাধিকারের কার্য। অনুষ্ঠানকালেই কর্মগুলিকে যথাসম্ভব মাতৃযুক্তভাবে করিতে হইবে। তাই মন্ত্রে 'করোতি'—এই বর্তমানকালবোধক ক্রিয়া পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে ! প্রারম্ভ-পরিসমাপ্তির নাম বর্তমান। যে কোন কার্যের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনই যথার্থ ধর্ম কর্ম।

বিশ্বময় একটা বিরাট কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই কর্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তি আমাদের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের ভিতর দিয়া সর্বদা প্রকাশ পাইতেছে। কিছুদিন এইরূপ জ্ঞানের অনুশীলন করিলেই উহা প্রকৃতিগত হইয়া যায়। তখন আর চেষ্টা করিয়া প্রতিকার্যের ভিতর দিয়া মাতৃ-কর্তৃত্ব দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। এইরূপ সর্বত্র মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনে সিদ্ধ সাধকেরই যাবতীয় কর্ম ধর্মময় হয়। পক্ষান্তরে মাতৃ-যোগশূন্য — মাতৃ কর্তৃত্ব দর্শনশূন্য, ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি কর্মগুলি বাহিরে ধর্ম কর্মের আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও উহা বাস্তবিক ধর্ম কর্ম নহে। আর আহার বিহারাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্মগুলিও যদি মাতৃ-যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে উহাও ধর্ম কর্মরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা প্রতিদিন সকল কর্ম এইরূপ ধর্মময়রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সুকৃতি, তাহাদের কৃতি মাত্রেই সু, অর্থাৎ শুভ ফলদায়ক হয়।

পক্ষান্তরে স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায় যাহারা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পরলোকে স্বর্গ অর্থাৎ সুখময় ক্ষেত্রে প্রয়াণ করে। আর যাহারা নিষ্কামভাবে — মাত্র মাতৃ-প্রীতি উদ্দেশ্যে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মুক্তিলাভ করে। এ সকলই '**ভবতীপ্রসাদাৎ**' মা ! তোমার প্রসাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তুমিই জীবকে ইহলোকে 'সুকৃতি' কর, তুমিই জীবকে পরলোকে স্বর্গভোগের অধিকারী কর, আবার তুমিই ইহ-পরলোকের অতীত মোক্ষফল প্রদান করিয়া, জীবকে ধন্য করিয়া দাও। সুতরাং হে দেবি ! তুমি '**লোকত্রয়েঽপি ফলদা**' ! তিনলোকে ত্রিবিধভাবে কর্মফল তুমিই বিধান করিয়া থাক !

'ফলদা' শব্দটির আর একটি গূঢ় অর্থ আছে। খণ্ডনার্থক 'দো' ধাতুর প্রয়োগেও ফলদা শব্দটি নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে উহার অর্থ হয় 'ফলনাশিনী'। অর্থাৎ যাবতীয় কর্মফল যিনি খণ্ডন করিতে সমর্থা, তিনিই ফলদা।

মা। একদিকে যেমন সুখ দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরকরূপ ফল দান কর বলিয়া তুমি 'ফলদা' অন্যদিকে তেমনই আবার জীবের যাবতীয় কর্মফলগুলি জ্ঞানাগ্নি প্রভাবে সমূলে ভস্মীভূত করিয়া দাও বলিয়াও তুমিই ফলদা। মাগো এইরূপে তুমি ফলদায়িনী হইয়াও ফলনাশিনী। এই ফলনাশিনী মূর্তিতে তোমার প্রকাশ হয় বলিয়াইত', আমাদের আশা আছে— একদিন তোমার অমৃতময় বক্ষে স্থান পাইব। সমস্ত কর্মফলের পরপারে চলিয়া যাইব।

যতদিন জীব অহংবুদ্ধিতে সাধারণভাবে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, ততদিনই তুমি ফলদায়িনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া জীবের সুখ দুঃখাদি ফলদান করিয়া থাক। আর যখন জীব অহংবোধকে তোমার রাতুল চরণে অর্পণ করিয়া, বিশ্বময় বিরাট কর্তৃত্বময়ী মহাশক্তিরূপিণী, তোমার কর্মযন্ত্ররূপে কর্মানুষ্ঠান করিয়া যায়, তখন তুমি 'ফলনাশিনী' মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, যাবতীয় কর্মফল অবখণ্ডিত করিয়া, জীবকে মোক্ষফলের অধিকারী কর।

———o———

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ১৬॥

অনুবাদ। মা ! দুর্গমে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকল প্রাণীরই ভয় হরণ করিয়া থাক। আর সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে তুমি অতীব শুভা মতি প্রদান করিয়া থাক। হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! সর্বজীবের এরূপ উপকারকারিণী সর্বদা দয়ার্দ্র চিত্তা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কে আছে ?

ব্যাখ্যা। মা। তোর প্রিয় সন্তান জীব যখন দুর্গমে নিপতিত হয়, দুঃখ সঙ্কটে পড়িয়া যখন তাহা হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় দেখিতে পায় না, সর্ববিধ পুরুষকার প্রয়োগ যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, বিপদের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা যখন চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া জীবের দৃষ্টিশক্তি নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে, ভয়ে সন্ত্রাসে জীব যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন— সেই অবস্থায়— সেই বড় দুঃখের দিনে, জীব একবার কোনও অজ্ঞেয় মহতী শক্তির দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে যে বড় দুঃসময়, তখন আর এমন কেহ নাই যে, একবিন্দু সাহায্য করিতে প্রস্তুত বা সমর্থ। সেই দুর্গমে জীব তোমার শরণ লইতে বাধ্য হয়—তোমাকে স্মরণ করে। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে —'**দুর্গে স্মৃতা**।'

জগতের চক্ষুতে তাহা দুঃখময় হউক, জীবের পক্ষে কিন্তু উহাই যথার্থ সুখময় ! বহু পুণ্যফলে জীব তোমায় স্মরণ করিবার শুভ অবসর প্রাপ্ত হয়। তোমাকে স্মরণ করিলে—যথার্থ স্মরণ করিতে পারিলে, অচিরেই বিপদ্ দূরীভূত হয়। ওগো, পুত্র যখন মা বলিয়া সকাতরে ডাকে, তখন তুমি কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পার ? পুত্রের কাতর আহ্বান যখন তোমার নিকট পৌঁছায় তখন তুমি যে মা উন্মাদিনীর মত সত্যলোক হইতে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হও ! ও মা ! তোমার সে মূর্তি স্মরণ করিয়াও বিহ্বল হইতে হয়। সেই আলুলায়িতকুন্তলা, সেই স্খলিতবসনা, সেই উচ্ছৃঙ্খলগমনা, সেই পাগলিনী মা আমার, সেই বক্ষ ধরিয়া তেমনি করিয়া স্নেহাদর—মা মা মা !

যাহা হউক, জীব বিপদে পড়িয়াই তোমায় ডাকিতে অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসের ফলে স্বস্থ অবস্থায়ও তোমায় ডাকিতে পারে। ক্রমে তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হয়। 'সর্বাবস্থায়ই আমার মঙ্গলবিধায়িনী স্নেহময়ী মা সতত আমার দিকে স্থিরলক্ষ্যে তাকাইয়া আছেন' এইরূপ বিশ্বাসে হৃদয় যখন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর মাতৃ অস্তিত্বে বিন্দুমাত্র সংশয় প্রাণে জাগে না, তখনই জীব স্বস্থ হয়। তখন আর বিপদ বলিয়া কিছু থাকে না, দুঃখ সঙ্কট বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা মনেই করিতে পারে না। যতদিন জীব মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান না হইতে পারে, ততদিন কিছুতেই স্বস্থ হইতে পারে না। স্বস্থ না হইলে অস্বস্থি ভোগ করিতেই হইবে। আরে স্ব-এর সন্ধান না পাইলে কি স্বস্থ হওয়া যায় ! স্ব যে মা !

মাগো ! জীব বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতে শিক্ষা করে, ক্রমে ডাকায় অভ্যস্ত হয়। বিপদ দূর হইয়া যায়, তোমার সত্তায় বিশ্বাসবান হয়— স্বস্থ হয়। সে অবস্থায়ও কিন্তু ডাকাটি থাকিয়া যায়। বিপদ নাই, অন্য কোনও কামনা বাসনা নাই, তবু ডাকে। তবু প্রাণের তাড়নায় তোমাকে স্মরণ করে। তখন তুমি কি কর ?

'**স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতীমতীব শুভাং দদাসি**।' স্বস্থ

অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি অতীব শুভা মতি প্রদান কর। বুদ্ধিসত্ত্বের নির্মলতাই শুভা মতি। আমরা সচরাচর যে বুদ্ধি লইয়া জগতে বিচরণ করি, ব্যবহারিক জীবন যাপন করি, উহা রজস্তমোগুণ কর্তৃক মলিনীকৃত বুদ্ধি, সুতরাং অবিশুদ্ধা বা অশুভা মতি। কিন্তু মা, কামনাহীন সন্তান যখন তোমায় বারংবার ডাকিতে থাকে, বারংবার স্মরণ করিতে থাকে, তখন তোমারই কৃপায় তাহার বুদ্ধির সেই মলিনতা বিদূরিত হয়—বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল হয়। এইরূপে অতীব শুভা মতি লাভ হইলে তাহাতে চিদানন্দময়ী মা, তোমার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। জীব তখন তোমার স্বরূপের আভাস পাইয়া ধন্য হয়। জন্ম-মরণ মোহ চিরদিনের তরে বিদূরিত হয়। এই সর্বাবস্থায় সন্তানের প্রতি সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা তুমি ব্যতীত আর কে আছে মা ? তুমিইত' আমাদের দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী মা। এমনই করিয়া প্রতিজীবে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া, অসীম দয়ার পরিচয় দিয়া থাক ! জীবের দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য দূরীভূত করিয়া দাও।

'দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী' কথাটা আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অভাববোধের নাম দারিদ্র্য। অভাববোধ থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ হইতেই ভয় আপতিত হয়। সুতরাং দারিদ্র্য, দুঃখ এবং ভয় এই তিনটি যেন পরস্পর সহচররূপে অবস্থিত। এই দারিদ্র্য জিনিষটা চিত্তের ধর্ম। চিত্ত সর্বদা একটা না একটা অভাব ধরিয়াই আছে। এই অভাববোধ বা দারিদ্র্য দূর করিবার জন্যই জগৎময় কোলাহল, এই ছুটাছুটি। যতই সঞ্চয় কিংবা ভোগ করা যাউক না কেন, চিত্তক্ষেত্রে নিত্য নূতন অভাববোধ জাগিবেই। এই দারিদ্র্য দূর না হইলে, দুঃখ ও ভয় কখনও দূরীভূত হইতে পারে না। বর্তমানে দেশময় যে একটা ভয়ানক দারিদ্র্যতার মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার হেতু— এই অভাববোধ। অভাববোধটা যত বাড়িয়াছে, সামগ্রী সঞ্চয়ের কিংবা ভোগের অভাব ততটা হয় নাই। কোন বস্তুটি পাইলে যে এই দারিদ্র্য দূরীভূত হইতে পারে, তাহা বলিয়া দিবে—বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি যতদিন অশুভ থাকে —মলিন থাকে, ততদিন সর্ববিধ অভাবনাশক বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, সুতরাং অভাববোধ কিছুতেই অপনীত হয় না। এই জন্যই শুভা মতির প্রয়োজন।

যাহাকে লাভ করিলে, আর কোন লাভই অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে অবস্থান করিলেই, দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই যে পরমানন্দময় নিত্যবস্তু, যাহা পাইলে দারিদ্র্য দুঃখ এবং ভয় চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহার সন্ধান দিবে কে ? ঐ শুভা মতি—ঐ নির্মল বুদ্ধিসত্ত্ব উপনিষদের ভাষায় ইহাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হইলেই জীব পরমাত্মরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তখন যাবতীয় অভাব দুঃখ এবং ভয় দূর হইয়া যায়। এস সাধক, এস আমরাও দেবতাগণের সুরে সুর মিলাইয়া ভক্তি-বিনম্র চিত্তে বলিতে চেষ্টা করি—**'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতি-মশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! কা ত্বদন্যা, সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা'**। মাগো ! সকল জীবের সকল রকমের উপকার করিবার জন্য সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা স্নেহবিগলিত হৃদয়া তুমি ছাড়া আর কে আছে ! তুমি যে আমাদের সর্বভাবেই দয়াময়ী মা ; দয়ায় স্নেহ মাতৃত্বে তোমার বুকখানা নিয়তই বিগলিত। কিন্তু মা আমরা কতদিনে তোমার এই অতুলনীয় মাতৃত্ব অনুভব করিয়া যথার্থ পুত্রত্ব লাভে ধন্য হইব ?

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥ ১৭॥

অনুবাদ। হে দেবি ! এই অসুরগণ নিহত হইলেই জগৎ যথার্থ সুখ লাভ করিতে পারে, অসুরগণও আর চিরকাল নরকজনক পাপানুষ্ঠান করিতে পারিবে না ; পক্ষান্তরে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ করিবে, এই সকল মনে করিয়াই তুমি অসুরদিগকে নিহত করিয়াছ।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি যদি সকলেরই উপকার কর, সকলের জন্যই যদি তোমার চিত্ত দয়ার্দ্র হয়, শত্রু মিত্র, পাপী পুণ্যবান, জ্ঞানী অজ্ঞানী, এসকল বিচার যদি তোমার নাই থাকে ; তবে এই অসুরকুলকে নিহত করিলে কেন ? এ বিষয় তোমার বলিবার তিনটি কথা

আছে। প্রথমতঃ ইহারা নিহত হইলে জগৎ শান্তি লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ অসুরগণও আর দীর্ঘকাল পাপাচরণ করিয়া নরকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়া, ইহারা স্বর্গে গমন করিবে। এই তিনটি উদ্দেশ্য লইয়াই তুমি অসুরকুলের বিনাশ সাধন করিয়া থাক।

যদি যথার্থ নিধন বলিয়া কিছু থাকিত, যদি যথার্থ অনুপকার বলিতে কিছু থাকিত, যদি যথার্থ নিষ্ঠুরতা বলিতে কিছু থাকিত, তবে তোমাতে উপকার অনুপকার, দয়া ও নিষ্ঠুরতারূপ দুইটি ধর্ম দেখিতে পাইতাম। যখন তোমার প্রত্যেক ইচ্ছাই মঙ্গলপ্রসূ, প্রত্যেক কার্যই মঙ্গলময়, তখন অমঙ্গল বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এ কথাটা যতদিন আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, ততদিনই জগতের চক্ষু দিয়া তোমাতেও উপকার-অনুপকার, দয়া ও নিষ্ঠুরতারূপ দুইটি জিনিস দেখিতে পাই! স্থূলদর্শী-ভেদজ্ঞান-সম্পন্ন চক্ষুতে ঐরূপ দ্বৈতদর্শন হইবেই; কিন্তু মা তুমি দয়া করিয়া যাহাদের ভেদজ্ঞান দূরীভূত করিয়া দাও, তাহারা বুঝিতে পারে— একমাত্র তুমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই, যাহারা বুঝিতে পারে—ধ্বংস এবং সৃষ্টি, উভয়ই তোমার তুল্য আনন্দলীলা, তাহারা কি করিয়া বলিবে—তুমি কাহারও প্রতি দয়া, আবার কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া থাক।

কিন্তু যদি ভেদদর্শন লইয়াও তোমাকে দেখা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাই—জীব তোমার সন্তান, তুমি জীবের জননী। জননী কখনও সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে যাহাকে আমরা নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করি—রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, মৃত্যু প্রভৃতি, যেগুলিকে আমরা যথার্থ অনুপকার বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া বুঝি, উহাও যে বস্তুতঃ মাতৃ-স্নেহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা বুঝিতে হইলে—ঐ সকলের ভিতরেও তোমার পূর্বোক্ত তিনটি অভিসন্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়।

প্রথম উদ্দেশ্য—**'জগৎদুপৈতি সুখম্'** — অসুরগণ নিহত হইলে, জগৎ শান্তিলাভ করে। স্থূলভাবে অসুরকুল নিহত হইলে, জগতের যাবতীয় অত্যাচার যে উপশান্ত হয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্মভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়— বাসনাগুলিকে বৃদ্ধির অবসর না দিয়া, প্রলয়াভিমুখী করিতে পারিলেই জীব যথার্থ শান্তির সন্ধান পায়। কারণ কামনার চরিতার্থতায় যে সুখলাভ হয়, কামনার উদ্বেলনশূন্যতা তদপেক্ষা বহুশতগুণে অধিক সুখ প্রদান করে। বিক্ষুব্ধচিত্তে বিষয়ভোগ করিয়া যে সুখ, প্রশান্তচিত্তে বিষয়ভোগের অনভিলাষে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ হয়। চিত্তবিক্ষোভের নামই দুঃখ, আর চিত্তের প্রশান্ততাই সুখ। এখন দেখ— যদি জগৎকে বা তোমাকে যথার্থ সুখী করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই অসুরকুলকে বা বাসনারাশিকে ধ্বংস করিতে হইবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—**'নরকায় চিরায় পাপং ন কুর্বন্তু'** —অসুরবৃন্দ বা বাসনাময় চিত্ত প্রতিনিয়ত বাসনা চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে চিরকালের জন্য নরক ভোগ না করে। নর যেখানে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাকে নরক বলে। ছোট ছোট বিষয়, ছোট ছোট কামনা লইয়া, মানুষ এমন মুগ্ধ থাকে যে যথার্থ সুখের সন্ধানই পায় না; সুতরাং উহাদিগকে সম্মুখ সংগ্রামে নিহিত করা একান্ত আবশ্যক। এবং ইহাই অসুর নিধনের তৃতীয় উদ্দেশ্য। যাহা যথার্থ সুখ, তাহাকে সম্মুখে ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বাসনাকে সমষ্টিভূত করিয়া তদভিমুখে পরিধাবিত করিতে পারিলেই নরকীয় বৃত্তিনিচয় বিলয় প্রাপ্ত হয়। সম্মুখ সংগ্রামে অসুর বিনাশের ইহাই রহস্য। ভূমা সুখের আভাস সম্মুখে দেখিতে পাইলেই জীব দুঃখমিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী সুখের কামনা অনায়াসে পরিহার করিতে সমর্থ হয়। মা আমার আনন্দময়ী, পরম সুখময়ী মূর্তিতে যখন সম্মুখে দাঁড়ান, তখনই যাবতীয় অসুরভাব বিলয় হইয়া যায়; তাই দেবতাগণ বলিলেন—**'অহিতান্ বিনিহংসি'** যাহা অহিত—যাহা আমাদের পক্ষে হিতকর নহে, এরূপ ভাবসমূহকে ধ্বংস করিয়া, আমাদের পরম মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই মায়ের এই সমর-বিড়ম্বনা।

দৃষ্ট্বৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৮॥

অনুবাদ। মা! তুমি দৃষ্টিপাতমাত্রই ত' অসুরগণকে ভস্ম করিতে পারিতে, তথাপি তাহা না করিয়া, সমস্ত

শত্রুগণের প্রতি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ইহার হেতু শত্রুগণও তোমার অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে। অহো ! শত্রুগণের প্রতিও তোমার এইরূপ সাধ্বী মতি রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি তুমি, তোমার ইচ্ছামাত্রেই ত' আসুরিক ভাবনিচয় মুহূর্ত মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইতে পারে ; তাহা না করিয়া অরিগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপরূপ এই সংগ্রাম বিড়ম্বনা কেন মা ? ওগো, ইহার মধ্যেও যে তোমার সাধ্বী মতি —মঙ্গলময়ী ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে। তোমার স্বহস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়া, উহারা পবিত্র হইবে— নিষ্পাপ হইবে, উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে—তোমার বর-বপুতে মিলাইয়া যাইবে, এইরূপ অতি উদার ও সাধ্বী মতি লইয়াই তোমার এই সংগ্রামলীলা ! শত্রুর প্রতিও তোমার এইরূপ মহতী দয়া। ইহা চিন্তা করিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। যাহাকে আমরা নিষ্ঠুরতা মনে করি, তাহা বাস্তবিক নিষ্ঠুরতা নহে ; করুণার ছদ্মবেশ মাত্র।

মাগো ! তুমি যখন জীবের আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে শস্ত্রপূত করিতে থাক, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা-রাশিকে একটু একটু করিয়া তোমার অভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাক, যখন চিত্তের বৃত্তিগুলি জড়ত্বের মোহ কাটাইয়া, একটু একটু করিয়া বোধময় সত্তার সন্ধান পায়, তখনই ত' উহারা স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে থাকে। ইহাই দেবতাগণ ভক্তিবিনম্রকণ্ঠে বলিতেছেন—'**লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ**'। মা আমাদের বহির্মুখ বৃত্তিগুলিকে এইরূপ বিন্দু বিন্দু আনন্দরসের ভোগ করাইয়া ক্রমে তোমাতে সম্যক্ মিলাইয়া লও ! আর তুমি তখন '**একমেবাদ্বিতীয়তম্**' স্বরূপে বিরাজ করিতে থাক ! মাগো ! ধন্য তোমার কার্যপ্রণালীর অপূর্ব শৃঙ্খলা।

খড়্গ প্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতাবিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥ ১৯॥

অনুবাদ। মা ! তোমার খড়্গপ্রভাসমূহের বিস্ফুরণ, এবং শূলাগ্রভাবসমূহের দীপ্তি যে অসুরগণের দর্শনশক্তি বিলয় করিতে পারে নাই তাহার হেতু—অসুরগণ তোমার এই জ্যোতির্ময় ইন্দুকলাবিভূষিত অতুলনীয় মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মা ! স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—এই মহিষাসুরযুদ্ধে তোমার খড়্গ প্রভাসমূহের বিস্ফুরণ এবং শূলাগ্রভাগসমূহের কান্তি অসুরগণের দৃষ্টিশক্তিকে বিলয় করিতে পারে নাই ; আবার সূক্ষ্মভাবেও দেখিতে পাই—তোমার বিজ্ঞান-খড়্গের প্রভাব এবং জ্ঞানময় শূলের কান্তিও আসুরিক দৃষ্টির সম্যক্ বিলয় সাধন করিতে পারে না। কেন এরূপ হয় ? যে বিশুদ্ধ বোধরূপ শাণিত অস্ত্রের প্রভাবে যাবতীয় দ্বৈতরূপ দৈত্যকুল সমূলে বিনিষ্ট হইয়া যায়, তাহার আভাস পাইয়াও আসুরিক দৃষ্টির বিলয় হয় না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর নিরূপণ করিতে গিয়া দেবতাগণ বলিলেন—'**অংশুমদিন্দুখণ্ড যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং**'। মাগো ! তোমার সমুজ্জ্বল মুখচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই অসুর-দৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। মায়ের হাস্যময়ী স্নেহময়ী আনন-সুষমা নিরীক্ষণ করিতে পারিলে, আর দৃষ্টিবিলয়ের আশঙ্কা থাকে কি ? আসুরিক সত্তাও যে চিদানন্দময়ী মাতৃ-সত্তাই, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ রহস্য সম্যক্ অনুভব করিতে পারিলেই পূর্বোক্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। যাঁহারা সর্বতোভাবে সর্ববিধ আসুরিক ভাবের বিলয় সাধন করিয়া বিশুদ্ধ বোধস্বরূপা তোমার সত্তাকে ধরিতে চাহেন, তাঁহারা হয়ত এ রহস্য উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা করুন। কিন্তু একটু ধীরভাবে দেখিলে, তাঁহারাও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন—মায়ের মুখখানি দেখিতে পাইবার পরও অসুর দৃষ্টি থাকিতে পারে এবং থাকে, ক্রমে—কালে তাহা সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয় ! মাগো, তোমার প্রিয়তম মানব সন্তানগণকে তুমি বুঝাইয়া দাও যে, আসুরিক দৃষ্টি থাকিতেও তোমার স্নেহকরুণাময় বদনসৌন্দর্য দেখিবার সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। অতি দুরাচার ব্যক্তিও তোমায় অনন্যাচিত্তে ভজনা করিতে পারে। তোমায় দেখিতে না পাইলে, অনন্যচিত্তে তোমার ভজনা হয় কি ? কিন্তু সে অন্য কথা।

মা ! চন্দ্রের দৃষ্টান্তেও আমরা এই সত্যে উপনীত হইতে পারি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় —'**অংশুমদিন্দু**' অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে

বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—কিরণ ত' চন্দ্রের নহে, উহা সূর্যের। চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণই চন্দ্র কিরণরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ যেগুলিকে আমরা আসুরিক দৃষ্টি বা আসুরিকভাব বলিয়া মনে করি, তাহাও যে মা তোমারই সত্তায় সত্তাবান, তোমারই প্রকাশে প্রকাশিত, তদ্‌ভিন্ন উহাদের কোন পৃথক সত্তাই নাই, এ রহস্য যাহারা যথার্থ অনুভব করিতে পারে তাহাদের আসুরিক দৃষ্টি বিলয় হওয়া না হওয়া উভয়ই তুল্য হইয়া থাকে। একমাত্র প্রাণরূপিণী তুমিই ত' সুর অসুর উভয় আকারে প্রকাশিত। আমরা তোমায় না দেখিয়া ঐ আকারে মুগ্ধ হই বলিয়াই প্রবঞ্চিত হই। কল্যাণময়ী মা, তুমি আমাদের এই মোহ দূর কর ; কল্যাণদৃষ্টি উন্মেষিত কর। প্রাণে প্রতিষ্ঠিত কর।

———○———

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবী শীলম্
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃহৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিম্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ২০॥

অনুবাদ। হে দেবি ! দুর্বৃত্তগণের বৃত্ত-প্রশমনকারী তোমার স্বভাব, অচিন্তনীয় তোমার রূপ, দেবপরাক্রম-বিনাশী—অসুর নিধনকারী তোমার বীর্য এবং বৈরিদলের প্রতিও তোমার এইরূপ দয়া, এ সকলের তুলনা একমাত্র তোমা ব্যতীত অন্য কোথাও নাই।

ব্যাখ্যা। মাগো ! চিত্তের বৃত্তিসমূহ যতদিন অসৎ বস্তুতে বর্তমান অর্থাৎ আসক্ত থাকে, ততদিনই উহারা দুর্বৃত্ত। একমাত্র সৎস্বরূপা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যতদিন চিত্তক্ষেত্রে বৈষয়িক স্পন্দনে প্রকাশিত হয়, ততদিনই বৃত্তিসমূহ দুর্বৃত্ত। কিন্তু এই দুর্বৃত্তদিগকে সম্যক্ প্রশমিত করাই তোমার স্বভাব ! মা ! **'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'** —দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করাই তোমার কার্য ! কিরূপে ইহা নিষ্পন্ন হয় ? তোমার রূপ দেখিলেই দুর্বৃত্ত প্রশমিত হয়। **'রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যম্'** তোমার রূপ অচিন্তনীয়। চিন্তা—চিত্তধর্ম ! তোমার রূপটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন চিত্ত বলিয়া কিছু থাকে না, থাকিতে পারে না ; সুতরাং চিন্তাও থাকে না। তাই মা, দুর্বৃত্তদিগের বৃত্তপ্রশমন অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহাই তোমার স্বভাব।

সাধক ! তোমরা সে অরূপের রূপ কখনও দেখিয়াছ কি ? পরিচ্ছিন্ন সীমাবিশিষ্ট কোনও রূপ দেখিলে হয়ত বা মুগ্ধ নাও হইতে পার ; কিন্তু সে রূপহীন রূপসাগরে অবগাহন করিলে, নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। একটা তুচ্ছ পার্থিবরূপে মুগ্ধ হইয়া মানুষ কুল শীল মান সকল জলাঞ্জলি দিতে পারে ; আর সেই অপরিচ্ছিন্ন মধুময় প্রাণময় প্রেমময় রূপের সম্মুখে দাঁড়াইলে, জীব কি আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারে ? ওগো এস, সকলে মিলিয়া মায়ের সেই অচিন্তনীয় রূপসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। চিরদিনের পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। সকল দুর্বৃত্ত প্রশমিত হইবে ! কিন্তু সে অন্য কথা।

মাগো ! তোমার রূপ দেখিলে যে চিত্তবৃত্তি আপনা হইতে প্রশান্ত হইয়া যায়, ইহা যাহারা বিশ্বাস না করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া শুধু কৌশলের সাহায্যে চিত্ত নিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদিগকে তোমার এই রহস্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও। মা বলিয়া, সত্য বলিয়া, প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়া আহ্বান করিলেই, তোমার অচিন্ত্য রূপরাশি উদ্‌ভাসিত হয়। এমনই মধুময় সে রূপ, এমনই সীমাহীন ভাষাহীন সে রূপ—তাহার প্রকাশ হইলে, চিত্ত আপনা হইতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, দুর্বৃত্ত—অসৎপ্রিয়তা সম্যক্ বিদূরিত হয়। নির্বিকল্পা নিরঞ্জনা ভাবাতীতা মা আমার ! তোমার প্রকাশে সর্বভাব সর্ববিধ বৈষয়িক প্রকাশ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শুধু রূপ নয়, তোমার বীর্যও দুর্বৃত্তদিগের বৃত্তি প্রশমন করিতে সমর্থ। যে আসুরিক বৃত্তি-নিচয় দেবভাব-গুলিকে নির্বীর্য করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সেই শক্তিকে একমাত্র তুমিই বিলয় করিয়া দিতে সমর্থ। তোমার যে বীর্য, যে মহতী শক্তি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেই অমিতবীর্যের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলেও চিত্তবৃত্তি বিনা প্রযত্নে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

মাগো, যাহারা তোমার রূপহীন রূপের ধারণা করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ যাহারা **'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'** এই স্বরূপ লক্ষণ ধরিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না ; তাহাদের জন্য তোমার এই অমিত বীর্য—এই মহতী শক্তিধারণার উপদেশ বিহিত হইয়াছে। তাহারা **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** এই তটস্থ লক্ষণ ধরিয়া, (যাঁহা হইতে জগতের

জন্ম-স্থিতি-লয় হয়) তাঁহার—সেই লীলাময়ী মহতীশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইবে। ইহা দ্বারাও চিত্তবৃত্তি অনায়াসে নিরুদ্ধ হয়। আর যাহারা ইহাতেও অক্ষম, তাহাদের জন্য **'বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্'** তোমার অতুলনীয় দয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি বৈরিদলের প্রতিও দয়া বিতরণে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন না, তিনি—সেই তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার পুত্র ; সুতরাং আমরা কখনও তোমার দয়ালাভে বঞ্চিত হইব না। মা, জগৎময় যে অসীম দয়া ছড়ান রহিয়াছে, এই নিয়ত প্রত্যক্ষ অতিশয় প্রকটিত তোমার দয়ার সম্মুখে সরলপ্রাণে সত্যজ্ঞানে একবার মা বলিয়া দাঁড়াইলেও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়—অসুরকুল বিলয় প্রাপ্ত হয়।

মা, এইরূপে তোমার রূপ, তোমার শক্তি এবং তোমার দয়া এই তিনটির যে কোনটিকে আশ্রয় করিলেই চঞ্চলচিত্ত নিরুদ্ধ হয়, দুর্বৃত্ত বৃত্ত অনায়াসে প্রশমিত হইয়া যায়। তাই দেবতাগণ বলিলেন—মা ! দুর্বৃত্তদিগের বৃত্তপ্রশমন করাই তোমার স্বভাব। এই তিনটিই মা, অতুলনীয় ! অন্য কোন সাধনা, অন্য কোন উপায় উহার সহিত তুলনাযোগ্য নহে ! তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—**'অতুল্যমন্যৈঃ'**।

মাগো ! আমরা কিন্তু তোর কনিষ্ঠ পুত্র ; আমাদের পক্ষে, তোর তৃতীয় উপদেশই একান্ত উপযোগী। আমরা তোর কৃপার ভিখারী। বিশ্বময় তোর যে দয়াময়ী মূর্তি প্রকটিত রহিয়াছে, সেই মূর্তিতে মুগ্ধ হইতে চেষ্টা করিব। মা বলিয়া, তোর মুখপানে চহিয়া বসিয়া থাকিব, একদিন তুমি নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে, একদিন নিশ্চয়ই তোমার দয়া উপলব্ধি করিতে পারিব। সেদিন আমাদের দুর্বৃত্ত প্রশমিত হইবে। তারপর বিনা চেষ্টায় তোমার বীর্যে বা তটস্থ লক্ষণে উপনীত হইব। সর্বশেষে তুই অরূপের রূপ লইয়া, আমাদের আত্মারূপে— সত্য জ্ঞান আনন্দ-স্বরূপে, ব্রহ্মস্বরূপে প্রকটিত হইবি, আমাদের মা ডাক সার্থক হইবে। আনন্দে জয় মা বলিয়া জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের পরপারে চলিয়া যাইব। মাগো ! সে দিনের কত দেরী ?

———○———

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥ ২১॥

অনুবাদ। হে দেবি ! হে বরদে ! তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কোথায় ? শত্রুভয়প্রদ অথচ অতি মনোহর এমন রূপই বা কোথায় ? চিত্তে কৃপা অথচ সমরনিষ্ঠুরতা, এই ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র তোমাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা। মা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি তুমি, সুতরাং তোমার পরাক্রমের তুলনা নাই ; এ কথা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে জগতে যাহা পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত আছে, তাহা সর্বতোভাবে দুর্বলের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দুর্বলের অশ্রুবিন্দু ভূমিতলে নিপাতিত না করিতে পারিলে, পরাক্রমের সার্থকতাই হয় না। কিন্তু মা, তোমার পরাক্রম ঠিক ইহার বিপরীত। বৈরিদলের প্রতিও অসীম করুণা বর্ষণ করাই তোমার পরাক্রমের ফল। সুতরাং জগতের পরাক্রমের সহিত তোমার পরাক্রমের তুলনা একান্ত অসম্ভব।

তারপর তোমার রূপ—তাহাও অতুলনীয়। ভয়-জনকত্ব এবং মনোহরত্ব, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ এই ধর্মদ্বয় একমাত্র তোমার রূপেই বিদ্যমান। জগতে কোথাও এরূপ পরস্পর-বিরোধি ধর্মের সম্মিলন সম্ভব হয় না ! যুগপৎ শত্রুর প্রতি ভয়দায়ক ও পুত্রের প্রতি আনন্দদায়ক রূপ একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

রজোগুণজনিত চিত্তবিক্ষেপরূপ শত্রুসমূহ তোমার সেই রূপহীন রূপ-সাগরে অবগাহন করিতে গিয়া, যেন ভয়ে ভয়ে মিলাইয়া যাইতে থাকে, আবার অন্যদিকে, সেই অচিন্তনীয় রূপের প্রকাশে সাধকের প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ স্ফুরিত হইতে থাকে। মা ! তোমার চিত্তে মহতী কৃপা, অথচ বাহিরে সমর-নিষ্ঠুরতা—শত্রু-সংহারের জন্য প্রাণপণে শাণিত অস্ত্রনিক্ষেপ, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম একমাত্র তোমাতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগতে যে রোগ-শোক-অত্যাচার-উৎপীড়ন-দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কনিষ্ঠ সন্তানগণ উহাতে কেবল তোমার নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা তোমার স্নেহ-স্তন্যপানে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহারা যুগপৎ তোমার চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা দেখিয়া ধন্য হয়। তুমি যে সমর-নিষ্ঠুরতার

কঠোর আবরণে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া জীব সন্তানগণের প্রতি অসীম করুণাধারা বর্ষণ করিয়া থাক, তাহা তাহারা সর্বদা প্রত্যক্ষ করে এবং সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, একমাত্র তোমার কৃপারূপ অনাবিল আনন্দ-রস পান করিয়া নিয়ত প্রফুল্ল থাকে।

———○———

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২২॥

অনুবাদ। মা, তুমি শত্রুসংহার করিয়া এই অখিল ত্রিলোক পরিত্রাণ করিলে, সমরক্ষেত্রে নিহত করিয়া শত্রুদিগকে স্বর্গ প্রদান করিলে এবং আমাদিগেরও উদ্ধত অসুরভীতি বিদূরিত করিলে ; মাগো ! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা ! জগতে প্রতি জীবে এইরূপ তিনটি কার্য সম্পন্ন করিয়া তোমার দয়াময়ী নাম সার্থক করিয়া থাক। ত্রিলোকের শান্তি, অসুরগণের স্বর্গপ্রদান, এবং আমাদিগের অসুরভীতিবিমোচন, ইহাই তোমার কার্য। তোমার দয়ার ইহাই ত' বাহ্যফল। আমরা যে বহু জন্ম হইতে কামক্রোধাদির অত্যাচারে সঞ্চিত সংস্কাররূপ অসুরগণের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছিলাম, তুমি স্বয়ং অসিহস্তে আমাদের হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সেই অসুরকুলকে নির্মূল করিলে। আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যে অসুরভীতির প্রবল সংস্কার আবদ্ধ হইয়াছিল, যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া তোমায় মা বলিয়া ডাকিতে পারি নাই, ভাবিতাম— কাম-ক্রোধাদি থাকিতে, চিত্তের মলিনতা বিদ্যমান থাকিতে, সংসারাশ্রম বর্তমান থাকিতে, তোমাকে ডাকিতে পারা যায় না, আজ তুমি সন্তানস্নেহে বাধ্য হইয়া আমাদের সে আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছ। প্রাণের সংকীর্ণতা দূর হইয়াছে। সঞ্চিত কামনারাশির বিক্ষোভজনিত চিত্তের আসুরিক চঞ্চলতা আর নাই। যাহারা আমাদের মাতৃ-মিলনের অন্তরায় ছিল, যাহাদিগের প্রতি আমরা বৈর-বুদ্ধি পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ দেখিতে পাইতেছি — তাহারাও তোমার স্নেহে সঞ্জীবিত হইয়া —বিশুদ্ধ হইয়া, তোমারই পবিত্র অঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার অপরিসীম দয়ার প্রভাবে তাহারাও আজ **'দিবং নীতাঃ'** স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। যাহারা ভূরাদি লোকত্রয়ে অত্যাচার করিয়া একদিন অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন দেখিতে পাইতেছি—তাহারাও তোমারই অঙ্গের ভূষণ হওয়ায়, আমাদের সেই ত্রিলোক-ব্যাপী অশান্তি বিদূরিত হইয়াছে। (ত্রিলোকের অত্যাচার পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তুমি জগৎ পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছ—চতুর্দিকে ক্রমে তাহারই আয়োজন চলিতেছে। ওগো, তুমি বাক্য এবং মনের অতীত —অপরিচ্ছিন্ন ; তথাপি এমন করিয়া প্রতি জীবহৃদয়ে তোমাকে এত ক্ষুদ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ওঃ ! তোমার দয়া, বাক্য এবং চিন্তার অতীত। আমাদের আর কি আছে মা ! শুধু প্রণাম লও— **'নমস্তে নমস্তে নমস্তে'**।

———○———

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৩॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৪॥

অনুবাদ। হে দেবি ! শূল খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি এবং ধনুর জ্যাধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে চণ্ডিকে ! হে ঈশ্বরি ! তোমার আত্মশূল পরিভ্রামিত করিয়া, পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ও উত্তর দিকে আমাদিগকে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা। শূল ও খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি এবং ধনুর জ্যাধ্বনি প্রভৃতির আধ্যাত্মিক রহস্য ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুনরায় তাহা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

দেখ— সাধক ! তোমারও পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে, সর্বত্র মাতৃ-শক্তি, মাতৃ-আহ্বান বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞান ও নাদ-শক্তিই সর্বত্র বিষয়াকারে বিরাজিত। এস, আমরাও শক্রাদি দেবতা-বৃন্দের ন্যায় সরল প্রাণে কাতরভাবে প্রার্থনা করি। মাগো ! শূল, খড়্গ, ঘণ্টাধ্বনি, জ্যাধ্বনি প্রভৃতি তোমার যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ! যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যে ঘন জড়ত্বের দুশ্ছেদ্য মূর্তি নয়নগোচর হয়, এই জড়ত্বরূপা মহা অসুরের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। একমাত্র প্রাণস্বরূপা তুমিই

আমাদের চতুর্দিকে পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছ, এ কথাটা আমরা সহস্র আলোচনাতেও ভুলিয়া যাই, জড়ত্বের দ্বারা পুনঃপুনঃ উৎপীড়িত হই, তাহারই ফলে কত লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুর অসহনীয় পেষণ সহ্য করিতে হয়। মা ! আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন আমাদের প্রাণস্বরূপিণী মাতৃ-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়। আর যেন বিষয়বোধে, বিষয়ভোগ করিয়া ত্রিতাপ বিষে বিদগ্ধ হইতে না হয়। মাগো ! আমাদের এই জড়ত্বপ্রতীতি বিদূরিত করিতে, তোমার যত রকম শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাই কর !

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাস্মাংস্তথা ভূবম্॥ ২৫॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥ ২৬॥

অনুবাদ। মা ! ত্রিলোকে তোমার যে সকল সৌম্য এবং অতি ভয়ানক রূপ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তের দ্বারাই আমাদিগকে এবং এই বিশ্বকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে ! খড়্গ, শূল, গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজিত, সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা। মা ! এই জগতে দ্বিবিধ মূর্তিতে তোমার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সৌম্যা, অন্য ঘোরা। যখন পার্থিব বা অপার্থিব সর্ববিধ সুখসম্ভার লইয়া তুমি সৌম্যমূর্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, তখন যেন আমরা সুখের মোহে তোমার স্নেহের পরশটি বিস্মৃত না হই। পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য এবং অপার্থিব সিদ্ধি শক্তি কিংবা স্বর্গাদি সুখ, যেন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে না পারে। মাগো ! সৌম্যমূর্তিতে এই মুগ্ধতার হাত হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিও। সর্ববিধ সুখরূপে যে তুমিই উপস্থিত হও, এ কথাটা মুহূর্তের তরেও আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত না হয়। আবার যখন দুঃখ দুর্দৈবের অমানিশা উপস্থিত হয়, যখন রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায়, মৃত্যুভয়ে উৎপীড়িত হইতে থাকি, তখন যেন বুঝিতে পারি—মা, তুমিই ঘোরা মূর্তিতে আসিয়া আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছ। সে সময় তোমার সেই ভীতিপ্রদায়িনী মূর্তি দেখিয়া যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হই, যেন অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া না পড়ি তোমার অস্তিত্বে—তোমার মাতৃত্বে বিন্দুমাত্র সংশয় না আসে, যত ঘোরামূর্তিতেই তুমি আবির্ভূত হও না কেন—প্রকৃতি যতই প্রতিকূল বেদনা লইয়া উপস্থিত হউক না কেন, তুমি যে যথার্থই আমাদের মা, উহাতে যেন তিলমাত্র অবিশ্বাস স্থান না পায় ! মাগো ! জীবনচক্র নিয়ত পরিবর্তনশীল। ইহাতে সুখ দুঃখের পরিবর্তন নিয়তই হইতেছে, হইবে। উহার মধ্যেই তোমার সৌম্যা ও ঘোরা মূর্তির প্রকাশ। এই উভয় মূর্তিতেই আমাদিগকে রক্ষা কর। কেবল আমাদিগকে নয়—**'তথা ভূবম্'** এই বিশ্ববাসী যেখানে যত জীব আছে সকলকেই রক্ষা কর মা ! সকলকেই রক্ষা কর। একমাত্র তুমিই যে সুখ-দুঃখ আকারে উপস্থিত হইয়া থাক, ইহা প্রতি জীবে মর্মে মর্মে অঙ্কিত করিয়া দাও ! ইহারই নাম—রক্ষা। কোনও অবস্থায়ই জীব যেন আপনাকে মাতৃহারা নিরাশ্রয় অনাথ বলিয়া মনে না করে। ইহা করিতে গিয়া, মা তোমার যত রকম অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হয়, সকলই কর। ওগো সর্বায়ুধধারিণী মা আমার ! তোমার যাবতীয় আয়ুধ প্রয়োগ করিয়াও আমাদিগকে রক্ষা কর। **'রক্ষঃ সর্বতঃ'**— সকল হইতে রক্ষা কর। এই যে সর্বভাব, এই যে বহুভাব—ইহা হইতে রক্ষা কর। একমাত্র সচ্চিদানন্দময়ী তুমিই যে সর্বভাবে অভিব্যক্ত, তদ্ব্যতীত সর্ব বা বহু বলিয়া কিছুই যে নাই—এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর ! আমরা যে সর্বাবস্থাতেই সত্যের আশ্রিত, সত্যে স্থিত, এই মহাজ্ঞানরূপে তুমি প্রতি জীবহৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও মা ! দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও ! জগৎ হইতে দুঃখ ভয় চিরতরে মুছিয়া যাউক।

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥ ২৭॥
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥ ২৮॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন— দেবগণ জগদ্ধাত্রী মাকে এইরূপ স্তব করিয়া নন্দনবনসম্ভূত দিব্য কুসুম, গন্ধ এবং অনুলেপন দ্বারা পূজা করিলেন। সমস্ত দেবতা ভক্তির সহিত দিব্য ধূপের দ্বারা দেবীকে সৌরভাকুলিত

করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রসন্নমুখী দেবী প্রণত দেবতাবৃন্দকে বলিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ এইরূপ স্তব করিয়া, গন্ধ পুষ্প ধূপাদি দ্বারা জগৎ বিধারিণী মহাশক্তির পূজা করিলেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও দেখিতে পাওয়া যায়— ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাবসমূহরূপ নন্দন কুসুম, বিবেকানলে জ্ঞান কর্মেন্দ্রিয় দাহজনিত সুরভি ধূপ, এবং শ্রদ্ধা নির্মমতা বিরাগ শুচিতা প্রভৃতি গন্ধানুলেপন দ্বারা জগদ্ বিধারিণী মায়ের পূজা করিয়া থাকেন। তিনিও এইরূপ পূজায় প্রসন্ন হইয়া, বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন। এইস্থানে পূজাসম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গীতায় উক্ত হইয়াছে— '**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি**'। এই দেবীমাহাত্ম্যেও অনেক স্থানে পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা পূজার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন যাবতীয় স্মৃতি সংহিতা পুরাণাদি শাস্ত্রে পূজার বিধান বহুধা উক্ত হইয়াছে। অথচ অন্যত্র দেখিতে পাই—'বাহ্যপূজাধমাধমা' এইরূপ উল্লেখও আছে। কেহ কেহ বা এই উপদেশের বশবর্তী হইয়া, যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্বক মাত্র ধ্যানের সাহায্যে পরমাত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমরা কি বুঝিব ? আমরা বুঝিব— যতদিন আহার-নিদ্রা আছে, যতদিন অনুকুল-প্রতিকুল বোধ আছে, যতদিন লঘু-গুরু জ্ঞান আছে, ততদিন বাহ্য পূজা থাকিবেই। শুধু ফুল বেলপাতা ছাড়িলেই বাহ্যপূজার পরিত্যাগ হয় না। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে— পূজাটি যেন কেবল বাহ্যপূজা রূপেই অনুষ্ঠিত না হয়। বাহ্যপূজা যে যথার্থই অধম হইতেও অধম, ইহা খুবই সত্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন— 'উপাস্য একজন আর উপাসক আর একজন, এইরূপ ভেদজ্ঞান নিয়া যাঁহারা দেবপূজা করেন, তাঁহারা দেবতাদিগের পশু।' ভগবান স্বয়ংও বলিয়াছেন—'অন্য দেবতার পূজা করিলে, উহা অবৈধ হইয়া থাকে'। ভেদজ্ঞান নিয়া পূজার নামই বাহ্যপূজা। যতদিন 'বাহ্য' বলিয়া একটা ঘন বোধ থাকে, ততদিন যথার্থ পূজার অধিকার হয় না। বাহ্য বলিয়া কিছু নাই, 'সবাই যে অন্তর' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন আর বাহ্যপূজা থাকে না। ইহা শুধু মুখে বলিলে হয় না— এই জগৎকে অন্তর বলিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। শুধু ঐ অন্তর বাহির ভেদজ্ঞান দূর করার জন্যই যত কিছু সাধনা, আরাধনা। স্থূল মূর্তি অবলম্বনে পূজা করিলে, অতি সহজে অন্তরবাহ্য ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞান ভক্তি কর্মের যুগপৎ অনুশীলনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিত, তবে ঋষিগণ এদেশে ঐরূপ মূর্তিপূজার প্রচলন করিতেন না। কিন্তু সে অন্য কথা—

যতক্ষণ এই অন্তর বাহ্য ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ দেবতার সহিত পরিচয়ই হয় না, সুতরাং কাহার পূজা করিবে ? '**দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ**' আবার '**জাতে পরিচেয়ে দেবে পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি**'। দেবতার সহিত পরিচয় হইলে, তখন আর তিনি পূজার আকাঙ্ক্ষাই করেন না। সুতরাং '**উভয়রোপি পক্ষয়োঃ পূজাং পশ্যামি দুর্ঘটাং**' উভয় পক্ষেই পূজাটি অসম্ভব হইয়া পড়ে। পূজা এবং পূজকরূপ ভেদজ্ঞান নিয়া পূজা করিলেই, উহা অজ্ঞানের অধম পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার যিনি প্রাণ, আমার যিনি আমি, তাঁহাকে পূজা করিতেছি— এইরূপ বোধ লইয়া পূজা করিলে, সে পূজা কখনও ব্যর্থ হয় না। যদিও এইরূপ অভেদে ভেদজ্ঞান লইয়া পূজার আরম্ভ করিলে ক্রমে ভেদজ্ঞান শিথিল হইতে থাকে, পূজার বিঘ্ন হইতে থাকে, বিধি লঙ্ঘন হইতে থাকে ; যদিও তখন শাস্ত্রোক্ত পূজার ক্রমগুলি বিস্মৃত হইতে হয়, ধূপ দিতে গিয়া, ফুল দিয়া বসিয়ে হয়, তথাপি উহাই পূর্ণ পূজার ফল। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—'**দেব এবেতি ধিয়া বিস্মৃতে পুজনক্রমে। পূজায়াং জায়তে বিঘ্নঃ পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥**'

এখনও এদেশের কোটি কোটি নরনারী পূজা করিয়া থাকেন, ঐ পূজা যে নিষ্ফল হয়—ইহা বলিতেছি না। তবে দেখিতে পাওয়া যায়—অনেকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পূজা করিয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। দৈনন্দিন কর্তব্য শেষ করার মত যেন পূজাটিও শেষ করিয়া যান ; আর যাঁহারা মাত্র অর্থের লোভে পূজার অভিনয় করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেন এরূপ হয়— কেন পূজা করিয়া জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে পারে না ? ঐ পরিচয়ের অভাব। যাঁহার পূজা করা হয়, তাঁহার সহিত পরিচয়ের অভাব। 'তিনি কে ? তাহা ত' জানি না, নিতান্ত করিতে হয়, তাই অভ্যাস রক্ষার

জন্য পূজা করিয়া যাই, এইরূপ একটা ভাব থাকে বলিয়াই পূজাগুলি আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না ! 'পূজাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পূজাবিষয়কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিষদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এদেশের নিত্যক্রিয়া পূজা হোমাদি কর্মকাণ্ড যেন একটা মৃতকর্মের অনুষ্ঠানরূপে পর্যবসিত হইয়াছে। মনে হয়— আবার যদি এ দেশের কর্মকাণ্ড উজ্জ্বল জ্ঞান ও পরাভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সজীব হইয়া উঠে, তবে বুঝি দেশের এই হাহাকার, এই অভাব উৎপীড়ন দূরীভূত হইয়া যায়। একবার ধর্মের নির্মল রসের আস্বাদ পাইলে, লোক আর ধর্মহীন হইতে পারে না। ধর্মহীন না হইলে সকল সুখই মানুষের সহজলভ্য হয়। এ দায়িত্ব প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের উপরই পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ ব্রাহ্মণগণই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, কর্মকাণ্ডকে এখনও বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারাই ঐ প্রাণহীন অস্থিকঙ্কাল-বিশিষ্ট কর্মকাণ্ডকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ করিয়া, আবার সজীব ও সফলতাময় করিয়া তুলিবেন। আবার তাঁহারা আদর্শ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত ভ্রাতৃবর্গকে আদরে ডাকিয়া কোলে লইবেন, সকলেই ধর্মময় হইবে, সকলেই কর্মময় হইবে। আবার সকল কর্মই জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞান আবার পরাভক্তির সুস্নিগ্ধ ধারায় মধুময় হইবে। এ বিশ্বরাজ্য ধর্মরাজ্যে পরিণত হইবে। অসত্য বিদূরিত হইয়া, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই আশায়ই সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপে বরাভয় হস্তে মা আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

ঐ দেখ সাধক ! দেবতাগণের পূজায় প্রসন্ন হইয়া, মা আমার বরপ্রদানে উদ্যত হইয়াছেন—**'প্রাহ প্রসাদ-সুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্'**। পূজা করিতে পারিলে —প্রণত হইতে পারিলেই মা আমার প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভাবিও না—তিনি কেবল দেবতাদিগের পূজা ও প্রণতিতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদের মত ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, জ্ঞানহীন দুর্বল অবিশ্বাসী সন্তানের পূজা প্রণতিও তিনি পরম আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অবিশ্বাসিযুগেও তিনি প্রকট হন, বরাভয় প্রদানে সন্তানকে আদর করেন। এস জীব ! এস সাধক। এস, মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন আমরা সকলে মিলিয়া, মা বলিয়া মায়ের চরণতলে প্রণত হইয়া পড়ি ! নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়ই মা আমাদের প্রতিও এইরূপ প্রসন্ন হইবেন।

———○———

দেব্যুবাচ।

ব্রিয়য়াং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৯॥

দেবা ঊচুঃ।

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।

যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩০॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে দেবগণ ! তোমরা আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর[১]। দেবগণ বলিলেন—ভগবতী কর্তৃক সকলই নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর নিহত হইয়াছে !

ব্যাখ্যা। ঠিক এইরূপই হয়। মা যখন বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বরপ্রদান করিতে উদ্যত হন, তখন সন্তান বলিয়া উঠে— না মা, কিছুই চাই না ! আমাদের কিছুই বাকী নাই ! কিছুরই অভাব নাই ! পূর্ণ স্বরূপা তুমি আবির্ভূত হইয়াছ, আর আমাদের কিছুই চাহিবার নাই, শুধু তুমি থাক। শুধু চিরদিন এমনই করিয়া আমাদের সম্মুখে থাক। চাহিবার কিছুই ত' নাই মা, হৃদয় যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! অন্তরের অন্তঃস্থল অন্বেষণ করিয়াও ত' কোন অভাব দেখিতে পাই না ! **'ন কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে'**। কিছুই ত' অবশিষ্ট নাই।

সাধক মাত্রেরই এই অবস্থা হয়। যত কামনা বাসনা নিয়াই মায়ের পূজায় ব্রতী হউক না কেন, মাকে একবার দেখিতে পাইলে, আর কিছুই মনে থাকে না, তখন মনে হয়— সবই পাইয়াছি, আবার চাহিব কি ? বালকযোগী ধ্রুবেরও ঠিক এইরূপ অবস্থায়ই হইয়াছিল। রাজ্য কামনায় সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু যখন পদ্মপলাশলোচনের সাক্ষাৎ লাভ হইল, তখন বলিলেন—'আমি কাচের অন্বেষণ করিতে গিয়া অমৃত লাভ করিয়াছি, আমার চাহিবার কিছুই নাই প্রভু।'

সাধক ! মনে করিও না—এরূপ ঘটনা কদাচিৎ কখনও কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়। তাহা নহে—প্রত্যেকে প্রতিদিন এইরূপ ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ ও

[১] 'দদাম্যহমতিপ্রীত্যা' ইত্যাদি অর্ধশ্লোক মূল সংহিতায় নাই। প্রাচীন টীকাকারগণও উহার উল্লেখ করেন নাই।

পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে পারে। ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। আরে, তিনি যে সর্বদা সর্বত্র সুপ্রকট ও সুপ্রসন্ন! ইচ্ছামাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে শুনিতে পাও— দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে তবে ভগবদ্ দর্শন হয়, উহার তাৎপর্য অন্য প্রকার। 'আমি ভগবানকে যথার্থই চাই' শুধু এইরূপ একটি ইচ্ছার উদ্বোধ করিবার জন্যই দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল কেন—বহু জীবন সাধনার আবশ্যক হয়। যদি কাহারও ঐরূপ ইচ্ছার আভাসও আসিয়া থাকে, তবে সে অচিরেই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু সে অন্য কথা ।

এই মন্ত্রটির আর একটি গূঢ় অর্থ আছে। **'ভগবত্যা কৃতং সর্বম্ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে'** এস্থলে নঞ্‌টি পূর্বার্দ্ধের সহিত অন্বয় করিলে, উহার অর্থ অন্যরূপ হইয়া যায়। **'ভগবত্যা কৃত্যং কিন্তু সর্বং ন, কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে'**। মা ! তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, কিন্তু সকল কার্য শেষ হয় নাই, এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। মহিষাসুর বধে জীবত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। শুম্ভবধ আবশ্যক। তাহা এখনও হয় নাই, তাই দেবতাগণ বলিলেন—**কিঞ্চিদবশিষ্যতে**।

———○———

যদি বাপি বরো দেয় স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি ।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩১ ॥
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে ।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈ র্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎ প্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। হে মহেশ্বরি ! তবে যদি একান্তই আমাদিগকে বর দিবে, তবে এই করিও— যেন সতত আমরা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তাহারই ফলে, আমাদের পরম আপদসমূহ যেন দূরীভূত হইয়া যায়। আর যে মানুষ এইরূপ স্তবদ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, হে অমলাননে ! হে অম্বিকে ! তুমি তাহার প্রতি সতত প্রসন্না থাকিও, এবং জ্ঞান ঐশ্বর্য সম্পত্তি ধন ও পুত্রাদি বিষয়ক মঙ্গল বিধান করিও।

ব্যাখ্যা। সন্তান যখন মাকে দেখিতে পায়, তখন আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে, চাহিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না বটে কিন্তু মা যে সন্তানের অভাব অভিযোগ সকলই জানিতে পারেন। তাহার সর্বদর্শি নয়নত্রয়ের অন্তরালে থাকিতে পারে, এমন কিছুই যে কোথাও নাই ! তাই মা নিজেই বর গ্রহণ করিবার জন্য সন্তানের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে পূর্ববিস্মৃত অভাবটি ফুটাইয়া তোলেন। ঠিক এইরূপ হয়। প্রথমদর্শন মাত্রেই সাধকের সকল অভাব-বোধের বিস্মৃতি ঘটে ; কারণ মা যে আমার পূর্ণতমা ! তারপর যখন ধীরে ধীরে সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে— একদিক দিয়া মা যখন অপ্রকট হইতে থাকেন, অন্যদিক দিয়া তখন চকিতের ন্যায় অভাবের মূর্তি ফুটিয়া উঠে, এই অভাববোধ হওয়ার নামই বর প্রার্থনা। মাকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যদি কোনরূপ অভাববোধ জাগে, তবে বুঝিতে হইবে —অচিরাৎ সে অভাব বিদূরিত হইবে ! মা এমনই সন্তানস্নেহে মুগ্ধা যে, মুখে কিছু না বলিলেও, সন্তানের অন্তরের লুক্কায়িত অভাববোধ দূর করিয়া থাকেন। নির্বিচারে অভীষ্ট বর প্রদানে ধন্য করিয়া থাকেন। আর আমরা এমন অকৃতজ্ঞ, এমন সংকীর্ণ হৃদয় সন্তান যে, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্যা, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও অতি অকিঞ্চিৎকর অভাব অভিযোগের ফর্দ উপস্থিত করি। মাগো ! কতদিনে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা সম্যক্ বিদূরিত হইবে ?

এস সাধক ! আমরাও দেবতাগণের ন্যায় বলি— হে মহেশ্বরি ! আমরা যেন সর্বদা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তুমিও আমাদিগের পরম আপদ দূর করিও।

'পরমাপদ' শব্দে আমরা পরমের আপদ বুঝিয়া লইব অর্থাৎ আমাদের পরমস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পক্ষে যাহা অন্তরায় তাহাই যথার্থ পরমাপদ। 'আমি সর্বদা পরমাত্ম-রূপে অবস্থান করিব' এই ব্রাহ্মী স্থিতির প্রতিকূলে যত কিছু বিঘ্ন আছে, তাহাই পরমাপদ। এক কথায় মাকে ভুলিয়া থাকাই পরমাপদ। যথার্থই আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দৈব বোধ হয় কিছুই নাই। মা ! তুমি এত নিকটে এত প্রত্যক্ষ, তবু আমরা তোমাকে ভুলিয়া জগতের ধূলি লইয়া চরিতার্থ হই, আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বিপদ আর কি থাকিতে পারে ? তাই প্রার্থনা করি মা ! **'সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।'** তোমায় যেন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে পারি, আর তাহারই ফলে— আমাদের পর-স্বরূপের বিঘ্ননিচয় যেন প্রতিহত হইয়া যায়।

আর একটি কথা—যদি সত্য সত্যই মা ! **'অস্মৎ**

প্রসন্না' আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে সেই প্রসন্নতার ফল এই বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ুক। মা তোমার এইরূপ হাস্যময় অমলানন, এইরূপ স্নেহময়ী অম্বিকা মূর্তি, জগতের প্রত্যেকেই দেখিয়া ধন্য হউক। জগতে যাহারা সাধারণের চক্ষুতে দুরাচার বলিয়া পরিচিত, তাহারাও এইরূপ স্তবস্তুতির সাহায্যে তোমার নিত্য প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হউক। এবং তাহারই ফলে— ধনদারাদিরূপ ভোগ ও জ্ঞানৈশ্বর্যরূপ অপবর্গ-লাভে ধন্য হইয়া যাউক। যদিও জীব-জগৎ মর্ত্য—মরণ-ধর্মশীল, তথাপি তোমারই কৃপায় অমরত্বের আস্বাদ লাভ করুক। মাগো ! তুমি এমনই করিয়া প্রতি জীবহৃদয়ে ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী নিত্য প্রসন্না অম্বিকা মূর্তিতে আবির্ভূত হও। জগৎ হইতে দুঃখের রোদন চিরতরে অপসৃত হউক।

ওগো চাহিয়া দেখ—তোমার জীবসন্তানগণ মোক্ষ ত' দূরের কথা, ভোগ করিতেই জানে না। কেবল ভোগের আশা ও সঞ্চয় করিয়া, প্রতিমুহূর্তে বিনাশের চিন্তায়, অভাবের তাড়নায় উৎপীড়িত হইতেছে। পর্ণকুটিরবাসী কদন্নসেবী ভিক্ষুক হইতে, রাজপ্রাসাদবাসী পলান্নপুষ্ট ধনী পর্যন্ত সকলেই অভাবগ্রস্ত। কেহই পূর্ণ প্রাণে সরল হৃদয়ে বিষয় ভোগের যে পরিতৃপ্তি, তাহা পাইতেছে না। শুধু উপভোগ করিয়া যায়—ভোগের সমীপস্থ হয় মাত্র। প্রাণপাত পরিশ্রমে ভোগ্য সম্ভার সমাহরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে, ভোগ করিতেই জানে না। তাই বলি মা তুমি একবার ভোগময়ী মূর্তিতে দাঁড়াও, সন্তানগণ প্রাণ ভরিয়া একবার সত্যজ্ঞানে মাতৃস্নেহরূপ বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হউক, এ বিশ্বের দারুণ ক্ষুধার নিবৃত্তি হউক। তখন তুমি অনায়াসে জ্ঞানৈশ্বর্য সমন্বিত অপবর্গ-প্রদায়িনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবকে অমরত্বের আস্বাদ ভোগ করাইবে।

মাগো ! আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রাণে চাহিবার কিছুই নাই। চাহিবার কিছু বাকীও রাখ নাই, শুধু তোর চরণে প্রণত হইয়া, সকাতরে প্রার্থনা করি— 'হউক মাগো বিশ্বের মঙ্গল।'

———○———

ঋষিরুবাচ।

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥ ৩৩॥

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী॥ ৩৪॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে নৃপ সুরথ ! দেবতাগণ এইরূপে জগতের এবং আপনাদিগের জন্য দেবীকে প্রসন্না করিলে, ভদ্রকালী দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে ভূপ ! পুরাকালে দেবতাবৃন্দের শরীর হইতে ত্রিলোকমঙ্গলবিধায়িনী দেবী যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট এই বলা হইল।

ব্যাখ্যা। জগতের মঙ্গলের জন্য অনাদিকাল হইতে দেবতাবৃন্দ এইরূপে দেবীর প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে নানারূপ সাধনা—স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন। জগতের মঙ্গল হইলেই দেবতাগণের আত্মমঙ্গল সাধিত হয়। আত্মাই ত' জগদাকারে প্রকাশিত হইয়া নিয়ত ত্রিতাপ দুঃখ ভোগের কল্পিত অভিনয় করিতেছে। এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই আত্মারই প্রীতিসাধন বিধেয়। আত্মা—মা যে আমার নিত্যপূর্ণা, নিত্যতৃপ্তা ! তাহাতে যে কোন দুঃখেরই সংস্পর্শ নাই, ইহা বুঝিতে পারিলেই আত্মপ্রীতি লাভ হয় এবং তাহারই ফলে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়। যে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই, দেবতাগণের চেষ্টায় মঙ্গলময়ী ভদ্রকালী মা প্রসন্না হইলেন। দেবতাবৃন্দ বিশ্বমঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। মা 'তথাস্তু' বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

জীব ! সাধক ! ইহা কল্পনা নহে উপাখ্যান নহে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। যেরূপ ব্যষ্টিতে প্রতিজীব-হৃদয়ে এইরূপ সংঘটন হয়, ঠিক সেইরূপ সমষ্টিতেও দেবতা-বৃন্দ জগতের মঙ্গলের জন্য— মাতৃপ্রসন্নতার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন। যদি কাহারও হৃদয়ে এখনও ঐরূপ সংঘটন না হইয়া থাকে, অথচ ঐরূপ সংঘটন দেখিবার জন্য প্রাণ একান্ত লালায়িত হয়, তবে সরল প্রাণে অন্বেষণ কর, মায়ের নিকট প্রার্থনা কর ! সে মহাসম্মিলনক্ষেত্রের সন্ধান পাইবে। সে দেবলীলায় সহচর হইয়া জীবনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ? কিন্তু সে অন্য কথা—

বিজ্ঞানময় গুরু মেধস এইবার রাজা সুরথকে বলিলেন— হে নৃপ! তুমি মহামায়ার উৎপত্তি কার্য ও স্বভাব ইত্যাদির বিবরণ শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলে, পূর্বে মধুকৈটভ-নিধন প্রসঙ্গে তাঁহার তামসী মহাকালী মূর্তিতে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আর এইবার সেই মহামায়া কিরূপে দেবতাবৃন্দের শরীর হইতে

আবির্ভূত হইয়া রাজসী মহালক্ষ্মীমূর্তিতে ত্রিজগতে মঙ্গল বিধান করেন, কিরূপে জীবের সঞ্চিত কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা দেখিতে পাইলে ; কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই—

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৩৫॥
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে॥ ৩৬॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিস্তুতিঃ।

অনুবাদ। পুনরায় সেই মহামায়া শুম্ভ নিশুম্ভ এবং অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের নিধনপূর্বক লোকরক্ষা ও দেবতাবৃন্দের উপকারের জন্য যেরূপ গৌরীদেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে তোমাকে বলিতেছি। তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে শক্রাদিস্তুতি সমাপ্ত ।

ব্যাখ্যা। আবার মহামায়াকে গৌরী মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে হইবে। এখনও জীবের রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় নাই, এখনও জীব সম্যক্ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখনও দুষ্ট অসুর শুম্ভ নিশুম্ভ এবং তৎসহচরগণ জীবিত, এখনও দেবকুল সম্যক্রূপে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। এখনও লোকরক্ষা বা ধর্মরাজ্য পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাই মাকে আবার আসিতে হইবে। আবার গৌরীরূপে—মহেশ্বরের অঙ্কস্থা সৌম্যা শান্তিময়ী মূর্তিতে প্রকটিত হইতে হইবে। এস বৎস সুরথ ! এস জীব ! মায়ের সেই গৌরীমূর্তি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও। হৃদয়-আসন আরও পবিত্র, আরও বিধৌত কর। মা আসিতেছেন, দেখিও যেন মলিন আসনে উপবেশন করাইও না। দেখিও যেন মায়ের আমার সেই ভাবাতীত নির্মল বপুকে সংস্কারের ছিন্ন বসন পরাইতে যাইও না। ধীরে অবহিতচিত্তে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা কর। সত্যই মা আসিতেছেন।

মনোময়গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে — নামরূপের মোহ কাটিয়া গিয়াছে, নামরূপ যে সত্যই মা ব্যতীত অন্য কেহ নহে, ইহা অনুভব করিয়াছ—বুঝিতে পারিয়াছ। সুতরাং নিত্যনুতন আশা আকাঙ্ক্ষার উৎপীড়ন দূরীভূত হইয়াছে — সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এইবার প্রাণময় গ্রন্থিও ছিন্ন হইল। একমাত্র প্রাণই যে নাম রূপের আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল। প্রাণ বলিতে এখন আর একটুখানি সঙ্কীর্ণ অব্যক্ত চৈতন্যের আভাসমাত্র বলিয়া বোধ হয় না। সর্বব্যাপী মায়ের প্রাণ—গুরুর প্রাণই যে তোমার প্রাণরূপে অভিব্যক্ত, এইবার ইহা অনুভব করিতে পারিলে। তোমার বিষ্ণুগ্রন্থি বা প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইল। বিষয়মাত্রই যে প্রাণের মূর্তি ইহা দেখিতে পাইলে। এখন প্রাণ বলিতে বিশ্বময় চিৎসত্তা অনুভব করিতে পার। অতএব নাম রূপের প্রতি বিষয়ের প্রতি যে একটা মমত্ববোধ — অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষ, তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং সঞ্চিত কর্মসংস্কারগুলি এইবার দগ্ধ-বীজবৎ হইয়া পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদন বা ফলপ্রসব করিবার সামর্থহীন হইয়াছে। সাধক ! তুমি এতদিনে প্রাণে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে।

এইবার আমরা জ্ঞানময়গ্রন্থির সমীপস্থ হইব। ইহাই জীবনমহীরূহের শেষ বন্ধন। মায়ের কৃপায় এইটি বিচ্ছিন্ন হইলেই অজ্ঞান অন্ধকার সম্যক্ বিদূরিত হইবে, জীবের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সুরথ ! তুমি মা বলিয়া আত্মসমর্পণ যোগের সাহায্যে, মুক্তি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ ! দুইটি তরঙ্গ তোমার উপর দিয়া চলিয়া গেল। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি যে অভিমান ছিল, তাহা দূরীভূত হইল। আর একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। মায়ের কৃপায় তাহাও অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিবে । তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এস সাধক ! এস জীব ! সকলে সমবেত কণ্ঠে মা বলিয়া অগ্রসর হই। যিনি আমাদিগকে এই দুর্জয় অসুরের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ করিয়া, স্নেহময় বক্ষে ধরিয়া আনন্দ-মন্দিরে লইয়া যাইতেছেন, এস তাঁহার চরণে প্রণত হই। প্রণাম ব্যতীত আমাদের আর কি আছে ! এস, অভিমানের উচ্চশির সম্যক্ অবনত করিয়া বলি—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ নামক দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

মাতৃ-স্নেহ

সাক্ষাৎকার—মিলন

পশ্যন্তু সর্বে অমৃতস্বরূপম্ ।
গচ্ছন্তু সর্বে অমৃতং নিধানম্ ॥

হে আনন্দময় সন্তানগণ ! তোমরা সত্যের মধুময় আহ্বানে প্রবুদ্ধ হইয়াছ ! প্রাণের অমৃতময়-পরশে পুলক কণ্টকিত শরীরে উত্থিত হইয়াছ ! এইবার এস, আমার আনন্দময় সত্তা প্রত্যক্ষ কর । দেখ, আমি মধুময়, আমি আনন্দময়, আমি অমৃত, আমি অভয়, আমি নিত্য-মুক্ত । দেখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই আমার স্বরূপ । দেখ, একমাত্র পূর্ণ আনন্দময় সত্তা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই । দৃশ্যরূপে, জগৎরূপে, অনাত্মরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, আনন্দই উহার নিমিত্ত, আনন্দই উহার উপাদান । অমৃতময় আমিই সর্বত্র দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে প্রকাশ পাইতেছি । দেখ, শোক দুঃখ মোহ অভাব আর্তনাদ, এ সকলের মধ্যেও আমি—নিত্যানন্দময় পুরুষ নিত্যই আনন্দপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছি ।

যাহারা এই অভয় অমৃতস্বরূপ 'আমির' চরণে স্বকীয় পৃথক্ সত্তাটি একেবারে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহারাই আমাকে বুঝিবে, তাহারাই আমাকে দেখিবে, এবং তাহারাই আমাতে মিলাইয়া যাইবে । সত্যের আহ্বান যাহাদের কর্ণে পৌঁছিয়াছে, প্রাণের পরশ যাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, এস তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হও, এই দেখ, তোমাদেরই জন্য আনন্দময় মাতৃ-বক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে । এস, দেখ, আত্মহারা হও ! প্রবেশ কর ! মিলাইয়া যাও !

এখানে আমি—বাক্য মনের অতীত—সত্তামাত্র নির্বিশেষ কেবল আনন্দস্বরূপ ; এখানে জীব নাই, জগৎ নাই, দৃশ্য নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না, অথচ অভাব বলিয়া কিছুই নাই ; কেবল পূর্ণ ! পূর্ণ ! পূর্ণ !

তারপর দেখ—আমি বহুত্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় লীলার আনন্দরসে মগ্ন, সর্বজ্ঞ সর্বভূতাধিবাস পরমেশ । আর একটু দৃষ্টি প্রসারিত কর, দেখ— সেই আমি, সেই পূর্ণ জ্ঞানময়, পূর্ণ আনন্দময় আমিই আবার অল্পজ্ঞান ও অল্প আনন্দ লইয়া—অজ্ঞান ও নিরানন্দ লইয়া, কেমন জীবত্বের অভিনয় করিতেছি ! এই ত্রিবিধ স্বরূপে আমাকে পাইয়া যাহারা ধন্য হইবে, কৃতকৃত্য হইবে, তাহারা একবার সত্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠ—'**অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্বানি ভূতানি মধু।**' তারপর আমার বিশ্বমূর্তির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে বল— '**ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্বানি ভূতানি মধু।**'

পুত্রগণ ! তোমরা সত্যে ও প্রাণে—চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হও । মাতাপুত্রসম্বন্ধ-বিহীন '**একমেবাদ্বিতীয়ম্**' তত্ত্বে উপনীত হও। '**অয়মস্মি**' বলিয়া সাধ্যসাধনার পরপারে চলিয়া যাও । শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ সফল হউক !

———০———

উত্তর চরিত

ঋষিচ্ছন্দঃ—উপোদ্‌ঘাত

উত্তরচরিতস্য রুদ্রঋষির্মহাসরস্বতী দেবতা
অনুষ্টুপ্ ছন্দোভীমাশক্তির্ভ্রামরীবীজং
সূর্যস্তত্ত্বং সামবেদস্বরূপং
মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ।।

উত্তর চরিত —শুম্ভবধ । রুদ্র ইহার ঋষি । রুদ্র —প্রলয়ের দেবতা । যাবতীয় জগদ্ভাব অর্থাৎ যাবতীয় খণ্ডজ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রে বা বিজ্ঞানময় মহেশ্বরে বিলীন হয় । জীবত্বের শেষ গ্রন্থি বা অস্মিতারূপ শুম্ভাসুর অখণ্ড জ্ঞানেই নিঃশেষরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় । তাই প্রলয়ের দেবতা রুদ্র এই উত্তর-চরিতের ঋষি । মহাসরস্বতী ইহার দেবতা— জ্ঞানময়ী পরা প্রকৃতির শুভ্রা সত্ত্বগুণময়ী সরস্বতী মূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপ আত্মসত্তার অববোধ ও জীবভাবের সম্যক্ অবসান হয়, তাই মহাসরস্বতী এই চরিত্রের দেবতা । ইহার ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ । মায়ের এই উত্তর চরিতে, যে সাধক অবগাহন করেন, তাঁহার প্রাণপ্রবাহ বা প্রাণায়াম অনুষ্টুপ নামক বৈদিক প্রশান্ত ছন্দের অনুরূপ স্পন্দন-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

ভীমাশক্তি—ভয়ঙ্করী প্রলয়কারিণী মহাশক্তির অঙ্কেই জীবত্বের অবসান হয় ; তাই ভীমা ইহার শক্তি । ভ্রামরীবীজ—অসংখ্য ষট্‌পদ-পরিবৃত মূর্তির নাম ভ্রামরী ; ইনি অরুণাখ্য অসুরকে নিহত করিয়া থাকেন । এই ভীমা ও ভ্রামরীতত্ত্ব এই চরিতেই পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে ।

সূর্য ইহার তত্ত্ব— সূর্য শব্দের অর্থ প্রকাশস্বরূপ বস্তু—জ্ঞান । যে বিমল বোধের উদয়ে অনাদি কালের অজ্ঞান-তিমির দূরীভূত হয়, সেই বোধই এই উত্তর চরিতের তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয় । সামবেদ— সমস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ সম্যক্ সাম্যাবস্থাই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ ; মহাসরস্বতী জ্ঞানময়ী দেবীর প্রীতির নিমিত্তই এই চরিতের বিনিয়োগ ।

——o——

রুদ্রগ্রন্থিভেদ—শুম্ভবধ

ঋষিরুবাচ

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—পুরাকালে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় মদ ও বলের প্রভাবে, শচীপতির ত্রিলোক এবং যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নিহত হইয়াছে। সাধকের সঞ্চিত কর্মসংস্কার-জন্য চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্ত হইয়াছে। কামনার—বিষয় বাসনার উৎপীড়ন নাই ; ভবিষ্যতে যে উৎপীড়ন আসিতে পারে, এরূপ আশঙ্কাও আর নাই। প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদ হইয়াছে। সাধক এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে—অন্তরে প্রাণরূপে যাহার উপলব্ধি হয়, বাহিরে তাহাই ব্যক্ত বিশ্বরূপে উদ্‌ভাসিত। যে দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়, সেই দিকে পরিপূর্ণ প্রাণময় সত্তা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। জড়ত্ববোধ অপনীত-প্রায়। একমাত্র পরম প্রিয়তম প্রাণ বা চৈতন্য ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই। সাধারণের চক্ষুতে যাহা জড়রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা যে বাস্তবিক জড় নহে, একথাটা এখন আর বাক্যমাত্রে অর্থাৎ মাত্র বাচনিক জ্ঞানে পর্যবসিত নাই। গুরুপদিষ্ট উপায়ে বিশ্বময় প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ সাধনার সাহায্যে, জড়া প্রকৃতি এখন চিন্ময়ী মাতৃমূর্তিরূপে প্রত্যক্ষীভূতা। জীবমাত্রই যে মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্নশিশু, এ কথা এখন আর বিচারের সাহায্যে, যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে হয় না। স্মরণমাত্রেই প্রাণময় মাতৃস্বরূপ উদ্‌ভাসিত হয়। আর ভয় বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বময় মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনে জীব-কর্তৃত্ববোধ অস্তমিত-প্রায়। সাধক এখন সর্ববিধ সংসার চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছে। আহো! বহু জন্মার্জিত সুকৃতি—অহৈতুক অপরিসীম গুরুকৃপাই জীবকে—সাধককে এইরূপ শান্তিময় অবস্থায় আনয়ন করে।

কিন্তু, এখনও প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ প্রক্ষীণ হয় নাই। **'অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ'** কি যেন এক অজ্ঞেয় মহতী শক্তির প্রবল অণুপ্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্মের আরম্ভ হইয়া পড়ে। সাধক বেশ জানে যে **'ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ'** তথাপি কর্তৃত্ববোধ ক্ষণেকের তরে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সমস্ত জ্ঞানকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত যে মাতৃ-অঙ্ক লাভ বা পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য এত প্রয়াস, এত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সুঃখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত, কই ঠিক সে জিনিষটি ত' এখনও উদ্ভাসিত হয় নাই! এই অবস্থায় সাধক মনে করে—সবই পাইয়াছি, সবই বুঝিয়াছি, তবু যেন কি পাই নাই, যেটুকু না পাইলে জীবনের যথার্থ পরিপূর্ণতা আসে না, সেই জিনিষটি এখনও ত' সম্যক্ প্রকটিত হয় নাই। যাঁহাকে বুঝি অথবা বুঝি না, কিছুই বলা যায় না, যাঁহাকে জানি অথবা জানি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কই, সে জিনিষ ত' এখনও সম্যক্ উদ্ভাসিত হয় নাই! যাঁহার কথা বলিতে গিয়া উপনিষদের ঋষি প্রশান্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন— **'নো ন বেদেতি বেদ চ'** যে বলে আমি তাঁহাকে জানিয়াছি সে তাঁহাকে জানে না, কারণ **'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'** যিনি স্বয়ংই বিজ্ঞাতা তাঁহাকে কি প্রকারে বা কিসের দ্বারা জানিবে? আর যিনি বলেন—'আমি তাঁহাকে জানি না' তিনিও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। ওগো, যিনি আমার 'আমি' সাজিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানি না বলিলে যে মিথ্যা কথা বলা হয়। তবে কে তিনি? যাঁহাকে জানি বলা যায় না, জানি নাও বলা যায় না, তিনি কে? তিনি যতই অবাঙ্‌মনোগম্য হউন, যতই ভাবাতীত হউন, যতই দুরধিগম্য হউন, তবু কিন্তু তাঁহাকে চাই! তাঁহাকে চাই! হাঁ সত্যই কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? হ্যাঁ সত্যিই পাওয়া যায়!

যতদিন এই পাওয়া না পাওয়া, জানা না জানার ধাঁধা

সম্যক্ বিদূরিত না হয়, ততদিন সাধক-হৃদয়ের দীনতা কিছুতেই সমূলে দূরীভূত হয় না ; অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে, অথবা হইতেই পারে না । কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, সুতরাঃ যতদিন সে পুনরায় ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে না পারিবে, ততদিন এ অতৃপ্তি দূর হইতেই পারে না । অতৃপ্তিই ত' মায়ের আমার গতিমূর্তি । মা ঐ মূর্তিতে প্রতি জীবহৃদয়ে নিত্য বিরাজ করেন বলিয়াই ত' আমরা দিনের পর দিন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মায়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারি । এই অতৃপ্তির প্রভাবেই ভবিষ্যৎ ও সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হইলেও, দুরপনেয় প্রারব্ধ-সংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত জীব কিছুতেই স্থির হইতে পারে না । প্রারব্ধটা যে দুঃখ নয়, উহা যে আনন্দেরই লীলা-বিলাসমাত্র, ইহার সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্তই প্রারব্ধ সংস্কারগুলি দুঃখদায়ক বলিয়া বোধ হইতে থাকে । ইহাই রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি । পরে এ সকল কথা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে ।

এই বিশ্ব যে আনন্দ ধাতু ! আনন্দ ইহার উপাদান, আনন্দ ইহার নিমিত্ত এবং আনন্দই ইহার গম্য বা লক্ষ্য ; এইরূপ উপলব্ধি সাধকের এখনও হয় নাই ! সত্যপ্রতিষ্ঠার বলে সৎ-এর সন্ধান মিলিয়াছে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে চিৎ-এর সন্ধান মিলিয়াছে, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই বড় সাধের মনুষ্যজীবনের চরম চরিতার্থতা উপস্থিত হয় ।

বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে দাঁড়াইলেই এই বিশ্ব, মাত্র বোধস্বরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে । ঐ বোধ যে আত্মাই, এইরূপ অনুভূতি যতদিন প্রকাশিত না হয়, ততদিন উহা—ঐ বোধস্বরূপ বস্তু যেন নীরস, যেন আনন্দহীন, এইরূপই প্রতীত হয় । বাস্তবিকই উহা যে রসহীন শুষ্ক বোধমাত্র নহে, উহা যে সত্য সত্যই আনন্দময়, চিদ্বস্তুই যে আনন্দঘন আত্মা, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি ভেদ হয় । তখন জীব প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও উহাকে আর দুঃখদায়ক বলিয়া মনে করিতে পারে না । বিশ্বটা যেন আনন্দ দিয়া গড়া, স্থূল দেহটা যেন আনন্দময় পরমাণুসমষ্টি, এইরূপই মনে হইতে থাকে । এই অবস্থায় জীবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য, প্রতি নিশ্বাসটি পর্যন্ত আনন্দময় স্ফুরণরূপে অনুভূত হইতে থাকে ।

জীব কিরূপে এই তত্ত্বে, এই আনন্দময় আত্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে, তাহাই বিজ্ঞানময় গুরু মহর্ষি মেধস শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ প্রসঙ্গে জীবাত্মরূপী সুরথকে শুনাইতেছেন বা দেখাইয়া দিতেছেন । পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মহিষাসুরবধের শেষে **'তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে'** বলিয়া ঋষি পরবর্তী রহস্য বা উত্তম চরিত্র বর্ণনার আভাস দিয়াছিলেন, এইবার সেই প্রতিশ্রুত বিষয়ের উপদেশ আরম্ভ করিলেন তাই অধ্যায়ের প্রথমেই 'ঋষিরুবাচ' উক্ত হইয়াছে ।

গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ ঠিক এইরূপই হইয়া থাকে । যতদিন শিষ্য যথার্থ আনন্দময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, ততদিন গুরু শিষ্যকে প্রশ্ন করিবার অবসর দেন না । যখন অধিকারী হয়, যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখন বিনা জিজ্ঞাসায় শিষ্যহৃদয়ের সমস্ত সশংয় স্বয়ংই নিরাস করিয়া দেন । অনেক শিষ্য হয়ত শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইবার পূর্বেই গুরুকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া উদ্‌বাস্ত করিয়া তুলেন ; যেন একদিনেই সমস্ত সংশয় দূর করিয়া লইবেন ; কিন্তু তাহা হয় না—এ সকল প্রাণের জিনিষ, ইহা গুহ্যতম রহস্য, ইহা সুদুর্লভ, সুতরাং শুধু উপদেশ বা কেবল পুস্তকপাঠে কখনও এই আত্মবস্তুলাভ হয় না । আরে, সন্তানের কখন যে যথার্থ ক্ষুধা পায়, এবং কিরূপ খাদ্য কোন্ সন্তানের পক্ষে উপযোগী, ইহা সন্তান অপেক্ষা মা-ই যে বেশী বুঝিতে পারেন ! মাতৃরূপী গুরুর প্রতি কর্তব্য নির্দ্ধারণের ভার না দিয়া যদি কেহ স্বয়ংই সে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে যে অভিমান রহিয়া গেল ! অভিমান থাকিতে গুরুকৃপার উপলব্ধি হয় না, গুরুকৃপা ব্যতীত মোক্ষলাভ একান্ত অসম্ভব ।

দেখ, সাধক-প্রবর অর্জুন — স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার গুরু, তিনি গীতার বিভূতিযোগ পর্যন্ত উপদেশ পাইয়াও কৃতঞ্জলিপুটে বলিলেন 'হে যোগেশ্বর ! হে প্রভো ! যদি তুমি আমাকে বিশ্বরূপ-দর্শনের যোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে তোমার সেই অব্যয় স্বরূপটি দয়া করিয়া একবার আমাকে দেখাও' । কি সুন্দর ! ভাব দেখি কেমন নিরভিমান, কত বিনীত, কত শ্রদ্ধাবানের ভাবটি অর্জুনের এই কথাটির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শিষ্য যখন ঠিক এইরূপ আত্ম-কর্তৃত্ব-বোধ সম্যক্ ভাবে গুরুর চরণে অর্পণ করিতে পারে, তখনই দেখিতে পাই

—তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, গুরু স্বয়ংই যখন যাহা আবশ্যক, তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শিষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, গুরু স্বয়ংই শিষ্যের যাহা করণীয় তাহা করাইয়া লয়েন ; সুতরাং অধীরতা কিংবা হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া উচ্চস্তরীয় সাধনা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, ফললাভে যে একটু বিলম্ব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? কিন্তু সে অন্য কথা—

এই শুম্ভবধ বা মায়ের উত্তম চরিত্র অতিশয় গহন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, উচ্চাধিকারী ব্যতীত, নির্মল বুদ্ধি ব্যতীত এ রহস্যে প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তাই এস সাধক, আমরা সর্বাগ্রে আমাদের একান্ত আশ্রয় মাতৃচরণে প্রণত হইয়া মায়ের কৃপা ভিক্ষা করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ নির্মল করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমরা এ অপূর্ব রহস্য যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

মা গো! শুনিয়াছি গুরুকৃপা শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা, এই ত্রিবিধ কৃপা ব্যতীত কেহই মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আবার এই ত্রিবিধ কৃপারূপে একমাত্র তুমিই আবির্ভূত হও। তুমিই গুরু, তুমিই শাস্ত্র, আবার তুমিই কৃপা! শাস্ত্রবাক্যগুলি যে জড়লিপিমাত্র নহে, উহা যে প্রাণময়, চৈতন্যময়, নিত্য চৈতন্যময়ী মা, তুমিই যে শাস্ত্রবাক্যরূপে প্রকটিত হইয়া আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ জীবের নয়ন জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলন করিয়া দিয়া থাক! ইহা বুঝিতে পারিয়াই মা তোমার করুণা স্মরণ করিতেছি, করুণাই তোমার মূর্তি, তুমি সন্তানবৎসলা জননী। তুমিই আমাদিগকে দুর্গম পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত কর। যতদিন তুমি জীবকে বিশিষ্টভাবে শাস্ত্রবাক্যসমূহের চৈতন্যময়ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা প্রদান না কর, ততদিন বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হয় না। তাই মা, তুমি ধীরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদিগকে এই অতি গহন তত্ত্বে অবগাহন করিবার সামর্থ্য প্রদান কর, আমরা সমস্ত সংশয়ের—অজ্ঞানের পরপারে চলিয়া যাই। মা মা মা!

শুম্ভ—অস্মিতা। শোভার্থক শুন্‌ভধাতু হইতে শুম্ভ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিচিত্র বিশ্ব, এই স্ত্রী-পুত্রাদি সংসার, এই ধন যশঃ খ্যাতি, এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, এই সকলই অস্মিতায় অবস্থিত। জাগতিক পদার্থ-সমূহ অস্মিতরাই এক একটি ব্যূহমাত্র। অস্মিত কি ? অস্মি শব্দের উত্তর ভাবার্থে তা প্রত্যয় করিয়া অস্মিতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'আমি আমি' এই ভাবটির নাম অস্মিতা। জীব যাহা কিছু করে, যাহা কিছু ভাবে, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি— 'আমি' ভাব একান্ত বিজড়িত ; ঐ আমি ভাবটির উপরেই এই সংসার বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। মনে রাখিও—ইহা দেহাত্মবোধের অহঙ্কার স্বরূপ 'আমি' নহে। উহা বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব। সাধক যখন বুদ্ধিতে বা বিজ্ঞানময় কোষে আমিত্বকে উপসংহৃত করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আমি বলিলেই সাধারণ লোকের যেরূপ স্থূল দেহ বা মাংসপিণ্ডটা মনে পড়িয়া যায়, সাধক যখন সেইরূপ 'আমি' বলা মাত্র তাহার বিজ্ঞানময় আমিকে ধরিতে পারে, অর্থাৎ দেহাত্মবোধের ন্যায় বিজ্ঞানাত্মবোধ সুদৃঢ় হয়, তখনই এই অস্মিতার স্বরূপ উপলব্ধিযোগ্য হয়। সাধন-সমর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে স্থানে যাইবার জন্য, যে কেন্দ্রে অবস্থান করিবার জন্য সাধকগণ ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রটি যখন তাঁহাদের আয়ত্তীভূত হয়, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই বিজ্ঞানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তখনই এই অস্মিতার সন্ধান পাইয়া থাকেন। অস্মিতার স্বরূপ আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে।

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে—দৃক্‌শক্তি পুরুষ এবং দর্শন শক্তি বুদ্ধি। এতদুভয়ের যে অভিন্নত্ব প্রতীতি, তাহারই নাম অস্মিতা। অর্থাৎ যখন বুদ্ধিই আত্মারূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলা যায়। ইহাও একপ্রকার ক্লেশ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশের ইহা অন্যতম। স্থূল কথায় বুদ্ধি এবং আত্মার যে অভিন্নত্ব প্রতীতি, তাহাই অস্মিতা নামক ক্লেশ। ইহাই দেবীমাহাত্ম্যের ভাষায় মহাসুর শুম্ভ। বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন এই সকলই বুদ্ধিপর্যবসানা। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং মন, ইহাদের যত কিছু চাঞ্চল্য বা ক্রিয়াশক্তি, সে সকলই বুদ্ধিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। বুদ্ধির উপরে আর বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই। এই বুদ্ধি ও অস্মিতা অভিন্ন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ও আমিত্ববোধ সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। নিশ্চয়ত্ব এবং আমিত্ব প্রতীতির কোনও বিশেষ ভেদ নাই। ফলগত বা কার্যগত বিভিন্নতাকে লক্ষ্য

করিয়াই বুদ্ধি ও অস্মিতারূপ বিভিন্ন ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

সাধকগণ সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে যখন এই বুদ্ধিতত্ত্বে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন, সেই সময় কিছুদিন এই বুদ্ধি বা অস্মিতাকেই আত্মা বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। যদিও মাতৃচরণাশ্রিত সাধকগণের এরূপ ভ্রান্তি বা বিপর্যয়-জ্ঞান খুব বেশী দিন থাকে না, মা স্বয়ংই এই সূক্ষ্মতম ক্লেশরূপী মহাসুরকে নিধন করিয়া আপনার যথার্থ স্বরূপটি উদ্ভাসিত করিয়া দেন, তথাপি যতদিন সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত না হয়, ততদিন সাধককে এখানেও বেশ একটু উৎপীড়িত হইতে হয়। অবশ্য এই উৎপীড়ন বাহিরে কেহ বুঝিতে বা লক্ষ্য করিতে পারে না ; মাত্র সাধক নিজের প্রাণেই এই অস্মিতাক্লেশের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন । এই অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে সাধকের মনে হয় সবই পাইয়াছি, সবই বুঝিয়াছি, বহুকালব্যাপী জন্মমৃত্যুর ধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিজের একটা বিশিষ্টতাও লাভ হইয়াছে। এ সকলই সত্য, কিন্তু যেখানে উপস্থিত হইলে সর্ব বলিয়া কিছু থাকে না, সকল ক্লেশ চিরতরে বিদূরিত হয়, সকল অজ্ঞান চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হয়, কই সে স্থানে ত' এখনও যাওয়া হয় নাই । সে যে আমার মায়ের স্নেহশীতল অঙ্ক, সে যে আমার সর্বভাবাতীত ত্রিগুণরহিত আনন্দময় মাতৃবক্ষ ; সে যে আমার সর্বভয়-নাশক অমৃতময় অভয়পদ, যেখানে একবার গেলে এই জগৎ-ধাঁধা চিরতরে অবসিত হয় । জগৎ বলিতে, জীব বলিতে, আমি বলিতে কিছুই থাকে না, কখনও ছিল কিংবা থাকিবে, এরূপ ধারণাও করা যায় না, সে যে আমার মাতৃবক্ষ । ওঃ ! সে কি সুখময়, মধুময়, আনন্দময়, রসময় স্থান ! সে যে আমি-বর্জিত আমি গো ! সাধক, যতদিন তুমি সেখানে যাইতে না পারিবে, যতদিন এই জগৎ-সত্তার পরপারে ত্রিগুণাতীত মাতৃবক্ষে তোমার ব্যষ্টি আমিটিকে চিরতরে মিলাইয়া দিতে না পারিবে, ততদিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি এবং সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি ঐশ্বর্যলাভ করিলেও তোমার বুকের অতৃপ্তি মিটিবে না, হৃদয় জুড়াইবে না, ক্লেশের অবসান হইবে না। ততদিন তোমাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অসুর-অত্যাচার সহ্য করিতেই হইবে।

সে যাহা হউক, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদের প্রসঙ্গে সাধককে যে স্থানে উপনীত হইবার জন্য বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যে আমিত্বকে লাভ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এখানে—এই উত্তম চরিত্রে কিন্তু তাহাই অসুররূপে বর্ণিত, উহাকেও নিধন করিতে হইবে । পূর্বে যাহা উপাদেয়রূপে সাধ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিল, এখানে তাহাই—হেয়রূপে বর্জনীয়রূপে ব্যাখ্যাত হইবে । সাধনারাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে । আজ যাহা একান্ত আশ্রয়নীয়, কিছুদিন পরে তাহাই সর্বদা বর্জনীয় হইয়া পড়ে । আর দিন দিন যদি এইরূপ বর্জনের ভাবটাই না আসে, তবে আর সাধনা কি ? সর্বত্বের পরিত্যাগ ও একত্বের লাভ, ইহাই ত' সাধনা । যতদিন সেই অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইতে না পারিবে, ততদিন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় বর্জন হইবেই । মাতৃ-চরণে সম্যক্ আত্মসমর্পণকারী সন্তানগণের এইরূপ বর্জন, হঠকারিতা পূর্বক ইচ্ছাপূর্বক করিতে হয় না, মায়ের কৃপায় আপনা হইতেই হইয়া থাকে । সে যাহা হউক, ক্রমে এই অস্মিতা বা মহাসুর শুম্ভের স্বরূপ আরও বিশদ্রূপে ব্যাখ্যাত হইবে, এবং তখন ইহা বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হইবে।

নিশুম্ভ—মমতা । 'আমার আমার' এই ভাবটির নাম মমতা । সাধারণ কথায় মমতা বলিলে যাহা বুঝায়, ইহা কিন্তু সে মমতা নহে । ইহা বিজ্ঞানময় কোষের মমতা । সে সূক্ষ্মতত্ত্বে যে মমত্ববোধ ফোটে তাহাই নিশুম্ভ । যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা এ মমতার স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ শুধু মস্তিষ্ক ধর্ম দিয়া বুঝিলে ইহার কিছুই বুঝা হয় না । ইহার উপলব্ধি আছে । 'আমার জ্ঞান' 'আমার বোধ' বলিলে যে মমতার আভাস পাওয়া যায়, ইহা সেই মমতা । অস্মিতা যেরূপ অহং-এর সূক্ষ্মতম অবস্থা, মমতাও সেইরূপ সূক্ষ্মতম একটি ভাববিশেষ । ইহারা পরস্পর সহোদর । যেখানে অস্মিতা সেইখানেই মমতা । তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়ের প্রায় একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।

শচীপতি—মায়োপহিত চৈতন্য । যদিও সাধারণতঃ শচীপতি শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকেই বুঝায়, তথাপি এখানে

ঐ শব্দটি ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বোধকরূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন— **'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'** ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলেন। শচী শব্দের অর্থ মায়া ; তাঁহার পতি, অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য। মন্ত্রে শচীপতি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ করিলে, পাছে মায়োপহিত ব্রহ্ম না বুঝাইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝাইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই মহর্ষি মেধস এস্থলে শচীপতি শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। শচীপতি শব্দে সাংখ্যের ভাষায় মহত্তত্ত্ব-প্রতিবিম্বিত পুরুষ, ভগবদগীতার ভাষায় অক্ষর পুরুষ এবং বেদান্তের ভাষায় কূটস্থ চৈতন্য বুঝা যায়। শচীপতি শব্দের এইরূপ অর্থ করাতে, অনেকের মনে সংশয় আসিতে পারে যে, উহা কাল্পনিক অর্থমাত্র। কিন্তু উপরের লিখিত শ্রুতি প্রমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রশব্দ ব্রহ্মবাচক। শ্রুতি অনেক স্থলে ব্রহ্ম অর্থেই ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত **'শচীপতেঃ ত্রৈলোক্যম্'** শচীপতির ত্রিলোক বলিলে, কোনরূপেই উহার দেবরাজ অর্থ করা চলে না ; যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকপতি নহেন, মাত্র স্বর্গাধিপতি। ত্রিলোকপতি স্বয়ং পরমেশ্বর। ত্রিলোকপতি শব্দের যথার্থ তাৎপর্য ত্রিবিধ প্রকাশ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই ত্রিবিধ প্রকাশকেই ত্রিলোক বলা হয়। এই ত্রিবিধ প্রকাশের অধীশ্বর একমাত্র মায়োপহিত চৈতন্য বা সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই পারে না।

যাহা হউক, মন্ত্রে দেখিতে পাইতেছি— শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়ই অসুর অর্থাৎ সুরভাবের বিরোধী। ইহারা 'মদবলাশ্রয়াৎ' মদ এবং বলের আশ্রয় পূর্বক শচীপতির ত্রিলোক এবং যাবতীয় যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল। মদ—গর্ব, বল—সামর্থ্য। অস্মিতা ও মমতার ধর্মই মদ বা গর্ব। এই সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থান করিতেছে, এইরূপ গর্ব ভাব শুম্ভ নিশুম্ভের একান্ত স্বাভাবিক। তারপর বল বা সামর্থ্য—যাহারা বুঝিতে পারে যে, আমিই সমস্ত জগতের ধর্তা পাতা সংহর্তা, তাহাদের সামর্থ্য যে কত বেশী, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রায়োজন হয় না।

এখন শচীপতির ত্রিলোক এবং যজ্ঞভাগহরণ কথাটা বুঝিতে পারিলেই এই প্রথম মন্ত্রের অর্থ একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবে। কথাটা একটু কঠিন, তাই আর একটু বিশদরূপে উহার আলোচনা করা যাইতেছে। স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক ত্রিলোকের যথার্থ অধিপতি শচীপতি অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য, অস্মিতা নহে। অস্মিতা বুদ্ধিতত্ত্ব, উহাও দৃশ্য জড় বা মায়িক। চৈতন্যের সত্তায়ই উহার সত্তা, নতুবা অস্মিতা বলিয়া কোন পৃথক্ সত্তাই নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু অস্মিতা অসুর ; সে আপনাকে সর্বময় কর্তারূপে দেখিতে পায়। আমাতেই ত' জগৎ অবস্থিত, আমিই ত' সর্বভাবের একমাত্র অধিষ্ঠাতা, আমার আবার একজন প্রকাশক আছেন, ইহা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে না, তাই অজ্ঞানবশতঃ ত্রিলোকের আধিপত্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, যজ্ঞভাগও হরণ করে। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে কর্মরূপে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে সমস্ত কর্ম এবং তাহার ফল সে আপনাতেই দর্শন করে। **'ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি'** বলিয়া সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়, যাবতীয় কর্ম ও তাহার ফল আপনাতেই দর্শন করে ; কিন্তু সে বুঝিতে পারে না যে, এই আমি শব্দে আমি-বর্জিত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ আত্মরূপী আমিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি বলিলে যথার্থ যাঁহাকে বুঝা যায়, সেই পরমাত্মাকে পরিত্যাগ পূর্বক, অর্থাৎ যথার্থ পরমাত্মস্বরূপ পরিগৃহীত না হওয়া হেতু, অস্মিতাই আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাই শুম্ভ অসুরের যথার্থ রহস্য। যজ্ঞভাগ শব্দের অর্থ— হবিঃ বা অমৃত। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য উপনিষদের ভাষ্যে **'লোকাঃ কর্মসুচামৃতম্'** ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অমৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কর্মফল'। যাবতীয় কর্মফলরূপ যজ্ঞভাগ বা অমৃত অস্মিতা রূপ অসুর আপনাতেই অবস্থিত দেখিতে পায় ; তাই মন্ত্রে **'ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতাঃ'** বলা হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥২॥
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ ॥৩॥

অনুবাদ। সেই উভয় অসুর সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন এবং বহ্নির আধিপত্য নিজেরাই

অধিকার করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। সাধক যখন অস্মিতায় উপনীত হয়, তখন দেখিতে পায়, বেশ উপলব্ধি করিতে পারে— সূর্য, চন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাবর্গ আমারই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র (দেবতাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ্‌ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তদধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ, সকলই অস্মিতার এক একটি ব্যূহমাত্র। বাহ্য পদার্থে সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে সাধক এমনই একটা সত্তায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখান হইতে আর রূপরসাদি বিষয়, কিংবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অথবা স্মৃতি, কল্পনা নিশ্চয়াদি বৃত্তিগুলিকে আর আমি হইতে পৃথক কোন পদার্থরূপে মনেই করিতে পারে না। এ সকল যে আমারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। ঐ দূরবর্তী সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যন্ত আমাতেই অবস্থিত ; এই স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, এই স্থূলদেহ, সকলই আমার সত্তায় সত্তাবান্। আমিই এই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছি। আমি উহাদিগকে বোধ করিতেছি, তাই উহারা আছে। আমার বোধ ব্যতীত উহাদের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমিই উহাদের প্রভু, ধাতা ও সংহর্তা। বহু সুকৃতিবলে, কঠোর সাধনার ফলে, সাধক এইরূপ ঈশ্বর-ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে ; কিন্তু হায় ! উহাও আসুরভাব বা অজ্ঞানমাত্র ; কারণ সমগ্র জগৎ যাহা হইতে জাত, যাহাতে পরিধৃত এবং যাহাতে লীন হয়, সে বস্তু আমি নহি, অস্মিতা নহে, আত্মা— মা আমার। অস্মিতাও দৃশ্যমাত্র—উহা আত্মারই সত্তায় সত্তাবান, কিন্তু সে যথার্থ সত্তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আপনাকেই জগৎকর্তা বলিয়া বুঝিয়া লয়—তাইত সে অসুর।

এই অবস্থাটা ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের অবস্থার সহিত কতকটা তুল্য বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন —'জগৎ বলিয়া, দৃশ্য বলিয়া বা ভোগ্য বলিয়া পৃথক কিছুই নাই, আমাদের ক্ষণ-পরিণামি বিজ্ঞানসমূহ পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে।' সে যাহা হউক, সাধক যতদিন ঠিক 'আমি' বস্তুটিকে ধরিতে না পারে, ততদিন ঐরূপ ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। অধিকাংশ সাধকেরই এইরূপ হইয়া থাকে।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—আমি শব্দের দুইটি অর্থ। একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। আমি বলিলে, বোধময় বিজ্ঞানময় সর্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে আমিটি লক্ষিত হয়, উহাই আমির বাচ্যার্থ। আমরা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত অবস্থায় যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমি আমি ভাব প্রকাশ পায়। সর্বভাবের সহিত অন্বিত অর্থাৎ একান্ত মাখামাখি ঐ যে আমিটি, উহাই আমি শব্দের বাচ্যার্থ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সুষুপ্ত অবস্থায় ত আমরা কিছু করি না, কিছু ভাবিও না ; সুতরাং তখন আমিত্ববোধও থাকে না। বাস্তবিক তাহা নহে, সুষুপ্ত অবস্থায়ও 'আমরা কিছু জানি না' এইরূপ ভাবিয়া থাকি। সুতরাং তখনও 'আমি অজ্ঞান' এইরূপ জ্ঞান থাকে। সে যাহা হউক, এই বিবিধ অবস্থায় সর্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে আমিটিকে পাওয়া যায়, উহাই আমি শব্দের বাচ্যার্থ।

আমির আর একটি অর্থ আছে, উহাকে লক্ষ্যার্থ কহে। সেইটি সর্বভাবের অতীত। সর্বভাবের সহিত তাহার যে কোনও সম্বন্ধ আছে, ছিল বা থাকিবে, এরূপ প্রতীতিই হয় না। সেই ভাবাতীত, বাক্যমনের অগোচর আত্মরূপী আমি যে আছেন, তাহা ঐ সর্বভাবের সহিত অন্বিত আমিটিতেই বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং আমি বলিলে এই বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মবস্তুটিই লক্ষিত হয়। মনে রাখিও—এই যে আমিত্ব প্রতীতি, তাহাও সেখানে নাই ; কারণ, যেখানে তুমি নাই, সে নাই অর্থাৎ দৃশ্য বা জ্ঞেয়বস্তুর সম্পূর্ণ অভাব, সেইখানে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বরূপতঃ আমি হইলেও আমি শব্দটির প্রয়োগ সেখানে কিছুতেই করা যায় না। এইজন্যই পূর্বে আমি-বর্জিত আমি বলিয়া আত্মবস্তুর ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এস, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই বিষয়টি আরও সরলভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। একজন বলিল, **'অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্'** অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একশত হস্তী আছে। এস্থলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে শত হস্তী থাকা একান্ত অসম্ভব বলিয়া, অঙ্গুলি-নির্দেশিত ভূখণ্ডে শত হস্তীর অবস্থান প্রতীতি হয়। ঠিক এইরূপ আমিশব্দ-প্রতিপাদ্য আপাতপ্রতীয়মান অস্মিতারূপ বস্তুটি যথার্থ আত্মা নহে। আত্মা যিনি, তিনি উহারও প্রকাশক। ইহা না বুঝিয়া সাধক যখন অস্মিতাকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তখন উহা শুম্ভনামক অসুররূপে

আত্মমহত্ত্ব—আত্মবিভূতি সমূহ অপহরণ করিয়া বসে। সে অবস্থায় সাধকের মনে হয়—আত্মা ত' নির্গুণ, সর্বধর্ম-বিবর্জিত ; তাহাকে লাভ করা না করা উভয়ই তুল্য ; কিন্তু এই যে অস্মিতা, ইহাই ত' যথার্থ ঈশ্বর ; যাবতীয় ঈশ্বরধর্ম এইখানেই ত' প্রতিভাত ; সুতরাং সর্বভাবাতীত জড়বৎ প্রতীয়মান আত্মার সন্ধানে কি ফল ? এইরূপ অজ্ঞান দ্বারা অসুর-ভাবের দ্বারা সাধক প্রতারিত হয়। হয়ত বা কখনও অস্মিতাকে ছাড়িয়া দিয়া নির্গুণ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিবার জন্য অবধান প্রয়োগ করিতে যত্ন করিয়া ভাবাতীত স্বরূপের জন্য একটা অস্ফুট সন্ধানও পায়। তখন ঐ অস্ফুট জড়বৎ বোধকেই বাক্যমনের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া লয়, এবং মনে করে—আমার বুঝিবার বা দেখিবার আর কিছু বাকী নাই। কিন্তু হায়! তখনও সাধক ঠিক বুঝিতে পারে না যে, ইহাও অসুরভাবমাত্র।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে বিজ্ঞানময়-কোষ বা বুদ্ধিতত্ত্বকে একান্ত আশ্রয়ণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে মহর্ষি মেধস তাহাকেই অসুররূপে পরিব্যক্ত করিলেন। নিশুম্ভ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দসহ এই মহাসুর শুম্ভ নিহত হইলেই জীবত্বের যথার্থ অবসান হয়—জীব-মহীরুহের শেষ মূল বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিজ্ঞানগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলেই জীব আনন্দনিকেতনে উপনীত হয়। একমাত্র গুরুকৃপা বা আত্মকৃপা ব্যতীত অপর কোনরূপ সাধনার বলে যে এই বিজ্ঞানগ্রন্থির ভেদ হইতে পারে, তাহা মনে হয় না। সর্ববিধ সাধনা এখানে কেবল মায়ের করুণ কটাক্ষ বা তীব্র স্নেহাকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার আমরা শুম্ভাসুরের দেবাধিপত্য অপহরণের বিষয় আলোচনা করিব। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন এবং বহ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দের আধিপত্য শুম্ভ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে—চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ ভাব, তাহাই দেবতা-নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এখানে যখন অস্মিতাই আত্মারূপে বা ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত, তখন দেবতাদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্য অথবা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দের স্ব স্ব চিদ্‌ভাব অস্মিতা কর্তৃক তিরস্কৃত বা আচ্ছন্ন থাকে। দেবগণ স্বকীয় চিদ্‌ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া একান্ত জড় ও দৃশ্য অস্মিতার অংশরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। মনে কর সূর্য—ইনি প্রাণের অধিপতি দেবতা, আত্মার যে অংশে প্রাণময় বিশিষ্ট বোধ প্রকাশ পায়, তাহাই সূর্যদেব। আত্মার ঐ বিশিষ্ট বোধটিই সূর্যের সূর্যত্ব। শুম্ভ—অস্মিতা সেই আত্মবোধকে সম্যক্ তিরস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সূর্যদেবও স্বকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য দেবতার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। একান্ত জড় অস্মিতা যখন আপনাকেই আত্মা বা চৈতন্য বলিয়া বুঝিয়া লয়, তখন প্রাণ মন প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা চৈতন্য-রূপী সূর্য, চন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ জড়ত্ব দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। শুম্ভ কর্তৃক দেবতাগণের আধিপত্য হরণের ইহাই তাৎপর্য।

———০———

ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ॥
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৪ ॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই মহাসুরদ্বয় কর্তৃক বিতাড়িত রাজ্যভ্রষ্ট পরাজিত এবং সম্যক্ নির্জিত ত্রিদশবৃন্দ স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। (যেহেতু মহিষাসুর যুদ্ধের অবসানে) সেই অপরাজিতা দেবী তাহাদিগকে বর দিয়াছিলেন যে, তোমাদের যখনই কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলেই তোমাদের অখিল পরমাপৎ বিনাশ করিব।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ উৎপীড়িত, পরাজিত, ভ্রষ্টরাজ্য, ভয়কম্পিত এবং অধিকারহীন হইয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, দেবতা চৈতন্যেরই বিশিষ্ট অভিব্যক্তিমাত্র। চৈতন্য—চিতিশক্তি বা মা। দেবতাগণ জানেন, আমরা সর্বতোভাবে মাতৃ-অঙ্কে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত। স্ব স্ব বিশিষ্টতামাত্র অবলম্বন করিয়া চিতিক্ষেত্রে বা স্বর্গরাজ্যে অবস্থান করাই দেবতাগণের প্রকৃতি ; কিন্তু এখন অস্মিতা আপনাকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে ; সুতরাং দেবতাগণ যখন স্ব স্ব অধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখনই দেখিতে পান যে, তাঁহারা চৈতন্যের বিশিষ্টভাবে

প্রকাশিত হইতে না পারিয়া, অস্মিতার বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অস্মিতা ত' আর যথার্থ চিদ্‌বস্তু নহে ; সুতরাং সে দেবতাদিগকে চিদ্‌বস্তুর আস্বাদ প্রদান করিতে পারে না। যে অমৃতরস পান করিয়া দেবতাগণ অমর নামে অভিহিত, সে অমৃত এখন জড় অস্মিতা কর্তৃক তিরস্কৃত ; তাই তাঁহারা দেবতা হইয়াও স্বর্গরাজ্য বা চিৎক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—এই দেখ, আমাদের দর্শন শ্রবণাদি যে কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সকলের সঙ্গে সঙ্গেই অহংভাবটি ফুটিয়া উঠে। ঐ অহং বা আমিরূপী শুম্ভাসুরকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ ক্ষণকালের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

দেখ সাধক ! তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সেখানেই তোমার প্রতি, তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গের প্রতি, আমিরূপী শুম্ভাসুরের কি অসহনীয় সূক্ষ্ম অত্যাচার। 'একমাত্র মা ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই' ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও, কি জানি, কোথা হইতে বুকের মধ্যে ঐ আমিটি ফুটিয়া উঠে ; তখন মা ও আমি, এই উভয়ের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তুমি ধ্যান-ধারণাই কর কিংবা সমাহিত অবস্থায়ই থাক, তোমার ঐ সূক্ষ্ম আমিটি নির্মল মাতৃবক্ষ হইতে তোমাকে অনেক দূরে রাখিয়া দিতেছে। তুমি শত চেষ্টায়ও সে ব্যবধানকে দূর করিতে পারিতেছ না। এ অত্যাচার কেবল আজ নয়, কোন্ অনাদিকাল হইতে তোমার হৃদয়-সিংহাসনে এই অস্মিতারূপী শুম্ভাসুর অধিষ্ঠিত হইয়া, তোমাকে আত্মরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহার সন্ধান কে করিবে ? এ অত্যাচার জীব-হৃদয়ে চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে ; তবে যতদিন মধুকৈটভ, মহিষাসুর অর্থাৎ কামনা-বাসনা, কিংবা কাম-ক্রোধাদি রিপুদলের অত্যাচার দূর করিবার জন্য সাধক ব্যাপৃত থাকে, ততদিন আর এ দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে না, সামর্থ্যও থাকে না। দেবতাবৃন্দ যে কেবল মধুকৈটভ ও মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত, এতদিন সাধক ইহাই বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখন মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অহৈতুক আশীর্বাদে, বহিঃশত্রুর বা স্থূল ইন্দ্রিয়াদির অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে, স্বরূপের দিকে তাকাইবার সামর্থ্য আসিয়াছে। তাই প্রশান্ত চিত্তে একবার নিজের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এইবার দেবতাবৃন্দ স্ব স্ব অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন—আমরা এতদিন যে সকল অসুরভাব কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, ইহারা অতি স্থূল ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ যে আরও সূক্ষ্মতর উপদ্রব, এ যে বুদ্ধি বা অস্মিতার অত্যাচার। অস্মিতা কর্তৃক আমাদের যথার্থ অধিকার অপহৃত হইয়াছে, আমরা সর্বতোভাবে আত্মা বা অখণ্ড চিতিশক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত, কিন্তু হায় ! এখন এ কি দেখিতেছি—জড় আমিত্বই এখন আমাদের একান্ত আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে।

যথার্থই এই সূক্ষ্ম আমিত্ব বড় ভয়ানক জিনিষ। 'মরিয়া না মরে হায় এ কেমন বৈরী'। প্রথমে স্থূল দেহাভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমিত্ব বা স্থূল অহঙ্কার, তাহা শ্রীগুরুচরণে প্রণতি বা সম্যক্ শরণাগতির সাহায্যে শীর্ণ হইয়া যায়। তখন উহা মনোময় দেহে বা সূক্ষ্ম শরীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় নানারূপ সাধন-ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, ক্রমে 'আমি ভগবৎসাধনায় নিরত', 'আমি একজন সাধক' এইরূপে অহংবোধ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। যদি বা শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপাবশে সাধকের অতুলনীয় সাহসের প্রভাবে সেখান হইতে উহাকে বিতাড়িত করা যায়, তারপরও কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি— সেই 'আমি' মহাশয় যথাপূর্বভাবেই, বরং পূর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিমান হইয়াই বুদ্ধিক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন, ইনিই মহাসুর শুম্ভ। ইহাকে নিধন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

প্রথমে যে বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সাধনা চলিতেছিল, পরে দেখা যায়, তাহাও আমিত্বদোষে দুষ্ট। সাধক প্রথম হইতে শিখিয়াছে—'আমি না গেলে মা আসেন না,' তাই প্রাণপণে আমিত্বকে বিতাড়িত করিতে যত্নবান হয়। প্রথমে স্থূলদেহ হইতে তাড়া দিতে আরম্ভ করে, ক্রমে উহা ইন্দ্রিয় ও মনের গণ্ডী পার হইয়া আসিয়া বুদ্ধিক্ষেত্রে দাঁড়ায়। এখানে আসিয়া সাধক দেখিতে পায় —এই বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব—মহান্, বিশাল, প্রায় ঈশ্বরতুল্য—যাবতীয় দেবাধিকার ইহারই করতলগত।

ইহাকে বিতাড়িত করা সহজসাধ্য নহে। অথচ এই আমিত্ব দ্বারাই আত্মরাজ্য সম্যক্ তিরস্কৃত। স্থূলকথা এই যে, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান বস্তুও যে জড় বা দৃশ্যমাত্র, এই অনুভব প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণের লভ্য নহে, যাহাদের বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ হইয়াছে, মাত্র তাহারাই বুদ্ধির জড়ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, এই অবস্থায় সাধকের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ নিরুপায় হইয়া কাতর প্রাণে অপরাজিতা দেবীকে—স্নেহময়ী মাকে স্মরণ করিতে থাকে। যাঁহাকে স্মরণ করিলে আর কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হইতে হইবে না, তাঁহাকে স্মরণ করে।

একদিন ত' এই মাই আমাদিগকে দুর্জয় দৈত্য মহিষাসুরের হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন ; সুতরাং এবারও এই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই শুম্ভাসুরের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। শুধু তাহাই নহে, আমাদের এই অপরাজিতা-মা স্নেহপরবশ হইয়া পূর্বে বলিয়াছিলেন, না, না, বর দিয়াছিলেন—যখনই তোমাদের কোন আপদ উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমাদের অখিল পরমাপদ্ বিনাশ করিব। তবে আর আমাদের ভয় কি ? সাধক ! এস, আমরাও দেবতাগণের ন্যায় আবার মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠি। আমাদের সে কাতর ক্রন্দন নিশ্চয়ই মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহের বন্যা লইয়া আসিবে, স্নেহবিহ্বলা মা, সেই বাক্য-মনের অতীত ক্ষেত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই দুর্জয় আমিত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আমরা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মা আসিবেন। মা আমাদের এই বিপদের বিষয় পূর্বেই জানিতেন, তাই ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে পরিত্রাণেরও সূচনা করিয়াছিলেন। আমাদের যে পরমাপদ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ আমাদের পরম অবস্থাটি যে আপদগ্রস্ত হইবে, আমরা যে পরমাত্মস্বরূপ হইতে দূরে থাকিব, তাহা জানিয়াই মা আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। সুতরাং এস, সকলে সমাহিত-চিত্তে মাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করি।

———○———

ইতি কৃত্বা মতিন্দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। দেবতাগণ পূর্বোক্তরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া নগাধিপতি হিমালয়ে গমন করিলেন এবং সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবতাগণের হিমালয় গমনের আধ্যাত্মিক রহস্য দেহাত্মবোধে অবতরণ। হিমালয়—দেহাত্মবোধ। (দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় কোষে অসুরের অত্যাচার উপলব্ধি করিয়া, দেবতাবর্গ স্থূলে—দেহাত্মবোধে অবতরণ করিলেন। দেহাত্মবোধে অবতরণ না করিলে, মাকে বিশেষভাবে ডাকা অর্থাৎ স্তব করা চলে না। স্তব বাগিন্দ্রিয়ের কার্য ; সুতরাং স্থূল দেহাত্মবোধ ব্যতীত স্তবাদিরূপ বিশেষ উপাসনা হইতেই পারে না।

এই স্থানে একটি বিষয় বলিয়া রাখিতেছি — স্থূল দেহই কর্মক্ষেত্র, যাবতীয় কর্ম স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য ইহা ধর্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। সূক্ষ্ম দেহে কোন কর্ম হয় না, হইতে পারে না ; সুতরাং এই স্থূল দেহ হইতেই কর্মের সাহায্যে এরূপ তীব্র বেগ অবলম্বন করিতে হয়, যেন তাহারই ফলে সূক্ষ্ম-ক্ষেত্র পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারা যায়। স্থূল দেহে অবস্থান করিয়া যাঁহারা কর্মহীনতার ভাণ করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বগতিলাভের বেগ হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এখানে দেখ, দেবতাগণকেও অপরাজিতার স্মরণ অর্থাৎ মায়ের স্তুতিমঙ্গল পাঠ করিবার জন্য স্থূলদেহবোধে অবতরণ করিতে হইল। স্তবই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে শক্রাদি স্তোত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুমায়া শব্দের অর্থ পরে পাওয়া যাইবে।

———○———

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্ ॥৭॥

অনুবাদ। দেবতাগণ বলিলেন—দেবীকে প্রণাম। মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাম। ভদ্রা প্রকৃতিকে প্রণাম। আমরা সংযত হইয়া তাঁহাকে (অবাঙ্মনোগম্যাকে) প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। দেখ সাধক ! দেবতাগণ মাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রথমেই 'নমঃ' বলিয়া—আমিত্ববোধকে সর্বতোভাবে বিনত করিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর প্রণাম করিয়া থাকি। হিন্দুর ঘরের সন্তান আমরা আশৈশব প্রণামেই অভ্যস্ত। প্রথমে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে, ক্রমে দেববিগ্রহ দেবায়তন প্রভৃতিকে প্রণাম করিতে শিক্ষা করিয়াছি। করকপাল-সংযোগ অথবা ভূমিতে মস্তকস্পর্শরূপ অনুষ্ঠান, কিংবা সমগ্র দেহটি ভূমিতলে নিপাতিত করিতে পারিলেই মনে করি, প্রণাম সিদ্ধ হইল। বাস্তবিকই কি তাহাই ? প্রণাম যে কত উচ্চ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ তত্ত্ব কি আমরা কখনও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি ? আমিত্বের উন্নত শির অবনত করিবার পক্ষে, প্রণামের মত সহজ উপায় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেহাত্মবোধের গর্বিত মস্তক কিছুতেই অবনত হয় না ; তাই আমরা দিবারাত্রি সংসারের দাস হইয়া, রোগে, শোকে, অনুতাপে দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইতেছি। প্রণাম রহস্য ভুলিয়া গিয়াই আজ এ দেশের লোক সকলের পদতলে বিলুণ্ঠিত। যাহারা প্রণাম করিতে জানে, তাহারা কখনও মানুষের দ্বারে মস্তক অবনত করে না ! **'ভিক্ষাং দেহি'** বলিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া মানুষের দ্বারে উপস্থিত হয় না।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নাম প্রণাম। 'আমি' বলিয়া যে অজ্ঞানের বোঝা লইয়া জ্ঞানের গর্বে আমরা মাথা উন্নত করি, ঐ আমিত্ববোধটিকে— ঐ অজ্ঞানের ভারটাকে জ্ঞানের সমীপে সম্যক্ অবনত করার নামই যথার্থ প্রণাম। ঐ অজ্ঞান, আর তাহার সহিত একান্তভাবে অবস্থিত অক্ষমতা দীনতা দুর্বলতাগুলিকে যে ব্যক্তি জ্ঞানময় সর্বনিয়ন্তার পদতলে অবনত করিতে না পারে, তাহার প্রণামই হয় না। এই জন্যেই স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন —**'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'**। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা, এই ত্রিবিধ উপায়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে হয়। সর্বপ্রথমেই প্রণিপাত। অহংকর্তৃত্বজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই যথার্থ প্রণিপাত। যতদিন উহা না হয়, ততদিন বুঝিবে— এখনও প্রণাম শিক্ষা হয় নাই। তাই বলি সাধক, ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা, জগৎতত্ত্ব-বিশ্লেষণ, আত্ম-সাক্ষাৎকারলাভ প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি উচ্চারণের অধিকার লাভ করিবার পূর্বে, কিছুদিন শুধু প্রণাম করিতে অভ্যাস কর। সমুদয় জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে যদি একটিবারও প্রণাম করিতে পার, বেশী নয়, জীবনে মাত্র একবার, এক মুহূর্তের জন্যও যদি প্রণাম করিতে পার, তাহা হইলেই জীবন সফলতাময় হইবে ; মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কিন্তু কই, পার কি ? যতই মস্তক অবনত করিতে চেষ্টা কর না কেন, আমিত্বের উচ্চশির কিছুতেই অবনত হইতে চায় না। চেষ্টা কর—এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত সকলেই তোমার গুরু, সকলেই তোমার মা, সকলেই তোমার পূজ্য। এইরূপে সহস্রভাবে সহস্রশীর্ষে মাকে প্রণাম করিতে থাক। ভয় নাই। প্রণাম করিতে গিয়া তোমাকে দীন হীন কাঙ্গাল সাজিতে হইবে না ; বরং জগৎপতিকে এইরূপে প্রণাম করিতে পারিলে, আর কোন দিন কাহারও কাছে মস্তক অবনত করিতে হইবে না। শুধু জগৎপতিকে প্রণাম কর না বলিয়াই মানুষের দ্বারে, বিষয়ের দ্বারে কপাল ঠুকিতে হয়, অথচ অভাব বোধ বিদূরিত হয় না।

সে যাহা হউক, প্রণাম করিতে পারিলে, জীব কিরূপে উন্নতি লাভ করে, তাহা একটু ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যে মুহূর্তে তুমি কাহাকেও প্রণাম কর, (অবশ্য শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রণামের কথাই এ স্থলে বলা হইতেছে, কেবল ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে যে প্রণাম করা হয়, তাহা এ স্থলে আলোচ্য নয়) ঠিক সেই সময় তোমারই অন্তরে একটা গুরুত্বভাব ফুটিয়া ওঠে। 'যাঁহাকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এইরূপ একটা শ্রেষ্ঠত্বভাব অন্তরের একদিকে ফুটিয়া উঠে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে স্বাপকর্ষ-বোধ অর্থাৎ 'আমি উঁহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট' এইরূপ একটা ভাব অন্তরে বিকাশ পায়। ফলতঃ কি হয় ? দেখ সাধক, প্রণাম করিতে গিয়া তুমিই লাভবান হও, তোমার চিত্তের একদিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বভাব প্রকাশ পায়, আবার অন্যদিকে অহংবোধটা একটু অবনত হইয়া পড়ে। এইরূপে যাঁহাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, তোমার সেই প্রণামের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছু লাভ হউক বা না হউক, তুমি যে

তদপেক্ষা বেশী লাভবান হও ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, ঐরূপ প্রণাম করিতে করিতে চিত্ত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও অহঙ্কাররূপী মহাশত্রু নিপাতিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি—অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী কেহ কেহ মনে করেন যে, একজন মানুষকে গুরু বলিয়া—ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করা মূর্খতামাত্র। হায়! তাঁহারা জানেন না—যাঁহারা যথার্থই ঈশ্বর লাভের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কোন না কোন মনুষ্যশরীরে গুরু বা ঈশ্বররূপে পরিগ্রহ করিতেই হইবে। এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবোধে প্রণাম করিয়া পূজা করিয়া আমিত্ব বোধকে অবনত করিতেই হইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিবার উহাই প্রথম প্রবেশ-দ্বার। বর্ণপরিচয় শিক্ষাকালে বালকগণ যে প্রকার শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশগুলি নির্বিচারে মানিয়া লয়, সেইরূপই আত্মরাজ্যে বিচরণেচ্ছু সাধক নিশ্চয়ই কোন মনুষ্যদেহকেই ঈশ্বররূপে নির্বিচারে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাঁহার চরণে অনাদিজন্মসঞ্চিত স্বকীয় আমিত্বের মহাভারটি সম্যক্ অর্পণ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিবেন। ইহাই ভগবৎলাভের একমাত্র উপায়! শ্রুতি বলেন,—**'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'** যিনি গুরুলাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে জানিতে পারেন। আবার এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে কোনও তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট হইতে কোনও বিশিষ্ট উপদেশ বা দীক্ষা গ্রহণ করিলেই গুরুলাভ হয় না। গুরুতে ঈশ্বরত্ববোধ এবং তিনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু, এইরূপ ভাব যাঁহার প্রাণে সর্বদা জাগিয়া থাকে, তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরুলাভে ধন্য হইয়া থাকেন। সত্যই যিনি সদ্‌গুরুলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকে না, বা থাকিতে পারে না। এইরূপ গুরুলাভ করিতে হইলে সর্ব-প্রথমেই পূর্বোক্ত প্রকারে প্রণতি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

যাঁহার প্রণাম যত সত্য, যাঁহার প্রণাম যত সরলতাময়, যাঁহার প্রণাম যত কৃত্রিমতাহীন, তিনিই তত সহজে ও শীঘ্র অভীষ্টলাভে চরিতার্থ হইয়া থাকেন। ইহাই প্রণামের রহস্য; এমনই প্রণামের মাহাত্ম্য। তাই বলি সাধক, তোমরা খুব বড় বড় তত্ত্বকথা শুনিবার পূর্বে, শুধু সরল প্রাণে প্রণাম করিতে অভ্যাস কর, আপনার আমিত্ব ভার গুরুর চরণে অর্পণ করিতে চেষ্টিত হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই আনন্দময় হইবে।

সে যাহা হউক, এইবার এস, আমরাও দেবতাগণের ন্যায় **'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ'** বলিয়া মায়ের স্তুতিমঙ্গল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানবোধ মাতৃচরণে উপহার দিতে প্রয়াস পাই।

নমো দেব্যৈ—দেবীকে প্রণাম। যিনি দ্যোতনশীলা, যিনি ক্রীড়াশীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লীলার অভিনয়নিরতা, যিনি জীব-জগদাকারে বিশ্বমূর্তিতে সতত প্রকাশিতা, সেই নিত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপা মায়ের স্থূলমূর্তিকে প্রণাম।

মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ—মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাম। এই প্রকট বিশ্বমূর্তি অপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম, যে অনির্দেশ্য সূক্ষ্ম মহতী শক্তিতে এই জগৎ বিধৃত প্রকাশিত ও অবস্থিত, সেই শিবা মঙ্গলময়ী মহাদেবী মাকে সর্বদা প্রণাম।

স্থূলমূর্তিকে প্রণাম করিতে করকপালাদি সংযোগ-রূপ বাহ্যানুষ্ঠান আবশ্যক; সুতরাং সতত প্রণাম সম্ভব নহে। কিন্তু মায়ের যে সূক্ষ্ম মহতী জগদাধারমূর্তি, সে মূর্তিকে সকল জীবই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিনা চেষ্টায় সর্বদাই প্রণাম করিয়া থাকে। জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থায় জীব যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা দ্বারা একমাত্র সেই মহতী শক্তিরই পূজা বা প্রণাম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাই তিনি সতত প্রণামযোগ্যা। আজ আমরা সেই নিত্য-প্রণামযোগ্যা মঙ্গলময়ী মহাদেবীর চরণে জ্ঞানতঃ প্রণত হইতেছি। মা! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ। ভদ্রা—মঙ্গলময়ী প্রকৃতিকে প্রণাম। পূর্বোক্ত স্থূল সূক্ষ্মের যিনি কারণ, সেই মূল প্রকৃতিরূপিণী জননীই ভদ্রা—সন্তানের মঙ্গলবিধায়িনী। জীব তাঁহারই কৃপায় প্রকৃতির পরপারে স্থূল সূক্ষ্মের অতীত ক্ষেত্রে, মুক্তির মহাপ্রাঙ্গণে উপনীত হয়। এই ভদ্রা প্রকৃতিকে সতত প্রণাম করা যায় না; কারণ, ইনি অব্যক্ত, কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান সাধক ইহার সন্ধান পাইয়া ইঁহার চরণে অবনত হইতে পারেন।

নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্—আমরা নিয়ত হইয়া 'তাহাকে' প্রণাম করি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে সম্যক্ নিয়মিত অর্থাৎ সংযত করিয়া, যিনি তৎপদগম্য—বাক্য মনের অগোচর তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি যে কি, তাহা

ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারাও সম্যক্ পরিগ্রহ করা যায় না । স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত সেই **'তাঁহাকে'**—সেই অজ্ঞেয়া **'জ্ঞ'**স্বরূপা নিত্যসত্যস্বরূপা জননীকে প্রণাম ।

এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতাগণ প্রথমে **'নমো দেব্যৈ'** বলিয়া মায়ের স্থূল মূর্তিকে প্রণাম করিলেন ; **'মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ'** বলিয়া মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপকে প্রণাম করিলেন ; **'নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ'** বলিয়া কারণরূপিণী মাকে প্রণাম করিয়া, **'নিয়তা প্রণতাঃ স্ম তাম্'** বাক্যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাতীত একমাত্র তৎ-পদগম্যা নির্গুণস্বরূপাকে প্রণাম করিলেন । ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহ সম্যক্ নিয়মিত না হইলে, সেই নিরঞ্জন সত্তার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও পাওয়া যায় না ; তাই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়মিত করিয়া লইতে হয় বলিয়াই মন্ত্রে 'নিয়তাঃ' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।

এই অধ্যায়টি প্রণতি প্রধান । কেবল প্রণাম—কেবল প্রণাম । সাধক, এস—আমরাও ঠিক এমনই করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতে অভ্যাস করি, আমাদের জীবন ধন্য হইবে ।

———o———

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥৮॥

অনুবাদ । রৌদ্রাকে প্রণাম । নিত্যা গৌরী ধাত্রীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । জ্যোৎস্না ও ইন্দুরূপিণী মাকে এবং সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । রৌদ্রা—রুদ্রশক্তি সংহারিণী মহাশক্তি । পূর্বমন্ত্রোক্ত ত্রিগুণাতীতা ভাবাতীতা তৎপদগম্যা নিরঞ্জনা মাকে আমার প্রণাম করিতে গিয়া বেশীক্ষণ অবস্থান করা যায় না, মুহূর্তমধ্যে আবার জগদ্ভাবে অবতরণ করিতে হয় । সেই নিরঞ্জনক্ষেত্র হইতে জগদ্ভাবে অবতরণ করিবার সময়ে মায়ের রৌদ্রা বা সংহারিণী তামসী মূর্তির কথাই প্রথমে মনে পড়িয়া যায় ; কারণ, ঐ সংহারিণী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই জগদতীত সত্তায় উপনীত হইতে হয় । তাই দেবতাগণ এই মন্ত্রের প্রথমে **'রৌদ্রায়ৈ নমঃ'** বলিয়া প্রলয়কারিণী রুদ্রশক্তিকে প্রণাম করিতেছেন। অর্থাৎ প্রলয়-কুক্ষিগত সর্বভাবের অন্তরালে যে বস্তুটির উপলব্ধি হয়, তাহা নিত্য । তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয় কিছুই নাই । তারপর ঐ নিত্য বস্তুতে শুভ্র সত্ত্বগুণের অবভাস হইতে থাকে । সে স্বরূপটি অতীব রমণীয় । তাই মা এখানে গৌরী নামে অভিহিতা । তারপর সর্বজগন্-বিধৃতিভাবটি ফুটিয়া উঠে ; তাই মা এখানে ধাত্রী । এইরূপে ধাত্রী পর্যন্তকে প্রণাম করিয়া জ্যোৎস্না ও ইন্দু-রূপিণী মাকে প্রণাম করা হইয়াছে । ইন্দু—মন, আর জ্যোৎস্না তাঁহার ব্যাপ্তি বা দিক্সত্তা, অর্থাৎ সর্বতঃ উদ্ভাসিত বিষয়সমূহ । (মন ও বিষয় যে অভিন্ন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে) এইরূপ সর্বত্র সর্বভাবের ভিতর দিয়া যাঁহারা মাকে, আত্মাকে প্রণাম করিতে বা দর্শন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই মায়ের সুখময়ী মূর্তির বিকাশ হয় ; তাই—সুখায়ৈ সততং নমঃ ।

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্' যাহা মহান্, তাহাই সুখ । মা যখন মনোরূপ দিক্ কালরূপে বিষয়রূপে আপনাকে কল্পনা করেন, অর্থাৎ ইন্দুরূপে জ্যোৎস্নারূপে প্রকাশিত হন, তখনই তাঁহার সুখস্বরূপটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয় । মহত্ত্বের উপলব্ধিই সুখ । পক্ষান্তরে যাহা অণুও নহে, মহৎও নহে, তাহা পরমার্থতঃ সুখ-স্বরূপ হইলেও, সে সুখ বিশিষ্টভাবে ভোগ্য নহে ; কারণ, সেখানে ভোগ্য ভোক্তৃভাব থাকে না । তাই বিশিষ্টভাবে সুখের ভোগ করিতে হইলে মহত্ত্বের উপলব্ধি চাই । মা যখন বিরাট্ মনোরূপে আপনাকে কল্পনা করেন, অন্য কথায় জীব যখন ঈশ্বরত্বে উপনীত হয়, তখনই এই মহৎস্বরূপের বা ভূমা সুখের আস্বাদ পায় ! আর সাধারণ জীব বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া—ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থসমূহের মধ্য দিয়া অতি অল্পমাত্র সুখের আভাস পায় । সুতরাং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলে সুখেরই অন্বেষণ করে, সুখেরই সেবা করে ; তাই সকল জীব সতত ইহাকেই প্রণাম করে । এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'** বলিয়া প্রণাম করিলেন । এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে ।

সে যাহা হউক, সাধকগণও ঠিক পূর্বোক্ত ভাবেই স্তরে স্তরে মায়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন । প্রথমতঃ স্থূল বিশ্বরূপে, পরে সূক্ষ্মে মহতী শক্তিরূপে, তারপর অব্যক্ত বীজ বা কারণরূপে, সর্বশেষে গুণাতীত বা নিরঞ্জন-স্বরূপে । আবার গুণাতীতস্বরূপ হইতে সাধকগণ কি ভাবে অবতরণ করেন, তাহাও এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত

হইয়াছে—গুণাতীতস্বরূপ হইতে প্রথমে রৌদ্রা বা সংহারিণী শক্তিতে অবতরণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে নিত্যত্বের উপলব্ধি ও সত্ত্বগুণের উদ্বোধ হয় (ইহাই গৌরীমূর্তি) ; ক্রমে জগদ্বীজের বিধৃতিভাবে (ইহা ধাত্রীমূর্তি), পরে মনে ও বিষয়ে (ইহাই ইন্দু ও জ্যোৎস্নারূপ) অর্থাৎ জগদ্ভাবে নামিয়া আসেন। তখন কি জগদ্ভাবে, কি জগদাতীত ভাবে, সর্বত্র অখণ্ড সুখময় সত্তার সন্ধান পাইয়া অন্তরে বাহিরে, ব্যক্ত অব্যক্তে স্থূলে সূক্ষ্মে সর্বত্র আনন্দময় সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া, **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'** বলিয়া সাধক ধন্য হয়।

জীব! মনুষ্য! তুমি নিয়ত সুখের অন্বেষণ করিতেছ, কামকাঞ্চন ব্যতীত সুখ নাই, এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে স্থির বিশ্বাসবান হইয়া তৃষিত মৃগের মত সুখের আশায় ধাবিত হইতেছ। কামকাঞ্চনের সেবা ও সঞ্চয় করিতে গিয়া, কতই না ক্ষত বিক্ষত হইতেছ, কিন্তু সুখ কি পাইয়াছ ? না, পাও নাই! এখনও সুখ বলিয়া বস্তুটি বুঝিতেই পার নাই। আগে সুখ স্বরূপাকে দেখ, তারপর জগতের কেবল কামিনীকাঞ্চনে কেন, ধূলিমুষ্টি সম্ভোগেও অতুল সুখের আস্বাদ পাইবে। আর কতকাল ভ্রান্তির বসে থাকিবে ? এস সুখের সন্ধান লও। যথার্থ সুখী হইবে। তুমিও আনন্দে দেবতাগণের মত বলিতে পারিবে **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**। দেখ, দেবতাগণ স্বর্গভ্রষ্ট পরাজিত হৃতসর্বস্ব ; তবু বলিতেছেন—**'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**। তোমারও এইরূপ হইবে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও বলিবে—**'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**। আবার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্ব পাইলেও বলিবে—**'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**। কারণ, সুখ ভিন্ন যে কোথাও কিছুই নাই। যাহাকে অসুখ বলিয়া বুঝিতেছ, উহাও যে সুখমাত্র এইটি বুঝিতে পার না বলিয়াই অসুখের ভয়ে পলায়মান হইয়া, কোথায় সুখ বলিয়া অন্ধের মত ধাবিত হও। এস, সুখের সন্ধান মিলিবে ; নিত্য সুখ, অপরিণামী সুখ যাহার ভোগে বিতৃষ্ণা নাই, অথচ পূর্ণ পরিতৃপ্তি আছে। তুমি চাও কি ?

———○———

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমোনমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ॥৯॥

অনুবাদ। কল্যাণীকে প্রণাম ; বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপিণী মাকে প্রণাম, তুমি নৈর্ঋতী, ভূভৃৎদিগের লক্ষ্মী ও সর্বাণী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। কল্যাণী—মঙ্গলদায়িনী। সুখময়ী মাকে একবার প্রণাম করিতে পারিলে, আর অকল্যাণ বলিয়া কিছু থাকে না ; তখন সাধক যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, কেবল কল্যাণমাত্রই দেখিতে পায়। মা যাহার নিকট কল্যাণীমূর্তিতে নিত্য প্রকটিতা, তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং সিদ্ধি অর্থাৎ সফলতা—অভীষ্টপূরণ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে কি সংসারক্ষেত্রে, কি সাধন-রাজ্যে, সর্বত্রই বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপে মাতৃপ্রকাশ হইয়া থাকে। তাই সাধক তাহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধারণ মানুষের যখন জাগতিক অভ্যুদয় অথবা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহারা লক্ষ্য করে না, অথবা লক্ষ্য করিতে পারে না যে, একমাত্র মা-ই বৃদ্ধিসিদ্ধি প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; তাই তাহারা ঐ সকল অভ্যুদয়াদি হইতে অচিরেই বঞ্চিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মা তখন সন্তানকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য, ধীরে ধীরে সন্তানের নিকট প্রতিকূল শাসনময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে থাকেন। তখন মায়ের নাম হয় নৈর্ঋতী— রাক্ষসী। মা যখন সন্তানকে রাক্ষসী প্রকৃতিরূপে কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন, তখনই তাহাদের কার্যপ্রণালী আচার ব্যবহার রাক্ষসোচিত হইতে থাকে। রাক্ষসীমূর্তি মায়ের অঙ্কে অবস্থিত সন্তানের স্থূল বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। মাত্র আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি পশু-বৃত্তির অনুশীলন করিয়াই তাহারা পরম তৃপ্তিলাভ করে। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—'মনুষ্যদেহ-আশ্রিত আমাকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করে।' তাই আমরা দেখিতে পাই, একদিকে যেমন মায়ের কল্যাণীমূর্তি প্রকটিত হইয়া মানুষকে বৃদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি সফলতা প্রদান করে, অন্যদিকে তেমনিই নৈর্ঋতী মূর্তি প্রকটিত হইয়া মানুষকে রাক্ষসরূপে পরিণত করে। অনির্বচনীয়া মা তুমি, একমাত্র তোমাতে এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব। মা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ—অনেকে ভূভৃৎলক্ষ্মী শব্দের রাজলক্ষ্মী অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই ; কারণ রাজশ্রীরূপেও একমাত্র মা-ই

ত প্রকটিত হইয়া থাকেন । আমরা কিন্তু মা, তোমার কৃপায় ভূভৃৎলক্ষ্মী শব্দের অন্য অর্থও দেখিতে পাই । ভূ-শব্দের অর্থ ক্ষিতিতত্ত্ব, ভৃৎ-শব্দের অর্থ ধারণকারী । যাহারা ক্ষিতিতত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব পর্যন্ত আমিত্ববোধের সহিত জড়াইয়া রাখে, তাহারাই ভূভৃৎ ; সুতরাং ভূভৃৎ শব্দের অর্থ জড়দেহাভিমানী জীব, তাহাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতৃচৈতন্য । লক্ষ্মী শব্দের অর্থ শোভা বা সম্পদ । চিদ্‌বস্তুই যথার্থ শোভা । যতক্ষণ জীবদেহে চৈতন্যসত্তার অভিব্যক্তি থাকে, ততক্ষণই তাহা শোভাবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে । পক্ষান্তরে, শবদেহকে নানারূপ বসন-ভূষণ দ্বারা সজ্জিত করিলেও তাহা শোভাময় হয় না । তাই, জীবিত মনুষ্যের নামের পূর্বেই লক্ষ্মীশব্দবাচক শ্রীশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তাই বলিতেছিলাম— মা ! তুমি জড়ত্বাভিমানী জীবদিগের নিকট চৈতন্যরূপে, প্রাণরূপে, লক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক । মাগো, ইহাই তোমার ভূভৃৎলক্ষ্মীমূর্তি । আবার সর্বাণী বা প্রলয়ের দেবতা শিবের শক্তিরূপেও তুমিই সকলকে প্রলয়কবলে গ্রহণ করিয়া থাক । মা, এইরূপ একদিকে তুমি ভুভৃৎলক্ষ্মী অর্থাৎ জীবচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া কত শত জন্ম পরিগ্রহ কর, আবার সর্বাণীরূপে সকলকে মৃত্যুর করাল কবলে প্রেরণ কর । মা ! একদিকে তোমার কল্যাণীমূর্তি, বৃদ্ধি-সিদ্ধিদায়িনী ; অন্যদিকে তোমার নৈর্ঋতীমূর্তি, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারধর্মরূপিণী । তোমার এই পরস্পর একান্তবিরুদ্ধ মূর্তিদ্বয়কে প্রণাম ।

এই মন্ত্রস্থ 'তে' পদটির অর্থ তোমাকে । সম্মুখে মাকে দেখিতে না পারিলে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার করা চলে না । তাই আশঙ্কা হয়, যাঁহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহেন, তাঁহারা এ সকল তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবেন কি ?

———○———

দুর্গায়ৈ দুর্গাপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥১০॥

অনুবাদ । দুর্গা দুর্গপারা সারা সর্বকারিণী খ্যাতি কৃষ্ণা এবং ধূম্রাকে সতত প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা, তুমি দুর্গা— দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা ; কারণ যতক্ষণ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবোধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয় না । তুমি দুর্গপারা । দুর্গ হইতে—এই সংসার হইতে তুমিই পার করিয়া থাক । যতদিন সর্বভাবাতীতা তোমাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করা না যায়, ততদিন দুর্গম সংসার হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না । আবার এই সংসারক্ষেত্রে সর্বভাবের ভিতর দিয়া তোমার যে স্বরূপটি ফুটিয়া উঠে, উহা চঞ্চলতাময়—পরিবর্তনশীল ; সুতরাং অসার । কিন্তু তুমি সারা—স্থিরাংশরূপিণী । এত বড় বৈচিত্র্যময় চঞ্চল জগৎ যে স্থির সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও তুমি । তাই মা, তুমিই সারা অর্থাৎ নিত্যা, সচ্চিদানন্দরূপিণী ।

মা, তুমি সর্বকারিণী । এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ সর্বভাব তুমিই প্রকাশ করিয়া থাক ; তাই সর্বকারিণী বলিলে একমাত্র তোমারই পরমেশ্বরীমূর্তির কথা মনে পড়িয়া যায় । যাঁহারা বলেন, চিতিশক্তিরূপিণী তুমিই স্বরূপতঃ নির্গুণা ; সুতরাং তুমি কখনও সর্ব-কারিণী হইতে পার না ; মায়া বা প্রকৃতিই সর্বকারিণী ; তাঁহারা মায়াকে বা প্রকৃতিকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলেন । কার্যতঃ অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ হয় । যদিও মায়াকে সত্তাহীন অনির্বচনীয় অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যায় বটে, কিন্তু উহাতেই কি সকলে নিঃসংশয় হইতে পারেন ! বর্তমান জগৎ যুক্তির অন্বেষী । যাহা যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে স্বীকার করা যায় না, এরূপ বিষয় বেদবাক্য হইলেও এ যুগে তাহা সাদরে পরিগৃহীত হয় না । তাই আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া, আজ তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব । মাগো, পূর্বে (দ্বিতীয় খণ্ডে) বলিয়াছি —তোমার কথা আলোচনা করিতে গিয়া যে, তোমাকে বুঝিয়া ফেলিব, অথবা অন্যকে বুঝাইতে পারিব, এরূপ ধৃষ্টতার আশা কখনও করি না। তোমাকে পাওয়া—বুঝিতে পারা সে তোমার কৃপা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না, হইতে পারে না । তবু কেন আলোচনা করি ? একটা পরম লাভ আছে, অন্ততঃ জিহ্বার জড়তা, বুদ্ধির মলিনতা দূর হইবেই ।

এস সাধক ! এইবার আমরা আমাদের মাকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করি—মা কি বস্তু । একমাত্র আনন্দই মায়ের স্বরূপ । শ্রুতি বলেন **'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন'**, আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ । আনন্দ বস্তুটির

অনুভব জীবমাত্রেরই অল্পাধিক আছে। জগতে কাম্যবিষয় অধিগত হইলে ক্ষণকালের তরে একটা আনন্দভাব বুকে ফুটিয়া উঠে। একবার ঐ ভাবটা স্মরণ করিতে চেষ্টা কর। ঐ যে ক্ষণিক আনন্দের আভাস, উহা 'জন্য আনন্দ', অর্থাৎ বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য এক প্রকার চিত্তবিকার মাত্র। বিষয়ানন্দ যে স্বরূপানন্দেরই আভাস মাত্র, একথা পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তোমাকে এমন একটা অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায়, যেখানে কোনরূপ বিষয়-সংস্পর্শ নাই, কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ত্যাগ নাই, গ্রহণ নাই, দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার নাই, অথচ কেবল আনন্দই আছে, তাহ'লে তুমি যে স্বরূপে উপনীত হইবে, উহাই মায়ের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। এইবার ধীরভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। আনন্দ একপ্রকার অনুভব বা বোধ। যখন আমাদের বোধ আনন্দমাত্রস্বরূপে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা আনন্দ বস্তুটির উপলব্ধি করিতে পারি। উহা কেবল অনুভবানন্দস্বরূপ। ঐ কেবলানন্দস্বরূপ বস্তুটিতে কোনরূপ ভেদ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ উহার সজাতীয় অপর কোন আনন্দ নামক বস্তু নাই। ঐ আনন্দের বিজাতীয় কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এরূপ কোন উপলব্ধিও সেখানে উদ্বুদ্ধ হয় না। তারপর উহার স্বগত ভেদও নাই, অর্থাৎ উহাতে কোনরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব অথবা ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিভাব নাই। কেবল আনন্দ ! কেবল আনন্দ ! বিশুদ্ধ আনন্দ ! ইহাকেই শ্রুতি **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** বলিয়াছেন। এই আনন্দেরই অপর নাম প্রেম বা রস ! দেবসমূহ ইহাকেই **'রসো বৈ সঃ'** বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমের আধার বলিয়া কোন ভেদ নেই। রসিক, রস ও রস্য বলিয়া কোন বিভিন্নতা নাই, কেবল প্রেম—কেবল রস। কি ভাষায় প্রকাশ করিব ? ওগো, সে যে ভাষার বাহিরে ! কেমন করিয়া বুঝাইব ? সে যে বুঝিবার বাহিরে। তবু কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। আবহমানকাল হইতেই এইরূপ বুঝিবার বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। বেদসমূহ ইঁহাকে **'অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্'**, **'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্'** ইত্যাদি নেতি নেতিমুখে বুঝাইতে কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, ইহাই মায়ের আমার নির্গুণস্বরূপ। এখানে একমাত্র আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিশিষ্টতা ভাবরঞ্জনা নাই ; তাই এখানে মা আমার নিত্যা শুদ্ধা নিরঞ্জনা।

এই নির্গুণ নিরঞ্জনস্বরূপের উপরেই মায়ের দ্বিবিধ মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। একটি ঈশ্বরত্ব অন্যটি জীবত্ব। এই উভয়েরই মধ্যে প্রথমে আমরা ঈশ্বরত্বরূপ মাতৃ-মহত্ত্বের আলোচনা করিব। উপনিষৎ বলেন **'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'** ইত্যাদি। আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহের উৎপত্তি, আনন্দেই উহাদের অবস্থান এবং একমাত্র আনন্দই জীবের প্রলয়স্থান। এখানে একটি সংশয় উপস্থিত হয়—পূর্বে যে আনন্দকে কেবলানন্দ বা সর্বভাব-বর্জিত নির্গুণ বলা হইয়াছে, আর এই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতুস্বরূপ আনন্দ এই উভয় আনন্দই এক অথবা বিভিন্ন ? এই আশঙ্কার উত্তরে একদল বলেন যে, তুমি যাহাকে নির্গুণ আনন্দ বলিতেছ, উহা বাক্যমাত্র ; কারণ আনন্দ কখনও নির্গুণ হইতে পারে না। নির্গুণ শব্দের অর্থ নির্বিশেষ গুণ। আনন্দ একটি গুণ বা ধর্মবিশেষ, উহা সূর্যরশ্মির ন্যায় সূর্য হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই ! আর একদল বলেন— আনন্দ হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি যাঁহার তিনিই (অর্থাৎ যিনি এই হ্লাদিনীশক্তিমান, তিনিই) ঈশ্বর। সুতরাং কেবল আনন্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না ইত্যাদি। এইরূপ বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল বিভিন্ন মতের মীমাংসা অতি সহজ। যিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে আর কোন গোলই থাকে না ; কারণ ব্রহ্মবস্তু যে কি নয়, তাহা বলা যায় না। ব্রহ্ম পূর্ণ ; তাঁহাতে কোনরূপ অভাবকল্পনা হয় না ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলেন, তাহাই সত্য। যাহার নিকট ব্রহ্ম যেরূপভাবে প্রকাশ পান, তাহার মুখ দিয়া সেইরূপ ভাষাই নির্গত হয়। এমন কি, যদি কেহ বলেন— ব্রহ্ম নাই, তাহাও সত্য ; কারণ সেখানে তিনি ঐ 'নাস্তি' রূপেই প্রতিভাত হইতেছেন। কেহ কোনপ্রকারে তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের বিশেষত্ব। তিনি যে কেবল এইরূপ অশক্য-প্রতিষেধ, তাহা নহে ; আবার আলোক অন্ধকার, জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা, সগুণ নির্গুণ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মসমূহেরও একমাত্র আধার ; এই বিরুদ্ধ ধর্মসমূহ একমাত্র ব্রহ্মেই যুগপৎ অবস্থিত। এই বিষয়ে আরও

বিশেষত্ব এই যে, পূর্বোক্ত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মসমূহ ব্রহ্মরূপ আধারে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইলেও, তাঁহার নিরঞ্জন-স্বরূপটির কিছুই ব্যাঘাত হয় না। কেবলানন্দ-রূপ ব্রহ্ম স্বকীয় নিরঞ্জনস্বরূপটি সর্বথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও যুগপৎ ঈশ্বর ও জীবরূপে প্রকটিত হইতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব।

এই নির্গুণ আনন্দস্বরূপ বস্তু কিরূপে ঈশ্বর বা সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পান, এইবার আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আচ্ছা ঐ যে নির্গুণ আনন্দ, উহাতে অনুভব বলিয়া একটা কিছু নাই বা থাকিতে পারে না, ইহা বলিতে পার কি ? আছে অথচ অনুভব শক্তি নাই ; এমন হয় কি ? যদি বলি নির্গুণ বস্তুতে এরূপ একটা শক্তি স্বীকার করিলেই ত' আনন্দের স্বগত-ভেদ হইয়া পড়ে এবং দ্বৈতাপত্তি হয়। না, তাহা হয় না। আনন্দ যখন স্বয়ং স্ব কে প্রকাশ বা অনুভব করেন, অর্থাৎ একমাত্র আনন্দবস্তুই যখন নিজে নিজকে ভোগ করেন, তখন এই ভোগ্যভোক্ত্রাদিরূপ যে ভেদ তাহা কিছুতেই প্রতীতিযোগ্য হয় না। সুতরাং সে অবস্থায় এই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ বস্তুতে ভোগ্য ভোক্তা প্রভৃতি ভাব কিছুই নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি, যদিও ইহাতে কোন সংশয় থাকে তথাপি এখন স্বীকার করিয়া লও, মানিয়া লও যে, নির্গুণ বিশুদ্ধ আনন্দনামক এক বস্তু আছে, উহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই। আচার্য শঙ্করকেও এই নির্গুণ সগুণের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া, একটি 'অনির্বচনীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ঐ অনির্বচনীয় মানেই 'স্বীকার করিয়া লওয়া'। আবার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' কথাটি বলিয়া, এই স্বীকার করিয়া লওয়াই, প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। হ্যাঁ, তবে এ কথা সত্য যে যদি এখন ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পার এবং শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট উপায়ে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার কৃপায় একদিন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, আনন্দ বস্তু নির্গুণ হইতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে—অখণ্ড জ্ঞান ও অসীম শক্তি উহারা অভিন্ন বস্তু। জ্ঞানই শক্তি অথবা শক্তিই জ্ঞান। যাঁহারা এই কথাটি বুঝিতে পারে নাই কিংবা অনুশীলনের সাহায্যে একটুও অনুভব করেন নাই, তাঁহারা এই আনন্দতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন কি ?

আচ্ছা, পূর্বে বিশুদ্ধ জ্ঞান বলিয়া যাহা বুঝিয়াছ, তাহা শুধু জ্ঞান নয়, এইবার উহাকে আনন্দ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। চিদ্‌বস্তু কেবল চিৎ নহে, আনন্দই উহার স্বরূপ। আনন্দ বলিলেই আনন্দের অনুভব ও সত্তা একান্তভাবে প্রতীতিগোচর হইতে থাকে। ঐ অনুভবের নাম চিৎ এবং সত্তাই সৎ। সুতরাং আনন্দ শব্দের অর্থ করিলেই সৎ চিৎ ও আনন্দ বস্তু পাওয়া যায়। এই তিনটি বস্তু বাস্তবিক তিনটি নহে, একটিই। সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ ; একটি বস্তুরই তিনটি নাম। ইহা পূর্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। এই আনন্দ যেখানে স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ, সেখানেও উহাতে চিৎ বা অনুভবশক্তি এবং সত্তা আছে। যে অনুভবশক্তি বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি না থাকিলে আনন্দ যে আছে, তাহার প্রতীতি হয় না, সেই অনুভবশক্তিটি যখন বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উহার উভয় পার্শ্বে কর্তা ও কর্মরূপ দুইটি ভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ অনুভব, অনুভবের কর্তা এবং অনুভাব্য বিষয়, এই তিনটি ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আনন্দ বস্তুতে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইলেও স্বরূপতঃ কোনই ভেদ হয় না। এক আনন্দ বস্তুই স্বয়ং স্ব-কে অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আনন্দ যেখানে আনন্দকে বিশেষ-ভাবে অনুভব করেন, সেইখানেই অদ্বিতীয় বস্তুতে স্বগতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইহাই সত্ত্বঃ, রজ ও তমোগুণ নামে আখ্যাত হয়। সচ্চিদানন্দের প্রথম স্পন্দনে সৎ বা সত্ত্বগুণ অর্থাৎ আনন্দের ভোক্তৃভাব, দ্বিতীয় স্পন্দনে চিৎ বা রজোগুণ অর্থাৎ আনন্দের অনুভবশক্তি এবং তৃতীয় স্পন্দনে আনন্দ বা তমোগুণ অর্থাৎ অনুভাব্য আনন্দরূপ ভোগ্য ভাব প্রকাশ পায়। মনে রাখিও এইরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইলেও বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপটি কিন্তু বিশুদ্ধই আছে।

উঁহার নাম দাও 'আমি'—না, আমি বলা যায় না ; আত্মা বল। পঞ্চদশীকার বলেন—**'ইয়মাত্মা পরমানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ'**। এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পরম-প্রেমের আস্পদ। পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়াই আত্মা

আনন্দস্বরূপ । যিনি পরম-প্রেমাস্পদ, যাঁহাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসি, যাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য এই জীবত্বের নিগড় অনাদিকাল হইতে বহন করিতেছি, যাঁহার রক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারি (আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ), সেই আত্মা যে কতটা ঘন আনন্দস্বরূপ, তাহা ভাষায় কি করিয়া বুঝাইব ?

সে যাহা হউক, আত্মা যখন পূর্বোক্তবৎ বিশেষভাবে আপনাকে আপনি অনুভব করেন, তখনই তিনি সগুণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহাকে দার্শনিকগণের ভাষায় বিকার পরিণাম বিবর্ত ভ্রান্তি কল্পনা অধ্যাস, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, ক্ষতি নাই । শুধু বুঝিয়া রাখ—সগুণ নির্গুণ, উভয়ই সত্য এবং নির্গুণ বস্তু এই রূপেই সগুণ হইয়া থাকেন । আসল কথা ঐটি যে, সহস্র বার সগুণ হইলেও নির্গুণত্বে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না ; তাহা যথাপূর্ব অক্ষুণ্ণই থাকে । তুলা যখন সূত্র বস্ত্র প্রভৃতি নামে ও আকারে পরিণত হয়, তখন তুলাত্বের কিছুই ব্যত্যয় হয় না ! সুবর্ণ যখন বলয় কুণ্ডলাদি নামে ও আকারে আকারিত হয়, তখন সুবর্ণত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে । জল যখন সমুদ্র নদী জলাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ও আকারে আকারিত হয়, তখন জলত্বের বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় না । সর্প যখন কুণ্ডলিত হয়, তখন কুণ্ডল নামে অভিহিত হইলেও সর্প সর্পই থাকে কুণ্ডল হইয়া যায় না । শুক্তি যখন রজত আকারে প্রতীয়মান হয়, তখনও সে শুক্তিই থাকে, রজত হয় না । আকাশ যখন ঘটকুড্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট হয়, তখনও আকাশ নির্বিশেষই থাকে ।

এখন দেখ—আনন্দ বস্তু যখন আপনি আপনাকে বিশেষরূপে অনুভব বা দর্শন করেন, তখনই তিনি সগুণ । বেদান্ত ইহাকেই মায়ার অধ্যাস বলেন । সাংখ্য ইহাকে প্রকৃতির সম্বন্ধ বলেন । উপনিষৎ কিন্তু এই সগুণ স্বরূপকেও আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দেই নির্দেশ করিয়াছে। আবার ঐ যে সগুণ আনন্দ, তাহাতে বহুত্বের অনুভবও প্রকাশ পায় । কেন পায়, কেমন করিয়া পায়, এরূপ প্রশ্ন করিও না । লীলা বা ইচ্ছা বুঝিয়া লও । আমি আনন্দ-স্বরূপ । একরূপে আমাকে ভোগ করিয়া—অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাই, তাহাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ভোগ করিব, যখন আমার এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখনই আমার ঈশ্বর আখ্যা হয় । **'একোঽহং বহু স্যাম্'** এইরূপ অনুভব বা বোধের নাম ঈশ্বর । একই আনন্দস্বরূপ আত্মাতে যখন বহুভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তখনই আত্মা ঈশ্বর । বলিতে পার—তবে কি ব্রহ্ম আনন্দহীন ? নতুবা বহুত্বভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন কেন ? না, তাহা নহে, ব্রহ্মবস্তু স্বরূপতঃই আনন্দ, তাঁহাতে আনন্দের অভাব কোন কালেই নাই । তবে তাঁহার একত্ব—অদ্বিতীয়ত্ব যেরূপ সত্য ও স্বাভাবিক, বহুত্ব বা ঈশ্বরত্বও জগদ্দর্শনকালে সেইরূপ সত্য ও স্বাভাবিক। জগদাতীত অবস্থায় যেরূপ ব্রহ্ম নির্গুণ, জগদ্দর্শন সমকালে সেইরূপই তিনি সগুণ । তিনি গুণাতীত এবং গুণময়—একাধারে এই উভয় ভাবই যুগপৎ বিদ্যমান । অথচ একের দ্বারা অন্যের কোনও হানি বা পরিবর্তন হয় না । সে যাহা হউক, পূর্বোক্তরূপে পরমপ্রেমাস্পদ আনন্দময় আত্মা যখন স্বয়ং স্ব-কে বহুধা বিভক্ত করিয়া ভোগ করেন, তখনই তিনি ঈশ্বর । এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই আত্মার ঈশ্বরত্বরূপ মহত্ত্ব যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবে ।

আত্মার আর একটি মহত্ত্ব আছে—জীবত্ব। **'তত্ত্বমসি'** প্রভৃতি মহাবাক্য এবং **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্বং, স এব সর্বং, পুরুষ এবেদং সর্বং, যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্'** ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীব যে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । জীব কি ? ঐ যে ঈশ্বরানন্দ অর্থাৎ বহুধা প্রকাশমান সমষ্টি আনন্দ, তাঁহারই ব্যষ্টিরূপ— সেই বহুর যে প্রত্যেকটি, তাহাই জীব । সুতরাং জীবও স্বরূপতঃ আনন্দই । এইখানে আবার পূর্বকথিত জল, তুলা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর । যেমন সমুদ্রস্থ জলের তরঙ্গগুলি জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সূত্রনির্মিত বস্ত্রগুলি তুলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ঠিক এইরূপই জীব অর্থাৎ বিভিন্ন নাম ও রূপগুলি স্বরূপত আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে । এইরূপে চতুর্বিধ ভূতগ্রাম—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ ঈশ্বরানন্দ হইতেই উৎপন্ন, ঈশ্বরানন্দেই স্থিত এবং ঈশ্বরানন্দেই ইহাদের অবসান ; সুতরাং আনন্দই জীবের স্বরূপ । এখন ভাবিয়া দেখ— আত্মা মা আমার কেবলানন্দময়ী, আবার সর্বকারিণী ঈশ্বরানন্দময়ী, আবার সর্বরূপিণী জীবানন্দময়ী ।

সাধক ! এইরূপ লক্ষ্য কর—ধীরে ধীরে তুমি কোথায়

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। প্রথম খণ্ডে যাহা কেবল সৎ সত্যরূপে বুঝিয়াছিলে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাই প্রাণ বা চিদ্রূপে বুঝিয়াছ। আর এখন দেখিতে পাইতেছ—যাহা প্রাণ, তাহাই পরমপ্রেমাস্পদ পরম আনন্দস্বরূপ আত্মা। তুমি আনন্দ হইতেই আসিয়াছ, তোমার প্রত্যেক ইঙ্গিতটি আনন্দময়, দেখ—তোমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুটি আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নয় ; আনন্দই তোমার উপাদান, আনন্দই তোমার স্বরূপ, আনন্দেই তুমি অবস্থিত। দেখ—তোমার চতুর্দিকে, ঊর্ধ্বে, নিম্নে সর্বত্র আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। দেখ, তোমার অন্তরের প্রত্যেক চিন্তাটি আনন্দময়, দেখ—তোমার জন্ম-মৃত্যু আনন্দময়। দেখ—তোমার রোগ শোক আনন্দময়, দেখ—তোমার দুঃখ-দারিদ্র্য আনন্দময়। দেখ—তোমার সম্মুখে যে বৃক্ষটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা আনন্দ দ্বারা গঠিত, —একটা ঘন আনন্দ সত্তা বৃক্ষের আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। জড় প্রস্তরখণ্ডে দেখ —তোমারই আনন্দময় আত্মা জড় প্রস্তর আকারে প্রতিভাত হইতেছে। ঐ যে স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজনগণ যাহাদিগকে তুমি তোমা হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাক, দেখ—উহারা তোমারই বহুত্ববিষয়ক আনন্দময় ঘন সত্তা। তোমারই আনন্দের উল্লাসগুলি মূর্তিমান্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপ যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, উহা সকলই আনন্দময়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চবিষয়, চন্দ্র সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তোমারই পরমপ্রেমাস্পদ পরমানন্দময় আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ওগো! এই আনন্দময় আত্মস্বরূপের আস্বাদ না পাইলে, তোমার জীবনটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ওগো! তুমি আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছ, দিবা রাত্রি আনন্দের সেবা করিতেছ অথচ কোথায় আনন্দ বলিয়া অন্ধের মত অন্বেষণ করিতেছ! একবার তাকাও আমার দিকে, দেখিবে—তোমার আনন্দের অভাব কোনকালেই নাই, ছিল না, থাকিবে না। যে মুহূর্তে তুমি আনন্দময় আমাকে পাইবে, সেই মুহূর্তেই তোমার নিকট এই সংসার আনন্দ-ময়রূপে প্রতিভাত হইবে। তখন হইতেই তোমার এই বিশিষ্টভাবে জগদ্ভোগের বাসনা সম্যক্ অন্তর্হিত হইবে।

খুলিয়া বলি—আনন্দই যে তোমার স্বরূপ, ইহা ঠিক বুঝিতে পারিলে, আর কি কাম্য বস্তু সংগ্রহ কিংবা ভোগ করিয়া আনন্দের সন্ধান লইতে হয়? কখনই নয়। তখন স্বভাবতঃই তোমার বৈরাগ্য আসিবে। 'আনন্দময় আমিই যে সর্বত্র বিষয় আকারে প্রতিভাত' ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে, আর ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছুই থাকে না। তখন নির্বিচারে বিষয়ানন্দে বিচরণ করিবার সামর্থ্য হয়। গীতার সেই কথাটি স্মরণ কর—**'রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্'**। যাহা হউক আমরা আনন্দতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এস! আবার আমরা দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া **'সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ নমঃ'** বলিয়া আনন্দময়ী মায়ের চরণে প্রণত হই। আত্মা আনন্দময়ী মা আমার সারা অর্থাৎ নির্গুণ চৈতন্যরূপিণী হইয়াও সর্বকারিণীরূপে ঈশ্বরীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

'খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ'—যশঃ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্থ ব্যতীত খ্যাতি শব্দের আর একটি অর্থ হয়—বিবেকখ্যাতি। প্রকৃতি-পুরুষ বা জড়-চৈতন্যের পৃথকত্ববিষয়ক যে সুদৃঢ় প্রতীতি, সাংখ্যদর্শন তাহাকে বিবেক-খ্যাতি বলিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় —সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রকৃতি জড় নহে ; চৈতন্যের জড়ত্বপ্রতীতি মাত্র। জড়ত্ব এক-প্রকার বোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বোধ বস্তু জড় নহে, চেতন। কেবল চেতন নহে, আনন্দই উহার স্বরূপ। নির্গুণ আনন্দ বস্তু কিরূপে সগুণ ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময় হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। গুণত্রয়ই প্রকৃতির স্বরূপ। আনন্দই যে ত্রিগুণ আকারে আকারিত, ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হওয়ার নামই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব-বিবেক বা বিবেকখ্যাতি।

মা! এই খ্যাতিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ কর। বিশুদ্ধ আনন্দময় পুরুষ তুমি যখন আপনাকে আপনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাক, তখনই তোমার নাম হয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বের যথার্থ্য উপলব্ধি-রূপেও তুমি। এই উপলব্ধির নাম খ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি। মা, বিবেকখ্যাতিরূপিণী তোমাকে প্রণাম! আবার এই খ্যাতির বিপরীত অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণা মূর্তিতেও তুমি।

যেখানে দেখিতে পাই— কোনরূপেই বোধের বিকাশ হয় না, শত সাধনাতেও অনুভব ফুটিয়া উঠে না, কেবলানন্দ-স্বরূপ আত্মবোধটি প্রকটিত হয় না, সেইখানেই বুঝিতে পারি —মা, তুমি অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্তিতে বিরাজ করিতেছ । মা, তোমার এই অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্তিকে প্রণাম, আবার এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ খ্যাতি ও কৃষ্ণামূর্তির অন্তরালবর্তী তোমার আর একটি মূর্তি আছে, উহার নাম 'ধূম্রা' । এই ধূম্রামূর্তিতে জ্ঞানের ঈষৎ আভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপটি প্রকাশ পায় । যখন দেখিতে পাই, মা ! তোমার কোন কোন সন্তান বেদাদি-শাস্ত্রপতিপাদ্য তোমার স্বরূপব্যাখ্যানে নিপুণ, সগুণ নির্গুণাদি তত্ত্ববিশ্লেষণে দক্ষ, মোক্ষশাস্ত্র-অধ্যয়ন-অধ্যাপনে পটু, অথচ তোমার এই আনন্দময় স্বরূপের অনুভব হইতে একান্ত বঞ্চিত, তখনই বুঝিতে পারি—মা, তুমি ধূম্রামূর্তিতে—জ্ঞানের ঈষদ্ আভাসযুক্ত জ্ঞানময়ী মূর্তিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই অপূর্ব ধূম্রামূর্তিকে আমরা প্রণাম করি ।

আবার অন্যদিক্ দিয়াও দেখিতে পাই—মা ! তুমি প্রতিনিয়ত খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধূম্রামূর্তিতে সকল জীবকেই অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । আমরা যখন বিষয় গ্রহণ করি, তখনই তোমার এই ত্রিমূর্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হয় । 'আমি ইহা জানিতেছি' ইহাই বিষয় গ্রহণের স্বরূপ । এই তিনটির মধ্যে 'আমি' এইটি খ্যাতিমূর্তি, 'জানিতেছি'—ধূম্রামূর্তি এবং 'ইহা'—কৃষ্ণা-মূর্তি। এইরূপ সর্বত্র । প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিরূপে মা ! তোমার এই ত্রিমূর্তি সর্বত্র প্রতিভাত । আমরা ভক্তির সহিত তোমার এই মূর্তিত্রয়কে প্রণাম করিতেছি ।

———০———

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ ॥১১॥

অনুবাদ । অতিসৌম্যা ও অতিরৌদ্রাকে প্রণাম । এতদ্ উভয়ের অতীত তৎশব্দলক্ষিত বাক্যমনের অতীতস্বরূপকে প্রণাম । জগৎ প্রতিষ্ঠারূপিণী মাকে এবং কৃতিদেবীকে বারংবার প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা, ইতিপূর্বে খ্যাতি ও কৃষ্ণারূপে তোমার অত্যন্ত-বিরুদ্ধ মূর্তিদ্বয় দেখিয়া আসিয়াছি, উহাই আবার এস্থলে অতিসৌম্যা এবং অতিরৌদ্রা নামে অভিহিত হইয়া দেবতাবৃন্দ কর্তৃক অভিষ্টুত হইতেছে । মাগো, একদিকে যেমন তুমি অতিসৌম্যা— স্নেহময়ী আনন্দময়ী দয়াময়ী মাতৃ-মূর্তি, অন্যদিকে আবার তেমনি অতিরৌদ্রা —ভয়ঙ্করী কৃষ্ণামূর্তিতে নিত্য প্রকটিতা । মা, এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতেও আমরা তোমার এই উভয়বিধ মূর্তির লীলা প্রায়ই দেখিতে পাই । কি দেখি— একদিকে তুমি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতিরূপে অতিরৌদ্রামূর্তিতে, তোমারই সন্তানদিগকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে নিপাতিত কর । আবার অন্যদিকে দয়ারূপে সহস্র সহস্র জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অতিসৌম্যা স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্তিতে সাহায্য সম্ভার বহন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য উপস্থিত হও । মাগো, যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত' তোমার ভয়ঙ্করী মূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই করুণাময়ী মাতৃ-মূর্তি দেখিতে পাই । সন্তানের নাস্তিকতায়, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ব্যথিত হইয়া, মা ! একদিকে যেমন শাসনরূপে— দণ্ডরূপে প্রকাশিত হও, অন্য দিকে আবার তখনই ব্যথাহারিণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সন্তানের অশ্রু স্বহস্তে মুছাইয়া দাও । এই ত' মাতৃত্ব ! বিশ্বময় সর্বত্র তোমার এই মাতৃ-লীলা সুপ্রকট ।

জীব ! তুমি কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও ? মাকে দেখিবার জন্য কি সাধন, ভজন, যোগ, তপস্যা করিবে ? ওরে, অত কষ্ট করিয়া মাকে দেখিতে হইলে যে মাতৃ-নাম কলঙ্কিত হয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই ত' মাতৃ-মূর্তি সম্যক্ উদ্ভাসিত । একটি আত্মসম্বেদন আছে,—**'যো হি পশ্যতি নাত্মানাং দৃষ্টিসম্পাতমাত্রতঃ । কদাপি নেক্ষিতুং শক্যো দৃক্‌সহস্র-ধরোঽপি সঃ॥'** যে চক্ষু চাহিয়াই মাকে দেখিতে না পায়, হাজার চক্ষু হইলেও সে কখনও মাকে দেখিতে পাইবে না । সত্যই মা এত সরল ও সহজ । জীব সত্যই যদি এমনি করিয়া দেবতাদিগের মত মাকে সর্বত্র দেখিতে পাও, এবং যথার্থই ভক্তিপ্রণত হইতে পার, তবেই মায়ের নির্বিশেষ রূপটির আভাস পাইবে এবং তখনই দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেপারিবে—**'তস্যৈ নমো নমঃ'**—বাক্য ও মনের অতীত কেবলানন্দস্বরূপকে প্রণাম । আপত্তি করিও না—অতিরৌদ্রা মূর্তির মধ্যে

আনন্দ কোথায় ? একটু চক্ষুষ্মান্ হইলেই দেখিতে পাইবে— আনন্দ কোথায় । আরে, আনন্দই ত' সত্তা ! আনন্দ বস্তুই ত' সুখ-দুঃখাদি আকারে প্রকাশ পাইতেছে ! আচ্ছা, জীবের দিক দিয়া দেখ । জীব যখন কাঁদে, তখন ঐ কান্নার মধ্যেই একটা আনন্দের আভাস পায়, তাই কাঁদে । দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই আনন্দের আভাস পায়, তাই দুঃখ ভোগ করে । এ সকল কথা 'শোক-শান্তি' নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । মনে রাখিও, জীবের হাসিতে যেরূপ আনন্দময় আত্মসত্তার অভিব্যক্তি কান্নাতেও ঠিক সেইরূপই আছে । তবে কান্নার ভিতরের আনন্দকে দেখিতে বা বুঝিতে হইলে, একটু যোগচক্ষু বা মাতৃ-কৃপার আবশ্যক । কিন্তু সে অন্য কথা—

মায়ের এই সৌম্য, রৌদ্র এবং ভাবাতীত স্বরূপটি বুঝিতে হইলে, কি ভাবে কোন্ কোন্ স্তরের ভিতর দিয়া আসিতে হয়, তাহাই মন্ত্রের অপর অর্দ্ধাংশে উক্ত হইয়াছে —**'নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ'**। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয় ; জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদানরূপে যে আনন্দময় চৈতন্যসত্তা রহিয়াছে, প্রথমে তাহাকে প্রণাম করিতে হয়, বুঝিতে হয় উপলব্ধি করিতে হয় । তারপর কৃতিদেবীকে অর্থাৎ যে ক্রিয়াশক্তি অখণ্ড আনন্দ-বস্তুকে এই খণ্ড জগদাকারে আকারিত করে, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয় । এস, আমরাও 'নমোজগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ' বলিয়া অভিন্ন নিমিত্তো-পাদান কারণ-রূপিণী মাকে প্রণাম করি । তারপর **'দেব্যৈ-কৃত্যৈ নমো নমঃ'** বলিয়া কৃতিদেবীর—সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহতী ক্রিয়াশক্তির চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হই ।

———০———

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১২॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । বিষ্ণুমায়া—জগদ্ব্যাপিনী মহতী স্থিতিশক্তি। দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশরূপা মহতী চিতিশক্তি । পূর্বে যে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় আনন্দময়স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যখন সর্বভূতাকারে আকারিত হন, সর্বভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ঈক্ষণ করেন, বোধ করেন, অনুভব করেন, তখনই তিনি বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই বিষ্ণুমায়া মা আমার, যিনি স্থূলে সর্বভূতরূপে আধিভৌতিক মূর্তিতে প্রকটিতা, তাঁহাকে প্রণাম । অনন্তর সেই বিষ্ণুমায়া মা আমার, যিনি সূক্ষ্মে—আধিদৈবিক মূর্তিতে মহতী শক্তিরূপে প্রকটিতা, তাঁহাকে প্রণাম। তারপর মায়ের যে মূর্তি স্থূল সূক্ষ্মের অতীত, সেই কারণরূপিণী বিষ্ণুমায়া মূর্তিকে প্রণাম । অবশেষে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত, বাক্যমনের অগোচর তৎপদলক্ষিত মাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ।

এখান হইতে এই স্তুতির প্রত্যেক মন্ত্রেই তিনবার নমস্তস্যৈ শব্দ আছে । এতদ্ভিন্ন একটি নমোনমঃ পদেরও প্রয়োগ আছে। প্রথম নমস্তস্যৈ পদের দ্বারা স্থূলে প্রণাম অভিব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মায়ের আধিভৌতিক স্থূলরূপটি অবলম্বন করিয়াই প্রথম প্রণাম বিহিত হইয়াছে। আবার এ স্থলে প্রণামরূপ কার্যটিও কিন্তু কায়িক ও বাচনিকরূপে স্থূলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । তারপর দ্বিতীয় নমস্তস্যৈ ; ইহা মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপটিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে । যে সূক্ষ্ম চৈতন্য-শক্তি স্থূলে আসিয়া বিশিষ্ট নাম ও আকার লইয়া অভিব্যক্ত হন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া— উপলব্ধি করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাই প্রণামের দ্বিতীয় বা সূক্ষ্ম অবস্থা । ইহাকে মানসিক প্রণাম বলা হয় । তারপর তৃতীয় নমস্তস্যৈ ; ইহা কারণ-স্বরূপের প্রণাম । যে আদি কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ই অভিব্যক্ত হয়, মায়ের আমার সেই কারণ-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া, উপলব্ধি করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাই তৃতীয় প্রণাম । এই প্রণাম কারণশরীরেই অভিব্যক্ত হয় । যদিও কারণ-স্বরূপটি বুদ্ধিতত্ত্বেরও উপরে অবস্থিত, তথাপি এই প্রণাম সেই বিজ্ঞানাতীত কারণকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বেই অভিব্যক্ত হয় । তাই ইহাকে বৌদ্ধ প্রণাম বলা যায় ।

'নমোনমঃ', এইটি চতুর্থ প্রণাম । ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বিশুদ্ধ বোধময় ক্ষেত্রে বা পরম প্রিয়তম পরমাত্মায়ই প্রকটিত হইয়া থাকে । যদিও এখানে, প্রণম্য, প্রণাম ও প্রণামকর্তা বলিয়া ত্রিবিধ স্ফুরণ নাই, তথাপি

যাঁহারা প্রথম হইতেই শরণাগত ভাবের সাধক, তাঁহারা এই অদ্বৈত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার সময়েও **'নমোনমঃ'**, বলিয়া, শুধু শরণাগত ভাবের সাহায্যেই পরমপ্রেমাস্পদ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় আত্মহারা হইয়া যান, মিলাইয়া যান। ইহাই তুরীয় অবস্থা বা চতুর্থ প্রণাম।

এইরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং কারণাতীত অর্থাৎ তুরীয়, এই চারিটি অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা প্রণাম করিতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা। শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ এইরূপভাবে প্রণাম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি, মা আমার অচিরে স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসুরকুল ধ্বংস করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। সাধক ! তুমিও ঐরূপ করিতে অভ্যাস কর। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং কারণাতীত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণাম করিতে অভ্যস্ত হও। সাধনশক্তি ঐ লক্ষ্যে পরিচালিত কর, তুমিও দেবতাদিগের ন্যায় সর্ববিধ আসুরিক অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে মুক্তির চারটি স্তর বর্ণিত আছে। যথা — সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। জড়ত্বকে ভেদ করিয়া চৈতন্যলোকে উপনীত হওয়াই সালোক্য ; যে সমষ্টি চৈতন্যে উহা অবস্থিত, তাহার সমীপস্থ হওয়াই সামীপ্য। যে সূক্ষ্ম কারণরূপ কেন্দ্র হইতে উহা প্রকাশিত, তথায় উপনীত হওয়ার নাম সারূপ্য ; এখানে উপস্থিত হইলেই সাধক তৎস্বরূপ হইয়া যায়, তাই এই অবস্থার নাম সারূপ্য। এখানেও বিশিষ্টতা থাকে। তারপর সাযুজ্য ; এ অবস্থায় আর কোনও বিশিষ্টতা থাকে না, জীব নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপে উপনীত হয় ; ইহারই অন্য নাম নির্বাণ। সাধক ! তোমার দৈনন্দিন সাধনার মধ্য দিয়াই যেন ঐ চারিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য থাকে। চারিটি প্রণামে চারিটি স্বরূপের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহারা সম্পূর্ণ চারিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অসমর্থ, তাহারা অন্ততঃ দুইটি বা তিনটির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিও, উহাই যথার্থ সাধনা। প্রতিদিনই অল্পাধিক মুক্তির আস্বাদ লইতে হয় এবং এইরূপ করিলেই জীবন্মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে অন্য কথা।

পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে এই নমস্তস্যৈ অংশের আর ব্যাখ্যা করার আবশ্যক হইবে না। ধীমান্ পাঠক উহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। যদিও সপ্তশতী মন্ত্রবিভাগে এই মন্ত্রের শেষ অংশ অর্থাৎ **'নমস্তস্যৈ নমোনমঃ'** এই অংশ একটি পৃথক মন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি শেষের **'নমোনমঃ'** অংশটিকে তৃতীয় নমস্তস্যৈ হইতে পৃথক করিয়া চতুর্থ প্রণামরূপে ব্যাখ্যা করায় কিছুই হানি হয় নাই। তৃতীয় প্রণামটি কারণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। কোন সাধক কারণ স্বরূপে উপনীত হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে কারণাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে ; তাই কারণের প্রণাম করিতে করিতেই নমোনমঃ বলিয়া কারণাতীত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

———o———

যা দেবীসর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৩॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে চেতনা নামে অভিহিতা তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম ! তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। চেতনা স্থূলে নামরূপ আকারে পরিব্যক্ত। সূক্ষ্মে প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণে অব্যক্ত বীজরূপে অবস্থিত। স্থূলাভিমানী চৈতন্য বিশ্ব, সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্য তৈজস এবং কারণাভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞনামে অভিহিত।

চৈতন্যরূপিণী মা ! তুমি বিশ্ব-চৈতন্য নামে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে নাম ও আকার পরিগ্রহপূর্বক প্রতিনিয়ত প্রকটিত হইয়া রহিয়াছ ! তোমার এই আধিভৌতিক চেতনাময়ী মূর্তিকে আমরা কায়িক ও বাচনিক প্রণাম করিতেছি। তারপর তৈজসচেতন নামে তোমার যে মহতী শক্তি এই প্রকট বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কার্যে নিরত, তোমার সেই সূক্ষ্ম আধিদৈবিক চেতনারূপিণী শক্তিময়ী মূর্তিকে আমরা মানসিক প্রণাম করিতেছি। অনন্তর প্রাজ্ঞচেতনা নামে যাহা এই স্থূল ও সূক্ষ্মের বীজরূপে—কারণরূপে নিত্য অবস্থিত, তোমার সেই আধ্যাত্মিক চেতনারূপিণী অব্যক্ত-কারণমূর্তিকে বুদ্ধির সাহায্যে প্রণাম করিতেছি। সর্বশেষে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অবাঙ্মনোগোচর তোমার সেই নিত্য নিরঞ্জন-স্বরূপের

দিকে লক্ষ্য রাখিয়া **'নমোনমঃ'** বলিতে বলিতে পরমপ্রেমাস্পদ প্রিয়তম মধুময় আত্মস্বরূপে মিলাইয়া যাই।

সাধক ! এইবার তুমিও দেখ, তোমার চেতনারূপে অন্তরে যিনি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন—ঐ উনিই ত' মা। যাহাকে সতত অবজ্ঞা করিতেছ—দেখ, সর্বভূতে চেতনারূপে অবস্থিত সেই মাকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ প্রণাম করিতেছেন। তুমিও দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া, আত্মচৈতন্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া **'নমস্তস্যৈ'** বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর। কায়িক ও বাচনিক প্রণাম সার্থক হউক। ঐ হৃদয়ানুভূত চৈতন্যই যে স্থূলদেহরূপে, দেহাত্মবোধরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা বুঝিয়া প্রথম প্রণাম কর। তারপর যে চেতনা সর্বভাবের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে—সেই সর্বব্যাপিনী চিন্ময়ী মাকে অনুভব করিয়া বোধ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া **'নমস্তস্যৈ'** বলিয়া দ্বিতীয় প্রণাম বা মানসিক প্রণাম কর। অনন্তর অব্যক্ত কারণরূপিণী চেতনার দিকে লক্ষ্য করিয়া যেখানে এই বহু বৈচিত্র্য বহু নামরূপ কিছুই ব্যাকৃত হয় নাই, সেই অতি সূক্ষ্ম অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৃতীয় প্রণাম বা বৌদ্ধ প্রণাম কর। এইরূপে কারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাখিতেই মায়ের কৃপায় কারণাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইবে, তখন সেই অজ্ঞেয় নিরঞ্জন-সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'নমোনমঃ' বলিতে বলিতে মধুময় পরমাত্মসত্তায় মিলাইয়া যাও।

———o———

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৪॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। **'যা দেবী'** শব্দের পুনঃ পুনঃ অর্থ করা নিষ্প্রয়োজন। **'যিনি'** বলিলে, বাক্যমনের অতীত অথচ সত্যস্বরূপ বস্তুকেই বুঝায় ; যাঁহার সত্তায়, যাঁহার প্রকাশ সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় বা অবিশ্বাস নাই, থাকিতে পারে না, যিনি আছেন বলিয়া এই জগৎ আছে, আমি আছি, তিনি যে কিরূপ, তাহা ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই **'যা দেবী'** এবং **'তস্যৈ'** এই পরোক্ষবাচক শব্দদ্বয় মন্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর **'সর্বভূতেষু'** কথাটি বলিবার সময় যেন সাধক নিজের দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া না যান। এ সকল কথা বারংবার বলা বাহুল্য মাত্র।

মা ! তুমি বুদ্ধিরূপিণী। ব্যষ্টি বুদ্ধিরূপে প্রতিজীবে, সমষ্টি বুদ্ধিরূপে মহত্তত্ত্বরূপে এবং বুদ্ধির বীজরূপে অব্যক্তক্ষেত্রে তুমিই অবস্থিত। তোমার এই ত্রিবিধ স্বরূপকে কায়িক বাচনিক মানসিক ও বৌদ্ধ প্রণাম করিতেছি। তারপর তোমার নিরঞ্জন সত্তা ; যেখানে বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, অথচ বুদ্ধি যাহাতে অবস্থিত, বুদ্ধির যিনি প্রকাশক, সেই যে তোমার নিরঞ্জন স্বরূপ, তাহাই যথার্থ আমারও স্বরূপ, 'নমোনমঃ' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। মা, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। আমরা আত্মস্বরূপে উপনীত হই।

সাধক ! তুমিও এই মন্ত্র পড়িয়া সর্বপ্রথমে নিজ বুদ্ধিকে প্রণাম কর। ঐ বুদ্ধিরূপেই যে মা ! ব্রাহ্মণগণ **'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'** বলিয়া যে ধীকে লাভ করিবার জন্য ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীমন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া থাকেন—দেখ, ঐ ধীরূপেই মা। উহাকে ঠিক ঠিক প্রণাম করিতে পারিলেই—যে মহতী বুদ্ধিতে তোমার ব্যষ্টি বুদ্ধি অবস্থিতা, তাঁহার অর্থাৎ মহদাত্মার সন্ধান পাইবে। উঁহাকে দ্বিতীয় প্রণাম কর। তারপর এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয় বুদ্ধির যে অব্যক্ত বীজ, যাহা মূলা প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়, তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে নিরঞ্জনস্বরূপে চলিয়া যাও ; সেই ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত গুরুস্বরূপে বা আত্মস্বরূপে মিলাইয়া যাও। **'নমোনমঃ'** বলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'আমিত্বের' গুরুভার চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হউক।

———o———

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৫॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম !

ব্যাখ্যা। মা তুমি নিদ্রারূপিণী। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন সম্যক্ নিরুদ্ধ

থাকে, তখন জ্ঞানময়ী মা তুমি 'কিছুই জানি না' রূপ অজ্ঞানটিকে বুকে করিয়া অবস্থান কর ; 'ইহাই ত' তোমার নিদ্রামূর্তির স্বরূপ । সর্বভাবের নিরোধ বিষয়ক বোধরূপে তুমিই ত' প্রকাশিত হও ; তাই পাতঞ্জল দর্শন তোমার এই মূর্তিটিকে অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । বাস্তবিকই ত' তুমি যখন অভাব মাত্রের প্রত্যয়রূপিণী হইয়া আত্মপ্রকাশ কর, তখনই আমরা তোমার স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, রসময়ী, মধুময়ী সুষুপ্তিমূর্তির অঙ্কে সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া ইন্দ্রিয়-ব্যাপারজনিত কর্ম-ক্লান্তি হইতে বিশ্রাম লাভ করি—পরমা তৃপ্তি প্রাপ্ত হই । ওগো, এত স্নেহ তোর বুকে, তোর আদরের সন্তান আমরা যখন এই দুঃখময় ত্রিতাপময় জগতে বিচরণ করিতে করিতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখনই তুমি নিদ্রামূর্তিতে আমাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধর, তোমার সেই সোহাগজড়িত স্নেহময় আলিঙ্গনের অমৃতময় পরশে আমরা সকল জ্বালা সকল বিক্ষেপ সকল চঞ্চলতা একেবারে ভুলিয়া যাই । ওগো মাতৃ-অন্বেষী সাধকবৃন্দ, তোমরা আমার মাকে খুঁজিতে কোথায় ছুটিয়া যাও ! ঐ দেখ, দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি মাকে আমার কত নিকটে আনিয়া দিয়াছেন, প্রতিদিনই মাকে আমরা নিদ্রারূপে পাইয়া থাকি । মা যে আমার স্ব, এই স্বকে প্রাপ্ত হই বলিয়াই নিদ্রার একটি নাম স্বপিতি । যাঁহাকে একবার স্পর্শ করিলে সকল জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই মা প্রতিদিনই ত' আসিয়া স্নেহের পীড়নে আমাদিগকে জড়াইয়া ধরেন ।

এস মা আমার, এস সুষুপ্তিরূপিণী জননী আমার, তোমার চরণে প্রণত হই—নমস্তস্যৈ । আমাদের কায়িক ও বাচনিকরূপে স্থূলের প্রণাম গ্রহণ কর । তারপর তোমার কৃপায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাই—এক মহতী সমষ্টি নিদ্রামূর্তি সর্বভূতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে । সেই যে মা, তোমার সুষুপ্তিময়ী ঈশ্বরী মূর্তি, যে মহতী অজ্ঞানমূর্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, মা ! তোমার সেই মহতী মূর্তিকে প্রণাম করিতেছি । মাগো, তোমার এ মূর্তি দেখিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া যায় । কি ঘন ! কি নিবিড় সেই কৃষ্ণা সুষুপ্তিমূর্তি ! 'নমস্তস্যৈ' তোমার চরণে কোটি প্রণাম । অনন্তর এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিদ্রার যাহা কারণ, সেই সুষুপ্তিবীজরূপিণী অব্যক্ত কারণ-মূর্তিকে তৃতীয় প্রণাম করিয়া নিদ্রাতীত নিরঞ্জনস্বরূপের উদ্দেশ্যে চলিয়া যাই, যেখানে নিদ্রা বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাঁহার সত্তায় নিদ্রার সত্তা, যিনি নিদ্রার প্রকাশক ; সেই যে নিত্য জাগরণময় নিত্য বোধময় তোমার নিরঞ্জনস্বরূপ, তাঁহাকে **'নমোনমঃ'** বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি । মা ! আমাদের প্রণাম সফল হউক ।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥১৬॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা ! তুমি ক্ষুধারূপে—ভোজনেচ্ছারূপে সর্বভূতে বিদ্যমান । আমাদের স্থূল শরীরের রস রক্তাদি ধাতুর অপচয় জন্য যে অবসাদ উপস্থিত হয়, ঐ অবসাদ দূর করিবার জন্য আহার গ্রহণের যে আবশ্যকতা বোধ হয়, 'ইহাই ত' মা তোমার ক্ষুধামূর্তি ! কেবল স্থূল শরীরে — অন্নময় কোষেই যে তোমার এই বুভুক্ষামূর্তির প্রকাশ হয়, তাহা নহে ; প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়-কোষেও তোমার এই ক্ষুধামূর্তির অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত আমরা দেখিতে পাই ; সুতরাং আমাদের এই পঞ্চকোষেরই বুভুক্ষা বা আহারের ইচ্ছা আছে । প্রাণ-ময়কোষের আহার জীবনীশক্তি, মনোময়কোষের আহার চিন্তা, বিজ্ঞানময়কোষের আহার জ্ঞান এবং আনন্দময়-কোষের আহার প্রীতি হর্ষ ইত্যাদি । মা ! এইরূপে ক্ষুধামূর্তিতে পঞ্চকোষের আহার গ্রহণের ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হও বলিয়াই ত' আমরা দিনের পর দিন, জন্মের পর জন্ম ধরিয়া এই ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যপদেশে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমারই দিকে অগ্রসর হইতেছি ! ধন্য তোমার অপূর্ব আকর্ষণময় এই ক্ষুধা স্বরূপের অভিব্যক্তি ! মাগো, প্রথমে আমাদের সেই নিত্য অনুভূতা অন্ন-বুভুক্ষা অর্থাৎ তোমার স্থূল ব্যষ্টিক্ষুধামূর্তিকে নমস্তস্যৈ বলিয়া প্রণাম করি । তারপর তোমারই কৃপায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাই—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী এক মহতী ক্ষুধাময়ী মূর্তি ; যাহা সর্বজীবে ব্যষ্টিরূপে অবস্থিত, তাহারই সমষ্টি অখণ্ড বুভুক্ষামূর্তি । তোমার এই মূর্তি যে

কেবল পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ আহার গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়, তাহা নহে। ওগো, এই সমগ্র বিশ্বই যে তোমার সেই মহতী ক্ষুধামূর্তির তৃপ্তিবিধানের জন্য অন্নরূপে —আহাররূপে অবস্থিত। কোন অনাদিকাল হইতে তুমি এই বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা-মূর্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছ, তাহা তুমি ব্যতীত আর কে বলিবে? মা! আমরা তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। মাগো, শুনিয়াছি—যে তোমার এই ক্ষুধামূর্তির চরণে সত্য সত্যই প্রণত হইতে পারে, তাহার ভবক্ষুধা চিরতরে বিদূরিত হয়। মা! কত কাল কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই জগৎ ভোগ করিতেছি, কত শোক দুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আসিতেছি, তবু ত' মা,— আমাদের এ বিষয়ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না! মা, একবার তুমি আমাদের এই ক্ষুধা মিটাইয়া দাও। তুমি যে মা! সন্তানের ক্ষুধা বুঝিয়া আহার দেওয়াই ত' মাতৃত্ব। সন্তান পুতুল খেলায় ব্যস্ত, ক্ষুধার কথা মনেই নাই! মা স্বয়ংই আসিয়া আহার দিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া দেন। এই না মাতৃত্ব? তবে এস, আমাদের ক্ষুধা দূর কর। আর যে অন্নের অন্বেষণ করিতে পারি না মা! কত কাল ধরিয়া কেবল অন্বেষণই করিতেছি, আহার করিতে পারি না, তাই ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু এবার যখন বুঝিতে পারিয়াছি,— ক্ষুধামূর্তিও তুমি, তখন আমাদের এ ক্ষুধা তোমাকেই দূর করিতে হইবে। মাগো, সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে দেখিয়াও কি তুই অন্নপূর্ণা হইয়া নীরবে থাকিবি? তা কী হয় মা? তুই অন্নপূর্ণা, আর আমরা ক্ষুধিত পুত্র! এ দৃশ্য কিরূপে সহ্য করবি। আয় মা, এবার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদের বিষয়ক্ষুধানল চিরতরে নির্বাপিত করিয়া দে। ক্ষুধারূপিণী মা আমার, এতদিন তোমায় মা বলিয়া চিনিতে পারি নাই, কত অবজ্ঞা করিয়াছি, ঘৃণার কুটিল কটাক্ষে জর্জরিত করিয়াছি, কিন্তু আর নয়— আজ তোমায় মা বলিয়া চিনিয়াছি, এস মা, সন্তানের স্থূল সূক্ষ্ম কারণের প্রণাম গ্রহণ কর, সন্তান ধন্য হউক! তারপর আমরা **'নমোনমঃ'** বলিতে বলিতে তোর নিরঞ্জন স্বরূপে চলিয়া যাই। যেখানে ক্ষুধা বলিয়া কিছু নাই, আহার বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাহার সত্তায় ক্ষুধার সত্তা, যিনি ক্ষুধার প্রকাশক, যাঁহাকে পাইলে সকল ক্ষুধা চিরতরে অবসিত হইয়া যায়, সেই ত' মা তোমার নিরঞ্জনস্বরূপ। মা, তুমি আমাদের শেষ প্রণাম গ্রহণ কর? তোমার মাতৃত্বের উজ্জ্বল গৌরব-আলোকে জগৎ আলোকিত হউক! কোটি কোটি জীব মা মা বলিয়া তোমারই দিকে অগ্রসর হউক!

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। ছায়া শব্দের অর্থ জীব। উপনিষৎ বলেন, — **'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি'**। আচার্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ছায়া শব্দের জীবাত্মা অর্থই করিয়াছেন। ছায়ার তিনটি অবস্থা আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। দেহভেদে ছায়ারও এই ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হয়। ছায়া—প্রতিবিম্ব। চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। স্থূলদেহে যে ছায়া বা চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহা ছায়ার স্থূল মূর্তি। সূক্ষ্মদেহে (পঞ্চ জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশাত্মক শরীরে) যে ছায়া বা চিৎপ্রতিবিম্ব আছে, তাহা ছায়ার সূক্ষ্মমূর্তি। এইরূপ কারণ দেহে অবিদ্যার যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহা ছায়ার কারণমূর্তি; এই তিন মূর্তিকে প্রণাম করিবার জন্যই মন্ত্রে বিশেষভাবে তিনবার প্রণামের উল্লেখ আছে। আর চতুর্থ প্রণাম ছায়াতীত স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে।

ছায়া সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সাধারণ ছায়া যেমন প্রকাশের আবরক হয়, এ জীবচ্ছায়াও যেন সেইরূপ পরমাত্ম স্বরূপের আচ্ছাদক হইয়া থাকে। এই আবরণ দূর করিবার জন্যই এত প্রণাম, এত শরণাগতভাব। প্রণাম করিতে করিতেই মিথ্যাভিমান দূরীভূত হয়। অভিমান দূর হইলেই ছায়াকে অর্থাৎ জীবভাবকে আর একটা পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া অনুভব হয় না। প্রতিবিম্বের যে কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, বিম্বের সত্তায়ই যে প্রতিবিম্বের সত্তা, ইহা তখনই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। একমাত্র আত্মাই যে আছেন, ইহা উপলব্ধি করিবার অতি সহজ উপায় —সর্বভূতে ছায়াদর্শন। যাঁহাদের বুদ্ধিতত্ত্ব সম্যক্ উন্মেষিত হইয়াছে, তাঁহারা এই জীবজগৎকে যথার্থই ছায়ারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মহানগরীর

ন্যায় এই নামরূপবিশিষ্ট স্থূল বিশ্ব যথার্থই ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। আধুনিক বেদান্তবাদীগণ মিথ্যা ভ্রান্তি কিংবা অধ্যাস বলিয়া এই চিচ্ছায়াকে উড়াইয়া দিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, যতদিন তাঁহাদের স্থূলদেহ আছে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতেও সহস্রবার মিথ্যা বলিলেও ইহা দূরীভূত হয় না।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থানপূর্বক জীবগণকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন'। জীব যে ছায়ামাত্র, তাহা এই ভগবদ্‌বাক্যদ্বারাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। কোনও স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেরূপভাবে অঙ্গভঙ্গী করা যায়, দর্পণ প্রতিবিম্বিত মূর্তিটিও ঠিক সেইরূপ ভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে। জীবরূপী চিৎপ্রতিবিম্বও সেইরূপ হৃদয়াবস্থিত ঈশ্বরকর্তৃক পরিচালিত হইয়া, বিভিন্নভাবের অভিনয় করিয়া থাকে। একটি গানেও শুনিয়াছি—'তুমি যেমন বলাও, তেমনি বলি, তুমি যেমন হাসাও, তেমনি হাসি' কথাগুলি খুবই সত্য।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে—জীব যদি ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই হয়, অর্থাৎ জীবানুষ্ঠিত কর্মসমূহ যদি ঈশ্বরকর্তৃকই সম্যক্‌ভাবে নিয়মিত হয়, তবে আর ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য বলিয়া কোনও বিচার থাকিতে পারে না। হাঁ, সত্যই যাঁহারা এইরূপ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে পরমেশ্বরের ছায়ামাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট যথার্থই পাপপুণ্য বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু এইরূপ দর্শন বা অনুভূতি লাভের পূর্বে অর্থাৎ অহংকর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান থাকিতে ধর্মাধর্মের বিচার থাকিবেই। সহস্রবার নাই বলিলেও অন্তরে পাপপুণ্যের সংস্কার ফুটিয়া উঠিবেই। কিন্তু সে অন্য কথা—

আমরা কিন্তু জানি মা, তুমিই আমাদের বিম্ব, আবার তুমিই প্রতিবিম্ব। তুমিই পরমাত্মারূপে বিম্ব হইয়া বুদ্ধিতে চিচ্ছায়াসম্পাত দ্বারা স্বয়ং জীব বা ছায়া সাজিয়া রহিয়াছ। তাই দেবতাগণের ন্যায় আমরাও তোমার এই ছায়াস্বরূপটিকে প্রণাম করিতেছি। মা, তুমি স্বয়ং চিন্ময়ী, তাই তোমার প্রতিচ্ছায়া যাহাতে সংক্রামিত হয়, তাহাও চৈতন্যময় হইয়া উঠে। জড়বস্তুর ছায়া জড়বস্তুতে বিপতিত হইলে, তাহাতে চেতনবদ্ ব্যবহার হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যরূপিণী মা, তোমার ছায়াসম্পাতে জড়দেহ, জড়বুদ্ধি, জড়ইন্দ্রিয় সকলই চৈতন্যময় হইয়া উঠে। মা, তুমি স্বয়ং 'আমি'রূপিণী ; তাই তোমার ছায়াসম্পাতে, এই জড় দেহ প্রভৃতিও 'আমি' বলিয়া অভিমান করে।

মা ! প্রথমে নমস্তস্যৈ বলিয়া আমাদের ব্যষ্টিবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত তোমার চিচ্ছায়ামূর্তিকে প্রণাম করি। ক্রমে সমষ্টিবুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বে যে ছায়ামূর্তি আছে, যাহাকে শাস্ত্রকারগণ হিরণ্যগর্ভ আখ্যা দিয়া থাকেন সেই মহতী ছায়ামূর্তিকে দ্বিতীয় প্রণাম করিয়া কারণ-ক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে তোমার অব্যক্ত ছায়াকে পুনরায় নমস্তস্যৈ বলিয়া প্রণাম করি। সর্বশেষে সেই নিরঞ্জন-ক্ষেত্র, যেখানে ছায়া বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাহার সত্তায় ছায়ার সত্তা, যিনি ছায়ার প্রকাশক, তাঁহার উদ্দেশ্যে নমোনমঃ বলিয়া বারংবার প্রণত হই, ছায়া বা মায়া চিরতরে মিলাইয়া যাউক।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা ! শক্তি বলিলে সর্বপ্রথমে নিজের দেহটার দিকেই লক্ষ্য হয়। একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিলে বেশ প্রতীতি হয়—এ দেহটা শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। দৃক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলিকে দেখিতে দেখিতে, ক্রমে রক্ত মাংসের পিণ্ডময় এই স্থূল অংশটার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয় ; তখন দেখিতে পাই—কতকগুলি অণু-পরমাণু এক অজ্ঞেয় ধৃতশক্তি-কর্তৃক পরিধৃত হইয়া দেহআকারে প্রতিভাত হইতেছে। তারপর অণুগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই—অণুগুলিও বাস্তবিক জীবাণু বা শক্তিব্যূহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপে এই স্থূলদেহটা কতকগুলি শক্তির সমষ্টিরূপে প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে। মা, প্রথমে তোমার এই স্থূলশক্তি মূর্তিকে প্রণাম করি।

মা গো, আধুনিক জড়বাদীগণ তোমার এই

স্থূলাকারে প্রকাশিত শক্তিমূর্তিকে জড়রূপেই প্রত্যক্ষ করেন। সর্বভূতে স্থূলদেহে ভৌতিক পদার্থে আলোক-তাপে তড়িতে চন্দ্রে সূর্যে সর্বত্র যে শক্তিরূপের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যে তোমারই জড়নামীয় চিন্ময়ী ইচ্ছা-শক্তিমাত্র, ইহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। শক্তি সে চেতনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। মা, তুমি তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দাও। ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহ যে কতকগুলি চৈতন্যময় শক্তিপ্রবাহমাত্র ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও।

এ কি মা! শক্তি ত' কতকগুলি নয়! দৃক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি শক্তিসমূহের প্রত্যেকটিকে আর ত' পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না। একই মহতী শক্তি বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতেছে। ইহা যে কেবল স্ব স্ব দেহ বা কোনও একটি বিশেষ পদার্থেই প্রতীত হয়, তাহা নহে; অনন্ত বিশ্ব বলিলে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যতদূর প্রসারতা লাভ করে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সকলকে আর ত' পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না! এ যে একা অদ্বিতীয়া মহতী শক্তি গো! কি বিশালতা। কি মহত্ত্ব! মন বুদ্ধি যে স্তব্ধ হইয়া যায় মা! ঐ যে সর্বভূতরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা এক অদ্বিতীয়া মহতী শক্তি, যাঁহার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়রূপ ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র পরিলক্ষিত হয়, সেই সমষ্টিরূপিণী মহাশক্তিরূপিণী মা তুমি! ওগো, এই দুরধিগম্য মহাশক্তিসিন্ধুরই এক একটি তরঙ্গ বিভিন্ন জীবজগৎ আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার ক্ষণকাল পরেই মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার এই ঈশ্বরী শক্তিমূর্তির চরণে আমরা একান্ত প্রণত হইতেছি। মা মহাশক্তি! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তারপর ব্যষ্টি ও সমষ্টি শক্তির যাহা বীজ, যে অব্যক্তক্ষেত্র হইতে এই মহতীশক্তির বিকাশ, সেই মহাকারণরূপিণী শক্তিমূর্তিকে প্রণাম করিতে করিতে নিরঞ্জনস্বরূপে চলিয়া যাই। সেখানে শক্তি বলিয়া কিছু প্রতীতি হয় না; অথচ যিনি না থাকিলে শক্তির সত্তাই থাকে না, এই শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াও যাঁহার স্বরূপের কোনও ব্যত্যয় হয় না, বাক্যমনের অতীত সেই স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া **'নমোনমঃ'** বলিয়া বারংবার প্রণাম করি।

মা গো, শুনিতে পাই—তোমার কোন কোন জ্ঞানী সন্তান নাকি তোমার পরমাত্মস্বরূপটিকে শক্তিহীন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং নানারূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যে উহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তুমিও কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদের নিকট তোমার আত্মস্বরূপটি উন্মেষিত কর। তাঁহারাও দেখুন—পরমাত্মা শক্তিহীন, রসহীন, আনন্দহীন একটা জড়বৎ বস্তু নহেন। তিনি সর্বশক্তির আধার; তিনি রসময়, তিনি আনন্দময়।

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥১৯॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! তৃষ্ণা—পিপাসা বা জলপানেচ্ছারূপে তুমিই সর্বভূতে সতত প্রকাশিতা। এই সর্বভূতের তৃষ্ণার বিষয় স্মরণ করিতে গিয়া, সর্বাগ্রে স্বকীয় তৃষ্ণার প্রতি লক্ষ্য পড়ে। মা! তুমি যে কেবল জলপানেচ্ছারূপিণী তৃষ্ণা, তাহা নহে; একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারূপেও বুকের ভিতর তুমিই ত' সদা জাগ্রত রহিয়াছ। কত জন্ম ধরিয়া তোমার এই তৃষ্ণামূর্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারি নাই! ওগো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পাইলেও যে এ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না! এতদিন এ তৃষ্ণাও যে তুমি, তাহা বুঝিতে পারি নাই, মা বলিয়া আদর করি নাই; কিন্তু আজ তোমারই কৃপায় দেখিতে পাইতেছি—আমার মধ্যে তৃষ্ণারূপে, আকুল-আকাঙ্ক্ষা-রূপে তোমারই নিয়ত প্রকাশ। এস মা তৃষ্ণারূপিণী, অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষারূপিণী, নিত্যতরুণা আশা আমার, বুকজোড়া ভরসা আমার, এস, তোমাকে একটা সত্যের প্রণাম করিয়া সকল তৃষ্ণার পরপারে চলিয়া যাই।

মা গো, এইরূপে তোমার ব্যষ্টি-তৃষ্ণামূর্তি দেখিতে দেখিতে সর্বভূতে বিরাজিত সমষ্টি তৃষ্ণার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়। ওঃ সে কি মহতী! এই জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যে মা তোমার অতৃপ্ত-লালসাময়ী মূর্তি দেখিতে পাই! এ কি মা? সর্বভূতকে এ

কি মূর্তিতে কোলে করিয়া রাখিয়াছিস ? এ যে মা তোর ঈশ্বরীমূর্তি ! যে মহতী তৃষ্ণার বিন্দুমাত্র পাইয়া জীব উন্মত্ত হয়, আত্মহারা হয়, কতকাল ধরিয়া জন্ম-মৃত্যুর পেষণ সহ্য করে, সেই সমষ্টি-তৃষ্ণাময়ী মূর্তি তুমি ! মা, যে তৃষ্ণারূপে অভিব্যক্ত হইতে গিয়া, এক অদ্বিতীয় আনন্দময়-স্বরূপ হইতে এই বহুত্বের লীলায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ, তোমার সেই মহতী তৃষ্ণার স্বরূপটি আমরা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব ? বুঝি বা না বুঝি—নমস্তস্যৈ । এস মা ! প্রণাম করি । আমাদের নিকট আর বিষয়তৃষ্ণামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিও না । রসময়ী মা কেবল তোমাকে লাভ করিবার প্রবল পিপাসা রূপে প্রকাশিত হও, আমাদিগকে ধন্য করিয়া দাও ।

তারপর যে অব্যক্ত কারণ হইতে এই মহতী তৃষ্ণা প্রাদুর্ভূত হয়, সেখানেও তোমাকে প্রণাম । অবশেষে তোমার তৃষ্ণাতীত, ভাবাতীত নির্মল বোধমাত্রস্বরূপের উদ্দেশ্যে 'নমোনমঃ' বলিয়া অসংখ্য প্রণাম করি। সেখানে তৃষ্ণা বলিতে কিছু থাকে না, তাঁহারই সত্তায় তৃষ্ণার সত্তা, তৃষ্ণারূপে প্রকাশিত হইয়াও তাঁর বিন্দুমাত্র বিকার বা মলিনতা হয় না । সেই যে মা তোমার নিরঞ্জন স্বরূপ, চল মা, সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চল ।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২০॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা ! প্রতি জীব হৃদয়ে অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষমারূপে তুমিই অধিষ্ঠিতা । অন্যকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহার প্রতীকার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেই অপকার নীরবে সহ্য করিবার ক্ষমতাই ক্ষমা । কোন প্রিয়জন কর্তৃক উৎপীড়িত হইলে যেরূপ আমরা সে উৎপীড়ন অনায়াসে সহ্য করিতে পারি, ঠিক সেইরূপ যখন সর্বপ্রকার পরাপকার সহ্য করিবার সামর্থ্য আসে, তখনই বুঝিতে পারি—তুমি ক্ষমামূর্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ । যে প্রবৃত্তির উদয় হইলে আমাদের এই পরাপকার-সহিষ্ণুতা ফুটিয়া উঠে, তাহাই তোমার ক্ষমামূর্তি। মা, তোমার এই ব্যষ্টি ক্ষমামূর্তিকে প্রণাম। মাগো তোমার এই ক্ষমামূর্তির প্রকাশ হইলেই আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করিতে পারি ।

তারপর যখন ঐ ক্ষমামূর্তির সর্বভূত পরিব্যাপক সমষ্টি-স্বরূপটি বোধে ফুটিয়া উঠে, তখন আহ্লাদে উৎসাহে হৃদয়ে শতগুণ সাহসের সঞ্চার হয় । মা সেই বিশ্বব্যাপিনী ক্ষমামূর্তিও তোমার । তোমায় কোটি প্রণাম । তুমি মা, ক্ষমাই তোমার মূর্তি ! যেখানে অপরাধ বলিয়া কিছু নাই, যেখানে অন্যায় বলিয়া কিছু নাই, যেখানে স্বেচ্ছাচারিতাই স্নেহের বহির্বিকাশ, সেই ক্ষমাময়ীমূর্তি তুমি । অন্য জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু বর্তমান জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই, তোমাকে কত অবহেলা করিয়াছি—করিতেছি ; তোমার নীরব সত্য আদেশ, তোমার অব্যক্ত স্নেহাশীর্বাদ কত উপেক্ষা করিয়াছি—করিতেছি কিন্তু মা ! তুমি ত' একদিনের তরে আমাদের প্রতি বিরক্তির কটাক্ষপাতও কর নাই । তুমি চিরহাস্যময়ী, চির ক্ষমাময়ী মা, নির্নিমেষ নয়নে শুধু আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছ ; কবে আমাদের এ ভুল ভাঙিবে, কবে আমরা তোমার কথা শুনিব, কবে আমরা সত্য সত্যই তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিব । মা তুমি ক্ষমাময়ী মূর্তিতে এই জীব-জগৎকে অনাদিকাল হইতে বুকে করিয়া রাখিয়াছ, তাই আমরা আছি ; নতুবা এমন অকৃতজ্ঞ জীব-জগতের অস্তিত্বই থাকিত না । যে জীব-জগৎ মায়ের সত্তাই স্বীকার করিতে পারে না, সেই জীব-জগৎ যে বর্তমান আছে, তাহাই তোমার ক্ষমামূর্তির অপূর্ব নিদর্শন । তোমার এই সমষ্টি মহতী ক্ষমাময়ী মূর্তিকে অসংখ্য প্রণাম ।

তারপর ক্ষমার বীজরূপিণী অব্যক্ত কারুণ্যমূর্তিকে তৃতীয় প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনক্ষেত্রে চলিয়া যাই । যেখানে ক্ষমা অথবা অক্ষমা বলিয়া কিছু নাই যাঁহার সত্তায় ক্ষমার সত্তা, ক্ষমারূপে প্রকটিত হইয়াও যাঁহার নির্গুণ সত্তার বিন্দুমাত্রও অন্যথা হয় নাই, সেই গুণাতীত মূর্তিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২১॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা, যাহা নিত্য হইয়াও বহু পদার্থে সমবেত, তাহাই তোমার জাতিমূর্তি । জন্ম হইতেই জাতির অভিব্যক্তি। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে, অথবা মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে তুমিই সমস্ত জীবকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । অল্পবয়স্ক বালক মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ 'আমি মায়ের ছেলে' বলিয়া অভিমান করে, ঠিক সেইরূপই এই জগতে যখন কেহ, 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদিরূপে কিংবা 'আমি মানুষ' 'আমি দেবতা' ইত্যাদিরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করে, তখন দেখিতে পাই — মা, তুমিই জাতি-মূর্তিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । মা, তোমার এই ব্যষ্টি জাতিমূর্তিকে প্রণাম ।

মাগো, তোমার যে সকল সন্তান বর্তমানে জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য প্রবল প্রয়াস করিতেছে, তাহারা জানে না যে জাতিরূপে তোমারই বিকাশ । নিত্যা তুমি, তোমার এই জাতিমূর্তিও নিত্যাই ; যতদিন জীব-জগৎ আছে, সৃষ্টি আছে, ততদিন জাতিভেদ থাকিবেই । শত চেষ্টায়ও তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না । তবে কালভেদে অবস্থাভেদে দেশভেদে জাতিভেদের রূপান্তর মাত্র হইতে পারে । মা তুমি বলিয়া দাও, তুমি বুঝাইয়া দাও—জাতি স্বরূপটি নিত্য, উহার বিলয় জগৎ থাকিতে হইতে পারে না ।

সে যাহা হউক মা ! তোমার এই ব্যষ্টি জাতিমূর্তিকে প্রণাম করিতে গিয়া সমষ্টি মহতী জাতি স্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয় । তখন দেখিতে পাই—ব্যষ্টি জাতিসমূহ অদ্বিতীয় জাতির তরঙ্গমাত্র, তোমার সেই সবভূত-মহেশ্বররূপিণী মহতী জাতিমূর্তিকে প্রণাম। অনন্তর এই উভয়ের বীজরূপিণী কারণস্বরূপা জাতিমূর্তিকে প্রণাম । প্রলয়কালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় হইয়া যায় বটে, কিন্তু বীজরূপে যে জাতিটি থাকিয়া যায়, তাহাই তোমার জাতিরূপিণী কারণমূর্তি । সর্বশেষে যেখানে জাতি নাই, মূর্তি নাই, প্রলয় নাই, অথচ যাহাতে এই সকল অবস্থিত, জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও যাহাতে বিন্দুমাত্র বিকার বা পরিণাম হয় নাই, সেই বাক্য-মনের অতীত স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছি। মা ! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর ।

———o———

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২২॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা, তুমি প্রতি জীবহৃদয়ে লজ্জামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াই তোমার সন্তানগণ অনেক সময় নিন্দিত কার্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয় । ওগো ! ভাবিলেও দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, যদি জীবহৃদয়ে তোমার এই লজ্জামূর্তিটির অভিব্যক্তি না থাকিত তাহা হইলে জগৎ যথার্থই পশুরাজ্যে পরিণত হইত ! একদিকে যেমন তুমি অতুলনীয়া ক্ষমামূর্তিতে জীবকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দিয়াছ, অন্যদিকে তেমনই লজ্জা-মূর্তিতে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংযত করিয়া রাখিতেছ । ধন্য তোমার কৃপা ! মা তোমার এই ব্যষ্টি লজ্জামূর্তিকে প্রণাম । অনন্তর যখন এই লজ্জাকে ঈশ্বরীমূর্তিতে বিশ্ব-ব্যাপিনী-রূপে সর্বভূতে বিরাজিতা সমষ্টি লজ্জাস্বরূপে দেখিতে পাই, তখন মনে হয়— মা ! তুমিই সংযমের মূর্তি ধরিয়া সহস্রবাহুতে স্বেচ্ছাচারী জীব-সন্তানগণকে বক্ষে টানিয়া রাখিতেছ । এই লজ্জামূর্তির ভিতর দিয়াই তোমার মাতৃ-ভাব পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত ও স্নেহের পরাকাষ্ঠা পূর্ণভাবে প্রদর্শিত হইতেছে । মা, তোমার এই সমষ্টি লজ্জামূর্তিকে প্রণাম । অতঃপর এই স্থূল, সূক্ষ্ম বা ব্যষ্টি সমষ্টি লজ্জামূর্তির যাহা বীজ বা কারণ, তাঁহাকে তৃতীয় প্রণাম করিতেছি ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ করিবার যোগ্য যে, যদিও মা, তুমি এই লজ্জামূর্তিতে সর্বভূতকে সংযত করিয়া রাখিয়াছ, যদি কোন সন্তান প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন জুগুপ্সিত কর্ম করে তবে তাহা সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকে, কিন্তু মা, তোমার কাছে কাহারও কোন লজ্জা নাই। তোমার কাছে কোন কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না । যে কথা জগতের কাহাকেও বলিতে পারা যায় না, যাহা সকলের নিকটই একান্ত গোপনীয়, সেই কথাও

নির্বিচারে অকপট হৃদয়ে তোমার কাছে খুলিয়া বলিতে পারা যায়। তুমি স্বয়ং লজ্জারূপিণী ; কিন্তু সন্তান তোমার কাছে আসিতে, তোমার কাছে প্রাণের গোপন কথা খুলিয়া বলিতে কোনই লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ করে না, ইহাই তোমার বিশেষত্ব। মা, আর একটা কথা সত্যি বল্‌ছি, আমরা সব চাইতে তোকেই যে বেশী ভালবাসি, ইহাই তাহার বহির্লক্ষণ। যতই সংসারমুগ্ধ হই না কেন, স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ প্রভৃতিকে যতই ভালবাসি না কেন, তোকে কিন্তু সে সবার চাইতেই বেশী ভালবাসি। নতুবা তোর কাছে কোন কথা গোপন করিতে পারি না, অথবা গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না কেন ? মা, তুমিই যে আমাদের যথার্থ প্রিয়তম বস্তু, যতদিন জীব এই কথাটা ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারে, ততদিনই সংসারের মোহে আচ্ছন্ন থাকে। আর যেদিন হইতে তুমি দয়া করিয়া জীব হৃদয়ে এই তত্ত্বটি উদ্ভাসিত করিয়া দাও, সেইদিন হইতেই তাহার সংসারাসক্তি কমিতে থাকে ; কিন্তু সে অন্য কথা—

যেখানে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, স্বেচ্ছাচারিতা নাই, সংযম নাই, অথচ যাঁহার সত্তায় এই সকলের সত্তা আবার এই সকল রূপে প্রকাশ হইতে গিয়াও যাঁহার স্বরূপের কোনই ব্যত্যয় হয় না, সেই **'একমেবাদ্বিতীয়ম'** তত্ত্বরূপিণী মা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

আর একটি কথা এখানেই বলা আবশ্যক মনে হয়—অনেক শিষ্য নিজ নিজ দুর্বলতাগুলিকে স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন। ইহা উন্নতির অন্তরায়। শাস্ত্রে আছে গুরুর নিকট লজ্জা করিবে না, নিঃসঙ্কোচে সকল পাপ সকল দুর্বলতা প্রকাশ করিবে। যতদিন সেরূপ ইচ্ছা না জাগে, ততদিন বুঝিতে হইবে—হয় গুরুলাভ যথার্থ ভাবে হয় নাই, অথবা গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধির অভাব আছে। সে যাহা হউক, আমরা এইবার স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত স্বরূপকে নমোনমঃ বলিয়া চতুর্থ প্রণাম করি।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥২৩॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, যদিও বিষয়সম্ভোগে যথার্থ শান্তি নাই, শান্তির আভাসমাত্র আছে ; যদিও চিত্তের পূর্ণ প্রশান্তভাব না আসিলে শান্তির সন্ধানই পাওয়া যায় না, তথাপি এই বিষয়সংগ্রহ ও সম্ভোগজনিত অস্বাভাবিক চিত্তবিক্ষেপের ভিতর দিয়া যে কণামাত্র শান্তি কদাচিৎ আমাদের হৃদয়টাকে ক্ষণকালের জন্য পবিত্র করিয়া দিয়া যায়, সেই শান্তিমূর্তি তোমারই। সর্বভূতেই তোমার ঐ মূর্তির অল্পাধিক বিকার দেখিতে পাওয়া যায় ; উহাই তোমার ব্যষ্টি-শান্তিমূর্তি। মাগো, তুমি যখন শান্তিময়ী মূর্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বস, তখনই ত' আমরা শান্তির স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হই, যদিও ক্ষণকালমাত্র, তথাপি উহাই অপূর্ব ! মা, তোমার যে সকল সন্তান শান্তির আশায় বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাদের বুঝাইয়া দেও, শান্তি বাহিরে নহে—অন্তরে। এস মা, শান্তিরূপিণী তোমাকে প্রণাম করি। তারপর চল মা, দেখি— যেখানে তোমার মহতী শান্তিমূর্তি, যেখানে গেলে একটা অসীম শান্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে গেলে এই সংসারতাপসন্তপ্ত বক্ষঃস্থল চিরতরে জুড়াইয়া যায়, চল মা চল, একবার সেইখানেই যাই। সে কি মধুময়ী অবস্থা ! আঃ ! সে যে অনির্বচনীয়। কেবল শান্তি ! কেবল শান্তি ! শোক নাই, তাপ নাই, জ্বালা নাই, কেবল বুকজোড়া শান্তি ! সে শান্তিসমুদ্রকে ধরিয়া রাখিবার মত সামর্থ্য এ ক্ষুদ্রবক্ষে নাই। মা, তোমার সেই সমষ্টি মহতী শান্তিমূর্তিকে অসংখ্য প্রণাম। তুমি আমাদিগকে ক্ষণকালের তরেও তোমার এই মহতী শান্তিমূর্তির অঙ্কচ্যুত করিও না। যতদিন বিষয়-ভোগের আসক্তি বিদূরিত না হয়, ততদিন তোমার এই অনির্বচনীয় কেবল শান্তিমূর্তির সন্ধানই পাওয়া যায় না। তোমার এই মহতী শান্তিমূর্তিকে প্রণাম করিতে করিতে আমরা ক্রমে এমন এক অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হই, যেখানে শান্তির ঐরূপ মহত্ত্ব, ঐরূপ ব্যাপকতা কিংবা বিশিষ্টতা নাই, কেবল অব্যক্তরূপে শান্তির বীজ অবস্থিত আছে, যাহা হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি শান্তিমূর্তি ফুটিয়া উঠে, মাগো ! তোমার সেই কারণরূপিণী শান্তিমূর্তিকে তৃতীয় প্রণাম। তারপর যেখানে কিছু নাই, অথচ কিছুর অভাবও নাই, যেখানে শান্তি বলিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না,

অথচ অশান্তিরও লেশমাত্র নাই, সেই যে তোমার ত্রিগুণাতীত বাক্যমনের অগোচর নিরঞ্জনস্বরূপ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদিগকে নিত্যশান্তিময় অবস্থায় লইয়া চল।

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! শ্রদ্ধা বলিলে প্রথমেই তোমার ব্যষ্টি শ্রদ্ধামূর্তির দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়। যদিও গুরু এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হয়, তথাপি নিরুক্তকার যাস্ক শ্রদ্ধা শব্দের যে নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। **'শ্রঃ সত্যম্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা'**। যে প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রতীতি নিয়ত সত্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই যথার্থ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য। মা, যাহাদিগকে তুমি এই কল্পিত মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তাহাদের হৃদয়ে সর্বপ্রথমেই তোমার শ্রদ্ধামূর্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা গুরুবাক্যে বেদান্তবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবান হয়, সত্যের প্রতিষ্ঠাই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই সব বহির্লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি—মা, তুমি ঐরূপ জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধামূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছ। অল্প হউক, বেশী হউক, সর্ব জীবের হৃদয়ে ব্যষ্টি শ্রদ্ধামূর্তিতে তুমি নিয়তই প্রকাশিত রহিয়াছ। মা, তোমাকে প্রণাম।

গীতায় উক্ত হইয়াছে **'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং'**। শ্রদ্ধা আত্মস্বরূপ জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা। যতদিন শ্রদ্ধা লাভ না হয়, ততদিন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আশা বৃথা। শ্রদ্ধা ও নিশ্চয় জ্ঞান প্রায় একই কথা, সংশয় থাকিতে নিশ্চয় জ্ঞান হয় না, তাই বুঝিতে হয় যতদিন সংশয় থাকে, ততদিন মা আমার শ্রদ্ধামূর্তিতে প্রকাশিত হয় নাই, শ্রদ্ধা একবার লাভ হইলে তাহা নষ্ট হয় না। সাধারণতঃ মনে হয়—আমরা অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, বাস্তবিক তাহা নহে, শ্রদ্ধা আমাদের জ্ঞানেরই একটি অপূর্ব অবস্থা, উহা সত্যরূপে নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়, যতকিছু সাধনা ভজন এই শ্রদ্ধালাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহার শ্রদ্ধালাভ হইয়াছে তিনি ধন্য। সে যাহা হউক, মা তোমার ব্যষ্টিশ্রদ্ধামূর্তিকে প্রণাম করিতে করিতে সমষ্টি শ্রদ্ধামূর্তির দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সুবিশাল শুভ্র আকাশরূপে নিস্তরঙ্গ মহোদধিকল্পা মহতী শ্রদ্ধামূর্তিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবস্থিত, তোমার এই মহেশ্বরী শ্রদ্ধামূর্তির অঙ্কেই সমগ্র জীবজগৎ পরিশোভিত। মা! তোমার এই সমষ্টি ঈশ্বরী শ্রদ্ধামূর্তির চরণে প্রণাম।

অনন্তর এই ব্যষ্টি সমষ্টি শ্রদ্ধার যাহা বীজ, সেই অব্যক্ত কারণরূপিণী শ্রদ্ধাকে 'নমস্তস্যৈ' বলিয়া তৃতীয় প্রণাম করিয়া, একেবারে গুণাতীত-স্বরূপে উপনীত হই। যেখানে শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধা বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় শ্রদ্ধার সত্তা, শ্রদ্ধারূপে প্রকাশিত হইয়াও যাঁহার স্বরূপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। মাগো, তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধামূর্তিতে প্রকটিত হও। আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হই।

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! কান্তি বা সৌন্দর্যরূপে তুমিই সর্বত্র সর্ববস্তুতে নিত্য উদ্ভাসিতা। জীব যতই কুৎসিত বা কদাকার হউক না কেন, প্রত্যেকের মধ্যেই কান্তি নামক একটা পদার্থ আছে। প্রত্যেক মানুষই ঐ কান্তির কিয়দংশ উপলব্ধি করিতে পারে। তদ্ভিন্ন পুষ্পে, পদ্মে, চন্দ্রে, শিশু এবং কামিনীর মুখমণ্ডলে একটা কি যেন জিনিষ আছে, তাহা দর্শনমাত্র আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হয়, উহাও মা, তোমার ঐ কান্তি-মূর্তিরই অভিব্যক্তি। যতদিন তুমি জীবদেহে চেতনারূপে অধিষ্ঠিতা থাক ততদিনই তোমার এই কান্তিমূর্তি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কেবল প্রাণীদেহে নয়, বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদনদী, গ্রহনক্ষত্র

সর্বত্রই তোমার এই বিশিষ্ট কান্তিমূর্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মা, ইহাই তোমার কান্তিমূর্তির ব্যষ্টিরূপ। এই ব্যষ্টি কান্তিরূপিণী তোমাকে প্রণাম।

ক্রমে ব্যষ্টিবস্তু ছাড়িয়া দিয়া, যখন সর্বভূতমহেশ্বরী মহতী কান্তিমূর্তির দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়, তখনই এই সমগ্র জগৎ কান্তিময় সৌন্দর্যময়, সুতরাং মধুময় হইয়া উঠে। মাগো, তখন এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণাশক্তি যতদূর প্রসারিত হয়, ততদূর কেবল তোমারই কমনীয় কান্তি —আকাশবৎ সর্বতঃপ্রসৃত রূপহীন কমনীয় রূপ দেখিয়া, উপলব্ধি করিয়া, ভোগ করিয়া আমরা কেমন হইয়া পড়ি! মা গো! তখন আমার আমিত্বটা কান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সেই অরূপ রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়া আমিটি যে কি অনির্বচনীয় ভাবময় হইয়া পড়ে, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? ওগো! যে রূপ দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ আত্মহারা হইয়া ছুটিত, যে রূপ দেখিয়া গাভীদল অর্দ্ধভুক্ত তৃণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিত, যে রূপ দেখিয়া জড় যমুনা প্রাণময়ী হইয়া উজান বহিয়া যাইত, এ যে সেই রূপ গো সেই রূপ। এ যে যথার্থই কুলমজান রূপ! মনপ্রাণহারা রূপ! একবার এ কমনীয় কান্তি যাহার নেত্রপথে নিপতিত হয়, এ সংসারে —ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নাই, যাহার প্রয়োজনে সেই লোভনীয় কান্তির স্মৃতি হইতে জীব বিচ্যুত হইতে পারে। মা, সেই বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত সৌন্দর্যময়ী তোমার কান্তিমূর্তিকে প্রণাম।

অনন্তর যে অব্যক্ত বীজ হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি কান্তির প্রাদুর্ভাব সেই কারণরূপিণী কান্তিমূর্তিকে প্রণাম। অবশেষে তোমার নিরঞ্জন-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া বারংবার প্রণাম করি। যেখানে কান্তি বলিয়া কিছু নাই, অথচ কান্তি যাহার প্রকাশে প্রকাশিত, কান্তিরূপে প্রকাশিত হইতে গিয়া যাহার অব্যয় স্বরূপের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, সেই পরম কমনীয়, পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মস্বরূপকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। পূর্বে বলা হইয়াছে—লক্ষ্মী শব্দের অর্থ প্রাণ। জীবদেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই সে লক্ষ্মী বা শ্রীযুক্ত থাকে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ শোভা সম্পৎ—সৌন্দর্য, যাহা কিছু কর, প্রাণই ঐ সকলের একমাত্র আধার।

মাগো, সর্বভূতে প্রাণরূপে তুমিই লক্ষ্মীমূর্তিতে বিরাজিত রহিয়াছ। ইন্দ্রিগ্রাহ্য না হইলেও এই মূর্তি আমাদের নিয়তই অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তি কখনও প্রাণের অভাব অনুভব করে না। এই যে প্রতি জীবনের নিয়ত অনুভবযোগ্য প্রাণস্বরূপ, ইহাই মা তোমার ব্যষ্টিলক্ষ্মীমূর্তি। এস প্রাণরূপিণী মা, তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম করি।

সাধক! তোমার অন্তরে অন্তরে প্রাণরূপে যাহার প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছ, উহাই মায়ের ব্যষ্টি লক্ষ্মীমূর্তি। প্রথমে ঐ ব্যষ্টি প্রাণরূপিণী মাকে **'নমস্তস্যৈ'** বলিয়া প্রণাম কর। তারপর বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণরূপে অবস্থিত সমষ্টি প্রাণময়ী মাতৃ-মূর্তিকে দর্শন কর। দেখ—একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গগুলি জীবরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুদিন ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ, আজ আর অবজ্ঞা করিও না, আজ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত **'নমস্তস্যৈ'** বলিয়া প্রণাম করিতে গিয়া, আপনার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকু সেই মহাপ্রাণসমুদ্রে ঢালিয়া দাও, তোমার জীবত্বের অবসান হউক। অনন্তর এই ব্যষ্টি সমষ্টি প্রাণের যাহা কেন্দ্র, সেই সূক্ষ্মকারণরূপী অব্যক্ত প্রাণসত্তাকে প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনক্ষেত্রে উপনীত হও, নমোনমঃ বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাও, আত্মলাভ কর।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৭॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে বৃত্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। বৃত্তি শব্দের অর্থ জীবিকা অথবা চিত্তবৃত্তি।

অব্যক্ত চৈতন্য যখন কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া বর্তমানবৎ প্রকাশিত হন, অর্থাৎ ব্যক্তভাবাপন্ন হন, তখনই তিনি বৃত্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন । জীবিকারূপ বৃত্তিও চৈতন্যের এই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

মা আমরা প্রতিনিয়ত তোমার এই বৃত্তিস্বরূপটির উপলব্ধি করিয়া থাকি । কি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, কি অন্তঃকরণ-বৃত্তি, সর্বরূপেই তুমি নিয়ত প্রকাশিত । একদিনও তোমার এই মূর্তিকে আদর করি নাই, একদিনও ইহাকে মা বলিয়া বুঝি নাই ; আজ তুমি কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছ ; বৃত্তিরূপে তুমিই যে প্রকাশিত, ইহা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা দিয়াছ ; আজ সেই চির অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া 'নমস্তস্যৈ' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রণাম করিতেছি । ব্যষ্টিবৃত্তিরূপিণী মা তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর ।

তারপর সমষ্টির দিকে—সূক্ষ্মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, বিশ্বময় এক অখণ্ড বৃত্তিনামক বস্তুই আছে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপে প্রকাশিতা সেই মহতী বৃত্তিরূপিণী ঈশ্বরী মূর্তিরই এক একটি স্ফুরণ প্রতি জীবের ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই মহতী বৃত্তিরূপিণী ঈশ্বরী মা, তোমার চরণে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম !

অনন্তর যে সূক্ষ্মতম অব্যক্ত কারণ হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি বৃত্তির প্রকাশ এবং যে কেন্দ্রে পুনরায় ইহার বিলয় হয় ; মা ! তোমার সেই অব্যক্ত কারণমূর্তিকে প্রণাম করিয়া, সর্বশেষে নিরঞ্জনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হই । যেখানে বৃত্তি বলিয়া কিছু নাই, কেবল বিশুদ্ধ চিৎ ; যেখানে উপস্থিত হইলে সর্ববৃত্তি সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেই গুণাতীত স্বরূপকে নমোনমঃ বলিয়া প্রণাম করিতেছি । মা ! কবে তুমি আমাদের এই প্রণাম সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবে ? বৃত্তিরূপিণী মা আমার, তুমি যখন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বোধাকারা অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখনই আমাদের এই প্রণাম সার্থক হইবে ।

—o—

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৮॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম !

ব্যাখ্যা । মাগো, বৃত্তির পরেই তোমার স্মৃতিমূর্তিটি উদ্ভাসিত হয় ; কারণ, প্রথমে বৃত্তিরূপে যে ভাবটি প্রকাশিত হয়, পরে তাহাই সংস্কাররূপে চিত্তে আহিত হয় । সেই আহিত ভাবটি যখন পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই উহা স্মৃতিনামে অভিহিত হয় । মা স্মৃতিরূপেই ত' তুমি জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসমষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছ ! এক একটা মৃত্যুর সঙ্গেই যদি সেই জন্মের লব্ধজ্ঞানগুলি হারাইয়া যাইত, তবে আর আমাদের পূর্ণজ্ঞান লাভের আশাই থাকিত না, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যাইত না, অনন্তকাল অজ্ঞান নরকে পচ্যমান হইতে হইত, কিন্তু স্নেহময়ী মা আমার ! তুমি এই অনাদি অজ্ঞান হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছ ; তাই আমরা স্মৃতিরূপিণী তোমার স্নেহময় অঙ্কে অবস্থান করিয়া জন্মের পর জন্ম ধরিয়া কেবল জ্ঞানরাশিই সঞ্চয় করিতেছি । তাহার ফলে একদিন '**অহং ব্রহ্মাস্মি**'রূপ চরমস্মৃতিতে উপনীত হইব । জীবত্বের ধাঁধা চিরতরে অবসিত হইয়া যাইবে । এস ব্যষ্টি স্মৃতিরূপিণী কেবল আমার মা, এস তোমায় প্রণাম করি । তারপর তোমারই কৃপায় তোমার সেই সর্বভূতমহেশ্বরী সমষ্টি-স্মৃতিমূর্তির সমীপে উপনীত হইয়া দেখিতে পাই—এক মহতী স্মৃতিমূর্তি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে । সর্বভূতে যে বিভিন্ন স্মৃতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঐ সমষ্টি-স্মৃতি-সমুদ্রেরই ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র । মা ! তোমার এই ঈশ্বরী স্মৃতিমূর্তিকে প্রণাম । অনন্তর সর্বস্মৃতিবীজরূপিণী অব্যক্ত-কারণমূর্তিকে প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনস্বরূপে উপনীত হই । যখন আমাদের জীবত্ব-স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, '**অহং ব্রহ্মাস্মি**' এইরূপ স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবুদ্ধ থাকে, তখনই আমরা তোমার নির্গুণ স্বরূপের সন্ধান পাই । যেখানে স্মৃতি বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় স্মৃতির সত্তা, স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়াও যাঁহার নির্গুণত্বের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ।

—o—

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৯॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । মা, জীবের দুঃখ দর্শন করিলে, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে ইচ্ছা জাগে, উহাই তোমার দয়ামূর্তি । প্রত্যেক জীবহৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে তোমার এই ব্যষ্টি-দয়ামূর্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । মা ! তোমার এই মূর্তিকে আমরা প্রণাম করিতেছি । মাগো, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে বলিয়া দাও,—যখন তাঁহারা কাহারও দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিছু দান করিতে উদ্যত হন, অথবা অন্য কোন প্রকার উপকার করিতে চেষ্টা করেন, তখন যেন তাঁহারা—'দুঃখীর প্রতি করুণা করিলাম', 'পরের উপকার করিলাম'—এরূপ জ্ঞানে দান বা উপকার না করেন ; কারণ উপকার অন্যের করা হয় না ; বাস্তবিক উপকার নিজেরই হইয়া থাকে । যখন কোন অন্ধ, খঞ্জ অথবা দরিদ্র আর্তব্যক্তি কিছু প্রাপ্তির আশায় কাহারও নিকট প্রার্থনা করে, তখন কার্যতঃ তাহার সেই কাতরভাব দর্শনে দাতার হৃদয়ে দয়াবৃত্তির উদ্বোধ হইয়া থাকে ; হয়ত দাতা তখন সংসারের ধাঁধায় ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ ঐরূপ কোন দরিদ্র বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তির কাতরভাব দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় । এই যে দয়া, উহা তোমারই মূর্তি । তুমিই ত' মা দয়ামূর্তিতে তখন তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছ ! দাতা যদি ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন এবং **'নমস্তস্যৈ'** বলিয়া তোমাকে প্রণাম করিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িবেন । যে দরিদ্র ব্যক্তি দাতাকে দয়ারূপিণী মাতৃ-মূর্তি দেখাইয়া দিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকা যায় কি ? সেই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান স্বরূপ যাহা কিছু দান করা যায়, যাহা লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর হইবেই ; সুতরাং এইরূপ দানের ফলে গ্রহীতা যত উপকৃত হন, দাতা তদপেক্ষা সহস্রগুণে উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । দয়া সাত্ত্বিকী বৃত্তি । ইহার যত বেশী অনুশীলন হয়, মানুষ ততই সুখী হয় । যে ব্যক্তি আমাদিগকে এই সাত্ত্বিকী বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ করিয়া দেয়, সে যত দীন-দরিদ্রই হউক না কেন, আমরা যে তাহার নিকট বিশেষভাবে উপকৃত এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । সেই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ যতই অধিক দান করা হউক না কেন, লব্ধ উপকারের তুলনায় উহা অতি সামান্য মাত্রই হইয়া থাকে ।

সাধক ! তুমি দরিদ্রকে দান করিতে গিয়া দেখিও —একদিকে মা স্বয়ং দরিদ্রমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবেই কিছু প্রার্থনা করিতেছেন, অন্যদিকে ঐ কাতরভাবই তোমার হৃদয়ে মায়ের দয়ামূর্তিতে আবির্ভাবের হেতু হইতেছে । তুমি বিষয়-চিন্তায় ব্যস্ত ছিলে, মুহূর্তমধ্যে সে বিষয়চিন্তা দূরীভূত করিয়া যে তোমাকে দয়ারূপিণী মাতৃ-মূর্তি দেখাইয়া দিল, তুমি তাহার নিকট কত ঋণী ! তোমার সর্বস্ব দিলেও তাহার প্রতিদান হয় কি ? এইভাবে দান বা উপকার করিতে পারিলেই, দানের সার্থকতা হয় । মনে রাখিও —যখনই তোমার অন্তরে পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা আবির্ভূত হয়, তখন ঐ ইচ্ছাটিকে চিত্তের একটা সামান্য বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ মা বলিয়া বুঝিয়া লইও ! দেবতাদের মত তুমিও উঁহার চরণে—এই দয়ারূপিণী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিও ; পরমানন্দ পাইবে ।

এইবার আমরা দয়ার ব্যষ্টিমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া সমষ্টিমূর্তির সমীপস্থ হইব । সে মূর্তির সমীপস্থ হইলে বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দয়া ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় না । এই অগণিত জীববৃন্দ এই মহতী দয়ামূর্তির বক্ষেই অবস্থিত । জন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রা শোক সুখ প্রভৃতি সর্বাবস্থায় জীব একমাত্র মহতী দয়ার বক্ষেই অবস্থিত । ওগো ! যে দয়ার দান আমার প্রাণ, যিনি দয়া করিয়া, ভালবাসিয়া আমাকে প্রাণনামক বস্তুটি দিতে পারেন, সে দয়ার সীমা যে কোথায়, তাহা কে বলিবে ? মা তোমার এই মহতী ঈশ্বরী দয়ামূর্তিকে শত শত প্রণাম । যাহারা তোমার এই দয়ামূর্তি না দেখিয়া রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে উৎপীড়িত হইয়া তোমার নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পায়, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধ । শুন, একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি—

কোনও গভীর অরণ্যে জনৈক মুসলমান গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া নিপতিত ছিল । তাহার সমুদয় শরীরে ক্ষত, তাহাতে অসংখ্য কৃমি, দুর্গন্ধে কেহ নিকটে যাইতে

পারে না, একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় দিনান্তে কিছু আহার্য অতি কষ্টে তাহার মুখের কাছে রাখিয়া যাইত। উহার দ্বারাই কোনরূপে সে জীবিত ছিল। তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মৃত্যুই তাহার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে হইত, এমনই ভাবে সে দিনপাত করিতেছিল। দৈববশে এক ফকির সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার বর্তমান দুর্দশা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন —হায় ! পরমেশ্বর কি নিষ্ঠুর ! তিনি তোমায় কত কষ্টই দিতেছেন। তোমার শরীরে এমন একটুও স্থান নাই, যে স্থানটি অক্ষত। উঃ ! কি যাতনাই তুমি ভোগ করিতেছ ! তাহা শুনিয়া রোগী সরল হাস্যপূর্ণমুখে বলিল, 'না ফকির সাহেব, তুমি খোদাকে নিষ্ঠুর বলিও না, তিনি পরম দয়াময়, এই দেখ— আমার কণ্ঠ এখনও অক্ষত আছে, এখনও আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার গুণকীর্তন ও নাম গান করিতে পারি ; ধন্য দয়া তাঁর, যাঁহার কৃপায় আমি এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।' এইরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ফকির অচিরাৎ তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

সত্যই এইরূপ যাহারা সর্বাবস্থায় ভগবানের দয়া ব্যতীত নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতেও পারে না, তাহার কখনও কোনরূপ দুঃখেই একান্ত ক্লিষ্ট বা উৎপীড়িত হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু সে অন্য কথা—

মা ! এই বিশ্বের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত' তোমার ঘনীভূত দয়ামূর্তি দেখিতে পাই। প্রত্যেক পদার্থ, প্রতি জীব ঘনীভূত দয়ার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পূর্বে যে ক্ষমারূপে তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা এই দয়ামূর্তিরই অন্যতম বিকাশ মাত্র। এইরূপে যে অসীম দয়া-সমুদ্রে আমরা নিয়ত অবস্থিত, তোমারই সেই পরমেশ্বরী মহতী দয়ামূর্তির চরণে অসংখ্য প্রণাম। তারপর যে অব্যক্ত-কেন্দ্র হইতে এই ব্যষ্টি-সমষ্টি দয়ার স্ফুরণ হয়, সেই কারণ-রূপিণী দয়ামূর্তিকে প্রণাম করিয়া একেবারে নিরঞ্জনক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে দয়া বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় দয়ার সত্তা, যিনি দয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াও নিত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা তুমি তুষ্টিরূপিণী। ইষ্টপ্রাপ্তি কিংবা অনিষ্টনিবৃত্তিতে ক্ষণকালের তরে অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, উহাই তোমার তুষ্টিমূর্তি। ব্যষ্টিরূপে প্রতিজীবে তুমি এই মূর্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম। তারপর যখন তোমার সমষ্টি তুষ্টিমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই—বিশ্বময় এক অখণ্ড তুষ্টি-সমুদ্র। জীবগণ তাহারই মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শোকার্তের কাতর ক্রন্দন, রোগার্তের রোগযন্ত্রণা, ক্ষুধার্তের ক্ষুধার জ্বালা, এসকলের মধ্যেও তোমার তুষ্টিমূর্তি অব্যাহতভাবেই বিরাজিত রহিয়াছে। জীব যদি কাঁদিয়াও তুষ্টির সন্ধান না পাইত, তবে কাঁদিত না। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকল জীবই তুষ্টির পূজা করে, তুষ্টির সেবা করে, তুষ্টিরই সন্ধানে অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর পেষণ সহ্য করে। মা, তোমার এই মহতী পরমেশ্বরী তুষ্টিমূর্তিকে প্রণাম। মাগো, গীতশাস্ত্রে তুমি বলিয়াছ যে, যে ব্যক্তি 'সতত সন্তুষ্ট' সেই তোমার প্রিয় ভক্ত ; কিন্তু মা যাহারা তোমার এই মহতী সর্বব্যাপিনী তুষ্টিমূর্তির সন্ধান পায় নাই, তাহারা কি সতত সন্তুষ্ট থাকিতে পারে ? এ জগতে যে প্রায় সর্বত্রই একটা তুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার একমাত্র হেতু— প্রারব্ধ কর্মের ফল অপেক্ষা বেশী বা অন্যরূপ ফল লাভের ইচ্ছা এবং যখন যে ফল লাভ হইবে, তাহার পূর্বেই সেই ফল লাভের জন্য ব্যাকুলতা ! এই দুইটিই যত অতৃপ্তির মুল। প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। এবং যখন যে ফল পাওয়ার জন্য যে সময়টি নির্দিষ্ট আছে, তাহার পূর্বে কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। ইহা যদি মানুষ বুঝিতে পারে, তবে আর কোন অবস্থায়ই মানুষের তুষ্টির অভাব হয় না—হইতে পারে না। মাগো, তুমি যতদিন জীব হৃদয়ে অতৃপ্তি মূর্তিতে প্রকাশিত থাক, ততদিন কি করিয়া জীব তৃপ্তির—তুষ্টির সন্ধান পাইবে ? তাই বলি মা, তুই তোর মহতী তুষ্টি স্বরূপটি প্রকটিত করিয়া জীবের পূর্বোক্তরূপ মিথ্যা দুরাশাজনিত অতৃপ্তি দূর করিয়া দে, এ দুঃখময়

জগৎ তোর তুষ্টিমূর্তিতে অবস্থান করিয়া ধন্য হউক। আমাদের এই ব্যষ্টি সমষ্টি প্রণাম সার্থক হউক! তারপর আমরা কারণতত্ত্বে প্রবেশ করি।

যে অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে এই তুষ্টির আবির্ভাব, তোমার সেই কারণমূর্তিকে প্রণামপূর্বক নিরঞ্জনসত্তায় উপনীত হই, যেখানে তুষ্টি অতুষ্টি কিছুই নাই, যাহার সত্তায় তুষ্টির সত্তা, তুষ্টিরূপে প্রকাশিত হইতে গিয়াও যাঁহার স্বরূপের কোন বিকার হয় না, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥৩১॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মাতৃ-রূপিণী মাগো, তোমাকে প্রণাম। তুমি সকল জীবকে বীজরূপে গর্ভে ধারণ করিয়া থাক। তারপর উহাকে ব্যক্ত অবস্থায় আনিবার জন্য তপঃক্লেশ বা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ কর। তখন জীবনামে একটা পৃথক সত্তা পরিলক্ষিত হয়; এইরূপে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আনিয়া অর্থাৎ গর্ভ হইতে প্রসব করিয়া স্তন্যদানে —খণ্ড খণ্ড বিষয়-জ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট করিতে থাক। অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া তুমি স্নেহময়ী মা নির্নিমেষ নয়নে সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া থাক। জীবের—সন্তানের মিথ্যা আমিত্বের কল্পিত অভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে থাক! এইরূপ জ্ঞান-স্তন্য-পরিপুষ্ট সন্তান ক্রমে মাতৃ-সত্তায় বিশ্বাসবান হয়, জীব-কর্তৃত্ব ভুলিয়া যায়, সর্বতোভাবে তোমাকে জড়াইয়া ধরে, আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন তুমিই তাহাকে আবার আপনাতে মিলাইয়া মাতাপুত্র-সম্বন্ধহীন এক অজ্ঞেয়-তত্ত্বে উপনীত হও। মা, ইহাই ত' তোমার সুপ্রকট মাতৃ-মূর্তি! এইরূপে তোমার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও নিরঞ্জনস্বরূপে তোমার মাতৃত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি দেখিয়া, আত্মা মা আমার! তোমার চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি।

সাধক! এইরূপ অভয়বাণীর আর কোথাও পাইয়াছ কি? গীতার সে অভয়বাণী মনে আছে? **'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্'**। সেখানেও ভজনা করিবার উপদেশ আছে। আর এখানে—এই দেবী-মাহাত্ম্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেবতাগণ মায়ের স্তব করিতে করিতে এমনই একটা কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহা আর কোথাও এমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। 'আত্মাই আমার মা' ইহা অপেক্ষা আশ্বাসবাণী আর কি থাকিতে পারে? আমি যে কোনও অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার মায়ের কোলেই রহিয়াছি। যতদিন আমি আমাকে একটি পৃথক্ জীবরূপে মনে করিব, যতদিন আমি সর্বত্বে—বহুত্বে মুগ্ধ থাকিব, ততদিনও আমি মায়ের কোলে। ধন্য আমি! ধন্য আমার জীবন! আমার আর অন্বেষণ করিবার কিছু নাই, আমার আর অভাব বলিয়া কিছু নাই, আমার আর হিতাহিত বিচার করিবার কিছু নাই। আরে, আমি যে আমার মায়ের কোলে রহিয়াছি! কেবল আমি নই—সর্বভূত, এই জগৎটা, এই ব্রহ্মাণ্ডটা মায়ের কোলে। ওগো! তোমরা মায়া বল, জড়া প্রকৃতি বল, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দাও, ক্ষতি নাই, আমি জানি—আমি মায়ের কোলে, এ ব্রহ্মাণ্ডটা মায়ের কোলে! আবার যেখানে আমি নাই, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সেখানেও মা আছেন— অব্যক্তরূপে কারণরূপে। আর তারপর? তারপর কি আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব! সে যে ভাবিতেও পারি না! তবে—'অস্তি অস্তি অস্তি', 'আনন্দ আনন্দ আনন্দ' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে যে বুঝি নাই, তাঁহাকে যে পাই নাই, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া থাকি।

মা, স্থূলে বা ব্যষ্টিতে তুমি কেবল আমার একার মা, সূক্ষ্মে বা সমষ্টিতে তুমি আমাদের সকলের—বিশ্বের মা, কারণে তুমি আমার এবং বিশ্বের গর্ভধারিণী মা, আর তুরীয়ে তুমি আমি এবং বিশ্ব বলিয়া কোন ভেদ নাই, সেখানে তুমি কেবল মা—আত্মা—ব্রহ্ম। এইরূপে স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে এবং কারণাতীত স্বরূপে তোমাকে নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমোনমঃ বলিয়া প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

———○———

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥৩২॥

অনুবাদ । যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।

ব্যাখ্যা । এমন সত্যবাণী বোধ হয় আর কোন শাস্ত্র কিংবা কোন দর্শনকার প্রচার করিতে সাহস করেন নাই । দেবীমাহাত্ম্যের আর সকল অংশ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র এই দুইটি মন্ত্র (মাতৃ-রূপ এবং ভ্রান্তিরূপ) জগতে যে সত্য ও সামর্থ্য আনয়ন করিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা অতুলনীয় । ভ্রান্তি বলিয়া যাহাকে উড়াইয়া দিতে চাও, ঐ ভ্রান্তিরূপেই যে মা ! ওগো, আমার একটি মাত্র মুখ, একটি মাত্র লেখনী, একটি মাত্র মন, এ সকলই আবার অতিশয় ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র সাধনা লইয়া, এই দুইটি মন্ত্র জগৎকে যে কি দিয়া গিয়াছে, তাহা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব । কেন যে দেবী-মাহাত্ম্য ভারতের প্রতিগৃহে পঠিত হয়, তাহা এই দুইটি মন্ত্রের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় । এমন দুর্বলের বল, এমন হতাশের আশ্রয়, এমন অভয়বাণী জীবের মর্মে মর্মে এমন করিয়া আর কেহ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন কিনা জানি না । বেদে উপনিষদে যে সত্যটি ভাষার আবরণে প্রচ্ছন্ন আছে, দেবীমাহাত্ম্যে তাহাই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন ।

শুন, ভ্রান্তিও কিরূপে মা হয়— তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তই ধর । রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির ন্যায় নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি হইতেছে । আচ্ছা বেশ, রজ্জু যেরূপ কখনও সর্প নহে, কিংবা রজ্জুতে যেরূপ কোন কালেই সর্প নাই, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ নহে কিংবা ব্রহ্মে কোনকালেই জগৎ নাই । এস্থলে যদি জিজ্ঞাসা করি, ভ্রান্তি কাহার ? তদুত্তরে বলিবে—যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার ! ব্রহ্মে ভ্রান্তি নাই, তিনি নির্মল চিৎস্বরূপ ; জীবই ভ্রান্ত । ভাল, রজ্জুটা জড় পদার্থ ! তাহাতে যখন সর্পের অধ্যাস হয়, তখনও রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান নাই, ইহা খুবই ঠিক ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ —রজ্জুটা যদি চেতন অর্থাৎ বোধস্বরূপ বস্তু হইত, তবে ঐ যে সর্পের অধ্যাস, উহাও সেই বোধে প্রতিভাত হইত নাকি ? নিশ্চয়ই হইত ; কারণ, বোধের নিকট যাহা ধরিবে, তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ইহাই বোধের স্বরূপ । সুতরাং রজ্জুস্থানীয় ব্রহ্মের চিদ্রূপত্ব নিবন্ধন, তাহাতে যে সর্পস্থানীয় জগতের অধ্যাস হয়, তাহাও ব্রহ্মের প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে । আর বাস্তবিক মনুষ্য মাত্রেরই অনুভবও সেইরূপ । আধুনিক কোন কোন মায়াবাদী এই কথাটি স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মের মাত্র অস্তিত্ব-অংশ এবং মায়ার জড়ত্ব-অংশ, এতদুভয়েই অধ্যাস হয় । আচ্ছা, তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়াই জিজ্ঞাসা করি—চৈতন্যশূন্য অস্তিত্বের ভাণ হয় কি ? কখনই হয় না । অস্তিত্ব এবং চৈতন্য অভিন্ন বস্তু ; সুতরাং জগদ্রূপে যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে সহস্রবার ভ্রান্তি বলিলেও ঐ ভ্রান্তি ব্রহ্মের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশেই প্রকাশিত। ব্রহ্মে কোন না কোন অবস্থায় যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; অতএব ভ্রান্তিও ব্রহ্ম । যাক, এসব বিচারের কথা ; এ সব মস্তিষ্কধর্মের বিচার । আচার্য ভাষ্যকার যে ভাবে বা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কোন কোন মায়াবাদীর হাতে পড়িয়া আচার্যের সেই অনাক্ষিপ্ত দিগ্বিজয়ী বাণীও আজকাল আক্ষেপযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয় । আমরা ভগবান ভাষ্যকারকে অসংখ্য প্রণাম করি । তিনি যথার্থই জগদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

সে যাহা হউক, আমরা জানি— মা, যতদিন জগৎ আছে, দেহ আছে, ততদিন তোমার এই অনির্বচনীয় ভ্রান্তিমূর্তি থাকিবেই ; ওগো ভ্রান্তি না হইলে যে এই জগৎখেলাই থাকে না । জ্ঞানময়ী তুমি ভ্রান্তিময়ী হইয়াই ত' এই অচিন্তনীয় জগৎলীলা সম্পাদন করিতেছ, আমরা ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই, তাই ত' ভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাই না । মাগো, এই যে দিন রাত তোকে ভুলিয়া, আমাকে ভুলিয়া ; বিনশ্বর বিষয় নিয়া ব্যস্ত থাকি, এই যে ভুল, এই যে ভ্রান্তি, ইহাও তুমি । যতদিন তুমি ভ্রান্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে, ততদিনে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত করে । আবার যে দিন তুমি তোমার আত্মস্বরূপটি প্রকটিত করিবে, সেইদিন তোমার এই ভ্রান্তিমূর্তিই আমাদের জগৎ-জ্ঞান— ভেদজ্ঞান ভুলাইয়া দিবে । ভ্রান্তি না থাকিলে ওগো, কি করিয়া জগৎ ভুলিব ! এই যে খেলাধুলা, এই যে মলিনতা, এই যে তোমার আমার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ব্যবধান, আশা আছে— এই

সকলই একদিন তুমি ভ্রান্তিরূপে মুছাইয়া দিবে। মা, তুমি যখন হৃদয়ে ভ্রান্তিমূর্তিতে নিয়তই অবস্থান করিতেছ, তখন একদিন তোমার কৃপায় নিশ্চয়ই সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া, মাত্র তোমাকে বা আমাকে লইয়াই থাকিব। মা, কত দিনে—সে দিনের কত দেরী ?

প্রতিদিনই ত' মা, তুমি তিন অবস্থায় বিশেষভাবে ভ্রান্তিমূর্তিতে প্রকটিত হও, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। জাগ্রত অবস্থায় যাহা কিছু আমিত্ব মমত্ব, স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশকালে সে সকলই ত' ভুলিয়া যাই ! সেখানে গিয়া নূতন জগতে নূতন আমিত্ব মমত্ব লইয়া বিচরণ করিতে থাকি। আবার যখন সুষুপ্তিতে প্রবেশ করি, তখন এই জাগ্রত ও স্বপ্নরাজ্যের সকল কথা ভুলিয়া যাই, তখন একা আমি—উলঙ্গ আমি কোথায় কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্রে চলিয়া যাই। এইরূপে ভ্রান্তিমূর্তিতে প্রত্যহই তুমি দেখা দাও মা ! তাই আশা আছে, তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, এক দিন সব ভুলিয়া তোমায় পাইব। এখন যেমন তোমাকে ভুলিয়া সব লইয়া—জগদ্ভাব লইয়া ব্যস্ত আছি, ঠিক তেমনই এক দিন জগৎ ভুলিয়া কেবল তোমায় নিয়াই থাকিব—কেবল তোমায় নিয়া থাকিব।

ওগো প্রিয়তম সাধকবৃন্দ, তোমরা মাকে খুঁজিতে কোথায় ছুটিতেছ ? এই যে মা ! দেখ—এই যে মা ! তোমারই বুকের ভিতর ভ্রান্তিরূপে অজ্ঞানরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, জাগরণ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, আবার সুষুপ্তি হইতে জাগরণ—এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই ত' মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ভোগ করিতেছ ! উহাকে ভ্রান্তি বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিও না। মা বলিয়া আদর কর, সরলপ্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া ডাক, আত্মনিবেদন কর, ভ্রান্তিমূর্তিই আত্ম-মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া তোমাকে সকল ভ্রান্তির পরপারে লইয়া যাইবে।

বেদান্তমতে ভ্রম দুই প্রকার। সংবাদী ও বিসংবাদী। যে ভ্রম অভিলষিত বস্তু লাভের ব্যাঘাতক হয় না, তাহাকে সংবাদী ভ্রম বলে। যেরূপ মণিপ্রভা দেখিয়া যদি কাহারও মণিভ্রম হয়, তবে সে ঐ প্রভা লক্ষ্যে ধাবিত হইলেও পরিণামে মণিই লাভ করিতে সমর্থ হয়। সংবাদী-ভ্রমের ইহাই দৃষ্টান্ত। আর জবাপুষ্পে পদ্মরাগমণি-ভ্রমের বশবর্তী হইয়া যদি কেহ পদ্মরাগমণির অন্বেষণ করিতে যায়, তবে তাহার কখনও পদ্মরাগমণি লাভ হয় না, জবাপুষ্পই লাভ হয়। ইহাই বিসংবাদী ভ্রমের দৃষ্টান্তস্থল। এই জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ভ্রম হইলেও, ঐ ভ্রমই জীবকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করায়, কারণ ইহা সংবাদী-ভ্রম। জানিনা কি অজ্ঞেয় কারণে বহুদিন হইতে জগতে বিসংবাদী ভ্রম চলিয়া আসিতেছে ! মা আমার বিসংবাদী ভ্রান্তি-মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, বহুদিন যাবৎ জীব-জগৎকে অভীষ্ট বস্তু হইতে দূরে রাখিতেন, কিন্তু এবার মায়ের হৃদয়ে স্নেহের বন্যা আসিয়াছে, এবার মা আমার অভীষ্ট বস্তু লাভের পক্ষে একান্ত অনুকূল সংবাদী-ভ্রান্তিমূর্তিতে আবির্ভূত হইতেছেন ! সেই জন্যই এই আয়োজন, সেই জন্যই আজ সত্যপ্রতিষ্ঠার বিজয়ধ্বনি বিসংবাদী-ভ্রান্তিকে বিদূরিত করিয়া, নিদ্রিত দেশকে জাগ্রত করিয়া, ধীরে ধীরে ভ্রান্তির পরপারে—সত্যের সমীপে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

ভ্রান্তরূপিণী মা ? তোমার চরণে প্রণত হইতে পারিলেই আমাদের ভ্রান্তি দূর হইবে ? আমরা যে সর্বাবস্থায়ই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা, তাহা বুঝিতে পারিব ; তাই প্রথমে তোমার ব্যষ্টি-রূপটিকে প্রণাম করি। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে তোমার বিশিষ্ট ভ্রান্তিমূর্তিটি রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে আমরা তোমাকে ভুলিয়া থাকি, তোমার সেই মূর্তির চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম, মা পুনঃ পুনঃ প্রণাম। তারপর তোমার পরমেশ্বরী সমষ্টি ভ্রান্তিমূর্তিকে প্রণাম করিয়া, অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপনীত হই। সেখানে ভ্রান্তির বীজ-রূপকে প্রণাম করিয়া, একেবারে নিরঞ্জনক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে ভ্রান্তি বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার আশ্রয়ে ভ্রান্তি অবস্থিত, ভ্রান্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াও যিনি স্বয়ং ভ্রান্ত হন না, তোমার সেই বিশুদ্ধ বোধময়-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য প্রণাম করি। তুমি আমাদের ভ্রান্তি দূর কর।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ ॥৩৩॥

অনুবাদ। যিনি সর্বজীবে ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তিদেবীকে

পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিবর্গের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি ভূতাধিষ্ঠাত্রীরূপে একমাত্র মায়েরই প্রকাশ। যদিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তথাপি উহা একই চৈতন্যরূপে সাধকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের নাম বলা হইতেছে। শ্রোত্রের দিক্, ত্বক-এর বায়ু, চক্ষুর সূর্য, রসনার বরুণ, ঘ্রাণের অশ্বিনীকুমার, বাক্-এর অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মৈত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির অচ্যুত, অহঙ্কারের চতুর্মুখ এবং চিত্তের শঙ্কর। যে চৈতন্যশক্তি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই পূর্বোক্ত দিক্ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে চৈতন্যশক্তি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যদিও এই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানচৈতন্য বিভিন্ন উপাধির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তথাপি বস্তুতঃ উহারা এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে! ইহাই মায়ের আমার ব্যাপ্তিমূর্তি বা সর্বব্যাপিনী চিন্ময়ীমূর্তি।

মা! এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই এই মহতী ঈশ্বরী ব্যাপ্তিমূর্তি দেখিতে পাই! এক অখণ্ড ঘন চৈতন্যসত্তা সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। আমরা তাহারই গর্ভে জাত স্থিত ও লীন হইতেছি। মা, যে সাধক তোমার এই ব্যাপ্তিমূর্তি অহরহঃ দেখিতে পায়, তাহার প্রাণের সঙ্কোচ, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া যায়। আত্মপ্রাণের মহান প্রসার দেখিতে পাইলে সকলেরই প্রাণের প্রসার হইয়া থাকে। ইহাই তোমার ব্যাপ্তিমূর্তি দর্শনের বিশেষ সার্থকতা। মা, তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। যিনি চিতিশক্তিরূপে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্বে যে 'চেতনারূপে' মাকে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহা বিশিষ্ট চেতনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গদ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়, তাহা। আর এই মন্ত্রে নির্গুণ চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া চিতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। চিতি শব্দে সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা এবং আমাদের মাকে বুঝা যায়। এ স্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, চিতি যদি নির্গুণা, তবে '**এতদ্‌ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ**' কথাটি কিরূপে সঙ্গত হয়? জগদ্‌ব্যাপিত্বধর্ম থাকিলে, 'চিতির' নির্গুণত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে বলিয়া রাখা উচিত যে, চিতিবস্তু শক্তিমাত্র। পাতঞ্জল দর্শনও ইহা বুঝাইবার জন্য 'চিতিশক্তি' এই শব্দটিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদিও সাংখ্যশাস্ত্র জড়াপ্রকৃতির পরিণামের হেতু বলিতে গিয়া পুরুষকে সান্নিধ্যমাত্রে উপকারক বলিয়াছেন, তথাপি কার্যতঃ ঐ নির্গুণ পুরুষকে শক্তি-স্বরূপই বলা হইয়াছে। ধীমান্ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—যাহার সান্নিধ্যবশতঃ জড়া প্রকৃতি চেতনবৎ ক্রিয়াশীলা হয়, সে বস্তুটি শক্তি না হইয়া অন্য কিছুই হইতে পারে কি? আচ্ছা, এইবার বেদান্তশাস্ত্র দেখ, সেখানেও '**জন্মাদ্যস্য যতঃ**' বলিয়া চিদ্‌বস্তুর শক্তিরূপত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে। হউক জগৎ মিথ্যা, হউক সৃষ্টি কল্পনা মাত্র, তাহার আশ্রয় ত' ব্রহ্ম! যাহা অন্যকে আশ্রয় দিতে পারে, অথবা অন্যের আশ্রয়-স্বরূপ হয়, তাহা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বলিতে পার—আত্মবস্তু যদি যথার্থতঃ শক্তিস্বরূপই হয়, তাহা হইলে উহার নির্গুণত্ব থাকে না। তাহার উত্তরে বলিতে হয়—যখন চিদ্‌বস্তুতে কোনরূপ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য হয় না, তখনই উহাকে নির্গুণ বলা যায়। যদি বল যাহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার বিকাশ নাই, তাহাকে শক্তি কিরূপে বলা যায়; কারণ ক্রিয়াশীলতাই শক্তির স্বরূপ। সত্য, নির্গুণস্বরূপেও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মতম ক্রিয়াশক্তি থাকে। ব্রহ্ম নির্গুণ অবস্থায়ও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন বা আপনি আত্মরস সম্ভোগ করেন। ইহাও শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে অনুভবসম্পন্ন সাধকগণ যতক্ষণ বুদ্ধির ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন বা করিতে চেষ্টা করেন, ততক্ষণ আত্মা বুদ্ধির প্রকাশকরূপে শক্তিরই

পরিচয় প্রদান করেন ; যাহা হউক, আমরা জানি আত্মা শক্তিমাত্র। জড়জগতে শক্তি হইতে শক্তিমান পৃথক দেখা যায় বটে, কিন্তু আত্মক্ষেত্রে শক্তি ও শক্তিমান সম্যক্ অভিন্ন বস্তু। শুধু ভাষায় বিভিন্নতার পরিচয় মাত্র, সুতরাং এই চিতিশক্তির আবার কোন আশ্রয়ান্তর আবশ্যক হয় না। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, কোন শ্রুতিবাক্য, কোন দর্শন, কোন পুরাণ কিংবা অন্য কোনও শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় না। বরং নিঃসন্দিগ্ধরূপে যুগপৎ সগুণ নির্গুণের বিরোধ মীমাংসা হইয়া যায়। কিরূপে নির্গুণস্বরূপ হইতে জগৎসৃষ্টি হয়, এ সকল আশঙ্কাও অতি সহজে অপনীত হইয়া যায়।

আর শক্তিহীন কোনও একটি অবস্থা আছে, ইহা যদি প্রমাণ করিতে চাও, তবে তাহাকে নির্গুণেরও উপরে স্থান দাও। তাহা বাক্য এবং মনের অতীত ; সুতরাং তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বেদ বেদান্ত সকলেই মূক। তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি শব্দে কিংবা 'নেতি' নেতি' মুখে যাহাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা কিন্তু ঐ নির্গুণ পর্যন্ত ; সুতরাং স্বীকার করিয়া লও— বাক্য মনের অগোচর একটি সত্তা আছে, তাহা নির্গুণও নয়, সগুণও নয়। সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দুই প্রকার মহত্ব বা বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি নির্গুণ, অপরটি সগুণ। সগুণ-স্বরূপের আবার দুই প্রকার মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—একটি ঈশ্বরত্ব অপরটি জীবত্ব।

স্বরূপতঃ নির্গুণ চিতিশক্তি কিরূপে সগুণ ভাবাপন্ন হন এবং সগুণভাবে পরিব্যক্ত হইলেও তাঁহার নির্গুণত্বের যে কোনই ব্যাঘাত হয় না, এ সকল তত্ত্ব পূর্বে আনন্দতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

জগৎ যে একটা শক্তিমাত্র, ইহা সর্ববাদিসম্মত। নাম আকার ও ব্যবহারগত অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহাকে একটিমাত্র শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। যে ব্যক্তি জলবস্তুকে বিশেষরূপে জানে, সে বরফ দেখিলেও উহাকে জল ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করে না। কুণ্ডলদর্শনে যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই প্রতীত হয় না, কিংবা ঘট দর্শনে যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই লক্ষিত হয় না, ঠিক সেইরূপ এই বহু-নাম-রূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট একটা অখণ্ড চিতিশক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব চিতিশক্তি দ্বারা গঠিত এবং চিতিশক্তিতেই অবস্থিত। চিতিবস্তু বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ! বোধ এবং আনন্দ অভিন্ন, সুতরাং জগৎ আনন্দময়। অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলি— আনন্দ দ্বারাই এ জগৎ গঠিত, আনন্দেই স্থিত আবার আনন্দেই ইহার লয়। শুধু দর্শনের তারতম্য। মায়ের কৃপায় জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেলে সকলেই দেখিতে পায়—এ জগৎ আনন্দময়।

সে যাহা হইক, মা ! যে তুমি স্থূলে ব্যষ্টি চিতিশক্তিরূপে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছ, সেই তোমাকে প্রণাম। আবার যে তুমি মহতী চিতিশক্তিরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমার সেই চিন্ময়ী ঈশ্বরী মূর্তিকে প্রণাম। অনন্তর স্থূল সূক্ষ্মের অতীত অব্যক্ত কারণরূপিণী চিতিশক্তিকে প্রণাম। সর্বশেষে বাক্য মনের অতীত, নিরঞ্জনস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া প্রণাম করি। মা, আমাদের প্রণাম সার্থক হউক।

সাধক ! একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ —মা আমার চিতিরূপে এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। যাহা দেখ, যাহা ভাব, সকলই আমার চিতিরূপিণী মা।

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
ত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানিভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ৩৫ ॥
যা সাম্প্রতঞ্চোদ্ধত-দৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশাচ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদোভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। যে দেবীকে ইতিপূর্বে (মহিষাসুরবধ-প্রসঙ্গে) ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ অভীষ্ট লাভের আশায় স্তব এবং অনেকদিন সেবা (অর্চনা) করিয়াছিলেন, সম্প্রতি যে মদগর্বিত অসুরকর্তৃক উৎপীড়িত আমরা (দেবতাবৃন্দ) ভক্তি-বিনত-শরীরে পরমেশ্বরীকে এই প্রণাম করিতেছি, আর যাঁহাকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল

আপদ্ দূর করিয়া থাকেন ; সেই শুভহেতুস্বরূপা পরমেশ্বরী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং সকল আপদ্ বিনাশ করুন।

ব্যাখ্যা। সাধক দেখ, দেবতাবর্গের বিশ্বাস কত! **'যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ সর্বাপদঃ'**—যাঁহাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের সমুদয় আপদ্ দূর করেন। সত্যই এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে, জীব কখনও বিপদে মুহ্যমান হয় না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় না। 'আমার সর্বশক্তিময়ী মা আছেন,' এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে, জীব যতই কেন বিপদাপন্ন হউক না, অন্তরে অন্তরে এমনই একটা বিশ্বাস ও ভরসা থাকে যে, তাহার ফলে বিপদগুলি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার আমিত্বের প্রকাশক, এক কথায় যিনি আমাকে সুখ-দুঃখ-অনুভবের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থ স্মরণ করিতে পারিলে যে, তৎক্ষণাৎ সকল বিপদ দূরীভূত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? কিন্তু ঐ একটি কথা আছে — **'ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিভিঃ'** ভক্তির প্রভাবে যেন মূর্তিটি নত হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ আমিত্ববোধটি সম্যক্ অবনত হওয়া আবশ্যক । যে পরিমাণে আমিত্ববোধটি বিনম্র হইয়া পড়িবে, দেহাত্মবোধ শিথিল হইবে, সেই পরিমাণেই মা আমার ঈশা অর্থাৎ ঈশ্বরীমূর্তিতে প্রকটিতা হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য। জীব যদি সত্যসত্যই মায়ের ঈশ্বরীমূর্তির উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহার জীবভাবীয় আপদ্ বিপদ্ অতি অল্পক্ষণেই দূরীভূত হইয়া যায়।

এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখিয়াছেন যে, ঘোর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কাতরপ্রাণে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোক ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকেন! এ সকলের মূল রহস্য এই যে —ঐ ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিতে প্রণামের ফলে জীবভাবীয় আমিত্ব ক্ষীণ হয়, এবং ঈশ্বরভাবীয় আমিত্বের বিকাশ হইয়া থাকে । সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারিলেই অল্পাধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি জীবশরীরে সংক্রামিত হয়। তাহারই ফলে জীবের সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়। স্বপ্নে বা দেবমন্দিরে হত্যা দিবার ফলে যে ঔষধাদি লাভ হয়, তাহারও রহস্য ইহাই।

'সর্বাপদঃ' শব্দের আর একটি বিশেষ অর্থ আছে। সর্বই আপদ্ অর্থাৎ, যতক্ষণ সর্বত্বের—বহুত্বের প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই সাধক আপদগ্রস্ত । এই সর্বরূপ আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সকলেরই ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিতে ঈশ্বরীরচরণে সম্যক প্রণত হওয়া একান্ত আবশ্যক । যতক্ষণ সর্বত্বের বিলয় এবং একত্বের প্রতীতি না হয়, ততক্ষণ জীব মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞই থাকিয়া যায়। গীতায় স্বয়ং ভগবানও সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক এক অখণ্ড বস্তুর শরণাগত হইবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। একমাত্র শরণাগতভাবে অর্থাৎ ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিতে প্রণাম দ্বারাই উহা সুলভ হইয়া থাকে।

ইতিপূর্বে মধুকৈটভ-বধপ্রসঙ্গে ব্রহ্মস্তোত্র এবং মহিষাসুর বধাবসানে শক্রাদিস্তোত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই উভয় স্তোত্রাপেক্ষা এই স্তোত্রের বিশেষত্ব অনেক। পূর্বোক্ত স্তোত্রদ্বয়ে মাতৃ-মহত্ত্ব মাতৃ-করুণা মায়ের সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে । আর এই স্তোত্রটি প্রণতিপ্রধান ; এখানে মাকে একেবারে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি সর্বভাবের ভিতর দিয়া দর্শন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করা হইয়াছে । যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই জীব বুঝিতে পারে যে, 'আমি' একটা দুরপনেয় অজ্ঞানমাত্র ; সুতরাং এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সৎ অসৎ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সাধক তাহাকেই মাতৃবোধে দর্শন করিতে থাকে এবং আমিত্বকে তাঁহার চরণে অবনত করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে যে সাধক জ্ঞানের যত উচ্চস্তরে আরোহণ করেন, তিনি ততই অবনত হইয়া পড়েন । জ্ঞান লাভ হওয়া মানেই অজ্ঞান যে কত বেশী, তাহা বুঝিতে পারা। অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, তাহাকে জ্ঞানের চরণে অবনত করিতে আর কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা উপস্থিত হয় না ; তাই দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অভীষ্টলাভের পথ সুগম করিয়া তুলিতেছেন। ইহার পরে শুম্ভবধের অবসানে আমরা যে নারায়ণী স্তুতি পাইব, তাহাও এইরূপ প্রণতিপ্রধান । প্রণতিই সাধনার রহস্য । ভক্তিপূর্বক প্রণত হইতে পারিলেই সব লাভ হয় । দেবতাগণ মাতৃবক্ষঃস্থিত জ্ঞানস্তন্য-পরিপুষ্ট সন্তান ; তাই তাঁহারা সর্বতোভাবে প্রণত । আর আমরা দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট জীব—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটাণু, কিন্তু আমাদের

মস্তক কিছুতেই অবনত হইতে চায় না। আমরা আমাদের এই মিথ্যা আমিকে যতই গৌরব দিতে চাই, ততই যে উহাকে অপমানিত করা হয়, এ কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। এই আমিটি যদি ঈশ্বরীর চরণতলে অবনত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে ঈশ্বরীয় গৌরব লাভ হয়, ইহা বুঝি না বলিয়াই আমাদের এই দুর্দশা। এখনও এ দেশের ব্রাহ্মণগণকে স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তানগণ দর্শনমাত্র মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করে। কেন করে? একদিন এই ব্রাহ্মণ তাঁহার আমিত্বকে বিশ্বেশ্বরীর চরণতলে যথার্থই নত করিতে পারিয়াছিল; তাহারই ফলে আজ পর্যন্তও তাঁহাদেরই কুলপাংশুল সন্তানগণ সমগ্র হিন্দুজাতির নিকট হইতে প্রণাম পাইতেছে। ওগো! একথা ভাবিলেও নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়! মাতৃ-চরণে প্রণত ব্রাহ্মণ একদিন এমনই বীর্যবান ও শক্তিমান ছিলেন যে, বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। মাতৃ-সত্তায় এমনই বিশ্বাসবান ছিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুত্ব পর্যন্ত অতিশয় তুচ্ছ মনে করিতেন! আর আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ—কিন্তু হায়, সে অন্য কথা।

এই স্তবে মায়ের যে সকল মূর্তির উল্লেখ আছে, এস্থলে সংক্ষেপে একবার তাহার আলোচনা করা যাউক। দেবতাগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই সর্বভূতে অবস্থিতা মায়ের বিষ্ণুমায়া মূর্তিকে প্রণাম করিলেন। ক্রমে—চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। সাধক! তুমিও ঐ সকল স্বরূপে প্রতিনিয়তই মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ। কিন্তু সত্যই যে উনি মা, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। অবিশ্বাস আছে বলিয়াই উঁহার চরণে প্রণত হইতে সমর্থ হইতেছ না। প্রণাম করিলেও সত্য প্রণাম করিতে পার না। তাই মাতৃ-প্রসন্নতা বা মাতৃ-কৃপার উপলব্ধি হইতে দূরে রহিয়াছ। ঐ যে চেতনা বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা প্রভৃতিরূপে মা তোমারই অন্তরে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত রহিয়াছেন, ঐ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম কর। প্রথম খণ্ডে যে সত্য-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে উপদিষ্ট প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাণময় হইয়া, এখানে আসিয়া প্রত্যক্ষ আনন্দস্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এক অখণ্ড আনন্দময় বোধ বা অনুভবই যে পূর্বোক্ত বুদ্ধি, নিদ্রা প্রভৃতিরূপে আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই অজ্ঞান দূর হয়—রুদ্রগ্রন্থি অর্থাৎ জ্ঞানময়গ্রন্থি ভেদ হয়।

পূর্বোক্ত প্রণামগুলি শুধু প্রণাম নহে, উহা উচ্চ স্তরের সাধনা। যেরূপভাবে প্রণাম করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং কারণাতীত অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টি অব্যক্ত এবং নিরঞ্জন সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণাম করিতে পারিলেই জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে প্রাণরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সাধনা আর একটু সূক্ষ্মে অগ্রসর হইয়াছে; তাই প্রত্যেক বৃত্তিকে ধরিয়া ধরিয়া প্রণতির সাহায্যে অখণ্ড বোধসমুদ্রে অবগাহন করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। যে অখণ্ড আনন্দ অর্থাৎ আনন্দময় অনুভূতির কথা **'সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ'** মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, সেই অনুভূতিই ব্যষ্টি, বুদ্ধি, নিদ্রা প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত, ইহা বুঝিয়া—উপলব্ধি করিয়া প্রথম প্রণাম করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম **'নমস্তস্যৈ'** মন্ত্রের তাৎপর্যই—স্ব স্ব ব্যষ্টি প্রকৃতির বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করা। তারপর ঐ ব্যষ্টি বৃত্তিকে সূক্ষ্মে সমষ্টিতত্ত্বে লইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় প্রণাম করিতে হয়! ঈশ্বরত্বের—মহত্ত্বের উপলব্ধিই এই দ্বিতীয় 'নমস্তস্যৈ' মন্ত্রের রহস্য! অনন্তর কারণ বা অব্যক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান এবং সর্বশেষে সর্বভাবাতীত স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য; ইহাই তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রণামের রহস্য। ঠিক এইরূপ প্রণাম করিতে পারিলেই, এ স্তবের সার্থকতা হয়! অনুভূতিহীন সাধকগণের নিকট ইহা প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা গুরুকৃপায় অনুভূতির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ তত্ত্ব যে একান্ত উপাদেয় হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঋষিরুবাচ

এবংস্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥৩৭॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে নৃপনন্দন! দেবতাগণ যখন এইরূপ স্তব করিতেছিলেন, তখন পার্বতী দেবী জাহ্নবী জলে স্নান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। দেবতাদিগের স্তব শেষ হইয়াছে। তাই আবার এখানে '**ঋষিরুবাচ**' বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষি মেধস এখানে মহারাজ সুরথকে নৃপনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিলেন। '**নৃন্ পাতি ইতি নৃপঃ**' যিনি মনুষ্যকুলের রক্ষক বা পালক, তিনিই নৃপ। সাধক মহাপুরুষগণই যথার্থ নৃপশব্দ-বাচ্য। জগতে মধ্যে মধ্যে সুরথের ন্যায় সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিয়াই মনুষ্যসমাজ স্থির আছে। ধর্মপ্রাণ ব্রহ্মনিষ্ঠ আদর্শ সাধকগণই বিরাট মনুষ্য-জাতির মেরুদণ্ড। ইঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই এখনও মানুষ সত্যের দিকে, ধর্মের দিকে লালসনেত্রে লক্ষ্য রাখে। নতুবা মনুষ্যসমাজ এতদিনে পশু-সমাজে পরিণত হইত। যে দেশে সাধকের সংখ্যা যত কম, সেই দেশের লোক তত স্থূলে আসক্ত, তত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট; সুতরাং তত বেশী পশুধর্মী। যাক্ সে অন্যকথা। যাঁহারা এ জগতে সত্যের আলোক দেখাইয়া যান, লোকস্থিতি রক্ষা করেন, তাঁহারাই যথার্থ নৃপ বা নর-রক্ষক। এখনও পশ্চিমভারতীয় জনগণ সাধু মহাপুরুষদিগকে নৃপ শব্দের সমানার্থবোধক মহারাজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। যিনি আবার সেই নৃপগণের অর্থাৎ সাধক মহাপুরুষদিগেরও আনন্দবর্দ্ধন করেন, তিনিই নৃপনন্দন। এখানে মহর্ষি মেধস্ আনন্দতত্ত্ব বিশ্লেষণে উদ্যত; তাই সুরথকেও নৃপনন্দন অর্থাৎ সাধকানন্দবর্দ্ধন বলিয়া সম্বোধন করিলেন!

দেবতাগণ যখন পূর্বোক্তরূপ মায়ের স্তব করিতেছিলেন, তখন মা আমার পার্বতীমূর্তিতে জাহ্নবীজলে স্নান করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্তবাদি পাঠকালে সত্যসম্বেদনযুক্ত দেবতাবৃন্দের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলে চিত্ত আর্দ্র ও নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়াছিল, উহাই জাহ্নবী-তোয়। পুনঃ পুনঃ মাতৃ-নাম স্মরণ, সর্বতোভাবে মাতৃ-বিভূতি দর্শন, কাতরকণ্ঠে মা মা বলিয়া রোদন এবং বারংবার ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিতে প্রণাম, এই সকল কর্মের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাই পূত জাহ্নবীবারি। উহাতে স্নান করিবার অর্থাৎ অভিষিক্ত হইবার জন্যই মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথার্থই সন্তান যখন আকুলপ্রাণে মা মা বলিয়া ডাকে তখন এমনই করিয়া মা আমার সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। সন্তানের ভক্তি-অশ্রু, উহা পরম পবিত্র! উহা স্বর্গগঙ্গার নির্মল বারি, ঐ জল ব্যতীত মায়ের আমার স্নান বা অভিষেক হয় না। ত্রিতাপ-সন্তপ্ত সন্তানগণের আকুল আর্তনাদে বিক্ষোভিত মাতৃ-বক্ষকে শান্ত শীতল করিতে হইলে, অকপট প্রেমাশ্রুরই প্রয়োজন। আজ দেবতাগণ স্তবের সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন; তাই মা আমার অচিরাৎ আবির্ভূত হইলেন।

পার্বতীমূর্তিতে মাতৃ-আবির্ভাব। পূর্বে দেবতাগণ স্তব করিবার জন্য হিমালয়ে বা স্থূলদেহাভিমানে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাই মা আমার পার্বতীমূর্তিতে স্থূলেই প্রকটিত হইলেন। অর্থাৎ এই স্থূল বিশ্বেই বিশেষভাবে মাতৃ-আবির্ভাব—আনন্দময় মাতৃ-সত্তা প্রকটিত হইয়া উঠিল। দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন—পরিদৃশ্যমান বিশ্ব শুধু জড়পদার্থ নহে, ইহা আনন্দময়ী মাতৃ-মূর্তি। জগতের প্রতি-পরমাণু আনন্দেরই অভিব্যক্তি। সেই আনন্দময় পরমাণু-পুঞ্জ আবার আনন্দময়ী ধৃতিশক্তি-কর্তৃক গঠিত হইয়া, জগদ্ আকারে দৃশ্য হইতেছে। পদার্থ, পদার্থ নহে, আনন্দময় ঘনসত্তা। পর্বত, পর্বত নহে, পার্বতীর আনন্দঘন মূর্তি। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় আনন্দময় আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাদভাগে যেদিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, যতদূর বোধ প্রসারিত হয়, সর্বত্র এক ঘন আনন্দময়সত্তা মাত্র। দেবতাগণ এইরূপ অনুভূতিতে আসিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন এবং অচিরাৎ যে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন।

সাঽব্রবীৎ তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্‌ভিস্তূয়তেঽত্র কা॥ ৩৮॥

অনুবাদ। সেই সুভ্রূ দেবী দেবতাদিগকে বলিলেন, আপনারা কাহাকে স্তব করিতেছেন।

ব্যাখ্যা। ঠিক যেন 'ন্যাকা' মেয়েটি! কিছুই জানেন না! জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহার স্তুতি

করিতেছেন' ? মা আমার এমনই বটে । সরল শিশু গৌরী কন্যা উমা মা আমার এমনই বটে । সন্তান বিপদে পড়িয়া, অসুর-অত্যাচারে বিব্রত হইয়া, ব্যাকুলপ্রাণে কত ব্যস্ততার সহিত মাকে ডাকিতেছেন ; কিন্তু মায়ের আমার প্রশান্ত সরল নির্মল মুখখানিতে কোনরূপ আকুলতার চিহ্নমাত্র নাই । যেন কিছুই হয় নাই ! তাই ধীরে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে ?

ওগো, তোমার এই কথাগুলিতে হয়ত কবিত্বের লক্ষণ দেখিয়া ফেলিবে ; বাস্তবিক তাহা নহে । ইহার মধ্যে কবিত্বের লেশমাত্র নাই । সত্যই সে আত্মক্ষেত্র ধীর, স্তব্ধ, শান্ত । কোনরূপ বৈষয়িক স্পন্দন সেখানে পৌঁছায় না । **'বুদ্ধিপর্যবসনা বিষয়াঃ'** বিষয়সমূহ বুদ্ধিতে গিয়াই পর্যবসিত হয় ; উহারা বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত সে আনন্দময় আত্মক্ষেত্রে যাইতে পারে না । যেখানে জড় বস্তু পর্যন্ত আনন্দময় অনুভব সত্তারূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেখানে আর বৈষয়িক স্পন্দন কিরূপে থাকিবে ? বাস্তবিকই ত' সেখানে কিছুই হয় নাই । সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সে যে আমার নিত্যা নির্মলা অব্যাকুলা স্থিরা মা ! তাই মায়ের আমার পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন—'কি হইয়াছে বাবা ; তোমরা কাহাকে স্তব করিতেছ ?'

———○———

শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ।
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ ।
দেব্যৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥৩৯॥

অনুবাদ । তাঁহার (পার্বতীর) শরীরকোষ হইতে শিবা —মঙ্গলময়ী এক দেবীমূর্তি সমুদ্ভূত হইয়া বলিলেন —শুম্ভদৈত্যকর্তৃক নির্জিত এবং নিশুম্ভকর্তৃক সমরে পরাজিত দেবতাবর্গ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন ।

ব্যাখ্যা । পার্বতীর শরীরকোষ হইতে এক শিবা —মঙ্গলময়ী মূর্তি আবির্ভূত হইলেন । দেবতাগণ স্তব করিতে করিতে যে আনন্দময়ী পার্বতীমূর্তির আবির্ভাব দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই শরীরকোষ হইতে এই শিবাদেবীর আবির্ভাব । স্থূল বিশ্বকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দময়ী পার্বতীমূর্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । ঐ আনন্দঘন সত্তাটি যখন স্থূল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখনই উহাকে শরীরকোষ পরিত্যাগপূর্বক শিবামূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন বলা যায় । যে আনন্দকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত সেই নির্গুণ গুণভোক্তা গুণের প্রকাশক অধিষ্ঠান-স্বরূপকেই এখানে শিবামূর্তি বলা হইয়াছে । ইনিই এই উত্তম চরিতের দেবতা সরস্বতী—বাগ্ ভব বীজস্বরূপা গৌরীমূর্তি । সরস্বতী বলিতে এখানে যেন কেহ বীণাপাণিমূর্তি মনে না করেন । **'সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ'**, সরস্বান্ শব্দের অর্থ— অর্ণব অর্থাৎ কারণ। অর্ণব শব্দে যে কারণসমুদ্র বুঝা যায়, ইহা ঋগ্‌বেদীয় সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে । সেই সরস্বানের যে শক্তি, তাহাই সরস্বতী । যে শক্তি কারণরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকেই সরস্বতী কহে । এই উত্তম চরিতেই জীব-জগতের যথার্থ কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের চরম মিলন অর্থাৎ অভিন্নতা ব্যাখ্যাত হইবে । ঋষিচ্ছন্দঃ বা উপোদ্ঘাত সূত্রেও ইহা বলা হইয়াছে । ইহা— এই সরস্বতী— জ্ঞানময়ী মূর্তি । ইহারই অঙ্কে সর্বভাব বিলয় প্রাপ্ত হয় । সে যাহা হউক, পার্বতীর শরীরকোষ হইতে বিনির্গতা এই দেবীই অচিরকাল মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরনিকরকে নিহত করিয়া **'একৈবাহং'** রূপে অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন । এখন হইতেই তাহার সূচনা হইতেছে । ইনি এতদিন শরীরকোষকে আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থূলে জড়াকারে পার্বতীমূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছিলেন ; কিন্তু আজ দেবতাদিগের স্তোত্রে— কাতর প্রার্থনায়, করুণায়, স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া শরীরকোষ পরিত্যাগপূর্বক —জড়ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধা চিতিশক্তিরূপে প্রকটিত হইলেন ।

তিনি চিন্ময়ী স্বপ্রকাশস্বরূপা ! সর্বভাব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত, তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই ; তাই তিনি স্বয়ংই দেবতাবৃন্দের উপাসনার হেতু এবং স্বরূপ বর্ণনা করিলেন । **'স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ'** — শুম্ভদৈত্যকর্তৃক নির্জিত দেবতা-বৃন্দ আমারই স্তব করিতেছে । সত্যই তাই । একমাত্র আমি ছাড়া কোথাও কিছুই যখন নাই, তখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যাহাই করুক, আমারই পূজা করিয়া থাকে । গীতায় রাজগুহ্যযোগে ভগবান যে কথা বলিয়াছেন, (অহং হি

সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ) এখানে—এই দেবীমাহাত্ম্যে তাহারই কার্যকরী অবস্থাটি প্রকাশ পাইতেছে। তাই মা আমার **'স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে'** বলিয়া যথার্থ স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত করিলেন। গীতায় অন্য দেবতার পূজাচ্ছলেও আমারই অবিধিপূর্বক পূজার কথাই উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এখানে দেবতাবর্গ সাক্ষাৎ চিতিশক্তির বা আত্মারই স্তব করিয়াছেন ; সুতরাং অন্য দেবতার প্রসঙ্গই নাই।

সাধক ! মনে রাখিও—কেবল সাধনা নহে, তোমার যাবতীয় কার্য যতদিন এই বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ 'আমি'র দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিনই উহা অবিধিপূর্বক হইবে, ততদিনই উহা জন্ম-মৃত্যুর সংসারগতির হেতু হইবে। দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে যথার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, দেবতাবৃন্দের ন্যায় 'আমির'ই শরণাপন্ন হইতে হইবে। সর্বভাবের সাহায্যে সর্বদা আমারই সেবা করিতে হইবে ! সকল কার্যই 'আমি'র দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। যদি পার (মানুষ মাত্রের ইহাতে অধিকার আছে) তবে উভয় লোককেই জয় করিতে পারিবে ; ইহা নিঃসংশয়।

'মামেকং শরণং ব্রজ' এই চরম অমূল্য উপদেশটি কি প্রকারে সাধক জীবনে সার্থকতাময় অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাই যে এই দেবী মাহাত্ম্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এ সকল কথা বলিতে হইল। ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি—এস্থলে যে আমি এবং আমার শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছি, উহা অস্মিতা মমতা বা শুম্ভ নিশুম্ভ নহে। উহাই আত্মা—মা—গুরু। এতদুভয়ের ভেদ অনুভব-সম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।

শরীরকোষাদ্‌যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥৪০॥

অনুবাদ। এই অম্বিকা দেবী, পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত লোকে কৌষিকী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। দেবী—দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশরূপিণী চিতিশক্তি। সাধারণতঃ ইনি অন্নময়াদি স্থূল কোষগুলিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। কখনও কখনও সাধকের বিশুদ্ধ ভক্তি-হিমে আর্দ্র হইয়া স্থূল কোষ পরিত্যাগপূর্বক, কেবল চিতিরূপেই আত্মস্বরূপটি প্রকাশিত করেন। এই আশ্রয় বা ত্যাগ, যে কোনরূপেই হউক, কোষের সহিত সম্বন্ধ আছে ; তাই মা আমার কৌষিকী নামে প্রসিদ্ধা। সমস্ত লোকে মায়ের এই নামটি বিশেষভাবে গীত হইয়া থাকে। সাধক ! স্মরণ রাখিও যতদিন মা আমার পঞ্চকোষপ্রাবৃতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদিন মা আমার পার্বতী, আবার যখন কোষের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক কেবল চিন্ময়ীরূপে প্রকাশিত হন, তখন মা আমার কৌষিকী নামে পরিচিত হন।

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৪১॥

অনুবাদ। তিনি (কৌষিকীদেবী) এইরূপ শরীরকোষ হইতে বিনির্গত হইলে পার্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া হিমাচলাশ্রিতা কালিকা নামে আখ্যাত হইলেন।

ব্যাখ্যা। পঞ্চকোষের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক আত্মা চিতিশক্তি মা আমার যখন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপটি প্রকটিত করেন, তখন পঞ্চকোষের অবস্থা কৃষ্ণা অর্থাৎ অজ্ঞান-স্বরূপ হইয়া পড়ে। অজ্ঞানস্বরূপিণী কৃষ্ণামূর্তি বলিয়াই তখন উহার নাম কালিকা এবং অত্যন্ত জড়রূপে —দৃশ্যমাত্ররূপে অবস্থান করে বলিয়াই ঐ কালিকা মূর্তি তখন 'হিমাচলকৃতাশ্রয়া' হয়।

খুলিয়া বলিতেছি—সাধক ! যখন তুমি বিশুদ্ধা চিন্ময়ী মূর্তিতে মায়ের দেখা পাও, তখনই দেহাদি জড়-ভাবের সম্যক্ বিস্মৃতি হয়। উহাদের যে তখন একেবারেই অভাব হইয়া যায়, তাহা নহে ; মাত্র তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই দেহাদি-বিষয়ক অজ্ঞানই এস্থলে কৃষ্ণা —কালিকামূর্তি। এই অবস্থায় অর্থাৎ যখন তুমি বিশুদ্ধবোধে অবস্থান কর, তখন তোমার জড়ত্বপ্রতীতি সম্যক্ বিলুপ্ত হইলেও অন্যের দৃষ্টিতে তোমার দেহাদির জড়পদার্থরূপেই ভাণ হইতে থাকে। পার্বতীর হিমাচলকৃতাশ্রয়া কালিকামূর্তি প্রকাশের ইহাই রহস্য। বুদ্ধি নির্মল হইলে অর্থাৎ রজস্তমোগুণ অভিভূত হইলে ধীরে ধীরে বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরমাত্মার সন্ধান

পাওয়া যায়, আভাস আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, তখন জড় চৈতন্যের ভেদ বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীতিগোচর হইতে আরম্ভ করে । এদিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্যদিকে স্বপ্রকাশরূপা চিতিশক্তি । বহু পুণ্যফলে সাধক এ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করে ।

———০———

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরং ।
দদর্শ চণ্ডমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৪২॥

অনুবাদ । অনন্তর শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ডনামক অসুরদ্বয় সুমনোহর পরম রূপধারিণী অম্বিকাকে দেখিতে পাইল ।

ব্যাখ্যা । পূর্বে যে কৌষিকীমূর্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে অম্বিকামূর্তিতে প্রকাশিতা । পার্বতীর শরীরকোষ হইতে বিনির্গতা মূর্তিই বিশুদ্ধা চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকা । জড়ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া চিতিশক্তি যখন স্বরূপে প্রকটিতা হন, তখন জড়ত্ব তমসাচ্ছন্ন কৃষ্ণামূর্তিতে পরিণত হয়, ইহাই পূর্ববর্তী মন্ত্রে কালিকা নামে অভিহিত হইয়াছে । চৈতন্য বা চিতিশক্তি যখন জড়াকারে প্রকাশিত হন তখন তাঁহার নাম হয় পার্বতী । এই পার্বতীর শরীর হইতে যখন বিশুদ্ধ চিদ্ অংশ পৃথক্‌ভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাঁহার নাম হয় কৌষিকী বা অম্বিকা । আর অবশিষ্ট জড়-অংশ কৃষ্ণা বা কালিকা নামে অভিহিত হয় ।

অম্বিকা—মাতা, বিশ্বপ্রসবিনী জননীমূর্তি । 'সুমনোহর' অতিশয় নির্মল—বিষয়কলুষিত নহে । অথবা যাহা মনকে সম্যক্‌রূপে হরণ বা বিলোপ করিতে সমর্থ, তাহাই সুমনোহর । অথবা সুমনা শব্দের অর্থ দেবতা ; যাহা সুমনাদিগকেও হরণ করিতে সমর্থ, তাহাই সুমনোহর । মা আমার এমনই পরম-রূপ— শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন যে, মন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত-চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দ পর্যন্ত বিলুপ্ত-প্রকাশ হইয়াছিল । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, '**ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্**' ।

যথার্থই অম্বিকা মা আমার সুমনোহরা, পরমরূপ-ময়ী । যেখানে সর্বভাব বিলুপ্ত অথচ যাঁহার প্রকাশে সর্ববস্তু প্রকাশিত, তাহা যথার্থই পরম-রূপ । মনকে হরণ করিতে না পারিলে পরমরূপের প্রকাশ হয় না । আমার পরমরূপের প্রকাশ না হইলেও মনের বিলোপ হয় না । পরমরূপটি উদ্ভাসিত হইলে, মন আপনা হইতেই অপহৃত হইয়া যায় । ঐ যে জীবন্ত বৃক্ষলতা দেখিতেছ, একটি প্রাণ আছে বলিয়াই উহাতে একটি বিশিষ্ট রূপের উপলব্ধি হয় । মৃত শুষ্ক বৃক্ষলতা ও জীবন্ত বৃক্ষলতার মধ্যে যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, মৃত দেহে ও জীবন্ত দেহে যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, ঐ পার্থক্যটুকু যাঁহার, তাহাই যে পরমরূপ— যে জিনিষটি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর, এত মোহন । সাধক ! অন্ততঃ কল্পনার চক্ষেও দেখিতে চেষ্টা কর— সেই জিনিষটি, মাত্র সেই রূপটি জড়ত্ব-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক তোমার সম্মুখে প্রকাশিত । উহাই পরমরূপ । ঐ রূপটি দেখিতে পাইলে, মন কি স্বয়ং অপহৃত না হইয়া থাকিতে পারে ? তাইত অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি, মনকে স্থির করিবার জন্য সাধনা করিও না । পরমরূপকে দেখ—মন আপনা হইতে স্থির অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । মন অপহৃত হইলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত-চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দ আপনা হইতেই সেই পরমরূপে মিলাইয়া যাইবে, তাই সুমনা শব্দের দেবতা অর্থও করা হইয়াছে।

প্রথমেই শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় চণ্ডমুণ্ড এই পরমরূপের সন্ধান পায় । চণ্ড— প্রবৃত্তি, মুণ্ড— নিবৃত্তি । চণ্ড শব্দটি কোপন অর্থে ব্যবহৃত হয় । কোপ, প্রবৃত্তিরই এক প্রকার উদ্বেলন মাত্র । আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে প্রবেশ করিব । পূর্বে যাহা কামক্রোধাদি স্থূল বৃত্তিরূপে দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে আসিয়া সেই সকলের মূলীভূত প্রবৃত্তিনামক একটি সূক্ষ্মতর শক্তি প্রবাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিনামক আর একটি সূক্ষ্ম শক্তিপ্রবাহ দেখিতে পাইতেছি । এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই অস্মিতা ও মমতার আশ্রয়ে প্রকাশিত ; তাই ঋষি ইহাদিগকে শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । শুম্ভনিশুম্ভ যেমন সমভাবাপন্ন, এই চণ্ডমুণ্ডও ঠিক সেইরূপ । যেখানে প্রবৃত্তি, সেইখানেই নিবৃত্তি ।

সাধক ! সাধারণতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলিলে যাহা বুঝায়, এখানে তাহা বুঝিও না । এখানে চণ্ডমুণ্ড শব্দে পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি এবং অহংবিরতিরূপ নিবৃত্তি

বুঝিও । এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্য এতদিন বহু সাধনা করিয়া আসিয়াছ । বহু সুকৃতিবলে বহু সাধনার ফলে আজ তোমার প্রবৃত্তি একমাত্র পরমাত্মাকেই চায় এবং নিবৃত্তি যথার্থই অহংরূপ-বিষয়বিরতি চায় । ইহা বহু সৌভাগ্যের ফল ; কিন্তু ইহারাও অসুর । ইহাদিগকে নিহত করিতে হইবে । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া কিছুই থাকিবে না । অস্মিতা মমতা বলিয়া কিছুই থাকিবে না । একমাত্র সুমনোহর পরমরূপময়ী মা—পরমাত্মাই থাকিবেন ।

ইহা বলাই বাহুল্য যে বিষয়বাসনারূপ প্রবৃত্তির কথা এখানে হইতেই পারে না । তারপর উভয়তোমুখী প্রবৃত্তির অর্থাৎ বিষয় এবং পরমাত্মা, উভয় দিকেই যে প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়, তাহার কথাও এখানে হইতে পারে না ; কেবল পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চণ্ডমুণ্ড অসুরের কথা বলা হইতেছে । আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি থাকিলে বিষয়াভিমুখী বিরতি থাকিবেই । ইহাও অসুরভাব অর্থাৎ অনাত্মবোধের পরিচায়ক । পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি থাকে । বাস্তবিকপক্ষে এক অদ্বয় আত্মা ব্যতীত আর কোথায়ও কিছুই নাই ; সুতরাং যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধক পরমাত্মাকে চায় অথবা বিষয়বিরতি চায়, ততক্ষণই বুঝিতে হইবে, সাধকের অনাত্মবোধ রহিয়াছে । উহাদিগকেও নিহত করিতে হইবে । সে জন্য সাধকের কোন বিশিষ্ট আয়োজন করিতে হইবে না । মা আমার পরম-রূপটি প্রকটিত করিয়াছেন, একে একে চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি অসুরকুল সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপ পরমরূপানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া সাধকের অনাদিসঞ্চিত অনাত্ম-সংস্কার বিলয় করিয়া দিবে ; এইবার তাহারই আয়োজন হইতেছে । শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড পরমরূপময়ী অম্বিকামূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সুতরাং আর বিলম্ব নাই, অচিরকালমধ্যেই উহারা বিলয়প্রাপ্ত হইবে ।

প্রথমেই আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি পরমাত্মস্বরূপের আভাস পায় । তাই শুম্ভের অম্বিকা দর্শনের পূর্বেই শুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড অম্বিকামূর্তি দর্শন করিয়াছিল ।

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীবসুমনোহরা ।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ । তাহারা (চণ্ডমুণ্ড) শুম্ভের নিকট আসিয়া বলিল মহারাজ ! অতীব সুমনোহরা, অনির্বচনীয়া এক স্ত্রীমূর্তি হিমাচল সমুদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছে ।

ব্যাখ্যা । প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাহায্যেই অস্মিতা পরমাত্ম-স্বরূপের সন্ধান পায় । সর্বভাবের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিল । তারপর স্ত্রীমূর্তির বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই অতীব সুমনোহরা বলিয়া অম্বিকার স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল । মাকে দেখিবামাত্র ক্ষণকালের জন্যও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আত্মহারা হইয়াছিল ; তাই সুমনোহরা বলিয়া উল্লেখ করিল । মায়ের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে অতি অল্প সময়ের জন্যও মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অনাত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তাই মা আমার যথার্থই সুমনোহরা ! চণ্ডমুণ্ড আর একটি কথা বলিল,— **'ভাসয়ন্তী হিমাচলম্'** হিমাচলকে অর্থাৎ জড়ত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া সে মূর্তি বিরাজ করিতেছে ।

সাধক ! একদিন যে প্রবৃত্তি তোমাকে বিষয়ের পঙ্কিলতাময় ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া রাখিত, একদিন যে প্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য কতই না আয়োজন করিয়াছিলে, একদিন যে প্রবৃত্তিকে তোমার যাবতীয় দুঃখের হেতুস্বরূপ বুঝিয়াছিলে, আজ দেখ — সেই প্রবত্তিই সর্বাগ্রে অতীব সুমনোহর পরমরূপের সন্ধান আনিয়া দিল । যে প্রবৃত্তি একদিন কেবল বন্ধনের দিকে লইয়া যাইত, সেই প্রবৃত্তিই আজ মুক্তিমন্দিরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া দিল । ওগো ! প্রবৃত্তির দোষ কি ? সে যতদিন পরমরূপের সন্ধান পায় নাই, ততদিন বিষয়ের দিকে ছুটিয়াছিল ! নিবৃত্তির দোষ কি ? সে এতদিন পরমাত্মস্বরূপের সন্ধান পায় নাই, তাই কেবল বিষয়-বিরতি সাধন করিতেই অর্থাৎ ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বনের চেষ্টায়ই ব্যস্ত ছিল । কিন্তু আজ তাহারা অম্বিকাকে দেখিতে পাইয়াছে ; আজ বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরম রূপের সন্ধান পাইয়াছে, তাই সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া অস্মিতাকে খবর দিল, **'এক অনির্বচনীয়া স্ত্রীমূর্তি হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছে।'**

এতদিন সাধক শুধু হিমাচলকে অর্থাৎ জড়ত্বকে চৈতন্যের বিকাশস্থান বলিয়া বুঝিয়াছিল, চৈতন্যই যে জড়ের আকারে প্রকাশিত, ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিল ;

কিন্তু আজ একি দেখিতে পাইল ! চৈতন্য যে স্বরাট্ ; জড় সম্বন্ধ ব্যতীতও তাঁহাকে নির্বিশেষরূপে দেখা যায়, ভোগ করা যায় । জড়ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ জড়ত্বের প্রকাশক চৈতন্য আজ স্বতন্ত্ররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে । তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল—হিমাচল হইতে স্বতন্ত্র অথচ হিমাচলের উদ্ভাসক সে পরমরূপ। উপনিষৎ ঠিক এই কথাই বলেন, —'**তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।**'

সাধক! পূর্বে মাকে কেবল পার্বতীমূর্তিতে দেখিতে, অর্থাৎ সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্ত বিশ্বরূপে চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি করিতে ; কিন্তু আজ তাঁহাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । ওগো ! সে যে কি, তাহা কিরূপে লিখিব ? কতবার বলিয়া আসিয়াছি, — '**জন্মাদ্যস্য যতঃ**' । যাঁহা হইতে আমরা জন্মিয়াছি, যাঁহাতে নিয়ত অবস্থান করিতেছি, আবার যাঁহাতে মিলাইয়া যাইব, অথচ যাঁহাতে জন্ম-স্থিতি-লয় বলিয়া কিছুই নাই ; তাঁহার প্রত্যক্ষ, তাঁহার সাক্ষাৎকার, সে যে কি আনন্দ তাহা কি বলিয়া বুঝাইব ? ইহার স্বরূপ বলা যায় না বলিয়াই মন্ত্রে অনির্বচনীয় অর্থ-বোধক 'কাপি' শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা যে শক্তিস্বরূপ ইহা বুঝাইবার জন্য মন্ত্রে স্ত্রী শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । শক্তি-বস্তু চিরকালই অনির্বচনীয়। কার্যকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি নির্বচনীয় হইয়া থাকে । কার্যসম্বন্ধ বিহীন এই শক্তির আভাসমাত্র পাইলেও সাধক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে ।

নৈব তাদৃক ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥৪৪॥

অনুবাদ । তেমন উত্তম রূপ কেহ কোথায়ও দেখে নাই । হে অসুরেশ্বর ! আপনি একবার জানুন ঐ দেবী কে ? আপনি উহাকে গ্রহণ করুন ।

ব্যাখ্যা । চণ্ডমুণ্ডের কথাগুলি কি সুন্দর ! সত্যই তেমন রূপ কে কোথায় দেখিয়াছে ? যে তাঁহাকে দেখিবে, সে যে তাই হইয়া যাইবে ! পৃথক থাকিয়া ত' দেখিবার উপায় নাই । তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল—'**তাদৃক্রূপং কেনচিৎ নৈব দৃষ্টং**' সে যে অনুচ্ছিষ্ট বস্তু । সে স্বরূপ কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যায় না—মূকাস্বাদনবৎ ।

উহারা শুম্ভকে আরও বলিল,—'**জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চা সুরেশ্বর**' । আপনি জানুন—তিনি কে ; তারপর গ্রহণ করুন । গীতায়ও উক্ত আছে, —'**জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ**'। আগে তাঁহার স্বরূপ জানিতে হয়, তারপর দেখিতে হয়, তারপর প্রবেশ করিতে হয় । উপনিষৎ ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলিয়াছেন ।

মন্ত্রে যে 'গৃহ্যতাম্' পদটির উল্লেখ আছে, উহার অর্থ গ্রহণ করুন । ঐ গ্রহণ এবং প্রবেশ একই কথা ; কারণ, মাকে গ্রহণ করিতে গেলেই তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে হয় । মাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না । স্বয়ংই গৃহীত হইতে হয় । মা ত' আর গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় নয় ! মা স্বয়ংই যে জ্ঞাতৃ স্বরূপ । বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে— গ্রহণ করিবে ? তাঁহাকে জানিতে গেলেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদির পরপারে চলিয়া যাইতে হয় ।

স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টু মর্হতি ॥৪৫॥

অনুবাদ । হে দৈত্যেন্দ্র ! তিনি স্ত্রীরত্ন ; তাঁহার অবয়ব অতিশয় মনোজ্ঞ ; তাঁহার দেহকান্তিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত । তাঁহাকে একবার আপনার দেখা উচিত ।

ব্যাখ্যা । প্রবৃত্তির ইহা প্রলোভন-বাক্য হইলেও, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংশ্রব নাই । যথার্থই তিনি স্ত্রীরত্ন— অনন্ত শক্তির নির্বিশেষ-কেন্দ্র । রত্ন শব্দে জ্ঞানকেও বুঝায়, সুতরাং স্ত্রীরত্ন শব্দে জ্ঞানময়ী শক্তিস্বরূপ বস্তুই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যে চিতিশক্তি বা চিন্ময়ী মহতী শক্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এস্থলে স্ত্রীরত্ন শব্দটির প্রয়োগ করিয়া চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে আভাসে তাহাই বুঝাইয়া দিল । সত্যই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতিশয় চারু । তিনি সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ । সত্যই তাঁহাকে দেখিয়া— 'মদন মূরছা যায়'। তিনি অনন্ত সৌন্দর্যের আকর । তিনি পরম প্রেমময়, পরম প্রিয়তম আত্মা । তিনি এমনই মনোহর, এমনই চারু যে, '**জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল**' । এমনই সে রূপ যে,

'সদা হেরি তবু থাকি তৃষিত নয়নে'। সে যে অরূপের রূপ। অপূর্ব সুষমা! কি ভাষা আছে যে, তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিব? ওগো! জগতের সকল রূপ সমষ্টিভূত করিয়া, জগতের সকল সুখ সমবেত করিয়া যদি এক জায়গায় রাখা যায়, তাহা হইলে যাহা হয়—যদি কল্পনা-চক্ষেও সাধক সেই ভাবটি বুঝিতে পার, তবেই সেই অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই ভূমা সুখের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পার। সে যে মধু, সে যে অমৃতম্! সে যে অভয়ম্! সে যে কি! সে যে কি গো!

'দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা' স্বকীয় দেহ-কান্তিতে সমগ্র দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। উপনিষৎ বলেন,—**'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'**—এই জগৎ, এই বহুত্ব, এই আমি, সকলই যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত; যিনি সকল প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং নির্বিশেষে কেবলানন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অম্বিকা, আত্মা, মা আমার। মা যে আমার কেবলানন্দময়ী চিতিশক্তিরূপিণী, এইটি বুঝাইবার জন্যই চণ্ডমুণ্ড চার্বঙ্গী স্ত্রীরত্ন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ ব্যতীত অসুর আর কি শব্দ দ্বারা মায়ের আনন্দস্বরূপটি ব্যক্ত করিবে? আনন্দের ত' কোনও বিশিষ্ট রূপ নাই! উহা যে কেবলানুভবস্বরূপ।

এই মন্ত্রের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—**'তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি'**—তাঁহাকে দেখিবার যোগ্যতা আপনার আছে। জীব যতদিন অস্মিতার সন্ধান না পায়, ততদিন এই **'রূপং রূপবিবর্জিতস্য স্বরূপম্'** বুঝিতেই পারে না; কিন্তু গুরুকৃপায় সাধক এতদিন সত্য ও প্রাণের সন্ধান পাইয়া, আমিত্ব-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং এইবার তাহার পরমানন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আসিয়াছে। ঠিক এমনই করিয়া প্রবৃত্তি অস্মিতাকে প্রলুব্ধ করে।

দেখ সাধক! প্রবৃত্তি যতদিন বিষয়াভিমুখী থাকে, ততদিন জীবকে নরকের পথে লইয়া যায়। কিন্তু এই প্রবৃত্তিই আবার পরমাত্মাভিমুখী হইয়া মুক্তি-মন্দিরের অর্গলাবদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তাই বলি—প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিও না। প্রবৃত্তি যথার্থই হিতৈষী বন্ধু।

———০———

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৪৬॥

অনুবাদ। হে প্রভো! ত্রিলোকে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ মণি, এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি আছে, সম্প্রতি সে সকলই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে।

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। হে প্রভো! ত্রিলোকের যাহা কিছু ভাল জিনিষ, সে সকলই আপনার গৃহে বর্তমান।

যদিও অস্মিতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্বভাব প্রকাশ পায়, যদিও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকল বস্তুই শুম্ভের গৃহে থাকা উচিত, তথাপি শুম্ভের মহিমা খ্যাপন উদ্দেশ্যে চণ্ডমুণ্ড এখানে কেবল মণিরত্নাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলির উল্লেখ করিল। আধিভৌতিক ভাবে বাস্তবিকই ত্রিলোকের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু—হস্তী, অশ্ব, মণি, রত্ন প্রভৃতি, সে সকল ত' শুম্ভের গৃহেই অবস্থিত, তদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও দেখা যায়— রত্ন শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্থাৎ জ্ঞান। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, **'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'**। এইরূপ গজ শব্দের অর্থ—বন্ধন এবং অশ্ব শব্দের অর্থ—গতি। (এ সকল অর্থ পূর্বেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে) জ্ঞানরূপ মণিরত্ন, গজরূপ কর্মফল-বন্ধন এবং অশ্বরূপ স্বর্গ নরকাদি সংসার-গতি সকলই অস্মিতার আশ্রয়ে অবস্থিত। মন্ত্রের শেষার্দ্ধে উক্ত হইয়াছে—**'সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে'**। এই **'সাম্প্রতং'** কথাটিরও একটু রহস্য আছে। সম্প্রতি অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ত্রিলোকের সমস্তই অস্মিতার। পরে ইহা আত্মারই হইবে। জ্ঞানের উদয়ে দেখা যায়—একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; অস্মিতা জগৎকারণ নহে। অস্মিতার জগৎকারণত্ব সম্প্রতিমাত্র, পরে আর এরূপ অজ্ঞান থাকিবে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপী ভৃত্যের এই গূঢ় রহস্যপূর্ণ সত্য-বাক্যগুলি শুম্ভ ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা সাধকগণই বিচার করিবেন।

———০———

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবাহয়ঃ ॥৪৭॥

অনুবাদ। গজরত্ন ঐরাবত পারিজাততরু এবং

উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। ক্রমে ছয়টি মন্ত্রে চণ্ডমুণ্ড পূর্বোক্ত মন্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। পূর্বে বলিয়াছিল—ত্রিলোকের সকল ধন-রত্ন আপনার গৃহে। এখন তাহাই বিশেষভাবে দেখাইতেছে। তাই শুম্ভকে বলিল—'এই দেখুন না কেন, ইন্দ্রের যাহা কিছু ভাল জিনিষ—ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, এ সকলই আপনি গ্রহণ করিয়াছেন।'

ইন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাখাত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। পারিজাত—কল্পতরু। সঙ্কল্পমাত্রেই যখন সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার গৃহে পারিজাত তরু অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ বিরাজিত। উচ্চৈঃশ্রবাঃ—দিব্য শ্রবণ শক্তি। অতিদূরস্থিত অথবা অতি সূক্ষ্মতম শব্দ শ্রবণ করিবার ক্ষমতাকে উচ্চৈঃশ্রবা কহে।

শুন—সত্ত্বগুণ যত নির্মল হয়, ততই অস্মিতার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন সাধক দেখিতে পায়—সর্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে 'আমিত্ব', উহাই ত' সর্বভাবের একান্ত আশ্রয়। যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলই ত' আমিত্বরূপ আধারে অবস্থিত। সুতরাং কি সূক্ষ্ম জগতে, কি স্থূল জগতে, যেখানে যতপ্রকার ভাব বা পদার্থ আছে, সে সকলেরই একমাত্র অধীশ্বর অস্মিতা। তাই ঐরাবতাদি যদিও যথার্থতঃ ইন্দ্রের অর্থাৎ পরমাত্মারই শক্তি মাত্র, তথাপি এখন উহাদিগকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি অনুচরগণ অস্মিতারই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে। ইহাই অসুরভাব। আসল কথা এই যে, একমাত্র স্বপ্রকাশ চিতিশক্তিই সর্ব বস্তুর অধিষ্ঠান, তাহা না জানিয়া চিদাভাসকে সর্ব বস্তুর অধিষ্ঠান মনে করাই অসুর ভাব।

———○———

বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ। ব্রহ্মার রত্নস্বরূপ হংসযুক্ত অদ্ভুত বিমান সমানীত হইয়া, এখানে—আপনার অঙ্গনে অবস্থান করিতেছে।

ব্যাখ্যা। বেধা—ব্রহ্মা, বিরাট্ মন। হংস—জীব। বিমান—ব্যোমযান। হংসযুক্ত বিমান—জীবভাবীয় মন। জীবের মন ব্যোমকে বা আকাশতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে; তাই মনকে ব্যোমচারী বা বিমান বলা হয়। যে বিরাট মনের সঙ্কল্প এই বিশ্ব, তিনিই বেধা বা ব্রহ্মা। আমাদের এ ব্যষ্টি মনও তাঁহারই অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্কল্পমাত্র। এইটি—ব্যষ্টি মনটিই ব্রহ্মার অদ্ভুত বিমান। সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমানের রহস্য বুঝিতে পারা যায়। ব্যষ্টি মনে অর্থাৎ হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সমষ্টি মন বা প্রজাপতি যে ভাবে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে সৃষ্টিব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। এবং ইহাই ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ রত্ন বা শক্তি। যদিও পূর্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে, তথাপি এ স্থানে পুনরায় আলোচনা করিতে হইল।

শুন—একটি বৃক্ষ দেখিতেছ। যে বৃক্ষটি বিরাট মনের সঙ্কল্প ঠিক সেইটি তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সে বৃক্ষটি সঙ্কল্পময়, ভাবময় বা আনন্দময়; কারণ, আনন্দময় পরমেশ্বরের কল্পনাই বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত হয়; আনন্দ-ধাতু দ্বারাই উহা গঠিত। সেই চিন্ময় আনন্দময় বৃক্ষটি তোমার পক্ষে অজ্ঞেয়। তবে তুমি কোন্ বৃক্ষ দেখিতেছ? ঐ চিদানন্দময় বৃক্ষ হইতে একপ্রকার স্পন্দন ইন্দ্রিয়পথে আসিয়া তোমার মনকে অর্থাৎ ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, তোমার মনটি বৃক্ষের আকারে আকারিত হয়; এইরূপে তুমি যে বৃক্ষটি দেখিতে পাও, উহা তোমার সংস্কারানুরূপ একটি স্থূল ভৌতিক বৃক্ষ মাত্র। আনন্দধাতু দ্বারা গঠিত বৃক্ষটি তোমার ভৌতিক সংস্কাররূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাই ব্রহ্মার অদ্ভুত বিমান অথবা অভূতপূর্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্য। এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও জীবের নিকট উহা ভৌতিক সংস্কাররূপ আবরণে আবৃত হইয়া প্রকাশ পায়। ব্রহ্মা স্বয়ং চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়াও, স্বকীয় কল্পনাগুলি জড়াকারে—ভৌতিক আকারে পরিবর্তিত করিতে পারেন; হংসযুক্ত বিমান অর্থাৎ জীবভাবীয় মনই ঐরূপ পরিবর্তনের সহায়ক; তাই ব্রহ্মা হংসবাহন। কোন্ অনাদি কাল হইতে আমরা আমাদের এই ব্যষ্টি মনকে কেবল ভৌতিক

রূপরসাদি গ্রহণের যোগ্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই আমরা চিদানন্দময় জগৎ ভোগ করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই প্রজাপতি ব্রহ্মার আমাদের উপর এই আধিপত্য। আমরা জীব—আমরাই ব্রহ্মার বাহন হংস। আমাদের ব্যষ্টি মনগুলি ভৌতিক বস্তু গ্রহণে নিপুণ জানিয়াই তিনি এই অনির্বচনীয় সৃষ্টি দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদিগকে ভৌতিক লীলা দেখাইতেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

শুম্ভ ব্রহ্মার এই বিমানটি হরণ করিয়াছে, অর্থাৎ এই অদ্ভুত সৃষ্টি ব্যাপারটি এখন আর ব্রহ্মার নহে শুম্ভের। অস্মিতা-স্বরূপে উপনীত হইয়া সাধক সত্য সত্যই দেখিতে পায়— আমিই ত' ব্যষ্টি সমষ্টি মনের যাবতীয় সঙ্কল্প ও স্পন্দন ধরিয়া রাখিয়াছি। আমা হইতে ব্যষ্টি সমষ্টি মনের বিকাশ, আমি না থাকিলে ত' মনের সত্তাই থাকে না। ইহাই শুম্ভের ব্রহ্ম-বিমান হরণের রহস্য। বাস্তবিকপক্ষে মন বস্তুটাও যে অস্মিতারই একপ্রকার ব্যূহমাত্র, ইহা সাধকগণ গুরূপদিষ্ট উপায়ে তত্ত্বের সাধনকালে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন।

———○———

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৪৯॥

অনুবাদ। আপনি ধনাধিপতি কুবেরের নিকট হইতে এই মহাপদ্ম নামক নিধি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সমুদ্র আপনাকে কিঞ্জল্কিনী নামক অম্লান-পঙ্কজের মালা দান করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। মহাপদ্মনামক নিধি শব্দের অর্থ নির্মল সত্ত্বগুণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে —'**সত্ত্বাধারোনিধিশ্চান্যোমহাপদ্ম ইতি স্মৃতঃ। সত্ত্বাপ্রধানোভবতি তেন চাধিষ্টিতোনরঃ।**' অর্থাৎ মহাপদ্মনামক নিধি সত্ত্বগুণের আধার; সুতরাং সত্ত্বগুণ-প্রধান মনুষ্যই এই নিধি লাভের যোগ্য। রজস্তমোগুণ অভিভূত হইলেই সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হয়। এস্থলে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকেই মহাপদ্মনামক নিধি বলা হইয়াছে। পূর্বেও বলিয়াছি— যাবতীয় নিধি বা বিভূতি বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়! আর, রজস্তমোগুণ অভিভূত না হইলে—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে না পারিলে ত' সাধক অস্মিতার স্বরূপই উপলব্ধি করিতে পারে না; সুতরাং মহাপদ্ম নিধি ত' শুম্ভের গৃহেই থাকিবে!

ধনেশ্বর—কুবের, প্রাণই যথার্থ ধনাধিপতি; তাই ধনেশ্বর শব্দের অর্থ প্রাণ। বিশ্বময় যে প্রাণসত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই সত্ত্বগুণ নির্মল হয়। তাই মহাপদ্ম বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকেই প্রাণের আশ্রিত বলা যায়। অস্মিতায় উপনীত সাধক ইতিপূর্বে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিয়া সর্বত্র প্রাণসত্তার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ মহাপদ্ম নিধির অধিকারী হইয়াছে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয় বলিয়াই ধনেশ্বরের নিকট হইতে এই নিধি গ্রহণের কথা হইল।

এতদ্ভিন্ন শুম্ভ সমুদ্রের নিকট হইতে কিঞ্জল্কিনী নামক এক অম্লান-পঙ্কজের মালা গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদ্র—কর্মাশয়। যদিও অস্মিতায় উপনীত সাধকের সঞ্চিত এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্কার না থাকা হেতু কর্মাশয় ক্ষীণ হইয়া যায়, তথাপি যতদিন প্রবল প্রারব্ধ-সংস্কার-সমূহ সম্যক্ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ততদিন (ক্ষীণ হইলেও) কর্মাশয় থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যদিও এরূপ সাধকের আর বন্ধজনক সকাম কর্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি যতদিন দেহ থাকে, ততদিনই প্রারব্ধ-কর্ম সংস্কার থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সুতরাং কর্মাশয় বলিতে এস্থানে কেবল প্রারব্ধ কর্মাশয় বুঝিতে হইবে। সঞ্চিত ও আগামী কর্মের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরে ইহাই চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ সেনার অন্যতম অঙ্গরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। অম্লান-পঙ্কজমালা শব্দে একান্ত ফলোন্মুখ প্রারব্ধ-কর্ম-সংস্কারশ্রেণী বুঝিতে হইবে। এখন পর্যন্ত উহারা প্রক্ষীণ হয় নাই, তাই অম্লান। পঙ্ক শব্দের অর্থ পাপ অর্থাৎ অজ্ঞান। অজ্ঞান-রূপী পঙ্ক হইতেই উহাদের জন্ম, তাই পঙ্কজ বলা হয়। কিঞ্জল্ক শব্দের অর্থ কেশর। যাহার কিঞ্জল্ক আছে তাহার নাম কিঞ্জল্কিনী। পূর্বোক্ত ফলোন্মুখ প্রারব্ধকর্ম-সংস্কারশ্রেণীরূপ অম্লানপঙ্কজ-মালাটিরই নাম কিঞ্জল্কিনী। পদ্মগর্ভস্থিত পীতবর্ণ কেশরসমূহের ন্যায় প্রবল প্রারব্ধ বীজগুলি সাধককে যথার্থ আত্মস্বরূপে অবস্থান হইতে দূরে রাখিয়া দেয়। প্রবল প্রতিকূল প্রারব্ধ-সংস্কারগুলির ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভ হয়

না। সাধক ! যতদিন দেখিবে মা আমার পরমার্থ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন না, ততদিনই বুঝিবে—ঐ কিঞ্জল্কিনী নামক অম্লান-পঙ্কজের মালাটিই প্রতিবন্ধক স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। ঐ প্রতিকূল প্রারব্ধসংস্কার-ক্ষয়ের জন্য ধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অধীর হইলে আরও বিলম্ব হইবে। একমাত্র মাতৃ-করুণার উপর নির্ভর করিয়া কাতরপ্রাণে কাঁদিতে হইবে।

সে যাহা হউক, ইতিপূর্বে এই কর্মাশয়কে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইত। এখন উহাকে অস্মিতারই একপ্রকার স্ফুরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাই চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—যে পঙ্কজমালা ইতিপূর্বে সমুদ্রের ছিল, তাহা এখন তুমি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছ।

দ্বিতীয় খণ্ডে সমুদ্র শব্দের যে গুণত্রয়ের সংযোগ-তারতম্যরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বর্তমান অর্থের কোনও বিরোধ নাই। ধীমান পাঠক ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

———○———

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৫০॥

অনুবাদ। বরুণ-প্রদত্ত সুবর্ণস্রাবি ছত্র এবং যাহা পূর্বে প্রজাপতির ছিল—সেই শ্রেষ্ঠ স্যন্দনও (রথ) আপনার গৃহেই রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ছত্র—আচ্ছাদনকারক। কাঞ্চনস্রাবি—ঐশ্বর্যদায়ক। অস্মিতায় আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে একদিকে যথার্থ আত্মস্বরূপটি আচ্ছন্ন থাকে, অন্যদিকে সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ঈশ্বরধর্ম প্রকাশ পায়, অর্থাৎ নানারূপ ঐশ্বর্য বা বিভূতির বিকাশ হইতে থাকে, ইহাই কাঞ্চনস্রাবি ছত্র। পরমাত্মস্বরূপের আবরক বলিয়াই ইহাকেই ছত্র বলা হয়। এই ছত্রটি পূর্বে বরুণের—রসাধিপতি দেবতার ছিল। এক্ষণে ইহা শুম্ভের গৃহে অবস্থিত। পূর্বে সাধক ভোগ-স্পৃহাকে ঐশ্বর্য বিভূতি প্রভৃতিকে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত, কিন্তু এখন উহাদিগকে নিজেরই একপ্রকার বিশিষ্ট-প্রকাশ-রূপে দেখিতে পায়। তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল—পূর্বে যাহা বরুণের ছিল এখন তাহা আপনারই হইয়াছে। সাধকগণের অতিশয় সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরত্বাদি আত্মমহত্ত্ব ভোগের স্পৃহা থাকে বলিয়াই, উহা কাঞ্চনস্রাবি ছত্ররূপে পরমাত্মস্বরূপের আচ্ছাদক হয়।

প্রজাপতির স্যন্দনবর—চিত্তবৃত্তি। বৃত্তিগুলিকে অবলম্বন করিয়াই মনোরূপী প্রজাপ্রতি ইতস্ততঃ যাতায়াত বা প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ; তাই চিত্তবৃত্তিই স্যন্দন বা রথ। পূর্বে উহা প্রজাপতিরই ছিল। এখন কিন্তু শুম্ভ-গৃহে অবস্থিত। সাধক ইতিপূর্বে বৃত্তিগুলিকে মনের ধর্ম বলিয়া জানিত, এখন দেখিতে পায়—উহারা নিজেরই (অস্মিতারই) বিভিন্ন স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্যন্দন শব্দটির ক্ষরণ অর্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিশ্চল পরমাত্মভাবের ক্ষরণ হয় বলিয়াও বৃত্তিগুলিকে স্যন্দন বলা যায়। প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করিত, বৃত্তিগুলিই আত্মলাভের অন্তরায়, এখন কিন্তু সে ভাবটি আর নাই, সকলই সে আত্ম-স্ফুরণরূপে দেখিতে পায়। যতদিন বৃত্তিগুলি নিজস্বরূপ হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, ততদিনই উহাদিগকে সংযত করিবার প্রয়াস থাকে। কিন্তু বৃত্তিসমূহ 'আমারই একপ্রকার বিকাশ মাত্র' এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হইলে আর উহাদের প্রতি প্রতিকূল ভাব থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বৃত্তিসমূহ অনুকূলও নহে, প্রতিকূলও নহে। উহারা যাঁহার সত্তায় সত্তাবান, তাঁহার দিকে লক্ষ্য পড়িলেই উহাদের অনিষ্টকারিতার উপশম হয়।

———○———

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥৫১॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী॥৫২॥

অনুবাদ। হে ঈশ ! আপনি মৃত্যুর উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি হরণ করিয়াছেন। জলাধিপতির পাশ এবং সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্ন আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধিকারে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত বহ্নি দেবতাও আপনাকে হিরন্ময় বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। মৃত্যুর শক্তি—উৎক্রান্তিদা। প্রাণকে দেহ হইতে উৎক্রামণ করানই মৃত্যুর কার্য। ইহাই তাহার শক্তি বা সামর্থ্য। অস্মিতায় উপনীত হইবার পূর্বে সাধক মনে করিত, মৃত্যু একটা আগন্তুক ব্যাপার-বিশেষ, যম যেন

বলপূর্বক প্রাণকে দেহ হইতে উৎক্রমণ করাইয়া থাকে। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। এখন সে দেখিতে পায় —মৃত্যু বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই। আমি যখন ইচ্ছা করিয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হই, তখনই মৃত্যু নামে একটা ব্যাপার সংঘটিত হয়। মৃত্যুর উৎক্রান্তি-শক্তি-হরণের ইহাই তাৎপর্য।

উপনিষদে এই প্রাণের উৎক্রমণ-বিষয়ে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে—চক্ষু, কর্ণাদি, ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণ, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্থির করিবার জন্য উৎক্রমণ ব্যবস্থা হইল। প্রথমে এক একটি করিয়া ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে প্রাণের বিশেষ কিছুই অনিষ্ট হয় নাই, কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অভাব-জনিত একপ্রকার কষ্ট বোধ হইতেছিল। সর্বশেষে প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিবামাত্র ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় সত্তার বিনাশ-আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ প্রাণের উৎক্রমণ যে 'আমারই ইচ্ছামাত্র', ইহা বুঝিতে পারিলে, সাধকের মৃত্যুভয় সম্যক্ অপনীত হয়। যাঁহারা অস্মিতায় গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল জ্ঞান অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

জলাধিপতির পাশ এবং সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্ননিচয় নিশুম্ভ গ্রহণ করিয়াছে। পাশ শব্দের অর্থ অনুরাগ। বরুণের পাশ কি তাহা দ্বিতীয়খণ্ডে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। এখানে অনুরাগ শব্দে কেহ বিষয়ানুরাগ বুঝিবেন না ; এ অনুরাগ—নিশুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার সহিত একান্ত সহভাবী যে মমতা, তাহারই। যেখানে মমতা সেইখানেই অনুরাগ। সাধারণতঃ বিষয়ানুরাগ স্থলে ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোক্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় ; সুতরাং উহাদের প্রতি একটা আসক্তি থাকে ; কিন্তু এ অস্মিতাক্ষেত্রের অনুরাগ সেরূপ নহে। এখানে যতই বহুভাব ফুটুক না কেন, সকলই অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণরূপে প্রকাশ পায় ; সুতরাং আমারই বহুভাবের প্রতি আমার যে আসক্তি, তাহাই এস্থলে অনুরাগপদবাচ্য। নিশুম্ভ-অসুরের জলাধিপতির নিকট পাশ-গ্রহণের ইহাই রহস্য। অস্মিতায় উপনীত হইতে না পারিলে সাধক ইহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন কি ?

সমুদ্রজাত রত্ননিচয় শব্দে যাবতীয় যোগ-বিভূতি বুঝায়। ইতিপূর্বে ঐ সকল যেন একটা পৃথক বস্তু বা শক্তিরূপে প্রতীত হইত, কিন্তু এখন মায়ের কৃপায় সাধক বেশ বুঝিতে পারে—ঐ যোগশক্তিসমূহ আমারই বিভিন্নরূপে প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অস্মিতার ঐ বহুভাবাত্মক স্ফুরণসমূহের সঙ্গে সঙ্গেই মমত্বের অভিব্যক্তি আছে, ইহাই নিশুম্ভের সমুদ্রজাত রত্ননিচয়-গ্রহণের রহস্য।

চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, যে সকল ঐশ্বর্যের কথা বলিল, সে সকলই শুম্ভের আয়ত্ত, কেবল এই দুইটি (বরুণের পাশ এবং সমুদ্রজাত রত্ননিচয়) নিশুম্ভের। সাধক ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন—অনুরাগ এবং বিভূতি অস্মিতামাত্র হইলেও মমত্বকর্তৃকই উহা পরিগৃহীত। তাই মন্ত্রেও **'ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে'** কথাটি রহিয়াছে।

বহ্নি দিলেন—**'অগ্নিশৌচে চ বাসসী'** অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়। বস্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন ; যাহা পরমাত্মভাবের আবরক তাহাই বাস। অগ্নিশৌচ শব্দের অর্থ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা বিশোধিত। মায়া এবং অবিদ্যা ইহাই অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল। **'মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি'**, সেই গানটি এখানে একবার স্মরণ করিলেই ভাল হয়। অস্মিতা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই সাধক মায়া অবিদ্যার স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে। পরমাত্মস্বরূপে মায়াও নাই, অবিদ্যাও নাই। ইতিপূর্বে অর্থাৎ অস্মিতায় উপনীত হওয়ার পূর্বে সাধক মায়া এবং অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানিত, উহা একপ্রকার অস্ফুট বাচনিক জ্ঞানমাত্র, কিন্তু এখন উহা অগ্নিশৌচ হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশোধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষে না দাঁড়াইতে পারিলে, মায়া এবং অবিদ্যা যে কি এবং উহার কেন্দ্র যে কোথায়, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

———○———

এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্নগৃহ্যতে ॥৫৩॥

অনুবাদ। হে দৈত্যেন্দ্র ! এইরূপ সমস্ত রত্নই আপনি আহরণ করিয়াছেন, কেবল এই কল্যাণী স্ত্রীরত্নটি কেন গ্রহণ করিতেছেন না !

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ডের প্রলোভন-বাক্যের এইখানেই

শেষ। এমনই করিয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জীবকে মাতৃলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অস্মিতার আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, সাধক বেশ বুঝিতে পারে—সর্বরূপে বহুরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, সে সমস্তই রত্নমাত্র। আমার আমিত্বরূপ মহারত্ন দ্বারাই এ বিশ্ব সংগঠিত। যে জিনিষ আমার পরম প্রিয়তম আমিত্ব দ্বারা গঠিত সে সকলই আমার নিকট রত্নরূপে, প্রিয়তম বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিগৃহীত হয়; সে সমস্তই ত' আমার আমিত্বময়! আমিত্বরূপ মহারত্নই ত' সর্বরূপে বহুরূপে প্রকাশিত! তাই মন্ত্রে '**রত্নানি সমস্তানি**' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। জগৎময় প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে সাধক দেখিতে পায়—আমার আমিটাই জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমিত্বরত্নই 'সমস্ত'রূপে অবস্থিত, ইহার উপলব্ধি বড়ই লোভনীয়, বড়ই আনন্দদায়ক। অনেক সাধক এখানে আসিয়া জীবনের চরিতার্থতা মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা এমনই মধুময়ী অবস্থা। কিন্তু এখানেও নয়, আরও অগ্রসর হইতে হইবে। তাই মা আমার চণ্ডমুণ্ড-রূপে —প্রবত্তিনিবৃত্তিরূপে চিতিশক্তির—পরমাত্মার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হন, এবং সাধককে নানারূপে প্রলুব্ধ করিয়া পরমাত্মাভিমুখে তীব্র আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পান। আশঙ্কা হইতে পারে—একমাত্র চণ্ড অর্থাৎ পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিই ত' সাধককে প্রলুব্ধ করে, মুণ্ড অর্থাৎ নিবৃত্তি ত' প্রলুব্ধ করে না! তাহার উত্তর এই যে, যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিবৃত্তি কখনই সাধককে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করে না বটে, তথাপি ঐ নিবৃত্তিই পূর্বলব্ধ রত্নাদি বা যোগ-বিভূতির প্রতি তীব্র আসক্তি দূর করিয়া দিয়া প্রবৃত্তির আকর্ষণের বিশেষ সহায় হয়। শুম্ভ যদি গৃহস্থিত রত্নরাজিতেই একান্ত মুগ্ধ থাকিত, তবে কি অম্বিকাকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইত? নিবৃত্তির প্রভাবেই অম্বিকা লাভ হয়। সে যাহা হউক, চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—সবই যখন আপনার, তখন আর এই কল্যাণী মূর্তিটিকেই বা আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না। সব রত্নই যখন আপনার, তখন এ স্ত্রীরত্নই বা আপনার কেন না হইবে? ইহাকেও আপনার করিয়া লউন! শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অম্বিকাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হায়! সে জানে না যে, অম্বিকাকে আপনার করিতে গেলে, আপনি অর্থাৎ 'আমি'টিই থাকে না, একমাত্র অম্বিকাই থাকেন। চিতিশক্তিকে গ্রহণ করিতে গেলে, অস্মিতাই বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে এই অপূর্ব তত্ত্বই পরিস্ফুট হইবে।

সাধক! তুমিও শুম্ভের মত প্রলুব্ধ হও। প্রবৃত্তি তোমায় কল্যাণী মায়ের জন্য প্রলুব্ধ করুক! নিবৃত্তি তোমায় লব্ধ-রত্নের প্রতি আসক্তিহীন করিয়া দিউক, তুমিও মাকে আনিতে বা পাইতে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেল, মনুষ্য-জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভ হউক।

———o———

ঋষিরুবাচ

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥৫৪॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু ॥৫৫॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন শুম্ভ সুগ্রীবনামক জনৈক অসুরকে দূতরূপে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল; এবং বলিয়া দিল 'তুমি আমার কথা অনুসারে সেখানে গিয়া এই সকল কথা বলিবে, এবং যাহাতে তিনি (সেই দেবী) সম্প্রীতির সহিত শীঘ্রই এখানে আগমন করেন, এরূপ কার্য করিবে'!

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ডের বাক্যে শুম্ভ মুগ্ধ হইল—অস্মিতা প্রবৃত্তির প্রেরণায় আত্মলাভে উদ্যত হইল। শুম্ভের সর্বপ্রথম উদ্যম—সুগ্রীবনামক দূত প্রেরণ। সু—শোভন গ্রীবাদেশ যাহার, তাহাকে সুগ্রীব কহে। সুগ্রীব—উত্তম বাক্য-প্রয়োগ অর্থাৎ বাচনিক জ্ঞান। মাত্র বাচনিক জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মস্বরূপ বুঝিবার চেষ্টাই শুম্ভের সুগ্রীবনামক দূত-প্রেরণের রহস্য।

অস্মিতা ক্ষেত্রে উপনীত সাধকের মনে স্বতঃই এই ভাবটি জাগিতে থাকে যে, 'আমিই ত' জগৎপ্রকাশক, আমার আবার প্রকাশক কে আছে? যদিই বা থাকে—তবে

সে অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ ইত্যাদি নেতি নেতি মুখে প্রতিপাদিত শূন্যবৎ নিষ্ক্রিয় নিরবলম্ব সুষুপ্তিবৎ একটা অবস্থা মাত্র । সে অবস্থায় গিয়াই বা ফল কি ? এই ত' বেশ আছি ! এখন শুধু বেদান্তাদি-শাস্ত্র প্রতিপাদ্য নির্গুণ স্বরূপের বিষয় মৌখিক আলোচনা করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ! সে অবস্থাটি—সেই বাক্যমনের অতীত স্বরূপটি, স্থূল দেহ থাকিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, হওয়ারও আবশ্যক নাই । এখন শুধু বাক্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই হয়' । কিন্তু হায় ! সাধক এখনও ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার এই যে পারমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, উহা কেবল শ্রুতি ও অনুমান জন্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র ! অপরোক্ষানুভূতি এখনও ঠিক হয় নাই । যদি পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি তাহাকে প্ররোচিত না করিত তবে সে এই ভাবাতীত স্বরূপের আলোচনাও করিত না, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যেন তাঁহার (পরমাত্মার) আলোচনা করিতে হয়, অধিকাংশ সাধকেরই এইরূপ একটা সাময়িক নিশ্চেষ্টতা আসিয়া পড়ে ।

সাধক যাহারা, তাহাদের এরূপ ভাব প্রায়ই আসিয়া থাকে ; কারণ, বহু জন্মার্জিত সাধনার ফলে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে—অস্মিতায় উপস্থিত হইয়া সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব পর্যন্ত লাভ করিয়া সাধক পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সন্ধান পাইয়াছে। তাহার আর ইহার উপরে যাইবার বড় একটা ইচ্ছা হয় না । নিতান্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় অগত্যা অল্পবিস্তর মৌখিক আলোচনা করিতে থাকে । একটা বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে আর সে নিরঞ্জনসত্তার দিকে অগ্রসর হইতে চায় না । তাই সুগ্রীবনামক দূত-প্রেরণের দ্বারা কার্য উদ্ধার করিতে প্রয়াস পায় । অতি চমৎকার এ তত্ত্ব ।

বর্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এইরূপ অবস্থাকেই জীবনের চরম চরিতার্থতা বলিয়া মনে করেন । ইহাকেই অপ্রাকৃত লীলানিকেতন বা নিত্য-বৃন্দাবন প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেন । পক্ষান্তরে পরমাত্মস্বরূপটি যেন নিতান্ত অন্ধকারময় সুষুপ্তিবৎ অবস্থা, এইরূপ স্থির করিয়া, বলিয়া থাকেন —'চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়াই ভাল।' হায় ! তাঁহারা জানেন না যে, বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতেও আত্মার স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধ হয় না, —সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের, পরম প্রেমের আস্বাদও পাওয়া যায় না । তাঁহারা কি জানেন না যে অদ্বয় জ্ঞানই অমৃত, ভেদ জ্ঞানই মৃত্যু ! যদিও স্থূল দেহ বিদ্যমান থাকিতে সে অদ্বয় স্বরূপে দীর্ঘকাল অবস্থান একান্ত অসম্ভব, তথাপি যতদিন অদ্বয় স্বরূপে উপনীত হইতে না পারা যায়, ততদিন যতই লীলারসের আস্বাদন করা যাউক না কেন, অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না, অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না ।

———০———

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশঽতিশোভনে ।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥৫৬॥

অনুবাদ । যেখানে—যে অতিশোভন শৈলোদ্দেশে সেই দেবী অবস্থান করিতেছেন, সে (সুগ্রীব) সেখানে গিয়া কোমল মধুর বাক্যে তাঁহাকে (দেবীকে) বলিতে লাগিল !

ব্যাখ্যা । অতিশোভন শৈলোদ্দেশ—সহস্রার ; অসীম জ্ঞানক্ষেত্র ! তত্ত্ব-প্রকাশিকা নামক চণ্ডীর টিকাকার শৈলোদ্দেশে শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন —**'শৈলস্য ঊর্দ্ধপ্রদেশে'** । যথার্থই এই দেহরূপ হিমাচলের সর্বোর্দ্ধ প্রদেশে সহস্রদল কমল বিরাজিত । জগতের কোন সৌন্দর্যই তাহার সহিত উপমিত হইতে পারে না ; কারণ পার্থিব সৌন্দর্য জড়ত্বমণ্ডিত ; কিন্তু সে স্থান—বিশুদ্ধ চিন্ময়ক্ষেত্র । সে যে **'আনন্দরূপং বিশুদ্ধবোধং নয়নাভিরামং !'** তাই মন্ত্রে অতিশোভন পদটির প্রয়োগ আছে ।

সহস্রার বলিলে যাঁহারা মনে করেন— মস্তকের অভ্যন্তরে এক হাজার পাপড়িবিশিষ্ট একটা পদ্মফুল আছে, তাঁহারা এ রহস্য পরিগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিশুদ্ধ চিন্ময় ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেই মস্তকের অভ্যন্তরে একটা অপূর্ব অনুভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে । বোধ বস্তু সর্বতঃ প্রসারী সর্বতঃ প্রকাশশীল ; অনন্ত শক্তির কেন্দ্র । অরসমূহ যেরূপ রথচক্র-নাভিতে সম্বদ্ধ থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই বোধ- ক্ষেত্র হইতে অনন্ত প্রসার অনন্ত প্রকাশ অনন্ত শক্তি সর্বতঃ প্রসৃত হইয়া থাকে, তাই ইহাকে সহস্রার বলা হয় । সহস্র শব্দ অসংখ্যবাচক ।

আজকাল অনেক সাধকই ষট্‌চক্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন বা অন্যকে উপদেশ করেন । প্রথম

শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ সকল উপায় মন্দ নহে। বিভিন্ন চক্রে, বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন মূর্তির চিন্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্র জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, কিংবা চক্রে চক্রে শ্বাসের ক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যদি অনুভূতিবিহীন হয়, অর্থাৎ চৈতন্যসত্তা উদ্‌বোধের সহায়ক না হয়, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা কখনও যে আত্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায় না। ঐ সকল চক্রের বিশেষ রহস্য আছে। উহা তত্ত্বসমূহের কেন্দ্র। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে ঐ সকল স্তর সাধকগণের একান্ত আশ্রয়ণীয়। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুগণ উপযুক্ত অধিকারীকেই সে সকল রহস্য ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই অনধিকারীর নিকট উহা প্রকাশ করেন না ; নতুবা লুকাইয়া রাখা তাঁহাদের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে অন্য কথা—

'শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা'—অতিশয় কোমল মধুর বাক্যপ্রয়োগে শুম্ভের দূত দেবীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অতি মধুর প্রণবাদি মন্ত্র জপ অতি মধুর স্তোত্রাদি পাঠ, অতি মধুর উপনিষদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভৃতি উপায়ে আত্মাকে—অম্বিকাকে শুম্ভ স্বকীয় গৃহে অস্মিতাক্ষেত্রে আনয়ন করিতে প্রয়াস পায় ; কিন্তু তাহা যে হইবার নহে। শুম্ভকে আত্মবলি দিতে হইবে ; নতুবা তিনি আসিবেন না। অস্মিতার লয় না হইলে, তাঁহার প্রকাশ হইবে না। মাকে আনিতে হইলেই আমিটি হারাইতে হইবে। যতক্ষণ আমিটি থাকে ততক্ষণ মায়ের আগমন হয় না, ইহাই সত্যকথা। সাধক এইখানে একবার সেই **'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'** ইত্যাদি সত্যদর্শী ঋষির বাক্য স্মরণ করিয়া লও, তাহা হইলেই শুম্ভের এই দূত প্রেরণের নিষ্ফলতা বুঝিতে পারিবে।

———o———

দূত উবাচ

দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৫৭॥
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥৫৮॥

অনুবাদ। দূত বলিল—দেবী ! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রিলোকের পরমেশ্বর। তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি দূতরূপে এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি। যাঁহার আজ্ঞা সমগ্র দেবতাবৃন্দ সর্বদা অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, সমস্ত দৈত্যারিবৃন্দকে যিনি সম্যক্ নির্জিত করিয়াছেন, তিনি—সেই শুম্ভ (আপনাকে) যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন।

ব্যাখ্যা। সুগ্রীব বলিল—'শুম্ভ ত্রিলোকের ঈশ্বর। অস্মিতায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ ত্রিবিধ প্রকাশ অবস্থিত ; সুতরাং অস্মিতাই ত' সর্বভাবের ধর্তা, পাতা ও সংহর্তা ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাচনিক জ্ঞানরূপী সুগ্রীব দূত আসিয়া দেবীর নিকট শুম্ভের এই ঈশ্বরত্বের বিষয় অর্থাৎ অস্মিতার ঐশ্বর্যমহত্ত্বাদি বিষয়ের বর্ণনা করিতে থাকে। যথা— জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই যখন আমাতে প্রতিষ্ঠিত, তখন তুমি দেবী—দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশ-স্বরূপা চিতিশক্তি, তুমি কেন আমার পরিগ্রহে আসিবে না ? সমস্ত দেবশক্তির উপর আমার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, দেবতাগণ আমারই সত্তায় সত্তাবান, আমার উপর দেবতাবৃন্দের কোন অধিকার নেই, আমি তাঁহাদিগকে সম্যক্ নির্জিত করিয়া রাখিয়াছি, এইরূপ সকলে যখন আমার অর্থাৎ 'আমি'রই বহুভাবমাত্র, তখন তুমি আত্মা, তুমিও ত' আমারই আত্মা। তুমিই বা কেন আমার না হইবে ?' শুম্ভের এই ভাবটিই দূতমুখে প্রকাশিত হইতেছে।

শুন, জীব যখন প্রথম সাধনাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন মনে করে, আমি ভগবান্‌কে লাভ করিব অর্থাৎ আমি হইতে ভগবানকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ মূল্যবান বস্তুরূপ বুঝিয়া লয়। ক্রমে সাধনা করিতে করিতে সন্দেহ অবিশ্বাস অহঙ্কার এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি আমির গায়ের মলিন পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, শ্রদ্ধা বিশ্বাস দয়া ক্ষমা নিরভিমান প্রভৃতি মূল্যবান পোষাকগুলি দ্বারা আমিটিকে সাজাইতে থাকে। ক্রমে গুরু-কৃপায় এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আমি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। যত কিছু বহুত্ব, যত কিছু ভালমন্দ, সে সকল 'আমি'রই এক এক প্রকার স্ফুরণ মাত্র, এইরূপে দেখিতে পায়। তখন আশা খুবই বাড়িয়া যায়, তখন আত্মাকেও আমির আয়ত্ত্বে আনিতে প্রয়াস পায়। কার্যতঃ ইহাও অজ্ঞান বা আসুরভাব মাত্র।

মুখে আমরা বলি 'আমার আত্মা' ! ইহাও অজ্ঞানমাত্র । আত্মা কখনও আমার হয় না, আত্মাই 'আমি'র স্বরূপ । ইহা বুঝিতে না পারিয়া যখন জীব আত্মাকে আমির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, তখনই এই চরম অজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয় । ইহাই মহাসুর শুম্ভ । অজ্ঞানই শুম্ভের স্বরূপ ; সুতরাং সে আত্মাকে মাকে আমির আয়ত্বে আনিতে চেষ্টা করিবেই । সেই চেষ্টাই দূতপ্রেরণরূপে প্রথম প্রকাশ পায় !

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ ।
যজ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥৫৭॥

অনুবাদ । এই অখিল ত্রৈলোক্য আমার, দেবতাবর্গ আমার বশীভূত । আমি সমস্ত যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উপভোগ করিয়া থাকি ।

ব্যাখ্যা । শুম্ভের কথাগুলি খুবই সত্য ! অস্মিতায় উপনীত হইলে, সাধক ! তুমিও বুঝিতে পারিবে, এই কথাগুলি কত সত্য । ত্রৈলোক্য আমার, দেবতাবৃন্দ আমার বশীভূত, যজ্ঞভাগ আমি গ্রহণ করি । পূর্বে উক্ত হইয়াছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ প্রকাশকে ত্রিলোক কহে । লোক শব্দ প্রকাশার্থক । আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন, তাই নিতান্ত জড় বুদ্ধিটিও আত্মারূপে 'আমি'রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে । আত্মা বা দৃক্‌শক্তি এবং বুদ্ধি বা দর্শনশক্তি, সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও তখন অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, ইহাই অস্মিতা বা শুম্ভাসুর । সুতরাং স্থূল সূক্ষ্মাদি অথবা সৃষ্টিস্থিত্যাদি ত্রিবিধ প্রকাশ এই অস্মিতাতেই উপলব্ধ হইয়া থাকে ; তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'**মম ত্রৈলোক্যমখিলম্**' ।

দেবতাগণ কি ভাবে অস্মিতার বশীভূত এবং কি ভাবে যজ্ঞভাগ অস্মিতাকর্তৃক পরিগৃহীত হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এ স্থানে পুনরায় বিশেষরূপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । যজ্ঞভাগ শব্দের অর্থ —কর্মফল । কর্মই যজ্ঞ । এই ব্রহ্মাণ্ড কর্মময় ; সুতরাং এ ব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞাগার । কর্মের যাহা শেষ বা পরিণাম অর্থাৎ ফল, তাহাই যজ্ঞভাগ । এই যজ্ঞভাগ দেবতার প্রাপ্য ; কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি সূর্যাদি দেবতাবর্গই রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ কর্মের ফল গ্রহণ করিয়া থাকেন । খুলিয়া বলি—একটি ফুল দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইলে । এস্থলে কি ব্যাপার হইল, একবার ভাবিয়া দেখ—বিরাট মনের যে পুষ্পবিষয়ক সঙ্কল্প আছে, তাহা হইতে এক প্রকার স্পন্দন গিয়া তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে স্পন্দিত করিল । অমনি তোমার চক্ষু ফুলের বাহ্য রূপটি গ্রহণপূর্বক মনের নিকট উপস্থিত করিল । মন উহা বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করিয়া ফুলের মনোহর রূপটি গ্রহণ করিল । তাহার ফলে চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল । এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অর্থই চক্ষুর অধিপতি আদিত্য-দেবতার তৃপ্তি অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ চক্ষুরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট-হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার—সেই আদিত্য দেবতার পরিতৃপ্তি । ঐ তৃপ্তিটুকুর নাম যজ্ঞভাগ ; রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ যজ্ঞের উহাই শেষভাগ বা অমৃত । উহাই দেবতাগণের প্রাপ্য বা ভোগ্য । কিন্তু এখন তাহা অস্মিতার অধিকারে আসিয়াছে ; কারণ এখন দেবতাবর্গ বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশরূপে প্রতিভাত হইতে না পারিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের বিশেষ বিশেষ স্ফুরণরূপে প্রকাশ পাইতেছে । এইরূপে দেবতাবর্গ স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত এবং যজ্ঞভাগ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে ।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—'কর্মদ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করিতে হয় ! তাহা না করিয়া যদি কেহ কর্মফলরূপ যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করে, তবে তাহার চুরি করা হয়।' এই চুরি করা ব্যাপারটি স্থূলদেহাত্মবোধ হইতেই আরম্ভ হয় । জীব যতদিন সাধক না হয়, ততদিন দেহাত্মবোধে বিচরণ করে ও রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিয়া স্থূলদেহ বা মনকেই পরিতৃপ্ত করে । এই তৃপ্তিরূপ ফল বা যজ্ঞভাগ যে দেবতাদেরই প্রাপ্য, ইহা তখন বুঝিতে পারে না । তারপর সাধনা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম প্রথম মনকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকে ; সুতরাং তখনও যজ্ঞভাগ চৈতন্যে অর্পিত হয় না । সর্বশেষে বিজ্ঞানে আরোহণ করিয়া, বিজ্ঞানাত্মরূপী অস্মিতারই তৃপ্তিসাধন করে । সুতরাং সাধারণ জীব হইতে বিজ্ঞানময় কোষের সাধক পর্যন্ত সকলেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যজ্ঞভাগ হরণ করে । ইহাই অসুরকর্তৃক যজ্ঞভাগ হরণের রহস্য । মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ পদের উল্লেখ আছে । বিভিন্ন

ইন্দ্রিয়কর্তৃক আহৃত রূপরসাদি বিষয়সমূহ বিজ্ঞানে গিয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপেই পরিগৃহীত হয়। যদি উহারা আত্মায় অর্পিত হইত, তবে আর এই পৃথকত্ব থাকিতে পারিত না; সকল ভেদ বিদূরিত হইয়া একরসরূপে পরিগৃহীত হইত। সাধক! অপূর্ব এ তত্ত্ব ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখ এবং আর যাহাতে এইরূপ যজ্ঞভাগ হরণ করিতে না হয়, যিনি সর্বযজ্ঞেশ্বর হরি তাঁহাতেই যজ্ঞভাগসমূহ যাহাতে অর্পিত হয়, তাহার জন্য যত্নবান হও, তোমার বহুত্বরূপ পাপ অনায়াসে বিদূরিত হইয়া যাইবে।

———০———

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥৬০॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥৬১॥
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষুরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥৬২॥

অনুবাদ। ত্রিলোকে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, সে সকলই আমার অধীন। (এমন কি) দেবেন্দ্রের বাহন ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত গজরত্ন ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন ইন্দ্রের নিকট হইতে আহরণ করিয়া দেবতাগণ প্রণিপাতপূর্বক আমাকে অর্পণ করিয়াছে। হে শোভনে! দেবতা, গন্ধর্ব এবং নাগগণের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল, সে সকল এখন আমারই অধিকারে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা। পূর্বমন্ত্রে শুম্ভের সামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি মন্ত্রে তাহার ঐশ্বর্য ব্যক্ত হইয়াছে। ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। শুম্ভ দূতমুখে দেবীকে স্বকীয় ঐশ্বর্যের বিষয় শুনাইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, দেববিজয়ী বীর্য এবং পার্থিব অপার্থিব ঐশ্বর্য, সকলই যখন আমার অধিকারে অবস্থিত, তখন বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ মহারত্ন তুমি কেনই বা আমার অধিকারে আসিবে না?

রত্ন শব্দে মণি বুঝায়। আবার যে জাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাহাকেও সেই জাতির মধ্যে রত্ন বলা হয়। পার্থিব শ্রেষ্ঠ-ভোগসমূহ এবং অপার্থিব স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠ ভোগসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে রত্ন শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অস্মিতা বিশ্বময় এবং বিশ্বরূপে প্রতিভাত, সুতরাং বিশেষ অভাব অভিযোগ নাই, অপরের ত্যাগ গ্রহণ নাই, এবং অপরের প্রতি অনুরাগ বিরাগও নাই। মানুষ যেরূপ স্বকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অভাব অনুভব করিয়া উহাদিগকে লাভ করিবার চেষ্টা করে না; ঠিক সেইরূপ অস্মিতায় উপনীত সাধকেরও নিতান্ত ভেদজ্ঞানে ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না। সবই যখন আমি তখন আর ত্যাগ গ্রহণ কিরূপে থাকিবে? বিশ্বের সকল বস্তুই যে আমি দ্বারা গঠিত; সুতরাং দেবতা গন্ধর্ব উরগ প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে যাহা কিছু বস্তু বা রত্ন আছে, সে সকলই আমার অধিকারে অবস্থিত।

সাধক! কি মধুময়ী অবস্থা! ভাবিয়া দেখ—জগতের যেখানে যত কিছু ভোগ আছে, তাহা আমিই করিতেছি। জগতের সকল জীব সকল ভোগই যে আমিময়! আমি এক অদ্বিতীয়—আর অসংখ্য জীব যেন আমারই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; সুতরাং যেখানে যাহা কিছু ভোগ হইতেছে, স্বরূপতঃ তাহা আমিই ভোগ করিতেছি! অস্মিতা-ক্ষেত্র এমনই বটে! তাই পূর্বে বলিয়াছি—বহু সৌভাগ্যের ফলে সাধক এ তত্ত্বে প্রবেশ করিবার সামর্থ্যলাভ করে।

সে যাহা হউক, শুম্ভ দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল—হে শোভনে—হে পরম-শোভাময়ী চিতিশক্তি! সমস্তই আমিময়, শুধু তুমি কেন আমার আমিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হও না? তোমার দিকে তাকাইলে, তোমার কথা ভাবিলে, তোমাকে যে আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই মনে হয়! কেন তুমি পৃথক্ থাকিবে দেবি! তুমিও আমার হও।

শুন, অস্মিতায় আসিলেই, অস্মিতা যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, যাঁহার সত্তায় অস্মিতার সত্তা, তাঁহার দিকে লক্ষ্য পড়ে; সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধকমাত্রেই সর্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকে। শুম্ভের এই অম্বিকা দেবীকে আনয়নের প্রযত্নটিও ঠিক সেই নিত্যসিদ্ধ সাধন-প্রণালীরই নির্দেশ করিয়া দিতেছে।

———০———

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবীং লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভূজোবয়ম্ ॥৬৩॥
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥৬৪॥

অনুবাদ। আমাদের মনে হয়—ইহলোকে তুমিই একমাত্র স্ত্রীরত্নস্বরূপা। আমরাই যাবতীয় রত্ন ভোগের অধিকারী ; সুতরাং তুমিও আমাদিগকে আশ্রয় কর। আমাকেই হউক অথবা আমার অনুজ উরুবিক্রম নিশুম্ভকেই হউক, হে চঞ্চলাপাঙ্গি! (তোমার যাহাকে ইচ্ছা) ভজনা কর ; যেহেতু তুমি যে রত্নস্বরূপা!

ব্যাখ্যা। শুম্ভের প্রত্যেক কথাটি সত্য। মা আমার যথার্থই স্ত্রীরত্নভূতা ? পূর্বে বলিয়াছি স্ত্রী শব্দের অর্থ শক্তি। যত শক্তি আছে, তন্মধ্যে একমাত্র চিতিশক্তিই সর্বশ্রেষ্ট, অপর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তি প্রভৃতি সেই পরাশক্তিরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই অম্বিকা মা আমার স্ত্রীরত্নস্বরূপা! জীব যতদিন এই আনন্দময়ী চিতিশক্তির সন্ধান না পায়, ততদিন কিছুতেই যথার্থ শান্তি লাভ করিতে পারে না। আজ কত লক্ষ লক্ষ জন্মের পর যখন ইঁহার সন্ধান মিলিয়াছে, তখন যে কোনও প্রকারে ইঁহাকে আয়ত্ত করা আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই শুম্ভ ইঁহাকে অঙ্কস্থা করিতে একান্ত প্রয়াসী। তাই বলিল—যেহেতু আমরাই রত্নাধিকারী, অতএব তুমি স্ত্রীরত্ন হইয়া কেন আমাদের অধিকারের বাহিরে থাকিবে ? তাহা হইতেই পারে না ; 'অস্মানুপাগচ্ছ' আমাদের নিকটে এস, আমাদের আমিত্বের ভিতর দিয়াই তোমাকে পাইতে চাই। তুমি এস! আমার অপূর্ণ আমিকে পূর্ণ কর, একমাত্র তোমার অভাবই আমার এত ঐশ্বর্যময় আমিত্বকে অভাবগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। দেবি, তুমি স্বয়ং আসিয়া সে অভাব দূর কর, আমার অপূর্ণ আমি পূর্ণ হউক!

আমাদের উভয়ের মধ্যে তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তুমি ভজনা করিতে পার। আমাকে অথবা আমার ভ্রাতা উরুবিক্রম—প্রবলপরাক্রান্ত নিশুম্ভকে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তুমি আশ্রয় কর। তাহাতেই আমরা কৃতকৃত্য হইব। আত্মা তুমি—আমিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হও, ক্ষতি নাই। নতুবা আমার আত্মরূপে প্রতিভাত হও, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমিত্বের মধ্য দিয়া ত' তোমাকে ধরিতেই পারি না ? আমি যে প্রতিবিম্বমাত্র! প্রতিবিম্ব হইয়া মূল বিম্বকে কিরূপে গ্রহণ করিব ? তাই যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তবে অগত্যা নিশুম্ভকে আশ্রয় কর, সেও প্রবল পরাক্রান্ত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই নিশুম্ভের অর্থাৎ মমতার করতলগত। তুমি স্বয়ং আত্মা যদি নিশুম্ভের অর্থাৎ মমত্বের হও, তাহাতেও আমাদের পরম লাভ। মুখে সহস্রবার বলি বটে, 'আমার আত্মা', কিন্তু আত্মা কিছুতেই ত' আমার হইলে না ? যদি আত্মা আমার হইতে পারিত, তবে আমি আত্মাকে নিয়া যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা যে হয় না। আমার আত্মাকে ধরিতে গেলেই আমিটি হারাইয়া যায়—আমিও থাকে না ; আমারও থাকে না। তাই তোমাকে পাই না। কিন্তু আর তাহা হইবে না ; তোমাকে হয় আমিত্বের ভিতর দিয়া দেখিব, নচেৎ আমারবোধে একান্ত আত্মীয়বোধে তোমাকে ভোগ করিব। তুমি চঞ্চলাপাঙ্গী! তোমার ঐ চঞ্চল ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে স্থিরভাবে ভজনা কর।

শুম্ভ ঠিকই বলিয়াছে—মা আমার চঞ্চলাপাঙ্গীই বটেন। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে মা আমার অদৃশ্য হইয়া পড়েন। সে সৌম্য প্রকাশ ; সে সর্বতোভেদী প্রকাশ, সে বাক্য মনের সম্পূর্ণ অগোচর প্রকাশ; ওগো, সে যে ক্ষণার্দ্ধ কাল মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়! ওগো, সে যে আমার সর্বভাবহরা আমিত্ব-হরা মা! তাঁহাকে শরীর থাকিতে দীর্ঘকাল দেখিবার উপায় নাই, তাঁহাকে মন থাকিতে দীর্ঘকাল দেখিবার উপায় নাই। যদিও শরীর মন প্রভৃতি সর্বভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিয়া তবে মা আমার প্রকাশিত হন, তথাপি ঐগুলির বীজ থাকিয়া যায়। তাই চঞ্চলার ন্যায়—বিদ্যুৎরেখার ন্যায়, মায়ের অপাঙ্গ—নয়ন-প্রান্তভাগ উদ্ভাসিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া যায়। সত্যই কি তাই ? মা যে আমার নিত্য-স্থিরা নিত্য-প্রকাশ-স্বরূপা! তবে এত চঞ্চলতা কেন! ওগো! আমরা যে অতিশয় চঞ্চল, তাই মাকেও চঞ্চলারূপেই প্রতীয়মান হয়। আমি আমার আমিটাকে বড় ভালবাসি, উহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাই না ; ভয় হয়, মা আসিলেই ত' আমি থাকিবে না! তাই পলকের মধ্যে একবার মাকে দেখিয়া আবার বড় সাধের আমিটিকে জড়াইয়া ধরি। ওগো, মা-ই যে আমি, আমি বলিয়া যে আর কিছুই নাই, ইহা ঠিক ঠিক কবে বুঝিতে পারিব ? মাগো, আমরা ত' তোমাকে চাইবই না, আমরা ত' তোমার সর্বনাশক প্রকাশের সমীপে উপস্থিত হইবই না ; তবু বলছি মা, তুমি দয়া করিয়া এস— প্রকাশিত হও!

আমাদের আমিত্বভার বিদূরিত হউক !

সাধক, ঐ যে দেখিতে পাও—পর্বতগহ্বরে দীর্ঘকালব্যাপী সমাধিতে অবস্থিত পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; ভাবিও না— উনি অনবরতই মাকে দেখিতেছেন । ওরে, তাহা হয় না ; অনবরত মাকে দেখিলে দেহ থাকে না ; অল্পকাল মধ্যেই আত্মা দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায় । অনাত্মপ্রতীতি সম্যক্ বিলুপ্ত হইলে, দীর্ঘকাল দেহে অবস্থান একান্ত অসম্ভব । ঐ যে বিদ্যুতের রেখার মত দর্শন, উহাতেই জীব ধন্য হয়, জীবন্মুক্ত হয়, আনন্দময় হয়, ব্রহ্মস্বরূপ হয়। একবার সাক্ষাৎকার হইলে আর কখনও বিস্মৃতি আসে না ; এবং ইচ্ছামাত্রেই আবার দর্শন করা যায় । আরে, এ যে আনন্দঘন জ্ঞান ! ইহার বিস্মৃতি কিরূপে হইবে ? আর কিই বা হারাইয়া যাইবে ? সে যে আমি—সে যে আত্মা, মা আমার । তাঁকে আবার পাওয়া না পাওয়া, দেখা না দেখা কি ? তবু কিন্তু দেখা চাই—তবু কিন্তু দেখিতে হয়, পাইতে হয় । উহাই ত' যথার্থ চরিতার্থতা !

শুম্ভ আর একটি কথা মাকে বলিয়াছে— **'ভজ ত্বং'** —তুমি ভজনা কর । বড় সত্য কথা । কেবল শুম্ভই এরূপ কথা বলে নাই । শ্রুতিও বলেন, **'যমেবৈষ বৃণুতে'** এই আত্মা যাহাকে বরণ করে, সে-ই আত্মাকে পায় । গীতা বলেন— **'তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** যে আমাকে যেরূপ ভাবে চায়, আমি তাহাকে সেইরূপভাবেই ভজনা করি । এইরূপে দেখিতে পাই— বেদ, গীতা ও চণ্ডী, তিনই সমান সুরে এক কথাই বলিয়াছেন । আত্মাই জীবকে ভজনা করে । কথাটা শুনিতে বিরুদ্ধ, বুঝিতে বিরুদ্ধ এবং বুঝাইতেও বিরুদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু উহাই যে একান্ত সত্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই ।

সাধক ! তুমি যে সাধন ভজনাদি করিয়া মাতৃ-লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছ, বুঝিয়া লইও—উহা মায়ের সাধন ভজনেরই প্রতিধ্বনিমাত্র । মা তোমার ভজনা করেন, তাই তুমি ভজনা কর। মা যখন তোমার ভজনা করেন, তখনই তোমার মধ্যে ভজনরূপ একটা বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় । আত্মাই জীবকে ভজনা করে— চায় । তাই জীব আত্মাকে চাইবার ভাণ করে । এ কথাটা কিন্তু এই রুদ্র-গ্রন্থিভেদের অধিকারী পাঠকদের জন্যই বলা হইয়াছে । যাহারা মাকে একবারও দেখে নাই, তাহারা এ কথাটা নিয়া হয়ত কত বিরুদ্ধ-বাদই তুলিবে । তা হউক —কথাটা কিন্তু খুবই সত্য ।

মা গো ! যে যাহা ইচ্ছা বলুক, আমরা শুম্ভেরই মত শতবার বলি, সহস্রবার বলি— **'ভজ ত্বং'** তুমি আমাকে ভজনা কর,— তুমি আমাকে গ্রহণ কর । ওগো, তুমি আমাকে ভজনা করিলেই আমার মিথ্যা আমিটি হারাইয়া যাইবে । কিন্তু আমি যদি তোমাকে ভজনা করিতে যাই, তবে ঐটি থাকিয়া যায় । তাই প্রাণপণে বলি— মা তুমি আমায় নেও, তুমি আমায় নেও । আমি তোমার কাছে যাইতে পারিতেছি না, তুমি আমায় লইয়া চল ।

ঋষিরাও বলিতেন— **'আবিরাবির্ম এধি'**। তুমি প্রকাশিত হও, তুমি আবির্ভূত হও, তুমি এস । মা গো, এইরূপ আবহমানকাল তুমিই জীবকে ভজনা করিয়া আসিয়াছ । তুমি যে মা ! তুমি আমাদিগকে ভজনা করিবে না ? তবে কি সন্তান মায়ের ভজনা করিবে ? মা গো, যে দিন হইতে তুমি আমি পৃথক্ সেই দিন হইতেই ত' তুমি আমাকে ভজনা করিতেছ । আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি, তুমিই একটু একটু করিয়া জ্ঞানস্তন্য দ্বারা আমাকে ভজনা করিতেছ । এইবার এই ভজনার শেষ কর মা । আর কেন ? কতকাল ধরিয়া সেবা করিতেছ, আদর করিতেছ, প্রতিপালন করিতেছ । এতদিনেও কি তোর সন্তান প্রতিপালনের সাধ মিটে নাই মা ? এইবার একবার বুকে তুলিয়া লও মা ! আমি তোমার ঐ নির্মল বক্ষে এই ভেদজ্ঞানের সন্তপ্ত বুকখানা রাখিয়া শেষবারের মতন মা বলিয়া আত্মহারা হই, মাতা-পুত্র ভেদ চিরতরে তিরোহিত হউক ! তুমি যেমন **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** তেমনই অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজ কর ।

শুম্ভ মাকে আর একটি কথা বলিয়াছে —**'রত্ন-ভূতাসি'**। তুমি রত্নরূপা । **'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'**। যাহাকে লাভ করিলে আর কোন রত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, চিরদিনের মত অভাবের কান্না বিদূরিত হয়, সেই রত্ন তুমি । তুমি স্বয়ং না আসিলে আমরা কিরূপে তোমাকে পাইব । যদিও কবি বলিয়াছেন —**'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগতে হি তৎ'** রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে । তথাপি আমরা জানি— রত্ন স্বয়ংই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় । মনুষ্য কখনও অন্বেষণ করিয়া রত্ন পায় না । যদি অন্বেষণে রত্ন

মিলিত, তবে সকলেই রত্নলাভে ধন্য হইত ! কিন্তু তাহা হয় না, রত্ন যাহাকে অন্বেষণ করে, মাত্র সে-ই রত্নকে লাভ করিতে সমর্থ হয় । তাই কেবল শুম্ভ নয় মা, আমরাও কাতর প্রাণে বলিতেছি—**'ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি ! রত্ন ভূতাসি বৈ যতঃ'** তুমিই সাররত্ন, তাই তোমাকে ভজনা করিবার জন্য বলিতেছি । তুমি দয়া করিয়া এস, আমাদিগকে ভজনা কর, আমরা রত্নলাভে ধন্য হই ।

———০———

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥৬৫॥

অনুবাদ । তুমি আমাকে পরিগ্রহ করিলে পরমৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং এই বিষয়টি বুদ্ধি দ্বারা সমালোচনা করিয়া আমার পরিগৃহীতা হও ।

ব্যাখ্যা । অস্মিতার ঐশ্বর্য বিপুল ; যেহেতু সমগ্র বিশ্বই তাহাতে অবস্থিত । তাই দেবীকে ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখান হইতেছে । কিন্তু অসুর— অস্মিতা জানে না যে, মায়ের সত্তায়ই তাহার সত্তা । চিতিশক্তিকে জগৎকর্তৃত্বের মধ্যে নিয়া আসিতে পারিলে, চিতিশক্তিরই যেন বিশেষ লাভ হইবে, ইহা ভাবিয়াই এই বিপুল ঐশ্বর্যের প্রলোভন । কিন্তু হায় ! শুম্ভ জানে না যে, এ প্রলোভন সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে । তাঁহাতে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ছিল না বা থাকিবে না । তিনি যদি আসেন অর্থাৎ প্রকাশিত হন, তবে নিমেষের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সত্তাহীন হইয়া পড়িবে । অথচ তিনিই—সেই অম্বিকা মা-ই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী । যাক্ সে অন্য কথা—

শুম্ভ-দূত মাকে 'বুদ্ধ্যা সমালোচ্য' বলিল । সমালোচনা ব্যাপারটি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য বলিয়াই সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে—**'শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচন মাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ'** তথাপি এস্থলে সুগ্রীব অম্বিকাকে বুদ্ধি দ্বারা সমালোচনা করিতে বলিল । বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত মন এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিষ্পন্নই হইতে পারে না । বিশুদ্ধবোধে সমালোচনা হয় না, বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপিণী মাকে সমালোচনা করিতে হইলে বুদ্ধিক্ষেত্রেই অবতরণ করিতে হয় । দূতের এই বুদ্ধিশব্দ প্রয়োগের রহস্য একটি মন্ত্র পরেই প্রকটিত হইবে, তাই এস্থলে বিশেষভাবে বলা অনাবশ্যক ।

———০———

ঋষিরুবাচ

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥৬৬॥

অনুবাদ । ঋষি বলিলেন—দূত দেবীকে এইরূপ বলিলে সেই দেবী, যিনি দুর্গা ভগবতী ভদ্রা, যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অন্তরে অন্তরে একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে সুমধুর স্বরে বলিলেন ।

ব্যাখ্যা । দূতমুখে প্রেরিত শুম্ভের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ শুম্ভের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, মা একটু হাসিলেন । হেতু এই যে—শুম্ভ আমাকে চায় বটে ; কিন্তু সে জানে না যে, আমাকে পাইলে তাহার আর পৃথক সত্তাই থাকিবে না । আত্মা আমি-স্বরূপে প্রকাশিত হইলে, আর অস্মিতার অস্তিত্ব কোথায় ? এইরূপ শুম্ভের অভিপ্রায় ও তাহার পরিণাম দেখিয়াই মায়ের এই মৃদু হাস্য ।

এই মন্ত্রে মায়ের কয়েকটি নাম আছে ; দুর্গা—যিনি দুর্গম হইতে রক্ষা করেন । ভগবতী—ষড়ৈশ্বর্যশালিনী । ভদ্রা—মঙ্গলময়ী । এবং জগদ্ধাত্রী—যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন । যে মা অচিরাৎ শুম্ভকে জীবত্বরূপ দুর্গা বা দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ করিয়া অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন, যিনি নিত্যমঙ্গলস্বরূপা জগদ্‌বিধাত্রী চিতিশক্তি, যিনি শুম্ভের অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া কেবল জ্ঞানস্বরূপে প্রকটিত হইবেন, তিনিই শুম্ভের পূর্বোক্তরূপ অভিপ্রায় জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ।

শুম্ভ যে নিজেকেই জগদ্ধারক বলিয়া মনে করে, সেই ভ্রম অচিরাৎ বিদূরিত হইবে । অস্মিতা ত' আর যথার্থ জগদ্ধাত্রী নহে, জগদ্ধাত্রী স্বয়ং চিতিশক্তি মা । সাধক ! এইখানে হয়ত আশঙ্কা উপস্থিত হইবে যে, চিতিশক্তি ত' স্বরূপতঃ নির্গুণা তিনি আবার জগদ্ধাত্রী কিরূপে হইবেন, আবার নির্গুণের মৃদু হাস্যাদি লৌকিক ব্যবহারই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? তদুত্তরে বুঝিয়া লইবে—এ সমস্তই উপাধিকৃত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে সমাহৃত যাবতীয় ভাব নির্গুণ চৈতন্যে আরোপিত হইয়াই নির্গুণেরও সগুণবৎ সর্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে । যেরূপ ঘট সঞ্চালিত হইলে, ঘটাকাশেরও সঞ্চালনরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; ইহাও ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে ।

'গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ' । যিনি রোষ এবং তোষ, উভয়ত্র সমভাবে অবস্থান করিতে সমর্থা ; তিনিই গম্ভীরা । মা আমার নিত্য নির্বিকারা কোন অবস্থায়ই তাঁহার বিন্দুমাত্র বিকার লক্ষিত হয় না, তাই তিনি গম্ভীরা। **'অন্তঃস্মিতা'** শব্দের অর্থ—অন্তরে অন্তরে একটু হাসিলেন । হাসির তাৎপর্য প্রথমেই বলা হইয়াছে । **'জগৌ'** শব্দের অর্থ গান করিলেন । অর্থাৎ মা শুম্ভ-দূতকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এত মধুর-কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে দূতের কর্ণে যেন সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ হইয়াছিল । সত্যই মায়ের বাণী এমনই মধুময়ী ! যদিও শব্দহীন সে বাণী তবু সঙ্গীত-স্বরবৎ অমৃত-বর্ষিণী ।

———○———

দেব্যুবাচ

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥৬৭॥

অনুবাদ । দেবী বলিলেন— (হে দূত) তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য, মিথ্যা কিছুই বল নাই । শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি, নিশুম্ভও তাদৃশই বটে ।

ব্যাখ্যা । এই মন্ত্রটির অর্থ নানা প্রকার হইতে পারে, ক্রমে আমরা সেই সকল অর্থের আলোচনা করিব । মা অম্বিকা সুগ্রীবকে বলিলেন —শুম্ভ এবং নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা এবং মমতা উভয়ই ত্রিলোকের অধিপতি বলিয়া মনে করে, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ ; এ বিষয়ে মিথ্যা কিছুই বল নাই । অথবা হে দূত ! **'ত্বয়া সত্যং ন উক্তং, অত্র কিঞ্চিত মিথ্যা উদিতম্'** । হে দূত ! তুমি সত্য বল নাই, এখানে কিছু মিথ্যা বলিয়াছ ; কারণ শুম্ভ নিশুম্ভ ত' আর বাস্তবিক ত্রিলোকপতি নহে, অথচ ইতি-পূর্বে **'ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ'** বলিয়াছ ; যথার্থ ত্রিলোকাধিপতি অস্মিতা নহে, আত্মা । আত্মসত্তাই ত্রিলোকের সত্তা । আত্মা না থাকিলে আর কোন কিছুরই সত্তা থাকিতে পারে না, সুতরাং মিথ্যাই বলা হইয়াছে । আর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে । যথা—আত্মা আমিই শুম্ভ নিশুম্ভরূপে অস্মিতামমতারূপে ত্রিলোকাধিপতি ; সুতরাং হে দূত ! তোমার উক্তি সত্যই । তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই । যেহেতু শাস্ত্রে সকলই সত্যরূপে উক্ত হইয়াছে, মিথ্যা বলিয়া কোথাও কিছু নাই । তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন— **'যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে'** এই যাহা কিছু প্রতীত হয়, সে সকলই সত্য বলিয়া কথিত হয় । সত্য মিথ্যা সর্বত্র সৎস্বরূপ আত্মার অনুগম তুল্যরূপে থাকায় সকলই সত্য । প্রামাণিক উপনিষৎসমূহে কিংবা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও মিথ্যা এবং ভ্রান্তি এই দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই । স্বয়ং ভাষ্যকারও অনির্বচনীয় অর্থেই মিথ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ; আর মিথ্যাও সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র সৎস্বরূপ আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই ; সুতরাং সকলই সত্য । অতএব হে দূত—**ত্বয়া সত্যং উক্তং, কিঞ্চিদপি মিথ্যা না উক্তং** ।

———○———

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্ ।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥৬৮॥

অনুবাদ । কিন্তু এ বিষয়ে আমার যে একটি প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা কিরূপে মিথ্যা করা যায় ? আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর ।

ব্যাখ্যা । মা বলিতেছেন— হে দূত ! শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়ই ত্রিলোকাধিপতি এবং সর্বরত্ন ভোগে সমর্থ । সুতরাং তাঁহাদের পরিগ্রহত্ব স্বীকার করাই আমার কর্তব্য ; কিন্তু আমি পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশতঃ একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ।

এস্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে—মা কি তবে মিথ্যা কথা বলিলেন ? যিনি স্বয়ং বুদ্ধি স্বরূপা, ইতিপূর্বে দেবতাগণ যাঁহাকে **'বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা'** বলিয়াছেন, আবার পরেও যাঁহাকে **'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি-সংস্থিতে'** বলিয়া স্তব করা হইবে, তিনি আজ এখানে স্বয়ং বলিলেন—**'অল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা'** । ইহা কি মায়ের মিথ্যা কথা বলা হইল না ? না, মিথ্যার লেশও ইহাতে নাই । সত্যই যাঁহার স্বরূপ, কোন অবস্থায়ই সত্যের অপলাপ নাই বলিয়াই যিনি নিরাবরণা দিগম্বরী, তাঁহাতে কোনরূপ মিথ্যার আরোপ বড়ই ব্যথাদায়ক । তবে কি ? শুন বলিতেছি— আরে, বুদ্ধি নামক তত্ত্বটাই ত' অল্প ! শ্রুতিও বলেন আত্মার একদেশে — অতি অল্পমাত্র স্থানেই জগৎ অর্থাৎ বুদ্ধি অবস্থিত। যে যাহার প্রকাশ্য, সে তাহার ব্যাপ্য হয় । আত্মপ্রকাশক—ব্যাপক,

বুদ্ধি প্রকাশ্য —ব্যাপ্য ; সুতরাং অল্প । বুদ্ধি চিরদিনই অল্প । আত্মার মায়ের আমার এই বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পাওয়াই ত' অল্প হওয়া । পূর্বে আমরা অসৎ অনৃত অবিদ্যা অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের নঞ্‌টি যে অল্পার্থক বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, এখানে দেখিতে পাই, মা স্বয়ংই সেই কথাটি বলিয়া দিলেন । আত্মা মা আমার যখন অল্প হইয়া ঈষৎ হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তাঁহার নাম হয় বুদ্ধি । তাই **'অল্পবুদ্ধিত্বাৎ'** কথাটির মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যার স্পর্শ নাই । আর এই প্রতিজ্ঞা ব্যাপারটাও বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে । 'এক আমি বহু হইব' ইহাই মায়ের সর্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা । এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই আত্মা মা আমার সর্বপ্রথম মহতী বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হন । প্রতিজ্ঞা করিতে হইলেই মাকে অল্প হইতে হয়— বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পাইতে হয় । আরে, বোধবস্তু স্বপ্রকাশ—পূর্ণ, যখন তাহাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদিভাব প্রকাশ পায়, তখনই তিনি অল্প বা অপূর্ণ, তাই মা শুম্ভদূতকে বলিলেন—**'শ্রূয়তামল্প-বুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা।'** এইবার আমরা প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিব । বড়ই সুন্দর ! বড়ই বিস্ময়কর । শুন সাধক, মা কি বলিতেছেন—

———०———

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি ।
যো মে প্রতিবলোলোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥৬৯॥

অনুবাদ । যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, যে আমার দর্পনাশ করিতে পারিবে এবং যে আমার প্রতিবল অর্থাৎ সমবলসম্পন্ন হইবে, সে-ই আমার ভর্তা হইবে ।

ব্যাখ্যা । মায়ের প্রতিজ্ঞায় তিনটি কল্প আছে । প্রথম কল্প —সংগ্রাম জয় । সংগ্রাম অর্থে ইন্দ্রিয় সংগ্রাম । ইন্দ্রিয়-বর্গ প্রতিনিয়ত রূপরসাদি বিষয়সমূহকে জড়পদার্থরূপেই পরিগ্রহ করে । আনন্দময়ী চিতিশক্তি-রূপিণী মা-ই যে রূপ রসাদি বিষয়াকারে ইন্দ্রিয়-পথে যাতায়াত করিতেছেন, ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও, ইন্দ্রিয়বর্গ পূর্বাভ্যাসবশতঃ জড়রূপেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাই ইন্দ্রিয়সংগ্রাম । জীব এই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে নিত্যই পরাজিত । চৈতন্যময়ী মা আমার নিয়ত জড়ত্বের ভাণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপে বিষয়রূপে প্রকটিত হইয়া জীবকে পরাজিত করিতেছেন । বিষয় যে বিষয় নহে, আনন্দঘন সত্তাবিশেষ, ইন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয় নহে, আনন্দঘন শক্তিপ্রবাহবিশেষ ; সাধারণ জীব ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না ; তাই পরাজিত হয় । কিন্তু মা বলিলেন— যে আমাকে এই সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-পথে আমি — আত্মাই যে আনন্দঘন সত্তারূপে নিত্য বিরাজিত, ইহা যাহারা বুঝিতে— উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহারাই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ।

দ্বিতীয় কল্প— দর্পনাশ । দর্প শব্দের অর্থ অহঙ্কার । আবার কামও দর্প শব্দের অর্থ হয় । কন্দর্প দর্প অনঙ্গ কাম পঞ্চশর এবং স্মর, ইহারা সমানার্থক শব্দ । কাম শব্দে বৃত্তি মাত্র না বুঝিয়া কামনামাত্রই বুঝিতে হয় । সে যাহা হউক, মা বলিলেন—**'যো মে দর্পং ব্যপোহতি'** যে আমার দর্পনাশ করিতে পারিবে, অর্থাৎ আনন্দঘন আত্মা আমিই যে দর্পরূপে—অহংকার অভিমান অস্মিতা মমতারূপে এবং কামাদি বৃত্তি অথবা কাম্য বস্তুরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছি, ইহা যাহারা যথার্থ বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে পারিবে ; অর্থাৎ আনন্দঘন আত্মা আমিই যে দর্প রূপ আবরণের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি ; যাহারা আমার এই দর্পরূপ আবরণ উন্মোচন করিতে পারিবে, মাত্র তাহারাই আমার দর্পনাশ করিতে সমর্থ হইবে । সহজ কথায় দর্পনাশ শব্দে অহঙ্কারনাশ এবং কামনার বিলয় বুঝিলেই হইবে ।

তৃতীয় কল্প— সমান বল । মা বলিলেন, যে আমার সমানবল হইবে । মায়ের বল কি ? একত্ব অবিক্রিয়ত্ব আনন্দময়ত্ব গুণাতীতত্ব নিরঞ্জনত্ব ইত্যাদি । যে জীব ঠিক এইরূপ একত্ব আনন্দময়ত্ব গুণাতীতত্ব প্রভৃতি বলসম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ যে জীব স্বকীয় ব্রহ্মভাবটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে—

'স মে ভর্তা ভবিষ্যতি' সে আমার ভর্তা হইবে । পূর্বোক্ত তিনটি কল্প যাহার পক্ষে সম্ভব, কেবল সে-ই মাত্র আমার ভর্তা হইতে পারিবে । ভর্তা—ভরণকর্তা । ভৃ ধাতুর অর্থ ধারণ এবং পোষণ । পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মবোধকে সম্যক্ ধারণ এবং পোষণ করার নামই মায়ের ভর্তা হওয়া । এইবার সমস্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিয়া লও । মা বলিলেন—যে ব্যক্তি বিষয়েন্দ্রিয়-

সংস্পর্শে আনন্দময় আত্মাকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহার অহংবোধ এবং কামনা অর্থাৎ মমতাবোধ সম্যক্ তিরোহিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি স্বকীয় একত্ব ও আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, মাত্র সে-ই আমার ভর্তা হইতে পারিবে অর্থাৎ সে-ই ব্রহ্মাত্মবোধের ধারণ ও পোষণ করিতে পারিবে। শ্রুতিও বলেন—**'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'**। **'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'** এই সকল বাক্যের যাহা তাৎপর্য, তাহাই মায়ের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে ব্রহ্মকে জানে সে-ই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। পূর্বোক্ত কল্পত্রয় যাহার পক্ষে সম্ভব, সে-ই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। সংগ্রামজয়, দর্পনাশ এবং সমবল না হইলে মাতৃ-লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। ইন্দ্রিয়পথে সমাহৃত বিষয়গুলিকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলেই, দর্প দূর হয়; অর্থাৎ **'অহং কর্তা, মম কর্তব্যম্'** ইত্যাকার ভাব বিদূরিত হয়। তখন আত্মার নিত্যত্ব অবিক্রিয়ত্ব একত্ব প্রভৃতি ধর্ম উপলব্ধিযোগ্য হয়; সুতরাং সমবল হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই আত্মা এবং ব্রহ্মের অভিন্নত্ব খ্যাতি হইয়া থাকে। তখন **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** বলিয়া সাধক যাবতীয় ভেদজ্ঞানের পরপারে উপনীত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে।

অনেকে পূর্বোক্ত তিনটি কল্পের বিকল্প মনে করেন। অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পের অভাবে পর পর কল্প হইলেও ভর্তা হইতে পারিবে। মন্ত্রে কিন্তু সেরূপ বিকল্পবোধক 'বা অথবা কিংবা' প্রভৃতি কোন শব্দই নাই, সুতরাং কেন কল্পনা করিয়া বিকল্প স্বীকার করিতে যাইব? সমুচ্চয় অর্থই ভাল। কল্পত্রয়ের সমুচ্চয় হইলেই ভর্তৃত্ব লাভের যোগ্য হইবে এইরূপ অর্থই আমরা বুঝিয়া লইব। কারণ, দেখা যায়— উহাদের মধ্যে প্রথমটি হইলেই পরপরটি আপনা হইতে আসিয়া থাকে, সংগ্রাম জয় হইলেই দর্পনাশ হয়, দর্পনাশ হইলেই সমবল হইতে পারে, সমবল হইলেই আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয়।

এই মন্ত্রটির অর্থ বুঝিতে গিয়া অনেকে অনেক রকম কথাই বলিয়া থাকেন। সে সকলের সবিস্তার উল্লেখ করিয়া আমরা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। কেহ বলেন—**'স মে ভর্তা ভবিষ্যতি'** কথার তাৎপর্য— প্রকৃতি-জয়। কেহ বলেন—প্রথম কল্প অর্থাৎ সংগ্রামজয় দ্বারা কর্মযোগ, দ্বিতীয় কল্প—দর্পনাশ দ্বারা ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় কল্প—প্রতিবল কথাটি দ্বারা জ্ঞানযোগ লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল অর্থের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। সকলেই সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং সকলই উপাদেয়। প্রকৃতি জয় এবং কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ব্যতীত যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য।

———○———

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু ॥৭০॥

অনুবাদ। অতএব মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ অচিরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হউন এবং আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটিতে উপনিষৎ প্রোক্ত **'যমেবৈষ-বৃণুতে তেনৈবলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং'** এই অপূর্ব বাক্যটিরই প্রতিধ্বনি আছে। যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে এবং তাহার নিকটই ইনি—এই আত্মা স্বকীয় স্বরূপটি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। কন্যা যেমন পতিকে বরণ করে, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে, সে-ই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হয়। তাহার সহিতই পরিণয় হয়। মা শুম্ভ-দূতকে বলিলেন—যদি শুম্ভ কিংবা নিশুম্ভ আমার প্রতিজ্ঞানুরূপ সামর্থ্য অর্জন করিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করুন। আদান-শক্তির নাম পাণি। তাহা দ্বারা পরিগ্রহ করাকে পাণিগ্রহণ বলে। আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) গ্রহণ করিবার জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা, তাহাই এ স্থলে পাণি বা আদান-শক্তি শব্দের তাৎপর্য। শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ তীব্র ব্যাকুলতা দ্বারা আমাকে লাভ করুক। পাণিগ্রহণ শব্দের পরিণয়রূপ অর্থ করিলেও কিছু হানি নাই। আত্মার প্রতি একান্ত আসক্তি ব্যতীত আত্মার সহিত পরিণয় অর্থাৎ মিলন বা সাক্ষাৎকার হয় না। অস্মিতারূপী শুম্ভ চিতিশক্তিরূপী আত্মাকে লাভ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়াই নিজত্ব বিসর্জন দিয়া আত্মাকে পাইয়াছিল। আপনাকে হারাইয়া ফেলা এবং কেবল অভীষ্ট বস্তুরূপে থাকা, ইহাই আসক্তি বা

ব্যাকুলতার চরম পরিণাম। আকুলতাই সাধনার প্রাণ, একমাত্র আকুলতা থাকিলে আর কিছু অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। তবে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রখিতে হইবে—ব্যাকুলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু এক জিনিষ নহে। সব ছাড়িয়া আত্মলাভের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটির নাম ব্যাকুলতা নহে ; সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। ব্যাকুলতা মানুষকে কর্তব্যজ্ঞান-হীন করে না। সমস্ত কার্য, সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া প্রাণের গতি এক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হওয়াই ব্যাকুলতার যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু সে অন্য কথা।

এখানে একটি গুহ্যতম রহস্যের অবতারণা করা হইবে, সাধকগণ অবহিত হইবেন। ভগবানের প্রতি এই ব্যাকুলতা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, দিন দিন যাহাতে ভগবৎপ্রেম উপচীয়মান হয়, তজ্জন্য এদেশের মনীষিগণ পঞ্চবিধ ভাবের সাহায্যে উপাসনা করিতেন। ঐ পঞ্চভাব—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর নামে অভিহিত হয়। পিতা, পুত্র কিংবা মাতা পুত্রভাবে ভগবদারাধনার নাম শান্ত ভাব, প্রভু-ভৃত্যভাবে উপাসনার নাম দাস্য ভাব, পুত্র কন্যার প্রতি পিতা মাতার যে স্নেহভাব, ঐরূপ ভাবে উপসনার নাম বাৎসল্য ভাব, সখা অর্থাৎ বন্ধুভাবে উপাসনার নাম সখ্যভাব, এবং পত্নীভাবে উপাসনার নাম মধুর ভাব। পরকীয়াভাবে উপাসনা মধুর ভাবের চরম। শান্তভাবের উপাসনার দৃষ্টান্ত স্থল—ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ; দাস্যভাবের—হনুমান, গরুড় প্রভৃতি ; বাৎসল্যভাবের—নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা এবং মেনকা প্রভৃতি ; সখ্যভাবের—রাখাল-বালক, অর্জুন ও বিভীষণ প্রভৃতি ; এবং মধুর ভাবের—রাধা ও অন্যান্য গোপীগণ। যে ভাবের মধ্যে ব্যাকুলতা যত বেশী, সেই ভাব তত শ্রেষ্ঠ। যদিও বৈষ্ণ ব শাস্ত্র পূর্বপূর্বগুলিকে 'এহ বাহ্য আগে যাহ আর' বলিয়া একমাত্র মধুরভাবকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তথাপি যাঁহারা যথার্থ প্রিয়তম-পরম-প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা শান্ত, দাস্য প্রভৃতি সর্বভাবেই তাঁহার সহিত তুল্যভাবে যুক্ত হইতে পারেন এবং অতুলনীয় মিলনানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ! কারণ এমন কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই যে, সেইটি ব্যতীত অন্য কোন ভাবের সাহায্যে আত্মার সমীপস্থ হওয়া যায় না। যিনি আত্মা, তিনি যে আমাদের সব গো, পিতা, মাতা, প্রভু, সখা, পুত্র, কন্যা, জায়া, পতি সর্বই যে তিনি ; সুতরাং আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিতে সকল ভাবই তুল্য।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধুরভাবের উপাসনা করিতে গিয়া ব্রজগোপীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, আর সকলেই তাঁহার প্রকৃতি ; সুতরাং নারী। এই ভাবে উপাসনা করিতে গিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবানের প্রিয়তমা সখীরূপে ভাবনা করিয়া থাকেন। এমনকি পুরুষ ভক্তগণও এই সখীভাবকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কখনও কখনও স্ত্রীজাতির ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ হাবভাব নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। যদিও এই সকল ভাব অস্বাভাবিক বলিয়াই অনেকের মনে হইতে পারে ; তথাপি উহা নিন্দনীয় নহে। এই ভারতে—এই ভাবুকের ও রসিকের দেশে, সর্বভাবের উপাসক থাকাই দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব। সে যাহা হউক, পরমাত্মাকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা যেরূপ মধুর ভাব, পরমাত্মাকে পত্নীরূপে উপাসনা করাও ঠিক সেইরূপই মধুর ভাব। কিন্তু এই ভাবটি বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রহণ করেন নাই। পুরুষ ভক্তদিগের পক্ষে এরূপ ভাবের উপাসনা পূর্বোক্ত সখীভাব অপেক্ষা অনেক সহজ বলিয়া মনে হয়। কোন গ্রন্থই এই ভাবটি স্পষ্টভাবে লিখিতে প্রত্যক্ষতঃ সাহস করেন নাই। এই চণ্ডীতে শুম্ভের বাক্য হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক স্থানে এইরূপ ইঙ্গিতমাত্র আছে। জানি, এরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক রকম আপত্তি ও দোষ প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ইহা ঠিক যে, যিনি আত্মা, যিনি আমার আমি, যিনি আমার সর্বস্ব, যিনি না থাকিলে আমির অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহাতে সকল ভাবেরই আরোপ একান্ত সম্ভব। পুত্র কিংবা কন্যা বলিয়া আত্মাকে আদর করিতে গেলে যেরূপ তাঁহার গৌরবের কিছুই হানি হয় না, সখা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে যেরূপ আত্মার মহত্ত্ব খর্ব হয় না, ঠিক এইরূপই পত্নী বলিয়া, প্রিয়তমা ভার্যা বলিয়া, সবটা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে গেলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র মহত্ত্বের অপলাপ হয় না। জগতে যে সকল মানুষ পত্নীগতপ্রাণ, পত্নীর সুখ সম্ভোগ বিধানই যাহাদের

জীবনের লক্ষ্য, তাহাদের সেই পত্নীপ্রেম যদি পরমাত্মায় অর্পিত হয়, তবে সেই সকল লোকের জীবন ধন্য হইয়া যাইতে পারে। এই মধুর ভাবের মধ্যে আবার পরকীয়া ভাব আরও স্বাভাবিক এবং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সকল অন্য কথা— আমরা ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছি, ভাবাতীত স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছি ; সুতরাং এখন ভাবরাজ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন নিষ্প্রয়োজন।

মা বলিলেন—আমার পাণিগ্রহণ করিতে হইলে, **'মাং জিত্বা'** আমাকে জয় করিতে হইবে ; অর্থাৎ আমি যেরূপ একা অদ্বিতীয়া নির্বিকারা সর্বভাবাতীতা, যে আমাকে পরিগ্রহ করিতে চায়, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইবে। **'মাং জিত্বা'** শব্দের আর একটি রহস্য আছে— আমিত্বকে নির্জিত করিয়া আত্মাকে লাভ করিতে হয়। 'আমি' যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আত্মার প্রকাশ হয় না—হইতে পারে না।

জানি মা, তোমায় পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে তোমাকে জয় করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়-পথে স্থূলে তোমাকেই ধরিতে হইবে, তোমার সর্বময় অক্ষুণ্ণ-কর্তৃত্ব দেখিয়া আমার অহং কর্তৃত্বরূপ দর্প বিনাশ করিতে হইবে, তারপর বলবান্ হইয়া অর্থাৎ তোমার তুল্যবল প্রাপ্ত হইয়া একত্ব অবিক্রিয়ত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি করিয়া, তবে তোমার সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। এইরূপ হইতে পারিলেই তোমাকে প্রাণদিয়া ভালবাসিতে পারিব—আমি তোমাতে আত্মহারা হইয়া যাইব—আমার আমিত্ব চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তখন একমাত্র তুমিই অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজ করিবে। তাই ত' পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি —আমাদের মুক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি মুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসিতে পারিতাম। যাঁহারা বলেন—মুক্তি চাই না, ভক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয় ; হায়, তাঁহারা জানেন না যে, মুক্তিলাভ হওয়ার পূর্বে যথার্থ ভক্তি হইতেই পারে না। বদ্ধ জীব মুক্ত আত্মাকে কতটা ভক্তি করিতে পারে ? অসমানধর্মে প্রেম হয় কি ? বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতে প্রেম হয় না, হইতে পারে না। অনন্য-ভক্তিই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়। ভেদজ্ঞানে যে ভক্তি হয়, উহা ভক্তির সাধনা মাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা —

দূত উবাচ।

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৭১॥

অনুবাদ। দূত বলিল—দেবি ! তুমি এরূপ অহঙ্কার করিও না ; আমার নিকট বল দেখি, এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কে আছে, যে শুম্ভ নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে ?

ব্যাখ্যা। শুম্ভ-দূত সুগ্রীব ইতিপূর্বে নানারূপ প্রলোভনবাক্য বলিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হওয়ায় এইবার ভয়প্রদর্শন আরম্ভ করিল। শুম্ভের বলবীর্য বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি এই অম্বিকা দেবী তাহার অঙ্কস্থা হন তবেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, দূতের মনোভাব এইরূপই বটে ; সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা যায়—অস্মিতার সম্মুখে যাহা কিছু প্রতিভাত, সে সকল অস্মিতারই বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বহুভাবকে অস্মিতা হইতে পৃথক কোন বস্তু বলিয়া মনে হয় না ; সুতরাং শুম্ভ নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এরূপ পৃথক্ পুরুষ আর কে থাকিবে ? পুরুষ ত' পরমাত্মার নাম। দেহরূপ পুরে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। অস্মিতা আপনাকেই স্বপ্রকাশ বলিয়া মনে করে ; সুতরাং অপর কোনও প্রকাশক পুরুষ আসিয়া তাহার সম্মুখে যে দাঁড়াইতে পারে, ইহা কিছুতেই সে মনে করিতে চায় না। দূত-বাক্যের মধ্য দিয়া এই রহস্যটিই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যখন কোন পুরুষই শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, তখন তুমি স্ত্রীমূর্তি হইয়া কি অবলেপ কি গর্ব্ব করিতেছ—শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিবে ? আশ্চর্য বটে ? (ত্রৈলোক্য শব্দটির অর্থ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে।)

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥৭২॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্ ॥৭৩॥

অনুবাদ। দেবতাগণ অন্যান্য দৈত্যবৃন্দের সম্মুখেই যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে পারে না ; অতএব হে দেবি ! একাকিনী তুমি আর কি যুদ্ধ করিবে ? ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ

সংগ্রামক্ষেত্রে যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, সেই শুম্ভ প্রভৃতি মহাসুরগণের সম্মুখে তুমি নারী হইয়া কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিবে।

ব্যাখ্যা। অন্যান্য দৈত্যগণের অর্থাৎ ধূম্রলোচন চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি শুম্ভের অনুচরবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতেই যখন দেবতাগণ অক্ষম, তখন তুমি অসহায়া অদ্বিতীয়া একাকিনী নারী স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? (ধূম্রলোচন প্রভৃতির স্বরূপ পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।)

ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ কেন যে শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, তাহা ইতিপূর্বে যজ্ঞভাগ-গ্রহণ ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে বলা হইয়াছে ; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে এইমাত্র বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে যে, দেবতাবর্গ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়াই তাহাদের চৈতন্যাংশ তিরস্কৃত অর্থাৎ আবৃত থাকে। দেবতাগণ স্ব স্ব বিশিষ্ট চৈতন্যাংশ লইয়া দাঁড়াইতে গেলেই অস্মিতার অংশরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ে, কাজেই তাহারা সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। সাধক! একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিও—দূতবাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে কিন্তু যুদ্ধ কথাটাই নাই, শুধু সম্মুখে অবস্থানের কথা আছে। দেবতাগণ শুম্ভের সম্মুখে আসিলেই স্ব স্ব বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে, এমনই শুম্ভের প্রভাব। তারপর তৃতীয় মন্ত্রে যুদ্ধের কথাও আছে—**'তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে'** ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেও সর্বথা নির্জিত হইয়া পড়ে। দেবতাবর্গেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন নারীমূর্তি কিরূপে শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইবে?

শুম্ভদূত সুগ্রীব (বাচনিক জ্ঞান) সর্বদাই দেখিতে পায় যে, সর্ব বলিয়া, বিশ্ব বলিয়া, দেবতা বলিয়া যাহা কিছু বিশিষ্টসত্তা লইয়া প্রকাশ পায়, সে সকলই অস্মিতার স্ফুরণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অস্মিতা হইতে পৃথক্‌রূপে কোন কিছুর সত্তাই প্রতীত হয় না। কেবল এই নারীমূর্তিটি অর্থাৎ চিতিশক্তিকেই অস্মিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দেখা যাইতেছে ; যদি কোন প্রকারে ইহাকে শুম্ভের সমীপে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইনিও নিশ্চয়ই তাহারই পরিগ্রহযোগ্যা হইবেন। কিন্তু হায়! দূত জানে না যে, তাহার এই ভয় প্রদর্শনও ব্যর্থ হইবে, ঐ নারীমূর্তিটিকে পরিগ্রহ করিতে হইলে শুম্ভের শুম্ভত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব।

———○———

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥৭৪॥

অনুবাদ। অতএব তুমি আমার কথা অনুসারে শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকটে চল। কেশাকর্ষণে বিলুপ্তগৌরবা হইয়া সেখানে যাওয়া ভাল নয়।

ব্যাখ্যা। ইহাই দূতবাক্যের উপসংহার। দূত শেষ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিল—যদি স্বেচ্ছায় শুম্ভ নিশুম্ভের পার্শ্ববর্তিনী না হও, তবে কেশাকর্ষণের দ্বারা তোমার গৌরব বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে অর্থাৎ বলপ্রয়োগে তোমাকে শুম্ভের সমীপে উপস্থিত করা হইবে। এই ত' গেল স্থূল কথা। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা এখানে কি দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ কেশাকর্ষণ শব্দটির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। (ক+অ+ঈশ=কেশ) ক শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, অ-কারের অর্থ বিষ্ণু এবং ঈশ শব্দের অর্থ মহেশ্বর। এইরূপ একাক্ষরকোষ অভিধান অনুসারে অর্থ করিয়া এই যে একটা কষ্ট কল্পনা করা, ইহা শুধু আমাদেরই উদ্ভাবিত নহে, পূর্ববর্তী আচার্যগণই ইহার পথ প্রদর্শক। কালী ধ্যানে **'মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং'** পদের অর্থ করিতে গিয়া কোন প্রাচীন প্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়াছেন, **'মুক্তাঃ কেশাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ যয়া সা মুক্তকেশী'** যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও মুক্তি দেন, তিনিই মুক্তকেশী। এই চণ্ডীর টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকাও এই স্থানে কেশ শব্দের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপ অর্থ করিয়াছেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিত্যাদি শক্তিত্রয়ই মায়ের কেশ শব্দের অর্থ। এই তিন শক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিলেই চিতিশক্তি হীনবল হইয়া পড়িবে, তখন তাঁহার মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইবে ; সুতরাং বিনষ্টগৌরবা হইয়া পড়িবে। দূত এইরূপ চিন্তা করিয়াই পূর্বোক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে—আত্মার ঐ জগজ্জন্মস্থিত্যাদি ব্যাপার যদি আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ অস্মিতাই যদি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ হয়, তখন আর চিতিশক্তির শক্তিত্বই

থাকিবে না। সেই অবস্থায় উহাকে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু হায়! দূত জানে না যে, মায়ের কেশকে — মায়ের সৃষ্ট্যাদি শক্তিকে কেহই আকর্ষণ করিতে পারে না। যত বড় শক্তিমান সাধকই হউক, মায়ের কেশাকর্ষণ করিবার শক্তি কাহারও নাই ; তাই ভগবান ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে **'জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্'** বলিয়া একটি বিশেষ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য এই যে, মুক্ত পুরুষদিগের অন্য সমস্ত ক্ষমতাই হইতে পারে, কেবল জগদ্-ব্যাপারে তাহাদের কোন হাত নাই। অর্থাৎ সমগ্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্তৃত্ব এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষগণ ইচ্ছা করিলে এই জগতের মধ্যে থাকিয়া উহার উপর আংশিক আধিপত্য করিতে পারেন মাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তৃত্ব তাঁহাদের কোন অবস্থায়ই হয় না। সুতরাং মায়ের কেশাকর্ষণ সর্বদা অসম্ভব, উহা করিতে গেলে স্বয়ং বিলুপ্ত হইতে হয়। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায় নারীর মর্যাদা নষ্ট করিতে গেলে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। সে যাহা হউক, শুম্ভ যে অম্বিকার পাণিগ্রহণ করিতে চায়, সে শুধু জগদ্‌ব্যাপারের জন্যই। শুন, খুলিয়া বলিতেছি—অস্মিতায় উপনীত সাধক আপনাকেই জগতের ঈশ্বররূপে দেখিতে পায়, ব্যষ্টি পদার্থসমূহের উপর কথঞ্চিৎ আধিপত্যও করিতে পারে ; অল্পাধিক ঈশ্বরধর্মও প্রকাশ পায়, ইচ্ছার অনভিঘাতও হইতে থাকে বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের উপর হাত দিতে পারে না ; তাই বাধ্য হইয়া চিতিশক্তির—পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়। যেখানে হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, যদি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত' জগদ্‌ব্যাপারের উপরেও আধিপত্য আসিবে। শুম্ভের আশা ঠিক এইরূপই ; তাই অম্বিকাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার এত আয়োজন।

———০———

দেব্যুবাচ

এবমেতদ্বলী শুম্ভোনিশুম্ভশ্চাতিবীর্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥ ৭৫ ॥
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তস্তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—সত্য বটে শুম্ভ এইরূপই বলবান, নিশুম্ভও অতিশয় পরাক্রমশালী ; কিন্তু কি করি ? পূর্বে আলোচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; সুতরাং তুমি যাও, আমি যাহা বলিলাম, ঠিক সেই কথাগুলি তুমি আদরের সহিত অসুররাজের নিকট বলিও। তারপর তিনি যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহাই করিবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্ম্যোপাখ্যানে দেবীর সহিত দূতের কথোপকথন সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্তরূপ দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া মা আবার বলিলেন—শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়ই অতিশয় বীর্যবান ; ইহা সত্য, বাস্তবিকই অস্মিতা এবং মমতা উভয়ই ত্রিলোকবিজয়ী দেবশক্তি-নির্যাতনকারী মহাবীর। সাধক যতদিন ইহাদের সন্ধান না পায়, ততদিন ইহাদের বীর্যবত্তা বুঝিতেই পারে না। কিন্তু আজ মায়ের কৃপায় সাধকের আত্মবোধ অস্মিতায় উপনীত হইয়াছে, যাবতীয় গ্রাহ্য ও গ্রহণশক্তি নিজেরই বিশিষ্ট-তরঙ্গরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ঈশ্বর স্বরূপের আভাস পাইতেছে। যদিও যথার্থ গ্রহীতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-স্বরূপটি অস্মিতার নহে, উহা একমাত্র চিতিশক্তিরই, তথাপি চৈতন্যোজ্জ্বলিত অস্মিতা আপনা হইতে চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিবিক্তরূপে দেখিয়াও উঁহাকে গ্রাহ্যশক্তিরূপে পরিগ্রহ করিতে চায়, অর্থাৎ স্বয়ং গ্রহীতৃরূপে অবস্থান করিয়া আত্মাকে গ্রাহ্যরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। ইহাই শুম্ভকর্তৃক অম্বিকার পাণি-গ্রহণের অভিলাষ।

যাহা হউক, মা স্বয়ং শুম্ভাদির বীর্যবত্তায় সন্দিহান নহেন। **'এবমেতদ্বলী শুম্ভ'** ইত্যাদি বাক্যে দূতের প্রতি সোপহাস উক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই। মা আমার উপহাস করিতে জানেন না, সেখানে উপহাস বলিয়া কিছুই নাই। যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, তাহাই সেখানে নিয়ত অভিব্যক্ত। যথার্থই বল বিক্রম যাহা কিছু, তাহা অস্মিতায়ই প্রকাশ পায়। যদিও মাতৃ-বলের তদপেক্ষাও বিশেষত্ব, তথাপি শুম্ভের ত্রিলোকবিজয়ী বীর্যে কোনরূপ সংশয় থাকিতে

পারে না। আরে, সমষ্টি-অস্মিতা ক্ষেত্রেই ত' সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ ত্রিলোক বা ত্রিবিধ প্রকাশ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভবও এইরূপই বটে।

মা বলিলেন —**'যদনালোচিতা পুরা'** পুরা অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশেষরূপ আলোচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে— **'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'** ইত্যাদি। আশঙ্কা হইতে পারে, শ্রুতি ঈক্ষণ পূর্বক অর্থাৎ আলোচনাপূর্বক সৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন ; তবে আলোচনা করা হয় নাই, এরূপ কথা মা এখানে কেন বলিলেন ? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, যথার্থই মাকে পাইতে হইলে—অম্বিকার পাণিগ্রহণ করিতে হইলে যে, পূর্বোক্তরূপ সংগ্রামের জয়, দর্পনাশ ও সমবল-সম্পন্ন হইতে হইবে, এ সকল বিষয় ত' আর পূর্বে আলোচিত হয় নাই ? মায়ের আমার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা নিত্যই স্থির। মা সর্বথা একান্ত-প্রাপ্ত বস্তু, মাকে পাওয়ার জন্য যে আবার একটা প্রযত্নের প্রয়োজন, ইহা মা ভাবিতেও পারেন না। আত্মবিস্মৃত জীব যে মায়ের সত্তা খুঁজিয়া পাইবে না, ইহা অচিন্তনীয়, একান্ত বিস্ময়কর বটে। কিন্তু এখন কার্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, জীব মা হইতে একটা পৃথক সত্তা কল্পনা করিয়া, ভ্রান্তির আশ্রয়ে যুদ্ধ দ্বারা সাধনা দ্বারা মাকে লাভ করিতে চায়। মা নিত্য জ্ঞানময়ী, নিত্য স্বচ্ছস্বরূপা, তাঁহাতে ঐরূপ ভ্রান্তি কি করিয়া থাকিবে। তবু কিন্তু জীব মা-তে ঐ ভ্রান্তির দ্রষ্টৃত্ব আরোপ করে ; সুতরাং সত্যস্বরূপ চিন্ময় আনন্দময় হইয়াও যে ভ্রান্তির দ্রষ্টা হইতে হইবে, ইহা ত' আর পূর্বে কল্পনা করা হয় নাই ; তাই মন্ত্রে আলোচনার কথা বলা হইয়াছে। আর একটি দিক দিয়া দেখা যায়—আলোচনা ইন্দ্রিয় ধর্মমাত্র, মা আমার অতীন্দ্রিয়া সুতরাং পুরা অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে মা যথার্থই 'অনালোচিতা' আলোচনার অতীত স্বরূপেই বিরাজ করেন।

দেবী আর একটি কথা বলিলেন— অসুররাজের নিকট আমার কথাগুলি উপেক্ষার ভাবে বলিও না, বেশ আদরপূর্বক বলিও। আমি যেমন বলিয়াছি, ঠিক তেমনই বলিও। আমি ত' শুম্ভের বীর্যবত্তায় সংশয় অথবা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। সে যে আমারই প্রতিবিম্ব, তার উপর আমার স্নেহ দয়া ব্যতীত কখনও ক্রোধ বা অবজ্ঞা নাই—থাকিতে পারে না।

শুম্ভকে এ স্থলে অসুরেন্দ্র বলা হইয়াছে। যাবতীয় সুর-বিরোধী ভাবের অনাত্মভাবের ইনিই একমাত্র অধিপতি। সংস্কাররূপ বীজসমূহের অস্মিতাই একমাত্র অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, তাই ইহাকে অসুরেন্দ্র বলিতে হয়।

সাধক ! এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কি ? যদি সত্য ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক, যদি বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাক, যদি সেই নির্মল ধীক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিবার সামর্থ্য অর্জন করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মবোধ অস্মিতায় উপনীত হইয়াছে। সর্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত, অথচ সর্বভাব হইতে একান্ত পৃথক্ ঐ যে তোমার আমিত্ব, তাহাই আত্মরূপে প্রতীত হইতেছে, বাস্তবিক উনিও আত্মা নহেন—আত্ম-প্রতিবিম্বমাত্র। এই অস্মিতাও যথার্থ আত্মস্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। এখানে আসিয়া তুমি আত্মবিভূতি দর্শনে মুগ্ধ হইও না, স্বীয় ঈশ্বরত্বের আভাস পাইয়া ইহাকেই তোমার চরম নিকেতন বলিয়া বুঝিয়া লইও না। ওগো ! যাহার প্রতিবিম্বমাত্র পাইয়া তুমি আপনাকে এত উন্নত ও মহান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ, একবার সেই বিম্বের দিকে পরমাত্মার দিকে আনন্দময়ী চিতিশক্তি-রূপিণী মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রবল অধ্যবসায়ে অগ্রসর হও, ইহাও অসুর-ভাব বলিয়া তুচ্ছ করিতে অভ্যাস কর। মনে রাখিও— যতদিন বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিবে, ততদিন কিছুতেই অমৃতলাভ করিতে পারিবে না— যথার্থ আনন্দের সন্ধান পাইবে না। যেরূপ প্রবল আগ্রহ নিয়া স্থূল জড় পদার্থকে মা বলিয়া বুঝিয়াছিলে, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে, যেরূপ অভাবের তীব্র যাতনা বুকে করিয়া সাধনারাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলে, ঠিক সেইরূপ প্রবল আগ্রহ ও তীব্র অভাববোধ বুকে করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আনন্দময় তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখ ; তুমি অমৃতলাভে ধন্য হইবে ; জন্মমৃত্যুর সংস্কার চিরতরে বিদূরিত হইয়া যাইবে। শুধু কাতর প্রাণে বলিতে থাক —মা ! কতদিনে তুমি এই প্রবল প্রারব্ধ-সংস্কাররূপ অসুরকুলকে নিহত করিয়া নির্মল চিন্মাত্র আনন্দময় স্বরূপে প্রকটিত হইবে। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই জীবত্বের বোঝা বহন করিয়া আসিতেছি, ভ্রান্তি মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া কতকাল জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমারই আশায়

ছুটিতেছি, তোমাকে পাইব, তোমার স্বপ্রকাশ নয়নে, আমার বিশিষ্ট প্রকাশরূপ মলিন দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া শেষবারের মত মা বলিয়া আত্মহারা হইব, এই আশায় তোমারই মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছি। এস মা! অসুর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমাকে নির্মল বোধমাত্রস্বরূপে উপনীত কর। যেখানে মাতা পুত্র বলিয়া কোন ভেদ নাই, তোমার সেই ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত স্বরূপটি উদ্ভাসিত কর, আমি ধন্য হই। সাধক! এমনই করিয়া কাঁদ। কাঁদিতে পারিলেই মায়ের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে। কৃপার উপলব্ধি হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর বিনষ্ট হইতে আর বিলম্ব থাকিবে না।

এই অধ্যায়ে এই দেবীদূত সংবাদের মধ্য দিয়া আমরা আর একটি রহস্যের সন্ধান পাই—প্রথমে চণ্ডমুণ্ড অম্বিকা পরিগ্রহের জন্য শুম্ভকে নানারূপে উৎসাহিত করিয়াছিল। তারপর শুম্ভের প্ররোচনায় দেবীকে শুম্ভের অঙ্কস্থা করিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন ও পরে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। আমাদের যাবতীয় বিধিশাস্ত্রসমূহও ঠিক এইরূপ রোচক ও ভয়ানক বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ। 'যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হইবে' 'হিংসা করিলে নরকে যাইতে হইবে', ইত্যাদিরূপ রোচক ও ভয়ানক বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, বহির্মুখ জীবসমূহকে আত্মাভিমুখ করিয়া ক্রমে স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া। শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ পালনে সাধারণতঃ অপ্রবৃত্ত জীবসমূহ ঐ সকল রোচক ও ভয়ানক বাক্যের প্রভাবেই বিধিনিষেধ পালনে প্রবৃত্ত হয়; তাহার ফলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে অদ্বয়া-নন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারে ধন্য হয়। তখন যাবতীয় বিধিনিষেধের পরপারে চলিয়া যায়।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় দেবীদূত সংবাদ।

———o———

ধূম্রলোচন বধ

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥১॥

অনুবাদ । ঋষি বলিলেন—দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে সেই দূত ক্রোধান্বিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট আগমনপূর্বক সবিস্তার বর্ণনা করিল ।

ব্যাখ্যা । বাচনিক-জ্ঞান, বাচনিক-প্রার্থনা নিস্ফল হইল । চিতিশক্তি বিনাযুদ্ধে অস্মিতার আয়ত্তী-ভূতা হইলেন না । দূত আসিয়া শুম্ভকে দেবীর প্রতিজ্ঞা শুনাইল —'যে তাঁহাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, যে তাঁহার দর্পনাশ করিতে পারিবে এবং যে তাঁহার তুল্যবলসম্পন্ন হইতে পারিবে, দেবী মাত্র তাঁহারই পরিগ্রহযোগ্যা হইবেন।'

এই মন্ত্রে দূতকে 'অমর্ষপূরিত' বলা হইয়াছে । দেবীর পূর্বোক্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া শুম্ভদূত সুগ্রীব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ; হইবারই কথা । বাচনিক-জ্ঞান কখনও আত্মলাভে সমর্থ হয় না। আজকাল অনেক স্থানেই আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জগতত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা হইয়া থাকে, ঐ সকল মৌখিক আলোচনা দ্বারা কখনও আত্মলাভ হয় না । অনেকে মনে করেন 'আমি ব্রহ্ম' এইটি মৌখিক আলোচনায় তর্কে বিচারে বুঝিয়া লইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল । বাস্তবিক তাহা হয় না । ঐরূপ জ্ঞান জ্ঞানই নয়—উহা জ্ঞানাভাসমাত্র । জ্ঞান যতক্ষণ অনুভূতিময় না হয়, ততক্ষণ উহা জ্ঞানপদবাচ্যই হয় না । আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ ; তাঁহাকে লাভ করা হইল, অথচ বিন্দুমাত্র অনুভূতি আসিল না, ইহা একান্ত অসম্ভব কথা । আরে, তোমরা সুখ, দুঃখ, শোক, শীত, গ্রীষ্ম এইগুলিকে জান ত' ? ঐ জানা মানেই অনুভব করা । তুমি সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্মকে জানিলে অর্থাৎ অনুভব করিলে । যতক্ষণ পর্যন্ত ঐগুলি তোমার অনুভব-পর্যন্ত না পৌঁছায়, ততক্ষণ তুমি সহস্রবার ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ করিলেও উহাদের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার না । জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন যে আত্মা কেবল অনুভবানন্দস্বরূপ, তাঁহাকে শুধু মৌখিক জ্ঞান-আলোচনায় কিরূপে লাভ করিবে ! জল জল বলিয়া সহস্রবার চীৎকার করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না । শুম্ভের দূত সুগ্রীবকে বিফলমনোরথ হওয়া এবং ক্রোধান্ধ হইয়া দেবীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসার ইহাই আধ্যাত্মিক রহস্য ।

তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্‌ ততঃ ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্‌ ॥২॥
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ।
তামানয় বলাদ্‌ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্‌ ॥৩॥

অনুবাদ । অনন্তর দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ ক্রোধান্বিত হইয়া বহু অসুরসৈন্যের অধিপতি ধূম্রলোচন নামক অসুরকে বলিল, হে ধূম্রলোচন ! তুমি শীঘ্র স্বকীয় সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া বলপ্রয়োগপূর্বক সেই দুষ্টা রমণীকে কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া এখানে আনয়ন কর ।

ব্যাখ্যা । শুম্ভের প্রথম সেনাপতি ধূম্রলোচন । শুম্ভ তাহাকেই সর্বাগ্রে বলপ্রয়োগপূর্বক দেবীকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিল । ধূম্রলোচন ধূমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি অর্থাৎ বিপর্যয়জ্ঞান । যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা না জানিয়া অন্যথা-প্রতীতির নাম বিপর্যয়-জ্ঞান। দার্শনিকগণ ইহাকেই ভ্রান্তি বলিয়া থাকেন । এই ভ্রান্তি বা বিপর্যয়জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতার ত্রিলোকাধিপত্য । মায়ের—আত্মার যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহা না বুঝিয়া আমিত্বকেই আত্মারূপে প্রতীতি হওয়ার কারণ—এই বিপর্যয়-জ্ঞান । কথাটি আর একটু পরিস্কার করা আবশ্যক—প্রথমে ধর আত্মা ; উহা বুদ্ধির প্রতিসম্বেদি-বস্তু । প্রতিসম্বেদন অর্থ প্রতিবিম্বিত হওয়া ।

মনে কর একখানি দর্পণ, উহাতে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া, যে স্থান হইতে আলো আসিতেছে আবার সেইস্থানে ফিরিয়া যায়। ঠিক এইরূপ আত্মা বুদ্ধিরূপদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবার আত্মাভিমুখে ফিরিয়া যায় । বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব পড়ামাত্রই আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠে। তারপর ঐ আমিত্ববোধের যাহা কেন্দ্র অর্থাৎ যেখান হইতে বিম্ব আসিয়া বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায় আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতিবিম্বটি সেই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয় । এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইতেছে ; এই যে প্রতিফলন ইহারই নাম প্রতিসম্বেদন। এই প্রতিসম্বেদনের যে কেন্দ্র তাহাই আত্মা। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার নাম অস্মিতা । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । অস্মিতা আত্মার অত্যন্ত-বিভিন্ন স্বরূপ না হইলেও, যথার্থ আত্মস্বরূপ নহে। সাধককে কিন্তু ঐ প্রতিসম্বেদন ধরিয়াই আত্মাকে বুঝিতে হয় । প্রতিসম্বেদন অবলম্বনে প্রতিসম্বেদিকে ধরিতে হয় । সে যাহা হউক, সাধকগণ যখন গুরুকৃপায় অস্মিতায় অসিয়া উপনীত হয়, তখন কিছুদিন ঐ কেন্দ্রকে অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসম্বেদি বস্তুস্বরূপ আত্মাকে কিছুতেই ধরিতে পারে না । মহাসুর শুম্ভ এখান হইতেই সাধকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়—অস্মিতার বা শুম্ভের অনুচর ঐ বিপর্যয়জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচন। যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ নহে, তাহাকে তৎস্বরূপে গ্রহণ করানই ধূম্রলোচনের কার্য । বিপর্যয়-জ্ঞানই অস্মিতাকে আত্মারূপে প্রতীত করায় । প্রথমে যেরূপ স্থূলদেহকেই আমি বলিয়া প্রতীতি হইত, এখানেও সেইরূপ অস্মিতাকে আমি বলিয়া প্রতীতি হয় । বস্তুতঃ কিন্তু অস্মিতা আমি নহে, আমির প্রতিবিম্বমাত্র। তবে এখানে উহাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া ধরা একটু কঠিন ; কারণ, বুদ্ধিতত্ত্ব এতই স্বচ্ছ যে, উহাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যেরূপ অতি স্বচ্ছ দর্পণের ভিতর দিয়া আলো আসিলে প্রথম দৃষ্টিতে সে দর্পণটা ধরাই যায় না, ঠিক সেইরূপ অস্মিতায় আসিয়া, যে আমিকে দেখা যায়, তাহাও যে যথার্থ আমি নহে, আমির প্রতিবিম্বমাত্র, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যাহার প্রভাবে এইরূপ হয়, তাহারই নাম ধূম্রলোচন বা ধূমাচ্ছন্ন দৃষ্টি । অবিদ্যারূপ উপনেত্র চক্ষুতে পরান থাকিলে আত্মপ্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে । এই কথাটি বেশ ভালরূপে বুঝিয়া রাখিতে না পারিলে, সাধকের পক্ষে এই উত্তমচরিত্রে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন হইবে।

যাহা হউক, এই ধূম্রলোচন বা বিপর্যয়-জ্ঞানকেই প্রথমে মায়ের নিকট প্রেরণ করা হইল । উদ্দেশ্য কেশাকর্ষণপূর্বক দেবীকে আনয়ন । কেশাকর্ষণ শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে । জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি ব্যাপারের যে কর্তৃত্ব বা শক্তি, তাহাকে আকর্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারিলেই চিতিশক্তিরূপিণী দেবী অম্বিকা বিহ্বলা — অবশা অর্থাৎ শক্তিহীনা হইয়া পড়িবেন । এইরূপ পরমর্শ স্থির করিয়াই মহাসুর শুম্ভ ধূম্রলোচনকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল ।

———○———

তৎ পরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষোগন্ধর্ব এব বা ।।৪।।

অনুবাদ । যদি কেহ তাহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য উদ্যত হয়, তবে সে দেবতা হউক, যক্ষ হউক, গন্ধর্ব হউক, তাহাকেও হত্যা করিবে।

ব্যাখ্যা । এই মন্ত্রে শুম্ভের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে । শুম্ভ ধূম্রলোচনকে বলিল—হে ধূম্রলোচন ! আমি দূতমুখে শুনিয়াছি সে নারী একাকিনী ; সুতরাং বলপ্রয়োগ করিলে তুমি অনায়াসেই তাহাকে এখানে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে, আর যদি অন্য কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব যে কেহ হউক না কেন, তাহাকে হত্যা করিবে ।

বিপর্যয়-জ্ঞান যখন আত্মার সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখন উহাকে অনায়াসলভ্য বলিয়াই মনে করে । কারণ, সে অস্মিতাকে আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে । বিপর্যয়-জ্ঞান জানে, জগৎ অস্মিতায়ই প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং চিতি-শক্তি বলিয়া ঐ যে একটি বস্তুর আভাস পাওয়া যাইতেছে, উহাই বা অস্মিতার মধ্যে কেন প্রকটিত না হইবে ? সাধক মনে রাখিও এইরূপ জ্ঞানের নামই ধূম্রলোচন ।

শুম্ভ দেখিতে পায় — দেবী সেখানে একা, দ্বিতীয় কেহ তাহার সহচর নাই ; সুতরাং তাহাকে আনয়ন করা

বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তাই ধূম্রলোচনকে আদেশ করিল যে, যদি সেই দেবী অপরের সাহায্য লয়, অর্থাৎ দেবতা গন্ধর্ব অথবা যক্ষ যে কেহ সেখানে তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া দিবে। আসল কথা এই যে—যেখানে কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় সেইখানেই অস্মিতার আধিপত্য। অস্মিতাকে আশ্রয় না করিয়া দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব কেহই প্রকাশ পাইতে পারে না; কারণ, উহারাও অস্মিতারই বিশেষ বিশেষ ব্যূহমাত্র। সুতরাং দেবতা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করা অস্মিতার পক্ষে বা তাহার অনুচরের পক্ষে একান্তই সহজ। যক্ষ এবং গন্ধর্ব ইহারাও দেব-যোনিবিশেষ।

———○———

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥৫॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন, শুম্ভকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই দৈত্য ধূম্রলোচন ষষ্টি সহস্র অসুর-বল পরিবৃত হইয়া দ্রুতবেগে অভিযান করিল।

ব্যাখ্যা। ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্য। বিপর্যয়-জ্ঞানেতেই জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে প্রভৃতি ষড়্ভাব বিকারের বীজ থাকে। উহারা আবার দশ ইন্দ্রিয়পথে প্রকাশিত হইতে গিয়া ষষ্টি সংখ্যক হয়, তারপর অসংখ্য বিষয়ভেদে ঐ ষষ্টি সংখ্যক বিকারবীজ অসংখ্যভাবে প্রকাশ পায়; তাই মন্ত্রে অসংখ্যবোধক সহস্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধক! আশঙ্কা করিও না যে, পূর্বে মহিসাসুরবধে এই ষড়্ভাব-বিকারকেই অন্যান্য অসুরের শক্তি বা সৈন্যবলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরায় ধূম্রলোচনের সৈন্যবলরূপে ব্যাখ্যা করায় পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা হয় নাই, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে উহা স্থূলে—কার্যক্ষেত্রে, কিন্তু ইহা সূক্ষ্মে অব্যক্তে কারণ-ক্ষেত্রে। কারণক্ষেত্রে ষড়্ভাব-বিকারের বীজ থাকে বলিয়াই ত' স্থূলে উহা কার্যরূপে প্রকাশ পায়, ইতিপূর্বে সেই কার্যভাবাপন্ন বিকারসমূহের নাশ বলা হইয়াছে, আর এইবার কারণভাবাপন্ন ষষ্টি সহস্র বিকার বীজ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই উত্তম চরিত্রে যে ধূম্রলোচনাদি অসুরের বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহারা সকলেই কারণ ক্ষেত্রীয় অনাত্মভাব, সুরবিরোধীভাব, এই সত্য তত্ত্বটি স্থির ধারণা রাখিতে পারিলে আর কোনরূপ সংশয় দ্বারা আকুলিত হইতে হইবে না। এইবার নির্বিশেষ আত্মস্বরূপ প্রকটিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তাই সূক্ষ্মতম বিকারবীজসমূহও প্রলয়ানলে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছে।

———○———

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৬॥
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৭॥

অনুবাদ। অনন্তর হিমালয়স্থিতা সেই দেবীকে দেখিয়া ধূম্রলোচন উচ্চৈঃস্বরে বলিল 'শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট চল, যদি আমার প্রভুর নিকট প্রীতির সহিত উপস্থিত না হও, তবে এই আমি বলপূর্বক তোমাকে কেশাকর্ষণবিহ্বলা করিয়া লইয়া যাইব'।

ব্যাখ্যা। বিপর্যয়জ্ঞান স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই চিতিশক্তির সন্ধান পায়, তাই মন্ত্রে 'তুহিনাচল-সংস্থিতা' কথাটি আছে। যাবতীয় অনাত্মভাবের বিলয় স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই সম্পন্ন হয়। যাহারা মনে করে মৃত্যুর পর তবে দ্বৈতজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে, তাহারা ভ্রান্ত। জীবিত অবস্থায়ই মুক্ত হইতে হয়। যদি মৃত্যুই হয়, তবে জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সে যাহা হউক, ধূম্রলোচন মায়ের সন্ধান পাইয়া দূর হইতেই তাঁহাকে অস্মিতার গণ্ডীর ভিতর লইয়া আসিতে চেষ্টা করে; মাকে পাইলেই যথার্থ ঈশ্বরত্ব আবির্ভূত হইবে, সেই আশায়ই প্রীতির সহিত দেবীকে শুম্ভের নিকট আগমন করিবার কথা বলে। মায়ের সম্মুখস্থ হইবার উপায় নাই; কারণ তাঁহার সমুখস্থ হইলেই যাবতীয় দ্বৈত-প্রতীতি সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই সর্বভাবের ভিতর দিয়া, বহুত্বের ভিতর দিয়া মাকে ভোগ করিবার জন্য অসুরগণের এই চেষ্টা চলিতে থাকে। যদি তাঁহাকে একান্তই অঙ্কস্থ করা অসম্ভব হয়, তবে বাধ্য হইয়া বলপ্রয়োগ অর্থাৎ কেশাকর্ষণ করিতে হইবে। জগৎ কর্তৃত্ব দূরীভূত করিয়া—জগৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তি অপহরণ করিয়া চিতিশক্তিকে অস্মিতাক্ষেত্রে লইয়া আসিতে পারিলেই ঈশ্বরত্ব লাভ হইবে, এই আশায়ই শুম্ভের এইরূপ প্রযত্ন। কিন্তু হায়, শুম্ভ জানে না যে, তাহার এ

প্রযত্ন কখনই সফল হইতে পারে না। সাধক, তুমিও যখন মাকে আয়ত্ত করিতে চাও তখন বুঝিতে পার না যে, মাকে পাইলে তোমার আমিত্বটা একেবারেই হারাইয়া যাইবে।

———০———

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥৮॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—তুমি দৈত্যেশ্বরকর্তৃক প্রেরিত, স্বয়ং বলবান্, আবার সৈন্যবলে পরিবেষ্টিত; সুতরাং বলপূর্বক আমাকে লইয়া যাইবে, আমি আর তোমার কি করিতে পারিব!

ব্যাখ্যা। বিপর্যয়-জ্ঞান অনাদিজন্মসঞ্চিত এবং ভেদ-প্রতীতি দ্বারা সম্যক্ পরিপুষ্ট। বহু প্রযত্নেও ইহাকে বিনষ্ট করা যায় না; তাই মা ধূম্রলোচনকে বলবান্ বলসংবৃত বলিলেন। বলপূর্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, 'আমি আর কি করিতে পারি' এই কথাটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা করার, মা তাহাই করিয়া ফেলিলেন। সাধক মাত্রেরই এইরূপ সংঘটন হয়। প্রথমতঃ বিপর্যয় জ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যেই সাধক মাকে পাইবার চেষ্টা করে। যত শাস্ত্রবিধি, সাধন ভজন, ব্রত নিয়ম, বেদ বেদান্ত,সকলই অবিদ্যাবস্থার কার্য। শাস্ত্রজ্ঞান তপঃশক্তি যোগবল ভক্তি-আকর্ষণ, এ সকলই অবিদ্যাক্ষেত্রের কথা। এই সকলের সাহায্যেই মাকে পাইবার যে চেষ্টা, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই মা বলিলেন **'বলান্নয়সি মাং'** আমাকে ত বলপূর্বকই লইয়া যাইবে! বাস্তবিকই সাধনা বা উপাসনার সাহায্যে মাকে পাওয়ার চেষ্টা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে সাধক বলপূর্বক মাকে আকর্ষণ করিতে চায়। এইরূপ অবিদ্যার সাহায্যে বিদ্যালাভ করিবার অর্থাৎ মাতৃসাক্ষাৎকারের যে প্রয়াস তাহার পরিণামফল যে কি হয়, তাহাই **'ততঃ কিন্তে করোম্যহম্'** বলিয়া মা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। সাধক মনে রখিও—অজ্ঞানান্ধকার যত দীর্ঘকালের এবং যত ঘনীভূতই হউক, মায়ের কৃপা হইলে উহা বিনষ্ট হইতেই ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না, পরবর্তী মন্ত্রে ইহাই পরিব্যক্ত হইবে।

———০———

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥৯॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন— দেবী এইরূপ বলিলে, সেই অসুর ধূম্রলোচন তাঁহার (দেবীর) প্রতি অভিধাবিত হইল। তখন অম্বিকা দেবী হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা যখন বিদ্যার সমুখস্থ হইতে যায়, তখন ঠিক এইরূপেই দেখিতে না দেখিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্ধকার যেরূপ আলোকের সমীপস্থ হইলেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিপর্যয়-জ্ঞান যতই বলবান হউক, যতই বলসংবৃত হউক, একবার সেই বিশুদ্ধা চিতিশক্তির সম্মুখস্থ হইলেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান যত দীর্ঘকালের এবং যত ঘনীভূতই হউক না কেন, জ্ঞানের সমীপবর্তী হইলে মুহূর্তকাল মধ্যেই উহার অস্তিত্বের বিলোপ হয়। অজ্ঞানের অস্তিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ জ্ঞানের আলোক তাহার উপর নিপতিত না হয়!

হুঙ্কার ক্রোধপ্রকাশক অব্যয়, তন্ত্রে ইহা প্রলয়-বীজরূপে অভিহিত হইয়াছে। আমি নিত্য নির্মল—স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ-জ্ঞান, আমার সম্মুখে আবার বিপর্যয়-জ্ঞানের আবির্ভাব কিরূপে, কোথা হইতে সম্ভব হইল? এইরূপ ভাবের ভিতর দিয়াই যেন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়; তাই মন্ত্রে ক্রোধের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভস্ম করিলেন কথাটার মধ্য দিয়াও একটি রহস্য প্রকাশ পাইতেছে— অসুরের আর কোন চিহ্নই রহিল না। অজ্ঞান একবার বিনষ্ট হইলে, আর কখনও সত্তাবান হইতে পারে না। আশঙ্কা হইতে পারে—আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগেরও অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষেরাও অবিদ্যার কার্য— লোক-শিক্ষা, শাস্ত্রপ্রণয়ন, বিধি নিষেধ পালন ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অজ্ঞান একবার বিনষ্ট হইলে, যদি আর তাহার পুনরাবৃত্তি-সম্ভব না-ই হয়, তবে এই সকল অনুষ্ঠান, অথবা এক কথায় দেহধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে পূর্বসংস্কারবশতঃ অজ্ঞানের কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যেরূপ কুলালচক্রের ভ্রামক দণ্ড অপসৃত হইলেও পূর্ববেগবশতঃ ভ্রমী বা আবর্তন কিছুক্ষণ থাকে, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইলেও পূর্বারব্ধ

অজ্ঞানের ফলরূপ দেহ ও তদনুবর্তী কর্মসমূহ কিছুদিন থাকে।

সে যাহা হউক, সাধক ! এইরূপভাবে যতদিন অম্বিকা মা তোমার বিপর্যয়-জ্ঞানকে ভস্মীভূত না করিবেন, ততদিন মাকে কিরূপে পাইবে ? তাই ত' বলি—ভাল হউক মন্দ হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক, জ্ঞান হউক অজ্ঞান হউক, সকলই মায়ের সম্মুখে ধর, সকলই মায়ের কাছে পাঠাইয়া দাও। শুম্ভ যেরূপ ধূম্রলোচন প্রভৃতি অনুচরবর্গকে ক্রমে ক্রমে মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিল, তুমিও সেইরূপ তোমার বলিয়া যাহা কিছু আছে, সৎ অসৎ নির্বিচারে সে সকলকে এক একটি করিয়া মায়ের কাছে পাঠাও, মা স্বয়ং উহাদের যথাযোগ্য বিধান করিবেন। তুমি কেন নিজে ভ্রান্তিনাশ, অবিদ্যানাশ, চিত্তবিলয়, বৃত্তিনিরোধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার লইয়া সমুদয় জীবন ক্ষতবিক্ষত করিতে যাও, অশান্তিতে অবস্থান কর ? তুমি মায়ের ছেলে, মা ব্যতীত আর কিছুই জান না, ভাল মন্দ যাহাই আসুক, উলঙ্গ শিশুর ন্যায় নির্বিচারে মায়ের নিকট উপস্থিত কর, মা ক্রমে তোমার সর্বভাব বিলয় করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিবেন, তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে। অবিদ্যার—অজ্ঞানের ধাঁধা চিরতরে বিদূরিত হইবে।

———○———

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাং ।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥১০॥

অনুবাদ। অনন্তর (সে ঘটনায়) ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল অসুরবাহিনী অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। শর, শক্তি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক রহস্য পূর্বেই (দ্বিতীয় খণ্ডে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরায় তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধকগণ এইমাত্র বুঝিয়া লইবেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ কথাই সূক্ষ্মদেহকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এ খণ্ডে কারণ-দেহ বা আনন্দময় কোষকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক কথা বলা হইবে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, রাগ-দ্বেষ, ভেদ-জ্ঞান, কর্তব্য-বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি হইবে ? ঐ সকলকে পুনরুক্তি না বুঝিয়া আরও সূক্ষ্মতর স্তরের কথা বুঝিলেই ঠিক হইবে। এবার আমরা স্থূল সূক্ষ্ম ছাড়িয়া অনেকটা কারণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। এই কারণ ক্ষেত্রে স্থূল ও সূক্ষ্মের ন্যায় সকলই আছে, কেবল অব্যক্তভাবে ; ইহাই বিশেষ। ঐ অব্যক্ত ভাবটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিলেই স্থূল ও সূক্ষ্মের বীজগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সংসারবীজ নষ্ট হইলে মাতৃ-লাভ অনিবার্য।

যাহা হউক, অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছে ; বিপর্যয়-জ্ঞানরূপী মহাসুর ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইয়াছে ; সুতরাং তাহার অনুচরগণ অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। অবিদ্যানাশের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যার কার্যগুলিও বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া উচিত এবং হয়ও তাহাই। তবে সাধকের তাহা উপলব্ধি করিতে একটু সময় আবশ্যক হয়। কারণ, বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে বিনষ্ট-অবিদ্যার কার্যসমূহ পূর্ব সংস্কারবশতঃ কিছুদিন অনুবর্তন করে। সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হইলেও পূর্বলব্ধ ভীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কিছুক্ষণ থাকে। কুলালচক্রের ভ্রমী বন্ধ করিয়া দিলেও পূর্ববেগবশতঃ কিছুকাল সে ভ্রমীটি থাকিয়া যায়। অবিদ্যার কার্য আপনিই বিনষ্ট হয়। কিরূপে বিনষ্ট হয়, তাহাই ক্রমে মহর্ষি মেধস অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক সুরথকে দেখাইয়া দিতেছেন। এক্ষণে যে সকল অসুরের নিধন বর্ণিত হইবে, তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট অবিদ্যার কার্য।

ধূম্রলোচন নিহত হইলে তাহার ষষ্ঠিসহস্র সৈন্য মায়ের প্রতি শাণিত শর, শক্তি, পরশু প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অর্থাৎ ষড়্‌ভাববিকারসমূহ স্বপ্রকাশ-রূপিণী মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ষড়্‌ভাববিকারের অন্য নাম জীবভাব ; পূর্বে ইহাকে ছায়া বলা হইয়াছে। আতপের সত্তা ব্যতীত ছায়ার সত্তাই থাকিতে পারে না, ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও ছায়া যেরূপ আতপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপ ধূম্রলোচনের অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে মাকে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিল।

———○———

ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্ ।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥১১॥

অনুবাদ । অনন্তর দেবীর স্ববাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর গর্জনপূর্বক অসুর-সৈন্য-মধ্যে আপতিত হইল ।

ব্যাখ্যা । বিপর্যয় জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, জীব বিশুদ্ধ বোধের সন্ধান পাইয়া সিংহবিক্রমে সংস্কারক্ষয়কল্পে বদ্ধপরিকর হয় । পূর্বে বলিয়াছি—জীবত্বহননেচ্ছু সাধকই সিংহ । মায়ের কৃপায় এতদিনে সে যথার্থ জীবভাবটি যে কি এবং তাহার বিনাশই বা কি তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে । এখন যত শীঘ্র হয় তীব্র পুরুষকার প্রয়োগে অসুরানুচরগণকে নিধন করিতে পারিলেই জীবত্বের সম্যক্ অবসান হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই অসুরসৈন্যমধ্যে আপতিত হইল । মায়ের স্বরূপের আভাস পাইলে সাধকের কর্মোদ্যম অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । তখন অভয় প্রাণে ভৈরব গর্জনে জয় মা বলিয়া আসুরিক সংস্কার জয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয় । কারণ তখন বুঝিতে পারে—সে '**দেব্যাঃ স্ববাহনঃ**' দেবীর স্ববাহন, পূর্বেও মায়েরই বাহন ছিল বটে, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে । এখন বিপর্যয়জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া মাকে স্ব বলিয়া, আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আত্মস্বরূপে মায়ের কোনও বিশিষ্টতা নাই ; এখানে মা আমার কেবলানন্দ-মূর্তি ; তাই সাধক আজ সাক্ষাৎ কেবলানন্দের বাহন, সুতরাং প্রাণে বল কত ! বহু সৌভাগ্যে সুকৃতির ফলে শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপায় সাধক নিজেকে মায়ের স্ববাহন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে । এখানে সাধক সত্যসত্যই আনন্দের ক্রীড়াপুতুল । জীব ! কবে তুমি সেই অবস্থায় উপনীত হইবে ?

———o———

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্ ।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্ ॥১২॥
কেষাঞ্চিৎপাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৩॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে ।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥১৪॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা ।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপনা ॥১৫॥

অনুবাদ । সেই সিংহ কতকগুলি দৈত্যকে কর-প্রহারে, কতকগুলিকে মুখে গ্রাস করিয়া, কতকগুলিকে অধর দ্বারা আক্রমণপূর্বক অর্থাৎ চর্বণ করিয়া নিহত করিল । এইরূপে কেশরী নখরাঘাতে কতকগুলি অসুরের কোষ্ঠ (উদরপ্রদেশ) বিদীর্ণ করিয়া দিল । কতকগুলির বা চপেটাঘাতে মস্তক (দেহ হইতে) পৃথক্ করিয়া দিল । সেইরূপ অপর কতকগুলি অসুর ছিন্নবাহু ও ছিন্নশির হইয়াছিল । অনন্তর সেই সিংহ কেশর কম্পিত করিয়া (আহ্লাদে) অন্য অসুরের কোষ্ঠ হইতে রুধির পান করিয়াছিল ! এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে সেই দেবী-বাহন অতি কুপিত মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকর্তৃক অসুরসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ।

ব্যাখ্যা । এই চারটি মন্ত্রে সিংহ কর্তৃক অসুরনাশের প্রকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে । সিংহের অপর কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই, স্বকীয় শরীরই তাহার শত্রুসংহারক অস্ত্র । সে ছয়টি উপায়ে অসুরসৈন্য ক্ষয় করিয়াছিল, যথা (১) কর-প্রহার (২) আস্য প্রহার অথবা মুখগ্রাস (৩) অধরাক্রমণ অর্থাৎ চর্বণ (৪) নখাঘাত বা নখরাঘাত (৫) তলপ্রহার অর্থাৎ চপেটাঘাত (৬) এবং শত্রুভয়দায়ক কেশরকম্পন । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ধূম্রলোচন ষষ্টিসহস্র অনুচরসহ যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিল । উহা দশ-ইন্দ্রিয়-গুণিত অসংখ্য ভেদপ্রাপ্ত জন্মাদি ষড্ভাববিকারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে । এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়— সিংহ কর-প্রহার প্রভৃতি ছয়টি উপায়ে সেই ষষ্টি সহস্র অসুরকে নিপাতিত করিয়াছিল । আমরা এস্থলে জন্মাদি বিকারগুলির বিষয় একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব । (১) জায়তে—আমি জন্মবান । আমার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই যে ভাব ; উহা বাস্তবিক আমাতে নাই ; অথচ আমি জাত এইরূপ একটা বোধ সর্বদাই আমাদের থাকে ; ইহাই প্রথম বিকার। আজ মায়ের কৃপায় বিপর্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং পূর্বোক্তরূপ প্রতীতি অর্থাৎ জন্মসংস্কার অনায়াসে বিলয়প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে । দেবীর বাহন সিংহের কর-প্রহারে প্রথম অস্ত্র প্রয়োগে কতকগুলি অসুরনিপাতের ইহাই রহস্য । (২) অস্তি—আমি অস্তিত্ববান অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পর আমি আছি, এইরূপ একটি বিশিষ্ট-সত্তার প্রতীতি হয় উহাই দ্বিতীয় বিকার । এইরূপ বিশিষ্ট সত্তাবোধও বিপর্যয়জ্ঞানের ফল ! বাস্তবিক আমার সত্তা নিত্য ও নির্বিশেষ । তাহাতে

জন্মাদি কোন ভাবেরই অন্বয় নাই। সাধক ইহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই, অথবা বুঝিয়াও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু আজ মায়ের কৃপায় বিপর্যয়-জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচন নিহত হওয়ায়, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সেই নিত্য সত্তাটির প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট সত্তাবোধরূপ বিকারও বিলুপ্ত হইতেছে। ইহাই মন্ত্রে **'দৈত্যানাস্যেন চাপরান্'** অর্থাৎ মুখব্যাদানপূর্বক সিংহকর্তৃক অসুরগুলির গ্রাসরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ছাত্রজীবনের রচিত একটি স্তোত্রের প্রথম শ্লোক সহৃদয় পাঠকবর্গকে শুনাইবার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না; চপলতা মার্জনীয়।

অস্তীত্যস্মিন্ পদং যৎ পরমবুধগণৈস্তৎ-প্রযুক্তং তবৈব,
ভ্রান্তিস্বপ্নাবসানে ত্বয়ি হি বিলসিতং নিত্যসত্তাশ্রয়ত্বম্।
মায়ামোহৈর্নিকামং ন জগদিদসন্মন্যমানা বয়ং হি,
মাতঃ সর্বেশ্বরে নঃ কলিকলুষহরে তত্ত্ববোধং বিধেহি॥

মা, **'অস্তি'**—এই যে একটি পদের প্রয়োগ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা (অস্তিপদটি) পরম বুধগণ—পরমাত্মসাক্ষাৎকারী মনীষিবৃন্দ একমাত্র তোমাতেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন; (তুমি ছাড়া আর কোথাও 'অস্তি' শব্দটির প্রয়োগ করা যায় না) যেহেতু ভ্রান্তি-স্বপ্নের অবসানে দেখা যায়—যথার্থ সত্তাটি একমাত্র তোমাতেই বিলসিত রহিয়াছে; কিন্তু মা আমরা মায়ামোহবশতঃ এই জগৎকে 'অসৎ' অর্থাৎ সত্তাহীন বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারি না। অতএব হে সর্বেশ্বরে হে কলিকলুষহরে মা, আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর।

যথার্থই জীব বলিয়া, জগৎ বলিয়া পৃথক কোন সত্তাই নাই। একমাত্র মাতৃ-সত্তাই জগৎরূপে পরিচিত হইতেছে। ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই ত' জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইতেছে। কিন্তু এবার মা আমার স্বয়ং জীবোদ্ধার করিতে আবির্ভূতা, মা আমার জীবত্বের শৃঙ্খলগুলি স্বহস্তে ছেদন করিয়া দিতেছেন; সুতরাং আশা হয়—এবার জীব-জগৎ নিশ্চয়ই মাতৃ-সত্তা পাইয়া ধন্য হইবে।

(৩) বর্দ্ধতে—আমি বৃদ্ধি-বিশিষ্ট, দিন দিন আমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই তৃতীয় বিকার। আত্মস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞানতাই এইরূপ বিকার-প্রতীতির হেতু। বিপর্যয়-জ্ঞানেই উহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এবার মা স্বয়ং বিপর্যয়-জ্ঞানকেই বিনষ্ট করিয়াছেন; সুতরাং তদাশ্রিত বিকার অনায়াসেই বিলুপ্ত হইবে। মন্ত্রস্থ **'আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্'** অর্থাৎ অধরাক্রমণে অপর কতকগুলি অসুর নিহত হইয়াছিল, অংশটি-দ্বারা এই তৃতীয় বিকারের বিষয় বর্ণিত হইল। (৪) বিপরিণমতে—আমি পরিণামপ্রাপ্ত। আমি বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থিত, আর আমি উপচয়প্রাপ্ত হইব না। এইরূপ প্রতীতি চতুর্থ বিকার। বিপর্যয়জ্ঞান-বিনাশের সঙ্গে ইহাও বিলয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই সিংহকর্তৃক নখরাঘাতে অসংখ্য ধূম্রলোচন-সৈন্য নিপাতের রহস্য। (৫) অপক্ষীয়তে—আমি অপক্ষয়বিশিষ্ট, দিন দিন আমি শীর্ণ হইতেছি, এইরূপ প্রতীতি পঞ্চম বিকার; আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, এইরূপ অপক্ষয় প্রতীতি থাকে না। বিপর্যয়জ্ঞান-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রে **'তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্'** কথাটিতে এই অপক্ষয়রূপ বিকারের বিলয় সূচিত হইতেছে। (৬) নশ্যতি—আমি নশ্বর, আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, এইরূপ প্রতীতি ষষ্ঠ বিকার। বিপর্যয়জ্ঞানের বিলোপ হইলে—অমৃতময়ী মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করিলে, জীবের মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়; এই ষষ্ঠ বিকারও যে আমাতে নাই, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই, জীব মৃত্যুভয়রূপ অসুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয়। আজ দেবীর স্ববাহন জীব-সিংহ ধূম্রলোচনের অনুচরধ্বংরূপী বিকারকে বিনষ্ট করিয়া অসুর-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। কেশরকম্পনপূর্বক অসুরগুলির ভীতি উৎপাদন এবং উদর বিদারণপূর্বক রুধির পানের ইহাই তাৎপর্য।

বিপর্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, বিপর্যয়জ্ঞান জন্য আত্মার ষড়্‌ভাব বিকাররূপ অসুরসৈন্যক্ষয় হইতে আর বিলম্ব হয় না। তাই মন্ত্রে **'ক্ষণেন'** পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিংহকে এখানে মহাত্মা বলা হইয়াছে। জীব যতদিন আত্মার সন্ধান না পায়, ততদিনই তাহার মহত্ত্ব অন্তর্হিত থাকে। সে যে যথার্থই **'মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্'** ইহা তখন পর্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এইবার মাতৃকৃপায় ভ্রান্তি-স্বপ্নের অবসান হইয়াছে, পরমাত্মস্বরূপের সন্ধান মিলিয়াছে; সুতরাং আত্মমহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আসিয়াছে। তাই মন্ত্রে

সিংহের বিশেষণস্বরূপ **'মহাত্মনা'** পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, দেবীর বাহন না হইলে —আত্মসমর্পণযোগী না হইতে পারিলে, এত সহজে এবং এত শীঘ্র দুর্জয় অসুরকুল বিনষ্ট হয় না। আত্মসমর্পণকারী সাধকই যে দেবীর বাহন সিংহ, এ তত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্ ।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবী-কেশরিণা ততঃ ॥১৬॥
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥১৭॥

অনুবাদ। দেবীকর্তৃক ধূম্রলোচনের নিধন এবং দেবীর কেশরী কর্তৃক সমগ্র সৈন্যক্ষয়ের বিবরণ শ্রবণপূর্বক দৈত্যাধিপতি শুম্ভ অধর প্রকম্পিত করতঃ ক্রোধের সহিত মহাসুর চণ্ডমুণ্ডের প্রতি আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। বিপর্যয়জ্ঞান এবং তজ্জন্য ষড়্ভাববিকার তিরোহিত হইলে, অস্মিতার আশঙ্কা হয়— যাহাদিগকে লইয়া আমি আছি, তাহারা যদি এইরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তবে আর আমার অস্তিত্ব কোথায় ? তাই শুম্ভ আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে মায়ের সমীপে প্রেরণ করিল।

পূর্বে যে ছয়টি বিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা শুধু স্থূল দেহের কথা নহে। সাধক ভুলিও না, এই উত্তম চরিত্রে স্থূল দেহের কথা খুব কমই আছে। তবে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে স্থূল দেহকে পরিত্যাগ করিলে, জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারের সম্ভাবনা কোথায় ? তাহার উত্তরে বুঝিতে হইবে, স্থূল দেহে জন্মাদি যে বিকারগুলি দেখা যায়, উহার অনুভব সূক্ষ্ম দেহেই হইয়া থাকে অর্থাৎ আমি জাত, আমি বর্দ্ধিত, আমি শীর্ণ ইত্যাদিরূপ প্রতীতি সূক্ষ্ম দেহেই হয়। আবার সূক্ষ্ম দেহে যে ঐরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায়, কারণ-শরীরে তাহার বীজসমূহ অবস্থান করে। ষড়্ভাববিকারের সূক্ষ্মতম সংস্কারগুলি অব্যক্ত-ভাবে কারণ-শরীরে অবস্থান করে। সুতরাং কেবল স্থূলদেহ নয় সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহেও বিকারপ্রতীতির আশ্রয়, কিন্তু আত্মা মা আমার অবিকারী বস্তু।

এখন আমরা শুম্ভের বা অস্মিতার দিক্ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বই অস্মিতা। যাহা যথার্থ আমি, তাহা কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে স্বয়ং চিৎ। এই চিদ্‌বস্তুকে আমিরূপে না বুঝিয়া চিৎপ্রতিবিম্বকে যে আমিরূপে গ্রহণ করা হয়, উহার মূলে একটি বিপর্যয়জ্ঞান থাকে। উহাই অযথাভূতজ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়। ধূম্রলোচন বধে সেই বিপর্যয়জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইবার অস্মিতার বিলয় অবশ্যম্ভাবী ; এমন কেহ নাই যে, তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অস্মিতাও নিতান্ত সহজ বস্তু নহে—উহা বহু জন্ম, বহু যুগসঞ্চিত প্রতীতিবিশেষ ; সে সহজে বিলয়প্রাপ্ত হইতে চায় না। যেরূপ বিষধর সর্পের মস্তক চূর্ণিত হইলেও পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করিতে চেষ্টা করে, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

সে যাহা হউক, এইবার শুম্ভ স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিল — যদিও ধূম্রলোচন নিহত হইয়াছে, তথাপি এখনও চণ্ডমুণ্ড নামক প্রধান অসুরদ্বয় বিপুল বাহিনীসহ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারাই আমাকে প্রথমে এই নারীমূর্তির সংবাদ দিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকেই যুদ্ধার্থ প্রেরণ করা যাউক।

সাধক মনে রাখিও, বিপর্যয়প্রতীতি বিনষ্ট হইলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিনাশ হইতে আর বিলম্ব হয় না। যদিও এই সকল ঘটনা ক্ষণকাল মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাপি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া উপাখ্যানাকারে একজনকে বুঝাইয়া দিতে বহুপ্রয়াসের আবশ্যক হয়।

আর বাস্তবিক পক্ষে বিপর্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইবার পরেও পূর্ববেগবশতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কারগুলি কিছুদিন থাকিয়া যায় ! পুনঃ পুনঃ আত্মস্বরূপে স্থিতির অভ্যাস সুদৃঢ় ও বহুক্ষণস্থায়ী হইলেই উহা ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥১৮॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্ ॥১৯॥

তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥২০॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে ধূম্রলোচন বধঃ।

অনুবাদ। হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহুসংখ্যক সৈন্য পরিবৃত হইয়া সেখানে যাও এবং সত্বর সেই দেবীকে কেশাকর্ষণ কিংবা বন্ধনপূর্বক এখানে আনয়ন কর। আর যদি তাহার সহিত যুদ্ধে তোমাদের কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত অসুর সমবেত হইয়া অশেষ অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে তাহাকে নিধন করিবে। এইরূপে সেই দুষ্টা রমণীকে নিহত এবং সে সিংহটাকেও বিনিপাতিত করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে ; অথবা সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া এখানে লইয়া আসিবে।

ব্যাখ্যা। অস্মিতার প্রেরণাই শুম্ভের আদেশ। এইবার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়ই বহুসংখ্যক অনুচরসহ অম্বিকাকে আনয়ন করিতে যাইবে। সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে শুম্ভের আদেশ তিন প্রকার। কেশাকর্ষণ অথবা বন্ধন করিয়া দেবীকে আনয়নের চেষ্টা করিবে ; ইহা প্রথম আদেশ। যদি সংশয় উপস্থিত হয় অর্থাৎ কেশাকর্ষণপূর্বক আনয়ন করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে দেবী এবং তাহার বাহন সিংহ উভয়কেই নিহত করিবে ; ইহা দ্বিতীয় আদেশ। শুম্ভ আবার তৃতীয় আদেশ করিল—বন্ধন করিয়া আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে। এই ত্রিবিধ আদেশের মধ্যে, প্রথমে কল্পে দেবীর প্রতি শুম্ভের ক্রোধ, দ্বিতীয় কল্পে অনন্যোপায় হইলে নিধন, এবং তৃতীয় কল্পে দেবীকে আনয়ন-বিষয়ক তীব্র আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

অপরিণামিনী অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তি হইতে যদি সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব রূপ ঈশ্বরত্ব অপনীত হয়, তবেই সে হীনবল হইয়া পড়িবে, তখন তাহাকে আনয়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে ; হয়ত তখন ঈশ্বরত্ব অস্মিতার মধ্য দিয়াও সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে ; এই আশায়ই শুম্ভের পূর্বোক্তরূপ কেশাকর্ষণপূর্বক দেবীকে আনয়নের আদেশ। শুম্ভ নিজেই এইরূপ আদেশের সফলতা বিষয়ে সন্দিহান ; কারণ, বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরত্ব কখনও চিতিশক্তিকে ছাড়িয়া থাকে না। তাই হতাশ পক্ষে অগত্যা নিধনের আদেশ। চিতিশক্তি বা আত্মাকে নিহত করার তাৎপর্যই শেষতত্ত্বকে শূন্যরূপে নির্ণয় করা। বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম এই শূন্য-বাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাকথিত বৌদ্ধগণ আত্মাকেই বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইত। স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপদেশ কালক্রমে বিকৃত হইয়া এইরূপ বৈনাশিকবাদে পরিণত হইয়াছিল। আত্মার বিনাশসাধন করিয়া শূন্যতত্ত্বে উপনীত হওয়াই ইঁহাদের মুক্তি বা নির্বাণের অর্থ হইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু হায়! তাঁহারা জানিতেন না যে, আত্মা অশক্যপ্রতিষেধ। আত্মা কখনও আত্মহত্যা করিতে পারেন না। আত্মার নিধন করিয়াও যিনি থাকেন, তিনিই আত্মা-রূপে নিত্য রহিয়া যান। এস্থানে সংক্ষেপতঃ একটু বৌদ্ধমতের আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিটি বৌদ্ধগণের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রুতির বাস্তবিক অর্থ—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎ অর্থাৎ নামরূপাদি দ্বারা অব্যাকৃত ছিল। বৌদ্ধগণ কিন্তু ইহার অন্য প্রকার অর্থ করেন ; তাঁহারা বলেন— এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অসৎ অর্থাৎ অভাব বা শূন্যমাত্র। সুতরাং শূন্যই শেষ তত্ত্ব। উহাদের আর একটি কথা—ক্ষণিক-বিজ্ঞান। বাহ্যজগৎ বলিয়া কিছু নাই ; তবে জগৎরূপে যাহার প্রতীতি হয়, উহা আমাদের সংস্কার অর্থাৎ ক্ষণকালস্থায়ী বিজ্ঞান-মাত্র। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার, ধারাবিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। আমরা প্রতিক্ষণে যে রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছি, উহার প্রত্যেকটির সঙ্গেই একটি 'আমি আমি' ভাবের ধারা আছে। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি করি, ইত্যাদি বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষণস্থায়ী কতকগুলি আমির ধারা চলিয়াছে, উহাই ধারাবিজ্ঞান। ঐ ধারাবাহিক আমিগুলির তলদেশে একটা অখণ্ড আমিবিজ্ঞান আছে, যাহার উপরে উক্ত খণ্ড খণ্ড আমিগুলি ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে, থাকিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সেই যে আধারস্বরূপ বিজ্ঞান, উহাই আলয়-বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথমে যোগাদি উপায়ের দ্বারা ঐ ধারাবিজ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। পরে আলয় বিজ্ঞানকেও বিলয় করিয়া শূন্য অভাবরূপ পদার্থে উপনীত হইয়া উহাকেই নির্বাণ বা মুক্তির স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

আচার্য শঙ্কর নানাবিধ যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই পর্যন্ত বুঝিয়া লইব যে, বৌদ্ধগণ যাহাকে 'আমির' সম্পূর্ণ অভাব বলিয়াছেন, সেই অভাবটি প্রকাশ করিবার জন্যও একটি 'আমি' থাকিয়া যায়। অর্থাৎ 'আমি'র অভাব যে আছে, তাহা যিনি জানেন তিনিই আত্মা ; সুতরাং আত্মার নিধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে, এই বৌদ্ধমতের সহিতও আমাদের কিছুই বিরোধ নাই। যাহা কিছু বিরোধ প্রতীত হয়, উহা শুধু ভাষার অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের বিরোধ ; বস্তুসত্তা বিষয়ে কিছুই বিরোধ নাই। বৌদ্ধের ধারাবিজ্ঞান —আমাদের অহংকার, বৌদ্ধের আলয়-বিজ্ঞান—আমাদের অস্মিতা। আর ঈশ্বর-সঙ্কল্প-স্বরূপ বাহ্যজগৎ আছে, এইটুকু স্বীকার করিয়া জীব-ভোগ্য জগৎকে ক্ষণিকবিজ্ঞান বলিলেও ক্ষতি হয় না। তারপর শূন্যতত্ত্বের কথা। যথার্থই ত' নিরঞ্জনস্বরূপে কোনরূপ বিশিষ্টতা পাওয়া যায় না ; তাই বৌদ্ধগণ পূর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই শূন্য বা অভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চল সাধক, আবার প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই।

শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিবার সময় তৃতীয় কল্পে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাতে বেশ প্রতীতি হয়—অম্বিকাকে নিধন করা শুম্ভের অভিপ্রায় নহে, অঙ্কশায়িনী করাই একান্ত অভিলাষ ; অগত্যাপক্ষে নিধনই বাঞ্ছনীয়।

শুন, অস্মিতারও আবার কেহ প্রকাশক আছে, ইহা সে স্বীকার করিতে চায় না। যদি আত্মা নামে কিছু থাকে, তবে সে অস্মিতার প্রকাশ্যরূপে পরিচিত হউক ; ইহাই অস্মিতার অভিপ্রায়। উচ্চস্তরের সাধকগণ নিশ্চয়ই এ রহস্য সহজে অনুধাবন করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধিতত্ত্ব সম্যক্ উন্মেষিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল কথা প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে। তবে যাঁহারা আগ্রহের সহিত পূর্বোক্তরূপ সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবেন, খুব আশা করা যায়—তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবেন এবং তখন অস্মিতা ও আত্মার এই সকল রহস্য নখদর্পণবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতির সহিত এই সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। সকলে স্ব স্ব বিশিষ্টতা সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ইহার অনুশীলন করিতে পারিবেন ; এবং কিছুদিন করিলে, ইহার সার্থকতা স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। মনে রাখিতে হইবে—যতদিন অবিদ্যা বা বিপর্যয়-জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচন নিহত না হয়, ততদিন জীবত্বের শৃঙ্খল কিছুতেই মোচন হয় না, হইতে পারে না। আজ সত্যপ্রতিষ্ঠ সাধকগণ মায়ের কৃপায় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে, **'অবিদ্যানাশ'** যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

মায়ের চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানগণের বিপর্যয়-জ্ঞানরূপী অসুরকে মা হুঙ্কারমাত্রে ভস্ম করিয়া দিলেন। রুদ্রগ্রন্থিভেদের ইহাই বীজ। পূর্বে বলিয়াছি, জ্ঞানময় গ্রন্থির নামই রুদ্রগ্রন্থি। এই জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, এই আমিত্ব প্রতীতিরূপ জ্ঞান, এ সকলই একটিমাত্র বিপর্যয় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মস্বরূপ বিষয়ক অনভিজ্ঞতার উপরই এই অজ্ঞান নামক জ্ঞানরাশি অবস্থিত। এইবার মায়ের কৃপায় তাহা দূরীভূত হইল ; সুতরাং অজ্ঞানের কার্যরূপে অবশিষ্ট যাহারা আছে, তাহারাও এখন ক্রমে ক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

এস সাধক, আমরা 'জয় মা' বলিয়া অগ্রসর হই। দেখি, মা কিরূপে চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরকুলকে নিহত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। আমাদের মঙ্গলময়ী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণাম।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
ধূম্রলোচন বধ।

———○———

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ

চণ্ডমুণ্ড বধ

ঋষিরুবাচ।

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর শুম্ভের আদেশে চণ্ডমুণ্ডকে অগ্রগামী করিয়া চতুরঙ্গবল-পরিবেষ্টিত দৈত্যগণ উদ্যতায়ুধে (দেবীর উদ্দেশে) অভিযান করিল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতার অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সদলবলে চিতিশক্তির উদ্দেশে অভিধাবিত হইল। সাধক! তুমিও দেখ, ঠিক এমনই করিয়া তুমিও প্রবৃত্তির সাহায্যে মাকে আমার পরিগ্রহ করিতে চাও, নিবৃত্তির সাহায্যে বিষয়বিরতি পরিপুষ্ট করিয়া ঐ মাতৃমুখী প্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাও। কেবল ইহাই নহে, এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অসংখ্য ভাব, অসংখ্য কার্যপ্রণালী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। ইহাই সদলবলে চণ্ডমুণ্ডের অভিযান। এইবার ইহারাও বিনষ্ট হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি—প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিলয় করিয়া তবে মাতৃ-আবির্ভাব হইয়া থাকে।

চতুরঙ্গবলের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়, ইহারাই চতুরঙ্গবল। সূক্ষ্মদেহে যেরূপে উহাদের অবস্থান বুঝিয়া লইয়াছ, কারণদেহেও ঠিক সেইরূপ বুঝিয়া লও। কারণশরীরে অব্যক্তভাবে—বীজভাবে ক্লেশকর্মাদি থাকে বলিয়াই সূক্ষ্মদেহে উহারা অঙ্কুরিত হয়, এবং স্থূলদেহে ফলরূপে অভিব্যক্ত হয়। মায়ের কৃপায় স্থূল ও সূক্ষ্ম সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এইবার কারণশরীরস্থ অব্যক্ত বীজরূপী সংস্কারগুলির ক্ষয় হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই মা আমার চণ্ডমুণ্ডকে চতুরঙ্গ বলের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত করিলেন।

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥২॥

অনুবাদ। অনন্তর তাহারা সুবর্ণময় মহৎ হিমালয়-শিখরে সিংহোপরি অবস্থিত ঈষৎহাস্যমুখী দেবীকে দেখিতে পাইল।

ব্যাখ্যা। হিরণ্ময়-হিমালয়-শিখরে জীব-সিংহবাহিনী মা আমার স্মিতমুখী। যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া মা আমার শুম্ভবধের লীলা প্রকাশ করেন, সে শরীর হিরণ্ময়ই বটে। হিরণ্যগর্ভ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়াই ত' আত্মায় বা বিশুদ্ধ চিতিশক্তিতে নানাবিধ লীলাবিলাস প্রকটিত হয়। মা আমার ঈষদ্ধাসা। এত সৈন্যসজ্জা, সম্মুখে সমর-কোলাহল, দুর্দান্ত অসুর চণ্ডমুণ্ড সদলবলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত, তথাপি মা আমার ঈষদ্ধাসা। সত্য সত্যই সাধক, মায়ের এই হাস্যময়ী আনন্দময়ী মূর্তির অন্যথাভাব কোনকালে কোন অবস্থায়ই হয় না। পরিদৃশ্যমান জড়জগদাকারে আকারিত হইতে গিয়া, অনবরত দ্বন্দ্বের মধ্যে—সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অবস্থান করিয়াও মায়ের আমার আনন্দময় ভাবটির ব্যতিক্রম কখনই হয় না। যেরূপ শর্করাগঠিত রাক্ষসী-মূর্তিরও সর্বাবয়বই মধুর, সেইরূপ আনন্দঘনমূর্তি মায়ের আমার সর্বভাবেই আনন্দটি অক্ষুণ্ণ। রোগে—আনন্দ, শোকে—আনন্দ, প্রলয়ে—আনন্দ, আর্তনাদে—আনন্দ, এমনই আনন্দময়ী মা আমার!

আরে, সবই যে আনন্দ দ্বারা গঠিত! সাধক, কবে তুমি এই আনন্দময় সত্তার সন্ধান পাইয়া—মায়ের ঈষৎ-হাস্যময়ী মূর্তি দেখিয়া জীবন ধন্য করিবে? অম্বিকা সর্বমনোহরা হাস্যমুখী মা আমার সর্বত্র প্রতিভাত, কোথাও লুকাইয়া নাই। তাকাও একবার মায়ের দিকে! তোমার আমিত্ব, তোমার স্থূল দেহের প্রত্যেক পরমাণু পর্যন্ত আনন্দরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৩॥

অনুবাদ । তাঁহাকে (অম্বিকাকে) দেখিবামাত্র কতকগুলি অসুর ধনু এবং অসি ধারণপূর্বক দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল । অপর কতকগুলি অসুর তাঁহার সমীপস্থ হইল ।

ব্যাখ্যা । এই মন্ত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—অসুরসৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল । একদল সশস্ত্র, অন্যদল নিরস্ত্র । প্রবৃত্তির দল—অসি, চাপ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে, অর্থাৎ ধারণা ধ্যানাদির সাহায্যে আত্মাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং নিবৃত্তির দল নিরস্ত্র হইয়া অর্থাৎ সর্ববিধ বিষয় পরিগ্রহের পরিহারপূর্বক নেতি নেতি মুখে আত্মসমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে ।

মনে রাখিও সাধক, প্রবৃত্তির কার্য সাধনা এবং নিবৃত্তির কার্য বৈরাগ্য ; এই উভয়ের দ্বারা মায়ের সমীপস্থ হওয়া যায় মাত্র, ঠিক মাকে পাওয়া যায় না । কারণ, সাধনা এবং বৈরাগ্য, উভয়ই অন্তঃকরণের ধর্ম । মা আমার ইহারও অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিতা । এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই ঋষি আজ সরল ভাষায় বলিলেন — **'আদাতুং উদ্যমং চক্রুঃ'** এবং **'তৎসমীপগাঃ'** । প্রবৃত্তির দল মাকে ধরিতে উদ্যম করিল ; কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না । আর নিবৃত্তির দলও সমীপস্থ হইল মাত্র, ঠিক লাভ করিতে পারিল না । কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক ।

পাতঞ্জল এবং গীতা উভয়ই বলিয়াছেন— অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয় ; অর্থাৎ বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় । এই বৃত্তি নিরোধ এবং আত্মলাভ, ইহা একই কথা নহে । আত্মলাভ হইলে বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই আত্মলাভ হয় না । কারণ, বৃত্তি নিরোধের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই । আত্মা বুদ্ধির উপরে অবস্থিত । বৃত্তিনিরোধের ব্যাপার বড় জোর বুদ্ধি পর্যন্ত । আচ্ছা এখন দেখ, প্রবৃত্তির কার্য সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস আর নিবৃত্তির কার্য বৈরাগ্য । এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য মায়ের নিকটস্থ হইতে পারে ; সাধককে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, কিন্তু ঠিক আত্মলাভ করাইয়া দিতে পারে না । একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফল বড় বেশী কিছু নহে ; কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিক্ষিপ্ত শর যদি লক্ষ্যবিদ্ধই না করে, তবে উহা লক্ষ্যের দশ হাত দূর হইতে চলিয়া যাওয়ার যেরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, লক্ষ্যের খুব নিকটস্থ হইয়া চলিয়া যাওয়ায়ও ঠিক সেইরূপই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ।

উদ্দেশ্য—আত্মলাভ বা পরমসুখ-প্রাপ্তি । অভ্যাস ও বৈরাগ্য পরমসুখ আনিয়া দিতে পারে না, দুঃখের নিবৃত্তিমাত্র করিতে পারে । সাধনা এবং বৈরাগ্যের ফলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু পরমসুখের প্রাপ্তি হয় না । দুঃখের নিবৃত্তির জন্য যে সুখ, মাত্র তাহাই হয় । দুর্বহভার-বহনকারী ব্যক্তির মস্তক হইতে ভারটি নামাইয়া নিলে, তাহার দুঃখের নিবৃত্তিজন্য যে সুখ, তাহা লাভ হয় বটে ; কিন্তু পরমসুখ লাভ হয় না ।

জীবমাত্রেই এইরূপ সাধনা এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ কেবল আত্মার সমীপস্থ হয় ; তাই এখানেও দেখিতে পাই—চণ্ডমুণ্ডের সৈন্যদল **'সমীপগাঃ'** হইল, অর্থাৎ মায়ের নিকট পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল । এইবার মা অচিরাৎ ইহাদিগকে বিনাশ করিবেন, আত্মা মা যে আমার সর্ব-ভাবাতীতা ; সুতরাং সর্বভাবের সহিত সাধনাও বৈরাগ্যকে বিলয় করিয়া, তারপরে তিনি স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন । যাঁহারা যথার্থ সাধক, তাঁহারা চণ্ডীর এই অপূর্ব রহস্য অবগত হইয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন । আর যাঁহারা এই রহস্য অবগত হইয়া সাধনা এবং বৈরাগ্যকে একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করিবেন, তাঁহারা যে মহাভ্রান্ত এ বিষয়েও কোন সংশয় করা যায় না। মায়ের সমীপস্থ হইতে হইলে ঐ দুইটি ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মায়ের সমীপস্থ হইলে তারপর ত' মাতৃ-লাভ। যাঁহারা সমীপস্থই হইতে পারেন নাই তাঁহাদের পক্ষে মাতৃ-লাভের আশা সুদূর পরাহত । সুতরাং সাধনা এবং বৈরাগ্য যে নিষ্প্রয়োজনীয় এবাক্য ভ্রান্তিমূলক ।

———○———

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি ।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥৪॥

অনুবাদ । অনন্তর অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ করিলেন । তখন কোপবশতঃ তাঁহার বদনমণ্ডল মসীবর্ণ হইয়াছিল ।

ব্যাখ্যা । অম্বিকা মা আমার তখন শত্রুগণের প্রতি

আতিশয় কুপিত হইলেন। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং তদনুচরবর্গ যথার্থই শত্রু নহে কি ? মায়ের স্বকীয় স্বরূপটি প্রকাশের পক্ষে উহারাই যে অন্তরায় ! আপত্তি হইতে পারে—মায়ের আবার শত্রু মিত্র কি ? ইহার উত্তর পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে। মা আমার নিত্য নির্বিকারা, তাঁহাতে কোনরূপ ভাববিকার নাই, ইহা খুবই সত্য, তথাপি উপাধিকৃত এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে। যে যেরূপ ভাবটি নিয়া মায়ের সম্মুখে উপনীত হয়, মা আমার তাহার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রকটিত হন। চণ্ডমুণ্ড শত্রুভাবে উপস্থিত ; সুতরাং অবিকারা মাও শত্রুভাবাপন্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাই মন্ত্রে **'অরীন্ প্রতি'** কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

অসুরগণ মায়ের সমীপস্থ হইয়াছে ; সুতরাং উহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মার সন্নিহিত হওয়ামাত্র সর্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন,— 'চন্দ্র সূর্যাদিও সেখানে প্রকাশ পায় না। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অন্ন। স্বয়ং মৃত্যুও তাঁহার উপকরণ' ইত্যাদি। সর্বতোভেদী সর্বভাব-বিলয়কারী সে প্রকাশ। অসুরগণ জানে না যে, তাহাদের বাস্তবিক সত্তাই নাই ; এই যে ব্যবহারিক সত্তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও একমাত্র মায়ের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং মায়ের স্বরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরগণের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকার যদি আলোককে ধরিতে যায়, তবে অন্ধকারের যে দশা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি অসুরগণের সেই দশা উপস্থিত। এই যে স্বাভাবিক প্রলয়, এই যে সৎ-এর মধ্যে অসতের বিলয়, ইহারই পূর্বরূপ—মায়ের কোপ ; তাই ঋষি বলিলেন—**'কোপং চকার'**।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়— কোপ হইলে বদন রক্তবর্ণ হয় ; কিন্তু এখানে ঋষি বলিলেন— মায়ের বদনমণ্ডল কোপভরে মসীবর্ণ হইল। মা আমার অচিরে প্রলয়ঙ্করী ঘোরা তামসী মূর্তিতে প্রকটিত হইবেন, ইহা তাহারই পূর্বসূচনা। সাধারণতঃ ক্রোধ হইলে রজোগুণের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু এখানে রজোগুণের নহে, পরাপ্রকৃতির তমোগুণের অভিব্যক্তি হইতেছে ; তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, তাই মা আমার মসীবর্ণা। তমোগুণেই সর্বভাবের বিলয় সাধিত হয়। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়া আসিয়াছি— তমোগুণের চরম পরিণতি সর্ববৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ। এই নিরোধ এবং বিলয় একই কথা। সর্বভাবের সম্যক্ বিলয় হইলেই মা আমার বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বদন শব্দের অর্থ সম্মুখ-ভাগ। চিতিশক্তির যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহাই অতীব সুমনোহরা কেবলানন্দময়ী অম্বিকামূর্তি। মায়ের এই অম্বিকা মূর্তির সম্মুখভাগেই সর্বভাবের প্রলয় বিরাজ করে, পরবর্তীমন্ত্রে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

———o———

ভ্রূকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৫॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৬॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥৭॥

অনুবাদ। তখন তাঁহার (অম্বিকার) ভ্রূকুটিকুটিল ললাটফলক হইতে অতিদ্রুতবেগে করাল বদনা কালীমূর্তি বিনিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ মূর্তির হস্তে অসি পাশ এবং বিচিত্র খট্বাঙ্গ, উহার বিভূষণ নরশিরোমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, মাংস শুষ্ক (অর্থাৎ দেহ অতিশয় শীর্ণ) আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর, বদন অতিবিস্তৃত, বিলোল রসনা ঐ ভীষণ মূর্তিকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার রক্তবর্ণ নয়নত্রয় কোটরপ্রবিষ্ট, তিনি ভয়ঙ্কর গর্জনে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। অম্বিকার কোপ প্রলয়ঙ্কারী সংহারিণী শক্তিতে প্রকাশ পাইল। ললাটফলক অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হইতেই সর্বভাব বিলয়কারী মহাশক্তির আবির্ভাব হইল ! সাধকগণও বুঝিতে পারেন— আজ্ঞা-চক্রে সমাহিত হইলেই জগদ্ভাব সম্যক্ বিলুপ্ত হয় ; তাই মন্ত্রে 'ললাটফলকাৎ' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। মায়ের ললাটদেশ হইতে ভীষণা কালীমূর্তির আবির্ভাব হইল।

কালী—কালশক্তি। যে চৈতন্যময়ী মহাশক্তি কালবোধে প্রবুদ্ধা হন, তাঁহাকেই কালীশক্তি বলে। কালাতীত সত্তায় প্রবেশ করিতে হইলে, সকল সাধককেই এই কালীমূর্তির ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কালী মা আমার ভীষণা সংহারিণী মহতী শক্তি। এতদিন এ মূর্তি নেত্রপথে নিপতিত হয় নাই। বিশুদ্ধ

আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য একান্ত লালায়িত না হইলে, মায়ের এই সংহারিণী মূর্তি প্রত্যক্ষ হয় না। আজ সাধক জগদ্ভাবকে তুচ্ছ করিয়া, স্বকীয় বিশিষ্ট আমিত্বটিকে বলি দিয়া, আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার জন্য উদ্যত, আজ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়াও মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য একান্ত লালায়িত ; তাই মা আজ কৃপা করিয়া চণ্ডমুণ্ড বধের জন্য সর্বভাব বিলয়ের জন্য সংহারিণী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

চিতিশক্তি সর্বপ্রথমেই আপনাতে কাল ও দিক্ কল্পনা করেন, তারপর ক্রমে ক্রমে অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টি হয়। চিতিশক্তি হইতেই কাল শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাই অম্বিকার ললাট ফলক হইতে কালীর নিষ্ক্রামণ বর্ণিত হইয়াছে। এই কালই জগদাধার। সর্বভাবের কলন বা সংহরণ করেন বলিয়াই ইহার নাম কালী। কাল ও কালী অভিন্ন। সাধক! একবার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, তুমি এবং এই জগৎ কালের গর্ভেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, আবার কালের গর্ভেই অস্তমিত হইতেছ। সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতেই কলন বা সংহরণ-ক্রিয়া চলিতে থাকে ; তারপর একদিন উহার পরিসমাপ্তি হয়,—অর্থাৎ পূর্ণভাবে সংহরণ হইয়া যায়। সৃষ্ট বস্তুকে সংহার করিতে যতটুকু অপেক্ষা, যতটুকু সময়ের আবশ্যক হয়, সেইটুকুরই নাম স্থিতি। বাস্তবিক স্থিতি বলিয়া কিছুই নাই, সকলই মৃত্যুপুরাভিমুখে গতিশীল। স্থিতি একমাত্র সত্যস্বরূপিণী মাতে অবস্থিত। কাল ও গতি অভিন্ন। তত্ত্বতঃ কাল বস্তুটাই ভয়ঙ্কর গতিশীল [১] ; সুতরাং কালরূপ আধারে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই গতিশীল। যেমন দ্রুতগামী শকটারূঢ় ব্যক্তি শত চেষ্টায়ও স্বকীয় গতি নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, ঠিক সেইরূপ কালারূঢ় জীবজগৎ সহস্র চেষ্টায়ও স্বকীয় ধ্বংসাভিমুখী গতিকে ক্ষণকালের তরেও নিরুদ্ধ করিতে পারে না!

এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে —অগণিত জীব প্রতিমুহূর্তে দ্রুতবেগে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজ যে শিশু, কিছুদিন পরে সে যুবক। সকলেই শিশুর বয়োবৃদ্ধি দর্শন করে ; বাস্তবিক কিন্তু শিশুর আয়ু হ্রাস হইতেছে—ধ্বংসপুরাভিমুখে বেশী অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ বৃক্ষ, লতা, কীটপতঙ্গ, পশু পক্ষী, দেব দানব নর, গ্রহ উপগ্রহ এককথায় ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র পরমাণু পর্যন্ত সকলেই অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কি এক প্রবল আকর্ষণে এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা কে বলিবে ? দেখ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালীর করালবদনে প্রবেশ করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। দেখ—'**যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ**'। বহ্নির অভিমুখে ধাবিত পতঙ্গ-বৃন্দের ন্যায়, জীবসমূহ যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংহার-অনলে আত্মাহুতি দিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখ, তোমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু কালীর করাল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংহারিণী শক্তির অঙ্কে মিলাইয়া যাইবার জন্য কত ব্যস্ত! ওঃ! তুমি কি অবস্থায় আছ! দেখ, তোমার ঊর্ধ্বে নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র কালী —সর্বত্র মৃত্যু! কেবল ধ্বংস, কেবল বিনাশ! মৃত্যুরই কোলে তুমি অবস্থিত! কেবল তুমি নয়, তুমি যাহাদিগকে আমার বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছ, একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখ—তাহারাও তোমাকে ছাড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিবার জন্য কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই মরণাভিমুখী গতি প্রকট হইতেছে! যে শ্বাস প্রশ্বাসকে তোমরা জীবনের লক্ষণ বলিয়া মনে কর, ঐ উহাই ত' প্রতি পলে পলে তোমাদিগকে ধ্বংসপুরের অতিথি করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃত্যুই তোমাদের স্বরূপ, মরিবার জন্যই জন্মধারণ করিয়াছ! ওগো! তুমি কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ ? তুমি কি মায়ের এই সংহারিণী করাল—কালীমূর্তি দেখিতে পাও না ?

মাভৈঃ! কিন্তু ভয় নাই! মৃত্যু মৃত্যু করিয়া, ভয় করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিও না, পলাইবার উপায় নাই,

[১] পূর্বে বলা হইয়াছে—কাল স্থির অখণ্ড দণ্ডায়মান, আর এখানে বলা হইল—কাল ও গতি অভিন্ন। তত্ত্বদৃষ্টিতে এই উভয় বাক্যে কোন বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, ক্রিয়ার আধাররূপ কালকে লক্ষ্য করিয়া স্থির বলা যায় ; আর ক্রিয়ারূপ কালকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে চঞ্চল বলা যায়। মীমাংসাদর্শন '**ক্রিয়ৈব কালঃ**' এই মতাবলম্বী।

উহাকেই মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। যে দিকে অগ্রসর হইতেছ, সেই মৃত্যুরই কোলে মা বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে চেষ্টা কর, দেখিবে—তুমি কালাতীত সত্তার—অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ। যেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, কালী তোমায় সেইখানে আনিয়া দিবেন। তখন দেখিতে পাইবে, তুমি নিত্য, তুমি অমৃত, তুমি আনন্দময়। কিন্তু সে অন্য কথা।

তাই কালী—করালবদনা। মায়ের আমার মুখমণ্ডল অতি ভীষণ ; সমগ্র অনাত্মভাবকে মা গ্রাস করেন, তাই মা আমার করাল-বদনা। মা আমার ঘোরা—কৃষ্ণবর্ণা ; যে স্থানে সর্ববর্ণের সর্বভাবের অভাব হয়, যেখানে কোন কিছুই নাই, সে স্থান যে কত ঘোর, কত কৃষ্ণ, কত অপ্রকাশ, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব ? যদি কাহারও সেই ঘনকৃষ্ণা সংহারিণী মাতৃ-মূর্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তবে মাত্র তিনিই বুঝিতে পারিবেন—মা আমার কত ভীষণা ! আরে, যেখানে আমিটাকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—দেহ ইন্দ্রিয় ত' দূরের কথা, ইহা সেই স্থান ! ঘোর-ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যা-নিশীথে গভীর সুষুপ্তির ভিতর দিয়াও যদি সচেতন অর্থাৎ জাগিয়া থাকিতে পার—না, না, তাতেও যে প্রাণনক্রিয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে—উহাও থাকিবে না ; দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, কল্পনা নাই, কিছু নাই ! কিছু নাই ! আমিও নাই ! তারপর আস্তে আস্তে যদি আমি-বর্জিত আমিটির সন্ধান লইতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে, কালী কত ভীষণা। ভাষায় সে ভীষণতা ব্যক্ত হয় না। শুষ্কমাংসাতিভৈরবা অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ইত্যাদি যতই বল না কেন, সে ভীষণতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যাঁহারা চিত্রে অঙ্কিত কালীর ভীষণ মূর্তি দেখিয়া উহাকে প্রণাম করিতেও ভয় পাইয়া দ্বিভুজ মুরলীধর রাধিকারমণের শরণাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানেন না যে, মৃত্যুর পরপারে না গেলে, অর্থাৎ কালশক্তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, সে হৃদয়রঞ্জন শ্যামসুন্দর রূপের দর্শন হয় না। যিনি কালী, তিনিই যে কালাতীতস্বরূপে আনন্দময় শ্যামসুন্দর, ইহা তাঁহারা যেদিন বুঝিতে পারিবেন, সেদিন আর ঐ ভীতিভাব থাকিবে না। যাক্, এ সকল অবান্তর কথা।

মা আমার অসি পাশ এবং বিচিত্র-খট্বাঙ্গধারিণী। অসি—ছেদনকারক অস্ত্র। পাশ—আকর্ষণকারক অস্ত্র। খট্বাঙ্গ—চূর্ণকারক অস্ত্র। ছেদন, আকর্ষণ এবং চূর্ণকরণ, এই ত্রিবিধ প্রকারে সর্বভাব—অনাত্মভাব কালের করালবক্ত্রে বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে পারমার্থিক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া দৃশ্যবর্গের ব্যবহারিক অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, উহাদের নিকট হইতে সেই পারমার্থিক সত্তাকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করাই কালশক্তির প্রথম কার্য। মায়ের হস্তস্থিত অসিখানি উহারই প্রতিভূ। কল্পিত অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে, যে পারমার্থিক অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাকে আকর্ষণপূর্বক পরমাত্মসত্তায় মিলন করিয়া দেওয়া দ্বিতীয় কার্য। মায়ের হস্তস্থিত আকর্ষণকারী পাশ অস্ত্রের ইহাই রহস্য। অবশেষে যাবতীয় দৃশ্যভাবকে চূর্ণ অর্থাৎ বিলয় করিয়া দেওয়াই মায়ের তৃতীয় কার্য। কালীর হস্তস্থিত খট্বাঙ্গ নামক অস্ত্রটি এই বিলয়-কার্যের প্রতিভূস্বরূপ বুঝিয়া লইবে। মা এই তিন প্রকারেই অনাত্ম-ভাবের বিলয় সাধন করিয়া থাকেন, তাই মন্ত্রে মাকে **'অসিপাশিনী বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা'** বলা হইয়াছে।

নরমালাবিভূষণা। নরমালা—শব্দে নরমুণ্ড-মালা বুঝিতে হইবে। মা আমার পঞ্চাশনমুণ্ডমালিকা—পঞ্চাশটি নরমুণ্ড দ্বারা মালা গাঁথিয়া মা গলদেশে পরিধান করেন। পঞ্চশন্মুণ্ডমালা কি ? পঞ্চাশৎ বর্ণমালিকা। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ককারাদি চতুস্ত্রিংশদ্ ব্যঞ্জনবর্ণ, সর্বশুদ্ধ পঞ্চাশটি বর্ণ অক্ষর ; ইহাই মায়ের মুণ্ডমালা। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

এই যে জগৎ দেখিতে পাইতেছ, উহা কতকগুলি শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গে নাদতত্ত্বের ব্যাখ্যাবসরে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দই জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যেরূপ 'ঘট' বলিলে একটা নামমাত্র পাওয়া যায়, বাস্তবিক মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটের অপর কোনও সত্তা নাই, সেইরূপ এই জগৎ কতকগুলি নাম বা শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই উপনিষদে ঋষি প্রশান্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—**'বাচারম্ভনং নামধেয়ং বিকারং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'**। এ জগৎ **'বাচারম্ভন'**—বাক্যমাত্র। বাক্য বর্ণসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বর্ণগুলিই অসুর ; কারণ, ইহারাই

সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়া ঘট পটাদি অনাত্মভাব ফুটাইয়া তুলে। বর্ণসমূহ যতক্ষণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবের প্রকাশক থাকে, ততক্ষণই উহারা জীবিত, কিন্তু মা যখন সর্বগ্রাসিনী কালীমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন বা প্রকটিতা হন, তখন পূর্বোক্ত পঞ্চাশটি বর্ণ আর কোনরূপ বিশিষ্ট ভাব উৎপাদন করিতে পারে না ; মৃতবৎ হইয়া পড়ে। বিভিন্ন পদার্থের প্রতীতি করাইবার সামর্থ্যই বর্ণের বর্ণত্ব বা জীবিত ভাব। যখন ভাব বলিতে আর কিছু থাকে না, তখন বর্ণের বর্ণত্ব বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ ভাব উৎপাদন-সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং মৃতবৎ অবস্থান করে। উহাই প্রলয়ঙ্কারী মহাশক্তির গলদেশে মুণ্ডমালারূপে পরিশোভিত। উহারা ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজরূপে থাকিয়া যায় বলিয়াই মাতৃ-অঙ্গের বিভূষণরূপে অবস্থান করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হওয়ামাত্র সাধকগণের হৃদয়ে এ তত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশ পায়।

দ্বীপিচর্মপরিধানা—শার্দূলচর্মপরিহিতা। কালীমূর্তি সর্বদাই দিগ্‌বসনা উলঙ্গিনী। সংহারিণী শক্তির কোথাও কিছু আবরণ বা সঙ্কোচ নাই। এখানে কিন্তু দেখিতে পাই—মা আমার শার্দূলচর্ম পরিহিতা। এখনও চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি অসুর নিহত হয় নাই— অর্থাৎ এখনও কারণ-দেহস্থ সূক্ষ্মতম সংস্কারের বীজগুলি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাই ঐ সকল বৈচিত্র্যময় নানাভাবের বীজগুলি এখনও পর্যন্ত মাতৃ-অঙ্গে বিরাজ করিতেছে— উহাই ব্যাঘ্রচর্ম। কৃষ্ণ পীত রক্ত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণময় শার্দূলচর্মরূপ নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কারসমূহ এখনও পর্যন্ত মায়ের বসন বা আচ্ছাদনরূপে অবস্থান করিতেছে, তাই এখনও মা আমার চামুণ্ডামূর্তিতে আবির্ভূতা। আর যখন সর্বভাবের বিলয় হইয়া যাইবে, তখনই শ্যামা মা আমার উলঙ্গিনী মূর্তিতে প্রকটিতা হইবেন।

অনেক সাধক শার্দূল-চর্মাসনে উপবেশনপূর্বক সাধন-ভজনাদি করিয়া থাকেন। উহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি (তাড়িত শক্তির অপরিচালকতা প্রভৃতি) যাহাই থাকুক না কেন, উহা যে সূক্ষ্মতম সংস্কারসমূহের বাহ্যলক্ষণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ব্যাঘ্রচর্ম দর্শনমাত্রই নিজের নানা বিচিত্র কর্মসংস্কারগুলি মনে পড়িয়া যায় বলিয়াই, বোধ হয় পূর্বকালে উগ্রতপাঃ সাধকগণ উহার ব্যবহার করিতেন। যাক্ এসকল অপ্রাসঙ্গিক কথা।

শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। সর্ববিধ সংস্কার ক্ষয় করিবার পূর্বে মা আমার **'শুষ্কমাংসা'**—অস্থিচর্মাবশিষ্টা শীর্ণাই থাকেন। আরে, সমগ্র সংস্কার আহার করিলে, তবে না মায়ের অঙ্গ পুষ্ট হইবে। এখন মায়ের ঐরূপ ক্ষুধিত মূর্তিরই প্রয়োজন। প্রলয়ের পূর্বাবস্থার শক্তিকে বুভুক্ষিতই মনে হয়, সর্বভাবকে প্রলয়কবলিত করিবার জন্য উদ্যত হইলেই মায়ের আমার শীর্ণ ও ভীষণ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধক ! প্রলয়ঙ্করী শক্তি যথার্থই অতিভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। রক্তবীজবধের জন্য অচিরকাল মধ্যেই মায়ের ঐরূপ বিস্তারবদন ও বিলোলরসনার বিশেষ প্রায়োজন হইবে। আমরা যথাস্থানে এ রহস্য বুঝিতে পারিব।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। ক্রোধের উদ্দীপনাই প্রলয়ের হেতু, তাহারই বহির্লক্ষণ রক্তনয়ন এবং নাদ। বিশিষ্ট প্রকাশশক্তি বিলুপ্তপ্রায়, তাই নয়ন নিমগ্ন অর্থাৎ চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ; তদ্ব্যতীত মায়ের ভীষণ নাদ সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়াছে, আর বিশিষ্ট ভাবে এটা কি ওটা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এ সকলই প্রলয়ঙ্করী শক্তির স্বরূপ বর্ণনা।

সাধক মনে করিও না— জগদ্ভাব অর্থাৎ স্থূল নামরূপগুলির বিলয় করিতেই এইরূপ সংহারিণী শক্তির প্রায়োজন। একটু স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশ হইলেই স্থূল ভাবগুলি অতি সহজে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবগুলি—জীবত্বের সূক্ষ্মতম বীজগুলির বিলয় করিতে মাকে এইরূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হইতে হয়। এইরূপ প্রলয়ঙ্করী শক্তির আবির্ভাব না হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতির হেতুভূত সূক্ষ্মতম সংস্কারগুলির বিলয় হয় না। সর্বভাব যে কেন্দ্র হইতে বিকশিত হয়, সেই অব্যক্ত বীজময় কেন্দ্রটিকে বিলয় করিতে হইলে, মায়ের এইরূপ চামুণ্ডামূর্তিতে আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।

ওগো, যাহারা মায়ের এমন স্বরূপটি দেখিতে পাও নাই, বুঝিও—তাহাদের সংসার-গতি-নিবৃত্তির উপায় হয় নাই। সত্যই এ রূপ দেখা যায়— সত্যই প্রলঙ্করী শক্তির প্রকাশ হয়। মা মা বলিয়া কাঁদিলে, মায়ের বক্ষে আপন সত্তাটি মিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইলেই মা আমার

এইরূপে দেখা দিয়া জীবত্বের যাবতীয় সংস্কার বিলয় করিয়া দেন। সাধক ! তুমি কি বীর সন্তানের মত এই প্রলয়ঙ্করী কালীমূর্তি দেখিতে চাও ?

———○———

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্‌ ।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্‌বলম্‌ ॥৮॥

অনুবাদ। সেই কালী মহাসুরগণকে নিহত করিতে করিতে সুরারি-সৈন্যমধ্যে অভিপতিত হইলেন ; এবং অসুরবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। সংহারিণী-শক্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় আসুরিক ভাব অস্তমিত হইতে থাকে। সে কি অপূর্ব দৃশ্য ! একদিকে ভয়ঙ্করী ঘোরা কৃষ্ণা মূর্তির প্রকাশ, অন্যদিকে চিত্তগত ব্যক্ত অব্যক্ত ভাবসমূহের একে একে বিলয়। সাধকপ্রবর অর্জুনও একদিন এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মা এখানে অসুরসৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া যে সকল অসুরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন—উহারা চণ্ডমুণ্ডের সৈন্য অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অনুচর ! প্রবৃত্তির বিষয়াভিমুখী বেগের ফলে যে সকল সংস্কার আহিত হয়, তাহা পূর্বে মহিষাসুর বধের সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হইয়াছে। এখানে প্রবৃত্তি আত্মাভিমুখী এবং নিবৃত্তি বিষয়বিরতি সম্পাদনপূর্বক প্রবৃত্তির সহায়। এতদুভয়েরও বিভিন্ন কর্ম আছে। কর্ম থাকিলেই কর্তৃত্ব এবং কর্তব্যত্ব প্রভৃতির সংস্কার থাকে। যদিও ইহারা সূক্ষ্মে—উন্নত স্তরে, তথাপি ইহারাও অনাত্মভাবের পরিপোষক। বিন্দুমাত্র অনাত্মবোধ থাকিতে আত্মার যথার্থ স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয় না। তাই মা আমার, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হইয়া প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন ; এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অনুচররূপ অনাত্মসংস্কারগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিলেন।

———▪———

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্‌ ।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্‌ ॥৯॥

অনুবাদ। তিনি পার্শ্বরক্ষক মহামাত্র (মাহুত) গজারোহী যোদ্ধা এবং ঘণ্টা প্রভৃতি আভরণ সহিত হস্তীগুলিকে একহাতে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, চণ্ডমুণ্ড চতুরঙ্গ বলসহ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। হস্তী তাহার প্রথম অঙ্গ ? হস্তীর পার্শ্বরক্ষককে পার্ষ্ণিগ্রাহ এবং পরিচালক অর্থাৎ মাহুতকে অঙ্কুশগ্রাহী বলে। চামুণ্ডা মা আমার এই পার্ষ্ণিগ্রাহ, অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা স্বয়ং এবং ঘণ্টা প্রভৃতি আভরণসহ হস্তীসমূহকে এক হাতে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিচিত্র যুদ্ধ ! স্বয়ং সংহারিণী শক্তির সম্মুখে কে দাঁড়াইবে ! যাহা কিছু অনাত্ম-ভাবরূপে প্রকাশ পায়, সে সকলই প্রলয়-কবলিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে চিক্ষুরের চতুরঙ্গ সেনার ব্যাখ্যাবসরে বলা হইয়াছে, ক্লেশ কর্ম বিপাক এবং আশয়, ইহারাই চতুরঙ্গ। সে স্থানে সূক্ষ্মশরীরস্থ ক্লেশ কর্মাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর এখানে কারণ শরীরে যে ক্লেশাদির বীজ থাকে, তাহাকেই চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ বলা হইয়াছে।

হস্তী—ক্লেশস্থানীয়। কারণদেহে সুখ দুঃখ নামক ক্লেশের বীজ থাকে বলিয়াই সূক্ষ্মদেহে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্তৃক পরিচালিত ঐ সূক্ষ্ম ক্লেশ-বীজগুলি যে চেতনাকর্তৃক পরিচালিত, রক্ষিত এবং যে অধিষ্ঠান-চৈতন্যে উহা অবস্থিত, তাহারাই যথাক্রমে পার্ষ্ণিগ্রাহ, অঙ্কুশগ্রাহী এবং যোদ্ধা। যদিও চৈতন্যাংশে ঐরূপ কোন ভেদ নাই—থাকিতে পারে না, তথাপি ঐ সকল উপাধিবশে চৈতন্যও যেন বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই বিশিষ্টতানাশই অসুর বিলয়। প্রলয়ঙ্করী শক্তির কবলে উহারা অর্থাৎ এই বিশিষ্ট ভাবসমূহ যুগপৎ নিপতিত হইতেছে, তখন আর ক্লেশ বলিয়া কোনরূপ প্রত্যয় থাকে না। যথার্থ সে সংহারিণী কৃষ্ণামূর্তির প্রকাশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবরাশি মিলাইয়া যাইতে থাকে। সে অবস্থায় মনে হয়—ভাবগুলি যেন একখানা কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর মুখের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। কালীর তীব্র আর্কষণশক্তির প্রভাবে সূক্ষ্মতম সংস্কারের বীজগুলি অব্যক্তক্ষেত্রে যাইতেছে—এইটি বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে **'হস্তেন আদায়'** বলা হইয়াছে।

———○———

তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনাসহ ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥১০॥

অনুবাদ। সেইরূপ অশ্বসহ আরোহী, সারথিসহ রথ (এবং রথী) মুখে নিক্ষেপপূর্বক দন্তদ্বারা চর্বণ করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা। পূর্বমন্ত্রে হস্তীর কথা বলা হইয়াছে, এই মন্ত্রে অশ্ব এবং রথের বিষয় বলা হইল । অশ্ব ও রথ শব্দে যথাক্রমে কর্ম এবং কর্মাশয় বুঝায়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । যে চৈতন্য কর্ম এবং কর্মাশয়রূপে প্রকাশিত, তাহাই অশ্বরক্ষক ও রথচালক বা সারথি । এ সকলই মা আমার করালবক্ত্রে নিক্ষেপপূর্বক দন্তদ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্বণ করিতে লাগিলেন— অর্থাৎ কারণদেহস্থ অব্যক্ত বীজভাবাপন্ন কর্ম এবং কর্মাশয়কে প্রলয়কবলিত করিলেন ।

ভক্তপ্রবর অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন—**'অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ । ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সর্বে সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি । কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ'**॥ সেখানেও দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক বদনে স্বপক্ষ বিপক্ষ যোদ্ধৃবর্গের চর্বণ বর্ণিত হইয়াছে । সেখানেও অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান নিজের স্বরূপ বলিতে গিয়া **'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'** বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । গীতায় যিনি কাল, চণ্ডীতে তিনিই কালী । গীতায় স্থূল সংস্কারগুলির প্রলয়ের কথা আছে, দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে, আর এই তৃতীয় খণ্ডে—কারণ-শরীরগত সূক্ষ্মতম বীজরূপা সংস্কার-সমূহের প্রলয় বর্ণিত হইতেছে । সাধকগণ যেমন স্তরে স্তরে জ্ঞানের উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, সংস্কারগুলিও ঠিক তেমনি স্তরে স্তরে ভেদ হইয়া যায় । জ্ঞানের এই সকল উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার পক্ষে একমাত্র শরণাগত ভাবই সহজ ও সুনির্দিষ্ট পন্থা । সাধক যে পরিমাণে ভগবানের শরণে অর্থাৎ আশ্রয়ে আসিতে থাকে, সেই পরিমাণেই জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে । শরণাগত ভাবের পূর্ণতা আত্মজ্ঞানে । যখন আর আমি বলিতে কেহ থাকে না, অথচ একমাত্র আমিই থাকে তখনই শরণাগত ভাব পূর্ণ হয় । আবার একমাত্র আস্তিক্যবুদ্ধিই এই শরণাগত হওয়ার পক্ষে সর্বপ্রধান অবলম্বন । মানুষ যে পরিমাণে ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসবান্ অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইতে থাকে, শরণাগত ভাবটিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে । আমরা—দেবী-মাহাত্ম্যের পাঠকগণ সর্বথা শরণাগত হইবার জন্যই চেষ্টা করি ; তাই দেখিতে পাইতেছি, মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের অনাত্ম-সংস্কারসমূহকে —ভেদজ্ঞানের বীজগুলিকে স্বয়ংই ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতেছেন । অহো ধন্য আমরা !

———০———

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্ ।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১১॥

অনুবাদ । অনন্তর কাহারও কেশ, কাহারও বা গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন । কাহাকেও পদদ্বারা, কাহাকেও বা বক্ষোদ্বারা বিমর্দিত করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা । চণ্ড মুণ্ডের চতুরঙ্গ বলের তিনটি অঙ্গ হস্তী, অশ্ব এবং রথ শেষ হইয়াছে । এইবার অবশিষ্ট পদাতি-সৈন্যের ক্ষয় বর্ণিত হইতেছে । বিপাক অর্থাৎ কর্মের পরিণতিসমূহই পদাতি-সৈন্যস্থানীয় । কর্মাশয়ে সঞ্চিত কর্মবীজগুলিকে ইহারা ফলোন্মুখ অবস্থায় আনয়ন করে । সূক্ষ্মে ঐ বিপাকশক্তি থাকে বলিয়াই উহারা ফলোন্মুখ হইয়া স্থূলে আসিয়া জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপে প্রকাশ পায় । 'আমি অমুক জাতি, আমার এত বয়স, আমার এই সুখ-দুঃখ ভোগ' এ সকলই ঐ বিপাক-শক্তির কার্য ।

মা এখানে প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া উহাদিগকে 'কেশেষু জগ্রাহ'— কেশ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ শিরোদেশ পরিগ্রহ করিলেন । প্রলয়ঙ্করীর গ্রহণ বলিলেই প্রলয় করা বুঝা যায় । বিশেষ কথা এই যে সংস্কারের মস্তক গৃহীত হইলে আর কোন কালেই তাহাদের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা থাকে না । সাধারণতঃ সংস্কারবীজগুলি অব্যক্তক্ষেত্রে লুক্কায়িত থাকে, উপযুক্ত দেশকাল ও পাত্রসহযোগে ফুটিয়া উঠে ; তাই মা আজ সেই অব্যক্তক্ষেত্রকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।

সাধক ! যদিও মাতৃ-কৃপায় সঞ্চিত এবং আগামী

কর্মের অশ্লেষ এবং বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি তুমি জাতি আয়ু এবং ভোগরূপ ভেদ-প্রতীতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাও নাই। ক্ষণে ক্ষণে উহাদের নানারূপ বিকাশ দেখিতে পাও ; উহার কারণ, এখনও চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ বল নিহত হয় নাই। কিন্তু এবার মা তোমাকে সর্ববিধ ভেদজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবেন। তাই এত আয়োজন, এত ক্রূর অভিনয়, এত প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য। নানাভাবে অসুর ক্ষয় করিতে লাগিলেন—কাহারও গ্রীবা গ্রহণ, কাহাকে চরণে মর্দিত, কাহাকে বা বক্ষোদ্বারা নিপোথিত করিলেন। স্থূল কথা—প্রলয়-শক্তির প্রকাশে নানাজাতীয় সংস্কার নানাভাবে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সংস্কারসমূহের বিচিত্রতাবশতঃই প্রলয়েরও বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাই কেশগ্রহণ গ্রীবাগ্রহণ পদমর্দন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী তিনটি মন্ত্রেরও ইহাই রহস্য।

———○———

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিত্যান্যপি॥১২॥

অনুবাদ। অসুরগণ শ্রেষ্ঠ শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দেবী সেগুলিকে মুখে গ্রহণপূর্বক দন্তদ্বারা বিচূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। প্রলয়মুখে প্রবিষ্ট হইবার সময়েও পূর্বলব্ধ বেগবশতঃ অব্যক্ত বিপাকস্থানীয় পদাতি-সৈন্যসমূহ স্বকীয় বহির্মুখী শক্তি প্রয়োগ করিতে বিমুখ হয় না ; অসুরগণের অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগের ইহাই রহস্য। সাধকগণও ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন—তাঁহারা যতই জ্ঞান ও ভক্তির অনুশীলন করুন, যতই মাতৃ-স্বরূপে সমাহিত থাকুন ; বিপাকের ফলরূপ জাত্যায়ু-ভোগরূপ ত্রিবিধ প্রতীতি হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পান না। বিপাকের ঐ যে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ, উহাই অসুরের অস্ত্রাদি প্রয়োগ। কিন্তু এবার উহা ব্যর্থ হইবে— মা এবার স্বয়ং প্রলয়-মূর্তিতে প্রকটিতা। এখন এক একবার ঐরূপ জাত্যাদি বিষয়ক প্রতীতি ফুটিয়া উঠিবে, আর অমনি অদ্বয় আত্মসত্তা তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতেই উহারা ক্ষীণবল হইয়া পড়িবে।

দেখিতে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসিগণ—পরমহংসগণ এই জাতিপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য শিখাসূত্র প্রভৃতি জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ করেন এবং সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। আয়ুপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য শরীরের বয়সের কথা বলেন না। ভোগপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকেন। এ সকলই অতি উত্তম। সন্ন্যাসিগণ আমাদের নমস্য। কিন্তু এই সব বাহ্য উপায় অবলম্বন এবং অবর্ণনীয় কঠোরতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও কয়জন পরমহংস যে উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা জানি না। যেহেতু শিখাসূত্রাদি ত্যাগ এবং সকল জাতির অন্নগ্রহণ করিলেও অন্তরে অন্তরে 'আমি অমুক জাতি' এইরূপ একটা প্রতীতি থাকিয়া যায়। বয়সের বিষয় আলোচনা না করিলেও বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি জ্ঞান থাকিয়া যায়। আর ভোগ যে আছে, স্থূল দেহই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। একমাত্র অদ্বয় আত্মস্বরূপ প্রকটিত হইলেই ঐ সকল ভেদ প্রতীতি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যথা সহস্র চেষ্টায়ও উহা অপনীত হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে, জ্ঞানলাভের পরও ত 'জাত্যায়ুভোগ' থাকে, তবে আর মায়ের কালীমূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া অসুরগ্রাসের সার্থকতা কি হইল ? না, এরূপ আশঙ্কা করিও না। মা সত্য সত্যই উহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকেন, আত্মস্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। এইরূপে আত্মস্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হইবার পরও উহাদের অনুবৃত্তি হয়, উহাকে বাধিতানুবৃত্তি কহে। তখন উহারা থাকিয়াও না থাকারই মত হয়। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

———○———

বলিনাং তদ্‌বলং সর্বমসুরাণাং মহাত্মনা।
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥১৩॥

অনুবাদ। মা এইরূপে সেই বলবান্ মহাকায় অসুরসৈন্যগণের কতকগুলিকে মর্দিত, কতকগুলি ভক্ষিত এবং অপর কতকগুলি বিতাড়িত করিলেন।

ব্যাখ্যা। যাহারা মর্দিত এবং ভক্ষিত তাহারা আর কখনও প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু যাহারা বিতাড়িত, তাহারা আবার বাধিতানুবৃত্তিরূপেই প্রকাশ পাইবে। যে সকল বিপাক আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে একান্ত

বিরোধী, প্রলয়শক্তি তাহাদিগকে মর্দন ও ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু যাহারা বাস্তবিক অন্তরায় নহে, মা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন! এই মনে কর—জাতি, আয়ু এবং ভোগ; আত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলেই উহাদের প্রতীতি ফুটিয়া উঠে। শুধু আত্মস্বরূপে অবস্থান কালেই উহারা সম্যক্ বিতাড়িত থাকে। যখন মা আমার আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আর ইহাদের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কখনও ছিল বা থাকিবে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু ব্যুত্থিত হইলেই উহাদের আবির্ভাব হয়। সাধকের নিজের জাতি, আয়ু এবং ভোগবিষয়ক জ্ঞান বিশেষভাবে না থাকিলেও অপরের জাতি, আয়ু এবং ভোগবিষয়ক প্রতীতি থাকিয়া যায়। আবার যে প্রতীতি নিজের বেলা মোটেই নাই, তাহা অপরের সম্বন্ধে কিরূপে থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কাও হয়; সুতরাং উহাদের বাধিতানুবৃত্তি অর্থাৎ বিতাড়িত হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসারূপ ব্যাপারটি নিশ্চয়ই আছে, ইহা বলিতে হয়। এস্থলে পুনরায় সেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যদি জাতি, আয়ু এবং ভোগই রহিয়া গেল, তবে মা যে প্রলয়-মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া উহাদের নাশ করিলেন, তাহার আর সার্থকতা কি হইল? হাঁ সার্থকতা খুবই আছে। উহাদের পারমার্থিকত্ববুদ্ধির বিনাশ হয়। সাধারণ জীব যেরূপ জাতি, আয়ু এবং ভোগকে পরমার্থসত্তা-বিশিষ্ট একটা কিছু মনে করে, আত্মজ্ঞানীদের তাহা থাকে না; 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার আয়ু এত, আমার সুখ দুঃখ' ইত্যাদি প্রয়োগগুলি যে কেবল কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ-জন্য ব্যবহার, উহাদের যে বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, ইহা তাঁহারা এত বেশী বুঝিতে পারেন যে, সহস্রবার জাত্যাদির প্রতীতি জাগিলেও তাঁহাদের অদ্বৈত প্রতীতির বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না।

তবে একটা কথা মনে রাখিও—যাহাদের ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়কে স্বয়ং মা আসিয়া বিলয় করিয়া না দেন, তাহারা শত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, সহস্র উপদেশ শুনিয়াও উহাদের পারমার্থিকত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না। একমাত্র আত্মা মা আমার পরমার্থস্বরূপে আছেন, আর যে কিছুই নাই— এক অদ্বয় সত্তা ব্যতীত আর সকল সত্তাই যে ব্যবহারিক মাত্র, ইহা মা-ই কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সম্যক্ উপলব্ধি ব্যতীত কেবল শ্রবণ এবং অনুমান জন্য জ্ঞান কখনও অজ্ঞানকে সম্যক্ দূরীভূত করিতে পারে না।

———○———

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥১৪॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥১৫॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর খড়্গের দ্বারা নিহত, কতকিগুলি খট্বাঙ্গ দ্বারা প্রহৃত, অবশিষ্টগুলি দন্তাগ্রদ্বারা আহত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যেই সেই সৈন্যদল নিপাতিত হইল। ইহা দেখিতে পাইয়া মহাসুর চণ্ড অতি ভীষণা কালীর প্রতি অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। অসি খট্বাঙ্গ প্রভৃতির তাৎপর্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। অসুরসৈন্য অসংখ্য। প্রথমেই ধর—জাতি জ্ঞান হইতেই বর্ণ-ধর্ম, আশ্রম-ধর্ম ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বহু কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ক সংস্কার উপচিত হয়। আয়ুজ্ঞান হইতে বাল্য যৌবনাদি বিশেষ অবস্থা ও তত্তৎ কালোচিত কর্তব্য এবং অকর্তব্য জ্ঞানের সংস্কার উপচিত হয়। এইরূপ ভোগ-বিষয়ক বহুসংখ্যক অবান্তর সংস্কারও আহিত হয়। এই সকল একত্র হইয়াই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সৈন্যবল অগণিত হইয়া থাকে! কিন্তু যতই অসংখ্য হউক না কেন, **'ক্ষণেন তদ্বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্'**। ক্ষণকাল মধ্যেই অসুরবল নিপাতিত হইল। আরে, সাক্ষাৎ প্রলয়ঙ্করী শক্তির সম্মুখে উহাদের অস্তিত্ব আর কতক্ষণ থাকিবে। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যেই বিলয় হয়, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান এবং তজ্জন্য ভেদ-প্রতীতিরাশিও, সেইরূপ ক্ষণকালেই বিলয় হইয়া যায়! এইরূপে স্বকীয় সৈন্যবলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া স্বয়ং চণ্ড (প্রবৃত্তি) যুদ্ধার্থ মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

———○———

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ড ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥১৬॥

অনুবাদ। মহাসুর চণ্ড অতি ভীষণ শরবৃষ্টি করিয়া

ভীমনয়না দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এবং মুণ্ডও সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এইবার চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একজন ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অন্যজন সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শর—প্রণব। পুনঃ পুনঃ প্রণবাদি মন্ত্রের স্মরণে অথবা অনাহত কেন্দ্র হইতে স্বতঃ উত্থিত অতি মধুর প্রণবনাদে মুগ্ধ হইয়া চিত্তকে স্থির রাখিবার যে অদম্য প্রয়াস, তাহাই চণ্ডের শরবর্ষণ ! আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তির ইহাই ত' শেষ কার্য। আর মুণ্ডের বা নিবৃত্তির অস্ত্র হইতেছে চক্র। এই সংসার-চক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান নিবৃত্তির কার্য। এইরূপে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়েই স্ব স্ব শক্তি প্রয়োগে প্রলয়শক্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। সাধক বুঝিয়া রাখ—যতক্ষণ সাধনা আছে, উপাসনা আছে, প্রণবাদি মন্ত্র জপ আছে, ধ্যান ধারণা আছে, ততক্ষণ আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই। আবার যতক্ষণ বিষয়বৈরাগ্য অনাশক্তি প্রভৃতি বোধ আছে, ততক্ষণও মাতৃ-প্রকাশ হয় নাই। শরবৃষ্টি ও চক্রাচ্ছাদনের ইহাই তাৎপর্য। পরে ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইতেছে।

———○———

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥১৭॥

অনুবাদ। সেই চক্রসমূহ দেবীর মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, মেঘমণ্ডলাভ্যন্তরস্থিত অসংখ্য রবিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী শক্তির কবলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অধ্যবসায়গুলি বিলয় হইবার সময় অপূর্ব শোভা হইয়াছিল। উপমাস্বরূপ দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি অর্কবিম্ব এবং ঘনোদর এই দুইটি পদ প্রয়োগ করিলেন। ঘনোদরের সহিত কালীর মুখমণ্ডলের এবং রবিবিম্বের সহিত অস্ত্রসমূহের উপমা করা হইয়াছে। মহাসুর মুণ্ডকর্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্রসমূহ—ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, নিয়ম, অহিংসা, অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিবৃত্তির কার্যসমূহ যখন কালীর মুখমণ্ডলে অর্থাৎ প্রলয়গহ্বরে বিলয় হইতে থাকে, তখন বাস্তবিকই মনে হয়, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলের অভ্যন্তরে রবিবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল উজ্জ্বল ভাবগুলি মিলাইয়া যাইতেছে। যেগুলি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান, যাহারা সত্ত্বগুণের নির্মল প্রকাশ, যে সকল দেবোচিত শ্রেষ্ঠ গুণ, সেই সকল সমুজ্জ্বল গুণ প্রলয়ের দংষ্ট্রা-করাল ঘনকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন উহাদের স্বভাবিক উজ্জ্বলতা যেন আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি যেমন একটি একটি করিয়া ঘনকৃষ্ণ মেঘমণ্ডলের অভ্যন্তরে লুকাইয়া যায়, ঠিক তেমনই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিও যেন ধপ্ ধপ্ করিয়া একটি একটি করিয়া মিলাইয়া যাইতে থাকে।

এতদিন সাধক শুধু দেবোচিত গুণরাশি অর্জন করিয়া দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এইবার সেগুলিকেও বিলয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এবার সাধককে দেবত্বে নয়, ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হইবে ; তাই মা স্বয়ং প্রলয়-মূর্তিতে যাবতীয় সদগুণরাশিকেও বিলয় করিয়া লইতেছেন। বিন্দুমাত্র বিশিষ্টতা বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতেও মা ছাড়িবেন না। সৎ অসৎ নির্বিশেষে সর্বভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিয়া তবে মা আমার স্বকীয় অম্বিকারূপটি উদ্ভাসিত করিবেন। এ সকল তাহারই পূর্বায়োজন চলিতেছে। অপূর্ব এ তত্ত্ব !

———○———

ততোজহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥১৮॥

অনুবাদ। অনন্তর কালী অতিশয় ক্রোধবশতঃ ভৈরব গর্জন ও ভীষণ অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন, তৎকালে তদীয় করালবদনের মধ্যবর্তী দুর্দর্শ দন্তসমূহের প্রভা তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অট্টহাসি, ভৈরব গর্জন, দশনপংক্তির শুভ্রতা প্রভৃতি দ্বারা মায়ের আমার প্রলয়ঙ্করী কৃষ্ণামূর্তির ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত হয়। এ সকলই প্রলয়ের অবস্থা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নিধন করিতে হইলে মায়ের এমনই মূর্তির প্রয়োজন। আরে, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্‌ভাবগুলি মানুষ সহজেই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সাধন ভজন ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ সদ্‌ভাবগুলি কেহই সহজে ছাড়িতে চায় না ; তাই মা আমার সাক্ষাৎ করালবদনা কালীমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া

উহাদিগকে বলপূর্বক বিলয় করিয়া দেন। এ মূর্তি দেখিলে সাধক মাত্রেরই ভয় হয়। স্বয়ং অর্জুনও এই মূর্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—**'ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'** **'ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো'**। তাই ইতিপূর্বে বলিতেছিলাম—সাধকমাত্রকে এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তির ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। যে সকল সাধক শ্যামসুন্দর নব নটবর মূর্তির উপসনা করিয়া, করালবদনা কালীর নাম করিতেও ভয় কিংবা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, তাঁহারাও জানিয়া রাখুন— অর্জুনের ন্যায় তাঁহাদেরও নিকট ঐ শ্যামসুন্দরই একদিন **'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'** বলিয়া, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর কালমূর্তিতে প্রকাশিত হইবেন। আরে, লোকক্ষয় না হইলে যে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাবই হয় না, হইতে পারে না! লোক অর্থাৎ দৃশ্য বলিতে যতক্ষণ কিছু থাকে, ততক্ষণ সেই পরমরূপের প্রকাশ হইতেই পারে না। সুতরাং লোকক্ষয় একান্ত আবশ্যক। মায়ের অতিরোষ, অট্টহাসি, ভৈরব গর্জন, দশন বিস্তার, এ সকলই লোকক্ষয়ের সহায়ক।

সাধক! বড়ই মনোহর, বড়ই আনন্দদায়ক সে মূর্তির প্রকাশ! যতই ভয়দায়িনী হউক না কেন, এই মূর্তিই সাধকগণের একান্ত ইষ্ট। ইহাই ত' চণ্ডীর যথার্থ স্বরূপ। চণ্ডমুণ্ড বধের সময়েই মায়ের আমার বিশেষভাবে চণ্ডী-মূতিতে আবির্ভাবের প্রয়োজন। মা আমার চণ্ডী না হইলে—অতিরোষময়ী না হইলে, আমাদের এই মিথ্যার খেলাঘর যে কিছুতেই ভাঙে না। মা আমার দুইখানি ঘর ভাঙিয়াছেন, আর একখানি ভাঙিবার যোগাড় করিয়াছেন, ইহাই ত' মায়ের চণ্ডীমূর্তির সার্থকতা। ভয় কি রে! সিংহীর সন্তান কি মায়ের দংষ্ট্রা-করাল-মুখমণ্ডল দেখিয়া ভয় পায়? সে যে মা রে, হউক ভীষণা, হউক প্রলয়ঙ্করী, হউক সর্বনাশী, তথাপি সেই যে মা রে! মায়ের করাল দশন দেখিয়া ভয় হইলে, মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া, মায়েরই গলা জড়াইয়া ধরিয়া আত্মহারা হইবার জন্য আবার তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিতে হয়। যদিও সেখানে মাতাপুত্র সম্বন্ধ নাই, যদিও স্থূলদৃষ্টিতে সেখানে স্নেহ দয়া কিছুই নাই, তথাপি আমরা প্রলস্থান পর্যন্ত মাতৃ-ভাব হইতে বিচ্যুত হইব না। প্রথমে স্থূল মাটি জল বৃক্ষ লতা হইতে মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, আর এই সর্বভাবের প্রলয় পর্যন্ত মা বলিয়া ডাকিব। তারপর যখন আর আমি থাকিব না, যখন আর মা বলিয়া ডাকিব না, তখনই এই অভূতপূর্ব মাতৃ-লীলার সম্যক্ অবসান হইবে।

এখনও এদেশে বহুস্থানে কালীপূজা হয়। বাস্তবিক উহা কালীপূজা হয় না, মায়ের পূজা— শ্যামা পূজা হয়। কালীকে মা বলিলে আর কালী থাকে না, শ্যামা হইয়া যায়। আমরা যে কালীপূজা করিতেই পারি না। পূজা করিতে করিতে কালীকে মা বলিয়া ফেলি; পাছে আমার বড় সাধের পুত্রত্বটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই ভয়ে ভয়ে মা বলিয়া ফেলি। মাও আমার দ্বৈতপ্রতীতি বজায় রাখিবার জন্য মাতৃ-ভাবেই প্রকটিতা হন। বহুদিনের বহুজন্মের সংস্কার; তাই দ্বৈত-ভাবটি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না; কিন্তু এবার আর তাহা হইবে না; মা স্বয়ং চণ্ডী হইয়াছেন, সর্বত্বের বিলয় ও একত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং এবার আমরা নিশ্চয়ই মাতা-পুত্র-সম্বন্ধ-বিহীন, বাক্য মনের অগোচর পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইব। মা মা মা! এ কথা ভাবিতেও শরীর পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠে।

———○———

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ॥ ১৯॥

অনুবাদ। অতঃপর দেবী সক্রোধে মহা-অসি উত্তোলন করতঃ চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং কেশ গ্রহণপূর্বক সেই অসিদ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

ব্যাখ্যা। মন্ত্রস্থ **'মহাসিং হং'** অংশটিতে দুইটি পদ আছে। একটি মহাসিং এবং অন্যটি হং। হং এই পদটি ক্রোধসূচক অব্যয়। মহা অসি— দ্বৈতপ্রতীতিনাশক অস্ত্র, অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান। জীব এবং ব্রহ্মের অভিন্নতাপ্রতিপাদক মহাবাক্যই মহা অসি। **'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তৎ ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি'** বেদচতুষ্টয় প্রোক্ত এই মহাবাক্য-চতুষ্টয়-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানই যাবতীয় দ্বৈত-প্রতীতিবিনাশের হেতু। এই অদ্বয় জ্ঞানই চণ্ডীর ভাষায় দেবীর হস্তস্থিত মহা অসি।

'মহাসি' পদটির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। সামবেদোক্ত মহাবাক্য **'তত্ত্বমসি'** মন্ত্রটির একদেশেও

'অসি' এই পদটি পাওয়া যায়। অস্ ধাতুর অর্থ সত্তা। মহাসি শব্দে মহতী সত্তা বুঝায়। মহতী সত্তার অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ হইলেই ব্যবহারিক সত্তা বিলুপ্ত হয়। প্রলয়ঙ্করী মা আজ মহা অসি উত্তোলনপূর্বক সেই অসির আঘাতে চণ্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন ; অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাটির প্রকাশ করিয়া দ্বৈত-প্রতীতির মূলীভূত যে প্রবৃত্তি, তাহার বিলয় সাধন করিলেন। দ্বৈত জ্ঞানই যাবতীয় প্রবৃত্তির হেতু। অদ্বয় জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রবৃত্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না।

এই মন্ত্রে আর একটি কথা আছে—মা চণ্ডের কেশ গ্রহণ করিয়াছেন। কেশ গ্রহণের রহস্য পূর্বে ব্যাখ্যত হইয়াছে। ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব লাভের প্রলোভন-বিনাশই দেবীকর্তৃক চণ্ডের কেশ গ্রহণের তাৎপর্য। মা আমার ঈশ্বরত্ব লিপ্সাকেও বিদূরীত করিয়া তবে প্রবৃত্তিকে বিনাশ করিলেন। আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই, থাকিতেও পারে না। মা যখন মহা অসি উত্তোলন করেন অর্থাৎ একটি মাত্র মহতী সত্তা যখন বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে, তখন আর প্রাপ্য প্রাপক কিংবা সাধ্য সাধকরূপ কোন ভেদই লক্ষিত হয় না ; সুতরাং প্রবৃত্তির সমূলে উচ্ছেদ হইয়া যায়। সাধক ! ভাবিও না কেবল তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ বিচার করিয়াই দ্বৈত প্রতীতি বিলয়রূপ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। মা যতদিন 'অসি' উত্তোলন করিয়া এই চণ্ডাসুর নিধন না করেন ততদিন মোক্ষের আশা আশামাত্ররূপেই থাকিয়া যায়।

———○———

অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥২০॥

অনুবাদ । অনন্তর চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া, মুণ্ডও দেবীর প্রতি ধাবিত হইল, তখন দেবী ক্রোধবশতঃ তাহাকেও খড়্গাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ।

ব্যাখ্যা । প্রবৃত্তি-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয় । পূর্বে বলিয়াছি—ইহারা উভয়ই সহভাবী ; সুতরাং একের বিনাশে অপরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । ইহারাই প্রথমে অস্মিতার নিকট মায়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল ; কর্তব্য শেষ হইয়াছে—যে জন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা অবসিত হইয়াছে ; তাই উভয়েই আত্মবলি দিয়া মাতৃ-স্বরূপ প্রকাশে পূর্বায়োজন সম্পন্ন করিল ।

পূর্বে যে মহা অসির কথা বলা হইয়াছে, সেই অসির দ্বারাই মুণ্ডও নিপাতিত হইল । মহাবাক্যার্থজ্ঞানরূপ মহা অসিই সর্ববিধ ভেদপ্রতীতি বিলয়ের অক্ষুণ্ণ এবং অব্যর্থ উপায় ।

সাধক ! ভাবিয়া দেখ, তোমার বিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তিকে পরমাত্মাভিমুখী করিবার জন্য কতই চেষ্টা, কতই কঠোরতা, কতই সাধনা করিয়াছিলে, আবার বিষয়াসক্তি দূর হইল না বলিয়া, নিবৃত্তির প্রকাশ হইল না বলিয়া, কতই যোগ-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে, তোমার আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া কতই না দুঃখ অনুভব করিতে, কতই না নীরব-অশ্রু মাতৃ-চরণে উপহার দিতে । তারপর যখন, আশাপূর্ণ হইল—প্রবৃত্তি সর্বতোভাবে মাতৃ-মুখী হইল, নিবৃত্তি যথার্থই বিষয়-বিরতি আনিয়া উপস্থিত করিল, তুমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার উপক্রম করিলে, অমনি মা আমার কালীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, তোমার অতিপ্রিয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে — তোমার সাধনা এবং বৈরাগ্যকেও গ্রাস করিয়া ফেলিলেন । সাধক ! আপনাকে ধন্য মনে কর । এতদিনের সাধনা, এতদিনের ত্যাগ বৈরাগ্য এক মুহূর্তমধ্যে মা করালবদনে গ্রাস করিলেন বলিয়া দুঃখ করিবে কি ? না না, তুমি যে চণ্ডী-তত্ত্বের সাধক ! তুমি যে জীবত্ব-হননেচ্ছু সিংহ ! তুমি যে অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়াসী ! তুমি দুঃখিত হইবে কেন ? জয় মা বলিয়া, জয় গুরু বলিয়া অগ্রসর হও । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি গেল— এখন যাহা বাকী আছে, তাহাও মায়ের মুখের কাছে ধর । মা আমার চামুণ্ডামূর্তিতে তোমার সর্বত্বকে গ্রাস করিয়া অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত করিয়া দিবেন । এই জন্যই ত' প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছি— চণ্ডীতত্ত্ব অতিশয় গহন । উপনিষদ্ও বলেন— **'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'** । যথার্থই এ সকল তত্ত্ব গহন নয় কি ?

———○———

হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্ ।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্।।২১॥

অনুবাদ । চণ্ড মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ার্ত হইয়া পলায়ন করিল ।

ব্যাখ্যা । প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অধিকাংশ অনুচরবর্গ পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে । যাহারা অবশিষ্ট ছিল, প্রলয়ঙ্করী শক্তির আবির্ভাবে তাহারা ভীতচিত্তে পলায়ন করিল । বাধিতানুবৃত্তিরূপে পুনরায় যাহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাদিগকে মন্ত্রে পলায়নকারী সৈন্যদল বলা হইয়াছে । খুলিয়া বলিতেছি—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিনাশ হইবার পরও সাধকগণ জগতে স্থূলদেহে অবস্থান করেন । তাঁহাদের আহার নিদ্রাদি কিংবা লোক-শিক্ষাদি কার্যে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রনিন্দিত কার্যে নিবৃত্তি দেখা যায় । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি থাকিলেই তাহাদের অনুচরবৃন্দ কতক কতক থাকিবেই । এইরূপে যাহারা পুনরাবর্তন করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে **'দিশো ভেজে ভয়াতুরম্'** কথাটি বলা হইয়াছে । আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিনষ্ট প্রবৃত্তি নিবৃত্তির এবং তদীয় কতিপয় অনুচরের যদি পুনরাবর্তনই হয়, তবে আর উহাদের বিলয় হইল কই ? সত্য, পূর্বেও ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে । যদিও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যবহার থাকে, তথাপি উহাদের পারমার্থিকত্ব বুদ্ধি বিলয়প্রাপ্ত হয়, শুধু যে মুহূর্তে সাধক আত্মস্থ হন, মাত্র সেই মুহূর্তেই ঐ ব্যবহার পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় । আসল কথা এই যে, 'আত্মাতিরিক্ত আর কোন কিছুরই সত্তা নাই', এই জ্ঞানে উপনীত হইবার জন্যই যত কিছু আয়োজন, যত কিছু যুদ্ধবিগ্রহ । ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত অর্থাৎ সম্যক্ অনুভূত হইবার পরও অনাত্ম-প্রতীতি পুনরাবর্তিত হয় । উহা অসুরভাব নহে, যেহেতু সর্পের খোলসের মত উহারা আর কখনও দংশনাদি করিতে পারে না । তবে ইহা স্থির যে, যখন কোনও আত্মজ্ঞ পুরুষেরও জগদ্ব্যবহার হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি সে সময় আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত । তবে, এই যে বিচ্যুতি, ইহাতে তাহার কিছুই হানি হয় না ; যেহেতু তাঁহার অনাত্মজ্ঞান বা অজ্ঞান সম্যক্ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ।

———○———

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেবচ ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২২॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৩॥

অনুবাদ । কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার সমীপে আগমনপূর্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্য সহকারে বলিলেন—এই যুদ্ধযজ্ঞে চণ্ডমুণ্ড নামক মহাপশুদ্বয় তোমাকে উপহার দিলাম । শুম্ভ নিশুম্ভকে তুমি স্বয়ংই হনন করিবে ।

ব্যাখ্যা । কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক লইয়া চণ্ডিকা-চরণে উপহার দিলেন । সাধক ভুলিওনা — পূর্বে যাহাকে কৌশিকী বলিয়া বুঝিয়াছ, তিনিই অম্বিকারূপে হিমালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন । তাঁহারই ক্রোধ মূর্তিমান্ প্রলয়রূপে— কালীশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া চণ্ড মুণ্ডের মস্তক উপহার দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে । অম্বিকা মা আমার এখানে অতি কোপনা, তাই চণ্ডিকা নামে অভিহিতা । এই চণ্ডিকাই দেবী-মাহাত্ম্যের প্রতিপাদ্য বস্তু । পরমাত্ম-স্বরূপের প্রকাশ হইলে সর্বভাবের বিলয় অবশ্যম্ভাবী । সেই বিলয়ই মায়ের ক্রোধের ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যে শক্তি সেই সর্বভাবের বিলয় করিয়া থাকেন, তিনিই কালী । এই যে এতবড় কাণ্ডখানা—এত অসুর নিধন, এত বড় ভীষণ যুদ্ধ, এ সকল ব্যাপারেও আত্মা মা আমার নিত্য নির্বিকারা নিত্যানন্দময়ী চিরহাস্যময়ী । সেখানে কিন্তু কোনওরূপ বিকারই নাই ; অথচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান হইয়া, এই অসুরকুলের যুদ্ধ ও ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে ।

সাধকমাত্রেরই এইরূপ হয় । আত্মস্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হইবার পূর্বেই আত্মশক্তি, সংহারিণীমূর্তিতে আবির্ভূত হন ; এবং স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়গুলি সম্যক্ বিদূরিত করিয়া দেন । বাকি থাকে একমাত্র অস্মিতা মমতা, ইহারা আত্মপ্রতিবিম্ব অর্থাৎ চিদাভাসমাত্র ; উহারা বিম্বেই মিলাইয়া যায় । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— কালী অম্বিকাকে বলিলেন, **'যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি'** । আভাস বা প্রতিবিম্ব একটা কিছু আশ্রয় অর্থাৎ বিশিষ্টতা না পাইলে প্রকাশ পাইতেই পারে না । মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্থূল দেহ কিংবা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি

কোনও কিছুর আশ্রয় না পাইলে আর চিদাভাস বলিয়া কিছুই থাকে না। যেমন শূন্যে কোন ছায়া পতিত হয় না, ঠিক সেইরূপ কোন আশ্রয় না পাইলে চিৎ-এর প্রতিবিম্ব থাকে না, একমাত্র চিৎই থাকে ; তাই স্বয়ং চিতিশক্তিকর্তৃকই চিৎ প্রতিবিম্ব স্বরূপ শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আর একটি কথা আছে—কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক চণ্ডিকাচরণে উপহার দিলেন। দেহহীন মৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির উত্তমাঙ্গটি অম্বিকাচরণে রহিয়া গেল। উহারা থাকিবে বটে, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানের হেতু হইবে না। পূর্বে ইহারা অদ্বৈত প্রতীতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিল, তাই অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু এখন ইহারা দেহহীন অর্থাৎ পৃথক্ সত্তাবিহীন মৃত মুণ্ডমাত্র। সাধক, বুঝিয়া রাখিও,—পূর্বে যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বাধিতানুবৃত্তির বিষয় বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই এই মন্ত্রের ঐ মুণ্ডোপহার কথাটি দ্বারা বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আর শেষ কথা— আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের অনুভবও এইরূপই বটে। আরও একটু রহস্য আছে—মুণ্ডদ্বয় মাতৃ-চরণে উপহৃত। মাতৃ-লাভের পর যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খোলসমাত্র থাকে, তাহারা যথার্থই মাতৃ-চরণস্থিত উপহার। মাতৃ-লাভের পর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির যত কিছু কার্য হয়, সে সকলই মাতৃ-ইচ্ছার অনুবর্তিরূপে নিষ্পন্ন হয় ; **'অহং কর্তা, মম কর্তব্যম্'** এরূপ প্রতীতির একেবারেই বিলোপ হইয়া যায়।

———○———

ঋষিরুবাচ

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥২৪॥
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি ॥২৫॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ড বধঃ।

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন— অতঃপর সেই চণ্ডমুণ্ড (নিহত অবস্থায় উপহার রূপে) আনীত হইয়াছে দেখিয়া, কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী ললিত মধুর বাক্যে কালীকে বলিলেন 'যেহেতু তুমি চণ্ডমুণ্ডকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছ, সেই হেতু— হে দেবি ! অদ্য হইতে তুমি লোক মধ্যে চামুণ্ডা নামে আখ্যাত হইবে।'

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে চণ্ডমুণ্ড বধ।

ব্যাখ্যা। প্রলঙ্করী শক্তিকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত থাকিবার জন্যই অম্বিকার এইরূপ বরদান। চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়াই উহার নাম চণ্ডমুণ্ডা বা চামুণ্ডা। চণ্ডমুণ্ড শব্দের উত্তর হননার্থবোধক আ ধাতু হইতে চামুণ্ডা নিষ্পন্ন হয়। পৃষোদরাদি সূত্র অনুসারে চণ্ডমুণ্ড শব্দটি চামুণ্ডারূপে পরিণত হয়। সে যাহা হউক, চণ্ডিকাদেবীর বরপ্রভাবে এই চামুণ্ডারূপিণী প্রলয়শক্তি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিলয় করিবার জন্য চিরকাল প্রকট রহিয়াছেন এবং থাকিবেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী মহানবমীর সন্ধিক্ষণে ইহার বিশিষ্ট পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দেখ সাধক ! জগৎময় চামুণ্ডার লীলা ! জগৎময় যে শোক দুঃখ হাহাকার দেখিতে পাও, সে সকলই এই চামুণ্ডার তাণ্ডব লীলা। যদি সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা এই প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডার করালকবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও, যদি মরণ-ভয় পরিত্রাণ লাভ করিয়া অভয় অমৃতের কোলে আশ্রয় লইতে চাও, যদি মরণ-কোলাহলপূর্ণ এই মর্ত্যধামে থাকিয়া অমৃতের শান্তি-আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে চাও, তবে এই চামুণ্ডা শক্তির পূজা কর—জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনরূপ মহা-সন্ধিক্ষণে এই সংসার-মহাশ্মশানে স্বয়ং শবাসনে উপবিষ্ট হও, তাহার পর বিরাট্ মরণের ভিতর যে অস্তিত্বের সন্ধানটুকু পাওয়া যায়, তাহারই উপর তোমার ঐ আমিটিকে নগ্নমূর্তিতে সংস্থাপিত কর, অবশেষে মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আদ্যাবীজ সহকারে প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কর। এইরূপ করিতে পারিলেই চামুণ্ডার পূজা হইবে। যাহারা জীবন্তে মরিতে না পারে তাহারা চামুণ্ডার পূজা করিতে সমর্থ হয় না, যাহারা চামুণ্ডার পূজায় অক্ষম, তাহাদের প্রতি চামুণ্ডার প্রসন্নতাও দুর্লভ ; চামুণ্ডার প্রসন্নতা লাভ না হইলে, করাল মৃত্যুর ছায়া অপসৃত হয় না। যাহারা চামুণ্ডাকে চিনিয়াছে, যাহারা চামুণ্ডাকে আত্মশক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে, যাহারা উহার করাল গ্রাসকে স্নেহময় মাতৃ-অঙ্ক বলিয়া অনুভব

করিয়াছে, কেবল তাহারাই ইহার আধিপত্য হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন আনন্দময় আত্মস্বরূপে উপনীত হইতে পারে।

ওগো ! দেখ, জগতের আনন্দভাণ্ডার লুটিয়া খাইতেছে—এই চামুণ্ডা। জীবের হৃদয় রক্ত শোষণ করিতেছে—এই চামুণ্ডা। মনুষ্যের যাবতীয় উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায় ধ্বংস করিয়া দেয়—এই চামুণ্ডা। পূর্বে বলিয়াছি—এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ আনন্দ। আনন্দই জীব-জগতের যথার্থ স্বরূপ ; তথাপি জীববৃন্দ আনন্দের অভাব বোধ করিয়া আনন্দের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, ইহার একমাত্র কারণ ঐ চামুণ্ডা—ঐ মৃত্যুর করাল গ্রাস। পাছে আমার আমিটি হারাইয়া যায়, এই ভয়ে সঙ্কুচিত জীব প্রাণ খুলিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না ; স্বাধীনভাবে মুক্তপ্রাণে আনন্দময়ী মায়ের আমার অক্ষয় আনন্দভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে পারে না। এই চামুণ্ডা—এই মৃত্যু ভীতি সকল আনন্দের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু তোমরা সাধক, তোমরা মায়ের বীর সন্তান ; তোমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় পলায়ন করিও না, মৃত্যুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, ফিরিয়া দাঁড়াও, মা মা বলিয়া বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হও, মা মা বলিয়া মৃত্যুরই চরণে প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি স্বেচ্ছায় অর্পণ কর, জয় মা বলিয়া পূর্ণ সাহসে পূর্ণ উদ্যমে ঐ প্রলয়ঙ্করী কালীশক্তির অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়। দেখিবে—মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই ; যে মৃত্যুকে পিশাচী শয়তানী বলিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই মৃত্যুই মঙ্গলময়ী, স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্তিরূপে তোমাকে বক্ষে ধরিয়া অমরত্বে উপনীত করিয়া দিয়াছে ; তুমি অমর হইয়াছ।

কেবল সাধনা জগতে নয়, যাহারা মৃত্যুভয়ে একান্ত ভীত, ব্যবহারিক জগতেও তাহাদের দ্বারা কোন বিশেষ কার্য সম্পন্ন হইবার আশা নাই। কিন্তু সে অন্যকথা—

এস সাধক ! আমরা 'কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপ হারিণি' বলিয়া মায়ের চরণে প্রণত হই। যাঁহার কৃপায় আমাদের বহু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-রূপ মহাসুরদ্বয় বিলয় প্রাপ্ত হইল, তাঁহারই চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিয়া মায়ের বিচিত্র লীলা—রক্ত-বীজ বধ দর্শন করি। আমাদের মস্তকে মায়ের মঙ্গল আশীষ বর্ষিত হউক !

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায়
চণ্ডমুণ্ড বধ সমাপ্ত।

———o———

রুদ্রগ্রন্থিভেদ

রক্তবীজ বধ

ঋষিরুবাচ

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে ।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥১॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্ ।
উদ্‌যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥২॥

অনুবাদ । ঋষি বলিলেন— চণ্ডমুণ্ড নিপাতিত এবং বহুসংখ্যক সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, অসুরেশ্বর প্রতাপশালী শুম্ভ কোপাবিষ্ট চিত্তে সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিলেন ।

ব্যাখ্যা । অনুচরবর্গের সহিত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিধন দর্শনে অস্মিতা কোপাবিষ্ট হইয়া ভীষণ যুদ্ধের উদ্যম করিল, দৈতকুলের যত সেনা ও সেনাপতি ছিল, সকলকেই যুদ্ধে যাইবার জন্য আদেশ করিল । দ্বৈতপ্রতীতির নাম দৈত্য, দ্বৈত প্রতীতি অসংখ্য ; সুতরাং দৈত্যও অসংখ্য । **'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি'**রূপ বিপর্যয়জ্ঞানই যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতির হেতু ; সুতরাং সর্বপ্রথমে বিপর্যয় জ্ঞানের বিনাশ আবশ্যক ; তাই এই উত্তম চরিত্রে সর্বপ্রথমেই বিপর্যয়জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচনের বধ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর দ্বৈতপ্রতীতির সর্বপ্রধান অবলম্বনস্বরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বা চণ্ডমুণ্ডেরও নিধন হইল । ইহা দেখিয়া অস্মিতা তাহার অবশিষ্ট সমগ্র অধ্যবসায় প্রয়োগ করিল ; ইহাই শুম্ভের ভীষণ রণসজ্জার রহস্য । সর্বভাব এইবার প্রলয়কবলিত হইবে ; তাই মন্ত্রে সর্বসৈন্যের যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে । এবার নিশুম্ভের সহিত শুম্ভকেও আত্মবলি দিতে হইবে । এই ভীষণ সমর-আয়োজন তাহারই পূর্বসূচনামাত্র । সাধক, মনে রাখিও— এ সকল মাতৃ-কৃপা বা মাতৃ-আকর্ষণ । স্মরণ কর গীতার বিশ্বরূপের সেই শ্লোকটি— **'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ । তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ'** । প্রদীপ্ত অগ্নির মনোহর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গবৃন্দ যেরূপ আত্মাহুতি প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে সমাকৃষ্ট দৈত্যগণ সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া পতঙ্গবৃত্তি সম্পাদন করিতেছে । সাধক ভাবিয়া দেখিও, —ইহা সাধনা দ্বারা হয় কি ? মায়ের কৃপা ব্যতীত এমন সুযোগ আসে কি ? মা যে আমার স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার স্নেহময় প্রবল আকর্ষণ না আসিলে, দ্বৈতপ্রতীতিসমূহ এক অদ্বয়সত্তায় আত্মহারা হইবার জন্য ধাবিত হয় কি ? তুমি মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত উদাসীন সাক্ষী পুরুষের মত বসিয়া রহিয়াছ ; আর মায়ের স্নেহময় আকর্ষণ তোমার যাবতীয় দ্বৈতভাবের বিলয় সাধন করিয়া তোমাকে পরমানন্দময় অদ্বৈতস্বরূপে উপনীত করিতেছে । একথা ভাবিতে গেলেও আনন্দে বিস্ময়ে উল্লাসে প্রাণের ভিতর কেমন করিতে থাকে ।

সাধক ! যতদিন মায়ের এই আকর্ষণ গণ্ডীর বাহিরে অবস্থান করিবে ততদিন অসুরভাবসমূহের স্বেচ্ছায় আত্মবলিরূপ মায়ের বিশিষ্ট কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে কি ?

———o———

অদ্য সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ ।
কম্বুনাং চতুরশীতি নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥৩॥
কোটীবীর্যাণি পঞ্চাশদসুরানাং কুলানি বৈ ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৪॥
কালকা দৌর্হৃতা মৌর্যাঃ কালকেয়া স্তথাসুরাঃ ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৫॥

অনুবাদ । আজ আমার আদেশে সমগ্র অসুর স্ব স্ব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া সত্বর নির্গত হউক । উদায়ুধবংশীয় ষড়শীতি, কম্বুবংশীয় চতুরশীতি, কোটিবীর্যকুলের পঞ্চাশৎ এবং ধূম্রবংশীয় শতসংখ্যক অসুর, আর কালক দৌর্হৃত মৌর্য ও কালকেয় নামক অসুর সম্প্রদায় স্ব স্ব সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থ শীঘ্র নির্গত হউক ।

ব্যাখ্যা । মহাসুর শুম্ভ ভীষণ সমরায়োজনের আদেশ

করিতে গিয়া যে সকল অসুরের নাম উল্লেখ করিল, তাহাতে আটটি অসুর সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। যথা উদায়ুধ, কম্বু, কোটিবীর্য, ধৌম্র, কালক, দৌর্হৃত, মৌর্য এবং কালকেয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই অষ্টসংখ্যক অসুর সম্প্রদায় অষ্টপাশরূপে পরিচিত হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে '**ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী, কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ**'। ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল এবং জাতি, এই আটটিকে অষ্টপাশ কহে। জীব এই অষ্টবিধ পাশদ্বারা আবদ্ধ। এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলেই জীব শিব হইয়া যায়। '**পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ**'। ইহাও তন্ত্রের বাক্য। এতদিনে জীব মায়ের কৃপায় শিবত্বে উপনীত হইতে চলিয়াছে। তাই শুম্ভ—অস্মিতা উহাদিগকেও—এই অষ্টপাশকেও মাতৃ-সমরে প্রেরণ করিল। এইগুলি বিনষ্ট হইলেই অস্মিতার বিশেষ আলম্বনগুলি অপসৃত হয়। ক্রমে আমরা সেই অপূর্ব রহস্যে উপস্থিত হইব । এস সাধক, এস্থলে আমরা অসুরগুলির একটু পরিচয় লইতে চেষ্টা করি।

১) উদায়ুধ—উদ্যত আয়ুধ যাহার। আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিতে ইহার নাম ঘৃণা। বাস্তবিকই ঘৃণা উদ্যত আয়ুধ। অপরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিতে গেলেই, আমিকে অর্থাৎ অহঙ্কারকে উদ্যত করিতে হয়। আমি— শুদ্ধ উন্নত। অপর— অশুদ্ধ হীন ; এইরূপ প্রতীতি হইতেই ঘৃণার আবির্ভাব হয় ; সুতরাং ঘৃণাকে উদায়ুধ অসুর বলা যায়। ইহার সংখ্যায় ষড়শীতি। জাগ্রতকালে চতুর্দশ করণকে আশ্রয় করিয়া জরায়ুজাদি চতুর্বিধ ভূতজাতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় ; সুতরাং জাগ্রতাবস্থায় ইহার ভেদ ষট্পঞ্চাশৎ। আবার স্বপ্নাবস্থায়ও অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত চতুর্বিধ ভূতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। সুতরাং স্বপ্নকালে ইহার ভেদ ষোড়শ সংখ্যক। আর পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি-প্রয়াসী অস্মিতার স্বকীয় বিভিন্ন স্ফুরণরূপী চতুর্দশ করণের প্রতি যে স্বাভাবিক একটু বিদ্বেষ বা ঘৃণাভাব, তাহার সংখ্যা চতুর্দশ। এইরূপে সমষ্টিতে ঘৃণা বা উদায়ুধ অসুরের ষড়শীতি প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় ; তাই মন্ত্রে '**ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ**' এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

২) কম্বু—শব্দের অর্থ শঙ্খ। ইহা জীবের দ্বিতীয় পাশ বা বন্ধন। লজ্জাই ইহার স্বরূপ। শঙ্খজাতীয় জলচর প্রাণীদিগের হস্তপদাদি অবয়বগুলি আবরণের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। কোনও রূপ একটু প্রতিকূল বেদনা আসিলেই, ইহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে। মনুষ্যের লজ্জাও ঠিক এইরূপ। কোনরূপ দুর্বলতা যাহাতে প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য সর্বদাই মনুষ্যকে সঙ্কোচ বা আত্মগোপন করিতে হয়। তাই লজ্জা জিনিষটা বুঝাইতে হইলে, এই কম্বুজাতীয় জীবের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ইহাও একপ্রকার পাশ বা বন্ধন। ভেদজ্ঞান হইতেই এই লজ্জা বা সঙ্কোচের আবির্ভাব হয়। সাধক লক্ষ্য করিও—পূর্বে যে '**লজ্জারূপেণ সংস্থিতা**' বলিয়া ইহাকে মাতৃরূপে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ এই ভেদজ্ঞানমূলক লজ্জা বা আত্মসঙ্কোচ, কম্বু-অসুররূপে আত্মবলি দিবার জন্য মাতৃ-সমীপে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহার সংখ্যা চতুরশীতি। চতুর্দশ করণকে আশ্রয় করিয়া ষাট্‌কৌশিক দেহেই ইহার অভিব্যক্তি হয়। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া চতুরশীতি সংখ্যা হয়। এইরূপে লজ্জার ভেদ চতুরশীতি প্রকার হইয়া থাকে। তাই শুম্ভের আদেশবাক্যে '**কম্বুনাং চতুরশীতি**' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩) কোটীবীর্য—কোটী অর্থাৎ অপরিমেয় বীর্য যাহার। ইহাই জীবের ভয় নামক তৃতীয় পাশ। ভয় যথার্থই কোটীবীর্য অর্থাৎ অমিতপরাক্রম। স্বকীয় অস্তিত্ব নাশের ভয় মানুষকে প্রাণ খুলিয়া জগদ্‌ভোগ করিতে দেয় না। প্রাণ খুলিয়া সাধন ভজনও করিতে দেয় না। একমাত্র পারমার্থিক সত্তার অপ্রকাশ বশতঃই এইরূপ আত্মবিনাশের ভীতিরূপ কোটীবীর্য-অসুরকুলের আবির্ভাব হয়। ইহারা সংখ্যায় পঞ্চাশৎ। দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কোষই এই অসুরকুলের প্রকাশ স্থান। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া পঞ্চাশৎ সংখ্যা হয় ; এইরূপে ভয় নামক পাশের পঞ্চাশৎ ভেদ হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে '**কোটীবীর্যাণি পঞ্চাশৎ**' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪) ধৌম্র—ধূম্র নামক অসুরের বংশকে ধৌম্র কহে। এই ধূম্র আমাদের পূর্বপরিচিত ধূম্রলোচন ভিন্ন অন্য কেহ নহে। বিপর্যয় জ্ঞান হইতেই যাবতীয় শঙ্কার আবির্ভাব

হয় ; তাই ইহাদিগকে ধৌম্র বংশীয় অসুর বলা হয়। ইহাই জীবের শঙ্কা নামক চতুর্থ পাশ বা বন্ধন। ভয় এবং শঙ্কার মধ্যে প্রভেদ আছে। ভয়—অস্তিত্ব নাশের আশঙ্কা ; শঙ্কা—সম্বন্ধি পদার্থের বিনাশ জনিত মানসিক বিকার। সহজ কথায় ভয় শব্দের অর্থ মৃত্যুভয়, এবং শঙ্কা শব্দে ধনপুত্রাদি বিনাশের আশঙ্কা বুঝা যায়। ভেদপ্রতীতি হইতেই ইহাদের আবির্ভাব ; সুতরাং ইহারাও বন্ধনবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা একশত। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চভূত, এই দশ, ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই শঙ্কা নামক অসুরকুলের প্রকাশ হয়। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া শত সংখ্যা হয়। এইরূপে শঙ্কা বা ধৌম্র অসুরের শতসংখ্যক ভেদ হয়। তাই মন্ত্রে '**শতং কুলানি ধৌম্রাণাং**' বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

৫) কালক—কৃষ্ণবর্ণ অসুরগণ। কাল শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা জুগুপ্সা নামক পঞ্চম পাশ। অজ্ঞান কৃষ্ণবর্ণ। অজ্ঞান হইতেই বহুত্বপ্রতীতি বা ভেদজ্ঞান পরিপুষ্ট হয়। ভেদজ্ঞান হইতেই জুগপ্সা বা নিন্দার আবির্ভাব হয়। সাধক যতদিন একত্বে—অদ্বিতীয়ত্বে উপনীত হইতে না পারে, ততদিন কিছুতেই এই কালক নামক অসুর বা জুগুপ্সার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না।

৬) দৌর্হৃত—ইহারা দুর্হৃত নামক অসুরের বংশধর। দুষ্ট ভাবের আহরণ করে বলিয়াই ইহাদের নাম দুর্হৃত বা দৌর্হৃত। ইহাই কুল অর্থাৎ কুলাভিমানরূপ ষষ্ঠ পাশ। সাধক শত সহস্রবার অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার উপদেশ পাইলেও স্বকীয় কুলাভিমানরূপ অজ্ঞানের হাত হইতে সহসা পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং ইহাও অসুরভাব।

৭) মৌর্য—ইহারা মূর নামক অসুরের সন্তান। আধ্যাত্মিক দর্শনে ইহা জীবের শীল বা সপ্তম পাশ। শীল শব্দের অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতি। অদ্বয় জ্ঞানে উপনীত হওয়ার পক্ষে স্ব স্ব প্রকৃতি বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানই মহান্ অন্তরায়। পূর্বে বলা হইয়াছে স্ব স্ব প্রকৃতিই জীবের মা। যাঁহারা এই সত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই এই রুদ্রগ্রন্থি-ভেদের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইবেন—সেই প্রকৃতি আপনা হইতেই জীবকে ছাড়িয়া দিয়া অদ্বয় আনন্দময় সত্তার সন্ধান আনিয়া দিতেছেন। স্বকীয় প্রকৃতিকে মা বলিতে না পারিলে কখনও বিশ্ব-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সন্ধান না পাইলে, বিশ্বাতীত ক্ষেত্রে—নিরঞ্জন স্বরূপে উপনীত হওয়া যায় না।

৮) কালকেয়—কালক নামক অসুরের সন্তানগণ। ইহাই জীবের জাতি নামক অষ্টম পাশ। অজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান হইতেই জাত্যভিমান পরিপুষ্ট হয়। তাই ইহাদিগকে কালক অর্থাৎ অজ্ঞানরূপী কৃষ্ণবর্ণ অসুরের সন্তান বা কালকেয় বলা যায়। এই জাতিজ্ঞান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে চণ্ডমুণ্ডবধ ব্যাখ্যাবসরে অনেক কথা বলা হইয়াছে ; সে স্থলে ইহার বিনাশও বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পুনরায় জাতির কথা বলিতে গিয়া যে পুনরুক্তি-দোষ লক্ষিত হইতেছে, আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ তাহাতে শঙ্কিত হইবেন না। কারণ সে স্থলে যে জাত্যায়ু ভোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণত্বাদিরূপ ব্যষ্টি জাতি আর এস্থলে মনুষ্যত্বাদিরূপ সমষ্টি জাতির কথাই বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই এই কুল শীল জাতি প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি একান্ত দুরপণেয়। বারংবার বিলয়প্রাপ্ত হইলেও নানাভাবে নানারূপে পুনরায় ইহারা আবির্ভূত হয় ; এই সকল প্রতীতিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্যই মায়ের এই চরম আয়োজন।

পূর্বোক্ত ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশ জীবত্বের সুদৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে, বিমল-বোধস্বরূপ মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অথবা মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে পূর্বোক্ত অষ্টপাশ ছিন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়—সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই এই পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য নানারূপ বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি সংস্কারগুলিকে বিলুপ্ত করিবার জন্য নানারূপ প্রতিকূল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু হায় ! তাহাতে একদিকে যেমন পাশগুলি বিচ্ছিন্ন হয় না, অন্যদিকে তেমনই উহার বিপরীত কর্মের অনুষ্ঠান জন্য আবার কতকগুলি নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই জ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র। যতক্ষণ বিশুদ্ধ বোধের উদয় না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমূলক অষ্টপাশ বা বন্ধন কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও ঠিক এই কথাই

বলিয়াছেন— '**বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥**' নিরাহারী হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিতে পারিলে বিষয়সমূহের বিনিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তদ্‌বিষয়ক রস —অনুরাগ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সংস্কারটি থাকিয়া যায়। একমাত্র পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ভেদজ্ঞানমূলক বিষয়-রস বা সূক্ষ্ম সংস্কার সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়।

যে সকল সাধক সাধনার প্রথম অবস্থা হইতেই সরল প্রাণে অকপট হৃদয়ে স্বকীয় সৎ অসৎ সকল ভাব নির্বিচারে মায়ের সম্মুখে ধরিতে পারে, কেবল তাহারাই মায়ের কৃপায় অতি সহজে অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ-সাগরে অবগাহন করিতে সমর্থ হয়। সাধন-সমরের প্রারম্ভে প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'অষ্টম মনু' শব্দের রহস্য বলিতে গিয়া, এই অষ্টপাশ মুক্ত হওয়ার কথাই বলা হইয়াছিল। সাধক স্মরণ কর,—প্রথমে যাহার সূচনামাত্র করা হইয়াছিল, কত অবস্থা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া, কত ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিয়া এতদিনে তাহা যথার্থ ফলোন্মুখ হইয়াছে। রুদ্রগ্রন্থিভেদের সাধক মাতৃ-অঙ্কে নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিয়া ঠিক এমনই দেখিতে পায় —মায়ের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পাশসমূহ এক একটি করিয়া স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিবার জন্য প্রলয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। যে পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য কত কঠোর সাধনারই আবশ্যকতা মনে হইয়াছিল, যে পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়া একান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই পাশগুলি আপনা হইতেই ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

সাধক! তুমি কি ইহা বিশ্বাস করিতে পার না! সত্য সত্যই মাকে সরল প্রাণে মা বলিয়া ডাকিলে, সত্য সত্যই মাতৃ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, সত্য-সত্যই মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারিলে, তোমার যাবতীয় বন্ধন এইরূপ অনায়াসে খুলিয়া যাইবে। মা স্বয়ং আসিয়া স্নেহের সন্তান তোমার সকল বন্ধন নিজহস্তে খুলিয়া দিবেন। তোমাকে বক্ষে করিয়া মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে উপনীত হইবেন। সন্তান, তুমি বহুদিন আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বেচ্ছায় জীবত্বের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছ, স্নেহবিহ্বলা মা তোমার সে কল্পিত বন্ধন চিরতরে দূর করিয়া দিবেন। যেখানে বন্ধন বলিয়া কিছু নাই, যেখানে ভেদজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, যেখানে নিরানন্দের স্পর্শও নাই, সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অখণ্ড ব্রহ্মসত্তায় তোমার বিশিষ্ট সত্তাটি চিরতরে মিলাইয়া লইবেন। তুমিও '**ব্রহ্মাহমস্মি**' বলিয়া জীবত্বের পরপারে চলিয়া যাইবে। তোমার মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ হইবে।

———○———

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥৬॥

অনুবাদ। ভীমশাসন অসুরপতি শুম্ভ এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ংও বহুসংখ্যক মহাসৈন্য-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা অসুরপতি— যাবতীয় দ্বৈত-প্রতীতির আশ্রয়। অস্মিতা ভৈরবশাসন— অস্মিতার আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারে না; কারণ, দ্বৈতপ্রতীতিসমূহ অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণমাত্র। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। শুম্ভ কেবল সেনাপতিগণকেই যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই; স্বয়ংও বহুসংখ্যক সৈন্যসহ নির্গত হইল। বলা বাহুল্য যে, নিশুম্ভও শুম্ভের সহিত যুদ্ধার্থ অভিযান করিয়াছিল। অস্মিতা ও মমতা এক সঙ্গেই সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে। জীবভাবীয় যাবতীয় সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারসমূহ এখনও অবশিষ্ট আছে; উহাদিগকেই মন্ত্রে শুম্ভ নিশুম্ভের সহগামী সৈন্যদল বলা হইয়াছে। ক্রমে ইহা স্ফুটতর হইবে।

———○———

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্॥৭॥

অনুবাদ। সেই অতিভীষণ সৈন্যবাহিনী আসিতেছে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা জ্যাশব্দে পৃথিবী এবং গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন।

ব্যাখ্যা। যথার্থই এবারকার সৈন্যসজ্জা বড়ই ভীষণ। যত কিছু দ্বৈতসংস্কার ছিল, সকলই একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। সেই বিপুলবাহিনী দূর হইতে আসিতেছে

দেখিয়া—মা—জ্যাধ্বনি করিলেন। সে ধ্বনি পৃথিবী এবং গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়াছিল। জ্যাধ্বনি—প্রণবধ্বনি ; ইহা পূর্বে অনেক স্থান শ্রুতি প্রমাণসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধক, মনে রাখিও —যতদিন মা স্বয়ং প্রণবধ্বনি না করেন, ততদিন অসুরকুল ভীত হয় না। যতদিন তোমার প্রণবধনুর জ্যাধ্বনি ছিল, ততদিন অসুরবৃন্দকে বিন্দুমাত্রও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পার নাই। তারপর যেদিন মাতৃ-কৃপায় মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, যেদিন তোমার কর্তৃত্ব বিদূরিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই মায়ের কার্য—জ্যাধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। যদিও প্রণবাদি মন্ত্র জপকালীন ধ্বনি তোমার বাক্‌যন্ত্র হইতেই নির্গত হয়, তথাপি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, সে ধ্বনি তোমার নহে। উহা মহতী শক্তিরই প্রবল আকর্ষণময় নাদ ; সুতরাং ঐ ধ্বনির দিকে অবধান প্রয়োগ করিলেই দেখিতে পাইবে— উহা ধরণী গগনান্তর পরিপূর্ণ করিয়াছে। চতুর্দিক্, দশদিক্ সর্বত্র নাদময়। নাদ ব্যতীত যেন কোথাও কিছু নাই ; এ জগৎ যেন একটা অশ্রান্ত ধ্বনিমাত্র। জন্ম মৃত্যু, নানা যোনি-ভ্রমণ, সুখদুঃখ, সঙ্কল্প বিকল্প সেই অশ্রান্তধ্বনিরই বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। অসুরবল যতই অসংখ্য ও সন্নদ্ধ হউক না কেন, একবার এই স্বাভাবিক নাদ উত্থিত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। সে নাদপ্রবাহে সর্বভাব পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। কি মধুর অথচ গম্ভীর এবং সর্বতঃপ্রসারী সে নাদ !

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৮॥

অনুবাদ। হে নৃপ ! এই সময়ে সিংহও পুনঃ পুনঃ মহানাদ করিতে লাগিল। স্বয়ং অম্বিকাদেবী ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সে নাদকে আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর বাহন সিংহ অর্থাৎ জীবও এই সময় যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাই যে জীবের সর্বশেষ প্রযত্ন ; ইহা বুঝিতে পারিয়াই, দ্বৈতভাবসমূহের প্রতিকূলে যত রকম আয়োজন সম্ভব, জীব তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য উদ্যত হইল। এই কর্মোদ্যম, এই পুরুষকার, এই তীব্র উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে সিংহের মহানাদের কথা বলা হইয়াছে। কেহ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হন যে, মাতৃ-চরণে যাহারা আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদের আর পুরুষকার বলিয়া কিছুই থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু আত্মসমর্পণ যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণই যথার্থ পুরুষকার জিনিষটার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাহারা কখনও তামসিক জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে না। আরে, পুরুষ ত' মা ! তাহার যে কার বা কৃতি, তাহাই ত' পুরুষকার ! যতক্ষণ মাতা-পুত্ররূপ একটু ভেদও থাকিবে, ততক্ষণই পুরুষকার থাকিবে। যখন মাতাপুত্র-সম্বন্ধহীন এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, তখন—কেবল তখনই পুরুষকার বলিয়া কিছু থাকে না। যেখানে ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, সেখানে আর পুরুষকার কিরূপে থাকিবে ? তাইত বলি— সাধনার প্রথম অবস্থা হইতেই তীব্র পুরুষকারের প্রয়োজন, এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়। যে মুহূর্তে সর্বভাবের বিলয় হয়, সেই মুহূর্তেই পুরুষকারের পরিসমাপ্তি ও কেবল পুরুষস্বরূপে স্থিতি হয়। পাতঞ্জল ইহাকেই দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান বলেন, গীতা ইহাকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলেন, ভক্তিশাস্ত্র ইহাকে প্রেমে আত্মহারা-ভাব বলেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

আমরা সিংহের মহানাদের কথা বলিতেছিলাম। যখন অসুর-অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন সাধকগণ 'জয় গুরু' 'জয় মা' বলিয়া '**অলখ্ নিরঞ্জন**' বলিয়া অথবা স্ব স্ব অভীষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়া, যে সিংহনাদ ছাড়েন, তাহাও সাধনা-রাজ্যে নিতান্ত কম উপকারী নহে। সাধকের সেই সিংহনাদ আবার মা অম্বিকা স্বয়ং ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা উপবৃংহিত—পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন ; অনাহত ঘণ্টাধ্বনি সাধকের বাগ্‌যন্ত্র-নির্গত ধ্বনির সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে আরও তুমুল করিয়া তুলে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই নাদরহস্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে স্থলে বৈখরীনাদের কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। এই উত্তম চরিত্রে সূক্ষ্ম মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা নাদের বিষয়ই—বলা হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে কোনরূপ সংশয় উঠিবে না। সাধক যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে অরোহণ করে, নাদ তেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করে।

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাংশব্দাপূরিতদিঙ্মুখা ।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ।।৯।।

অনুবাদ । ধনুর জ্যাধ্বনি, সিংহের নাদ এবং ঘণ্টার শব্দ একত্রিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল । আবার বিস্তারিতাননা কালিকা দেবী স্বকীয় ভীষণ নিনাদে সে ধ্বনিকেও তিরস্কৃত করিলেন ।

ব্যাখ্যা । কালীর ধ্বনি—প্রলয়কালীন ভীষণ হুঙ্কার । সে ধ্বনি অপর সকল ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিবেই ; কারণ সকল ধ্বনিই প্রলয়হুঙ্কারে মিলাইয়া যায় । এবার শুম্ভের সৈন্যসজ্জা যেরূপ ভীষণ, মায়ের বিজয়-ধ্বনিও সেইরূপ প্রচণ্ড । কেবল সূক্ষ্ম নহে, এইরূপ স্থূল নাদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে । যখন দ্বৈতভাব-জনিত প্রতিকূল বেদন আসিয়া সাধককে দুর্বল ও হতাশ করিয়া ফেলে, তখন সর্বতোভাবে নাদের আশ্রয় লইতে হয় । মানস প্রণব ধ্বনি, উপাংশু অনাহত ধ্বনি, স্থূলের 'জয় মা' প্রভৃতি ধ্বনি, এবং সর্বভাব-বিলয়াত্মক মহা-শক্তির হুঙ্কার ধ্বনি, এই সকল যুগপৎ সমবেতভাবে প্রকাশিত হইলে, সাধকের সকল অবসাদ, সকল দুর্বলতা ক্ষণকালের মধ্যে পলায়ন করে । সাধক তখন নব বলে বলীয়ান হইয়া অমিত তেজে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয় ।

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্ ।
দেবী সিংহ স্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ।।১০।।

অনুবাদ । সে নিনাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যসেনাগণ সক্রোধে চতুর্দিক্ হইতে দেবী, সিংহ এবং কালীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল ।

ব্যাখ্যা । দেবী—অম্বিকা, স্বয়ং চিতিশক্তি ; বাহন —সিংহ—জীব ; এবং কালী—প্রলয়ঙ্করী মহতী শক্তি । অগণিত দৈত্যসেনা দূর হইতে এই তিনজনকে দেখিতে পাইল । কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে যে সর্বলোক-ক্ষয়কারী প্রলয় ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দৈত্য সৈন্যগণ অতিমাত্র বিস্মিত হইল । যেহেতু, মাত্র তিনটি শক্তির সমরধ্বনি যে এত তুমুল, এত সর্বদিগ্ব্যাপী হইতে পারে, ইহা তাহারা ভাবিতেও পারে না । যাহা হউক, এখন উহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিবার জন্য দৈত্যগণ অর্থাৎ পূর্বোক্ত অষ্টপাশ প্রভৃতি বন্ধনজনক সংস্কারগুলি চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল ।

শুন, সাধক যখন ধীরে ধীরে সর্বভাবাতীত ত্রিগুণ-রহিত সেই নিত্য নিরঞ্জন সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন নানাবিধ লৌকিক সংস্কাররাশি আসিয়া তাহার সে গতিকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায় । কিছুতেই সেই অদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরস পান করিতে দেয় না । প্রতি পদক্ষেপে সহস্র সহস্র সংস্কার আসিয়া সাধকের অগ্রগতি নিরুদ্ধ করে । বহুজন্মসঞ্চিত দ্বৈতসংস্কার প্রবলবেগে আসিয়া অদ্বয়ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হয় । দৈত্যসৈন্যগণের চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টনের ইহাই রহস্য । যাহারা সাধক, তাহারা এ সকল কথা একেবারে মজ্জায় মজ্জায় বুঝিতে পারিবেন ।

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলান্বিতাঃ ।।১১।।
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যোবিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ।।১২।।

অনুবাদ । হে ভূপ সুরথ ! ইত্যবসরে সুরবিদ্বেষিগণের বিনাশের জন্য এবং দেবশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা শিব কার্তিকেয় বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের অতিবীর্য বলান্বিত শক্তিগণ, তাঁহাদের (ব্রহ্মা প্রভৃতির) শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সেই সেইরূপে আবির্ভূত হইয়া চণ্ডিকা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন ।

ব্যাখ্যা । মহর্ষি মেধস এখানে সুরথকে ভূপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন । জীব এতদিনে ক্ষিতিতত্ত্ব অর্থাৎ জড়ত্বের উপর আধিপত্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে । জড়পদার্থসমূহ যে চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এ কথাটা সুরথ এতদিনে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে বলিয়াই এস্থলে ঋষির এরূপ সম্বোধন । শিষ্য যেরূপ স্তরে স্তরে জ্ঞানের উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে থাকে, শ্রীগুরুও তাহাকে তদনুকূল বাক্য প্রয়োগে উৎসাহিত করিতে থাকেন । শ্রীগুরুর উৎসাহ বাক্যই শিষ্যের অগ্রগমনের সম্বল । মেধস এইবার দুরধিগম্য রহস্যের অবতারণা করিবেন ; পাছে সুরথ স্বকীয় জীবভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া, সেই রহস্যের অনুধাবন করিতে না পারে এই আশঙ্কায় প্রথমেই 'ভূপ' বলিয়া—জড়ত্ত্ববিজয়ী

মহারাজ বলিয়া আহ্বান করিলেন।

অসুরসৈন্যবৃন্দ যখন চতুর্দিক হইতে আসিয়া দেবীকে পরিবেষ্টন করিল, তখন সমগ্র দেবশক্তি সম্মিলিত হইয়া দেবীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। মহিষাসুরবধে দেখিতে পাইয়াছি— দেবতাগণ স্ব স্ব শক্তি অর্পণ করিয়া মহতী শক্তিকে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র অর্থাৎ স্ব স্ব শক্তি একমাত্র মহামায়ারই মহতী শক্তি, তাই অল্পায়াসেই মহিষাসুর নিহত হইয়াছিল। কিন্তু এবার এই অসুরবৃন্দ তদপেক্ষাও প্রবল পরাক্রান্ত, তদপেক্ষাও দুর্জয়। এবার আর কেবল শক্তিসমর্পণদ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। এবার মহতী শক্তিতে সমর্পিত বিভিন্ন শক্তিসমূহকে আবার বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হইতে হইবে।

এস্থলে একটু সাধনার রহস্য আছে। সাধকগণ অবহিত হইবেন। প্রথমতঃ স্ব স্ব বিভিন্ন শক্তিগুলিকে একটি একটি করিয়া মহতী শক্তির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে হয়। অর্থাৎ একমাত্র চৈতন্যময়ী মহাশক্তির বিভিন্ন প্রবাহই যে আমাদের দর্শন শ্রবণ গ্রহণ মনন প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা বুঝিতে হয় —উপলব্ধি করিতে হয়। তারপর আবার ঐ একই মহতীশক্তি যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-আকারে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা অনুভব করিতে হয়। নিজের নিত্য অনুভবযোগ্য বিভিন্ন শক্তিগুলিকে মহতী মাতৃ-শক্তির বিভিন্ন বিলাসরূপে বুঝিতে না পারিলে, সমগ্র বিশ্বের শক্তিপ্রবাহকে এক অভিন্ন চৈতন্য শক্তিরূপে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

স্বকীয় বিশিষ্ট শক্তিকে মিলাইয়া দিতে পারিলেই শক্তির ক্ষুদ্রতা ও বিশিষ্টতা দূর হয়। সে অবস্থায় জীব ঈশ্বরভাবে অনুভাবিত হইতে থাকে। তারপর মহাশক্তিতে সমর্পিত বিশিষ্ট শক্তিকে অতিবীর্য-বলান্বিত করিয়া—পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য পাশগুলি ছিন্ন করিতে হয়। মহাশক্তিতে অর্পিত হইবার পূর্বে বিশিষ্ট শক্তিগুলি যেন হীনবল থাকে ; কিন্তু একবার ঈশ্বর-শক্তির সংস্পর্শ পাইলে, উহারাও অমিতবীর্য হয়। তাই মন্ত্রে **'অতিবীর্য-বলান্বিতা'** বলা হইয়াছে। অতিবীর্য-বলান্বিতা বলিয়াই উহারা অসুরনিধনে চণ্ডিকার সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। শ্রুতিও বলেন, **'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'**। পরমাত্মার শক্তি পরা অর্থাৎ মহতী এবং বিবিধ। পরাশক্তি হইতেই যে বিবিধ শক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝিতে পারিলেই চণ্ডিকার শরীর হইতে দেবশক্তিসমূহের নির্গমরহস্য বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ দর্শন শ্রবণ গমন গ্রহণ প্রভৃতি নানাশক্তি সমন্বিত একটি আধারকেই মনুষ্য বলা হয়, সেইরূপ ব্যষ্টি সমষ্টি যাবতীয় বিভিন্ন শক্তির যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বা অনুভব করিতে পারা যায়, সে সকলই একমাত্র পরাশক্তি বা পরমাত্মশক্তির প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

'ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ' এই অংশটির ব্যাখ্যা পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে বিশেষভাবে পাওয়া যাইবে। শুধু **'শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য'** এই অংশটি নিয়া একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ মনে হয়, ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। 'শরীরেভ্যঃ পদটিতে বহুবচনের প্রয়োগ দেখিয়াও সেইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরে শুম্ভবধে পাওয়া যাইবে—ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিসমূহ একমাত্র দেবীর শরীরেই বিলীন হইয়াছিল। যে কারণ হইতে যে কার্যের উৎপত্তি হয়, সেই কার্য পুনরায় সেই কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই অবিসংবাদিত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত ; সুতরাং চণ্ডিকার শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। আর পক্ষান্তরে ব্রহ্মাদি দেবতার শরীর হইতে উঁহাদের নির্গম স্বীকার করিলেও বিশেষ হানি হয় না ; কারণ, ব্রহ্মাদি দেবতার শরীর অম্বিকাশরীর হইতে বাস্তবিক কোন অংশেই বিভিন্ন নহে। যাহা হউক, আমরা এ স্থলে চণ্ডিকার শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির নির্গম বুঝিয়া লইব। মায়ের শরীর এক হইলেও উহার অসীমত্ব লক্ষ্য করিয়াই 'শরীরেভ্য' এই বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে।

পূর্বে মহিষাসুর-বধে দেবতাগণের অস্ত্র-অর্পণ বা শক্তি-সমর্পণ দেখা গিয়াছে। আর এখানে সেই অর্পিত শক্তির বিশিষ্টভাবে পুনরায় নিষ্ক্রমণ দেখা যাইতেছে। সেখানে মহিষাসুর বধকালে অর্পণদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল ; যেহেতু তখন ছিল অপ্রকটিত সঞ্চিত সংস্কার, উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর এস্থলে প্রকটিত

প্রারব্ধ সংস্কার, ইহারা ফলোন্মুখ ; সুতরাং অতিশয় বলবান্ । তাই এবার দেবশক্তিবৃন্দকে বিশিষ্টভাবে সমরক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে ।

প্রিয়তম সাধক ! মনে আছে কি ? পূর্বে বলা হইয়াছে, মা-তে যাহা অর্পিত হয়, তাহাই মাতৃশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া পুনরায় অর্পণকারীর নিকটই ফিরিয়া আইসে। দেখ, অসুরকর্তৃক নির্জিত দেবতাবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষীণ শক্তি একদিন মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়াছিল ; আর আজ সেই শক্তিই অতিবীর্যবলান্বিত হইয়া মূর্তিমতী দেবশক্তি রূপে অম্বিকার শরীর হইতে বিনিস্ক্রান্ত হইয়া অসুর নিধনের জন্য আবির্ভূত হইল। এইরূপ তুমিও অকপটচিত্তে যাহা কিছু মাতৃ-চরণে অর্পণ করিবে, তাহা, যতই মলিন ও ক্ষুদ্র হউক না কেন, যদি ঠিক ঠিক অর্পণ করিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে— তোমার সেই অর্পিত বস্তু কত উজ্জ্বল, কত মহান, কত পবিত্র হইয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে ।

———○———

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্ ।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥১৩॥

অনুবাদ । যে দেবতার যে প্রকার রূপ, যেরূপ ভূষণ এবং যেরূপ বাহন, সেই দেবতার শক্তি সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ এবং বাহন সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন ।

ব্যাখ্যা । যে দেবতার যেরূপ আকার, অর্থাৎ যে বিশিষ্ট চৈতন্য যেরূপ বিশিষ্টতার অধিষ্ঠান, সেইরূপ বিশিষ্টতা লইয়াই সেই দেবতার শক্তি সমরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । ভূষণ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য বা বিভূতি, যে দেবতার যাহা বিভূতি, তাহাই সেই দেবশক্তির বিভূষণ । বাহন শব্দের অর্থ শক্তি-পরিচালক আশ্রয় । প্রথম খণ্ডে বাহনতত্ত্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ভূষণতত্ত্ব সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

দেবশক্তির বিষয় আর একটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা আবশ্যক । প্রত্যেক দেবতারই একটা বিশিষ্টতা আছে । ঐ বিশিষ্টতাই শক্তির কার্য । শক্তি — কারণস্বরূপ অদৃশ্য বস্তু । শক্তি যখন কার্যরূপে প্রকাশ পায়, তখনই শক্তির সত্তা অনুমিত হয়, নতুবা শক্তি কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না । মনে কর—বহ্নির যে দাহিকা শক্তি, তাহা তাপ আলোক প্রভৃতি কার্যদ্বারাই বুঝিতে পারা যায় ; অন্যথা দাহিকাশক্তির স্বরূপটি কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না । এই শক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানই জীবের চরম জ্ঞান । জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বলিয়া, যাহা কিছু দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়, এ সকলই যে একমাত্র পরা শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীব ধন্য হয় । জীব সাধারণতঃ শক্তির বিকাশ অবস্থা বা কার্যটিমাত্র দেখিতে পায় ও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, শক্তির যথার্থ স্বরূপটি জানিতে চায় না ; তাই শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ হয় না । তবে ইহাও একান্ত সত্য যে, শক্তি স্বয়ং যদি ধরা না দেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, কোনরূপ কৌশল বা প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে । তাইত অনেক সময় বলিয়া থাকি— মা আমার সর্বরূপে সর্বত্র সুপ্রতিভাত হইয়াও স্বয়ং কিন্তু নিত্যই অদৃশ্যা, অগ্রাহ্যা, অলভ্যা, বাক্য মনের অগোচরা হইয়া রহিয়াছেন ।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা আবশ্যক । ব্রহ্মনিরূপণসূত্রে **'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** এই কথাটি বলাতেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । **'যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম'** এই কথাদ্বারাই ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপতা প্রমাণিত হয় ; সুতরাং যাঁহারা নির্গুণত্ব ভঙ্গের ভয়ে ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপটি অস্বীকার করেন, আমরা এস্থলে তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না । আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, শক্তিরূপিণী মা আমাদের হৃদয়ে যতটুকু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বলা যায়—**'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** বস্তু চিতিশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । এই জগদ্রূপ কার্যদ্বারাই উহার শক্তিরূপত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায় । আর যখন জগৎরূপ কার্য থাকে না, স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদও থাকে না, কেবল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়, তখন তাঁহাকে শক্তিময় কিংবা শক্তিহীন, কিছুই বলা যায় না । তবে যতক্ষণ পরমাত্মায় শক্তিময় স্বরূপটি প্রত্যক্ষ হয়, ততক্ষণ তাঁহাতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ দ্বিবিধ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় । জীবভাবে স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত, এই ত্রিবিধ ভেদই দৃষ্ট হয় । ঈশ্বরভাবে স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ থাকে না, কেবল স্বগত ভেদের উপলব্ধি হয় । জীব

সাধনাদ্বারা, জ্ঞান ভক্তির অনুশীলনদ্বারা, এই ঈশ্বরত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারে, তৎপরবর্তী স্বরূপটি সর্ববিধ সাধ্য সাধনার অতীত বলিয়াই শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ তৎসম্বন্ধে মূক। তবে ইহা স্থির যে, জীব যখন সাধনার ফলে কিংবা মায়ের কৃপায় এই ঈশ্বরত্বে অর্থাৎ আত্মার শক্তিময় স্বরূপে উপনীত হইতে পারে, তখন—কেবল তখনই, নিরঞ্জন স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হয়। ঈশ্বরত্বের কিছুমাত্র আস্বাদ না পাইয়াও যদি কেহ নিরঞ্জন স্বরূপের বিষয়ে কোনও কথা বলিতে থাকেন, শুধু মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিয়া **'অহং ব্রহ্ম'** বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভাণ করেন, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে এখনও বহু দূরে রহিয়াছেন। সেখানে—সেই নিরঞ্জন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তারপর তাঁহাকে শক্তিময় বলিলেও ক্ষতি নাই, শক্তিহীন বলিলেও ক্ষতি নাই; উভয়রূপ বলিলেও ক্ষতি নাই, উভয়াভাবরূপ বলিলেও ক্ষতি নাই। তিনিই সব অথবা তিনি ইহার কিছুতেই নাই। সে কি মধুময়, কি আনন্দময়, তাহা ভাষায় কিরূপে বুঝাইব!

সে যাহা হউক, সগুণ ও নির্গুণ উভয় অবস্থায় পরমাত্মার শক্তিস্বরূপত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই সাধনমার্গ সুগম হয়। তারপর যদি এই উভয়ের আধাররূপে কোনও অজ্ঞেয় সত্তার স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—যাহা শক্তির আশ্রয়, তাহা শক্তির স্বরূপ হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। আমরা কথাপ্রসঙ্গে বিচারের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তাহাতে তর্ক কিংবা বিচারের অবসর কোথায়?

———০———

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥১৪॥

অনুবাদ। হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এখান হইতে সাতটি মন্ত্রে দেবশক্তিগণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মাণী—সৃষ্টিশক্তি। অখণ্ড চৈতন্যসমুদ্রের যে অংশে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যাংশের নাম ব্রহ্মা, অর্থাৎ আত্মা যেখানে সৃষ্টিক্রিয়ার অভিমান করেন, সেইখানে তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। আর সেই চেতনাধিষ্ঠান হইতে যে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তাহার নাম ব্রহ্মাণী; সুতরাং সাধনার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণীর মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদই পরিলক্ষিত হয় না। শক্তি বস্তুটা যদি চৈতন্যাশ্রয় ব্যতীত সত্তাময় হইত, তবে ভেদ স্বীকার করা যাইত এবং সেরূপ অনুভবও হইত। শক্তির সর্বাবয়বই যখন সত্তা বা চেতনা, তখন শক্তিকে চৈতন্য বলায় কিছুই ক্ষতি হয় না। দাহিকাশক্তিকে অগ্নি বলায় কি ক্ষতি আছে? অবশ্য তর্কমূলক সূক্ষ্ম বিচারে উহাতেও নানারূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহাদের পক্ষে শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া লইলে কিছুই ক্ষতি হয় না। তারপর যদি কিছু ভেদ থাকে, আপনা হইতে অনুভবগোচর হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোনরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিবার আবশ্যক হয় না। আত্মা নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং একান্ত সহজ বস্তু; সুতরাং অন্ধের মত কিছুই মানিয়া লইবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু সে অন্য কথা।

হংস—জীব। অক্ষসূত্র—বর্ণমালা। কমণ্ডলু—সৃষ্টির বীজাধার বা বিরাট্ কর্মাশয়। খুলিয়া বলি, বুঝিতে চেষ্টা কর—তোমার যেরূপ ব্যষ্টি মন আছে, প্রত্যেক জীবেরই সেইরূপ আছে। ঐ ব্যষ্টি মনগুলি একটি সমষ্টি মনেরই অংশমাত্র। ঐ সমষ্টি মনের নাম দাও বিরাট্ মন। উনিই ব্রহ্মা। মনের ধর্ম কল্পনা। এই বিশ্ব বিরাট্ মনের কল্পনা। কল্পনা একটা শক্তি, উহা মনের ধর্ম বা স্বরূপ। ঐ কল্পনাশক্তির নাম ব্রহ্মাণী; তিনি হংসবাহিনী। প্রতি জীবের যে বিভিন্ন সঙ্কল্প দেখিতে পাও, উহার মধ্য দিয়াই ঐ সমষ্টি মনের প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং জীবই সৃষ্টির পরিচালক। জীবকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ। জীব যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিশক্তি যে আছে, তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। তাই সৃষ্টিশক্তিরূপিণী ব্রহ্মাণীর বাহন জীবরূপী হংস। জীবকে হংস বলিবার আর একটি তাৎপর্য আছে। উহারা শ্বাস প্রশ্বাসে দিবারাত্রিতে সাধারণতঃ একুশ হাজার ছয়শত হংসমন্ত্র জপ করিয়া থাকে, উহাকে অজপা কহে। এ সকল কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

অক্ষসূত্র—বর্ণমালা। কল্পনাগুলি শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বিশ্ব কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দদ্বারাই গঠিত। শব্দসমূহ বর্ণসমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বর্ণের সংখ্যা পঞ্চাশটি। পঞ্চাশৎ বর্ণমালাই ব্রহ্মাণীর অক্ষমালা। পূর্বে কালীর মুণ্ডমালায় যে বর্ণমালার কথা বলা হইয়াছে, ভাবোৎপাদনে সামর্থ্যহীন হওয়ায় তাহা শবমুণ্ডমালা। আর প্রতিক্ষণে অসংখ্য ভাবের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়াই ব্রহ্মাণীর বর্ণমালা অক্ষমালা। অবশিষ্ট কমণ্ডলু। পূর্ব পূর্ব কল্পের সৃষ্টির বীজ অনুসারেই পুনরায় অভিনব সৃষ্টির আরম্ভ হয়; এই সৃষ্টির বীজাধারকেই ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলু বলা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এ সকল কথার বিস্তারিত বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন।

———০———

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৫॥

অনুবাদ। বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী সর্পবলয়া চন্দ্রকলাবিভূষিতা মাহেশ্বরী যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। মাহেশ্বরী—লয়শক্তি। অখণ্ড চৈতন্য-সমুদ্রের যে অংশে প্রলয়ভাব প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যাংশের নাম মহেশ্বর। অর্থাৎ আত্মা যেখানে প্রলয়ক্রিয়ার অভিমান করেন, সেই স্থানে তিনি মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। সেই চেতাধিষ্ঠান হইতে যে প্রলয়রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তিনিই মাহেশ্বরী। ইনি বৃষারূঢ়া। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম। ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানশক্তি পরিচালিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পরিচালনরূপ ধর্ম যথারীতি অর্জিত না হইলে জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয় না। প্রথমখণ্ডের বাহনতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। ত্রিশূল—ত্রিপুটী জ্ঞান। ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহাহিবলয়া—মহা অহি—মহাসর্প অর্থাৎ কুণ্ডলিনী! ইনি বলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কুণ্ডলিনী কি এবং তাহাকে সর্প কেন বলা হয়, এ কথাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। চন্দ্ররেখা-বিভূষণা—চন্দ্ররেখা শব্দের অর্থ চন্দ্রকলা। চন্দ্রের ষোল কলা, তন্মধ্যে পঞ্চদশ কলা তিথিরূপে অভিব্যক্ত অবশিষ্ট কলার নাম অমা। এই অমানাম্নি মহাকলা জ্ঞানশক্তি-রূপিণী মাহেশ্বরীর ললাটে (একদেশে) অবস্থিতা। অমাশব্দের অর্থ করিতে গিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ইহাকে অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অমা বা মায়াই জ্ঞানশক্তির বিশিষ্ট বিকাশ। যে মহতী জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া মায়ার লীলা সংঘটিত হয়, তিনিও অসুরনিধন উদ্দেশ্যে চণ্ডিকার সহায়তাকল্পে মাহেশ্বরী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

———০———

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥১৬॥

অনুবাদ। গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়রূপধারিণী অম্বিকাদেবী কৌমারীশক্তিরূপে শক্তি অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া, ময়ূরে আরোহণপূর্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। কৌমারী—অসুরবিজয়িনী কার্তিকেয়শক্তি। ইনি দেবসৈন্য-পরিচালিকা। দেবশক্তি ও অসুরশক্তির রহস্য দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। যে অসুরবিজয়িনী শক্তি আসুরিক বৃত্তিনিচয়ের দমন কল্পে দেবশক্তিসমূহের পরিচালনা করেন, তিনিই কৌমারী শক্তি। তদধিষ্ঠিত চৈতন্যশক্তি কুমার বা কার্তিকেয় নামে অভিহিত হয়। ইঁহার বাহন ময়ূর। ময়ূর সর্পভোজী বিহঙ্গম। সর্প—কুটিলগতি। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বিষয়াভিমুখে বিসর্পিতভাবে কুটিলগতিতে পরিচালিত হয়; যখন কোন সাধক উহাদিগকে বিলয় করিবার মত বল বা সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে, তখনই সে ময়ূরধর্মী হয়। এইরূপ ময়ূরধর্মী জীবই কৌমারী শক্তির বাহন। আত্মার যে অংশে দেবভাবসমূহকে অসুরভাব বিমর্দন কল্পে পরিচালিত করিবার ভাব ফুটিয়া উঠে, সেই অংশের নাম কুমার বা কার্তিকেয়। সেই অধিষ্ঠানচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি দেবভাবসমূহের পরিচালনা করেন, তিনিই কৌমারী শক্তি।

———০———

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥১৭॥

অনুবাদ। এইরূপ বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়োপরি অরোহণপূর্বক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু এবং খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা । যে চৈতন্যসত্তা স্থিতিশক্তিতে অভিমান করেন, তিনি বিষ্ণু । স্থিতি বা পালনই তাঁহার শক্তি । শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে । শার্ঙ্গ শব্দের অর্থ ধনু অর্থাৎ প্রণব এবং খড়্গ শব্দের অর্থ—দ্বৈতপ্রতীতি-বিলয়কারক অদ্বয় জ্ঞান । বিষ্ণু শব্দ ব্যাপকতা-বোধক । যে সর্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞানের উদয় হইলে, দ্বৈতপ্রতীতি বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেই অখণ্ড জ্ঞানই বিষ্ণুর হস্তস্থিত খড়্গ । গরুড় শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে বাহনতত্ত্ব ব্যাখ্যাবসরে বলা হইয়াছে । ত্রিবৃদ্ বেদই বিষ্ণুশক্তির পরিচালক ; তাই বেদসমূহই গরুড় । ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা নহে । স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন । যাঁহারা ঈশ্বর বলিলে কোন একটা বিশিষ্ট মূর্তিমাত্র বুঝিয়া থাকেন, যাঁহারা শ্রীভগবানের কালীয়দমন, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অলৌকিক লীলারহস্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটি বিশিষ্ট মূর্তিমাত্র বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থখানি একটু বিশেষ অনুধাবনের সহিত পড়িয়া দেখিবেন, স্বয়ং ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন —লৌকিক লীলা ব্যপদেশে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্য প্রকটন করিবার জন্যই ভগবানকে বিশিষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করিতে হয় । সাধক ! মনে রাখিও অমূর্ত স্বরূপের রহস্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে না পারিলে মূর্তির স্বরূপ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না ; সুতরাং যে মূল বস্তুটি বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করেন, তাঁহার স্বরূপ জানা একান্ত আবশ্যক । বর্তমান কালে যে ধর্ম গ্লানির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রধান হেতু—এই মূর্ত অমূর্ত বিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞানের অভাব । বিজ্ঞানময় গুরু—সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্ এই অজ্ঞানতা দূর করিয়া দেশ হইতে এই ধর্ম গ্লানির হেতু সম্যক্ বিদূরিত করিয়া দিউন ।

———o———

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারহীং বিভ্রতী তনুম্ ।।১৮।।

অনুবাদ । হরির যে শক্তি যজ্ঞবরাহের রূপের ন্যায় অতুলনীয় রূপ ধারণ করেন, তিনিও শৌকরবপু ধারণপূর্বক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন ।

ব্যাখ্যা । বারাহী—ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম শক্তি-বিশেষ । পুরাণে বর্ণিত আছে—স্বয়ং বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণপূর্বক প্রলয়মগ্ন বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । বরাহ ভগবান্ বিষ্ণুরই একটি নাম । এই বরাহ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ—এক কল্প পরিমিত কাল । বর শব্দের অর্থ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আত্মা ; তাঁহাকে যিনি আহনন করেন, অর্থাৎ আবৃত করেন তিনিই বরাহ । কালসত্তাই সর্বপ্রথম আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মায় সর্বপ্রথমেই কালসত্তাই পরিকল্পিত হয় ; কালই আত্মার সর্বপ্রথম আবরণ । বর্তমানে আমাদের এই পৃথিবীতে বরাহকল্প নামক কাল-প্রবাহ চলিতেছে । চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয় । সম্প্রতি শ্বেতবরাহ কল্পের ছয়টি মহাযুগ অতীত হইয়াছে, সপ্তম মন্বন্তরীয় সপ্তবিংশতিসংখ্যক কলিযুগ চলিতেছে । এই বরাহ-কল্পের সুদীর্ঘকাল অতীত হইবার পর, আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরার সৃষ্টি হয় । সৃষ্টির পূর্বে ইহা প্রলয় সলিলে মগ্নই ছিল ; তাই পুরাণকারগণ বিষ্ণুর বরাহমূর্তিকর্তৃক বসুন্ধরার উদ্ধার বর্ণনা করিয়া থাকেন । অতি দীর্ঘকালরূপ বরাহকল্পের একদেশে এই বসুন্ধরা অবস্থান করিতেছে ; তাই বরাহের দন্তে অর্থাৎ সুবিশাল অবয়বের একদেশে বসুন্ধরা অবস্থিত । কালী-শক্তি এবং বারাহীশক্তির প্রভেদ এই যে—কালী প্রলয়ঙ্করী সমষ্টি-মহাকাল-শক্তি ; আর বারাহী মাত্র এক কল্পরূপ ব্যষ্টি কালশক্তি । এই শক্তি জগতের আধারস্বরূপ বলিয়া ইহাকেও বিষ্ণুশক্তি বলা হয় । পালনশক্তি ও আধার-শক্তি প্রায় অভিন্ন । আমাদের এই ভূলোক যে বিশাল কাল-রূপ আধারে অবস্থিত এবং পরিধৃত তাহাই বরাহ, আর সেই ভূলোক-বিভ্রতী (ধারিণী) মহতী শক্তির নামই বারাহী ।

———o———

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতীসদৃশং বপুঃ ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্ত-নক্ষত্রসংহতিঃ ।।১৯।।

অনুবাদ । নারসিংহী নৃসিংহদেবের তুল্য দেহ ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন । তাঁহার কেশরাঘাতে নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ।

ব্যাখ্যা । নারসিংহী—ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম

শক্তিবিশেষ। নৃসিংহ—স্বরূপজ্ঞান। আত্মস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইলেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। নৃ শব্দের অর্থ মানুষ এবং সিংহ শব্দটি শ্রেষ্ঠার্থবাচক। ইনি হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন। হিরণ্য শব্দের অর্থ আত্মা ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ। যে হিরণ্যকে অর্থাৎ নির্বিকল্প পরমাত্মাকে কশিত করে নিগৃহীত করে অর্থাৎ বিষয়াভিমানরূপে প্রকটিত করে, সে-ই হিরণ্যকশিপু। এই হিরণ্যকশিপু অসুরকে একমাত্র আত্মস্বরূপ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই বিনাশ করিতে সমর্থ। তাই নৃসিংহ শব্দের অর্থ স্বরূপজ্ঞান ; এই নৃসিংহের হস্তেই হিরণ্যকশিপুর নিধন হয়। নর যতদিন স্বকীয় স্বরূপ বুঝিতে না পারে, ততদিন সে কিছুতেই সিংহ বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। পুরাণকারগণ হিরণ্যকশিপুবধের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ আখ্যান। প্রথমতঃ তপস্যাদ্বারা সে ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছিল—দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর নর পশু বিহঙ্গমাদি কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সত্যই ত' কোনরূপ বিশিষ্টজ্ঞান থাকিতে হিরণ্যকশিপু নিহত হয় না। নির্বিকল্প জ্ঞান ব্যতীত সবিকল্প জ্ঞানরূপী অসুরকে অন্য কেহই বিলয় করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপুর সন্তান প্রহ্লাদ—আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান। একটু একটু করিয়া যতই তাহার প্রকাশ হইতে থাকে, অজ্ঞান ততই তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। ক্রমে জলে স্থলে অনলে অনিলে গগনে সর্বত্র প্রহ্লাদের হরিদর্শনরূপ সত্যজ্ঞানের প্রভাবে নৃসিংহমূর্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ আত্মস্বরূপবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন ভেদজ্ঞান বা হিরণ্যকশিপু নিহত হয়।

সাধক ! তুমিও দেখ—তোমার অন্তরে অন্তরে যে বালক ভক্ত প্রহ্লাদ—আনন্দময় ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, উহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য তোমার বিষয়াসক্ত-মনরূপী হিরণ্যকশিপু কতই না চেষ্টা করিতেছে। কত নির্যাতন সহ্য করিয়া তোমার আনন্দময় শিশু সত্যজ্ঞান সর্বত্র সত্যদর্শন করিবার অভ্যাস সুদৃঢ় ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। একদিন ঐ সত্যজ্ঞানই তোমার জড়ত্বজ্ঞানরূপী স্ফটিক স্তম্ভকে বিদীর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ বোধমাত্রস্বরূপে প্রকটিত হইবেন, তুমি নৃসিংহমূর্তিদর্শনে আত্মহারা হইবে, তোমার মনোরূপী হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইবে। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

নৃসিংহের শক্তিই নারসিংহী। ব্রহ্মবিদ্যাই নারসিংহী শক্তি। কারণ, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই জীব নৃসিংহ হয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার আবির্ভাবে বিশিষ্টজ্ঞানরূপী অসুরগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ' কথাটি বলা হইয়াছে। সটাক্ষেপ শব্দের তাৎপর্য স্বকীয় শক্তিপ্রভাব। বিশিষ্ট জ্ঞানগুলিকে নক্ষত্র বলিবার একটু উদ্দেশ্য আছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে বিষয়গুলি গ্রহণ করি, অর্থাৎ যে বিশিষ্টজ্ঞানগুলিতে বিচরণ করি, উহাদের মধ্যে অতি ক্ষীণভাবে একটু আলো বা আত্মপ্রকাশ আছে। আত্মপ্রকাশ না থাকিলে, কোনওরূপ বিশিষ্টজ্ঞান হইতেই পারে না। নারসিংহী বা বিদ্যাশক্তি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সত্যজ্ঞানের সেই বিশিষ্টতাকে বিদূরিত করিয়া দেন। সাধক ! যদি তুমি সত্যই মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে—তোমার হৃদয়াকাশরূপ রণক্ষেত্র হইতে তোমারই স্বেচ্ছাকল্পিত বিশিষ্ট জ্ঞানগুলিকে অপসারিত করিয়া বিদ্যাশক্তি কিরূপ প্রযত্নে ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ-বোধ উদয়ের উপায় প্রদান করিয়া থাকে।

———০———

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥২০॥

অনুবাদ। এইরূপ ইন্দ্রের তুল্য রূপধারিণী বজ্রহস্তা গজারূঢ়া সহস্রনয়না ইন্দ্রাণী-শক্তি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্র—দেবাধিপতি। তাহার শক্তি ইন্দ্রাণী। বজ্রহস্তা, গজারূঢ়া প্রভৃতির ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে। এখানে কেবল সহস্রনয়না কথাটির রহস্য বুঝিতে পারিলেই এই মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। সহস্রশব্দ অসংখ্যবাচক। নয়ন শব্দের অর্থ প্রকাশ-শক্তি। যাঁহার প্রকাশভাবটি অসংখ্য বিশেষণযুক্ত হইয়া অসংখ্য প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, তিনিই সহস্রলোচন ইন্দ্র। তাঁহার সেই প্রকাশশক্তিটিই ইন্দ্রাণী। সমস্ত দেবাধিপত্য কথাটির তাৎপর্য—সমস্ত দেবশক্তির মধ্য দিয়া স্বকীয় শক্তি প্রকাশিত করা। পুরাণকারগণের আখ্যায়িকায়

বর্ণিত আছে—গুরুপত্নীহরণরূপ মহাপাপের ফলে ইন্দ্রের শরীরে সহস্র ক্ষত হইয়াছিল ; কঠোর তপস্যার ফলে সেই ক্ষতসমূহই পরে নেত্ররূপে পরিণত হয় । গুরু একমাত্র পরমাত্মা । তাঁহার স্বপ্রকাশশক্তিকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গের অধিপতি ইন্দ্রদেব যথার্থই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, এবং তাহারই ফলে স্বয়ং বহুভাবে বিভক্ত হইয়া পড়েন । তপস্যাদির ফলে একটু একটু করিয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইতে থাকে, তখন ঐ বহুভাবের ভিতর দিয়াই আত্মার স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই ইন্দ্রদেব সহস্রনয়ন হইয়া থাকেন । সাধক ! তুমিও দেখ—তোমার গুরুশক্তিকে তোমার ইন্দ্রিয়গণ নিয়ত অপহরণ করে ; তাই একই প্রকাশশক্তিকে নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া অসংখ্য প্রকারে ভোগ করিতে গিয়া, তোমাকে কতই না ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় । তুমি সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহায্যে ঐ অসংখ্য ক্ষতগুলির মধ্য দিয়া একই প্রকাশশক্তির অসংখ্য ভেদ দেখিতে অভ্যস্ত হও । তোমার ক্ষতগুলি নিশ্চয়ই নেত্ররূপে পরিণত হইবে ।

———○———

ততঃ পরিবৃত স্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥২১॥

অনুবাদ । অনন্তর স্বয়ং ঈশান সেই দেবশক্তিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে বলিলেন —এইবার আমার প্রীতির জন্য অসুরকুলকে নিহত করা হউক ।

ব্যাখ্যা । এ পর্যন্ত যে অষ্টশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী ইন্দ্রাণী এবং (পূর্বকথিত) চামুণ্ডা ব্রহ্মা মহেশ্বর কার্তিকেয় প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য যে শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অষ্টশক্তির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে । সাধকগণ সর্বশেষে এই শক্তিতত্ত্বেই উপনীত হন । তাই শাস্ত্রেও উক্ত আছে—**'শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে'** । যাহারা দ্বিজ অর্থাৎ বৈদিকী দীক্ষার ফলে যাহাদের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তাহারাই সাধক তাহারা সকলেই শাক্ত । শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কার্যতঃ এই শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে ; তবে যতদিন শক্তির সন্ধান না পায়, ততদিন আপনাদিগকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চায় না । ক্রমে যখন গুরুকৃপায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন দেখিতে পায়—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলে একমাত্র শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে । এই শক্তিজ্ঞান হইতেই জীবের মুক্তিদ্বার উদ্ঘাটিত হয় । সে যাহা হউক, শক্তি এবং শক্তিমান অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্য ও অধিষ্ঠিত শক্তি, এতদুভয় যে সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু, এবং অধিষ্ঠান-চৈতন্য যে শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তাহা এই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে, অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে । পূর্বেও বলিয়া আসিয়াছি—আত্মাকে শক্তিস্বরূপ বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লইবে, তাহা হইলেই সাধনপথ অনেক সুগম হইয়া উঠিবে । তবে বিশেষ কথা এই যে নির্বিকল্প বোধস্বরূপ আত্মাকে একেবারেই শক্তিস্বরূপ বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; তাই মহর্ষি মেধস্ প্রথমতঃ আত্মবিভূতিসমূহকে—আত্মার স্বাধীন বিলাসগুলিকে —শক্তিস্বরূপ বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন ; সেই জন্যই তিনি এস্থলে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিতত্ত্বের অবতারণা করিলেন । মনে রাখিও সাধক, শক্তি-বস্তু চৈতন্য হইতে অনতিরিক্ত পদার্থ । এস, এইবার এই মন্ত্রটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—**'ঈশান** পূর্বোক্ত শক্তিগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া অসুর নিধনের জন্য চণ্ডিকার নিকট প্রার্থনা করিলেন' । যে সমষ্টি অধিষ্ঠানচৈতন্যে পূর্বকথিত ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী প্রভৃতি অষ্টশক্তি প্রকাশিত হয়, তিনি ঈশান—তিনিই প্রলয়ের দেবতা বিশুদ্ধ বোধময় মহেশ্বর । ঈশানরূপ অধিষ্ঠানেই অষ্টশক্তি বিরাজিত। এই অষ্টশক্তি বিশিষ্ট ঈশান আজ চণ্ডিকাকে অসুরনিধনের জন্য অনুরোধ করিলেন । অর্থাৎ বিজ্ঞানময় সর্বভূতমহেশ্বর গুরু এতদিনে সর্বভাববিলয়ের জন্য চিতিশক্তির প্রতি অনুপ্রেরণা করিলেন । ঈশান আজ আপনাকে অষ্টশক্তির অধিষ্ঠানরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং অষ্টশক্তিকে অসুরহননে সমুদ্যত দেখিয়া স্বয়ং চিতিশক্তিকে বিশেষ-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন ।

সাধক ! দেখ না একবার নিজের বুকের দিকে চাহিয়া ! তোমার জ্ঞানরূপী মহেশ্বর শববৎ শায়িত, তাঁহার যে কোন চেষ্টা বা কার্য আছে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। উহাকে পদতলে বিমর্দিত করিয়া নানাবিধ শক্তি এতদিন

বিষয়সম্ভোগের—বহুত্বের তাণ্ডব নৃত্যবিলাস করিতেছিল ! আজ সেই শক্তিসমূহ বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বহুত্বকে—সর্বত্বকে বিলয় করিয়া এক অখণ্ড চিতিশক্তিতে মিলাইয়া যাইবার জন্য উদ্যত। ধন্য সাধক তুমি ! ধন্য তোমার সাধনা ধন্য তোমার মানব-জীবন ! আজ তোমার হৃদয়স্থ গুরু—স্বয়ং ঈশান অসুরক্ষয়ের জন্য সচেষ্ট । এতদিন শুধু তুমিই অসুর অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতে, আজ তোমার গুরুও তোমাকে সম্যক্ নির্মুক্ত করিবার জন্য উদ্যত । তোমার আর ভয় নাই । তুমি অচিরে অখণ্ড পরমানন্দ রসের আস্বাদ পাইবে ।

ঈশান বলিলেন—**'মমপ্রীত্যা'** আমার প্রীতির জন্য । অসুরকুল নিহত হইলেই ঈশানের পরম প্রীতি লাভ হয় । গীতায় উক্ত হইয়াছে—**'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'** সমস্ত কর্ম অর্থাৎ যাবতীয় শক্তিপ্রবাহ জ্ঞানে অর্থাৎ ঈশানে আসিয়া পর্যবসিত হয় ; অসুরকুল নির্মূল হইলেই ঈশান সর্বশক্তিসমন্বিত হইয়া সর্বতোভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন, তাই অসুরনিধনে তাঁহার একান্ত প্রীতি আছে ।

———◦———

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা ।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২২॥

অনুবাদ । অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা চণ্ডিকা শক্তি এবং অতিউগ্রা ও ভয়ানক নিনাদকারিণী শত শত শিবা বিনিষ্ক্রান্ত হইল ।

ব্যাখ্যা । দয়াময় গুরু ঈশান প্রার্থনা করিলেন—**'হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং'** অসুরগণকে শীঘ্র হনন করুন । কিন্তু ঈশানের এইরূপ প্রার্থনার প্রত্যুত্তরস্বরূপ দেবী একটিও বাক্য প্রয়োগ করিলেন না ; কেবল স্বকীয় শরীর হইতে অতিভীষণা এক চণ্ডিকাশক্তি এবং বহু সংখ্যক শিবা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন । পূর্বমন্ত্রে যে চণ্ডিকাশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অম্বিকাদেবীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; কারণ এইমন্ত্রে দেবীর শরীর হইতে পুনরায় অতি ভীষণা চণ্ডিকাদেবীর নিষ্ক্রামণ বর্ণিত হইয়াছে । চণ্ডিকা—অতি কোপনা সংহারকারিণী শক্তি । অম্বিকা মা আমার নিত্য নির্বিকারা তাহাতে তোষ বা রোষ কিছুই নাই ; সেই জন্যই তাঁহা হইতেই অতিকোপময়ী চণ্ডিকা নাম্নী এই অত্যুগ্রা শক্তির নিষ্ক্রামণ।

চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকাদেবী স্বয়ং অপরিণামিনী নির্বিকারা বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপা । তিনি স্বয়ং কিছু করেন না, অথচ তাঁহাতেই সর্বভাবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে । আবার যাহার যাহা কিছু প্রার্থনা, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি থাকে, তাহাও তাঁহার নিকটই করিতে হয় । তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছু না করিলেও পরোক্ষে অভূতপূর্ব উপায়ে সাধকের প্রার্থনা কোন না কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া থাকেন । এই দেখ, ঈশান প্রার্থনা করিলেন —**'হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রম্'** অথচ অম্বিকা একটি কথাও বলিলেন না । কিন্তু দেখা গেল—অম্বিকার শরীর হইতে অত্যুগ্রা চণ্ডিকাশক্তি ও শত শত শিবা বিনির্গত হইয়া আসিল । ইহাতেই বুঝা যায়—তিনি ঈশানের প্রার্থনাপূর্ণ বিষয়ক কোনরূপ বিশেষ অনুষ্ঠান না করিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার উদ্যম করিলেন। অথচ পূর্বে কিছুই বুঝিতে দিলেন না । মা আমার এমনই ছলনাময়ী বটে ! সাধক ! তুমি মা মা করিয়া যতই মাথা খুঁড়িয়া মর, যতই আকুলপ্রাণে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া মা মা করিয়া কাঁদিতে থাক, আপনার অভাব অভিযোগগুলি মাকে জানাইবার জন্য যতই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাক, তথাপি মা যে তোমার একটি কথাও শুনিতেছেন, এমন ভাবটিও প্রকাশ পায় না । তোমার সহস্র আর্তনাদ, সহস্র ব্যাকুলতা সে নির্বিকার ধীর স্থির মাতৃ-বক্ষকে বিন্দুমাত্র সংক্ষুব্ধ বা চঞ্চল করিতে পারে না । মা আমার যেমন ধীরা স্থিরা তেমনই অচল মূর্তিতে দাঁড়াইয়া থাকেন ;—যেন কিছুই জানেন না । তারপর হঠাৎ একদিন তুমি দেখিতে পাইলে—তোমার অভাব-অভিযোগগুলি পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে ; তোমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে ।

ঠিক এমনই হয় ; মা আমার এমনই ছলনাময়ী বটে ! মহাভারত বর্ণিত একটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিতেছি—দ্বৈতবনে পঞ্চ-পাণ্ডবের বনবাস কালে যখন ষষ্টি সহস্র শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনি তাঁহাদের আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন, তখন দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ হইয়াছে ; সুতরাং সূর্যপ্রদত্ত অক্ষয় পাকস্থালীও অন্নশূন্য । বড়ই বিপদ ! ব্রহ্মশাপে সর্বনাশ হইবার উপক্রম । এইরূপ ঘোর

বিপদে পড়িয়া তখন তাঁহারা সকলে বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। পাণ্ডবগণ অবসন্ন তন্দ্রাগ্রস্থ। কেবল দ্রৌপদী জাগ্রতা। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি দ্রৌপদীকে বলিলেন — সখি দ্রৌপদি ! অনেক দিন ধর্মরাজের কোন সংবাদ পাই নাই, তাই এই পথে যাইবার সময় একবার সংবাদ নিতে আসিলাম। আর একটি কথা, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত ; সখি ! আমায় কিছু অন্ন দাও।

সাধক ! বুঝিতে পার কি তখন দ্রৌপদীর মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? জগৎপতি প্রাণপতি পরম প্রিয়তম ব্রহ্মাণ্ডের অন্নদাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আজ ক্ষুধিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন, অথচ গৃহে অন্ন নাই। দ্রৌপদীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নয়—রুধিরধারা নির্গত হইতেছিল। দ্রৌপদী তখন সব ভুলিয়া গেলেন। আজ পাণ্ডবকুল যে ব্রহ্মশাপে নির্মূল হইতে চলিয়াছে, সে কথা পর্যন্ত মনে নাই। আজ সর্বস্ব দিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা দূর করিতে পারিতেন, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না ; কিন্তু তখন এমন কোন উপায় ছিল না, যাহাতে প্রিয়তমের ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারেন। অগত্যা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন— জগন্নাথ ! অন্তর্যামিন্ ! বিশ্বের অন্নদাতা! আজ তুমি আমাকে এ কি মর্মপীড়া দিলে, আমার এ ব্যথা একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে ? প্রাণেশ্বর ! আজ তুমি ক্ষুধার্ত হইয়া আমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছ, আর আমি অন্নহীনা (আর লিখিতে পারি না)।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অটল অচল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত ; সখি, তোমার যাহা আছে, তাহাই দাও। দ্রব্যের পরিমাণ দেখিও না, শুধু শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ কর। তখন সেই স্থালীলগ্ন কণিকামাত্র শাকান্ন শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া দারুণ মর্মপীড়ায় দৌপদী আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, এদিকে **'তৃপ্তোঽস্মি'** বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। কিছুকাল পরে দ্রৌপদী প্রকৃতিস্থ হইয়াও কি ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জানিতে পারিলেন—ষষ্টি সহস্র শিষ্যসহ দুর্বাসা পরিতৃপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সাধক ! ভগবানের এই সব লীলারহস্য অনুধাবন করিতে পার কি ? সে যাহা হউক, আজ এই দেবীমাহাত্ম্যেও দেখিতে পাই—ঈশানের প্রার্থনায় কোনরূপ উত্তর না দিয়াও অম্বিকা মা আমার কার্যতঃ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ক্রমে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, অম্বিকা—নির্বিকারা চিতিশক্তি। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্বিকারা চিতিশক্তি হইতে চণ্ডিকা এবং শত শত শিবার আবির্ভাব কিরূপে হইবে ? যাহা হইতে কোন কিছুর আবির্ভাব হয়, তাহা ত' অবিকারী বস্তু নয় ! ইহার উত্তরে বলিতে হয়—এ যে বিকার, উহা পরমার্থরূপে নাই, কল্পিত বা ব্যবহারিক মাত্র। অনন্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অম্বিকাদেবীর শরীর হইতে চণ্ডিকাশক্তি এবং অসংখ্য শিবা নির্গত হইলেও, তাহাতে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না। বস্তুর অন্যথাভাব প্রাপ্তির নাম বিকার। চিতিশক্তি বাস্তবিক কোন অবস্থায়ই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না। অসংখ্য ভেদের ভিতর দিয়াও তাঁহার একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব অব্যাহত থাকে।

শিবাশতনিনাদিনী—শিবের শক্তি শিবা। প্রলয়কালে সকল জীব যাহাতে শয়ন করে, তিনিই শিব। শিব শব্দের উহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। শিবা শব্দের সাধারণ অর্থ শৃগাল হইলেও, আমরা কিন্তু এ স্থলে প্রলয়কালীন শক্তি বুঝিয়া লইব। অম্বিকার শরীর হইতে অসংখ্য প্রলয়াত্মিকা শক্তির বিকাশ হইল। উহারা প্রলয়কালীন নিনাদ অর্থাৎ হুঙ্কার করিতে লাগিল। অথবা শতনিনাদিনী শব্দটিকে পৃথক্ও করা যায়। এরূপ করিলে শত নিনাদিনী শব্দের অর্থ—অনবরত ভয়ঙ্কর গর্জনকারিণী শিব অর্থাৎ প্রলয়শক্তি এইরূপ অর্থ হয়। এইরূপ অর্থও উপাদেয়ই বটে।

———o———

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২৩॥
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৪॥

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভূজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৫॥
বলাবলেপাদথ চেত্তবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অতঃপর সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা দেবী ধূম্রবর্ণ জটাধারী ঈশানকে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি দূতরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করুন এবং অতি গর্বিত শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্য যে সকল দানব সেখানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে বলুন—ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুক, দেবতাগণ হবির ভাগ গ্রহণ করুক ; আর তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে প্রয়াণ কর। পক্ষান্তরে, যদি বলগর্বিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষী হও তবে এস, তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণ পরিতৃপ্ত হউক।

ব্যাখ্যা। অম্বিকার শরীর হইতে আবির্ভূতা চণ্ডিকাদেবী ঈশানকে দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত করিলেন। অষ্টশক্তির অধিষ্ঠানচৈতন্যই ঈশান ! ইনিই ঈশিতা নিয়ন্তা, ইনিই জ্ঞানের দেবতা শিব ! জ্ঞানের কার্য—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক—হিতাহিত বিচার। কোন গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিবার সময়, ঐ ঈশানই জীবের অন্তরে থাকিয়া, বিবেকরূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য হইতে জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। ঈশান আজ এখানে ধূম্র জটিল মূর্তিতে আবির্ভূত। প্রলয়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং জ্ঞানের স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণের মিশ্রণে ধূম্রবর্ণ শক্তিপ্রবাহ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া আজ জ্ঞানের দেবতা শম্ভু প্রলয়ের বার্তা লইয়া দূতরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দৈত্যগণের নিকট তাঁহাকে যে সকল কথা বলিতে হইবে, চণ্ডিকা দেবী তাহাও বলিয়া দিলেন।

প্রথম—'**ত্রৈলোক্যমিন্দ্রোলভতাম্**'। ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুক। পূর্বে বলা হইয়াছে—'**ত্রৈলোক্যাধিপতি শুম্ভঃ**'। মা এবার শুম্ভকে সেই ত্রিলোকাধিপত্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। অস্মিতা যে আপনাকেই ত্রিলোকের অধিপতি বলিয়া বুঝিয়াছিল, ঐ ভাবটি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহার ত্রিলোক, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মাই যে ত্রিলোকের যথার্থ অধিপতি, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। '**ইন্দ্রোমায়াভিঃ**' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ইন্দ্র শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র আত্মাই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিলোকের অধিপতি, অস্মিতা যে কখনই ত্রিলোকাধিপতি হইতে পারে না, ইহাই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে ; ইহাই মায়ের আমার দূতমুখে শুম্ভের প্রতি প্রথম আদেশ !

তারপর দ্বিতীয় আদেশ—'**দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ**'। দেবতাগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুক। অস্মিতার বিভিন্ন ব্যূহরূপী অসুরগণ যে অমৃতস্বরূপ যজ্ঞভাগ অর্থাৎ চৈতন্যাংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে ; এইরূপ করিলেই দেবতাগণ বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশরূপে প্রতিভাত হইয়া যজ্ঞভুক্ হইতে পারেন। এই যজ্ঞভাগ হরণের রহস্য ইতিপূর্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মায়ের তৃতীয় আদেশ—'**যূয়ং প্রয়াত পাতালম্**'। তোমরা পাতালে যাও। অস্মিতা মমতা ও তাহাদের অনুযায়িবর্গের স্বর্গে অর্থাৎ চিৎক্ষেত্রে আর স্থান হইবে না ; পাতালে—জড়ক্ষেত্রে—দৃশ্যবর্গের মধ্যে পরিণত হইতে হইবে। এতদিন অস্মিতা আপনাকেই দ্রষ্টৃস্বরূপ বলিয়া মনে করিত, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বস্বরূপ অস্মিতাই আত্মারূপে প্রতিভাত হইতেছিল, এখন আর তাহা থাকিবে না ; যিনি যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই এখন স্বরূপে অবস্থান করিবেন। অস্মিতা প্রভৃতিকে দৃশ্যবর্গরূপে বিলয়প্রাপ্ত হইতে হইবে। অম্বিকা মা আমার শুম্ভ নিশুম্ভকে পাতালে যাইবার আদেশ করিলেন, ইহার মধ্যেও একটু রহস্য আছে। পরমাত্ম-স্বরূপ উদ্ভাসিত হইবার পরও প্রারব্ধ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত অস্মিতা মমতা প্রভৃতির বাধিতানুবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধক যখন পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তখনই উহারা সম্যক্ অদৃশ্য থাকে। ব্যুত্থানদশায় পুনরায় উহাদের আবির্ভাব হয়। এইরূপ আবির্ভাব হইলেও উহারা আর দ্বৈতপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না। কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অস্মিতা প্রভৃতির পারমার্থিকত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

মায়ের চতুর্থ আদেশ—'**যদি বলগর্বিত হইয়া যুদ্ধার্থী হও, তবে এস, আমার শিবাগণ তোমাদের মাংসে পরিতৃপ্তি লাভ করুক**'। অস্মিতা মমতা ও তদীয় অনুচরবর্গ যদি আপনা হইতেই দৃশ্যবর্গের ন্যায়

বিলয়প্রাপ্ত হইতে না চায়, তবে মায়ের শরীর হইতে বিনির্গত প্রলয়াত্মিকা শক্তিসমূহ অচিরাৎ উহাদিগকে বিলয় করিয়া দিবে। শিবাগণ—প্রলয়ঙ্করী শক্তিসমূহ প্রলয়যোগ্য বস্তুর অভাবে এতদিন যেন অনশনে ছিল, এইবার অস্মিতা প্রভৃতিকে প্রলয়-কবলিত করিয়া তাহাদের প্রলয়ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে। শিবাগণ পরিতৃপ্ত হইবে।

অম্বিকার শরীর হইতে চণ্ডিকাশক্তি বিনির্গত হইয়া ঈশানকে দূতরূপে শুম্ভের নিকট প্রেরণ করিলেন। অম্বিকা স্বয়ং কিছুই করেন না, তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণা। অথচ তাঁহাকে অধিষ্ঠানরূপে পাইয়া তাঁহার শক্তিতে চৈতন্যময় হইয়াই যাবতীয় বিশিষ্ট ভাব যাবতীয়-কার্য সম্পাদন করে। চণ্ডিকার এই দূতপ্রেরণ যে সফল হইবে না, ইহা তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন। শুম্ভ যে স্বেচ্ছায় পাতালে গমন করিবে না, ইহা তিনি ভালরূপেই বুঝিতেন; তথাপি মাত্র কর্তব্যজ্ঞানে উহার অনুষ্ঠান করিলেন। ফলের দিকে লক্ষ্যহীন—কেবল কর্তব্যবোধে কর্মানুষ্ঠানই যে জীবকে যথার্থ শান্তির পথে আনয়ন করিতে পারে, ইহা বুঝাইবার জন্যই মায়ের এইরূপ লীলা। শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রসমরের প্রারম্ভে দূতরূপে দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচখানিমাত্র গ্রাম পাণ্ডবদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ত' পূর্ণ হয়ই নাই, অধিকন্তু দুর্যোধনের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছিত হইবারও উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কি জানিতেন না যে, ভারত-সমর অনিবার্য? তথাপি কিন্তু স্বয়ং কর্তব্যবোধে যুদ্ধবিরতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধক! যাহা তুমি কর্তব্যরূপে বুঝিয়া লইবে, তাহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঠিক এইরূপই অনুষ্ঠান করিয়া যাইবে। **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** গীতার এই অপূর্ব মন্ত্রটির কার্যকরী অবস্থাটি বিশেষভাবে দেখাইবার জন্যই বোধ হয় চণ্ডিকাদেবী ঈশানকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আর একটি বিষয়ও দেখিবার যোগ্য—আমরা যখন যে কার্যের অনুষ্ঠান করি, আমাদের হৃদয়স্থ দেবতা বিবেকরূপী ঈশান, অন্তরে অন্তরে নীরব ভাষায় উহার কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ক আদেশ করিয়া থাকেন। যখন আমরা এই হৃদয়স্থ গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করিতে পারি, তখন আমরা অভ্যুদয়ের সন্নিহিত হই। আর যখন গুরুর আদেশকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াও প্রেয়ের আকর্ষণে শ্রেয়কে উপেক্ষা করি, তখনই আমাদের নিম্নগতি সূচিত হয়। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলেও শুম্ভ নিশুম্ভ এবং অন্যান্য অসুরগণ ঈশানের বাক্য অবহেলা করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

জানি প্রভু, তোমার আদেশ তোমার ইঙ্গিত পালন করাই আমাদের শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু কই, নির্বিচারে তোমার আদেশ শিরোধার্য করিতে পারি কই গুরো? তুমি ঈশান, তুমি নিয়ন্তা, তুমিই আমাদের ইহ-পরকালের একমাত্র গতি; এই কথাটা যে কিছুতেই মর্মে মর্মে ধারণা করিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের এই দুর্বলতা একমাত্র তুমিই দূর করিতে সমর্থ। গুরো! তোমার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা আনিবার উপায়ও একমাত্র তুমিই। বহুদিন হইতে, বহু জন্ম হইতে শুধু এই দুর্বলতার জন্যই তোমার অভয় অঙ্ক হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি। আর না, আর যে পারি না প্রভো! আমায় নিয়ে চল। শুধু উপদেশ, শুধু পথ দেখাইয়া দিলে চলিবে না। আমি যে গতিহীন, আমি যে শক্তিহীন; সুতরাং উপদেশ আমার কি করিবে? তুমি নিজে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চল প্রভু! আমায় নিয়ে চল। শুধু অন্তরে থাকিয়া নীরব ভাষায় আদেশ করিও না। আদেশ প্রতিপালনের সামর্থ্যরূপেও তুমিই আবির্ভূত হও।

সাধক! এমনই করিয়া ঈশানের চরণে সরল প্রাণে নিবেদন কর, তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে বল আসিবে, গুরুর আদেশ পালনের সামর্থ্য আসিবে! তখন অবলীলাক্রমে এই সকল গহনতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া জন্ম মৃত্যুর পরপারে অতি সহজে উপনীত হইতে পারিবে। তোমার বহুজন্ম-ব্যাপী কঠোর সাধনা ফলবতী হইবে।

———○———

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সাখ্যাতিমাগতা॥২৭॥

অনুবাদ। যেহেতু সেই দেবী (চণ্ডিকা) কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি লোকমধ্যে শিবদূতী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা। স্বয়ং শিব যাঁহার দূত, তিনি শিবদূতীই বটেন। যাঁহার প্রেরণায় অন্তর্যামী পুরুষ প্রতিজীবের

অন্তরে থাকিয়া জীবের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করেন, যাঁহার প্রেরণায় ঈশান নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বা বিচার রূপে প্রতিজীবের অন্তরে অবস্থান করেন, তিনিই শিবদূতী। শিবকে—বিজ্ঞানময় গুরুকে দূতরূপে নিয়োগ করিবার সামর্থ্য একমাত্র চিতি শক্তিরই আছে। তাই অম্বিকার শরীর হইতে নির্গত চণ্ডিকাদেবী ঈশানকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিলেন। চিতিশক্তি স্বয়ং সর্বভাবাতীত বলিয়া তদাশ্রিত বা তদুৎপন্ন শক্তিসমূহই সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সাধক, যতক্ষণ বিজ্ঞানময় গুরু চিতিশক্তির অমৃতময় বার্তা লইয়া দূতরূপে জীবের নিকট উপস্থিত না হন, ততদিন জীবের কি সাধ্য যে, জগতের ধুলা-খেলাকে তুচ্ছ করিয়া অমৃতের অন্বেষী হয়। গুরুই ত' একান্ত আগ্রহে মায়ের নিকট গিয়া বলেন, —'**হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যা**'—'আমার প্রীতির জন্য শীঘ্র অসুর বিনাশ করুন'। গুরুর ইচ্ছায়ই ত' চণ্ডিকাকর্তৃক অসুরগণ নিপাতিত হয়। যতদিন গুরুর হৃদয়ে অসুর-বিনাশের ইচ্ছা না জাগে, ততদিন চণ্ডিকাদেবী অসুর নিধন করিতে উদ্যত হন না। কি হইলে গুরুর এইরূপ মঙ্গলময়ী ইচ্ছা জাগে, তাহা জানিতে চাও। তবে শুন—যখন শিষ্যের ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকে না, শিষ্য হৃদয়ের প্রত্যেক ইচ্ছাটি যখন গুরুর ইচ্ছারই সম্যক্ অনুবর্তন করে, তখনই বুঝিতে হইবে, অসুর-নিধনের জন্য গুরুর অনুপ্রেরণা আসিতে আর বিলম্ব নাই। গুরুকে দেখিতে পাও না ? এই বিশ্বই যে গুরুর স্থূলরূপ। গুরুকে দেখিতে পাও না ? ঐ যে অন্তরে অন্তরে বোধরূপে, জ্ঞানরূপে, হিতাহিত বিচাররূপে নিত্যই তিনি বিরাজিত। তথাপি দেখিতে পাও না ? তবে শুন—যিনি স্থূলে বিশ্বমূর্তি, সূক্ষ্মে কেবল জ্ঞানমূর্তি, তিনিই আবার বিশেষ করুণায় বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিজ্ঞানময় গুরু ঘন হইয়াই মনুষ্যের আকার ধারণ করেন! গুরু কখনও মানুষ হন না, অথবা মানুষ কখনও গুরু হয় না। গুরু, নিত্যই গুরু, নিত্যই ঈশান, নিত্যই সর্বভূত-মহেশ্বর—বিশ্বনাথ। যাহাদের হৃদয়ে মা আমার শ্রদ্ধামূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেবল তাহারাই গুরুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

সাধক, এই যে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বা বিচার বলিয়া কথাটা শুনিতে পাও, ঐ যে বিবেক, ঐ যে বিচার, উহাই ত' গুরুর প্রকট কৃপা। কেবল শ্রবণ দ্বারা, কেবল মৌখিক আলোচনা দ্বারা কখনও নিত্যানিত্য-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় না। নিত্য বস্তুতে বিচরণ করিতে না পারিলে, অনিত্য বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তদ্‌বিষয়ে আগ্রহ ত্যাগ কিছুই উপস্থিত হয় না। নিত্যানিত্য বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানের প্রতি একমাত্র গুরুকৃপাই অব্যর্থ হেতু। গুরুর আসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে, জীব নিশ্চয়ই নিত্যানিত্য বস্তুবিচারে সমর্থ হয়।

সে যাহা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি—হিতোপদেশ লইয়া ঈশান শুম্ভের নিকট উপস্থিত। সাধক, তোমরাও লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তোমার প্রত্যেক কার্যেই এইরূপ ঈশানের আবির্ভাব হয় কি না ?

———○———

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৮॥

অনুবাদ। ঈশান বর্ণিত দেবীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া অসুরগণ অত্যন্ত ক্রোধের সহিত, যেখানে কাত্যায়নী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ব্যাখ্যা। '**আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধি**' '**ন শৃণ্বন্তি সুহৃদ্‌বাক্যং হতায়ুষঃ**' আসন্নকালে জীবের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয় ; হতায়ু ব্যক্তি সুহৃদের হিতোপদেশ শ্রবণ করে না। অসুরগণও এই নীতির অন্যথা করিল না ; তাহারা প্রলয়-পুরীর আতিথ্যস্বীকারে উদ্যত হইল। শর্বকর্তৃক আখ্যাত অর্থাৎ ঈশানকর্তৃক বর্ণিত দেবীর তিনটি আদেশই অসুরগণ উপেক্ষা করিল ! দেবী বলিয়াছেন—'**ত্রৈলোক্য মিন্দ্রোলভতাং, দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ যুয়ং প্রয়াত পাতালম্**' এই তিনটি আদেশ অমান্য করিয়া, অসুরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইল ; সুতরাং মায়ের চতুর্থ বাক্য নিশ্চয় সফল হইবে। অচিরে অসুরের মাংসে শিবাগণের পরিতৃপ্তি সাধন হইবে।

শুন, অস্মিতা যে আত্মা নহে, বুদ্ধি যে স্বয়ং চৈতন্য নহে, ইহা আমরা যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে বিশেষরূপ

বুঝিতে পারিলেও, আমাদের কার্যগুলি তাহার বিপরীতভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । কার্যতঃ আমরা অস্মিতাকেই আত্মারূপে এই বুদ্ধিকেই চৈতন্যরূপে গ্রহণ করি । সুতরাং ঈশানের উপদেশ— বিবেকের বাণী আমাদের নিকট কোনও কার্যকরী হয় না । আমরা কিছুতেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বস্তুকে পরিগ্রহ করিতে পারি না, ভয় হয়— পাছে আমার বড় সাধের আমিটি হারাইয়া যায় ! কিন্তু এইবার আশা হইয়াছে— অসুরগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কাত্যায়নীর নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং উহাদের প্রলয় অবশ্যম্ভাবী ।

এই মন্ত্রে অম্বিকাদেবীকেই কাত্যায়নী বলা হইয়াছে। কাত্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ; তাঁহারা যাঁহাকে অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনিই কাত্যায়নী । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ একমাত্র চিতিশক্তিকে অর্থাৎ অম্বিকাদেবীকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন ; তাই মা আমার কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা । সাধক অচিরে ব্রহ্মবিদ্ হইবেন তাই ঋষি এখানে মাকে আমার কাত্যায়নী নামে অভিহিত করিলেন ।

———o———

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥২৯॥
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান ।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৩০॥

অনুবাদ । অনন্তর প্রথমেই ক্রোধে উদ্ধত অসুরগণ দেবীর প্রতি শর, শক্তি এবং ঋষ্টি অস্ত্রসমূহ বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং দেবীও সেই অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ শূল চক্র এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্রগুলিকে অবলীলাক্রমে শব্দায়মান ধনু হইতে বিমুক্ত মহাশরসমূহ প্রয়োগ করিয়া ছিন্ন করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা । যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে আততায়ী পক্ষ কহে, এবং যাহারা পরে অস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষী পক্ষ কহে ; যুদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রথম কৌরব পক্ষ শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; সেইজন্য দুর্যোধনাদি আততায়ী পক্ষ এবং পাণ্ডবগণ আত্মরক্ষী পক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এখানেও দেখিতে পাই— অসুরগণই প্রথমে মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত । উহারা আত্মাকে হনন করিতে চায়, তাই আততায়ী । শাস্ত্রে উক্ত আছে— আততায়ীকে নির্বিচারে হত্যা করিবে । তাই মা আমার অচিরাৎ ইহাদিগকে হত্যা করিয়া, স্নেহের সন্তানকে অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ।

এইবার আমরা অসুরগণের অস্ত্র-প্রয়োগের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব । ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল প্রভৃতি সংস্কারসমূহ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহমাত্র। উহারা স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবের দ্বারা আত্মবোধকে বিশেষিত করিতে প্রয়াস পায়, ইহাই অসুরগণের মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ । পূর্বোক্ত ঘৃণা-লজ্জাদি বিশিষ্ট ভাবগুলি আত্মবোধের সহিত এমনই জড়াইয়া গিয়াছে যে, পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা আত্মার অসঙ্গত্ব নির্ণীত হইলেও ঐ সকল ভাব পুনঃ পুনঃ আত্মবোধকে বিশিষ্ট করিয়া তুলে । সর্বথা অসঙ্গ আত্মাকে কোন প্রকারে বিশেষিত করাই অসুরদিগের অস্ত্র-প্রয়োগ ।

এইরূপ উদায়ুধ প্রভৃতি অসুরগণ অর্থাৎ ঘৃণা-লজ্জাদি পাশসমূহ পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ চিতিশক্তির অঙ্গে নানাভাবরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল ; তখন মা আমার শব্দায়িত ধনু হইতে মহা ইষু নিক্ষেপ করিয়া অসুর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলিকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । শব্দায়িত ধনু হইতে মহা ইষু নিক্ষেপ করাই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য উপাসনার রহস্য। প্রণবরূপ ধনুতে আত্মবোধরূপ শর সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতে হয় । ঐরূপ করিলেই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন ; সুতরাং ঘৃণা-লজ্জাদিবিশিষ্ট ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায় । আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে আপনাকে বিচ্যুত বা পৃথকরূপে দর্শন করেন বলিয়াই ত' তাঁহাকে অষ্টপাশরূপী অসুরগণের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে হয় । শুধু পূর্বোক্ত শরপ্রয়োগে অর্থাৎ উপাসনা রূপ তীব্র প্রযত্নের ফলেই আত্মার নির্বিশেষ স্বরূপটির উপলব্ধি হয় ।

সাধক ! তুমিও তোমার বহুজন্মসঞ্চিত অষ্টপাশরূপী আসুরিক ভাবগুলিকে ধরিয়া মায়ের অঙ্গে নিক্ষেপ কর । তুমি মায়ের কৃপায় অচিরে পাশমুক্ত হইবে—জীবত্ব বিদূরিত হইবে, শিবত্ব লাভ হইবে । আর যদি মাতৃ-চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, তবে আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না ; সাধন-সমরে প্রবিষ্ট

সাধকগণের ন্যায় তোমাকেও মা স্বয়ংই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইবেন।

———০———

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরত্তদা ॥৩১॥

অনুবাদ। তখন কালী অরিগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্বাঙ্গদ্বারা প্রোথিত করিয়া তাহার (অম্বিকার) সম্মুখভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এইবার দেবশক্তিসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অসুরক্ষয়ের বিবরণ বর্ণিত হইবে। প্রথমে কালী বা চামুণ্ডা-শক্তির কথা হইতেছে। তিনি কতকগুলি অসুরকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ, অপর কতকগুলিকে খট্বাঙ্গদ্বারা প্রোথিত করিলেন। যদিও কালীশক্তির বিনিষ্ক্রমণকালে বিশেষভাবে শূলাস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই, কেবল অসি, পাশ, খট্বাঙ্গ এই তিনটি অস্ত্রেরই উল্লেখ আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে,—এই অষ্টশক্তি যখন ঈশানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, তখন ঈশানের বিশেষ অস্ত্র শূল প্রত্যেক শক্তিরই আছে। শূলাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। শূল শব্দে সাধারণতঃ ত্রিশূলই বুঝায়। ত্রিপুটী জ্ঞানই ত্রিশূল। অসুর নিধনের পক্ষে এমন অব্যর্থ অস্ত্র আর নাই। মহিষাসুর হইতে শুম্ভ পর্যন্ত প্রধান প্রধান অসুরগুলি সকলেই এই শূলাঘাতে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধক! দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশূল বলিতে জ্ঞানের ত্রিপুটী বুঝিয়াছিলে, আর এখানে উহাকে আনন্দের ত্রিপুটী বলিয়া বুঝিয়া লইবে। আনন্দ, তাহার অনুভব এবং আনন্দের অনুভবকর্তা, এই তিনটিকে আনন্দের ত্রিপুটী কহে। একই আনন্দ বস্তু এই ত্রিবিধ স্পন্দনে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। এইটি যখন সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তখনই অসুরকুল নির্মূল হয়; তাই বলিতেছিলাম—অসুর-নিধন পক্ষে ত্রিশূল অস্ত্রই বিশেষ কার্যকরী।

কালী—প্রলয়ঙ্করী শক্তি এইরূপে আনন্দের ত্রিপুটী প্রয়োগে ষড়শীতিসংখ্যক উদায়ুধবংশীয় অসুরগণকে নিহত করিয়া, অম্বিকা দেবীর অগ্রভাগে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি—বিশুদ্ধ চিতিশক্তির সম্মুখভাগেই প্রলয়-শক্তি বিরাজ করে। কারণ, সর্বভাবের বিলয় না হইলে পরমাত্ম বোধ উদ্ভাসিত হয় না। তাই মন্ত্রে '**তস্যাগ্রতোব্যচরৎ**' এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। '**তস্যাগ্রতঃ**' পদটিতে তস্যাঃ শব্দটির বিসর্গলোপ হওয়াতেও সন্ধি হইয়াছে; উহা আর্ষ প্রয়োগ। সে যাহা হউক, যদিও এই মন্ত্রে উদায়ুধ-অসুরের নিধন বর্ণিত হয় নাই, তথাপি বুঝিয়া লইতে হইবে—শুম্ভের আদেশে যে আটটি অসুর-সম্প্রদায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা-লজ্জাদি অষ্টপাশরূপে বুঝিয়া লইয়াছি, এইবার সেই অষ্টপাশরূপী আটটি অসুর-সম্প্রদায় অম্বিকার শরীর হইতে বিনির্গত অষ্টশক্তিকর্তৃক ক্রমে ক্রমে নিহত হইতেছে। তন্মধ্যে চামুণ্ডা-শক্তি উদায়ুধ নামক অসুরকে অর্থাৎ জীবের ঘৃণা নামক প্রথম পাশকে বিলয় করিয়া দিলেন। একমাত্র অখণ্ড আনন্দসত্তা ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই ইহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের ভেদজ্ঞান সম্যক্ অপনীত হয়। ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইলেই জীবের ঘৃণানামক সংস্কার চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে সাধক প্রথম পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

———০———

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৩২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাণী যুদ্ধক্ষেত্রের যে যে অংশে দ্রুতবেগে গমন করিতেছিলেন, কমণ্ডলু-জলনিক্ষেপে সেই সেই অংশের শত্রুদিগকে হতবীর্য ও হতোদ্যম করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। যে শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টির অব্যক্ত বীজগুলি পুনরায় সৃষ্টি কার্যের উপযোগী হইয়া থাকে, সেই শক্তিই সৃষ্ট জীবের জীবন। উহাই ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলুস্থিত জল। ঐ জল অর্থাৎ জীবনীশক্তি নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মাণী অসুরদিগকে হতবীর্য এবং হতোদ্যম করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলু-জলক্ষেপরূপ ব্যাপারটিরদ্বারা বীজ-সমূহের পুনরায় ভাবোৎপাদনের সামর্থ্য অর্থাৎ বীজের বীজত্ব বিনষ্ট হইতেছিল। সাধক মনে রাখিও—মা যতদিন এইরূপ ব্রহ্মাণী -মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টির বীজাধার হইতে জল বা জীবনীশক্তিকে অপসারিত করিয়া না দেন,

ততদিন জন্মমৃত্যুর স্রোত নিরুদ্ধ হয় না। সাধকের নিজের চেষ্টায় ইহা কোনও রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদের পুঞ্জীভূত ইচ্ছার তলদেশে কোথায় কোন্ সংস্কার লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা জানি না, জানিতে পারি না ; কিন্তু মায়ের তীব্র দৃষ্টিতে সে সকলই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। সেই লুক্কায়িত সংস্কারগুলিকে প্রকট করিয়া, উহার জীবনীশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেওয়াই ব্রহ্মাণীশক্তির কার্য। সাধকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন—সাধনার পথে যতই বেশী অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রতিকূল সংস্কার অতি তীব্রবেগে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এবং তাহারই প্রভাবে অনেক সাধক একেবারে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। এই সময় গুরুর সমীপে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তিনি বুঝাইয়া দিবেন ঐরূপ ঘটনায় হতাশার কোন কারণ নাই। উহা অসুরকুলের জীবনীশক্তি নাশের পূর্বায়োজন। ব্রহ্মাণীর এই কমণ্ডলুজল নিক্ষেপের রহস্য বুঝিতে পারিলে আর সাধকগণের কোনরূপ হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। আর একটি কথা যদিও এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই, তথাপি বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ব্রহ্মাণী-শক্তি কর্তৃকই চতুরশীতি-সংখ্যক কম্বু নামক অসুরকুল নিহত হইয়াছিল। এইরূপেই মা ভেদজ্ঞানমূলক লজ্জা বা আত্মসঙ্কোচরূপ দ্বিতীয় পাশ ছিন্ন করিয়া দেন। স্থূল কথা, বিপর্যয়-জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পর সাধক যতই অদ্বয় সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই যাবতীয় ভেদজ্ঞান এবং তজ্জন্য নানারূপ সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাতে অসম্ভবতা এবং অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই।

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৩৩॥

অনুবাদ। মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তিঅস্ত্রদ্বারা অতিশয় ক্রোধের সহিত দৈত্যবৃন্দকে নিধন করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী এবং কৌমারী শক্তি—ত্রিশূল চক্র এবং শক্তি অস্ত্র প্রয়োগে যথাক্রমে কোটি-বীর্য ধৌম্র এবং কালক নামক অসুরসমূহকে নিহত করিলেন। ত্রিশূল চক্র এবং শক্তি শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বিশেষভাবে করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত অসুরত্রয় যথাক্রমে ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা নামক জীবের তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম পাশ ; ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মা আমার মাহেশ্বরী বিজ্ঞানময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ত্রিশূল অর্থাৎ আনন্দময় ত্রিপুটীপ্রয়োগে অতি প্রবল মৃত্যুভয়রূপ সংস্কার বিলয় করিয়া দিলেন। যে মরণ-ত্রাস জ্ঞানবানেরও বিদূরিত হয় না, মা আমার মাহেশ্বরী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া আজ তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবী প্রাণময়ী স্থিতিশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া সুদর্শনচক্র অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি প্রয়োগে আশঙ্কারূপ চতুর্থ পাশ ছিন্ন করিলেন। প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিনাশ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উন্নতস্তরের সাধকগণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। মা আমার বৈষ্ণবী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া তাহারও বিলয় সাধন করিলেন। এইরূপ কার্তিকেয় শক্তি অর্থাৎ দেবসেনা-পরিচালনকারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া ভেদজ্ঞানমূলক জুগুপ্সা নামক সংস্কার বিনষ্ট করিলেন। ভেদজ্ঞান যত ক্ষীণ হইতে থাকে, গোপনেচ্ছা আত্মসঙ্কোচ প্রভৃতি ততই বিনষ্ট হইয়া যায়। সাধক ! দেখ —মা যাহাকে পাশমুক্ত করিয়া শিবত্ব প্রদান করেন, ঠিক এমনই করিয়া তাহার সকল বন্ধন নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়া দেন। যাঁহারা মাতৃ-চরণে সর্বতোভাবে শরণাগত হইতে পারিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়—একমাত্র তাঁহারাই এইরূপ সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। তাই বলি প্রিয়তম সাধকবৃন্দ ! মাতৃ-চরণে সর্বথা শরণাগত হইবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন প্রয়োগ কর।

ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতা ভূমৌ রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥৩৪॥
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৫॥
নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥৩৬॥

অনুবাদ। ইন্দ্রাণী বজ্রপাতের দ্বারা শত শত দৈত্য-দানবকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। তাঁহাদের দেহ হইতে রুধিরধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

বারাহীশক্তি অসুরগণকে স্বকীয় তুণ্ডপ্রহারে বিধ্বস্ত করিলেন, দন্তাঘাতে তাহাদের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত এবং অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এই নারসিংহী শক্তিও অন্য অসুরদিগকে নখরসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ঘোর নাদে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রে ইন্দ্রাণী, বারাহী এবং নারসিংহী শক্তির অসুরক্ষয় বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। শুম্ভ যে আটটি অসুরসম্প্রদায় যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে! উহাদের নাম দৌর্হৃত, মৌর্য এবং কালকেয়। ইন্দ্রাণী, বারাহী এবং নারসিংহী মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া মা আমার এই অসুরত্রয়কে নিহত করিলেন। আধ্যাত্মিকভাবে ইহাদিগকে কুল, শীল ও জাতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই তিনটিই জীবের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পাশ। এই কুল শীল ও জাতিরূপ পাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাধকগণ শিখাসূত্র-ত্যাগ সন্ন্যাসগ্রহণ যথেচ্ছ আহার বিহার প্রভৃতি কতই না উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধকই যথার্থ ঐ সকল বন্ধনের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বন্ধন অর্থবোধক পশ্ ধাতু হইতে পাশ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং পাশমুক্ত হওয়া ও বন্ধনমুক্ত হওয়া একই কথা। মা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। তাই দেখিতে পাই মা আমার নানা মূর্তিতে নানাভাবে সন্তানকে পাশমুক্ত করিয়া দিতেছেন। ধন্য সাধক! এইবার তুমি অষ্টপাশ মুক্ত হইয়া শিবত্বলাভের যোগ্য হইলে। ধন্য তোমার মাতৃ-চরণে শরণাগতি!

প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে এই অষ্টপাশের সংস্কার অতি প্রবলভাবে অবস্থান করে। সঞ্চিত ও আগামী সংস্কারের মধ্যে ইহারা যে থাকে না, তাহা নহে, তবে ইতিপূর্বেই মায়ের কৃপায় তাহা অশ্লেষ এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানে উপস্থিত হওয়ার পক্ষে প্রবল প্রারব্ধই বিশেষ অন্তরায়; তাই মা ইহাদিগকে নানারূপে বিনষ্ট করিয়া দেন। কতকগুলিকে ভোগের ভিতর দিয়া, কতকগুলিকে সংযমের ভিতর দিয়া, কতকগুলিকে স্বপ্নের ভিতর দিয়া বিলয় করেন। কোন্ সংস্কার যে কিরূপভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। মায়ের মহতী ইচ্ছা কতরকম ভাবে প্রকটিত হইয়া কত রকমে যে স্নেহের সন্তানকে পাশমুক্ত করিয়া দেয়, তাহা সাধকগণ সামান্যমাত্রই লক্ষ্য করিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি—মা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া বিভিন্ন সংস্কারগুলি ক্ষয় করিয়া দিতেছেন।

———o———

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাং স্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৩৭॥

অনুবাদ। শিবদূতী দেবীর (অম্বিকার শরীর হইতে আবির্ভূতা চণ্ডিকা দেবীর) প্রচণ্ড অট্টহাস্যে অসুরগণ অভিদূষিত অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, তখন তিনি স্বয়ং সেগুলিকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। শিবদূতী অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবীও পূর্বোক্ত অষ্টমাতৃকার সহিত একত্রিত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। অট্টহাস্যই ইহার যুদ্ধ-সাধন অস্ত্র। প্রলয়ের অট্টহাসি অসুরবৃন্দের হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল যে, তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং স্বয়ং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাবতীয় ভেদভ্রান্তিই শিবদূতী কর্তৃক নিধনযোগ্য অসুর। যাঁহার প্রেরণায় বিজ্ঞানময় মহেশ্বর ঈশান দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি—সেই শিবদূতী—সেই জ্ঞানময়ী মহতী শক্তিও আজ অসুর নিধনে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে যে সর্ববিধ ভেদ ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ভেদ পাঁচ প্রকার (১) জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, (২) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (৩) জীবের সহিত জীবের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) এবং জড়ের সহিত জড়ের ভেদ। এই সকল ভেদভ্রান্তিরূপ অসুর একবার অদ্বয় জ্ঞানের আলোক পাইলে অচিরাৎ মূর্চ্ছিত ও নিপাতিত হয়। **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** **'তত্ত্বমসি'** প্রভৃতি মন্ত্রের উচ্চারণ এবং তৎসঙ্গে অদ্বয় জ্ঞানের ক্ষণিক প্রকাশরূপ উজ্জ্বল হাসি ভেদভ্রান্তিরূপ অসুরসমূহকে ক্ষণকাল মধ্যেই বিলয় করিয়া দেয়। ইতিপূর্বে উহারা জ্ঞানময় সত্তার

উপরেই অধিষ্ঠিত ছিল ; তখন উহাদিগকে ঠিক অজ্ঞান বলিয়া ধরিতে পারা যায় নাই ; কিন্তু এইরূপ অখণ্ড জ্ঞানময় সত্তা প্রকাশিত হওয়ায়, উহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল । তারপর সে সকলকে শিবদূতী স্বয়ং গ্রাস করিয়া ফেলিলেন । তাই মন্ত্রে **'তাংশ্চখাদ'**—**'সেই অসুরদিগকে ভক্ষণ করিলেন'** এইরূপ বাক্যের উল্লেখ হইয়াছে ।

সাধক দেখ, যে পরিমাণে জ্ঞানের আলোক আসিয়া পড়িতে থাকে, সেই পরিমাণেই অজ্ঞান বা ভেদ-ভ্রান্তিরূপ অসুর নির্মূল হইতে থাকে । তাই ত' প্রথম বলিয়া আসিয়াছি—ওগো, তোমরা অজ্ঞান দূর করিতে চেষ্টা করিও না ; শুধু জ্ঞানের উদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ । অজ্ঞান দূর করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, আলোক দর্শন বা জ্ঞানলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । জ্ঞানলাভ হইলে অজ্ঞান অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে । কিন্তু সে অন্যকথা—

———○———

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্ ।
দৃষ্টাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারি-সৈনিকাঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ । এইরূপ নানা উপায়ে মাতৃগণ মহাসুর-গণকে বিমর্দিত করিতেছেন দেখিয়া, দৈত্যসৈন্যগণ অদৃশ্য হইল অর্থাৎ পলায়ন করিল ।

ব্যাখ্যা । মা একা অদ্বিতীয়া হইয়াও আজ মাতৃগণরূপে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে অসুরগণকে —যাবতীয় দ্বৈত প্রতীতিসমূহকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন । তাহার ফলে অসুরকুল বিনষ্ট হইতে লাগিল । সাধক ! লক্ষ্য করিও—দ্বৈতপ্রতীতিসমূহ বিশুদ্ধ বোধের উদয়ে একে একে বিনষ্ট হইয়া যায় । মায়ের কৃপায় পঞ্চবিধ ভেদ-ভ্রান্তি অষ্টবিধ পাশ এইরূপেই অদৃশ্য হইয়া যায় । অদর্শনার্থক নশ্ ধাতু হইতে 'নেশু' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । বোধ বস্তু যখন স্বপ্রকাশ উদ্ভাসিত হয়, অর্থাৎ মাত্র আপনাকেই আপনি প্রকাশ করেন, তখন ভেদ-জ্ঞানগুলি অথবা ভেদজ্ঞানমূলক বিভিন্ন সংস্কারগুলি আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায় । এইবার দেখ সাধক, মা তোমাকে ধীরে ধীরে কোথা হইতে কোথায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন । মনোরাজ্য হইতে বিজ্ঞানরাজ্যে, বিজ্ঞান হইতে ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছেন ! অথচ তোমাকে কিছুই করিতে হয় নাই । তুমি মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্ন শিশু তুমি সরল প্রাণে শুধু মা মা বলিয়াই নিশ্চিন্ত । তারপর কি করিতে হইবে, কিরূপে তোমার বহুজন্ম সঞ্চিত দুরপনেয় সংস্কাররাশিকে বিলয় করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ে আর তোমার লক্ষ্য করিবার কিছু আবশ্যক নাই । শুধু মায়ের খেলাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া যাওয়াই তোমার কার্য । ভ্রমেও ভাবিও না, তোমাদের কঠোর সাধনা কিংবা সুদৃঢ় ভক্তির বলে এইরূপ হইতে পারে । যদি তাহা হইত, তবে সাধক বা ভক্তিমান্‌মাত্রেই মুক্তিলাভ করিতে পারিত । স্মরণ কর —**'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্'** । যাহারা আত্মাকে বরণ করে—যাহারা আত্মাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া আত্মচরণে আত্মসমর্পণ করে, একমাত্র তাহাদের নিকটেই আত্মা তাঁহার স্বকীয় স্বরূপটি সম্যকরূপে উদ্ভাসিত করেন ।

———○———

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্ ।
যোদ্ধু মভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৩৯॥
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ ॥৪০॥

অনুবাদ । মাতৃগণকর্তৃক বিমর্দিত দৈত্যগণকে পলায়নতৎপর দেখিয়া অতিক্রুদ্ধ রক্তবীজনামক অসুর যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল । তাহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূতলে নিপতিত হইলে, ঠিক সেইরূপ প্রমাণবিশিষ্ট অপর একটি অসুর ভূমিতল হইতে পুনরায় সমুত্থিত হয় ।

ব্যাখ্যা । এই রক্তবীজই শুম্ভের শেষ সেনাপতি । ইহার পর একমাত্র নিশুম্ভ অবশিষ্ট থাকিল, তাহাকে আর সেনাপতি বলা যায় না । সে যাহা হউক, এই রক্তবীজবধের রহস্য অতি বিচিত্র । একটু ধীরভাবে এ তত্ত্বে অবগাহন করিতে হইবে । মা আনন্দময়ী মহাশক্তি, তুমি ধীরূপে— ধারণাবতী মেধারূপে আত্মপ্রকাশ কর । তোমার এই অতিগহন লীলারহস্য আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউক । তোমার কৃপায় ততোঽধিক তোমার স্নেহে এই দুরধিগম্য মধুচক্র হইতে আনন্দময় বিজ্ঞান-মধু পান করিয়া আমরা ধন্য হই । জগতের লোক

তোমার এই অপূর্ব লীলা-রহস্য অবগত হইয়া, তোমাকে সরলপ্রাণে মা বলিয়া ডাকিতে শিখুক। দুঃখ-সন্তাপময় বিশ্ব আবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হউক।

'আমি জীব' এই ভাবটির নাম রক্তবীজ। আমি অর্থাৎ আত্মরূপী বীজটি যখন জীবত্বরূপ বিশেষণদ্বারা রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হয়, তখনই উহাকে রক্তবীজ বলা হয়। বীজ একমাত্র পরমাত্মা মা আমার। তাঁহাতে যখন জীবত্বরূপ—দ্বৈতজ্ঞানরূপ ভাবের রঞ্জনা হয়, তখনই বিশুদ্ধ বোধ বস্তুটি সজাতীয় এবং স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন; নিরঞ্জন বীজের এই যে অভিরঞ্জনভাব, ইহারই নাম রক্তবীজ। রক্তবীজের ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূপতিত হইবামাত্র অপর একটি রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হওয়ারূপ ভাবটি যখনই ভূপতিত হয়,—পার্থিবভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে— স্থূল ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই আবার বীজভাবটি ফুটিয়া উঠে। রঞ্জিত হওয়ার ভাবটি যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা ভূপতিত হইবেই, সুতরাং নিরঞ্জন বীজকেও অভিরঞ্জিত করিবেই। সহস্র সাধনা, সহস্র জ্ঞানালোচনা, সহস্র অনুভূতিও 'আমি জীব' এই বোধটিকে সম্যক্‌রূপে বিলয় করিতে পারে না। অদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রতিপাদক **'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের যথাযথ অনুশীলনের ফলে, সাধক যখন জীব ব্রহ্মের ভেদ-ভ্রান্তির পরপারে চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হয়, অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে যত্নবান্ হয়, তৎক্ষণাৎ এই রক্তবীজ আবির্ভূত হইয়া—'আমি জীব' রূপে ফুটিয়া উঠিবে। এই জীবত্বরূপ অজ্ঞানই সাধকের সেই অদ্বয়গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সাধকগণ নিজ নিজ জীবনে ইহা অহর্নিশ অনুভব করিয়া থাকেন। মায়ের বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অসুর নিহত হয় না। যাঁহারা যথার্থ অদ্বয়তত্ত্ব-উপলব্ধির নিকটবর্তী হইয়াছেন, যাঁহারা অস্মিতাকে বা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকেও অসুর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই রক্তবীজ-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আরে, 'আমি জীব' এই ভাবটিকে বিচারের সাহায্যে সহস্রধা বিনষ্ট করিলেও উহা যেমন ছিল, আবার তেমনই ফুটিয়া উঠে। কেবল বিচার কেন, যোগবলে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়াও এই রক্তবীজের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। যে মুহূর্তে নিরোধ হইতে ব্যুত্থান হয়, সেই মুহূর্তেই 'আমি জীব' এই ভাবটি সর্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে। আবার যেই আমি, সেই আমি। পরাভক্তি বা অকৈতব প্রেমের বলে আত্মসঙ্গত হইলেও, আবার পরক্ষণেই ঐ ভাবটি ফুটিয়া উঠে। অমনি 'আমি জীব' বলিয়া আত্মা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতে হয়, আপনাকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে; ইহাই রক্তবীজের অত্যাচার। এইরূপে সাধক, তুমি বিচারের পথেই অগ্রসর হও, অথবা যোগবলে চিত্ত নিরুদ্ধই কর, অথবা পরাভক্তির সাহায্যে আত্মহারাই হও, এই রক্তবীজের অত্যাচার সর্বত্র সমানভাবে দেখিতে পাইবে। উহার বিনাশ কিছুতেই হয় না। সাধারণ কথায়ও বলে—'যেন রক্তবীজের ঝাড়'। রক্তবীজ কিছুতেই বিনষ্ট হইতে চায় না। যাঁহারা রুদ্রগ্রন্থিভেদের সাধক, কেবল তাঁহারাই এই রক্তবীজ অসুরের অনির্বচনীয় অত্যাচার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরের নিকট এ সকল কথা প্রহেলিকার মত মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

শুন—তোমরা কথায় বল, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। বাস্তবিক আত্মা আত্মামাত্রই। তাঁহাতে জীব বা পরম কোন বিশেষণই নাই। এই আত্মায় যখন জীবভাবটি পরিকল্পিত হয়, তখনই তিনি রক্ত হন অর্থাৎ রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পান। আর যখন কোনরূপ ভাবরঞ্জনা থাকে না তখনই তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার কোন নাম কিংবা বিশেষণ নাই, থাকিতে পারে না। এই আত্মা যতদিন জীবভাবকে প্রকাশিত করিবেন, বুঝিতে হইবে,—ততদিন রক্তবীজ নিহত হয় নাই। যতদিন দেহ আছে, মন আছে, ইন্দ্রিয় আছে, ততদিন রক্তবীজও আছে, তবে কথা এই যে, যদিও ইহা খুবই সত্য, তথাপি অদ্বয়জ্ঞানরূপিণী মায়ের বক্ষে সম্যক্ আত্মহারা হইবার পর রক্তবীজের পারমার্থিক সত্তা কিন্তু একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। উহা ক্ষীণরক্ত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। সে সকল কথা ইহার পরেই পাওয়া যাইবে।

মা গো, এতদিন এই রক্তবীজকে দেখিতেই পাই নাই, এতদিন যে এই অজেয় অসুর আমারই বক্ষে অবস্থান করিয়া আমারই রক্ত শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট

হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমিই যে মা, আমিই যে তুমি, আমি যে আত্মা, এই কথাটা তোমার কৃপায় যত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছি, যতই তোমার প্রজ্ঞালোকে হৃদয়াকাশ উদ্‌ভাসিত হইতেছে, ততই যেন এই অসুরের অত্যাচার বিশেষভাবে মর্মপীড়াদায়ক হইতেছে। আমি যে নির্মল, আমি যে শুদ্ধ, আমি যে বুদ্ধ, আমি যে মহান্‌, আমি যে নিত্যমুক্ত, আমি যে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ, আমাতে যে কোন বিশিষ্টতা নাই, কোন মলিনতা নাই, আমাতে যে কোন গুণের সম্বন্ধ নাই, রোগ শোক জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই, আমাতে সংসার বলিয়া, স্বর্গ নরক বলিয়া, ধর্মাধর্ম বলিয়া কিছুই নাই, ব্রহ্মত্বই যে যথার্থ আমার স্বরূপ, আমি যে ব্রহ্মই—অন্য কিছুই নহে, ইহা সহস্রবার শুনিয়া সহস্রবার মনন করিয়াও আবার আমি জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ি। কেন মা এমন করিয়া স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় ? কেন মা এমন করিয়া অসুর অত্যাচার সহ্য করিতে হয় ? কেন মা আমি ব্রহ্ম হইয়াও ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা নিয়া থাকিব ? কেন মা আমি পূর্ণ জ্ঞানময় হইয়াও অল্পজ্ঞ জীবরূপে অবস্থান করিব ? কেন মা আমি শাশ্বত নিত্য নিরাময় হইয়াও রোগ শোক জন্ম মৃত্যুর মধ্যে অবস্থান করিব ? মা গো, যতদিন বুঝিতে পারি নাই, ততদিন এ যাতনার অনুভবই হয় নাই। কিন্তু এখন যে আর এক মুহূর্তও সহ্য হয় না। মা মা, মা আমার ! জীবত্ব ব্রহ্মত্বের এত বিভিন্নতা দেখিয়া বুঝিয়া উপলব্ধি করিয়া, আর যে এক মুহূর্তও এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না ! আহা ! যেখানে তোমার পূর্ণ আনন্দময় ভেদাতীত নিরঞ্জন স্বরূপটি নিত্য বিরাজিত, সেইখানে যাইবার জন্য, সেইখানে নিত্য অবস্থানের জন্য বড়ই ইচ্ছা হয় মা ! আমায় নিয়ে চল মা, নিয়ে চল ! এই অসুর অত্যাচার হইতে, এই জীবত্বের বন্ধন হইতে আমায় চিরতরে মুক্ত করিয়া দেও মা ! আর যে আমার বলিতে কেহ নাই ! আর যে কাহাকেও দেখিতে পাই না ! শুধু তুমি — শুধু তুমি আমার মা তুমি আমার সর্বস্ব, তুমি আমার আমি, আমায় নিয়ে চল। আমি নিজে অগ্রসর হইতে পারি না, আমি বহুদিন এই রক্তবীজের অত্যাচার সহ্য করিয়া উহাকে প্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে তোমাকে ছাড়িয়া এই রক্তবীজকে নিয়া থাকিতেই ভালবাসি। তুমি আর একটু নামিয়া এস, তুমি নিজে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া নিয়া যাও ; আমি চিরতরে রক্তবীজের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া ধন্য হই, তোমাকে মা বলিয়া ডাকা সার্থক হউক। মা মা মা !

সাধক, যদি যথার্থই আপনাকে রক্তবীজের অত্যাচারে উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে এমনই করিয়া কাঁদ—কাঁদিতে পারিলেই মা স্বয়ং আসিয়া রক্তবীজ নিধন করিবেন। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥৪১॥
কুলিশেনাহতস্যাশু বহু সুস্রাব শোণিতম্‌।
সমুত্তস্থুস্ততোযোধাস্তদ্রূপাস্তৎ-পরাক্রমাঃ ॥৪২॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর রক্তবীজ গদাহস্তে ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রাণীও স্বকীয় বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আহত করিতে লাগিলেন। বজ্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হইতেছিল, সেই রক্ত হইতে তাদৃশ পরাক্রমশালী এবং সেইরূপ আকারবিশিষ্ট অসুরগণ উত্থিত হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে অষ্টমাতৃকা-শক্তির সহিত রক্তবীজের যুদ্ধ বর্ণিত হইবে। প্রথমেই ইন্দ্রাণীর সহিত ইহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে—পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি ইন্দ্র। পাণি শব্দের অর্থ— আদানশক্তি, এবং বজ্র— তড়িৎ শক্তি। 'আমি জীব' এই ভাবটা পাণি প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই প্রকাশ পায়। সাধনাবলে— মায়ের কৃপায় সাধকের পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি যখন পরমাত্মভাবে পরিভাবিত হইতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার জীবভাব ক্রমে ক্রমে বিশীর্ণ হইতে থাকে। ইহাই ইন্দ্রাণীর বজ্রপ্রহারে রক্তবীজের দেহ হইতে বহু রুধিরস্রাবরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও মন্ত্রে সকল ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ নাই, তথাপি একমাত্র পাণীন্দ্রিয় দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। আসল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় করিয়াই জীবভাব পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু মায়ের কৃপায় উহারা যতই সত্তাহীন হইতে থাকে জীবভাবও ততই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। তবে

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যতই বিশীর্ণ হউক না কেন, যতই রক্তপাত হউক না কেন, জীবভাব যেমন ঠিক তেমনই থাকিয়া যায়। একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিলয়ে বা সংহরণে জীবভাব কিছুতেই বিশীর্ণ হয় না— বিলয়প্রাপ্ত হয় না। কেবল একটিমাত্র কেন, সকল ইন্দ্রিয়ের বিলয় হইলেও, অর্থাৎ প্রজ্ঞালোকের দ্বারা জীবভাবটি সহস্রধা ক্ষত বিক্ষত হইলেও 'আমি জীব' এই দ্বৈতপ্রতীতি নিঃশেষিত হইতে চায় না।

———○———

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা যাতাস্তদ্বীর্যবলবিক্রমাঃ ॥৪৩॥

অনুবাদ। তাহার (রক্তবীজের) দেহ হইতে যত রুধিরবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, ততই রক্তবীজের ন্যায় বীর্য, বল এবং বিক্রমসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ অসুর-সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যে মুহূর্তে পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি পরমাত্মসত্তায় বিলীন হইতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্তেই ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তির সহিত রক্তবীজের এইরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মাতৃগণ আজ প্রলয় শক্তিরূপে আবির্ভূতা। সুতরাং নানাভাবে রক্তবীজকে নিহত করিতে উদ্যতা। ইন্দ্রাণীর বজ্রপ্রহারে—আদান-শক্তির সম্পূর্ণ সংহরণে, রক্তবীজ যতই আহত অর্থাৎ জীবভাব যতই বিশীর্ণ হইতে থাকে ততই রুধিরস্রাব অর্থাৎ রঞ্জিত হওয়ার ভাবটি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে যে এইরূপ রঞ্জিত হইত না, তাহা নহে, তবে সে সময় এই বহুভাবরঞ্জনারূপ ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হতই না। এখন প্রজ্ঞার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাই এই সূক্ষ্মতম দোষরাশিরূপ অসুরকুলকে লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য হইয়াছে। একবিন্দু রুধির হইতে আবার যে তাদৃশ শক্তিমান—তাদৃশ বীর্য বল ও বিক্রমসম্পন্ন অসুরের উদ্ভব কিরূপে হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বীর্য শব্দের অর্থ প্রভাব, বল—শারীরিক শক্তি এবং বিক্রম—উৎসাহ। সে যাহা হউক, বিষয়টা জটিল করিয়া কিছু লাভ নাই। 'আমি জীব' এই ভাবটি নানা উপায়ে পুনঃ পুনঃ বিশীর্ণ হইলেও আবার পরক্ষণেই দেখা যায় যে, ঠিক পূর্বের মতনই বল বীর্য এবং বিক্রমসম্পন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'আমি জীব' এইরূপ বিশিষ্টভাবের উদয় হয় বলিয়াই সাধক ব্রহ্মক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শুধু এই একটি কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই রক্তবীজের যুদ্ধরহস্য সহজবোধ্য হইবে।

———○———

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্র-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥৪৪॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৫॥

অনুবাদ। সেই রক্তসম্ভূত অসুরগণ অতি উগ্র অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে মাতৃগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী পুনরায় বজ্রপ্রহারে ইহার শিরোদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন, তখন তাহা হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল, পুনরায় সেই রক্ত হইতে সহস্র সহস্র অসুর উৎপন্ন হইল।

ব্যাখ্যা। অসুরগণ অতিভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অতি উগ্র অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগের তাৎপর্য— দুরপনেয় দ্বৈত সংস্কারের সম্বন্ধ। সাধকগণ যখন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে আত্মসত্তা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়, তখন পুনঃ পুনঃ জীবত্ব সংস্কার— ভেদজ্ঞানের সংস্কার ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং সাধককে অদ্বয়সত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে, ইহাই রক্তবীজের ভীষণ যুদ্ধের রহস্য।

ইন্দ্রশক্তি এক এক বার বজ্রপাত করেন, অমনি অসুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরস্রাব হইতে থাকে। পুনরায় তাহা হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য এই যে 'আমি জীব' এই ভাবটিকে যতই ক্ষত বিক্ষত করা হউক না কেন, উহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে চায় না, বরং সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। যদিও এই বৃদ্ধিটা অজ্ঞান অবস্থার তুলনায় খুব বেশী নহে, তথাপি জ্ঞানালোক যত সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, জীবভাবের অনিষ্টকারিতা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে, তাই মন্ত্রে সহস্র সহস্র অসুর উৎপত্তি বিষ বর্ণিত হইয়াছে। সাধক! 'আমি জীব' এই বোধটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—সহস্র সহস্র রক্তবীজ উৎপন্ন হয় কি না? আত্মজ্ঞান যত সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, রক্তবীজের সংখ্যা যেন ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনুভূতির কথা ভাষায় আর কত বলা যাইতে পারে?

———○———

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥৪৬॥
বৈষ্ণবী-চক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥৪৭॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ। ইন্দ্রাণী যেরূপ অসুরশ্রেষ্ঠ রক্তবীজকে বজ্রঘাতে বিতাড়িত করিতেছিলেন, বৈষ্ণবীশক্তিও সেইরূপ যুদ্ধস্থলে ইহাকে চক্রের দ্বারা আহত এবং গদাপ্রহারে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবীর চক্রে বিদীর্ণ রক্তবীজের দেহ হইতে যে রুধিরস্রাব হইতেছিল, তাহা হইতে তৎপ্রমাণ মহাসুরগণ সমুত্থিত হইয়া সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল। তখন কৌমারী শক্তি-অস্ত্রপ্রয়োগে, বারাহী অসির আঘাতে এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে রক্তবীজগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। বিষ্ণুশক্তি এবং তাঁহার গদা ও চক্রের রহস্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিতিশক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহ যখন জীবভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহাদিগের প্রবল আকর্ষণে উহা সহস্রধা বিখণ্ডিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু অনাদিজন্ম-সঞ্চিত জীবত্বের যে বিশিষ্ট সংস্কার, তাহা কিছুতেই সহসা দূরীভূত হইতে চায় না। ঐটিকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতা নিজ বিশিষ্ট সত্তাটি অক্ষুণ্ন রাখিতে প্রয়াস পায়।

রক্তবীজের দেহ হইতে যে রুধিরস্রাব হইতেছিল, তাহা হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রজ্ঞার আলোকে 'আমি জীব' এই ভাবটি যতই বিশীর্ণ হইতে থাকে ততই ঐ জীবভাব যেন অমিতবল ও সর্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায়। কারণ, এ পর্যন্ত জীবভাবাতিরিক্ত অপর কোন ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই—বিশোকাজ্যোতিই বল, বুদ্ধিতত্ত্বই বল, কিংবা মহৎতত্ত্বই বল, সকল ভাবগুলিই জীবভাবের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইত ; তাই এতদিন জীবভাব একটিমাত্ররূপেই লক্ষিত হইত ; কিন্তু এখন মায়ের কৃপায় একটু একটু করিয়া বিশুদ্ধবোধ উদ্ভাসিত হইতেছে, ক্ষণপ্রভা রেখার ন্যায় অদ্বয় জ্ঞানালোক আসিয়া নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও জীবভাবকে বিলয় করিয়া দিতেছে ; এখন বিভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক পৃথকরূপে লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য হইয়াছে ; তাই এখন জীবভাবের প্রতি লক্ষ্য পড়িলেই, উহা অসংখ্য এবং বলশালী রূপে প্রতীত হইতে থাকে। জীবভাব বাস্তবিক একটি হইলেও উহা ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয় বলিয়া উহাকে অসংখ্য এবং জগদ্ব্যাপী বলা হয়। জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, জগতের যে কোন ভাব গ্রহণ করি সকলের মধ্য দিয়াই 'আমি জীব' এই ভাবটি সর্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে, তাই রক্তবীজ অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

যাহা হউক, রক্তবীজের সংখ্যা এরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেও, মাতৃ-শক্তিসমূহ স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে রক্তবীজকে ক্ষয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌমারীদেবী শক্তি অস্ত্র প্রয়োগে, বারাহী অদ্বয়জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে এবং মাহেশ্বরী আনন্দময় ত্রিপুটীরূপ ত্রিশূলাঘাতে রক্তবীজের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মা আমার নানাভাবে আবির্ভূত হইয়া, নানা শক্তিমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, অনাদিজন্ম সঞ্চিত জীবভাবটিকে বিশীর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ধন্য মায়ের দয়া, এ দয়া ভাষায় পরিব্যক্ত হয় না ; ইহাই যথার্থ মাতৃত্ব। আমার কোথায় কি ভেদজ্ঞান আছে, আমার কোথায় কি ক্ষত আছে, তাহা দূর করিবার জন্য, আমাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিবার জন্য, এরূপ যত্ন এরূপ প্রয়াস একমাত্র মা ব্যতীত আর কে করিয়া থাকে ? ওরে, আমি যে মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্নশিশু।

———o———

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪৯॥
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি ।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥৫০॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর রক্তবীজও তখন কোপাবিষ্ট হইয়া গদাদ্বারা মাতৃশক্তিসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে আঘাত করিতে লাগিল। (আবার অন্যদিকে মাতৃশক্তি নিক্ষিপ্ত) শক্তি শূলাদি অস্ত্রের দ্বারা বহুধা আহত হওয়ায় তাহার শরীর হইতে যে রক্তপ্রবাহ ভূতলে নিপতিত হইতেছিল, তাহা হইতে শত শত (অর্থাৎ অসংখ্য) অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ঐন্দ্রী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দেবশক্তি-সমূহ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জীবভাবের সম্যক্ বিলয় করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে রক্তবীজকে নিধন করিতে চেষ্টা করিলেন। রক্তবীজ কিন্তু কিছুতেই বিলয়প্রাপ্ত হইতে চায় না। বিশেষ অধ্যবসায়-প্রয়োগে কিছুক্ষণের জন্য অব্যক্তভাবে থাকিলেও ব্যুত্থানদশায় আবার 'আমি জীব' এইরূপ একটি ব্যক্তভাব ফুটিয়া উঠে। অষ্টমাতৃকাশক্তির প্রবল আকর্ষণে বিশুদ্ধ বোধময়স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে, জীবভাবটি কিছুক্ষণের জন্য অব্যক্ত ক্ষেত্রে মিলাইয়া যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার 'আমি জীব' এই ব্যক্ত ভাবটি প্রকাশ পায়। ইহাই রক্তবীজের গদাপ্রহার। গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য। প্রাচীন টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীও একস্থানে গদা শব্দের ব্যক্তবাক্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। মাতৃকাগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্তবীজকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন; রক্তবীজও তাঁহাদের নিকট স্বকীয় ব্যক্ত ভাবটি পুনঃ পুনঃ ফুটাইয়া তুলে। যাহা হউক, রক্তবীজকে নিধন করা ত' দূরের কথা, অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর হইতে যে রুধির প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে অসংখ্য অসুর আবির্ভূত হইল। পূর্ববর্তীমন্ত্রে এই রুধির হইতে অসুর আবির্ভাবের রহস্য বলা হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, জীবভাবকে যতই বিলয় করিতে চেষ্টা কর না কেন, সে কিছুতেই সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হইতে চায় না; বরং আরও যেন পরিবর্দ্ধিত এবং বলবীর্যসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। পুরুষকার প্রয়োগে জীবত্ববিলয় একান্তই অসম্ভব তবে যে স্থলে স্বয়ং মা-ই পুরুষকাররূপে প্রকাশিত হন, সে স্থানের কথা স্বতন্ত্র।

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৫১॥

অনুবাদ। রুধিরসম্ভূত সেই রক্তবীজ নামক অসংখ্য অসুর কর্তৃক সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া দেবতাগণ অতিশয় ভীত হইলেন।

ব্যাখ্যা। দেবতাগণ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ জগদ্ব্যাপী রক্তবীজ-অসুরের সত্তা দেখিতে পাইয়া ভয়ার্ত হইয়া পড়িলেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যে দিকে অবধান প্রয়োগ করা যায়, সেই দিকেই অসংখ্য রক্তবীজ, সেই দিকেই 'আমি জীব' এই দ্বৈতভাবটির দ্বারা বিশুদ্ধ চৈতন্যের উৎপীড়ন লক্ষিত হয়। যখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও এই দূরপনেয় জীবভাবের হাত হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, তখন যথার্থই প্রবল ভয় এবং অত্যন্ত নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভয় ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া সাধক-হৃদয়ে একটা তীব্র বিরহ ফুটিয়া উঠে। সে বিরহ যথার্থ অসহ্য বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রিয়তমের সহিত কিছুতেই মিলিত হওয়া যায় না, কিছুতেই পরম-প্রেমাস্পদের বুকে বুক মিলাইয়া আপনাকে হারাইতে পারা যায় না, তখন সাধকের কষ্ট যথার্থই অসহনীয় হইয়া উঠে। অতি স্বচ্ছ বুদ্ধিরূপ প্রাচীরের অন্তরাল হইতে প্রিয়তমকে দেখা যায়, বুদ্ধির আড়াল হইতেই প্রিয়তমের অপরূপ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, প্রিয়তমকে লাভ করিবার আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয় অথচ সেই বুদ্ধির প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া প্রিয়তমের চরণে সর্বতোভাবে আমিটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না; সুতরাং দিন দিন বিরহ বেদনা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং এই জীবত্বকে অসহনীয় যাতনাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। ওগো, সে অতি পবিত্র, অতি বিশুদ্ধ, সে যে আমার সর্বভাবাতীত নিরঞ্জন, সে যে আমার পরম প্রেমময় আত্মা, সে যে আমার আনন্দময় জীবনবল্লভ, সে যে আমার মধুময় জীবনসর্বস্ব, আমি তাহাতে কিরূপে মিলিয়া যাইব! তিনি ব্রহ্ম আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি কি করিয়া তাহাতে মিলাইয়া যাইব! দুইটি অসমান বস্তুর মিলন হয় কি? 'আমি জীব' এই বোধটি যতদিন সম্যক্ অপনীত না হইবে, ততদিন বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরম প্রিয়তমের সহিত কিছুতেই মিলাইয়া যাইতে পারিব না। আধুনিক কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধক ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন একান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা যদি বেদের 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়ের অর্থের প্রতি একটু বিশেষভাবে প্রণিধান করেন, তবে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ বাক্য চতুষ্টয়ের মধ্য দিয়াই পরমপ্রেম সূচিত হইয়াছে। ধন্য সেই ঋষিগণ! যাঁহাদের হৃদয়ে সর্বপ্রথমে এই অপূর্ব সম্বেদন ফুটিয়া উঠিয়াছিল;

যাঁহারা পরম প্রেমাস্পদের চরণে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিলেন। বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতেও যে প্রেমের পূর্ণতা হয় না, হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারিয়াই, উপনিষদের ঋষিগণ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বলিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে স্বকীয় পৃথক্ সত্তাটি সম্যক্‌ভাবে মিলাইয়া দিতেন। আজ তাঁহাদের মুখোচ্চারিত সেই পবিত্র মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত যুগ যুগান্তর পরেও জীব পরম প্রেম ও পরমজ্ঞানের সন্ধান পাইয়া জীবন ধন্য করিতেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রবর্ণিত গোপীপ্রেম এবং রাধাপ্রেম যে কি বস্তু, এইখানে না আসিলে, কিছুতেই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না।

সাধক! যতদিন 'আমাকে'—মাকে, আত্মাকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিবে, যতদিন মায়ের স্বরূপ সম্যক্ উদ্ভাসিত না দেখিবে, ততদিন বিরহবেদনা কিছুতেই দূর হইবে না। আমি জীব, এইরূপ দ্বৈতপ্রতীতি থাকিতে কিছুতেই মিলন হয় না। মনে রাখিও, অদ্বয়-জ্ঞানই মিলন এবং ভেদজ্ঞানই বিরহ। যাহাদের কখনও প্রিয়তমের সহিত মিলন সংঘঠিত হয় নাই— প্রিয়তমের বিরহ যে কি বস্তু, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে অন্য কথা।

উপনিষৎ বলেন, **'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি'**। দ্বৈতজ্ঞান হইতেই ভয় আপতিত হয়। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবতাগণ অগণিত রক্তবীজ অসুর দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়াছিলেন। এইখানে উপনীত হইতে পারিলে, এই রক্তবীজ-সমরে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করিলে, তবে এই উপনিষদ্‌বাক্যের রহস্য বুঝিতে পারা যায়, ভয় যে কিরূপ বস্তু তাহার উপলব্ধি হয়। ওগো জগতে যে তোমরা ভয় করিয়া সঙ্কুচিত হও, উহা আর কতটুকু ভয়। উহা ভয়ের আভাস মাত্র, ভয়ের অতিদূরবর্তী ছায়ামাত্র। যথার্থ ভয় এইখানে আসিলে বুঝিতে পারা যায়। ঐ একটুখানি ভেদ, ঐ একটুখানি দ্বৈত, উহা কিছুতেই অপসৃত হয় না। তাই ভয়ও দূর হয় না।

মন্ত্রে **'ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্'** কথাটির মধ্যে আর একটু রহস্য আছে। এখানে ভয়কে উত্তম বলা হইয়াছে; জাগতিক যাবতীয় ভয় অধম। একমাত্র এই জীবব্রহ্ম মিলনের সন্ধিক্ষণে জীবত্বরূপ ভেদজ্ঞান হইতেই যে ভয় আপতিত হয়, তাহাই উত্তম ভয় নামে প্রসিদ্ধ। সাধক! কবে তুমি প্রিয়তমের তীব্র আকর্ষণে দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, কবে বিজ্ঞানের পরপারস্থিত পরমাত্মার লোকাতীত স্বরূপ দেখিতে পাইয়া একান্ত মুগ্ধ হইবে, কতদিনে অভয়াকে স্মরণ করিয়া, এই উত্তম ভয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

———o———

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫২॥

অনুবাদ। দেবতাগণকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা সত্বর হইয়া বলিলেন, (হে দেবতাগণ, তোমরা বিষণ্ণ হইও না)। তারপর কালীকে বলিলেন—হে চামুণ্ডে! তোমার বদন বিস্তৃত কর।

ব্যাখ্যা। 'আমি জীব' এই ভাবটি কিছুতেই অপনীত হইতে চায় না; কিছুতেই নিষ্কল ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করা যায় না—ইহা দেখিতে পাইয়া দেবতাগণ একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই মা আমার বিষণ্ণ দেবতাগণকে, 'মা বিষীদত' তোমরা বিষণ্ণ হইও না বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন। এইরূপ যখন দেবতাগণ দ্বৈতজ্ঞানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়, তখনই অদ্বয়জ্ঞানরূপিণী মা আমার এইরূপ অভয়বাণীতে দেবতাগণের হৃদয় হইতে বিষাদশল্য বিদূরিত করিয়া দেন।

এই মন্ত্রটিতে প্রাহ এবং উবাচ, এই দুইটি সমানার্থ-বোধক শব্দ থাকায়, কোন কোন প্রাচিন টীকাকার 'মা বিষীদত' এই বাক্যটির অধ্যাহার করিয়া অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তত্ত্বপ্রকাশিকা কিন্তু 'প্রাহসত্বরা' একটি সমস্তপদ স্বীকার করিয়া, প্রাহ শব্দের অর্থ করিয়াছেন যুদ্ধ।

সে যাহা হউক, মা একদিকে যেমন অভয়বাণীতে দেবতাবৃন্দের বিষাদ বিদূরিত করিলেন, অন্যদিকে তেমন রক্তবীজবধেরও উদ্যম করিলেন। উদ্যমের প্রথমেই চামুণ্ডাশক্তিকে বদন বিস্তৃত করিবার আদেশ করিলেন। এই বদন বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা পরবর্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইবে।

———o———

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ ।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥৫৩॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্ ।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৫৪॥
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥৫৫॥

অনুবাদ । আমার অস্ত্রাঘাতসম্ভূত রক্তবিন্দুগুলিকে এবং রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরগুলিকে তুমি সবেগে এই (বিস্তৃত) মুখের মধ্যে গ্রহণ কর । এইরূপে রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরবৃন্দকে ভক্ষণ করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ কর । এই প্রকারে দৈত্য রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । তোমা কর্তৃক এইরূপ ভক্ষিত হইলে আর কোন অসুরই উগ্রভাবাপন্ন থাকিতে পারিবে না, এবং অপর অভিনব অসুরকুলও সমুৎপন্ন হইতে পারিবে না ।

ব্যাখ্যা । চণ্ডিকাদেবী প্রলয়ঙ্করী কালীশক্তিকে বদন বিস্তারপূর্বক অস্ত্র-দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত রক্তবীজের রুধির-বিন্দুগুলিকে এবং রুধিরোৎপন্ন অসুরগুলিকে গ্রাস করিবার আদেশ করিলেন । যথার্থই সংহারিণী শক্তি জীবভাবকে সমূলে গ্রাস না করিলে আর এই রক্তবীজবধের উপায় হয় না । জীবভাবের বীজটি পর্যন্ত গ্রাস করিতে হইবে । যদিও যতক্ষণ শুম্ভবধ না হয়, ততক্ষণ জীবভাবের সূক্ষ্মবীজ থাকিয়া যায়, তথাপি যে ব্যক্তভাবটি সাধককে জীবরূপে প্রতিভাত করিয়া ফেলে, অদ্বয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক রাখে, সেই ব্যক্ত জীবভাবটিকে সর্বতোভাবে এইখানেই বিলয় করিতে হইবে । ইহাই চামুণ্ডার প্রতি মায়ের আদেশ । সংহারিণী শক্তি যদি অসুরদিগকে এইরূপে গ্রাস করিতে থাকেন, তবে আর রক্তবিন্দুগুলির ভূতলে পতনের অবকাশ থাকিবে না ; সুতরাং ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে আর অভিনব অসুরের উত্থানও সম্ভব হইবে না । এইরূপে রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ।

খুলিয়া বলি,—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 'আমি জীব' এই যে প্রতীতি ইহার ঐ আমিটি হইতেছে বীজ এবং জীবত্ব হইতেছে রক্ত । কোন না কোন বিশিষ্ট ভাব থাকে বলিয়াই ত' আমিরূপী বীজটি জীবত্বরূপ রক্তদ্বারা অভিরঞ্জিত হয়। এখন প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা মা যদি কৃপা করিয়া আমাদের যাবতীয় বিশিষ্টতাকে গ্রাস করেন অর্থাৎ অনাদি-জন্মসঞ্চিত এই জীব-ভাবটিকে কোন বিশিষ্টতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে না দেন (বিশিষ্টতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই রক্তবিন্দুর ভূপতন) তবে আর জীবভাবের বা রক্তবীজের পরিবর্দ্ধনশক্তি থাকে না । জীবভাব ফুটিয়া উঠিয়া, কোন বিশিষ্টতার আশ্রয় লইয়া, আমিটিকে রঞ্জিত করিবার পূর্বেই যদি চামুণ্ডার করাল কবলে প্রবেশ করে, তবে আর রক্তবীজের অস্তিত্ব থাকে না । একটু গভীর রহস্য । শারীরিক-ভাষ্যে যে যুস্মৎ এবং অস্মৎ প্রত্যয় গোচর বিষয় এবং বিষয়ীর পরস্পর অধ্যাস বর্ণিত হইয়াছে, সেই অধ্যাসের প্রকৃত স্বরূপটি এই রক্তবীজ-সমরে উপনীত সাধকের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অহং-প্রতীতিগোচর বস্তুর স্বরূপ সম্যক্ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই অনাত্মভাব বা জীবভাব ফুটিয়া উঠে, শত চেষ্টায়ও এই অনাত্ম-প্রতীতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না ; ইহাই ত' রক্তবীজের সমর । মনে কর —তুমি অদ্বয়স্বরূপে উপনীত হইতে উদ্যত । সেই সময় পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবশে তোমাকে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইতে বিশুদ্ধচৈতন্যে অবতরণ করিতে হয় । সে বিশিষ্টতা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ সূক্ষ্মেই হউক, অথবা দেহ কিংবা রূপরসাদি বিষয়রূপ স্থূলই হউক, তোমাকে কিন্তু সে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে বিশিষ্টতায় নামিয়া আসিতেই হয় । সে অদ্বয়ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার উপায় নাই । আরে 'মাকে দেখিতেছি' 'মায়ের ধ্যান করিতেছি' 'পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি'—ঐগুলিও ত' দ্বৈতজ্ঞান । উহারাও ত' জীবভাব । আমি পরমাত্মা হইতে একটি পৃথক্—এইরূপ একটু সূক্ষ্মভাব থাকে বলিয়াই ত' পূর্বোক্তরূপ ভেদজ্ঞানগুলি ফুটিয়া উঠে । উহারাই ত' রক্তবীজ । উহাদের বিলয় করিতে হইলে সর্বভাবের একান্ত বিলয় আবশ্যক । নতুবা কোনরূপ কিছু বিশিষ্টতা থাকিলেই আমিত্বটি রঞ্জিত হইয়া পড়িবে । সুতরাং যেকোন প্রকারে হউক, ঐ রঞ্জনভাবকে অর্থাৎ রক্তবিন্দুগুলিকে বিলয় করিয়া শুদ্ধ আত্মারূপে অব্যয় বীজরূপে অবস্থান করিতে হইবে, একাকী হইতে হইবে । এইরূপ হইলেই রক্তবীজ অসুর বিনষ্ট হয় ; তখন

অস্মিতা ও মমতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এস সাধক! আমরা 'জয় কালী' বলিয়া প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা শক্তির শরণাগত হই। তিনি স্বকীয় সর্বগ্রাসী বদনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়া রুধিরসহ রক্তবীজগুলিকে গ্রাস করিবেন। তখন আমরা জীবভাবের হাত হইতে সম্যক্ পরিত্রাণ লাভ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইব। আমাদের জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ চিরতরে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

———০———

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥৫৬॥

অনুবাদ। কালীকে এইরূপ আদেশ করিয়া চণ্ডিকাদেবী স্বয়ং রক্তবীজকে শূলাঘাত করিলেন। কালিকাদেবীও তখনই স্বকীয় বিস্তৃত মুখে তাহার শোণিতগুলি পান করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মায়ের শূলাঘাত কথাটির তাৎপর্য —আনন্দময় জ্ঞানালোকসম্পাত। শূল শব্দের তাৎপর্য ইতিপূর্বে অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শূলই মায়ের প্রধান অস্ত্র। দ্বৈতপ্রতীতিরূপ অসুরকুল একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক ব্যতীত অন্য কিছুতেই সমূলে বিনষ্ট হয় না। সাধক! মনে করিও না, জ্ঞানের এক মুহূর্তমাত্র প্রকাশেই তোমার সকল অজ্ঞান চিরতরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এবং জ্ঞানময় অবস্থাটি সহজ হইবে; তাহা হয় না। একটু একটু করিয়া জ্ঞান প্রকাশ হয়, একটু একটু করিয়া জ্ঞান দৃঢ়ভূমিক হয়, একটু একটু করিয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তবে যে শুনিতে পাও, 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরও একটিমাত্র দীপশলাকায় আলোকিত হয়' ইহার তাৎপর্য এই যে—একবার মাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, জীব আর কখনও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিতে পারে না। দিন দিন সেই ক্ষণদৃষ্ট জ্ঞানালোকের দিকেই তীব্র পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। আর কখনও ভ্রান্তিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হয় না।

অজ্ঞান যে ধীরে ধীরে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ভগবানের বাক্য দ্বারাও ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন—'সমিদ্ধ অগ্নি যেরূপ ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ সর্বকর্মকে অর্থাৎ অজ্ঞানকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়'। এই বাক্যটির মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রস্তাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইন্ধনসমূহের সহিত অগ্নিসংযোগ হইবামাত্রই উহা যেরূপ ভস্মরূপে পরিণত হয় না, সম্যক্ ভস্মীভূত হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক হয়, জ্ঞানাগ্নি-সংযোগের অজ্ঞান-ইন্ধনও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিবেন—যতক্ষণ দেহ এবং জগৎ ভাণ হয়, ততক্ষণ অতি অল্পমাত্র হইলেও, আভাসমাত্র হইলেও, বাধিতানুবৃত্তি হইলেও, অজ্ঞান আছে, উহার সম্যক্ বিলয় হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। জ্ঞানের কিন্তু এমন একটি সমুজ্জ্বলতম অবস্থা আছে, যেখানে উপনীত হইলে, আর কখনও দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণই হয় না। যোগবাশিষ্ট ইহাকে পদার্থাভাবিনীরূপ ষষ্ঠ ভূমিকা এবং তৎপরবর্তী তুরীয়গারূপ সপ্তম ভূমিকা নাম দিয়াছেন। যদিও বর্তমান কালে ঐরূপ উচ্চ ভূমিকার সাধক একান্ত দুর্লভ, তথাপি বলিতে হয়—উক্তরূপ জ্ঞান একান্ত অসম্ভব নহে। মায়ের কৃপায় সাধকের তীব্র পুরুষকার এবং বৈরাগ্যের ফলে উক্তরূপ সমুজ্জ্বল জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া খুবই সম্ভব।

যাহা হউক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটু দূরে আসিয়াছি। এস, আবার প্রস্তাবিত বিষয়ের নিকটস্থ হই। ইতিপূর্বে বলিতেছিলাম, মা শূলাঘাতে রক্তবীজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। এবং প্রলয়ঙ্করী কালী স্বকীয় বদন বিস্তৃত করিয়া সেই ক্ষতনিঃসৃত রুধিরগুলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই সাধক, এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। একদিক দিয়া অদ্বয়জ্ঞানের আলোক ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইয়া ভেদজ্ঞানকে —জীবত্ব বুদ্ধিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়, আবার অন্যদিক্ দিয়া কালীশক্তি সর্বগ্রাসিনীমূর্তিতে সর্বভাবকে— জীব-ভাবকে গ্রাস করিতে থাকেন। জীবত্বরূপ শোণিত থাকে বলিয়াই ত' পুনঃ পুনঃ রক্তবীজের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এবার মা আমার স্বয়ং কালীমূর্তিতে সেই শোণিতরাশি কবলিত করিতেছেন; সুতরাং এইবার রক্তবীজবধ অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন হইয়াছে।

———০———

ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্ ।
ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥৫৭॥

অনুবাদ । অনন্তর সেই রক্তবীজ যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকা দেবীকেও গদাঘাত করিয়াছিল । কিন্তু সেই গদাঘাতে দেবীর অতি অল্পমাত্রও বেদনা হয় নাই ।

ব্যাখ্যা । ইতিপূর্বে রক্তবীজ অষ্টমাতৃকাশক্তিকে গদার প্রহার করিয়াছিল, এইবার চণ্ডিকাদেবীকেও গদাঘাত করিল । কিন্তু মায়ের এমনই মহিমা, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র বেদনা অনুভব করিলেন না । আসুরিক ভাবসমূহ যতই বিশিষ্টতা নিয়া প্রকাশিত হ'ক, 'আমি জীব' এই ভাবটি যতই পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়া উঠুক, তাহাতে মায়ের অঙ্গে—অদ্বয়ক্ষেত্রে—বিশুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না বলিয়াই কোনরূপ বেদন অর্থাৎ অনুভূতি ফুটাইতে পারে না । মা আমার যেমন নিত্যশুদ্ধা, নিরঞ্জনা, নির্ব্বিকারা, ঠিক তেমনই আছেন, বিন্দুমাত্র বিকারভাব তাঁহাতে স্পর্শ করে না । বুদ্ধিময় ক্ষেত্রের যতকিছু বিশিষ্টতা, তাহা চিৎক্ষেত্রে কখনই উপস্থিত হইতে পারে না । বেদনা শব্দের অর্থ বিশিষ্ট অনুভূতি । জীবভাবটি যতই বলবান হউক, যতই আত্মাকে জীবত্বের মোহে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক, তাহাতে সেখানে — সেই বিশুদ্ধ পরমাত্মক্ষেত্রে কিন্তু কোন সংক্ষোভই উপস্থিত হয় না । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে — মায়ের অঙ্গে অতি অল্পমাত্র বেদনাও প্রকাশ পায় নাই ।

সাধক ! প্রথম হইতেই এই বেদনা কিংবা অনুভূতির কথা বলিয়া আসিয়াছি । অনুভূতি ধরিয়া তবে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে হয় । অনুভূতিই আত্মা, অনুভূতিই মা । প্রথমে বিশেষ বিশেষ ভাবের সাহায্যে বিশেষ অনুভূতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয় । তারপর এখানে আসিলে, এই রুদ্রগ্রন্থিভেদের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, অনুভূতির ঐ যে বিশিষ্টতা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায় ; কেবল অনুভূতিই থাকে । ঐ অনুভূতিটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ; উহাতে কোনরূপ বিশিষ্টতা থাকে না ।

শুন—যদি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই বেদনা বা অনুভূতি বলিয়া জিনিষটা বুঝিতে পারিয়াছ । আচ্ছা এইবার দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি তত্ত্ব, কিংবা রূপ রসাদি বিষয়, এ সকলই যে এক এক প্রকার অনুভূতিমাত্র, ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি—অনুভূতি ধরিয়া বিষয়ের দিকে আসিতে হয়, আবার বিষয় ধরিয়া অনুভূতির দিকে যাইতে হয় । কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে গ্রাহ্য এবং গ্রহণগুলি অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি অনুভূতিময় হইয়া উঠিবে । তখন দর্শন বলিলে—বোধের দর্শন, শ্রবণ বলিলে—বোধের শ্রবণ, এইরূপ অনুভব হইতে থাকিবে। ঐ অবস্থাটি বেশ একটু পরিপক্ব হইলে, তখন ঐ দর্শন শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনুভূতি—কেবল বোধ ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে । প্রথম প্রথম এই নির্ব্বিশেষ বোধকে ধরিতে গেলেই পশ্চাৎপদ হইতে হইবে, একটা ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক্তি যেন জোর করিয়া সে স্থান হইতে সরাইয়া দিবে ; তথাপি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে, এবং 'মা কোলে নাও, মা কোলে নাও' বলিয়া কাতর প্রাণে কাঁদিতে থাকিবে । তখন মায়ের কৃপায় উহাতে ক্ষণকাল স্থিতি লাভ করিতে পারিবে, 'কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি' গুরু যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে । পূর্বে যে অনুভূতির বিশিষ্টতা বলিলাম, উহাই জ্ঞানের গ্রন্থি । ঐ গ্রন্থিভেদ করিতে হইলে এইরূপ তীব্র প্রযত্ন এবং মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় । এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে যে কি হয়, তাহা আর পুস্তকে লিখিয়া জানাইবার আবশ্যকতা নাই । সাধক ! নিজেই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে । সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি— জীবন্মুক্তি নামে যে একটা কথা শুধু পুস্তকে পড়িয়া এবং লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছ, তাহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে । কিন্তু এ সকল অন্যকথা—

তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্ ।
যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ॥৫৮॥

মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ॥৫৯॥

অনুবাদ । (মাতৃ-শূলাঘাতে) আহত রক্তবীজের শরীরের যে যে স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতেছিল, চামুণ্ডা সেই সেই স্থানেই স্বকীয় মুখের দ্বারা ঐ শোণিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার (চামুণ্ডার) মুখমধ্যে রক্তপাতবশতঃ যে সকল অসুর উদ্ভূত হইতেছিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকেও ভক্ষণ এবং রক্তবীজের রুধির পান করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা । যেখানে রুধির ক্ষরণ, সেইখানেই চামুণ্ডার করালমুখ । জীবত্বের দ্বারা যেইমাত্র বিশুদ্ধ বোধটি উপরঞ্জিত হইতে আরম্ভ হয়, অমনি করালবদন ব্যাদান করিয়া প্রলয়ঙ্করী কালী সেই ভাবকে গ্রাস করিতে থাকেন। একদিকে যেমন প্রজ্ঞার আলোকে আসিয়া পড়িতে থাকে, অন্যদিকে তেমনই সর্বভাব— জীবভাব প্রলয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িতে থাকে। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই এই কয়েকটি মন্ত্রে প্রায় একই কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ নাই ; এই ব্যাপারটি—এই প্রজ্ঞালোক-সম্পাত এবং অনাত্মভাবের বিলয়, বাস্তবিকই পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।

চণ্ডিকার শূলাঘাতে আহত রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রুধিরপ্রবাহ চামুণ্ডার মুখমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল ; কারণ তিনি পূর্ব হইতেই তাঁহার করালমুখ অতিশয় বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন । মুখগহ্বরে নিপতিত রুধির হইতে যে সকল অসুর উৎপন্ন হইতেছিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে— পূর্বে বলা হইয়াছে, রক্তবিন্দু ভূমিতলে নিপতিত হইলেই রক্তবীজের তুল্য বল ও বিক্রমশালী অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে বলা হইল, চামুণ্ডার মুখমধ্যে নিপতিত রুধির হইতেও অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, চামুণ্ডার মুখেও ভূমির সত্তা অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের অংশ আছে ; সুতরাং চামুণ্ডার মুখমধ্যেও অসুরগণের উৎপত্তি একান্তই সম্ভব। আর বাস্তবিক পক্ষে, **'রক্তবিন্দুর্যদাভূমৌ'** ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমি শব্দটি বিশিষ্টতা মাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং কোনরূপ বিশিষ্টতা পাইলেই রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে পারে। অথবা সেস্থলে ভূমি শব্দের অর্থ পার্থিব দেহ । এইরূপ অর্থ বুঝিয়া লইলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। যতদিন পার্থিব দেহ আছে, ততদিন জীবত্ব বোধ ফুটিবেই । পার্থিব ভাবের সম্বন্ধবশতঃই বিশুদ্ধ চিদ্‌বস্তুটি বিশিষ্টভাবে বা জীবভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যদিও এখানে মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া করালমুখ বিস্তারপূর্বক রক্তবীজের রক্তকে ভূতলে পতিত হইতে দিতেছেন না, যদিও জীবত্ব-প্রতীতিকে স্থূল দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে দিতেছেন না, যদিও জীবত্ববোধ ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন, তথাপি ঐ যে একটুখানি জীবভাব, ঐ যে একটুখানি বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, উহা পার্থিব দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রকাশ পায় । এইরূপ যতদিন পার্থিব-দেহবিষয়ক বোধ থাকিবে, ততদিন রক্তবীজের রক্ত ভূমিতলে নিপতিত হইবেই । রুধিরসমূহ চামুণ্ডার মুখমধ্যে অর্থাৎ প্রলয়কবলে নিপতিত হইবার কালে পার্থিব দেহবিষয়ক বোধের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই নিপতিত হয়, সেইজন্যই মন্ত্রে চামুণ্ডার মুখমধ্যেও অসুরোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভি ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥৬০॥

অনুবাদ । চামুণ্ডা রক্তবীজের রুধির পান করিয়া লইলেন, চণ্ডিকাদেবী শূল বজ্র বাণ অসি এবং ঋষ্টি অস্ত্রের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা । এইবার রক্তবীজ ধ্বংসের মুখে আসিয়াছে। একদিকে যেমন পুনঃ পুনঃ প্রজ্ঞার আলোক-সম্পাতরূপ মায়ের শূল বজ্রাদি অস্ত্রপ্রয়োগ হইতেছে ; অন্যদিকে তেমন ভাবরঞ্জনা হইতে না হইতেই প্রলয়ঙ্করী শক্তি সর্বভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। মন্ত্রে যে শূল বজ্র

বাণ অসি এবং ঋষ্টি, এই পাঁচটি অস্ত্রের উল্লেখ আছে, উহাদের আধ্যাত্মিক অর্থ—বিশ্বাস অনুভব যুক্তি শাস্ত্র এবং কৃপা। এই পাঁচটিই রক্তবীজ-নিধনের যথার্থ অস্ত্র। উহাদের এক একটি দ্বারাই এই মহাসুর নিহত হয় না। যুগপৎ এই সকল অস্ত্রের প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। একদিকে অস্ত্রপ্রয়োগ, অন্যদিকে সংহারিণী-শক্তির আকর্ষণ, এইরূপ উভয়দিক হইতে রক্তবীজকে আক্রমণ করিতে পারিলে, তবেই ইহার নিধন অবশ্যম্ভাবী।

সাধক তুমি সর্বপ্রথমে **'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'** এই জ্ঞানে বজ্রবৎ দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিবে ; ইহাই প্রথম অস্ত্র। তারপর বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থানপূর্বক স্বপ্রকাশস্বরূপা চিতশক্তির দিকে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিবে, অর্থাৎ বিশিষ্ট অনুভূতিকে ধরিয়া নির্বিশেষ অনুভূতিতে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে। ইহাই দ্বিতীয় অস্ত্র ; তারপর যুক্তির সাহায্যে, বিচারের সাহায্যে বুঝিবে যে বাস্তবিক সত্তা একমাত্র চিতিশক্তিরই আছে দৃশ্যরূপে জ্ঞেয়রূপে বিশিষ্টরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সে সকল পারমার্থিক সত্তাবিহীন এক প্রকার ব্যবহার মাত্র। যাহা ব্যবহার, তাহার বস্তুত্ব হইতে পারে না। ব্যবহারের পৃথক্ অস্তিত্ব তিন কালেই নাই, থাকিতে পারে না। এইরূপ এবং অন্যান্য নানারূপ যুক্তির সাহায্যে বিশিষ্ট সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচার, এইখানে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ রক্তবীজ সমরে উপনীত হইতে পারিলে তবে উপযোগী হইয়া থাকে। অন্যথা উপযুক্ত অধিকার লাভের পূর্বে ঐরূপ বিচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে প্রায়ই অনর্থ সংঘটিত হয় ; সাধকের উন্নতির পথ —যথার্থ সত্যবস্তু লাভের পথ বিঘ্নপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই মনে রাখিও সাধক, মাত্র রক্তবীজ বধের জন্যই ব্রহ্মবিচার রূপ অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক ! সে যাহা হউক, ইহাই তৃতীয় অস্ত্র। অতঃপর শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে অদ্বয়স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত স্বকীয় অনুভবের তুল্যতা আছে কি না, ইহা লক্ষ্য করা সাধকমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়। **'তত্ত্বমসি'** প্রভৃতি মহাবাক্য চতুষ্টয়, **'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'নেহ নানাস্তিকিঞ্চন'** ইত্যাদি একত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে স্বকীয় অদ্বয়স্বরূপটির সম্যক্‌রূপে পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইবে। ইহাই চতুর্থ অস্ত্র। আর পঞ্চম অস্ত্র কৃপা। মায়ের বিশিষ্ট কৃপা লাভ করিবার জন্য, যে কাতর প্রার্থনা প্রথম হইতে অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই শেষ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কৃপাই শরণাগত ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল। আত্মলাভের পক্ষে আত্মকৃপাই প্রধান অবলম্বন। কৃপার উপলব্ধি হইলে আর যাহা কিছু, তাহা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বোক্ত পাঁচটি প্রায়ই বুৎক্রমে ফলদায়ক হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রথমে মায়ের কৃপার অনুভব হইতে থাকে ; তারপর বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় ; পরে শাস্ত্রবাক্যের অর্থপ্রতীতি হয় ; অতঃপর যুক্তি বা বিচারের সামর্থ্য জন্মে ; সর্বশেষে অনুভূতিকে লক্ষ্য করিয়া নির্বিশেষ স্বরূপে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাহা হউক, এই পঞ্চবিধ উপায়, পূর্বোক্ত শূলাদি পঞ্চবিধ অস্ত্ররূপে যথাযোগ্য বুঝিয়া লইলেই এই মন্ত্রের রহস্য অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে। তবে একটি কথা এখানে বিশেষ স্মরণযোগ্য —**'চামুণ্ডা-পীতশোণিতম্'**। চামুণ্ডা যতক্ষণ রক্তবীজের শোণিত পান না করেন, ততক্ষণ কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে নির্মূল করিতে সমর্থ হয়। তাই প্রাণপণে প্রলয়ঙ্করী শক্তির কৃপার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে—সাধকের পুরুষকার মায়ের কৃপার দ্বারাই সম্যক্ প্রকটিত হয়।

———○———

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৬১॥

অনুবাদ। হে মহীপাল ! এইরূপে শস্ত্রসঙ্ঘদ্বারা সমাহত হইয়া ক্ষীণরক্ত মহাসুর রক্তবীজ মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত বিশ্বাস অনুভব যুক্তি শাস্ত্রপ্রমাণ এবং কৃপারূপ শস্ত্রসঙ্ঘদ্বারা সমাহত হইয়া রক্তবীজ মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল—জড়ত্বে পরিণত হইল, অর্থাৎ

নিহত হইল। জড়ত্ব এবং দৃশ্যত্ব একই কথা। জীবভাবটি এতদিন আমিরূপ চেতনবস্তুর সহিত যুক্ত হইয়া কর্তা ভোক্তা সাজিয়াছিল—যাহা স্বরূপতঃ জড় বা দৃশ্য, তাহাও এতদিন চেতনারূপে— দ্রষ্টারূপে প্রতিভাত হইতেছিল ; কিন্তু আজ চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপটি প্রকটিত হওয়ায়, উহা দৃশ্যত্বে পরিণত হইল। আমি বস্তুটি এখন আর দৃশ্য বা বীজ নহে। আমি দ্রষ্টা—চেতন। এতদিন বিপর্যয় জ্ঞান ছিল, তাই বীজরূপী আত্মা বিপর্যস্তভাবে জীবরূপে প্রতিভাসিত হইতেছিল। কিন্তু এবার মা আমার সর্বপ্রথমেই ধূম্রলোচন বধ করিয়া সেই বিপর্যয় জ্ঞানটি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে আজ জীবভাবটিরও অবসান হইল।

শুন— বাস্তবিক জীব বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, দৃশ্য বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, কখনও ছিল কিংবা থাকিবে, ইহাও হইতে পারে না। একমাত্র বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ বস্তুটিই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা পূর্ণ আনন্দময়, চিরমধুময় এবং সর্বথা অমৃতময়। পূর্ণজ্ঞান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ বস্তুতে অজ্ঞান ও নিরানন্দ কখনও নাই, থাকিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই রক্তবীজবধ ; কারণ এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে আর জীবভাব বলিয়া কিছুই থাকে না। তখন আর বীজরূপী আমি বস্তুটি জীবত্বদ্বারা অভিরঞ্জিত হয় না। অজ্ঞানতা-বশতঃই ঐরূপ জড় চৈতন্যের সংমিশ্রণরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। সাধক ! মায়ের কৃপায় এতদিনে তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, চৈতন্য স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; সুতরাং জীবরূপে আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না।

মহর্ষি মেধস এখানে রাজা সুরথকে মহীপাল বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সাধক ! তুমিও মহীপাল হও। চৈতন্যস্বরূপ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়াই ত' মহী বা জড়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, তুমিই যে মহীকে পালন করিতেছ, রক্ষা করিতেছ অর্থাৎ অজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিতেছ, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিলে দেখিতে পাইবে— মহী বলিয়া আর কিছুই নাই ; একমাত্র চৈতন্যস্বরূপবস্তু—তুমিই স্বয়ং নিত্য উদ্ভাসিত রহিয়াছ ; কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ ব্যবহার তোমাতে কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সাধক ! কবে তুমিও সুরথের ন্যায় মহীপালত্বের মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ মহীপাল হইবে ? কবে তোমার রক্তবীজ অসুর নিহত হইবে ? কবে তুমি এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ।

অনুবাদ। হে নৃপ ! তখন দেবতাগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং মাতৃগণও রক্তবীজের অসৃক্-পানজনিত আনন্দে উদ্ধতনৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রক্তবীজবধ।

ব্যাখ্যা। বাস্তবিকই আজ দেবতাগণের আনন্দ অতুলনীয়। বহুকালের সঞ্চিত জীবত্বরূপ মলিনতার সংস্পর্শ হইতে দেবতাগণ বিমুক্ত হইয়াছেন, জড়ত্বের সংস্পর্শ কাটিয়া গিয়াছে, শুভ্র আত্মজ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং বিশিষ্ট চৈতন্যসমূহ নির্বিশেষ অখণ্ড আনন্দময় সত্তার সম্বন্ধ লাভ করিয়া অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। আর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃ-শক্তিগণও অসৃক্‌মদোদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অসৃক্ শব্দের অর্থ রক্ত ; তাহাই মদ অর্থাৎ হর্ষ বা আনন্দ। জীবভাবরূপ অসৃক্ অর্থাৎ ভাবরঞ্জনাসমূহ আনন্দময়ী চিতিশক্তির সম্বন্ধ হইতে বিশিষ্ট হইয়াছে ; মাতৃ-শক্তিগণের প্রলয়লীলা সার্থক হইয়াছে ; তাই তাঁহারা উদ্ধতভাবে তাণ্ডব-নৃত্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তিসমূহ নির্মল বোধপ্রবাহরূপে অভিব্যক্ত হইতে লাগিলেন।

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই জীবভাব অবস্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মই যেন জীবরূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন ; সাধক এতদিন এইরূপ জ্ঞানে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত ছিল ; কিন্তু আজ মায়ের কৃপায় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে

স্থানে আর জীবত্ব বলিয়া কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নতা দ্বারা আনন্দের যে একটি সীমাবদ্ধ ভাব ছিল, এই রক্তবীজ-বধে তাহার সম্যক্ অবসান হইয়া গিয়াছে। রক্তবীজবধ হইলেই আনন্দের পরিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয়। আর পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যষ্টিভাবের ভিতর দিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দের সন্ধান লইতে হয় না। সর্ববিধ বিশিষ্টতা পরিত্যাগপূর্বক আনন্দস্বরূপ আত্মাই সর্বথা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তখন বিশ্বময় কেবল আনন্দ! অসীম আনন্দ! নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! আনন্দ ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। আনন্দস্বরূপ আমি, পরম প্রিয়তম আমি, অমৃতময় আমি সর্বত্র উদ্ভাসিত রহিয়াছি। আমার আনন্দের আদি নাই, অন্ত নাই, উদ্বেলন নাই, আমি — মহান্ প্রশান্ত, ধীর স্থির। সাধকের এইরূপ অনুভূতি লাভ হয়। সে অবস্থায় জীব জগৎ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, চন্দ্র সূর্য, আকাশ নক্ষত্র, সকলেই একটা ঘন আনন্দময় সত্তার দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে; সুতরাং দেবতাগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দের অতুল আনন্দ উপস্থিত হয়; এবং মাতৃগণ—ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিগণ আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকেন। এস সাধক! তুমিও এই আনন্দের সন্ধান লইয়া আনন্দময় হও — ধন্য হও। সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপটি উপলব্ধি করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে আনন্দ বিতরণ করিয়া বেড়াও। শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্বাদ তোমাদিগকে ধন্য করিয়া এইরূপ বিশ্বমঙ্গলে প্রণোদিত করুক। নিরানন্দ জগতে আবার আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠুক।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
রক্তবীজ-বধ।

———o———

রুদ্রগ্রন্থিভেদ

নিশুম্ভবধ

রাজোবাচ ।

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম ।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥১॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে ।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥২॥

অনুবাদ । রাজা (সুরথ) বলিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি রক্তবীজবধ-প্রসঙ্গে দেবীর এই বিচিত্র চরিত-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন । (তাহাতে) পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়—রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কোপন শুম্ভ এবং নিশুম্ভ কিরূপ কার্য করিয়াছিল ।

ব্যাখ্যা । যথার্থই এই রক্তবীজ-বধ অতি বিচিত্র । দেবীর এই অভূতপূর্ব চরিত-মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া জীবভাব-বিলয়কামী সাধকগণ নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন । যে চরিতে একা অদ্বিতীয়া মা আমার বহুশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া জীবভাবকে প্রলয়কবলিত করেন, যে চরিতে মা আমার স্বয়ং নির্বিকল্পা হইয়াও শূলাদি অস্ত্রপ্রয়োগে অসুরকুলকে বিমথিত করেন, যে চরিতে মা আমার অনাদিজন্মসঞ্চিত সংস্কাররাশিকে উন্মূলিত করিয়া দেন, সেই অপূর্ব চরিত যতই শ্রবণ করা যায়, ততই বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয় । তাই রাজা সুরথ '**বিচিত্রমিদমাখ্যাতং দেব্যাশ্চরিত-মাহাত্ম্যম্**'—বলিয়া ইহার বিচিত্রতা প্রতিপাদন করিলেন । কেবল যে মায়ের এই চরিতমাহাত্ম্যই বিচিত্র, তাহা নহে ; ইহার বক্তা বিচিত্র, ইহার শ্রোতাও বিচিত্র । আরও বিচিত্র তিনি—যিনি ইহার উপলব্ধি করেন । তাই উপনিষৎ বলেন— '**আশ্চর্যোবক্তা কুশলোঽস্যলব্ধা**' । ভগবান্ স্বয়ং বলেন— '**আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ**' যথার্থই এই তত্ত্বের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই বিচিত্র । বক্তব্য বিষয়টি কিন্তু তদপেক্ষাও আরও বিচিত্র—আশ্চর্য । এমন সহজ সরল স্বপ্রকাশ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে, কত বৈচিত্র্যময় ঘটনানিচয়ের মধ্য দিয়া জীবকে যাইতে হয়, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয় না কি ? যিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, যিনি নিত্য প্রকটিত, যিনি একান্ত সহজ, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে যে এত অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়—ইহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় না কি ? আরে, 'আমি আছি' ইহা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, কত প্রকাশশীল ! আনন্দময়ী মা আমার ঠিক এমনই সহজ এমনই স্বাভাবিক, এমনই স্বপ্রকাশ । অথচ স্বকীয় স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত করিবার জন্য আমাদিগকে লইয়া তাঁহার কতই লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে হয় । ধন্য তিনি—যিনি অতি সুপ্রকট হইয়াও চিরলুক্কায়িত । এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুকে লাভ করিবার জন্য, এই প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কত সহস্র গ্রন্থ, কতরূপ উপদেশ, কত রকমের শিক্ষা ও সাধন প্রণালী জগতে প্রচলিত হইয়াছে, হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয় । ধন্য তিনি আর ধন্য তাঁহার অচিন্ত্যনীয় লীলারহস্য ।

সে যাহা হউক, রক্তবীজনিধনের পরেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, কিরূপে তাহারও অবসান হয়, তাহা জানিবার জন্য সাধকের কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হয় ; তাই মহারাজ সুরথ '**ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং**' বলিয়া নিশুম্ভ ও শুম্ভের নিধনরহস্য শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিলেন । রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে যখন মহর্ষি মেধসের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি 'হে ভগবন্' সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা গুরুর নিকট সমুদাচারমাত্র সূচনা করিয়াছিল । আর আজ এখানে যে 'ভগবন্' শব্দের প্রয়োগ করিলেন, তাহা যথার্থই ভগবদ্ দর্শনের সূচনা করিতেছে । ঠিক এইরূপেই শিষ্য যত উন্নত হইতে থাকে, ততই গুরুর মধ্যে ভগবৎসত্তা বিশেষরূপে দর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করে। অথবা গুরুতে ভগবদ্‌জ্ঞান যত বেশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, শিষ্য ততই উন্নত হইতে থাকে ।

———০———

ঋষিরুবাচ

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥৩॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর অতুলনীয় কোপ প্রকাশ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভের—অস্মিতা ও মমতার যাহারা প্রধান অবলম্বন, একে একে সে সকলেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে ; আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এমন আর কেহই নাই। এ অবস্থায় তাহাদের নৈরাশ্য, অবসাদ ও অবর্ণনীয় দুঃখ উপস্থিত হওয়াই উচিত ; কিন্তু তাহা হইল না। অতুলনীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। এ ক্রোধ অতুলনীয় বটে। যে ক্রোধ আত্মস্বরূপ প্রকাশের হেতু, জগতে সে ক্রোধের তুলনা কোথায় ? ভগবান্ বলিয়াছেন—**'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'** কামনা হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব হয়। শুম্ভ ও নিশুম্ভ অম্বিকাকে কামনা করে, নানা কারণে তাহাদের সে কামনা পূর্ণ না হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতেছে, তাই ক্রোধের আবির্ভাব হইল। এই ক্রোধই উহাদিগকে সর্বতোভাবে বিলয় করিয়া দিবে। কামনা হইতে যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণামে বিনাশে আসিয়া পর্যবসিত হয়, তাহাও ভগবান্ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন —**'ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ'**। ক্রোধ হইতে সম্মোহ উপস্থিত হয়। আত্মার স্বপ্রকাশত্ব আনন্দময়ত্ব দর্শনে অস্মিতা একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। নিজ অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়াও আত্মাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত লালায়িত হয়। ইহারই নাম সম্মোহ। **'সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ'**। মোহ হইতেই স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয়। পরম প্রেমময় পরমাত্মস্বরূপে একান্ত মুগ্ধ হইলে, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব-বিষয়ক স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। **'স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ'**। স্বকীয় সত্তার বিস্মৃতি হইলেই বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশক মাত্র। যখন চিত্তে আর কোন প্রকার বৃত্তিপ্রবাহ চলে না, প্রকাশ্যরূপে কিছুই থাকে না, তখন প্রকাশক যে বুদ্ধি, তাহারও অবসান হয়। এইরূপে স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। **'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'**। বুদ্ধিনাশ হইলেই প্রণাশ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নাশ উপস্থিত হয়—অস্মিতার যে আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা, তাহা সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পূর্বে বলিয়াছি —বুদ্ধি ও অস্মিতা অভিন্ন ; সুতরাং বুদ্ধিনাশ এবং অস্মিতানাশ একই কথা। ক্রোধ হইতেই এই প্রণাশ বা বুদ্ধিনাশের সূচনা হয়। তাই ঋষি বলিলেন—শুম্ভ নিশুম্ভ অতুলনীয় কোপ প্রকাশ করিয়াছিল। যে কোপে আমিত্বের বিলয় হইয়া যায়, জগতে তাহার তুলনা হয় না। সে যাহা হউক, 'আমি জীব' এই ভাবটির বিলয় হইবার পরই আত্মাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অস্মিতা-ক্ষেত্রে একবার শেষ উদ্যম প্রকাশ পায় তাহারই বহির্লক্ষণ—ক্রোধ। ফল কিন্তু বিপরীত—আত্মা অস্মিতার আত্মসাৎ না হইয়াই, অস্মিতাই আত্মার আত্মসাৎ হইবে। ক্রমে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব !

———○———

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥৪॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৫॥

অনুবাদ। মহাসৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত নিশুম্ভ প্রধান অসুর-সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ অভিধাবিত হইল। তাহার অগ্রে পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে ক্রুদ্ধ মহাসুরগণ ওষ্ঠ দংশনপূর্বক দেবীকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভ উভয় ভ্রাতার মধ্যে নিশুম্ভ প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। অস্মিতা ও মমতা—এই উভয়ের মধ্যে মমতাই প্রথমে আত্মলাভে অগ্রসর হয়—'আমার আত্মা' বলিয়া অম্বিকাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। নিশুম্ভের—মমতার অগ্রভাগে আত্মলাভের বাসনা, পৃষ্ঠদেশে জগদ্ভোগের বাসনা, উভয় পার্শ্বে অনন্ত ঐশ্বর্য বিকাশের বাসনা, ইহারাই মুখ্য অসুর ; এই অসুর সৈন্যগণ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশনপূর্বক দেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে অভিধাবিত হইল। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে—ইতিপূর্বে রক্তবীজবধে জীবভাব পর্যন্তের বিলয় হইয়া গিয়াছে, আবার সম্মুখে পৃষ্ঠে পার্শ্বে এই বাসনারূপী অসুর-সকল কোথা হইতে আসিল ? তাহার সমাধান এই যে—মধুকৈটভ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্তবীজ পর্যন্ত যে সকল অসুর নিধনের কথা বলা হইয়াছে,

তাহাতে জীবভাবীয় যাবতীয় সংস্কারবিলয়ের রহস্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইবার ঈশ্বর-ভাবীয় সংস্কারনাশের কথা বলা হইবে। সুতরাং নিশুম্ভের অগ্রে পশ্চাতে এবং পার্শ্বদেশে যে সকল অসুরসৈন্যের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে ঈশ্বরভাবীয় সংস্কাররূপে বুঝিয়া লইলে, আর কোনও সংশয় উপস্থিত হইবে না। সাধক! বিশেষভাবে মনে রাখিও —এই নিশুম্ভ ও শুম্ভবধে ঈশ্বরত্ব বিষয়ক সংস্কারক্ষয় বর্ণিত হইবে। পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইবার পক্ষে জীবভাবীয় সংস্কারগুলি যেরূপ অন্তরায়, ঈশ্বরত্বের সংস্কারও ঠিক সেইরূপই প্রতিবন্ধক। জীবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব এই উভয়ের বিলয় সাধন করিতে পারিলেই অম্বিকাকে লাভ করা যায়। যথার্থই যাহারা মুক্তিকামী, যথার্থই যাহারা ইহামুত্রফলভোগবিরাগী, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব পর্যন্ত যাহাদের নিকট উপেক্ষিত, কেবল তাহারাই এই অদ্বয় অমৃতময় আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, নিশুম্ভ সদলবলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। 'আমার আত্মা' বলিয়া আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিয়া নিজের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে উদ্যত হইল। উদ্দেশ্য এই যে— আত্মাকে আত্মীয় করিতে পারিলেই ঈশ্বরত্ব লাভ হয়; স্বাধীনভাবে মুক্তপ্রাণে জগদ্রূপ ঐশ্বর্যবিলাস সম্ভোগ করা যায়। ইহাই নিশুম্ভের যুদ্ধাভিযানের রহস্য।

সাধক! এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে, বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বরত্ব কি এবং প্রেমভক্তিই বা কি; সাধারণতঃ তোমরা যেখানে প্রেমভক্তির আলোচনা কর, তাহা যথার্থ প্রেম ভক্তির স্থান নহে। ওগো, যতদিন তোমরা নিশুম্ভের মত 'আমার আত্মা' বলিয়া আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিতে না পারিবে, যতদিন আত্মস্বরূপের আভাস না পাইবে, ততদিন প্রেমভক্তির বিষয় আলোচনা করিবার অবসর কোথায়? 'আমার আত্মা' এই কথাটি বলিবার—বুঝিবার সামর্থ্য তখনই হয়, যখন আমার বলিবার আর কিছুই থাকে না। সর্বভাবের বিলয় না হওয়া পর্যন্ত, চিত্তের ভাবস্রোত নিরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, আমার ভগবান্, আমার মা, আমার আত্মা প্রভৃতি আত্মীয়বোধক বাক্যপ্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। সাধকের যখন একমাত্র আত্মাই লক্ষ্য হইয়া পড়ে, আর কিছুই বোধময় ক্ষেত্রে ফুটিবার অবকাশ পায় না, তখনই আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। এবং তখনই যথার্থ প্রেম ভক্তির অপূর্ব রসাস্বাদের যোগ্যতা লাভ হয়।

দেখ সাধক! নিশুম্ভের প্রায় সর্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি 'আমার অম্বিকাকে আমি চাই' বলিয়া সে কিরূপ তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়াছে! ঠিক এমনই করিয়া তুমি আকুল আগ্রহে অগ্রসর হও। ঈশ্বরত্বের লালসা রাখিও না। লাভ ক্ষতির বিচার করিও না, শুধু প্রেমে আত্মহারা হইতে চেষ্টা কর। তুমি নিশুম্ভের ন্যায় 'আমার আত্মা, আমার-মা' বলিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয় মাকে পাইবে, 'আমার' শব্দটি একেবারেই ভুলিয়া যাইবে এবং কেবল আত্মস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

———০———

আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ॥৬॥

অনুবাদ। মহাবীর্য শুম্ভও স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে মাতৃগণের সহিত চণ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য সক্রোধে (সমর ক্ষেত্রে) আগমন করিল।

ব্যাখ্যা। মমতার সঙ্গে সঙ্গে অস্মিতাও যুদ্ধযাত্রা করিল। পূর্বেই বলিয়াছি— মমতা ও অস্মিতা পরস্পর সহভাবী। ঈশ্বরত্বের—নানাবিধ ঐশ বিভূতির সংস্কাররূপ অসুর-সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল। শুম্ভ অম্বিকার পাণিগ্রহণাভিলাষী। অম্বিকার শরীর হইতে নির্গত অষ্টমাতৃ-শক্তিসহ চণ্ডিকাদেবীকে নিহত করিতে পারিলেই অম্বিকাদেবী একাকিনী হইবেন, এবং তাহা হইলেই হয়ত শুম্ভের সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে; তাই মন্ত্রে '**নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ**' এইরূপ উল্লেখ আছে।

শুন— অস্মিতা হইতে পৃথক্ আত্মা নামে একজন আছেন, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর, তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যথার্থ ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই অস্মিতার এত তীব্র আগ্রহ, এত দৃঢ়প্রযত্ন। অস্মিতা আপনাকেই আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধআত্মস্বরূপের আভাস দেখিতে পাইয়া স্বকীয় স্বরূপের অপূর্ণতা বিশেষভাবে অনুভব

করিয়া থাকে ; তাই আত্মাকে লাভ করিয়া সেই অপূর্ণতা দূর করিয়া স্বয়ং পূর্ণ হইতে চায় । তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমি ছাড়া আবার যে একজন 'আমির' সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে কিছুতেই পৃথক্‌ভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে না ; হয় ঐ আমি এই আমিতে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে, না হয় আমি ঐ আমিতে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে । দুইটি আমির সত্তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না । অস্মিতা ক্ষেত্রে উপনীত মুমুক্ষু সাধক না হইলে এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে কি ? যতক্ষণ আত্মস্বরূপের আভাস না পাওয়া যায়, ততক্ষণ অস্মিতাই আত্মা-রূপে অবভাসিত হইতে থাকে । উহা যে বাস্তবিক আত্মা নহে, ইহা প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না । ক্রমে যত আত্মসান্নিধ্য লাভ হয়, ততই তাহাকে আয়ত্ত করিতে আগ্রহ উপস্থিত হয় ।

ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥৭॥

অনুবাদ । অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । জলবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় তাহারা উভয়ে অতি প্রবলবেগে শরবর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা । মমতা 'আমার আত্মা' বলিয়া আত্মাকে আত্মীয় করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল ; আর অস্মিতা 'আমিই আত্মা' বলিয়া যথার্থ আত্মসত্তার নিরাস করিতে প্রয়াস পাইল । ইহাই শুম্ভ নিশুম্ভের সমর-রহস্য । যাঁহারা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই অস্মিতা মমতার অতিসূক্ষ্ম অথচ ভীষণ আক্রমণ লক্ষ্য করিতে পারিবেন । যথার্থই যাহাকে চরমতত্ত্ব এবং পরমধাম বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাকে যতক্ষণ আমার মধ্যে আনিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সাধকের কিছুতেই শান্তি বা বিশ্রাম নাই । সেই জন্যই সাধকগণ এই ক্ষেত্রে আসিয়া আত্মলাভ করিবার জন্য বিপুল অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন । পাতঞ্জল যোগসূত্রে উল্লিখিত **'তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ'** তীব্রসংবেগ সম্পন্ন সাধকগণের পক্ষেই আত্মলাভ আসন্ন হইয়া থাকে । আর বাস্তবিক অনুভূতি-ক্ষেত্রেও দেখা যায়—এইরূপ তীব্র সংবেগ একান্তই স্বাভাবিকভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় । নদী যেখানে সমুদ্রের সন্নিহিত, সেখানে স্রোতের বেগ বড়ই প্রবল । সাধক যত আত্মসান্নিধ্যলাভ করিতে থাকে, তাহার অধ্যবসায়ও তত প্রবল হয় । ইহাই শুম্ভ নিশুম্ভকর্তৃক অতি উগ্র শরবর্ষণের রহস্য । মন্ত্রে মেঘের সহিত ইহাদের উপমা করা হইয়াছে । ইহারও একটু উদ্দেশ্য আছে । মেঘ যেরূপ অনবরত জল বর্ষণ করিয়া নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে, অস্মিতা মমতাও সেইরূপ তীব্রবেগে অধ্যবসায় প্রয়োগরূপ শরবর্ষণ করিয়া অচিরে আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলিবে। তখন একমাত্র আত্মসত্তাই বিদ্যমান থাকিবে । অস্মিতা ও মমতা বলিয়া কিছুই থাকিবে না । ক্রমে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব ।

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শাস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥৮॥

অনুবাদ । অসুরদ্বয়নিক্ষিপ্ত বাণগুলিকে চণ্ডিকা দেবীও শীঘ্র শরসমূহের দ্বারা ছিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে অসুরাধিপতিদ্বয়ের অঙ্গ জর্জরিত করিতে লাগিলেন ।

ব্যাখ্যা । নিশুম্ভ ও শুম্ভ বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল ; যেহেতু চণ্ডিকা মা আমার স্বকীয় শর প্রয়োগে সে সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন । অধিকন্তু চণ্ডিকার অস্ত্রাঘাতে অসুর-দ্বয়ের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল । এই শর প্রয়োগের রহস্য যদিও পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তথাপি এ স্থলে পুনরুল্লেখ আবশ্যক বলিয়াই মনে হয় । **'প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে । অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ'** । এই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য-শর-নিক্ষেপের চরম উৎকর্ষতা এইখানে—এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-সমরেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সাধক যতই প্রণবধনু অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মলক্ষ্যে আত্মশর নিক্ষেপ করিতে থাকে, ততই সাধকের নিজ পৃথক্ সত্তাটি ক্ষীণ হইতে থাকে । যথার্থ সত্তার সন্ধান যতই পাওয়া যায়, জীবভাবীয় পৃথক্ সত্তাটির মূল ততই বিনষ্ট হইতে থাকে । অসুরাধিপতিদ্বয়ের শর ব্যর্থ হওয়া এবং অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়ার তাৎপর্য ইহাই । চণ্ডিকার শর প্রয়োগ বলিতে চিতিসত্তার পুনঃ পুনঃ ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ বুঝিয়া লইলেই এ

রহস্য সম্যক্ উপলব্ধিযোগ্য হইবে। নিষ্কর্ষ এই যে আত্মা মা, নিত্য স্বচ্ছ নিত্য নির্বিকার তাঁহাকে 'আমার' করিবার জন্য যতই চেষ্টা করা যায়, আমিটি ততই ক্ষীণ হইতে থাকে। আত্মার সেই নিতান্ত নির্মল স্বরূপের আভাস যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে সাধকের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে, অস্মিতা মমতাও ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। সাধক এই তত্ত্বটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধরহস্য বুঝিতে পারিবে।

———०———

নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্ মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥৯॥

অনুবাদ। (তখন) নিশুম্ভ শাণিত অসি এবং অত্যুজ্জ্বল চর্ম (ঢাল) গ্রহণপূর্বক দেবীর উত্তম বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর-যুদ্ধেও একবার সিংহের মস্তকে এইরূপ আঘাত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। নিশুম্ভও শাণিত অসি এবং চর্ম গ্রহণ করিয়া সিংহের মস্তকে সেইরূপ আঘাত করিল। মাতৃশক্তি পরিচালক যন্ত্রটিকে অর্থাৎ জীবরূপী সিংহকে অকর্মণ্য করাই নিশুম্ভের অভিপ্রায়। জীব-সিংহকে উদ্যমবিহীন করিতে পারিলেই অম্বিকা নিশুম্ভের অধীনতা স্বীকার করিবেন; ইহাই তাহার উদ্দেশ্য!

একটি আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে আবার জীবসিংহ কোথা হইতে আসিল? রক্তবীজবধেই ত' জীবভাবের বিলয় হইয়াছে। বিশেষ কথা— বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎ, তাহাই ত' জীবের যথার্থ স্বরূপ; তাহাই এখানে শুম্ভাসুররূপে বর্ণিত, তবে আবার দেবীর বাহন সিংহ কোথা হইতে আসিবে? এ আপত্তি সত্য বটে। ইহার উত্তর এই যে, যদিও বাস্তবদৃষ্টিতে চিদাভাস হইতে অতিরিক্ত জীব বলিয়া কিছুই নাই, তথাপি যতক্ষণ অস্মিতা ও মমতা আছে, ততক্ষণ এমন একটা শক্তি, যদিও তাহাতে 'আমি জীব' বলিয়া কোনরূপ অভিমান নাই, তথাপি উহা যে আত্মারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সেই বিশিষ্টতাটুকুই এই স্থলে দেবীর বাহন—সিংহ।

এই মন্ত্রে বাহনের একটি বিশেষণ আছে— উত্তম। ইতিপূর্বে দেবীর যে বাহন ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত স্থূলাভিমানী, কিন্তু ইহা আনন্দময় কোষে অতিসূক্ষ্মতম শক্তিপ্রবাহ! এখানে কোনরূপ স্থূলত্বের অভিব্যক্তি নাই। তাই ইহাকে উত্তম বাহন বলা হইয়াছে। শুন, সুষুপ্তিকালে জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করে, সেই সময় স্থূল কিংবা সূক্ষ্মবিষয়ক কোন জ্ঞানই থাকে না, কিন্তু অজ্ঞান-বিষয়ক যে জ্ঞানটুকু থাকে, উহাকে ধরিতে পারিলেই দেবীর এই উত্তম বাহন সিংহের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে।

———०———

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥১০॥

অনুবাদ। বাহন আহত হইলে দেবী ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রদ্বারা নিশুম্ভের অসি ও অষ্টচন্দ্র-চিহ্নিত চর্মও ছেদন করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর উত্তম বাহন সিংহকে আহত হইতে দেখিয়া ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রপ্রয়োগে দেবী নিশুম্ভের উত্তম অসি এবং অষ্টচন্দ্র চিহ্নিত চর্ম ছিন্ন করিয়াছিলেন। ক্ষুরপ্র —ক্ষুরসদৃশ একপ্রকার শাণিত অস্ত্রবিশেষ। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ আত্মস্বরূপ-প্রকাশক শক্তিবিশেষ। যে প্রকাশশক্তির প্রভাবে ঈশ্বরভাবীয় বিক্ষেপসমূহ নিবারিত হয়, তাহাই এস্থলে ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চিক্ষুর নিধনে যে বিক্ষেপ-নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে উহা জীবভাবীয় বিক্ষেপ। আর এই অস্মিতাক্ষেত্রে যে বিক্ষেপ নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে উহা ঈশ্বরভাবীয় বিক্ষেপ বুঝিতে হইবে; কারণ এই অস্মিতাক্ষেত্রে জীবভাবীয় বিক্ষেপের কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, দেবী ক্ষুরপ্র অস্ত্র-প্রয়োগে নিশুম্ভের উত্তম অসি এবং চর্ম উভয়ই ছিন্ন করিলেন। অসি শব্দে এস্থলে ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরভাবীয় বিক্ষেপ শক্তি এবং চর্ম শব্দে আত্মস্বরূপ আবরক শক্তিবিশেষ বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রে চর্মটিকে অষ্টচন্দ্র-চিহ্নিত বলা হইয়াছে, উহারও একটু রহস্য আছে। ইতিপূর্বে যে অষ্টপাশের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে উহাদের শেষ চিহ্নস্বরূপ সূক্ষ্মতম

বীজ তাহাই এস্থলে অষ্টচন্দ্র চর্ম নামে উক্ত হইয়াছে। সাধারণ কথায় চর্মঅস্ত্রকে ঢাল বলা হয়। ইহা আবরণ শক্তিরই নামান্তর মাত্র। স্বপ্রকাশ আত্মশক্তি যখন নিশুম্ভকে—মমত্বকে বিলয় করিতে উদ্যত হয়, তখন সে সূক্ষ্মতম বীজরূপী আবরণশক্তি প্রভাবে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে ; ইহাই মমতার স্বভাব। মা এইবার তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন।

———○———

ছিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেনাভিমুখাগতাম্ ॥১১॥

অনুবাদ। চর্ম এবং খড়্গ ছিন্ন হইলে, সেই অসুর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবীর অভিমুখে আগত সেই অস্ত্রকেও দেবী চক্র অস্ত্র প্রয়োগে দ্বিধা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। অসি চর্ম ছিন্ন হইল দেখিয়া নিশুম্ভ শক্তি-অস্ত্র প্রয়োগ করিল। দেবী তাহাও চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। পূর্বোক্ত আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি যাহা হইতে উদ্ভূত হয়, সেই মূল অজ্ঞানস্বরূপ পদার্থও যে শক্তিবিশেষ ইহা বলাই বাহুল্য। অজ্ঞানের শক্তিস্বরূপতা বেদান্তশাস্ত্রেও বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক অজ্ঞানরূপ মূল শক্তি হইতে প্রকাশিত আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয় যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন নিশুম্ভ শেষবারের মত তাহার সমস্ত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া সেই মূল অজ্ঞান শক্তিকেই ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মন্ত্রে ইহাই শক্তি অস্ত্র প্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মা চক্র-অস্ত্র প্রয়োগে তাহাও ব্যর্থ করিয়া দিলেন। চক্র শব্দের অর্থ সুদর্শন চক্র অর্থাৎ জগৎ চক্র। পূর্বে এই চক্ররহস্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মমতা যখনই আমার আত্মা বলিয়া আত্মাকে পরিগ্রহ করিতে অগ্রসর হয়, তখনই মা আমার এই জগৎ-চক্র সম্মুখে ধরিয়া উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দেন। তাৎপর্য এই যে, সাধক যখন অজ্ঞানবশতঃ 'আমার' বলিয়া আত্মাকে ধরিতে চেষ্টা করে, তখনও ঠিক আত্মাকে ধরা যায় না। আত্মার বিভূতিসমূহ অর্থাৎ ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারসমূহ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং উহাদের উপরই মমত্ব জন্মে। কিন্তু অনাত্ম-ভাবসমূহের প্রতি যে মমত্ব তাহা ইতিপূর্বে সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়াছে, পরবৈরাগ্যের প্রভাবে জীবভাবীয় এবং ঈশ্বরভাবীয় যাবতীয় বিভূতিই যে ত্যাগ বা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইয়াছে। মমতা একমাত্র আত্মাকেই চায়, অন্য কোন প্রলোভনই আর তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না ; তাই মা যতই জগৎচক্র বা আত্মবিভূতির প্রলোভন দেখাইয়া মমত্বের অগ্রগতিকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, মমত্ব ততই উল্লাসে তীব্র উৎসাহে আত্মাভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। যদিও মমত্বের এই প্রয়াস অর্থাৎ আত্মাকে আত্মীয় করিবার প্রযত্ন প্রায় নিষ্ফলই হইয়া যায়, তথাপি এইরূপ চেষ্টারও একটা বিশেষ উপকার আছে। সাধক মূল অজ্ঞানশক্তি প্রভাবে যতবার আত্মাকে আত্মীয় করিতে চেষ্টা করে, ততবারই একটু একটু করিয়া মমত্ববোধ ক্ষীণ হইতে থাকে ; সুতরাং মন্ত্রে যে মায়ের চক্র-অস্ত্র প্রয়োগে নিশুম্ভের শক্তিহীনতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা সাধক মাত্রেরই সূক্ষ্ম অনুভবযোগ্য বিষয়। উন্নতস্তরের অনুভূতি-সম্পন্ন সাধকগণ স্বকীয় অনুভব বিশ্লেষণ করিলেই এই রহস্যের সন্ধান পাইবেন।

———○———

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥১২॥
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥১৩॥
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৪॥

অনুবাদ। অনন্তর নিশুম্ভদানব কোপপ্রজ্বলিত হইয়া শূল গ্রহণ করিল। দেবীও সেই শূল আসিতে আসিতেই মুষ্টিপাতের দ্বারা চূর্ণ করিয়া দিলেন। নিশুম্ভ তখন গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবীর ত্রিশূলাঘাতে সেই গদাও বিদীর্ণ এবং ভস্মীভূত হইল। অনন্তর পরশুহস্তে সমাগত সেই দৈত্যপুঙ্গবকে দেবী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রেও নিশুম্ভ এবং চণ্ডিকা দেবীর পরস্পর অস্ত্রপ্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। নিশুম্ভ শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, দেবী মুষ্টিপাতে তাহা চূর্ণ

করিলেন । নিশুম্ভ গদা নিক্ষেপ করিলে, দেবী ত্রিশূলাঘাতে তাহাও ব্যর্থ করিলেন। নিশুম্ভ পরশুর আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, দেবী বাণ-প্রয়োগে তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। শূল— স্বরূপবিষয়কজ্ঞান, গদা—ব্যক্তবাক্য, প্রয়োগ —স্তোত্রাদিপাঠ মহত্ত্বকীর্তন প্রভৃতি, পরশু—দ্বৈত-প্রতীতি। এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন ! স্থূল কথা এই যে, মমতা বারংবার নানাবিধ উপায়ে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আত্মাকে আত্মীয় করিতে চেষ্টা করে । 'আমি থাকি, আর আমার বলিতে একমাত্র তুমিই থাক' এই যে ভাব, ইহাই নিশুম্ভের নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে । সাধক-জীবনে যদি কাহারও এইভাবটি সত্য সত্যই উপনীত হয়, তবে তিনি যে ধন্য ইহা মুক্ত কণ্ঠেই বলা যায়। প্রেমভক্তি অনুশীলনের ইহাই যে চরম অবস্থা, এ কথা সত্য, কিন্তু এখানে থাকিলেও চলিবে না, আরও অগ্রসর হইতে হইবে । তাই নিশুম্ভ যতই চেষ্টা করুক, যতই প্রেমভক্তির অনুশীলন করিয়া আত্মরস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করুক, স্বকীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে যতই প্রয়াস পাউক, মা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেনই ; তাই দেখিতে পাই চণ্ডিকাদেবীও নানা অস্ত্র প্রয়োগে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অদ্বয় জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে মমতার সেই বিশিষ্টতা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন । তাহারই ফলে অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশ-শক্তিপ্রভাবে মমতার বিশিষ্ট প্রকাশ ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া মূর্চ্ছিত হয়— দ্বৈতপ্রতীতি কিছুক্ষণের জন্য বিলয়প্রাপ্ত হয় । মমতার যে একটা সত্তা আছে, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়াই সে মূর্চ্ছিত হয় । বৈষ্ণবশাস্ত্রেও প্রেমধর্ম অনুশীলনের পরিণামে এইরূপ মূর্চ্ছার কথা বর্ণিত আছে। ভক্তিশাস্ত্রবর্ণিত অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের শেষ ভাব—এই মূর্চ্ছা । যখন 'আমার আমার' বলিয়া আত্মাকে ধরিতে গিয়া 'আমার' বোধটি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মস্বরূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,তখনই যথার্থ প্রেমের উদয় হয় । সাধক, এখানে মূর্চ্ছা শব্দে চৈতন্যের বিলোপ বুঝিও না । স্বয়ং চৈতন্য-স্বরূপের সমীপস্থ হইলে জীব কখনও চৈতন্যহীন হইতে পারে না । যদি দেখিতে পাও— কেহ ভগবানের নাম স্মরণ বা কীর্তন করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, তবে বুঝিও— সে এখনও চৈতন্যবস্তুর স্বরূপ বুঝিতেই পারে নাই, তাঁহার নিকটস্থ হওয়া ত' দূরের কথা। যাহারা চৈতন্যময়কে স্মরণ করিতে গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তাহারা মনোময় ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটুও উপরে উঠিতে পারে নাই, ইহাই স্থির বুঝিয়া লইও ।

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে ।
ভ্রাতার্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥১৫॥

অনুবাদ । ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইলে শুম্ভ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আম্বিকাকে হত্যা করিতে গমন করিল ।

ব্যাখ্যা । নিশুম্ভ ভীমবিক্রমই বটে । সাধক, এই মমত্বই একদিন স্থূলে—সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনে আকৃষ্ট ছিল । কত চেষ্টা, কত কঠোর প্রযত্নে এবং কত দীর্ঘকালে উহাকে সে আকর্ষণ হইতে ছাড়াইয়া ধর্মের ভিতর আনিয়াছিলে ; তখন এই মমতা ধর্মকেই আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । তারপর বহুদিনে—বহুজন্মের পর মায়ের কৃপায় শ্রীগুরুর অহৈতুক অনুপ্রেরণায় সেই ধর্ম-সংস্কার ছাড়াইয়া মমতাকে যথার্থ সাধনারাজ্যে উপস্থিত করিলে, সে তখন সাধনাকেই আমার বলিয়া বুঝিয়া লইল । তারপর বহু সুকৃতির ফলে এতদিনে সে আত্মস্বরূপের সন্ধান পাইয়া আত্মাকে আমার বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে । দেখ সাধক, এই মমতা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছে ; সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । কত নিম্ন অবস্থা হইতে কত উচ্চ অবস্থায় আসিয়াছে । তথাপি মমতার যে স্বভাব, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । মমতা এখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চায় না, জগৎ সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মলাভে প্রয়াসী হইয়াছে । কিন্তু ইহাও ভেদজ্ঞানমাত্র ; তাই মা আমার উহাকেও নিধন করিবেন । সাধক ! একটা কথা এখানে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই রুদ্রগ্রন্থির স্তরে প্রবেশের পর যে সকল স্থলে ভেদ উল্লেখ আছে, তাহাতে স্বগতভেদ মাত্রই লক্ষিত হইয়াছে, স্বজাতীয় কিংবা

বিজাতীয় ভেদের কোন কথাই এ স্তরে হইতে পারে না। সে যাহা হউক এখন নিশুম্ভ মায়ের অদ্বয়স্বরূপ-প্রকাশে কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ; অর্থাৎ মমত্বের আর বিকাশভাব রহিল না। তাই শুম্ভ—অস্মিতা নিজেই অতি সত্বর অম্বিকাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। আত্মাকে হনন করিতে পারিলেই অস্মিতা ও মমতা, উভয় ভ্রাতাই নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু হায়! সে যে অসম্ভব।

———○———

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥১৬॥

অনুবাদ। সেই শুম্ভাসুর রথে আরোহণ করিয়া অতুলনীয় অষ্টসংখ্যক হস্তদ্বারা নানারূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণপূর্বক আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ রথস্থ। রথ—দেহ। দেহ ত্রিবিধ— স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। শুম্ভের রথ বলিতে এখানে কারণ-দেহই বুঝিতে হইবে, যেহেতু, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে যে আত্মাভিমান, তাহা অনেক পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। অষ্টভুজ—অষ্ট সাত্ত্বিকভাব। আকাশমণ্ডল—বিজ্ঞানময় ব্যাপক আকাশ। অস্মিতা কারণ-দেহের আশ্রয়ে অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবসমন্বিত বিজ্ঞানময় আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। প্রেম ভক্তির অনুশীলন জন্য পুলক অশ্রু কম্প প্রভৃতি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক! ইহা স্থূলে নয় অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে। সে যাহা হউক, **'ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ'** ইহাই শুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার যথার্থ স্বরূপ। অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে সাধকের ঠিক এই অবস্থাটি উপস্থিত হয় — অতি স্বচ্ছ চৈতন্যময় সর্বব্যাপক আকাশ আমিত্বময় হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিষয়ক প্রতীতিই থাকে না। অতুলনীয় অনির্বচনীয় আনন্দের সে আমিত্ববোধটা যেন একেবারেই ডুবিয়া যাইতে চায় ; তাই সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই আত্মার —অম্বিকার মায়ের আমার পরমরূপ দূর হইতে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ; সর্বভাবের সহিত অন্বিত আমি কখনও এই অম্বিকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সর্বভাব হইতে একান্ত বিবিক্ত না হইলে—উলঙ্গ আমি না হইলে, ভাবাতীতা দিগম্বরী মায়ের অঙ্কে আরোহণ করা যায় না। কিন্তু সে অন্যকথা—

———○———

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুশশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥১৭॥
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্ত দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥১৮॥

অনুবাদ। তাহাকে (শুম্ভকে) আসিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খধ্বনি ও ধনুর অতীব দুঃসহ জ্যাধ্বনি করিলেন। এবং সমস্ত দৈত্যসৈন্যের তেজোনাশক স্বকীয় অসাধারণ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। সর্বতোব্যাপী অস্মিতাকে দেখিতে পাইয়া দেবী চণ্ডিকা শঙ্খ, ঘণ্টা এবং জ্যাধ্বনি করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি অনাহত-নাদ। ধনুর জ্যাধ্বনি—প্রণব-নাদ। নাদ এখানে বৈখরী নহে, মধ্যমা পশ্যন্তী প্রভৃতি সূক্ষ্মনাদের কথাই এখানে বলা হইতেছে। যতক্ষণ দ্বৈত-প্রতীতি আছে, ততক্ষণ নাদ থাকিবেই। তবে প্রভেদ মাত্র স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব নিয়া। সে যাহা হউক, দৈত্য-সৈন্যগণের তেজোবীর্য বিনাশ করিতে এই সূক্ষ্ম নাদত্রয় বিশেষ অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। যখনই আসুরিক ভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয়, তখনই অনাহত-নাদে অভিনিবেশ স্থাপনপূর্বক একতানে প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে সে অত্যাচার প্রশমিত হয়। দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম হইতেই এই কথা বলা হইতেছে। স্থূল অসুর—কামক্রোধাদি বৃত্তি, কিংবা সূক্ষ্ম অসুর—অস্মিতা প্রভৃতি, সকলই অনাহত-নাদ সমন্বিত প্রণবধ্বনিতে অভিভূত হইয়া পড়ে— উহাদের তেজোবীর্য হ্রাস পায়। পূর্বে বলা হইয়াছে, মা স্বয়ংই যুদ্ধ করেন, এই সকল মন্ত্রেও তাহাই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলে কিংবা অসুরিক বৃত্তিনিচয়ের দমন করিতে চেষ্টা করিলে শরণাগত সাধকগণ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন— অন্তর হইতে মা-ই সময়ানুরূপ সাধনা করিতে থাকেন, অর্থাৎ উপায়সকল যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে! মনে রাখিও সাধক!

উহাই দেবীর প্রতীকার বা মাতৃ-সমর ।

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ ।
পূরয়ামাস গগনং গান্তথোপদিশো দশ ॥১৯॥
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ ।
কারাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২০॥

অনুবাদ । অনন্তর সিংহ হস্তীর মহামদনাশক ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল, তাহাতে আকাশ, পৃথিবী এবং দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল । অনন্তর কালী আকাশে উৎপতিত হইয়া করদ্বয়দ্বারা পৃথিবীকে বিতাড়িত করিলেন ; সেই তাড়ন-ধ্বনিতে পূর্বোত্থিত শব্দসকল তিরোহিত হইয়া গেল ।

ব্যাখ্যা । অনাহত-নাদ এবং প্রণবধ্বনির সহিত সিংহনাদ বা জীবের স্বকীয় উল্লাসসূচক জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া ধরণী ও গগন মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল । অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে ব্যোমতত্ত্ব পর্যন্ত সকল তত্ত্বই বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল । এখানে স্থূল ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের কথা বলা হয় নাই । অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপ ক্ষিতি প্রভৃতির অতি সূক্ষ্মতম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে ধরণী ও গগনমণ্ডল কথাটি বলা হইয়াছে । এই মন্ত্রে সিংহনাদ শব্দটির একটি বিশেষণ আছে— **'ত্যাজিতেভ-মহামদৈঃ'** । হস্তীর মহামদনাশক । ইভ—হস্তী অর্থাৎ মন । তাহার যে মহামদ—মত্ততা অর্থাৎ চঞ্চলতা, তাহা জীব-সিংহের ভীষণ নিনাদে 'ত্যাজিত' অর্থাৎ বিদূরিত হইয়া গেল ।

সাধক, যখন দেখিতে পাইবে— সূক্ষ্মতম অনাহত-নাদের সহিত পরম সূক্ষ্ম প্রণবধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন তুমিও মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া মনোরূপ মত্ত হস্তীর দুর্দমনীয় চঞ্চলতাকে বিশীর্ণ করিয়া দিও । তোমার আশা পূর্ণ হইবে । সে যাহা হউক, যখন এইরূপ বিভিন্ন নাদসমন্বয় ধরণী এবং গগনমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, তখন কালী— সংহারিণী শক্তি, স্বকীয় করদ্বয়দ্বারা ক্ষিতিতল সন্তাড়িত করিলেন । অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বীয় বোধকে বিলয় করিয়া দিলেন— বোধের যে ক্ষিতি-তত্ত্বাত্মক বিকাশ বা স্ফুরণ, তাহাকে প্রহত করিলেন । সেই তাড়নধ্বনিতে পূর্ব কথিত সমুদয় ধ্বনি তিরস্কৃত হইয়াছিল । কারণ, ক্ষিতিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় ভাব বা ধ্বনির বিকাশ হয় ; যখন সেই ক্ষিতিতত্ত্ব কালীর করপ্রহারে স্বয়ং বিশীর্ণ হয়, তখন তদাশ্রিত বিশেষ বিশেষ ভাব বা ধ্বনিসমূহ আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যায় । তাই মন্ত্রে **'প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ'** এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । সাধক ! এখানে ক্ষিতিতত্ত্ব শব্দে অস্মিতার স্থূল বোধাত্মক স্ফুরণমাত্র বুঝিও ; তাহা হইলেই এই সকল কথা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ।

অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥২১॥

অনুবাদ । শিবদূতী অমঙ্গলজনক অট্টহাস্য করিলেন । সেই শব্দে অসুরগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং শুম্ভ অতিশয় কোপান্বিত হইল ।

ব্যাখ্যা । শিবদূতী—যিনি ইতিপূর্বে ঈশানকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই চণ্ডিকাদেবী অসুরপক্ষের অমঙ্গলজনক অট্টহাস্য করিলেন । সেই ভীষণ হাস্যধ্বনিতে অসুরগণ বিত্রস্ত এবং শুম্ভ কোপান্বিত হইয়াছিল । হাস্য আনন্দময় আত্মরূপের বিকাশ । বিদ্যুদ্‌রেখাবৎ—চকিতের ন্যায় সেই বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মসত্তার ক্ষণিক বিকাশই শিবদূতীর হাস্য । এই হাস্যই অসুরগণের পক্ষে অশিব অর্থাৎ বড়ই অমঙ্গলজনক, যেহেতু ঐ হাস্যই অসুর ভাবসমূহকে বিলয় করিয়া দেয় । পরমাত্মার এইরূপ ক্ষণিক বিকাশেই উহারা একান্ত সন্ত্রস্ত ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে ; কারণ, ক্ষণকালের জন্য আপনাদের বিশিষ্ট সত্তা হারাইয়া ফেলে। সে কি ভীতিদায়ক অবস্থা ! অসুরগণ যখন সেইরূপ স্বকীয় সত্তা হারাইতে বসে, তখন প্রাণপণে আপনাদের বিশিষ্ট সত্তাটি ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে ।

সাধক ! এমন করিয়া এক একবার মায়ের হাসি প্রকাশ পাইলেই, জীবের পৃথক্ সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে, এবং আসুরিকভাবসমূহ সন্ত্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সমুদয় আসুরিকভাবের কেন্দ্রস্বরূপ শুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠে ; যে আত্মপ্রকাশ তাহার বিশিষ্ট সত্তাকে বিনাশ করিতে উদ্যত তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সে তখন বদ্ধপরিকর হয় ।

দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥২২॥

অনুবাদ। 'হে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ'; অম্বিকা যখন শুম্ভকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবতাবর্গ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ব্যাখ্যা। মা শুম্ভকে **'দুরাত্মন্'** বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অস্মিতা আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়াও আত্মস্বরূপে পরিচিত হইতে চায়, ইহাই অস্মিতার দুষ্টভাব; তাই মা ইহাকে 'দুরাত্মা' বলিলেন। 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'—থাক থাক, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তুমি বিলয়প্রাপ্ত হইবে—মায়ের বাক্য হইতে এই ভাবটিই প্রকাশ পাইতেছে। মা যখন এইরূপ অচিরকাল মধ্যে শুম্ভের বিনাশ সূচনা করিলেন, তখন বিজ্ঞানময় আকাশমণ্ডলে অবস্থিত বিশিষ্ট চৈতন্যবর্গরূপী দেবতাবৃন্দ মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অচিরেই তাঁহারা অসুরের অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবেন, আর তাঁহাদের অস্মিতারূপ দুর্জয় অসুরের অধীনে থাকিতে হইবে না। অমৃতময় আত্মসত্তা সম্ভোগের শুভদিন আগত প্রায়; এই উল্লাসেই দেবতাগণের জয়ধ্বনি।

সাধক! সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে এইরূপ শুভলক্ষণসমূহ দেখিতে পাইলেই বুঝিও—তোমার আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই। দেবতাগণ যতদিন আত্মাভিমুখী না হন, তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ যতদিন মহোল্লাসে অমৃত-সম্ভোগের অভিলাষী না হন, ততদিন আত্মলাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র। যখন দেখিতে পাইবে,—ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি একসুরে সম্মিলিত হইয়া মহোল্লাসে আত্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তখনই বুঝিও তোমার মাতৃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুধু মা মা বলিয়া কাঁদিতে থাক, আর বল—'কাছে এসে হাতে ধ'রে, নিয়ে যাও মা কোলে ক'রে আমি দুবাহু তুলে মা মা বলে, ঘরের ছেলে যাই মা ঘরে'। সরল প্রাণে এমন করিয়া বলিতে পারিলেই মা আসিবেন, দেবতাবর্গ তোমার সহায় হইবেন। তোমার আমিত্বের বিলয় হইবে—মাতৃ-বক্ষে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে।

———○———

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥২৩॥
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥২৪॥

অনুবাদ। শুম্ভ দেবীর নিকটে আগমনপূর্বক অতি ভীষণ অগ্নিশিখা-বিশিষ্ট শক্তিঅস্ত্র প্রয়োগ করিল। বহ্নিরাশির ন্যায় সেই অস্ত্র আসিতে আসিতেই দেবীর মহোল্কাকর্তৃক নিরস্ত হইল। শুম্ভ তখন সিংহনাদে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিল; কিন্তু হে অবনীপতে! দেবীর ভীষণ বজ্রধ্বনি তাহার সে ধ্বনিকে অভিভূত করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই দুইটি মন্ত্রে শুম্ভের ভাগ্যবিপর্যয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার শক্তি-অস্ত্র এবং ভীষণ সিংহনাদ উভয়ই ব্যর্থ হইয়াছিল। অস্মিতা স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মাকে সর্বভাবের মধ্যে আনিয়া বিশেষভাবে ভোগ করিতে চায়, ইহাই শুম্ভের শক্তি-অস্ত্র প্রয়োগের রহস্য! এই শক্তি ভীষণ বহ্নিরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কারণ, যখন এই অস্মিতার প্রকাশ হয়, তখন সর্বব্যাপী একটা আমিত্বময় ঘনসত্তা আত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু আত্মার স্বপ্রকাশভাবটি তদপেক্ষাও ঘন এবং সমুজ্জ্বল, তাই ক্ষণকালের জন্য সেই আত্মস্বরূপের আভাস অস্মিতার উপরে নিপতিত হইয়া উহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। ইহাই মায়ের মহোল্কা প্রয়োগের রহস্য। যখনই অস্মিতা স্বকীয় বিশিষ্ট সত্তাকে তীব্র অধ্যবসায়ের সহিত ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তখনই আত্মার স্বপ্রকাশস্বরূপটি ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হয়; সুতরাং তাহার সমস্ত শক্তি-প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায়।

শক্তি-অস্ত্র ব্যর্থ হইতে দেখিয়া শুম্ভ ভীষণ সিংহনাদ করিয়াছিল। মায়ের বজ্রধ্বনিতে তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। যথার্থই শুম্ভের আমিত্বধ্বনির দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হয়। অস্মিতা দেখিতে পায়—'আমি ছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই, সর্বভাবে আমিই আছি'। ইহাই ত' শুম্ভের সিংহনাদ। কিন্তু হে অবনীপতে সুরথ! এবার প্রকৃতি বিপর্যস্ত হইয়াছে, নির্ঘাতনিঃস্বন উত্থিত হইয়াছে। অন্তরীক্ষে বজ্রধ্বনিবৎ আকস্মিক ভীষণ নিঃস্বন উত্থিত হইয়া, শুম্ভের সে সিংহনাদকে নির্জিত করিয়া দিয়াছিল। আকস্মিক বজ্রধ্বনি আর কিছুই নহে, বিদ্যুৎ-বিকাশবৎ ক্ষণস্থায়ী আত্মবিকাশ মাত্র। আত্মার বিকাশেই অস্মিতা দুর্বল হইয়া পড়ে, নিজের অস্তিত্বে সংশয় আসে, 'আমি আছি' অর্থাৎ 'অস্তি' বলিয়া যে একটি প্রতীতি হইতেছে,

এই অস্তিত্ব আমার না আত্মার ; এইরূপ জ্ঞানের আভাস আসিতে থাকে। যে পরিমাণে এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই অস্মিতা দুর্বল হইয়া পড়ে। ক্ষণকালের জন্যও নিত্য-অস্তিত্বের বিকাশ হইলে, প্রতিবিম্বস্বরূপের অস্তিত্ব ক্ষীণবল না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা এই সকল কথা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিবেন।

———○———

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎ প্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৫॥
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতোভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৬॥

অনুবাদ। দেবী শুম্ভনিক্ষিপ্ত শত সহস্র বাণসমূহকে এবং শুম্ভও দেবীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহকে স্বকীয় অত্যুগ্র শরপ্রয়োগে ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চণ্ডিকাদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভকে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন, শুম্ভ আহত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। আত্মা এবং অস্মিতায় যুদ্ধ। বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের সমর। সাধক! লক্ষ্য কর—তোমার সর্ব-ভাবের সহিত অন্বিত ঐ যে আমিত্বটি উহা কিছুতেই আপনস্বরূপকে হারাইতে চায় না ; নানাভাবে নানা আশ্রয়ে 'আমিকে' রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই শুম্ভের শত সহস্র শরনিক্ষেপ। আবার দেবী চিতিশক্তিও মুহুর্মুহু স্বকীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া অস্মিতার সে বিশিষ্ট আশ্রয়গুলিকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ইহাই মায়ের সহিত শুম্ভের সমর-রহস্য।

অনন্তর চণ্ডিকাদেবীর শূলাঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হইল। শূলাঘাত শব্দের তাৎপর্য জ্ঞানময় সত্তার বিকাশ, ইহা পূর্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। 'আমি' যে 'জ্ঞ'স্বরূপ বস্তু, ইহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয়াদি বিশিষ্ট কোন ভাব নাই, এইরূপ উপলব্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে শূলাঘাত শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। যে মুহূর্তে এইরূপ অনুভব প্রকাশ পায়, সেই মুহূর্তেই অস্মিতা মূর্চ্ছিত বা অদৃশ্য হয়। ক্ষণকালের জন্য অস্মিতার বিভুত্ব ব্যাপকত্বাদি ধর্ম তিরস্কৃত থাকে—এমনই মায়ের আমার আত্মবিকাশ। তাঁহার বিকাশে সর্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিছুই থাকে না, কি যে থাকে, তাহাও ভাষায় ঠিক ঠিক বলা যায় না, সে যে 'আমি'-বর্জিত আমি! অথবা আমিরই যথার্থ স্বরূপ! সেই যে যথার্থ আমি, সেই ত' 'সোঽহং', সেই যে আত্মা ; সেখানে চন্দ্র, সূর্যের বিকাশ নাই, সেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদির বিকাশ নাই, সেখানে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, অগ্নিও সেখানে প্রকাশহীন, এমনই 'জ্ঞ'স্বরূপ কেবলানন্দস্বরূপ সেই আত্মা—আমি। ইহার চকিতবৎ বিকাশ হইলেই অস্মিতা কিছুক্ষণের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

———○———

ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৭॥
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥২৮॥

অনুবাদ। অতঃপর নিশুম্ভ চেতনা লাভ করিয়া ধনুর্ধারণপূর্বক শরসমূহের দ্বারা কালীকে এবং কেশরীকে আহত করিতে লাগিল। পুনরায় দনুজাধিপতি দিতি-তনয় নিশুম্ভ অযুতবাহু প্রসার করিয়া চক্রায়ুধদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভ এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল। মায়ের শূলাঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হওয়ার পর নিশুম্ভের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল ; সে ধনুর্ধারণপূর্বক কালী এবং কেশরীকে লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। অস্মিতা ও মমতা ঠিক এইরূপভাবে সাধককে উৎপীড়িত করিতে থাকে। একটি নির্জিত হইলেই অপরটির প্রভাব বিস্তৃত হয়। 'আমার আত্মা' বলিয়া আত্মাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই মমতার শর প্রয়োগের রহস্য। নিশুম্ভের বিশেষ ক্রোধ সংহারশক্তির উপর এবং দেবীর বাহন সিংহের উপর। কারণ ঐ সংহার-শক্তির জন্যই ত' কোথাও কিছুই নাই ; ঐ কালীই ত 'আমার' বলিয়া ধরিয়া রাখিবার মত কোথাও কিছুই রাখেন নাই, সর্বস্ব গ্রাস করিয়াছেন। আর কেশরীও একান্তভাবে জীবভাব হননেচ্ছু ; সুতরাং এই উভয়ের প্রতি নিশুম্ভের শর প্রয়োগরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল।

এই মন্ত্রে নিশুম্ভকে দনুজাধিপতি এবং দিতিজ বলা হইয়াছে। দনু এবং দিতি একেরই বিভিন্ন নাম—ইনি কশ্যপ-পত্নী। খণ্ডনার্থক 'দো' ধাতু হইতে দনু এবং দিতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শক্তি অখণ্ড বোধকে খণ্ডিত

করে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞানকে ধরিয়া রাখে, তাহাই দিতি বা দনু। কশ্যপ শব্দের অর্থ পশ্যক অর্থাৎ দ্রষ্টা। ব্যাকরণবিধি অনুসারে অক্ষর-বিপর্যয় হইয়া পশ্যক শব্দটি কশ্যপরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা নহে, বৈদিক নিরুক্তকার স্বয়ংই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কশ্যপের দুই পত্নী— দিতি এবং অদিতি। সর্বভাবপ্রকাশক ব্রহ্মের দ্বিবিধ শক্তি ; এক বহির্মুখী অপর অন্তর্মুখী। দনু বা দিতির সন্তানদিগকে দানব বা দৈত্য এবং অদিতির সন্তানদিগকে আদিত্য বা দেবতা বলা হয়। একদল বহির্মুখ, অন্যদল অন্তর্মুখ। একদল আত্মভাবকে খণ্ডিত করে, অপরদল আত্মসত্তায় যুক্ত থাকে।

সে যাহা হউক, 'আমার' এই জ্ঞানটিই ভেদজ্ঞানের সর্বপ্রথম বীজ। বাস্তবিক আমি ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, ইহাই সত্যজ্ঞান। কিন্তু যে কোন কারণে ঐ অখণ্ড আমির উপর যখন একটি 'আমার' বোধ ফুটিয়া উঠে, তখনই আমি ছাড়া আর একটা কিছু দ্বিতীয় বস্তুর ভাণ হইতে থাকে। অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর সত্তা-বিষয়ক প্রতীতি হইতে থাকে ; ইহাই যাবতীয় অসুরভাবের স্বরূপ। তাই অসুরদিগকে দিতিজ বা দনুজ বলা হয়। মমতা জাতীয় ভেদজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াই নিশুম্ভকে এস্থানে দনুজেশ্বর বলা হইয়াছে।

নিশুম্ভ অযুত অর্থাৎ দশ সহস্র বাহু বিস্তারপূর্বক চক্রায়ুধদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কথাটা একটু ভাবিবার বিষয়। মমতার শেষ আক্রমণ— আত্মার প্রতি মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ হইতেই আধুনিক বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমার প্রভু, আমার পিতা, আমার সখা, আমার বন্ধু, আমার পতি ইত্যাদি প্রকারে পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পরিসমাপ্তি এইখানে—এই নিশুম্ভবধে। আমার বলিয়া আর কিছুই থাকে না, সব 'আমি' হইয়া যায়। যতদিন 'আমার' শব্দ বলিতে গেলে আত্মা ব্যতীত আরও কিছু থাকে, ততদিন ত' সাধকের 'আমার' শব্দটি ঠিক ঠিক বলাই হয় না। যখন সর্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়, যখন সম্মুখে স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়, তখনই আত্মার প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ ফুটিয়া উঠিতে পারে। তৎপূর্বে যে মমত্ববোধের ভাব দেখা যায়, উহা প্রবর্তক অবস্থামাত্র। এই যথার্থ মমত্ববোধই অযুত হস্তে চক্র-অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হয়। দশ ইন্দ্রিয়পথে সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য ভাবের সাহায্যে আত্মাতে মমত্ববোধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ঐরূপ মমত্ববোধের সাহায্যে আত্মাতে যে সকল ভাব অর্পিত হয়, তাহা আবার আপনা হইতেই মমত্ববোধে ফিরিয়া আসে, পুনরায় আত্মাভিমুখে প্রেরিত হয়, আবার মমত্ব প্রতীতির মধ্যেই ফিরিয়া আসে। এইরূপ চক্রাকার গতি লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে **'চক্রায়ুধেন'** কথাটি উক্ত হইয়াছে। ঠিক ঠিক ধ্যানাবস্থা আসিলেই এ কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। আত্মার স্বরূপ দর্শন, আত্মার আহ্বান শ্রবণ, আত্মার সুগন্ধ গ্রহণ, আত্মরস আস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারগুলিকে অবলম্বন করিয়াই —**'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'** শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন পরমাত্মার অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপ অযুত বাহু বিস্তার করিয়াই ভাবাতীত স্বরূপকে আক্রমণ করিতে হয়। সাধক! এ সকলই কিন্তু বৈষ্ণবের ভাষায় অপ্রাকৃত ক্ষেত্রের কথা। যদিও অস্মিতা মমতা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলিও প্রকৃতিরই অন্তর্গত, তথাপি ইহা এত বেশী চৈতন্যধর্মী যে ইহাকে অপ্রাকৃত বলায় কিছু ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রের দর্শন শ্রবণাদির ব্যাপারগুলি যে সাধারণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার নহে, ইহা ধীমান্ সাধকের নিকট বলাই বাহুল্য মাত্র।

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥২৯॥

অনুবাদ। দুর্গমে নিপতিত জনগণের কাতরতাহারিণী ভগবতী দুর্গা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া নিশুম্ভনিক্ষিপ্ত চক্র এবং বাণসমূহকে স্বকীয় শরপ্রয়োগে ছিন্ন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। দুর্গত সন্তান দুর্গা বলিয়া, আর্তিহরা মা বলিয়া ডাকিয়াছে ; অসুর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া সর্বাশ্রয়া মাকে সরল প্রাণে দুর্গা বলিয়া ডাকিয়াছে ; তাই ভগবতী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মা আমার ক্রুদ্ধা চণ্ডিকামূর্তিতে মমতার যাবতীয় অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। মায়ের অস্ত্র —স্ব-শর, অর্থাৎ আত্ম-শর। আত্মস্বরূপ-প্রকাশরূপ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মা আমার এক একবার চপলার ন্যায় যখন স্বয়ং উদ্ভাসিত হয়েন, তখনই অসুরের

যাবতীয় অস্ত্রপ্রয়োগ ও উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ আত্মার এমনই স্বরূপ যে তাঁহার উদয়ে আর কাহারও সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সর্বসত্তার বিলয়কারী আত্ম-সত্তার বিকাশ হইলেই মমতাদি ভেদজ্ঞানাত্মক বৃত্তিপ্রবাহগুলি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। যোগশাস্ত্রকার ইহাকে 'প্রক্ষীণ ক্লেশাবস্থা' বলিয়াছেন। যাঁহারা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, এই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উপায় স্বতন্ত্র। আমরা কিন্তু চিরপুরাতন একটি পথের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছে—যতই মায়ের আমার আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে, ততই ক্লেশসমূহ প্রক্ষীণ হইয়া যায়। মায়ের এই আত্মপ্রকাশ আবার শরণাগত ভাবের ভিতর দিয়াই অতি সহজে হইয়া থাকে। সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাই এইরূপ সাধনার একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু এ সকল এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক কথা।

———০———

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৩০॥
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৩১॥

অনুবাদ। অতঃপর নিশুম্ভ দৈত্যসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া গদা গ্রহণপূর্বক চণ্ডিকাকে হত্যা করিবার জন্য বেগে অভিধাবিত হইল। (গদাহস্তে) আপতিত নিশুম্ভের সেই গদাকে তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা চণ্ডিকাও শীঘ্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নিশুম্ভ তখন শূলাস্ত্র গ্রহণ করিল।

ব্যাখ্যা। গদা শূল প্রভৃতির অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। স্থূল কথা—মমতা পুনঃ পুনঃ 'আমার' বলিয়া আত্মাকে পরিগ্রহ করিতে চায়, চণ্ডিকাও স্বকীয় স্বরূপ-প্রকাশরূপ তীক্ষ্ণধার খড়্গাঘাতে মমতার সে সকল উদ্যম বিনষ্ট করিয়া দেন। ভেদ-জ্ঞাননাশক বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানের প্রকাশকেই এস্থলে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বলা যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রে বিজ্ঞানই অসিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতি অল্পকালের জন্যও **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে, যাবতীয় ভেদজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া মমতা অগত্যা তাহার সর্বশেষ অস্ত্র শূল গ্রহণ করে। যে জ্ঞান-সত্তায় মমতারূপ অজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞানকেই এখানে ত্রিশূল বলা হইয়াছে। ত্রিপুটিজ্ঞানই এই ত্রিশূল। 'আমার আত্মাকে আমি সাক্ষাৎ করিতেছি' এইরূপ ভাবটির মধ্যে যে স্বগত-ভেদময় ত্রিপুটিজ্ঞান বিদ্যমান উহাই নিশুম্ভের শূলাস্ত্র।

———০———

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥৩২॥
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৩৩॥

অনুবাদ। অমরবিজয়ী নিশুম্ভ শূলহস্তে আগমন করিতেছে দেখিয়া, চণ্ডিকা অতিবেগে স্বকীয় শূল নিক্ষেপপূর্বক তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। শূলাঘাতে তাহার (নিশুম্ভের) হৃদয়দেশ এইরূপ বিদীর্ণ হইলে, তথা হইতে অপর এক মহাবল ও মহাবীর্যসম্পন্ন পুরুষ 'তিষ্ঠ' এই কথাটি বলিতে বলিতে নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভের শূল অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিপুটিজ্ঞান ব্যর্থ করিয়া চণ্ডিকা মা আমার শূলাঘাতে—অদ্বয়াত্মস্বরূপ প্রকাশে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। ওগো, এমন করিয়া বিদ্ধ না করিলে, এমন করিয়া দ্বৈতজ্ঞানকে বিদীর্ণ না করিলে, এমন করিয়া অদ্বয়তত্ত্ব উদ্ভাসিত না করিলে, আমাদের যে আর কোন উপায়ই থাকে না। মা! আজ তুমি এই মুক্তিমন্দিরের দ্বারে আসিয়া যে অদ্বয় শূলাঘাতে ভেদজ্ঞানের হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, এই শূলাঘাত কবে কোন্ অতীত যুগে আরম্ভ হইয়াছে, কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে এ হৃদয় কত ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তথাপি জাগে নাই। ওগো, আমি যখন 'আমার' বলিয়া বড় আদরে ধনৈশ্বর্যকে জড়াইয়া ধরিতাম, তখন বুঝি নাই যে, ঐ ধনৈশ্বর্যরূপেই তুমি—মা আমার। আমি ভেদজ্ঞানে জড়পদার্থ বলিয়া উহাকে ধরিতাম ; আর তুমিও ঠিক এমনি করিয়া তীব্র যাতনাদায়ক অথচ জ্ঞানময় শূলের আঘাতে ঐগুলিকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দিতে। আমি তখন **'হা হতোঽস্মি'** বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। তারপর যখন স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিতাম, তখনও বুঝি নাই—উহাও মা তুমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাই তুমি সেগুলিকেও ঐরূপ শূলাঘাতে সরাইয়া দিয়া, আমার হৃদয়দেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে। সেই অবসরে পরম প্রিয়তম আত্মা আমার, তুমি একটু একটু করিয়া এই বিশীর্ণ হৃদয়ের এক কোণে

আসিয়া স্থান গ্রহণ করিতে। এইরূপ একদিন নয়, কতদিন কত জন্ম ধরিয়া তোমার শূলাঘাত বক্ষ পাতিয়া লইয়াছি। কাঁদিয়াছি, অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছি, তথাপি আবার ভেদজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছি—তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আবার তুমি আমাকে জাগাইবার জন্য শূলাঘাত করিয়াছ। আবার বুক পাতিয়া সেই ক্ষতবিক্ষত বক্ষে তোমার শূলাঘাত সহ্য করিয়াছি। তোমার সেই কৃপাকঠোর মূর্তি তখন দেখিয়াও দেখি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই। জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তোমার কৃপা উপেক্ষা করিয়া কতই না বহির্মুখে ধাবিত হইয়াছি। তখন তোমার সেই শূলাঘাতগুলি বড়ই যন্ত্রনাদায়ক ছিল। আজ কিন্তু তোমার এই শূলাঘাত একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছি। আর বলিবার কিছু নাই মা ; শুধু মা, শুধু মা বলিতেই আমাদের কণ্ঠ যেন এমনই করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সে যাহা হউক, এই মমত্ব প্রথমে জড় পদার্থের আশ্রয়ে প্রকাশ পায় ; ক্রমে জড়াশ্রিত চৈতন্যে, পরে বিশুদ্ধ চৈতন্যে পর্যবসিত হয়। এইরূপে মমত্ব যখন বিশুদ্ধ চৈতন্যাভিলাষী হয়, তখনই যথার্থ শক্তি বা প্রেমধর্মের অনুশীলন হইতে থাকে। ক্রমে আত্মপ্রেম যত গভীরতা লাভ করে, ততই মমত্ববোধটি ঢাকিয়া যায়। যখন মাত্র বিশুদ্ধবোধরূপ আত্মসত্তা প্রকাশ পায়, তখনই এই মমতা নিহত হয়। চণ্ডিকার শূলাঘাতে নিশুম্ভের হৃদয়বিদারণের ইহাই সংক্ষিপ্ত রহস্য।

মন্ত্রে আর একটি কথা আছে—নিশুম্ভ নিহত হইলেও তাহার হৃদয়দেশ হইতে মহাবলসম্পন্ন আর একটি পুরুষ নির্গত হইয়াছিল। ঐ পুরুষটি অন্য কেহ নয় মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্য। যে চৈতন্য-সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া মমত্বরূপ একটা বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়, সেই বিশিষ্ট চৈতন্যই নিশুম্ভের হৃদয়নিঃসৃত পুরুষ। মমত্বরূপ বিশিষ্টভাবটি বিনষ্ট হইলেও তদধিষ্ঠিত চৈতন্যের বিলয় হয় না। বিশেষতঃ সে নির্গত হইয়াই দেবীকে 'তিষ্ঠ' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে থাকে। অভিপ্রায় এই যে—আমি যতক্ষণ রহিয়াছি, ততক্ষণ হে দেবী, তুমি যত নিশুম্ভই নিহত কর না কেন, আমি ইচ্ছা করিলে আবার এইরূপ সহস্র নিশুম্ভ সৃষ্টি করিতে পারি। সাধক ! বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে কতক্ষণ।

———০———

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥৩৪॥

অনুবাদ। তখন দেবী অট্টহাস্য করিয়া খড়্গদ্বারা এই হৃদয়নিষ্ক্রান্ত পুরুষের শিরশ্ছেদ করিলেন। সে ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। চণ্ডিকার খড়্গাঘাতে— অদ্বয়জ্ঞানালোক-সম্পাতে, মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্যের শিরশ্ছেদ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইল। 'আমি মমতাময়' এইরূপ অভিমান নাশের নামই নিশুম্ভের হৃদয়নিঃসৃত পুরুষের শিরশ্ছেদ। শুম্ভের যে নিশুম্ভবিষয়ক অভিমান, তাহা ঠিক এইরূপেই বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ শুম্ভ যে মনে ভাবে —'আমার নিশুম্ভ নামক ভ্রাতা আছে', সেই ভাবটি দূরীভূত হইল। আরে, মমতাও ত' অস্মিতারই এক প্রকার বিশিষ্ট ভাবমাত্র ! মায়ের স্বরূপপ্রকাশ বা অদ্বয়জ্ঞানের উদয়রূপ শাণিত খড়্গের আঘাতে এই বিশিষ্টতাও বিদূরিত হয়, মমতা চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইবার শুম্ভ সম্যক্‌রূপেই নিঃসহায় হইয়া পড়িল। সাধক, পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি—সম্পূর্ণরূপে একাকী হইতে না পারিলে, সেই পরম 'এক'কে ধরিতে পারা যায় না। দেখ, আজ এতদিন পরে শুম্ভ যথার্থই একাকী হইতে পারিয়াছে ; সুতরাং এইবার অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হইতে আর বিলম্ব হইবে না। মমতাই যাবতীয় ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ নিরানন্দের মূল। এইবার সে মূল বিনষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং আনন্দময়স্বরূপে উপনীত হওয়া একান্তই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয় সাধক, —এইবার উল্লাসে গাও দেখি—'আনন্দে জগৎ ভরা, আনন্দময় হেরি ধরা, তাই মা দিয়াছে ধরা, কি আনন্দ দেয় গো ঢেলে। মা আমার আনন্দময়ী, আমি মায়ের আহ্লাদে ছেলে, আনন্দময় হেরি ভুবন নিরানন্দ দূরে ফেলে।'

———০———

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্র দ্রংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তদা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৩৫॥

অনুবাদ। অনন্তর সিংহ নিশুম্ভের সৈন্যগুলিকে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাদ্বারা গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন শিবদূতীও সেইরূপ অপর অসুরগুলিকে ভক্ষণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর উত্তম বাহন জীবরূপী সিংহ মমতার

অনুচরগুলিকে চর্বণ করিতে লাগিল। দেবী শিবদূতীও অন্যান্য অসুরভাবসমূহকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। মমতা বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তদাশ্রিত যাবতীয় সংস্কার যে এইরূপে অনায়াসেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্বে বলিয়াছি—ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারসমূহই শুম্ভনিশুম্ভের সৈন্যদল। ঈশ্বরত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা—বিরাট ঐশ্বর্যভোগের বাসনা এতদিন মমতার অন্তর্নিহিত ছিল, এইবার বিশুদ্ধ অদ্বয়তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ায়, বিশিষ্টভাবে ঈশ্বরত্বভোগের স্পৃহাও সম্যক্ বিলুপ্ত হইল। এই ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য সাধক স্বয়ং এবং শিবদূতী ও ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, সকলেই একসঙ্গে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই অসুরসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তীমন্ত্রে অষ্টশক্তির অসুরনিধন বর্ণিত হইয়াছে।

———○———

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥৩৬॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥৩৭॥
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ॥৩৮॥

অনুবাদ। কতকগুলি মহাসুর কৌমারী দেবীর শক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ হইল। অপর কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলের দ্বারা নিরাকৃত হইল। এইরূপ কতকগুলি মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে কতকগুলি বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। আবার বৈষ্ণবীশক্তি চক্রাস্ত্র প্রয়োগে দানবগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী শক্তিও স্বহস্তে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া অপর অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। মমতা নিপতিত ; তদাশ্রিত অসুরকুল মাতৃগণ কর্তৃক বিমর্দিত। যদিও মন্ত্রে কৌমারী ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী বারাহী বৈষ্ণবী ও ইন্দ্রাণী, এই ছয়টি শক্তির উল্লেখ আছে, তথাপি উপলক্ষণবশতঃ এস্থলে অষ্টশক্তিই বুঝিতে হইবে। ইঁহারাই ইতিপূর্বে রক্তবীজবধের সময়ে ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশরূপী অষ্টবিধ অসুরকুলকে নিহত করিয়াছেন ; আবার এখানেও ঈশ্বরত্বের যে অষ্ট ঐশ্বর্য, অর্থাৎ অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ শ্রেষ্ঠ বিভূতি লাভের বাসনারূপ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপী অসুরসমূহ, তাহাদিগকেও বিলয় করিলেন। যথার্থ আত্মজ্ঞানের পক্ষে ঈশ্বরাভিমানও প্রবল অন্তরায়। ঈশ্বরত্বের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে মমতারূপী নিশুম্ভ নিহত হয় না। অনেক সাধক এইখানে আসিয়া অষ্ট ঐশ্বর্যের প্রলোভনে—ঈশ্বরত্বের আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানকে সুষুপ্তিবৎ একটা মূঢ় অবস্থা মনে করিয়া উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বহু সুকৃতির বলে, শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপায়, মায়ের অতুলনীয় স্নেহে সাধক এই ঐশ্বর্য-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। যতক্ষণ মমতা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। মায়ের বিশিষ্ট কৃপা না হইলে, মা ঐরূপ অষ্টশক্তি মূর্তিতে প্রকটিত না হইলে, সাধকের অষ্ট ঐশ্বর্যের প্রতি প্রলোভন কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। জীবভাবের প্রতি বৈরাগ্য একান্ত দুর্লভ নহে, কারণ উহা অনাদিজন্ম হইতে ভোগ করা হইতেছে। যাহা বহুদিন যাবৎ উপভোগ করা যায়, তাহার প্রতি স্বতঃই একটা বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরত্ব অতি দুর্লভ। সমষ্টি-বুদ্ধিতে বা মহত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইতে না পারিলে ঈশ্বরত্বের স্বরূপও উপলব্ধি হয় না। সাধক যখন তীব্র আগ্রহে কেবল পরমাত্মসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হয়, তখন পথিমধ্যে এই অপূর্ব ঈশ্বরত্বভোগের সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন সাধক জগতে খুব কমই আছেন, যাঁহারা এই ঈশ্বরত্বকেও তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। একমাত্র মহাশক্তিরূপিণী মা যাঁহাদের হৃদয়ে অমিতবল এবং পরবৈরাগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই দুর্দমনীয় প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। সাধনসমরের সাধকগণ প্রথম হইতেই মাতৃ-চরণে শরণাগত সন্তান ; তাহারা জীবত্ব জানে না, ঈশ্বরত্ব জানে না, তাহারা বন্ধন জানে না, মুক্তি জানে না, তাহারা জ্ঞান জানে না, ভক্তি জানে না, জানে শুধু 'মা'। তাহারা সর্বাবস্থায় সর্বতোভাবে মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্ন শিশু। তাই মা আমার বিশিষ্টভাবে প্রকটিত হইয়া—আপনাকে অষ্টশক্তি-মূর্তিতে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের অষ্ট ঐশ্বর্যের প্রতি প্রলোভনকে সম্যক্ দূরীভূত করিয়া দেন ; সুতরাং তাহারা ঈশ্বরত্ব-সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া জগৎতৃণীকৃত

করিয়া মহোল্লাসে পরমানন্দময় পরমাত্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চণ্ডীতত্ত্বে ইহাই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বান্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে নিশুম্ভ-বধঃ।

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর যুদ্ধে নিহত হইল, কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইল, আর অবশিষ্ট অসুরগুলি কালী, শিবদূতী এবং সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল।

ইতি মার্কেণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নিশুম্ভবধ।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ ব্যতীত আর সকল অসুরই বিধ্বস্ত হইল। এই মন্ত্রে অসুরগণের দুর্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—কতকগুলি অসুর নিহত, কতকগুলি পলায়িত এবং অবশিষ্ট কালী, শিবদূতী ও সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিহত, তাহারা আর পুনরাবর্তন করিবে না। তাৎপর্য এই যে কতকগুলি আসুরিক-সংস্কার চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আর বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে পুনরাবর্তন হয় না। অপর কতকগুলি সংস্কার (আহার-বিহারাদি) ব্যুত্থিত অবস্থায় পুনরাবর্তিত হয়; ইহাদিগকেই মন্ত্রে পলায়নকারী সৈন্যদল বলা হইয়াছে। ইতিপূর্বেও স্থানে স্থানে এই রূপ কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না। অত্যন্ত গহন এ তত্ত্ব, অতি দুরধিগম্য এ অদ্বয়ের উপলব্ধি, সুতরাং এ সকল কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনাই আবশ্যক। অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হইলে যাবতীয় সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইলে, জীবভাবীয় কতকগুলি সংস্কার প্রকাশ পায়। যতদিন স্থূল দেহ থাকে, ততদিন উহারা থাকে বটে, কিন্তু কিছুই অনিষ্ট সংঘটন করিতে, অর্থাৎ পুনরায় ভ্রান্তিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। কারণ উহাদের পারমার্থিকত্ববুদ্ধি একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। আর কতকগুলি সংস্কার থাকে, তাহারা (ধর্মপ্রতিষ্ঠা জ্ঞানদান লোকশিক্ষা প্রভৃতি) সর্বতোভাবে মাতৃ-ইঙ্গিতে, মাতৃ-ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, মায়ের বিশিষ্ট প্রেরণা ব্যতীত সে সকলের বিশেষ কোনও কার্যকারিতা প্রকাশ পায় না। এইরূপ সংস্কারগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে শিবদূতীকর্তৃক অসুরভক্ষণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মা শিবদূতী যাহাদিগকে গ্রাস করিলেন—আবশ্যক হইলে অর্থাৎ মহতীশক্তির বিশেষ প্রেরণা হইলে, সে সকল সংস্কারও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টকারিতা থাকে না; যেহেতু, উহা সর্বতোভাবে মহতী ইচ্ছারই অনুবর্তন করে। সুতরাং সাধককেও বিশিষ্টভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না; স্থূলকথা এই যে—একবার অদ্বয়তত্ত্বে সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সাধকের ভেদভ্রান্তি, বন্ধনভয়, মৃত্যুভয় চিরতরে দূরীভূত হইয়া যায়। তারপর যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন সাধক মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে থাকে, এবং প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহ-কৈবল্য-লাভ করে।

এস সাধক, এইবার আমরা মায়ের চরণ স্মরণ করিয়া শুম্ভবধরহস্য অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করি। প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিতে শুম্ভবধ হয় না—যথার্থ অদ্বৈততত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় না। এস আমরা মা বলিয়া কাঁদি। এস, আমরা কেবল মাকে দেখিবার জন্যই আরও আগ্রহান্বিত হই। এস, আমরা ঈশ্বরত্ব-ভোগের স্পৃহা পর্যন্ত সংযম করিয়া অকৈতব প্রেমে আত্মহারা হইতে যত্ন করি। কৃপাময়ী মা নিশ্চয়ই আমাদিগকে স্নেহময় বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সেই নিরঞ্জনক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে!

ইতি সাধন-সমর দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় নিশুম্ভবধ সমাপ্ত।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ

শুম্ভবধ

ঋষিরুবাচ।

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্‌।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্‌ বচঃ ॥১॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥২॥

অনুবাদ। প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত এবং সৈন্যবল বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, শুম্ভ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—হে দুর্গে! তুমি বলগর্বে অতিশয় উদ্ধত হইয়াছ। গর্ব করিও না। যেহেতু তুমি অতিমানিনী (গর্বিতা) হইয়াও অপরের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের প্রাণপ্রতিম সহোদর নিশুম্ভ নিহত হইয়াছে, অস্মিতার একান্ত সহায় মমতা যাবতীয় দ্বৈতসংস্কারসহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইবার অস্মিতা সহায়হীন—একমাত্র; তথাপি হতাশভাব নাই, অবসাদ নাই, আছে উৎসাহ, আছে প্রতিহিংসার প্রতিদানের বা আত্মদানের তীব্র আগ্রহ। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে শুম্ভ ক্রোধভরে দেবীকে বলিল হে বলাবলেপদুষ্টে—হে বলগর্বজনিত-উদ্ধতভাবাপন্নে! হে দুর্গে! তোমার অতিশয় বলগর্ব দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু এরূপ গর্ব করিবার মত তোমার ত' কিছুই নাই! কারণ, অন্যের বলে তুমি বলীয়সী। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃকাশক্তিগণের বলকে আশ্রয় করিয়াই তুমি যুদ্ধ করিতেছ এবং অসুরনিধনের সমর্থ হইতেছ, তোমার নিজের তাহাতে মহত্ত্ব কি আছে, যাহাতে তুমি আপনাকে অতিমানিনী—অতিশয় গর্বিতা বলিয়া মনে করিতে পার?

দেবীর প্রতি প্রযুক্ত শুম্ভের বাক্যগুলি কি সুন্দর! আত্ম—চিতিশক্তি মা আমার যথার্থই অতিগর্বিতা। আর দ্বিতীয় কেহই ত' নাই! আত্মার গর্ব ক্ষুণ্ণ করিবে, এরূপ কিছুই ত' নাই! আত্মাই ত' যথার্থ আমি! যিনি যথার্থ আমি, গর্বই ত' তাঁহার স্বরূপ। মায়ের এরূপ গর্ব কেন, তাহা পরবর্তীমন্ত্রে নিজেই বলিবেন। সাধক! সাধন-সমরের প্রারম্ভে দেবীসূক্তে যে 'আমিকে' অন্বেষণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, নানান্তরের ভিতর দিয়া নানারূপ অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া এতদিনে সেই 'আমির' সমীপে উপস্থিত হইয়াছ! আজ 'আমি' রূপিণী মায়ের অক্ষুণ্ণ প্রভাব, অক্ষুণ্ণ গৌরব দেখিতে পাইতেছ; ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হও।

এক—প্রতিবিম্ব আমি, এবং অন্য—বিম্ব আমি। এক অস্মিতা, অন্য আত্মা বা চিতিশক্তি। এক চিদাভাস, অন্য স্বয়ং চিৎ। এতদিনের পর এই উভয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। ওগো প্রিয়তম সাধক! কত যুগ যুগান্তর কত জন্ম জন্মান্তর অক্লান্ত সাধনার ফলে—না না, মায়ের—গুরুর—আমার প্রবল স্নেহের আকর্ষণে আজ তুমি অম্বিকার মায়ের আত্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ! অহো ধন্য তুমি! ধন্য তোমার পুত্রত্ব! কিন্তু সে অন্যকথা—

শুন—অস্মিতার স্বভাব এই যে, সে আপনাকেই মহান্‌রূপে ঈশ্বররূপে দেখিতে চায়। পক্ষান্তরে আত্মাকে অনণু অস্থূল অহ্রস্ব অদীর্ঘ ইত্যাদি সর্ববিশেষ বিবর্জিত কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় সে আপনভাবে বিচার করিতে থাকে—সর্বভাবাতীত বাক্যমনের অগোচর বস্তুকে জড় বলিলেই বা ক্ষতি কি আছে? তাহার আবার গর্ব করিবার কি থাকিতে পারে? কিন্তু আত্মাকে একেবারে জড় পদার্থই বা কিরূপে বলা যায়? যাবতীয় শক্তি যে তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা ত' প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শক্তিগুলি যদি না থাকে—অর্থাৎ কোনরূপ শক্তির প্রকাশ না থাকে, তবে আত্মা খুব সম্ভব জড়বৎ হইয়া পড়িবে, তখন হয় ত' উহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ বিচার করিয়াই শুম্ভ দেবীকে অন্যের বলে বলীয়সী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছিল। অভিপ্রায় এই যে—অসুরনাশিনী বিভিন্ন শক্তির আশ্রয় না হইলে, চিতিশক্তি সম্ভবতঃ পরিগ্রহযোগ্যা হইতে পারে।

শুম্ভ দেবীকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাতে শুম্ভের আর একটি গূঢ় অভিপ্রায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। তত্ত্ব প্রকাশিকা সে অভিপ্রায়টির উদ্‌ভেদ করিয়াছেন। প্রথমে মন্ত্রটির অন্বয় করা যাউক। 'হে বলাবলে, হে অপদুষ্টে, হে

দুর্গে ত্বং মা, সুতরাং গর্বং আবহ। যা ত্বং অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে, অতএব অতিমানিনী'। এইবার শব্দগুলির অর্থ করা যাউক— বলবান অবলয়তি যা সা বলাবলা, তস্যাঃ সম্বোধনে বলাবলে। যিনি বলবানকেও অবল অর্থাৎ হীনবল করিতে সমর্থা, তিনিই বলাবলা; তাঁহার সম্বোধনে 'বলাবলে' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। যে মা আমার অতি প্রবল অহঙ্কারাদি ভাবনিচয়কে সম্যক্ ক্ষীণবল করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ বলাবলা। এবং যাবতীয় দুষ্টভাব— ভেদভাব যাঁহার নিকট হইতে সম্যক্ অপগত হয়, তিনিই অপদুষ্টা; তাঁহার সম্বোধনে 'অপদুষ্টে' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। আর দুর্গা শব্দের অর্থ দুর্গতিহরা অথবা দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা তাঁহার সম্বোধনে দুর্গে; ত্বং মা—তুমিই মা; যেহেতু সর্বভাবের ধারণ এবং পোষণ তুমিই করিয়া থাক, মাতৃত্ব-ধর্ম-পূর্ণভাবে একমাত্র তোমাতেই সম্যক্ প্রকটিত; সুতরাং ত্বং গর্বং আবহ —তুমিই যথার্থ গর্ব করিতে পার। তোমার প্রকাশেই সর্বভাব প্রকাশিত! তোমার সত্তাদ্বারাই সর্বভাব সত্তাময়, তোমার চৈতন্যদ্বারাই সর্বভাব সঞ্জীবিত; সুতরাং গর্ব করিবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে।

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে— তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ কর, তুমি স্বয়ং সর্ববিকার-বিবর্জিত, তুমি নির্গুণ নিস্ফল; তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইলেই পরবল আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির আশ্রয় লইতে হয়। গীতায় ভগবানও এই পরবলকেই **'আত্মমায়া'** বা স্বকীয়া প্রকৃতি বলিয়াছেন—যথা **'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'**। নির্গুণ নিরঞ্জন আত্মাকে যুদ্ধ করিতে হইলে, অর্থাৎ দ্বৈত-প্রতীতির মধ্যে আসিতে হইলে প্রকৃতির বা স্বকীয় শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। আমাদের যেমন কোনও বস্তুর রূপ গ্রহণ করিতে হইলে দৃক্‌শক্তির আশ্রয় লইতে হয়, শব্দ শ্রবণ করিতে হইলে শ্রবণ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ঠিক তেমনই নিরঞ্জন আত্মাকে ভাবরঞ্জনাময় অবস্থায় আসিতে হইলেই শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। এই শক্তিসমূহ আত্মার আশ্রয়েই প্রকাশ পায় এবং আত্মা হইতেই সমুদ্‌ভূত হয়। এ কথা ইতিপূর্বে দেবীর শরীর হইতে চণ্ডিকা প্রভৃতি শক্তির নিষ্ক্রমণ-প্রস্তাবে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে। যে মা আমার সর্বশক্তির সম্ভবস্বরূপা, যে মা আমার সর্বশক্তির একান্ত আশ্রয়স্বরূপা, তিনি অতিমানিনী কেন না হইবেন? মান্ ধাতুর অর্থ পূজা। মা আমার অতিশয় পূজ্যা অতিশয় গৌরবিতা। মা ব্যতীত আর কাহারও গর্ব করিবার অধিকার নাই। আরে, গর্ব ত' 'আমিকে' নিয়া! আমি যখন একমাত্র মা, আর কেহ যখন আমি নয়, আমি বলিবার অধিকার যখন আর কাহারও নাই, তখন যিনি আমি, তিনিই ত' গৌরবিণী —তিনিই ত' অতিমানিনী।

বুঝিতে পারিলে পাঠক, যাঁহারা মাকে পান, যাহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ হন, তাঁহাদের অহঙ্কার থাকে না কেন? যিনি যথার্থ অহংরূপিণী তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই মিথ্যা অহংটি— প্রতিবিম্ব অহংটি চিরদিনের তরে অস্তমিত হয়। তাই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ সর্বতোভাবে অহঙ্কারশূন্য হইয়া থাকেন। মনে রাখিও—মাকে অহংকে না দেখিলে কিছুতেই অহঙ্কার দূরীভূত হয় না। অহংকার দূর করিবার জন্য আপনাকে দীন হীন পতিত বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও না; ঐরূপ ভাবের ভিতরেও অহঙ্কার থাকে। যথার্থ অহংকে দেখ— মিথ্যা অভিমান আপনি পলায়ন করিবে।

দেব্যুবাচ

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥৩॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন— এ জগতে একমাত্র আমিই ত' আছি, আমা হইতে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে? ওরে দুষ্ট! দেখ্ আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

ব্যাখ্যা। এতদিনে মা আমার নিজের স্বরূপ নিজমুখে পরিব্যক্ত করিলেন। যত শাস্ত্রগ্রন্থই আলোচনা করা যাউক, যত কঠোরসাধনাই করা যাউক, মা স্বয়ং যতদিন স্বকীয় পরিচয় প্রদান না করেন, ততদিন কাহারও সাধ্য নাই যে, মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। মাকে পাইতে হইলে—মায়ের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, মাকে বরণ করিতে হয়, মাতৃ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। কন্যা যেমন বরকে বরণ করে—সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ

করে, ঠিক তেমনভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তবে মা আমার স্বকীয় স্বরূপটি উদ্ভাসিত করেন । এই কথাটি নানাভাবে নানাস্থানে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে । যাঁহারা প্রাণপণপ্রযত্নে উহার অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁদের নিকটই মায়ের আত্মপরিচয় প্রদানের সার্থকতা । সে যাহা হউক, মা বলিলেন—অত্র জগতি এই জগতে, একৈবাহং — একমাত্র আমিই (আছি) । দ্বিতীয়া কা মমাপরা— আমা হইতে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে ?

'অত্র জগতি' এই অধিকরণবোধক পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেক ব্যাখ্যাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন, আমরা সে সকল সূক্ষ্ম বিচার কোলাহলের মধ্যে যাইব না। সহজ কথায় যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব । 'এই জগৎ' রূপে যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সে সকলই একমাত্র আমি — মা । যতক্ষণ জগৎ প্রতীতি আছে, ততক্ষণ জগৎকে পৃথক্ কিছু না বুঝিয়া আমিরূপেই বুঝিয়া লইব । বাস্তবিক আমির সত্তা ব্যতীত জগতের পৃথক্ সত্তা নাই । এই জগৎ আমিরই স্থূল রূপ । সাধক ! জগৎ বলিতে মন বুদ্ধি প্রভৃতিকেও বুঝিয়া লইও।

'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' এই বাক্যটির দ্বারা সর্ববিধ দ্বৈতের প্রতিষেধ করা হইয়াছে । শ্রুতির **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** বাক্যটি যেরূপ সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত এক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতিপাদক, মায়ের এই **'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'** বাক্যটিও ঠিক সেইরূপ ; তবে একটু বিশেষত্ব আছে । পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ পর্যালোচনা করিয়া সর্বভেদবিবর্জিত একটি বস্তুর সত্তামাত্র বুঝিতে পারা যায়, সে বস্তুটির স্বরূপ যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার জন্য আবার—**'অস্থূলমনণু'** প্রভৃতি, এবং **'সত্যং জ্ঞানমানন্দং'** প্রভৃতি পরোক্ষ বাক্যের, এবং **অহং ব্রহ্মাস্মি, তৎ ত্বমসি'** প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বাক্যের সাহায্য লইতে হয় । কিন্তু দেবীর আত্মপরিচয় প্রদান-বাক্যে **'একা এব অহং'** এইরূপ প্রত্যক্ষতা বোধক শব্দের উল্লেখ থাকায় সত্তা এবং স্বরূপ, উভয়ই যুগপৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে । মাকে কেবল বাক্যমনের অগোচর বলিয়া ছাড়িয়া দিলে ত' নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারা যায় না । সন্তান যে মাকে দেখিতে চায়, বুঝিতে চায়, ধরিতে চায় ! সুতরাং **'অস্থূল অনণু অহ্রস্ব'** বলিলে ত' সন্তানের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না । তাই মা আমার অহং বলিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ আত্মস্বরূপটি প্রকাশ করিলেন । অতি দুরাচার ব্যক্তিও ইহাকে জানে এবং অনুভব করে । মা কখনও কাহারও নিকট আত্মগোপন করেন না । তিনি সকলেরই প্রত্যক্ষ । গীতায় দুরাচার ব্যক্তিরও ভগবদ্-ভজনের যোগ্যতা বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু সে অন্য কথা—

সাধক ! দেবী-সূক্তের প্রারম্ভে 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যে অহং-এর সূচনা করা হইয়াছিল, নানাভাবের ভিতর দিয়া—সত্য প্রাণ এবং আনন্দ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া, সেই একই আমির নানরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলিয়াছে । কিন্তু সেই অহং -এর যথার্থ স্বরূপ যে কি, তাহা এতদিন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই, তাই মা আমার স্বয়ং কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান দূর করিয়া দিতেছেন, নিজের স্বরূপ নিজেই প্রকটিত করিতেছেন । শ্রুতি যাহাকে **'একম্ এব'** বলিয়াছেন মা তাহাকে **'একা এব'** বলিলেন । অদ্বিতীয়ং অহং বস্তুটি যে শক্তি-স্বরূপ তাহা 'একা' এই স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ দ্বার স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে **'অত্র জগতি'** পদের দ্বারা তাঁহার শক্তিস্বরূপতাই বিশেষভাবে সমর্থিত হইল । ইহা শুধু আমাদের কথা নহে ; শ্রুতি এবং দর্শনশাস্ত্রও ইঁহাকে চিতিশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক বিচার করা হইয়াছে । এস সাধক ; এবার আমরা বিচারের দিকে না গিয়া মাতৃ-বাক্য শিরোধার্য করিয়া লই। যতক্ষণ আমরা **'অত্র জগতি'** এই জগতে আছি, অর্থাৎ যতক্ষণ জগৎ বলিয়া একটা জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ মাকে শক্তিরূপিণী বলিয়াই বুঝিয়া লই । এই শক্তি বহু নহে, একা অদ্বিতীয়া । এই জগতের যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই দেখ—মা আমার একা অদ্বিতীয়া প্রত্যেক জীবেই তিনি **'অহং'** রূপে নিত্য প্রকাশিত । ঐ অহংটি অদ্বিতীয় । উহার দ্বিতীয় কেহ নাই । কেবল জীব কেন—প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক বালুকাকণার দিকে তাকাও, দেখ সকলেই এক অদ্বিতীয় । স্থূলে আসিয়া ভেদজ্ঞানের মধ্যে আসিয়াও মায়ের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব কিঞ্চিণ্মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই । জড়ক্ষেত্র ছাড়িয়া চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সেখানে ত' ভেদের

লেশমাত্র অনুভূত হয় না ; তাই, কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে কি কারণে, সর্বত্রই মা আমার একা অদ্বিতীয়া **'অহং'** স্বরূপে নিত্য বিরাজিতা। ইহাই মায়ের স্বরূপ।

'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' এই অংশটির আর একপ্রকার অর্থও হইতে পারে। **'মমাপরা দ্বিতীয়া কা'**। আমা হইতে অপর দ্বিতীয় যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা **'কা'** তুচ্ছা পরিহার্যা অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর। অহংব্যতীত যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা সর্বতোভাবে পরিহারযোগ্য। যেহেতু উহা কোন বস্তু নয় ; উহা অহং-এর ব্যবহার মাত্র। অহংই একমাত্র বস্তু। আর যাহা কিছু অহং-এর সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা বস্তু নহে— ব্যবহার। ব্যবহার কখনও বস্তু হয় না, হইতে পারে না। তোমার আহার-বিহারাদি ব্যাপরগুলি যেরূপ কোন বস্তু নহে, তোমারই একপ্রকার ব্যবহার মাত্র ; ঠিক সেইরূপ পরিদৃশ্যমান এই জীব জগৎ অহং-এর—আত্মার—মায়ের আমার ব্যবহার মাত্র। তাই বেদান্তবাদিগণ জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, ব্যবহারিক সত্তামাত্র বলিয়া থাকেন। সত্যই এ জগতের কোন বাস্তবিক সত্তা নাই।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা দেবী-বাক্যের অপরার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। দেবী বলিলেন—**'পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ'** ও দুষ্ট ! পশ্য, মদ্‌বিভূতয়ঃ ময়ি এব বিশন্তি। বিশন্তি এইটি ক্রিয়াপদ এবং 'ও' এইটি সম্বোধনসূচক অব্যয়। 'ওরে দুষ্ট ! দেখ—আমার বিভূতিসকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে'। অস্মিতা প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া বিম্বের ধর্ম আত্মসাৎ করিতে চায়—অহং না হইয়াও অহংরূপে পরিচিত হইতে চায়, ইহাই তাহার দুষ্টভাব ; তাই মা তাহাকে, ও দুষ্ট বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

মদ্‌বিভূতি—আমার বিভূতি আত্মবিভূতি। যত কিছু বহুত্ব, যত রকম শক্তি, সে সকলই আত্মবিভূতি। বিভূতি কখনও আশ্রয়ের সত্তা ব্যতীত পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু হয় না। যেমন কোন বাগ্মী পুরুষের বক্তৃতাশক্তি উক্ত পুরুষের সত্তা ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন বস্তু নহে, উহা ঐ পুরুষের এক প্রকার বিভূতি বা ব্যবহারমাত্র ; ঠিক সেইরূপ এই জগৎ, অনন্ত শক্তি, আত্মার বিভূতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাঁহারই এক প্রকার ব্যবহারমাত্র ; একা অদ্বিতীয়া অম্বিকা মা আমার যখন বিভূতিময়ী হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তাঁহাতে বহুত্ব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তিনি —**একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা**।

দেবীর এই বাক্যটিদ্বারা শুম্ভকে ইহাও বলা হইল যে 'আমিই ত' একমাত্র 'আমি', আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহ ত 'আমি' নাই ! অতএব হে শুম্ভ ! তুমি আবার একটা পৃথক্ আমি কিরূপে হইলে ?'

যাহা হউক, শুম্ভ যখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গের বিকাশ দেখিয়া অম্বিকার বহুত্বে সংশয়াপন্ন হইয়াছে, তখন মা আমার কৃপাপূর্বক স্বকীয় বিভূতিসমূহ সংহরণ করিয়া শুম্ভকে বলিলেন—দেখ, আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিল।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥৪॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই ব্রহ্মাণী প্রমুখ শক্তিসমূহ দেবীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন অম্বিকা একাই রহিলেন।

ব্যাখ্যা। মায়ের ইচ্ছামাত্র অষ্টশক্তিরূপ বিভূতিসমূহ দেবীর শরীরে লীন হইল। চিতিশক্তি হইতে প্রসৃত নানাশক্তি স্বকীয় কারণে অর্থাৎ চৈতন্যেই বিলীন হইয়া গেল। ব্যবহার নিবৃত্ত হইল। এইবার মা আমার একা অদ্বিতীয়া সর্বভেদরহিতা, পূর্ণা আনন্দস্বরূপা স্বচ্ছা। এখনও কিন্তু শুম্ভ আছে, দেবী-বাক্য আছে ! পাঠক ! ইহাতে দ্বৈতভাবের আশঙ্কা করিও না। মাকে ভাষার মধ্যে নিয়া আসিলে, বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেই, তিনি দ্বৈত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক কিন্তু দ্বৈত বলিয়া কিছু নাই। কিরূপে এক অখণ্ড আনন্দস্বরূপ বস্তু স্বকীয় একত্ব সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুরূপে— বিশ্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তাহা ইতিপূর্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আধুনিক মায়াবাদিগণের সহিত এইখানে আমরা একমত হইতে পারি না, তাঁহারা এই মদ্‌বিভূতি অর্থাৎ আত্মবিভূতিস্বরূপ এই বহুত্বকে 'ভ্রান্তি' বা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন, আর আমরা উহাকে আত্মবিলাস আত্মমহত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকি। যতক্ষণ দ্বৈত-প্রতীতি

আছে, ততক্ষণ সহস্রবার ভ্রান্তি বলিলেও উহা উড়িয়া যায় না ; আবার যখন অদ্বয়স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হয় তখন মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিবার মত কিছুই থাকে না । সুতরাং যতক্ষণ সাধনা বলিয়া, উপলব্ধি বলিয়া, মহাবাক্যার্থ-বিচার বলিয়া কিছু থাকে, যতক্ষণ বুঝিবার বা বুঝাইবার কিছু থাকে, ততক্ষণ ইহাকে ভ্রান্তি না বলিয়া লীলাবিলাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সর্বসামঞ্জস্য হয় । উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্রও এই বহুত্বকে লীলাকৈবল্যরূপেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহারা কিন্তু মিথ্যা কিংবা ভ্রান্তি, এরূপ শব্দ কখনও প্রয়োগ করেন নাই । নির্গুণ বস্তুতে লীলাবিলাস কিরূপে থাকে, এরূপ আশঙ্কা ঋষিদের প্রাণে কখনই জাগিত না । তাঁহাতে যে কি নাই, এবং কি থাকিতে পারে না, তাহা কে বলিবে ?

সাধক ! তোমরা দেবী-মাহাত্ম্যের অপূর্ব এই বাণী স্মরণ রাখিও—সাধনার পথ সুগম হইবে । এই জগৎকে, এই বহুত্বকে 'মদ বিভূতি' বলিয়া জানিও । আমারই ইচ্ছা বহুরূপে অভিব্যক্ত ; তাই আমি বহুত্বদর্শী । আবার যখন আমি একত্বাভিলাষী হইব, তখন আর বহু বলিয়া কিছু থাকিবে না । সকল ভেদ আমাতেই বিলীন হইয়া যাইবে । ইহাই সত্য জ্ঞান ।

———o———

দেব্যুবাচ ।

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা ।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥৫॥

অনুবাদ । দেবী বলিলেন—আমি বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া যে বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা সংহরণ করিলাম। এখন আমি একাই অবস্থিত । (হে শুম্ভ ! তুমি) এই যুদ্ধে স্থির হও ।

ব্যাখ্যা । দেবী যখন একা অদ্বিতীয়া, তখনও কিন্তু তাঁহার বাক্য অসম্ভব নয়, সে বাক্য যে কিরূপ তাহা তত্ত্বদর্শিগণ বুঝিতে পারিবেন । যদিও মা আমার 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ' যদিও মা আমার 'মহতঃ পরং ধ্রুবম্' তথাপি তাঁহার বাক্য প্রয়োগ এবং শুম্ভের সহিত সমর একান্ত অসম্ভব নহে । আরে, যখন অতি স্বচ্ছ মহৎতত্ত্বে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকার দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন তাঁহা হইতে যে প্রজ্ঞার আলোক আসিয়া মহত্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চিদাভাসে নিপতিত হইতে থাকে, তাহাই ত' মাতৃ-বাক্য বা মাতৃ-সমরাভিনয় । সাধক, এক একবার প্রজ্ঞালোকসম্পাতে অনেক ধাঁধা সরিয়া যায়, অনেক অসুর নিপাতিত হয়, অনেক অভূত-পূর্ব তথ্য অবিষ্কৃত হয় ।

সে যাহা হউক, দেবী শুম্ভকে বলিলেন—আমি বিভূতি বিস্তারপূর্বক যে বহুরূপে বিরাজ করিতেছিলাম, এইবার তাহার সংহরণ করিলাম । দেখ এখন আমি একা ; কিন্তু সাবধান, তুমি এই যুদ্ধে স্থির হও । মায়ের এ বাক্যের তাৎপর্য অতি স্ফুট । মা বলিলেন—সন্তান, তুমি আমার বহুত্ব-দর্শন প্রয়াসী ছিলে ; তাই আমি তোমারই ইচ্ছায় বিভূতিময়ী হইয়া বহুরূপে বিরাজ করিতেছিলাম । এতদিন তুমি আমাকে চাহ নাই, আমার বিভূতি চাহিয়াছিলে, তোমার কল্পিত আমিটিকে ভালরূপ সাজাইতে চাহিয়াছিলে ; তাই আমি '**বহুভিরূপৈঃ আস্থিতা**' ছিলাম, তোমারই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে বহুত্ব-বিভূতি বিস্তার করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু আজ এত দিনের পর তোমরা সকল সাধ মিটিয়াছে, বহুত্ব-সম্ভোগের বাসনা বিদূরিত হইয়াছে, আজ তুমি ঈশ্বরত্ব পর্যন্ত তৃণীকৃত করিয়া, শুধু আমাকেই চাহিতেছ । এখন আর তুমি আমার বিভূতি চাও না, শুধু আমাকেই চাও । এত ভালবাসা, এত প্রেম তোমার প্রাণে ! ধন্য তুমি, কেবল আমার জন্য আমাকে চাহিতে পারিয়াছ ! এস—দেখ, এই আমি এক অদ্বিতীয়াস্বরূপে প্রকটিত হইলাম, আমার বহুত্ব সংহৃত হইল । কিন্তু তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর দেখি ?

মায়ের এই 'স্থির হও' কথাটির মধ্যে একটু রহস্য আছে । এখানে আসিয়া—এই একত্বের সমীপস্থ হইয়া স্থির থাকা বড় দুরূহ ব্যাপার । সকল প্রকার বিশিষ্টতা এখানে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে । যদিও সর্বত্র—বহুত্ব বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি অস্মিতারূপ যে বিশিষ্টতাটুকু রহিয়াছে, তাহা ত' এখনও বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই । আত্মার সন্নিহিত হইলে, সে বিশিষ্টতাটুকুও বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং এখানে স্থির থাকা সহজসাধ্য নয় বলিয়াই মা আদর করিয়া বলিলেন —'স্থিরোভব' । অস্মিতা যতক্ষণ স্থির থাকিতে পারিবে, স্বকীয় বিশিষ্টতাটুকু যতক্ষণ বজায় রাখিতে পারিবে, ততক্ষণই মায়ের আনন্দ-বিলাস এই সাধন-সমরের অভিনয় চলিবে ; সুতরাং শুম্ভের এখন স্থির হওয়াই একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু সে আর কতক্ষণ !

———■———

ঋষিরুবাচ ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥৬॥
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ ।
তয়োর্যুদ্ধমভূত্তুয়ঃ সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥৭॥

অনুবাদ । অনন্তর দেবাসুরগণের সম্মুখে দেবী এবং শুম্ভ, এই উভয়ের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । পুনঃ পুনঃ দারুণ শরবর্ষণ এবং শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগরূপ সর্বলোক-ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল ।

ব্যাখ্যা । দেবী এবং শুম্ভের যুদ্ধ সর্বলোকভয়ঙ্করই বটে ! একদিকে অস্মিতা স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী, অন্যদিকে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সে বিশিষ্টতাকে বিলয় করিতে উদ্যত । এক প্রতিবিম্ব, অপর বিম্ব, এই উভয়ের যুদ্ধ দারুণই হইয়া থাকে । প্রতিবিম্ব যতদিন নিজেকে প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝিতে না পারে, ততদিনই বিম্বের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বয়ং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা করে । সুতরাং এ দারুণ যুদ্ধ অনিবার্য ।

দেবী এবং শুম্ভের যুদ্ধ সর্বলোকভয়ঙ্কর । সর্বরূপে যাহা কিছু আলোকিত বা প্রকাশিত হয়, তাহাই সর্বলোক । যথার্থই এই যুদ্ধ সর্বলোকের পক্ষে ভীষণ হইয়া থাকে ; কারণ অস্মিতার সত্তায়ই সর্বলোকের সত্তা । অস্মিতা না থাকিলে সর্ব বলিয়া কিছু থাকে না । যদিও ইতিপূর্বে যাবতীয় অসুরভাবের নিধন বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে —যদি অস্মিতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে আবার সেই বিনষ্ট অসুরভাবগুলির পুনরায় আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হইবে না ; উহারা যে অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । এ পর্যন্ত অসুরভাবসমূহের নিধনে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহাদের বিশিষ্ট কোন সত্তা নাই । বিভিন্ন স্ফুরণগুলি বিনষ্ট হইয়া অখণ্ড অস্মিতারূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অস্মিতা থাকিলে, আবার স্ফুরণ উঠিবার একান্ত সম্ভাবনা আছে । পাতঞ্জল দর্শন ঠিক এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—'যাহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তাহাদের পুনরায় আবির্ভাব হয়।' প্রকৃতি পর্যন্তের বিলয় করিতে না পারিলে যথার্থ আত্মস্বরূপ প্রকটিত হয় না, জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না । অস্মিতা-বিলয় এবং প্রকৃতি-লয় একই কথা । মহত্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্মতম বীজাবস্থাই সাঙ্খ্যদর্শন কথিত প্রকৃতি । সর্বভাব সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতেই অবস্থান করে । আমরা এখানে অস্মিতার যে স্বরূপটি দেখিতে পাইতেছি, উহাকে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি বলিলেও কিছুই ক্ষতি হয় না । সাঙ্খ্যের ভাষায় শুম্ভের সহিত দেবীর এই যুদ্ধকে পুরুষের সম্মুখভাগ হইতে প্রকৃতির পলায়নোদ্যম বলা যায় । বেদান্তের ভাষায় ইহাকে মায়ার অধ্যাসনিবৃত্তি বলা যায় । ভক্তের ভাষায় ইহাকে ভক্ত এবং ভগবানের একান্ত মিলন বলা যায় । যাহাই হউক ইহা যে অতি দারুণ এবং সর্বলোকের পক্ষে একান্তই ভয়ঙ্কর এ কথা খুবই সত্য ।

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা ।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎ প্রতীঘাতকর্তৃভিঃ ॥৮॥
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী ।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥৯॥

অনুবাদ । অতঃপর অম্বিকা যে শত শত দিব্য অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ প্রতিঘাতকারী স্বকীয় অস্ত্রপ্রয়োগে তাহা ভগ্ন করিয়া দিল । আবার অসুরাধিপতি যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরমেশ্বরী সেই সকল অস্ত্রকে প্রচণ্ড হুঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা অনায়াসে ভগ্ন করিলেন ।

ব্যাখ্যা । অম্বিকার অস্ত্রসকল দিব্য স্বপ্রকাশ । আত্মসত্তা যতই প্রকাশিত হইতে থাকে, অস্মিতা নিজের সত্তাবিলয়ের আশঙ্কায় ততই অস্থির হইয়া পড়ে ; এইরূপ অবস্থায় সে নানা উপায়ে নানাভাবে স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পায়, অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশত্বকে নানা উপায়ে আবৃত রাখিতে চেষ্টা করে ; সুতরাং দেবীর অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায় । আরে, জীব কি সহসা ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিতে চায় ! সে প্রাণপণে নিজের বিশিষ্টতা নিজের ভেদপ্রতীতি রক্ষা করিতে চায় । অস্মিতা যখন আত্মস্বরূপের দিকে লক্ষ্য করে, তখন ক্ষণকালের জন্য আত্মার স্বয়ংপ্রকাশভাব প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের বিশিষ্ট অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে । আবার যখন নিজের বিশিষ্ট সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে, তখন আত্মার ঐ স্বপ্রকাশভাবটি যেন অভিভূত হইয়া পড়ে । ইহাই দেবী ও শুম্ভের যুদ্ধ রহস্য । পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্রেও ইহা নানাভাবে বিভিন্ন অস্ত্র-প্রয়োগরূপে বর্ণিত হইবে ; সুতরাং এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিলে, পাঠকগণের পক্ষে দেবী ও শুম্ভের সমররহস্য বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হইবে না ।

মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবী হুঙ্কার-উচ্চারণে শুম্ভ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল ব্যর্থ করিয়াছিলেন। হুঙ্কার—প্রলয়াত্মক বীজ। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। যদিও এই পরমাত্মক্ষেত্রে প্রলয়শক্তির কোনরূপ বিশিষ্ট বিকাশ নাই, তথাপি উহা স্বভাবতঃই ভেদজ্ঞানের পক্ষে প্রলয়াত্মক ; কারণ, স্বপ্রকাশ আত্মসত্তা উদ্ভাসিত হইলে, অস্মিতার প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। তাই, মন্ত্রে প্রলয়সূচক হুঙ্কারাদি উচ্চারণে দেবীকর্তৃক শুম্ভের অস্ত্র ব্যর্থ হইবার কথা বলা হইয়াছে। স্থূলকথা এই যে, প্রতিবিম্ব যখন বিম্বের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে, আবার নিজের বিশিষ্ট সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে, বিম্বস্বরূপটি তাহার নিকট আবৃত থাকে ইহাই পরস্পরের অস্ত্রপ্রয়োগ-রহস্য।

———০———

ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১০॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥১১॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যাধাবত তাং দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥১২॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্ ॥১৩॥

অনুবাদ। অতঃপর সেই অসুর শত শত বাণ প্রয়োগে দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিত হইয়া বাণের দ্বারা অসুরের ধনুঃ ছেদন করিলেন। ধনুঃ ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ শক্তিঅস্ত্র গ্রহণ করিল, কিন্তু দেবী অসুরের করস্থিত সেই শক্তিঅস্ত্রকে চক্রপ্রয়োগে ছেদন করিলেন। তখন অসুরাধিপতি খড়্গ ও অতি উজ্জ্বল শতচন্দ্র নামক চর্ম (ঢাল) গ্রহণ করিয়া দেবীর প্রতি অভিধাবিত হইল। সে (খড়্গ চর্মধারী শুম্ভ) আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকাদেবী ধনু হইতে মুক্ত শাণিত শরপ্রয়োগে অতি শীঘ্র সেই খড়্গ এবং সূর্যকিরণবৎ চর্মখানা ছিন্ন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। এই চারিটি মন্ত্রেও দেবী এবং মহাসুর শুম্ভের পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন অস্ত্রপ্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে শুম্ভ শত শত বাণপ্রয়োগে দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। দেবী কুপিত হইয়া শুম্ভের ধনুঃ ছেদন করিয়াছিলেন। অস্মিতা প্রণবধনুতে স্বকীয় বিশিষ্ট আত্মবোধস্বরূপ শর সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল! যদিও পূর্বে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি এখানে উহাও অসুরের অস্ত্রপ্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐরূপ প্রণব ধনু হইতে আত্মশর-নিক্ষেপ ব্যাপারটির মধ্যে দ্বৈত প্রতীতি অবস্থিত ; সুতরাং প্রণবাদি মন্ত্রের উচ্চারণ এবং আত্মশর নিক্ষেপ, ইহাও অসুর-অত্যাচারমাত্র। আত্মা মা আমার এতটুকু ভেদজ্ঞানও রাখিতে দিবেন না। তাই স্বকীয় স্বপ্রকাশ শক্তি-রূপ শরপ্রয়োগে ক্ষণকালমধ্যে শুম্ভের প্রণব-ধনুঃ ছিন্ন করিয়া দিলেন। শুম্ভের উদ্যম ব্যর্থ হইল। ঠিক এইরূপই মুমুক্ষু সাধক যখন বিশিষ্ট সাধনার সাহায্যে স্বকীয় পৃথকত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, তখন মা আমার সে বিশিষ্টতাও বিনষ্ট করিয়া দেন।

অতঃপর শুম্ভ শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। 'আমিই আত্মা' এইরূপ বোধশক্তিকে দৃঢ় প্রযত্নে ধরিয়া রাখার নামই শুম্ভের শক্তিগ্রহণ। কিন্তু হায়! দেবী তাহাও ছিন্ন করিয়া দিলেন। যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঠিক এমনই সর্বতোভেদী যে, বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞানও সেখানে থাকিতে পারে না। যাহা হউক, দেবীর সুদর্শন বা দিব্যদৃষ্টিরূপ চক্র অস্ত্র-প্রয়োগে অর্থাৎ সর্বতোভেদী প্রকাশ-সত্তার প্রভাবে, অস্মিতার যে বিশিষ্ট আত্মবোধ, তাহা সম্যক্ অভিভূত হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় শুম্ভ হতাশ হইয়া খড়্গ এবং চর্ম গ্রহণপূর্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, দেবী ধনুর্মুক্ত শরপ্রয়োগে তাহাও ছিন্ন করিয়া দিলেন। খড়্গ—ভেদজ্ঞান ; চর্ম—আবরণ। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। একান্তই যখন অস্মিতা আত্মপ্রকাশের সম্মুখে স্বকীয় বিশিষ্টতা লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, তখন অগত্যা ভেদজ্ঞান ও আবরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। একদিক হইতে আত্মাভিমুখী লক্ষ্য পরিত্যাগ করে, অন্যদিক হইতে স্বকীয় পৃথকত্ব ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে ; ইহাই শুম্ভের চর্ম ও খড়্গ-প্রয়োগের রহস্য। অস্মিতার ভাব এই যে, 'আত্মা আছেন থাকুন, তাঁহার প্রকাশেই আমি প্রকাশিত, তাহাও স্বীকার করি ; তথাপি আমার যে বিশিষ্ট সত্তাটুকু আছে, তাহা কেন পরিত্যাগ করিতে যাইব। আমি বেশ আছি। দূর হইতে অম্বিকার সর্বমনোহর রূপ দেখিয়া আনন্দে মুগ্ধ থাকিব ; তাঁহার সমীপস্থ হওয়ার—তাঁহাতে আত্মসত্তা মিলাইয়া দিবার কি প্রয়োজন ?' ঠিক সেইরূপ অনেক বৈষ্ণব সাধকও এইখানে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা

কিছুতেই ভগবানের সহিত মিলাইয়া যাইতে চান না। সান্নিধ্যমাত্র লাভ করিয়া ভগবৎরসাস্বাদনকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করেন। বাস্তবিক কিন্তু রসাস্বাদও মুক্তিপথের বিঘ্ন। শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানলাভের পথে যে সকল অন্তরায়ের উল্লেখ আছে, 'রসাস্বাদ' তাহার অন্যতম বিঘ্ন। যদিও নিশুম্ভবধেও ইহা বলা হইয়াছে, তথাপি এখানে যে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। শুম্ভ ও নিশুম্ভ একটি বিশিষ্ট বোধেরই দ্বিবিধ প্রকাশমাত্র। সে যাহা হউক, বিশিষ্টভাবে ভগবৎরসের আস্বাদনকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিলে, সহসা অদ্বয়তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় না। আবার এই অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যাঁহারা বলেন—মুক্তি বাঞ্ছনীয় নয়, ভগবৎপ্রেম-রসের আস্বাদনই একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা জানেন না যে, যতক্ষণ মুক্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণ যথার্থ প্রেম হইতেই পারে না। অনন্য-ভক্তিই যথার্থ প্রেম। কিন্তু এসকল অন্য কথা। যাঁহারা প্রথম হইতেই আত্মসমর্পণ যোগের অনুশীলন করেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া এই চিদাভাসরূপে—এই অস্মিতারূপে অবস্থান করিয়া, স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রযত্ন করিলেও স্নেহ-বিহ্বলা মা আমার সে প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া দেন। স্নেহের সন্তানকে যতক্ষণ না সম্যক্ আত্মসাৎ করিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। শুম্ভের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হওয়ার ইহাই রহস্য।

শুম্ভ যে শতচন্দ্র নামক চর্ম (ঢাল) গ্রহণ করিয়াছিল, মন্ত্রে উহাকে সূর্যকিরণের ন্যায় নির্মল বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই এই অস্মিতাক্ষেত্রের আত্মস্বরূপ-আবরক ভেদজ্ঞান অতিশয় উজ্জ্বল। পূর্বে মহিষাসুর প্রভৃতিও এইরূপ খড়্গচর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু শুম্ভের খড়্গচর্ম তদপেক্ষাও অতিশয় নির্মল। যেহেতু অস্মিতার সহিত আত্মার যে ভেদ, উহা অতি সামান্য—ভেদের আভাসমাত্র; সাধারণতঃ উহা প্রায় অভেদরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তাই, ইহাকে উজ্জ্বল ও নির্মল বলা যায়। যেরূপ কোন কাচাধারের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখার উত্তাপে ও আলোকে স্বচ্ছ কাচাধারটিও অতিশয় উত্তপ্ত ও আলোকিত হইয়া থাকে, এবং দূর হইতে ঐ কাচাধাররূপ আবরণটিই অগ্নিরূপে প্রতিপন্ন হইতে থাকে, ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় স্বচ্ছ অস্মিতাও বহুল পরিমাণে আত্মধর্মী হয়, এবং স্বয়ং আত্মারূপে প্রতিপন্ন হইতে প্রয়াস পায়। এই ভাবটি বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে '**চর্ম চার্ককরামলম্**' বলা হইয়াছে। সাধক, একটু ধীরভাবে স্বকীয় অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করিলেই এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

———○———

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥১৪॥
চিচ্ছেদাপততস্তস্যমুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥১৫॥

অনুবাদ। অশ্বহীন ছিন্নধনু এবং সারথিবিহীন সেই অসুর অম্বিকানিধনে উদ্যত হইয়া ঘোর মুদ্গর ধারণ করিল। সেই মুদ্গর আসিতে আসিতেই দেবী শাণিত শরাঘাতে ছিন্ন করিয়া দিলেন। তথাপি সে (শুম্ভ) মুষ্টি উদ্যমনপূর্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয় অশ্ব, প্রণব ধনুঃ এবং বুদ্ধি সারথি, এ সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। সকল প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়াছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহ হইয়াও এখন আর অস্মিতার সহায়তাকল্পে উপস্থিত হয় না। প্রণবাদি মন্ত্রের উচ্চারণ তাহাও নিরুদ্ধ হইয়াছে। তারপর সারথি—নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা বুদ্ধি, তাহারও আর প্রকাশ নাই। বিষয় থাকিলে, তবে না বুদ্ধির প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়। এখানে বিষয় বলিতে কিছুই নাই, সুতরাং বুদ্ধিও বিলুপ্ত। এইবার অসুর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঘোর মুদ্গর গ্রহণ করিল, অর্থাৎ অস্মিতা মূঢ়ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 'আমি কিছুতেই আত্মাভিমুখী হইব না, আত্মার নিকট কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিব না, যেমন আছি, তেমনই থাকিব, তথাপি নিজসত্তাকে কখনও আত্মসত্তায় বিলীন হইতে দিব না', অস্মিতার এইরূপ যে দৃঢ় প্রত্যয়, উহাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে শুম্ভের মুদ্গর-গ্রহণ বলা হইয়াছে। 'এইরূপ মূঢ় অবস্থায় অবস্থান করিতে পারিলেই স্বকীয় বিশিষ্ট সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; পক্ষান্তরে, আত্মস্বরূপটিও আবৃত থাকিবে'। অস্মিতার এই ভাবটিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে '**অম্বিকানিধনোদ্যতঃ**' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মস্বরূপকে আবৃত রাখিবার উদ্যমকেই অম্বিকা-নিধনের উদ্যম বলা হইয়াছে।

অস্মিতা এইরূপে আপনাকে অজ্ঞানাবৃত রাখিতে

চাহিলেও, মা কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেন না, তিনি নিশিত শরপ্রয়োগে অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতিবিলয়কারক আত্মস্বরূপ-প্রকাশে শুম্ভের সে ঘোর মুদ্গার—অস্মিতার সে মূঢ়ভাব বিনষ্ট করিয়া দিলেন। মা যে আমার এখন অতি কোপনা চণ্ডিকা—তাঁহার ক্রোধের উদয় হইয়াছে, সুতরাং আমিত্বকে—অস্মিতাকে কিছুতেই পৃথক থাকিতে দিবেন না। অস্মিতা নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও চণ্ডিকা মা আমার তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেনই ; কারণ, একদিন এই 'আমিই' মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যতক্ষণ সে সমর্পণের পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। সাধক! বিপদে পড়িয়াই হউক, অশক্ত হইয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, একদিন যখন **'মামেকং শরণং'** নিয়াছিলে, আত্মার—মায়ের আমার শরণাগত হইয়াছিলে, তখন আর কিছুতেই রক্ষা নাই। যিনি যথার্থ আমি তিনি প্রকাশিত হইবেনই। তোমার কল্পিত আমিত্বকে যে কোন প্রকারে বিনষ্ট করিবেনই। ইহাই চণ্ডী-তত্ত্বের বিশেষ রহস্য। চণ্ডিকাদেবীর ইহাই বিশেষ কৃপা। তাই দেখ অস্মিতার মূঢ় অবস্থারূপ শুম্ভের মুদ্গার-প্রয়োগও চণ্ডিকার স্বপ্রকাশ-শক্তিপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল।

এত বিফলতায়ও কিন্তু আমিত্ব হতাশ বা নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মুদ্গার-প্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া শুম্ভ তখন মুষ্টি উদ্যমনপূর্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। মুষ্টি—বিক্ষেপ শক্তি। অস্মিতা বিক্ষেপ-শক্তি-প্রভাবে আত্মসত্তাকে দূরে সরাইয়া দিতে চায়। আত্মসত্তা দূরীকৃত হইলেই অস্মিতা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। সাধক! এখানে যে বিক্ষেপের কথা বলা হইল, উহা চিত্তক্ষেত্রের বিক্ষেপ নহে। উহা অস্মিতা ক্ষেত্রের বিক্ষেপ—অতি সূক্ষ্ম। চিত্ত-বিক্ষেপরূপ চিক্ষুর অসুরের নিধন বিবরণ মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখানে বৈষয়িক স্পন্দনরূপ বিক্ষেপের কথাই নাই। সাংখ্যের ভাষায় এই অস্মিতার বিক্ষেপের প্রকৃতির পরিণাম ধর্মের সূক্ষ্মতম বীজ অবস্থা বলা যাইতে পারে ; বেদান্তের ভাষায় ইহাকে অজ্ঞানের—মায়ার সূক্ষ্মতম অধ্যাস ধর্মের বীজ বলা যায়। স্থূল কথা এই যে, কোনরূপে বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞানের সূক্ষ্মতম বীজ থাকিলে, সময়ে উহাই আবার স্থূলে ঘনীভূত হইয়া ভেদজ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতে পারে ; তাই মা আমার সে সূক্ষ্মতম বীজটুকু পর্যন্ত রাখিবেন না। তাই তিনি স্বয়ং শুম্ভকে মুষ্টি উদ্যত করিয়া নিজের অভিমুখে অভিধাবিত হওয়ার জন্য প্রেরণা করিলেন, অর্থাৎ অস্মিতার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম বিক্ষেপ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া দিলেন। ওগো মায়ের আমার স্বপ্রকাশ-স্বরূপের নিকট কিছুই যে লুকাইয়া থাকিতে পারে না।

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥১৬॥
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। দৈত্যপুঙ্গব শুম্ভ দেবীর হৃদয়দেশে সেই মুষ্টি নিপাতিত করিল। দেবীও তাহার বক্ষঃস্থলে করতলদ্বারা আঘাত (চপেটাঘাত) করিলেন। করতল-প্রহারে অভিহত হইয়া দৈত্যরাজ ভূতলে নিপতিত হইল এবং পুনরায় উত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা। আত্মাভিমুখী তীব্র আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, সূক্ষ্মতম বিক্ষেপ-শক্তির আশ্রয়ে অনাত্মবোধরূপী অস্মিতার স্বকীয় সত্তা রক্ষা করিবার চেষ্টাই দেবীর হৃদয়ে অসুরের মুষ্টি-প্রহার। আত্মাকে দূরস্থ করাই অস্মিতার উদ্দেশ্য ; কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় না। অস্মিতা যতই আত্মাকে দূরস্থ এবং উৎপীড়িত করিতে প্রয়াস পায়, আত্মা ততই সন্নিহিত হইতে থাকেন। শুম্ভ দেবীর হৃদয়ে মুষ্টিপ্রহার করিল, দেবীও শুম্ভের বক্ষঃস্থলে করতল প্রহার করিলেন। উভয়ে উভয়ের হৃদয়স্থান আহত করিল। হৃদয় বলিতে এখানে কেন্দ্রস্থান বুঝিতে হইবে। অনন্ত শক্তির যাহা কেন্দ্র, তাহাই মায়ের হৃদয়দেশ ; এবং ব্যাপক অস্মিতা যে সূক্ষ্ম কেন্দ্র হইতে প্রকাশ পায়, তাহাই শুম্ভের বক্ষঃস্থল বা হৃদয়। এই উভয় হৃদয় যতক্ষণ এক হৃদয়ে পরিণত না হয় ততক্ষণ কিছুতেই ভেদপ্রতীতি দূরীভূত হয় না। হৃদয়ের মিলন না হইলে শুধু অঙ্গসংস্পর্শে বিরহ-বেদনা দূরীভূত হয় না। বেদান্তদর্শন হৃদয় শব্দের অর্থ আত্মাই করিয়াছেন। (**হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্**)। প্রত্যক্ষ অনুভূত আত্মা হৃদয়দেশেই বিশেষভাবে প্রকটিত ; তাই, আত্মার অন্য নাম হৃদয়। সুতরাং হৃদয়ের

মিলন বলিলে, আত্মমিলনই বুঝা যায়। যতক্ষণ আত্মার আত্মসাৎকৃত না হওয়া যায়, ততক্ষণ হৃদয় মিলন হয় না; হৃদয় মিলন না হইলে অনাদিজন্মের বিরহজ্বালা বিদূরিত হয় না।

মা গো! কতদিন হইতে—কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে তোরই বুকে আমার বুকখানা মিলাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছি; একবার শুধু মা বলিয়া তোর হৃদয়দেশে প্রবেশ করিব বলিয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্ম মৃত্যু, রোগ শোকের যাতনা সহ্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু পারি নাই। কিছুতেই তোমাতে আত্মহারা হইতে পারি নাই, ওগো আমার চির-বিশ্রাম, হে আমার চিরশান্তি, কিছুতেই তোমাতে মিলাইয়া যাইতে পারি নাই; শুধু বিরহের দাবানল জ্বালিয়া এই সংসারসন্তপ্ত হৃদয়খানা আরও বিদগ্ধ করিয়াছি। তোমার বক্ষে বক্ষমিলনের যে কি শান্তি তাহা অনুভব করবার যোগ্যতা পর্যন্ত লাভ হয় নাই! মা গো, এইবার শেষ কর। এইবার বহুদিনের সঞ্চিত মিলন-বাসনা পূর্ণ কর; এইবার এতদিনের পর এস, তুমি আমি এক হইয়া যাই। যথার্থই মা, তোমার বিরহ আর আমরা ভোগ করিতে চাই না। তোমার বিরহের যে কি মর্মভেদী পীড়া, তাহা বুঝিতে আর বাকি নাই মা! এইবার শুম্ভের মত আমাদের হৃদয়দেশেও করতল প্রহার কর। আমাদের হৃদয়ের যত কিছু মলিনতা, তাহা দূর হইয়া যাউক; তোমার পবিত্র অঙ্গস্পর্শে এ হৃদয়ও পূত হউক। আজ, শুম্ভ ধন্য; ধন্য শুম্ভের সমরাভিনয়। আজ তুমি মা, কর-প্রহারচ্ছলে শুম্ভের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছ। শুম্ভ আর বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবে না। তোমার পবিত্র স্পর্শে সেও পবিত্র হইয়া তোমাতে মিলাইয়া যাইবে। শুম্ভ যে যথার্থই তোমার জন্য তোমাকে চায়। সর্বস্ব গিয়াছে, তথাপি তোমায় চায়; তাই মা শুম্ভের প্রতি তোমার এই বিশিষ্ট কৃপা।

শুন, অস্মিতা বাস্তবিক আত্মাকেই চায়, আত্মায় মিলাইয়া যাইতে পারিলেই, তাহার যথার্থ শান্তি লাভ হয়। তবে, এই যে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রপ্রয়োগরূপ সমরাভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্বসঞ্চিত ভেদজ্ঞানমূলক দুরপনেয় সংস্কারের সূক্ষ্মতম প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ পার্থিব জগতেও অনেক সময় দেখা যায়—যে যাহার একান্ত প্রিয়, সময় বিশেষে সে তাহার সন্নিহিত হইলেও, প্রাণে প্রাণে তাহার সহিত মিলনের একান্ত বাসনা থাকিলেও, কার্যতঃ কিন্তু স্বয়ং দূরস্থ হইতে প্রয়াসী হয়; ঠিক এইরূপই শুম্ভ, অম্বিকার সর্বমনোহর রূপে মুগ্ধ অস্মিতা, সত্য সত্যই আত্মাকে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত; কিন্তু বহুজন্ম সঞ্চিত অভ্যাসবশতঃ স্বকীয় সেই বিশিষ্টতাটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে না; তাই আত্মপ্রেম আত্মসমররূপে পরিণত হয়। অতি অপূর্ব এ তত্ত্ব।

সাধক দেখ, তোমরাও শুম্ভের ন্যায় মাতৃ-হৃদয়ে কতই মুষ্টিপ্রহার করিয়া মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাও। কিন্তু একটু পশ্চাৎপদ হইলেই—মায়ের দিক হইতে একটু মুখ ফিরাইলেই বুকের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত জ্বালা হইতে থাকে। আবার মাতৃ-আকর্ষণ অনুভব কর। আবার সে অপরূপ রূপ দেখিবার জন্য লালায়িত হও। রাগ করিয়া, অভিমান করিয়া, প্রহার করিয়া দূরে সরাইয়া দাও; আর 'তোমায় দেখিব না' বলিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত কর; আবার কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও। তাঁহাকে একটিবার না দেখিয়া থাকিতে পার না। কেন এরূপ হয়? মায়ের আকর্ষণ। মা যে তোমায় ছাড়েন না, তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও তিনি তোমায় আত্মলীন করিতে চান; তাই এমন হয়।

সে যাহা হউক, অস্মিতার উপর আত্মার স্বপ্রকাশ-স্বরূপটির বিশেষ উদ্ভাসনকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে দেবীর করতল-প্রহার কথাটি বলা হইয়াছে। এখানে একটু সাধনার কথাও বলিয়া রাখিতেছি—গুরুর হৃদয়ের সহিত স্বকীয় হৃদয় মিলাইয়া দিতে পারিলেই এই দেবী এবং শুম্ভের পরস্পর হৃদয়দেশে আঘাতের রহস্য বুঝিতে পারা যায়। যথার্থই সে মিলনানন্দ দুঃসহ হইয়া উঠে—যেন আনন্দের যাতনা বলিয়া মনে হয়। তখন ইহাকে আনন্দের প্রহার বা পীড়ন না বলিয়া, থাকা যায় না। অনুভব-সম্পন্ন সাধক ইহা সহজেই বুঝিয়া লইবেন।

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥১৮॥
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতু প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥১৯॥

অনুবাদ। শুম্ভ উৎপতিত হইয়া দেবীকে গ্রহণপূর্বক আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল। চণ্ডিকা কিন্তু সেখানেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আকাশে দৈত্য এবং চণ্ডিকা, পরস্পরের এরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাতে সিদ্ধ মুনিগণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা যখন দেখিল যে, কোন উপায়েই আত্মাকে আত্মসাৎ করা যায় না, বরং নিজেকেই আত্মায় আত্মসাৎ হইয়া যাইতে হয় তখন উপায়ান্তর অভাবে দেবীকে লইয়া শূন্যে উৎপতিত হইল, অর্থাৎ আত্মার শূন্যত্ব অনুভব করিতে চেষ্টা করিল। আত্মা বলিয়া বাস্তবিক কিছুই নাই; আত্মা শূন্যমাত্র, অভাবই ত' আত্মার স্বরূপ যাহা অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি নেতি নেতি মুখে প্রতিপাদ্য সর্বভাবের অভাবই যাহার স্বরূপ, তাহা শূন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে! (ইহা আধুনিক বৌদ্ধবাদ, পূর্বে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)। যথার্থই অধিকাংশ সাধক এখানে আসিয়াও আত্মাকে গাঢ় সুষুপ্তিবৎ একটা অভাবস্বরূপ বস্তু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন এবং সর্বভাব বিলয় করিয়া শূন্যরূপে অবস্থান করাই জীবের চরম পুরুষার্থ মনে করিয়া অভাবস্বরূপে—শূন্যরূপে অবস্থানকেই আত্মস্থিত বা ব্রাহ্মীস্থিতি বলিয়া বুঝিয়া লয়েন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে দেবীকে লইয়া শুম্ভের আকাশে উৎপতন বলা হইয়াছে। কিন্তু হায়! শূন্যে অবস্থান করিয়াও শুম্ভের পরিত্রাণ নাই; এখানে আসিয়াও দেবী শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শূন্য বা অভাব বলিয়া আত্মার বারংবার নিষেধ করিলেও, সেই অভাবের বিজ্ঞাতৃরূপে যিনি থাকিয়া যান তিনিই ত' আত্মারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং শূন্য বলিয়াই বা পরিত্রাণ পাওয়া যায় কই! শূন্য যে আছে, এই কথাটা বলিয়া দিবার জন্য আত্মার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অস্মিতা আত্মাকে প্রতিষেধ করিতে চায়, আর আত্মা শূন্যের বিজ্ঞাতৃরূপে স্বয়ং পূর্ণ হইয়া শূন্যবাদকে নিরাকরণ করিয়া অবস্থান করেন, ইহাই দেবী এবং শুম্ভের পরস্পর আকাশযুদ্ধের রহস্য।

এই আকাশ-যুদ্ধ যথার্থই বিস্ময়কর। একদিকে আত্মা নিষিদ্ধ হইয়াও, শূন্যমাত্ররূপে পর্যবসিত হইয়াও, পূর্ণত্ব—স্বপ্রকাশত্ব লইয়া অভিব্যক্ত হইতে থাকেন, আর অন্যদিকে যাহার পরমার্থতঃ কোন সত্তাই নাই, সেই অস্মিতা স্বয়ং সত্তাবিশিষ্ট হইতে উদ্যত হয়। সুতরাং এ যুদ্ধ বড়ই বিস্ময়কর। অবশ্য সকলের পক্ষে বিস্ময়কর না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সিদ্ধ, যাহারা মুনি, অর্থাৎ যাহারা আত্মলাভে চরিতার্থ, যাহারা মননশীল যোগী, তাহাদের নিকট এ যুদ্ধ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাই মন্ত্রে এ যুদ্ধকে 'সিদ্ধমুনি বিস্ময়কারক' বলা হইয়াছে। সত্যই সাধক ব্যতীত এ যুদ্ধ-রহস্য কে বুঝিবে? একবার মনে হয়—আত্মা শূন্যমাত্র, আবার মনে হয়— না, আত্মা শূন্য নয়, আত্মাই পূর্ণ।

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়াসমাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥২০॥
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২১॥

অনুবাদ। অনন্তর দীর্ঘকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অম্বিকাদেবী শুম্ভকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপপূর্বক ঘূর্ণন করতঃ ধরণী-পৃষ্ঠে নিপাতিত করিলেন। নিক্ষিপ্ত এবং ভূমিতল-প্রাপ্ত সেই দুষ্টাত্মা শুম্ভ পুনরায় মুষ্টি উদ্যমনপূর্বক চণ্ডিকাকে নিধন করিবার ইচ্ছায় সবেগে অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এই আকাশ-যুদ্ধ—এই শূন্যত্বের ধাঁধা দীর্ঘকাল চলে। অধিকাংশ সাধকই বাক্যমনের অগোচর বস্তুকে সুষুপ্তিবৎ, অজ্ঞানবৎ, শূন্যবৎ একটা কিছু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। আত্মা যে স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু, তাঁহাকে সহস্রবার নাই নাই বলিলেও ঐ নিষেধের বিজ্ঞাতৃরূপে তিনি স্বয়ং থাকিয়া যান, ইহা প্রথমতঃ বুঝিতে না পারিলেও সাধক মাত্রেই শেষে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যে দিন আত্মার পূর্ণত্ব আনন্দময়ত্ব উদ্ভাসিত হয়, সেই দিনই এই শূন্যত্বের ধাঁধা চলিয়া যায়। সেই দিন হইতেই অস্মিতা নিজের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া পড়ে। আত্মার প্রতিষেধ ত' কিছুই হয় না! তবে 'আমি' বলিয়া যাহা বুঝিতেছি উহা কি নাই? এইরূপ নিজের অস্তিত্ববিষয়ক সংশয় ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মন্ত্রে ইহাই শুম্ভের শূন্যমার্গে ঘূর্ণনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অস্মিতার তখনকার অবস্থা যথার্থ বিঘূর্ণিতমস্তক-পুরুষের ন্যায় হইয়া পড়ে। 'কি সর্বনাশ। আমিটাই নাই! তবে আমিও কি স্থূল জগতের মত দৃশ্যমাত্র— কল্পনামাত্র'! এইরূপ ভাবটিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে দেবীকর্তৃক শুম্ভের ধরাতলে নিক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। যখন আত্মসত্তা একটু বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক সাধকের হৃদয়েই এইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এইবার শুম্ভের শেষ চেষ্টা। দেবীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ও ধরণীপ্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ স্থূল জগতের ন্যায় দৃশ্য—কল্পিত—তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতীয়মান হইয়াও

একবার নিজ সত্তাটি বজায় রাখিবার জন্য সেই দুরাত্মা—সেই মিথ্যাভিমানরূপী অস্মিতা আবার চণ্ডিকানিধনের ইচ্ছায় মুষ্টি উত্তোলন করিল। চণ্ডিকাকে নিধন করাই শুম্ভের অভিপ্রায়। কোনরূপে আত্মসত্তাকে তিরস্কৃত করিতে পারিলেই অস্মিতার স্বকীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে ; তাই মন্ত্রে শুম্ভের পুনরায় মুষ্টি উদ্যমন কথিত হইয়াছে। যদিও চণ্ডিকাকে একেবারে নিধন করা একান্তই অসম্ভব ; তথাপি যতটা সম্ভব উহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিলেও অস্মিতার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সেই জন্যই শুম্ভের এই পুনরায় মুষ্টি-উদ্যমনরূপ বিশেষ প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাই শুম্ভের চরম উদ্যম।

———○———

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্ ।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২২॥

অনুবাদ। সেই সর্বদৈত্যাধিপতি যখন (এইরূপভাবে) আসিতে লাগিল, তখন দেবী শূলের দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণকরতঃ ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

ব্যাখ্যা। এতদিনে শুম্ভের অবসান হইল। অস্মিতা সর্ববিধ দ্বৈতপ্রতীতির আশ্রয় বলিয়াই, এখানে শুম্ভকে সর্বদৈত্যাধিপতি বলা হইয়াছে। যাবতীয় অনাত্মপ্রতীতি যে একমাত্র আমিত্বের আশ্রয়েই অবস্থিত ইহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। যদিও সাধারণভাবে আমি বলিলে—স্থূল দেহ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত, এবং পাপ পুণ্য ধর্মাধর্ম প্রভৃতি সমন্বিত একটা কিছু প্রতীয়মান হয়, তথাপি যাঁহারা অস্মিতা ক্ষেত্রের সাধক, তাঁহারা ঐ সর্বভাবের সহিত অন্বিত অথচ একান্ত বিবিক্ত আমিত্বকে বিশেষভাবে ধরিতে বা বুঝিতে পারেন। যতদিন কেবলানন্দময় 'জ্ঞ' স্বরূপটির আভাসও না আসে, ততদিন ঐ আমিত্বের বিকাশ হয় না। বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতির ফলে, শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপায়, মায়ের অতুলনীয় স্নেহে, সাধক বিশুদ্ধ বোধমাত্রস্বরূপে উপনীত হইয়া, এই মিথ্যা অভিমান বা অস্মিতারূপী অসুরের হাত হইতে চির পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহাই শুম্ভ বধের রহস্য।

দেবীর শূলাঘাতে মহাসুর শুম্ভ জগতীতলে নিপতিত হইল। কেবলানন্দময় বোধস্বরূপের সম্যক্ প্রকাশ হওয়াই দেবীর শূলাঘাত। পূর্বে শূল শব্দের আনন্দময় ত্রিপুটিরূপ অর্থ করা হইয়াছিল। এখানে কিন্তু শূল শব্দে ত্রিপুটিবিহীন কেবলানন্দময় 'জ্ঞ' স্বরূপটি বুঝিতে হইবে। উহার উদয়ে অস্মিতা অর্থাৎ যাবতীয় অনাত্মভাবের বীজ সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়। **'জগত্যাং পাতয়ামাস'**—মা শুম্ভকে জগতে নিপাতিত করিলেন। জগৎ অর্থাৎ দৃশ্য বা জড়বস্তু বলিয়া যেরূপ কিছুই নাই, কখনও ছিল না কখনও থাকিবে না ; ঠিক সেইরূপ আমিত্ব বলিয়া কিছুই নাই, ছিল না এবং থাকিবে না যাহা আছে অস্তিরূপে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা আমি নহে—আত্মা। যে আমি এতদিন সর্বাধিপতিরূপে প্রতীত হইত, যে আমি এতদিন সর্বভাবের জ্ঞাতা এবং অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রতীত হইত, সেই আমি নাই—তিনকালেই নাই।

সাধক ! ইহাই শুম্ভ বধ। যে আমিকে লইয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুর পেষণ সহ্য করিয়াছ, যে আমিকে লইয়া কত স্বর্গ নরক ভ্রমণ করিয়াছ, যে আমিকে কতবার কত রকম সাজে সাজাইয়াছ, যে আমিকে বদ্ধ মনে করিয়া, উহাকে মুক্ত করিবার জন্য কত কঠোর সাধনা করিয়াছ, এইবার দেখ—সেই আমি নাই—তিন কালেই নাই। তুমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। তুমি অভয় অমৃত সত্য ! তুমি ব্রহ্মাই ! তোমাতে জন্মমৃত্যু নাই, বন্ধনমুক্তিও নাই। তুমি নিত্যমুক্ত। ইহাই পরমলাভ, ইহাই পরম পুরুষার্থ। পূর্বে বলিয়াছিলাম, আমিকে না হারাইলে মাকে পাওয়া যায় না। আজ এতদিনের পর আমিকে হারাইয়াছ, আজ আমি নিপতিত, মাতৃস্বরূপ—আত্মস্বরূপ স্বতঃ উদ্ভাসিত। ইহারই নাম মাতৃ-লাভ।

এইবার শুন—শুম্ভ শব্দের অর্থ নিত্য নিহত। পূর্বে শুন্ভ ধাতুর অর্থ শোভা বলিয়া আসিয়াছি। ঐ শুন্ভ ধাতুর আরও একটি অর্থ হয়—বধ। যাহারা বধ হইয়াই রহিয়াছে—যাহা নিত্যই নিহত অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার নাম শুম্ভ। শুম্ভকে দার্শনিকের ভাষায় অসম্ভব ভবিষ্যৎ বলা যায়। আমি এবং আমির আশ্রিত এই জগৎ নিতান্ত অসম্ভব বস্তু। ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই, কখনও থাকিবে না। ইহাই সত্য। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই যথার্থ সত্য-প্রতিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নে জগতের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া শ্রীবশিষ্ঠদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইখানে একটু বলা আবশ্যক। 'কোনও

অরাজক রাজ্যে এক রাজা বাস করিতেন, তিনি অবিবাহিত, তাঁহার দুই পত্নী, উভয়ই বন্ধ্যা। তাঁহাদের দুইটি পুত্র মৃগয়া করিবার জন্য এক বৃক্ষহীন অরণ্যে প্রবেশ করিল'। ইত্যাদি উপাখ্যানটি যেরূপ কিছুই নহে, কেবল ধাত্রীক্রোড়স্থ অনাবিষ্ট শিশুকে শান্ত করিবার জন্য কতকগুলি শব্দমাত্র, ঠিক সেইরূপ এই জগৎ, এই আমি, এই চিদাভাস, এই অস্মিতা, ইহার কিছুই নাই। একমাত্র আত্ম—মা-ই আছেন। তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ। আর কোথাও কিছু নাই।

সাধক, একদিন গীতাতত্ত্বের অবসানে শ্রীগুরুর মুখোচ্চারিত অপূর্ব বাণী—'**মামেকং শরণং ব্রজ**', শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে ; তোমার আমিটিকে তাঁহারই চরণে শরণাগত করিয়াছিলে। এত দিনের পর তাহার সার্থকতা দেখিতে পাইলে। দেখ—তোমার সেই শরণাগত আমিটিকে কত বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পবিত্র করিয়া, মা আজ আত্মসত্তায় মিলাইয়া লইলেন। তোমার শরণাগতির যথার্থ ফললাভ হইল। জীব তুমি ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে। বল—'**ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দং বিভাতি মে স্পষ্টং। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষতেঽদ্য। ধনোঽহং ধনোঽহং স্বস্য অজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্য সম্পন্নম্**'।

———○———

স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্॥২৩॥

অনুবাদ। দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিশেষরূপ আহত হওয়ায় সেই অসুর গতপ্রাণ হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্বতা সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালিত করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ যখন দেবীর শূলে আহত ও গতাসু হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল, তখন সমুদ্র দ্বীপ পর্বতাদি সহ সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ইহাই মন্ত্রের স্থূল অর্থ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে—গুণত্রয়ের পরস্পর সংক্ষোভ-তারতম্যবশতঃ যে সপ্তধাভেদ হয়, তাহাই সপ্ত সমুদ্র, এবং মূলাধারাদি যে সাতটি বিশিষ্ট অনুভূতি কেন্দ্র, তাহাই সপ্তদ্বীপ ; এবং স্থূল-জড়ত্ব বোধগুলিই পর্বতস্থানীয়। অস্মিতার বিনাশে ইহারা সকলেই বিচলিত হইয়া উঠে। কারণ, এসকলই আমিত্বের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। আমিত্ব বিনষ্ট হইলে আর ইহাদের সত্তা কিরূপে থাকিবে ?

যতদিন প্রারব্ধ কর্মসমূহের সম্যক্ নিঃশেষ না হয়, ততদিন এই দেহাদিবিষয়ক বোধ অর্থাৎ অনাত্মবোধের পুনরাবর্তন হয়। সাধক যখন আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, তখন উহাদের চিহ্নমাত্র থাকে না, কিন্তু আত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলেই আবার অনাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে। সর্পভ্রান্তির নিবৃত্ত হইলেও— রজ্জুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নিশ্চয় হইলেও সর্পজ্ঞান-সমকালীন উৎপন্ন ভীতি হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ কিছুকাল থাকিয়া যায়। আত্মার প্রকাশে অস্মিতা অবধি অর্থাৎ প্রকৃতি পর্যন্ত যাবতীয় অনাত্ম-বস্তুর সত্তা সম্যক্ বাধিত হইয়া যায় ; তথাপি যাবৎ-প্রারব্ধ উহাদের অনুবর্তন হয়। তাহার ফলে স্থূলদেহ ধারণ, লোকশিক্ষা, উপদেশ, শাস্ত্র-প্রণয়ন, ধর্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যোগদর্শন ইহাকে 'নির্মাণ-চিত্তের ফল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞ পুরুষ অস্মিতামাত্র হইতে বিশ্বমঙ্গলের জন্য অভিনব চিত্ত নির্মাণ করিয়া, সেই নির্মাণ-চিত্তের আশ্রয়ে নানাবিধ লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যোগদর্শন যাহাকে নির্মাণচিত্ত বলেন, বেদান্ত তাহাকেই বাধিতানুবৃত্তি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় মতে কিছুই বিরোধ নাই। সে যাহা হউক, সাধক যখন অস্মিতাকে পর্যন্ত পরিত্যাগপূর্বক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন যথার্থই পৃথ্বী সমুদ্র দ্বীপ এবং পর্বত অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর কম্পিত হইয়া উঠে ; কারণ, ইহারা যে চিরতরেই সত্তাহীন হইতে চলিয়াছে। কোন কোন সাধকের সমাহিত হওয়ার পূর্বক্ষণে দেহাদির অল্পাধিক কম্পন স্থূলেই পরিলক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, যতদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণ হইবেই। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সাধক বিদেহকৈবল্য লাভ করে, তখন আর অনাত্মবস্তুর ভাণও হয় না। প্রারব্ধ-সংস্কারের মধ্যে যেগুলি আত্মজ্ঞানলাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়, তাহাদিগকেই আমরা ইতিপূর্বে প্রবল প্রারব্ধ বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি। এই প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। ইহাকেই সাধনার ভাষায় রুদ্রগ্রন্থি ভেদ বলে। এই জগৎ, এই দেহাদি, ইহারা যে বিজ্ঞানমাত্র, এইরূপ

প্রতীতির নামই রুদ্র-গ্রন্থি। ইহার ভেদ হওয়াকে রুদ্রগ্রন্থিভেদ কহে। বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, অনাত্মা বলিয়া কোথাও কিছু নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না। জগতের সত্তা তিন কালেই নাই। এক অদ্বিতীয় আত্মা—মা আমার নিত্য বিরাজিত। আত্মাতিরিক্ত কোথাও কিছুই নাই। এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার নামই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ। যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ তাহাতে চেত্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। যাহা অনুভূতিস্বরূপ, তাহাতে অনুভাব্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এই ক্ষেত্রে এই পরমাত্ম-স্বরূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই নাই। আত্মা নিত্য স্বচ্ছ, নিত্য নিরঞ্জন, নিত্য বিশুদ্ধ। বুঝিতে পারিলে কি সাধক? রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয় বটে, কিন্তু সেজন্য রজ্জুতে কখনও সর্প বলিয়া কিছু থাকে না। রজ্জুর সর্পভাব যেরূপ কখনও নাই, ঠিক সেইরূপ আত্মায় জগদ্‌ভাব কখনও নাই। এইরূপ ভাবে আত্মোপলব্ধি হওয়ার পর, ব্যুত্থিত অবস্থায় আত্মার প্রতি যে স্বাভাবিক একান্ত অনুরাগ থাকে, উহাকেই অহৈতুক ভক্তি বলে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আত্মারাম শ্লোকে এই অহৈতুক ভক্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং জগতের সত্তাভাব-বিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান, এই উভয়ই সাধককে সর্বথা নিস্পৃহ অর্থাৎ পর-বৈরাগ্যবান করিয়া রাখে। সে যাহা হউক, এইরূপে মায়ের কৃপায় সাধকের ব্রহ্ম-বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয়, সাধক জীবন্মুক্ত হয়, তাহার সকল বন্ধন ঘুচিয়া যায়, সে নিত্য-মুক্ততার আস্বাদ পায়।

———○———

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥২৪॥

অনুবাদ। পূর্বে যে সকল মেঘ উল্কাযুক্ত থাকিয়া উৎপাতসূচক ছিল, শুম্ভাসুর নিপতিত হওয়ায়, এখন তাহারা প্রশান্তভাব ধারণ করিল এবং সরিৎসমূহ মার্গবাহিনী হইল। (পূর্বে ইহারা উন্মার্গগামিনী ছিল)

ব্যাখ্যা। আমি নাই সুতরাং উৎপাতও কিছু নাই। পূর্বে যে দুর্বহ সংসারচিন্তার ভার ছিল, এখন আমির অভাবে তাহা সম্যক্ দূরীভূত হইয়াছে। সংসার চিন্তার কথা ছাড়িয়া দাও, পূর্বে সাধনারাজ্যেরই কত দুশ্চিন্তা ছিল। কিরূপে এই দুর্জয় মন ও দুর্জয় ইন্দ্রিয়গুলি বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে সিদ্ধিশক্তিলাভ হইবে, কিরূপে অনাদি-জন্ম-সঞ্চিত কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি কতই না দুশ্চিন্তা ছিল, ঐ দুশ্চিন্তারূপ মেঘসমূহ আবার কত হতাশ, কত অবিশ্বাস ও সন্দেহরূপ উল্কাযুক্ত ছিল; এখন তাহারা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আর ভাবিবার কিছু নাই, আর করিবার কিছু নাই, হতাশ বলিয়া কিছু নাই, আশা বলিয়াও কিছু নাই। আমিত্ববোধ বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল আপনা হইতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই মন্ত্রে, উৎপাতসূচক মেঘসমূহের সৌম্যভাব ধারণ বর্ণিত হইয়াছে। আর সরিৎ সকল অর্থাৎ দেহস্থ শক্তিপ্রবাহসমূহ নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হইল। ইতিপূর্বে সাধনার জন্যই হউক, আর সাংসারিক চিন্তার ভারেই হউক, উহারা উৎপথগামী ছিল; এখন আর দুশ্চিন্তা নাই, সুতরাং তাহার স্ব স্ব পথে শান্তভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমিত্ব বিলয়ের পর সাধকের স্থূল শরীর পর্যন্ত অনেকটা প্রশান্তভাব ধারণ করে। যতদিন শুম্ভ থাকে, যতদিন অস্মিতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিন নানারূপ উৎপাত, নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহার বিলয়ে সকলই সৌম্যভাব ধারণ করে, সকলই প্রশান্ত হইয়া যায়। আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভের পর সাধকের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই মন্ত্রে এবং পরবর্তী কয়েকটি মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অনুভূতিসম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই এ সকল লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারেন।

———○———

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলং চাভবন্নভঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। সেই দুরাত্মা অসুর নিহত হওয়ায়, অখিল সংসার প্রসন্নতালাভ করিল, জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং আকাশ অতিশয় নির্মল হইল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা বিনষ্ট হইলে অখিল সংসার যথার্থই প্রসন্নতা লাভ করে। পূর্বে— যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইত, সেই দিকেই যেন একটা অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টিগোচর হইত; কারণ তখন 'আমি কর্তা' এই বোধ ছিল, এখন আর তাহা নাই; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই প্রসন্নভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র

আত্মসত্তাই যে সর্বত্র সম্যক্‌ভাবে উদ্ভাসিত, এইরূপ উপলব্ধিতে অবস্থান করিতে পারিলে, অপ্রসন্নতা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। সাধক! তোমার আমিটাও যখন এইরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, তখন তুমিও অখিল সংসারকে প্রসন্নময় দর্শন করিবে।

'জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ'—জগৎ স্বাস্থ্যকে লাভ করিল। স্ব-তে অবস্থান করার নাম স্বস্থ, অর্থাৎ আত্মস্থ। স্বস্থের ভাবকে স্বাস্থ্য বলে। আত্মসত্তা সর্বত্র সুপ্রকাশিত, সুতরাং জগৎটা স্বস্থভাবেই অবস্থিত। জগৎ বলিয়া এখন আর পৃথক কিছুই নাই, সকলই স্ব হইয়া গিয়াছে।

আকাশ নির্মল হইল। বিজ্ঞানময় আকাশে আর কোনরূপ মলিনতা অর্থাৎ বিশিষ্টতা নাই। পূর্বে বহুত্বের আবরণে বিজ্ঞানাকাশ মলিন ছিল, এখন অস্মিতা বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুত্ব প্রীতির উচ্ছেদ হইয়াছে সুতরাং উহা সর্বতোভাবে নির্মল হইয়াছে।

———০———

ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ॥২৬॥
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥২৭॥

অনুবাদ। সেই অসুর নিহত হওয়ায় দেবতাগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন, গন্ধর্বগণ সুমধুর গান করিতে লাগিল। অপর কতিপয় গন্ধর্ব বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং দিবাকর উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইলেন।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের পতনে দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, চন্দ্র, সূর্য সকলেই আনন্দিত। সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দের আর উদ্বিগ্নতা নাই, ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হইয়াছে। চৈতন্যরাজ্য অক্ষুণ্ণ। দেবতাগণের যজ্ঞভাগ অপহৃত হইবার আশঙ্কা নাই; সুতরাং তাঁহারা হর্ষনির্ভর-মানস হইলেন। আর গন্ধর্বগণ—নাদাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল। আনন্দ-মঙ্গল গান করিয়া লব্ধ আনন্দকে আরও বিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এ যাবৎ গন্ধর্বগণ শুম্ভের প্রভাবে অভিভূত ছিল; তাই তাহারা তান-লয়-হীন নানাবিধ শব্দের অভিঘাতে বিব্রত ছিল। এখন শব্দাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ প্রশান্ত হইয়া, শব্দগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

শুন—আত্মলাভের পর সাধকের উচ্চারিত শব্দগুলি মধুর হয়। তাহার কণ্ঠস্বরে একটা সুমধুর আকর্ষণভাব থাকে। পূর্বে যে শব্দ যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিত, তাহা সকলের চিত্তাকর্ষক হইত না; কিন্তু এখন গালি দিলেও তাহা মধুর হইয়া থাকে, যাহাদিগকে গালি দেওয়া যায়, তাহারাও মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করে না, বরং অন্তরে অন্তরে আনন্দিত হইয়া থাকে। গন্ধর্বগণের প্রসন্নতার ইহাই ফল।

অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল—পুলক এবং অঙ্গকম্পনাদিরূপ সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। যোগের প্রথম অবস্থায় ইহারা চিত্তবিক্ষেপের সহকারী বলিয়া সাধনার অন্তরায়স্বরূপ হয়; কিন্তু অস্মিতা-বিনাশের পর, স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মস্বরূপে উপনীত হইবার সময়ে যে অঙ্গকম্পনাদি হইয়া থাকে, উহা আনন্দসূচক, বিক্ষেপকারক নহে। আত্মায় বিক্ষেপ বলিয়া কিছু নাই; বিক্ষেপ চিত্তেরই ধর্ম; সুতরাং এস্থলে অঙ্গকম্পনাদিরূপ বাহ্যবিক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলেও তাহাতে আত্মোপলব্ধির কিছুই ব্যাঘাত হয় না, বরং বিশেষ আনন্দোপলব্ধির সূচনা করে।

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ—পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইল। আত্মসাক্ষাৎকারের পর সত্য সত্যই বায়ুমণ্ডলকে পবিত্র ও আনন্দময় বলিয়া মনে হইতে থাকে। তখন মধুময় আনন্দময় প্রিয়তম আত্মার স্বরূপটি সর্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে, তাই সত্যদর্শী ঋষিদিগের সুরে সুর মিশাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—**'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'**। একটি গানেও শুনিয়াছিলাম—'তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় মধুময়।'

এইরূপ কেবল বাহ্যবায়ুমণ্ডলই যে পুণ্যময় আনন্দময় হয়, তাহা নহে, আভ্যন্তরিক প্রাণাদি পঞ্চবায়ুও তখন পবিত্র ও মধুময় হইয়া উঠে। ইতিপূর্বে আমরা এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই; সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইখানেই সংক্ষেপ উহার আলোচনা করিতে হইল। আন্তর বায়ু পাঁচটি, যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান। সাধারণতঃ ইহারা বায়ুরূপেই পরিচিত। বাস্তবিক

কিন্তু বায়ু ইহাদের অতি স্থূলরূপ। আমরা এখানে ঐ স্থূলরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে যাইব না; কারণ, উহার স্বরূপ, ক্রিয়া এবং স্থান অনেকেই জানেন। কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রাণাদির যে স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রাণাদি পঞ্চও করণবিশেষ। জীবের করণ দ্বিবিধ—অন্তঃকরণ এবং বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণ চারিটি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার। বাহ্যকরণ ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি পঞ্চ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে যথাক্রমে উক্ত ত্রিবিধ কারণ উৎপন্ন হয়। যেরূপ সত্ত্বগুণের করণ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে প্রকাশভাব প্রধান, এবং রজোগুণের করণ কর্মেন্দ্রিয়সমূহে ক্রিয়াভাব প্রধান; সেইরূপ তমোগুণের করণ বলিয়াই প্রাণাদির ধৃতিভাব প্রধান। প্রাণ বলিলে বহিরাগত বোধবিশেষের ধৃতিভাব বুঝায়। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে আভ্যন্তরিক বোধবিশেষ ফুটিয়া উঠে, সেই বোধের যাহা অধিষ্ঠান, তাহাকে ধরিয়া রাখাই প্রাণের কার্য। মনে কর—তুমি তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপান করিতেছ। এ স্থলে ঐ জলরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত কণ্ঠনালী প্রভৃতির সংস্পর্শবশতঃ পিপাসা নিবৃত্তিরূপ একটা বোধ ফুটিয়া উঠে; যে শক্তি ঐ বোধটিকে ধরিয়া রাখে, তাহাই প্রাণ।

শরীরস্থ মলাপনয়নের যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান, তাহাকে ধারণ করাই অপানের কার্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান, তাহাকে ধারণ করাই ব্যানের কার্য। এইরূপ শরীরস্থ রস-রক্তাদি ধাতুগত যে বোধ, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখাই উদানের কার্য, এবং অন্ন পানীয় দ্বারা শরীর গঠন করিবার যে শক্তি, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখাই সমানের কার্য। এই পঞ্চবিধ ধৃতিশক্তিদ্বারাই এই স্থূল শরীর গঠিত, স্থির এবং লয়প্রাপ্ত হয়। আবার উহারা যখন প্রতিলোমভাবে ক্রিয়া করে, তখনই স্থূলশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহারাও অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণ। এই পঞ্চ প্রাণশক্তিই প্রাণময় কোষের যথার্থ স্বরূপ।

সে যাহা হউক, মাতৃ-লাভের পর অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলে যে কেবল চিত্তেরই প্রশান্ত ভাব হয়, তাহা নহে; চিত্তের প্রসন্নতাহেতু যেরূপ জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণাদি পঞ্চভূতেরও প্রসন্নতা লাভ হয়। তাহার ফলে স্থূল শরীরটি পর্যন্ত আনন্দঘনরূপে বোধ হইতে থাকে। শরীরের প্রত্যেক পরমাণুটি যেন আনন্দের কণা, এইরূপ প্রতীতি হয়। শরীরস্থ বায়ুপ্রবাহ পুণ্যময় হওয়ার ইহাই লক্ষণ।

ওগো, একবার আত্মবোধে উপনীত হইলে—একবার আমার আদরিণী মায়ের কোলে উঠিলে, সত্য সত্যই এমনটি হয়। প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, এমন কি স্থূলদেহ পর্যন্ত এক অপূর্বরসে রসময় হইয়া পড়ে। অপার্থিব সে রস. অননুভূত তাহার আস্বাদন, বিস্ময়কর সে মিলনরহস্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তাহার স্বরূপ।

———o———

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্ জনিতস্বনাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ।

অনুবাদ। হোমাগ্নি সকল শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং উৎপাতসূচক দিগ্‌নিস্বনসমূহ প্রশান্তভাব ধারণ করিল।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সার্বণিক-মন্বন্তরীয় দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শুম্ভবধ।

ব্যাখ্যা। হোমাগ্নি শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব। ইতিপূর্বে উহা নানারূপ উৎপাত সূচনা করিত, এখন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্বে বাসনার অভিঘাত সুখদুঃখের অভিঘাত সাধকের চিত্তকে সর্বদাই চঞ্চল করিয়া রাখিত। সুতরাং শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব নানাভাবে পরিভাবিত হইয়া নানারূপ উৎপাতের সূচনা করিত। এখন সকলই শান্ত হইয়াছে। আমিত্ব নাই; সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতাও নাই। পূর্বে এই বিশ্বযজ্ঞ, এই কর্মযজ্ঞ অহংকর্তৃত্বরূপ বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, সকলই অশান্ত ও উৎপাতসূচক ছিল। এখন আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়ায়, সকলই ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। এখন কর্মমাত্রই **'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'** রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এখন হব্য হোতা অগ্নি হোম

এবং তাহার ফল, সকলই ব্রহ্মময়— সকলই আত্মময় ; সুতরাং কর্মযজ্ঞরূপ অনুষ্ঠানগুলি এখন আর অশান্তভাবে সম্পন্ন হয় না।

দিগ্‌নিস্বন— অমঙ্গলসূচক দূরাগত ধ্বনিবিশেষ । অহংবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, আত্মবোধ সমুদিত হইয়াছে, সর্বত্র এক মঙ্গলময় আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই ; সুতরাং দিগ্‌নিস্বন বা অমঙ্গলসূচক শব্দসমূহ সম্যক প্রশান্ত হইয়াছে । পূর্বে জাগতিক ঘটনাসমূহের ফলাফল বিচার এবং তজ্জন্য মঙ্গলামঙ্গলের বিচার ছিল, এখন আর সেভাব নাই। সকলই মঙ্গলময় । সকলই আত্মময় সকলই আনন্দময় ।

সাধক ! ইহাই আনন্দপ্রতিষ্ঠা । দেখ এই পাঁচটি মন্ত্রে সর্বত্র কেবল আনন্দের অভিব্যক্তিই বর্ণিত হইয়াছে । আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ঠিক এইরূপ সর্বত্র আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে । যতক্ষণ আমিত্ব বলিয়া একটা বিশিষ্ট জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ এই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না । কিন্তু মায়ের কৃপায় শুম্ভ নিহত হইলে—অস্মিতা বিলয়প্রাপ্ত হইলে, সাধকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ হয় । কোন অবস্থায় এ আনন্দ বিচ্যুত হয় না । চিত্ত-বিক্ষেপ, ভোগ ত্যাগ, রোগ-শোক, যে কোন অবস্থা আসুক না কেন, এ স্বরূপানন্দের বিচ্যুতি ঘটে না। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই । এক অভিন্ন পূর্ণ অথচ চির নবীন—নিত্য ভোগ করিয়াও ইহার নবীনত্ব অপনীত হয় না । এমন মধুর ! ইহাই বৈষ্ণবের ভাষায় নিত্য বৃন্দাবনে নবঘনশ্যাম—নিত্য তরুণ নিত্য লোভনীয়। এই আনন্দই সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, দেবীমাহাত্ম্যের চণ্ডিকা আর আমাদের মা ।

দেখ সাধক, তুমি আনন্দময়, তোমার ভোগ্য জগৎ আনন্দময় । তোমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় স্থূল শরীর পর্যন্ত আনন্দময়। আনন্দ দ্বারাই তুমি এবং এই বিশ্ব গঠিত। আনন্দই তোমার এবং এই বিশ্বের উপাদান। কোন অবস্থায় তুমি আনন্দ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হও নাই। তুমি ধন্য ! তুমি ধন্য ! বল— '**সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।**'

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় শুম্ভবধ।

———o———

শুম্ভবধ

ঋষিরুবাচ।

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্বিকাশিবক্ত্রাব্জ বিকাশিতাশাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—সেই যুদ্ধে দেবী কর্তৃক অসুরশ্রেষ্ঠ শুম্ভ নিহত হইলে, অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় অগ্নি প্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ উৎফুল্ল আননে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধবোধস্বরূপে অবস্থানকালে দ্বৈত-প্রতীতির অভাব বশতঃ স্তবাদি একান্ত অসম্ভব হইলেও, ব্যুত্থিত অবস্থায় বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে পুনরায় দেহাদি অনাত্মপ্রতীতি ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সে অবস্থায় স্তব স্তুতি অসম্ভব নহে ; বরং হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক।

শুম্ভ নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দরূপী দেবতাবৃন্দের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের অপহৃত যজ্ঞভাগ পুনরায় করতলগত হইয়াছে ; সুতরাং দেবতাবৃন্দের আনন্দের অবধি নাই। এখন তাহারা বিশিষ্ট চৈতন্য হইয়াও অখণ্ড চৈতন্যের সহিত একান্ত অন্বিত, অখণ্ড আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ ; তাই তাহাদের মুখমণ্ডলে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

যদিও ইন্দ্রই দেবতা প্রধান, তথাপি এস্থলে অগ্নি-দেবকেই পুরোগামী করা হইয়াছে। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি। স্তুতি বাক্য-সমষ্টি মাত্র ; সুতরাং বাগধিষ্ঠিত চৈতন্যকে অগ্রগামী করিতে পারিলেই স্তবাদি কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ অগ্নিদেবকেই প্রধান ভাবে স্তুতির নেতা করিলেন। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্ন না হইলে, স্তোত্রাদি পাঠ কখনও সত্য ও প্রাণময় হয় না।

সে যাহা হউক, দেবতাবৃন্দের পুষ্কল স্তোত্রধ্বনি দিক্‌সমূহকে পবিত্র করিয়া দিল, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের শুভ্র প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, দেবতাগণ ভক্তিবিনম্র মূর্তিতে কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী—জগদীশ্বরী। ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় বলিয়াই মা আমার কাত্যায়নী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। স্তবাদি সগুণ ব্রহ্মেরই ত' হইয়া থাকে।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে দেবি ! হে শরণাগত-জন-দুঃখহারিণি ! তুমি প্রসন্ন হও। হে অখিল জগতের জননি ! তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশরি ! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেবি ! তুমি এই বিশ্বকে রক্ষা কর। তুমিই যে চরাচরে (একমাত্র) অধীশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মাগো ! তুমি প্রপন্নজনের আর্তি হরণ করিয়া থাক। যাহারা তোমাকে একান্ত আশ্রয় জানিয়া তোমারই অভয় চরণে শরণ লয়, তাহারা যত বড় দুরাচার, যতবড় মূঢ়ই হউক না কেন, তুমি স্বয়ং তাহাদের সর্ববিধ আর্তি, সর্ববিধ কাতরতা, দীনতা বিদূরিত করিয়া থাক। মা ! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা যেন তোমার চরণে আশ্রয় লইতে পারি। ওগো ! আমাদের বুকে এমন বল নাই, আমাদের হৃদয়ে এমন বিশ্বাস নাই যে, তোমাকেই একান্ত আশ্রয় জানিয়া, নির্বিচারে তোমার অঙ্কে মা বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি। তথাপি তুমি আমাদিগকে তোমার আশ্রিত করিয়া লও। আর কেন পার্থিব বস্তুর আশ্রয়ে মিথ্যাভিমানের কল্পিত আমিটিকে পরিপোষণ করিতে যাইব ? যাহাতে সকল ছাড়িয়া একমাত্র তোমার শরণাগত হইতে পারি, তাহাই কর মা, তাহাই কর ; তুমি প্রসন্ন হও।

ওগো, তুমি যে অখিল জগতের মা সুতরাং আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়াই রহিয়াছ। আমরা কুপুত্র বলিয়া তুমি ত' আর কুমাতা হইতে পার না। আমরা অকপট প্রাণে মা বলিয়া তোমাকে ডাকি না, ডাকিতে পারি না। সেজন্য তুমি ত' আর আমাদিগকে দূরে ফেলিয়া দিতে পার না। তুমি যে আমাদের মা। হে বিশ্বেশ্বরি ! তুমি প্রসন্ন হইলেই আমাদের সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ওগো ! কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া শুধু তোমার প্রসন্নতাবিধানের জন্য কত ঘাত প্রতিঘাত, কত পেষণ সহ্য করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু কই, তুমি যে নিত্যপ্রসন্না, নিত্যতৃপ্তা, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি কই ! যতক্ষণ তোমার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই, ততক্ষণ তোমার প্রসন্নতা কিরূপে বুঝিব ? মা গো ! তোমার মুখ হইতে নির্গত শুধু একটি কথা শুনিবার জন্য কতকাল

ধরিয়া, কত নৈরাশ্য হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া, তোমার মুখপানে তাকাইয়া আছি—কত আঘাত সহ্য করিয়া জ্ঞানে, অজ্ঞানে, কপটে অপকটে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মা বলিয়া ডাকিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও মা ! একবার বল —'আমি বহু নয় আমি এক'। তোমার শ্রীমুখ নির্গত এই একটি বাণী শুনিতে পাইলেই ত' আমাদের জীবন ধন্য হয়, অনাদি জন্মের জীবত্ব-বন্ধন খুলিয়া যায়, তোমার প্রসন্নভাব আমাদের প্রতীতিযোগ্য হয়।

মা, তুমি বিশ্বেশরী, তুমিই এ বিশ্বকে রক্ষা কর। এ বিশ্ব যে তোমায় দেখিতে না পাইয়া তোমার সত্তা অনুভব করিতে না পারিয়া তোমার প্রসন্নতা বুঝিতে না পারিয়া, বহির্মুখে ধাবিত হইতেছে। দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওগো বাঁচাও ! রক্ষা কর ! এই বহির্মুখী তীব্রগতি হইতে এ বিশ্বকে বাঁচাও ! ধ্বংস হইতে রক্ষা কর ! কেন করিবে না, তুমি যে চরাচরের একমাত্র অধিশ্বরী। স্থাবর জঙ্গম যেখানে যাহা কিছু আছে, তুমিই যে, সে সকলের একমাত্র নিয়ন্ত্রী। তোমার জগৎকে তুমি রক্ষা না করিলে, আর কে করিবে মা ? তাই কাতরপ্রাণে বলিতেছি, ঠিক এমনি করিয়া প্রতিজীবে শুম্ভবধ করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে এ বিশ্বকে রক্ষা কর !

———○———

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥ ৩ ॥

অনুবাদ। তুমিই জগতের একমাত্র আধারস্বরূপা ; যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। আবার জলরূপে অবস্থান করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। মা, তোমার বীর্য অলঙ্ঘনীয়।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি যে আধার-শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী, তাহা তোমার মহীমূর্তি দেখিয়াই আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। মহীরূপে মৃত্তিকারূপে যাবতীয় পদার্থকে তুমি মায়েরই মতন বুকে করিয়া রহিয়াছ। কোন বিকার নাই, কোন বিকল্প নাই ; কোন্ অনাদি কাল হইতে তুমি মাটিরূপে মাটি সাজিয়া এই জীব জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছ। শুধু তাহাই নহে, আবার জলময়ী মূর্তিতে সকল জীবকেই আপ্যায়িত করিতেছ— স্নিগ্ধ করিতেছ। শস্যাদিরূপে ক্ষুধানিবৃত্তি, এবং জলরূপে তৃষ্ণানিবারণ করিয়া প্রতিনিয়ত মাতৃত্বের পরিচয় দিতেছ। মাতা যেরূপ স্তন্যপায়ী শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া, স্তন্যদানে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বিদূরিত করিয়া দেন, ঠিক সেইরূপ তুমিও মা মহীরূপে এই জীবজগৎকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপ্‌রূপে—রসরূপে প্রত্যেক জীবকে আপ্যায়িত করিতেছ। পরিপুষ্ট করিতেছ। মা ! একাধারে তুমি এই জগতের ধারণ এবং পোষণ করিয়া যে অতুলনীয় প্রভাবের পরিচয় দিতেছ, তোমার সে বীর্য প্রভাবকে ঈশ্বরাদিও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। মা, এইজন্যই তুমি অলঙ্ঘ্যবীর্যা।

স্ব-ই তোমার রূপ। তুমিত' আত্মা ! তথাপি তুমি মহীস্বরূপা অপ্‌স্বরূপা। সর্বভেদাতীত আত্মা তুমি, তথাপি স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতিরূপে জগতের ধারণ পোষণাদি কার্য সম্পন্ন কর। মা ! তোমার বীর্য যথার্থই অলঙ্ঘনীয়।

———○———

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, তুমি অনন্তবীর্যা, তুমি বিশ্বের বীজ, তুমি পরমা মায়া। হে দেবি ! তুমি এই সমস্ত জীবজগৎকে মুগ্ধ করিয়া রহিয়াছ ; আবার তুমি প্রসন্ন হইয়াই এ জগতের (জীবের) মুক্তি-হেতুস্বরূপা হও।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি বৈষ্ণবীশক্তি—সর্বব্যাপিনী জগৎ-পালনকারিণী মহতী স্থিতিশক্তি। এ বিশ্বের প্রতি পরমাণু তোমাতেই অবস্থিত। তুমি অনন্তবীর্যা। তোমার বীর্য-বিভবের সীমা নাই। মাগো ! যখন তুমি সর্বব্যাপিনী বৈষ্ণবীশক্তিরূপে সন্তানের নিকট আত্মপ্রকাশ কর, তখন সত্য সত্যই তুমি অনন্তবীর্যারূপে প্রতিভাত হইতে থাক। তোমার সে বীর্যপ্রভাবকে তখন অতিক্রম করা বা ইয়ত্তা করা একান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তুমি যে শুধু এই ব্যক্ত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি নামে অভিহিতা হও, তাহা নহে ; এই বিশ্বের বীজরূপে, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের আদিম কারণরূপে অব্যাকৃতিরূপেও তুমি অবস্থিতা। বীজরূপে তুমি পরমা, এবং বৈষ্ণবীরূপে তুমি মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাক। মা, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চরূপে— ব্যক্ত বিশ্বরূপে তুমি মায়া,

আর সৃষ্টির অব্যক্ত বীজস্বরূপে তুমি পরমা মায়া। সাংখ্যশাস্ত্র তোমার এই পরমা স্বরূপটিকে মূলপ্রকৃতি বলিয়াছে।

মা ! এই দ্বিবিধস্বরূপে তোমার দুই প্রকার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তুমি মায়ামূর্তিতে প্রকটিত হও, অর্থাৎ ব্যক্ত প্রপঞ্চরূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখন **'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ'** আর যখন পরমা মূর্তিতে প্রকটিতা হও, তখন **'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।'** এক মূর্তিতে ভোগবতী, অন্য মূর্তিতে তুমি মোক্ষদায়িনী। মায়া স্বরূপে তুমি সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখ —স্বকীয় স্বরূপটির উপলব্ধি করিতে দাও না। তখন জীব নানাভাবে তোমার মায়িক মূর্তি দর্শন করিয়া উহাকেই আয়ত্ত করিবার জন্য অভিধাবিত হয়। যাহারা রূপ-রসাদি কিংবা কামকাঞ্চনাদি বিষয়ের মোহে মুগ্ধ, তাহারা ত' প্রত্যক্ষভাবেই তোমাকর্তৃক সম্মোহিত। আর যাহারা তোমার শরণাগত না হইয়া, নানারূপ সাধনার অনুষ্ঠান করে, তাহারাও সিদ্ধি শক্তি যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন না কোন একটা লইয়া মুগ্ধ থাকে। মায়াবী মানুষ যেমন দুর্বল মানুষকে সম্মোহনমন্ত্রে আবিষ্ট করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপেই কোন্ অনাদিকাল হইতে তুমি এই জীববৃন্দকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ। তাহারা কিছুতেই ত' তোমাকে চাহিতে পারে না ; তোমার দেওয়া সাজগুলি খেলনাগুলি লইয়াই জীবনকে কৃতার্থ মনে করে। তোমাকে চাহিবার যে একটা প্রয়োজন আছে, তাহা ভাবিতেও পারে না। এমনই অজেয় মোহ। মা গো, এ যে তুমি ! তাই অজেয়। যদি তুমি ছাড়া অন্য কেহ এই মোহের রূপ ধরিয়া আসিত তবে এত চেষ্টা এত কঠোরতা করিয়া জীব তাহাকে নিশ্চয়ই বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এ যে অলঙ্ঘ্যবীর্যা মা তুমিই মোহরূপে দাঁড়াইয়া জীবের আত্মদর্শনের চক্ষু আড়াল করিয়া রাখিয়াছ। মা গো ! কতকাল— কতকাল এমনি করিয়া 'চোখবাঁধা বলদের মত' ঘুরাইবি ? একবার তোর সন্তানের 'চোখের ঠুলি' খুলে দে, তাহারা তোর অভয়পদ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুক।

মা গো, এই সম্মোহিনী মূর্তিতে যে তুমি ! তুমিই যে বিষয়ের সাজে, কাম কাঞ্চনের সাজে আসিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করিতেছ, ইহা বুঝিতে পারিলেই তুমি প্রসন্না হও—তুমি ধরা পড়। ধরা পড়িলেই তোমার মোহিনী মূর্তি অপসৃত হয়, নিত্য প্রসন্না মূর্তি উদ্ভাসিত হয় তখন আর কোন বিপদ থাকে না, কোন ভয় থাকে না। তুমিই তখন পরমা প্রকৃতিরূপে জননীরূপে স্নেহের জীবকে বক্ষে ধরিয়া মুক্তিমন্দিরে উপনীত হও। তাইত' দেখিতে পাই—দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া—একদিকে তোমার বিশ্বমোহিনী মূর্তি দেখিয়া **'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ'** বলিলেন, আবার মোক্ষদায়িনী প্রসন্নমূর্তি দেখিয়া **'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ'** বলিয়া তোমারই চরণে প্রণত হইয়া পড়িলেন। মা, তুমি প্রসন্ন হও ! তুমি যে নিত্য প্রসন্না মূর্তিতে নিয়ত আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, ইহা বুঝিতে দাও ! দেবতাদিগের মত আমরাও মা মা বলিয়া মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হই।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে দেবি ! এ জগতে সমস্তই বিদ্যা, এ সকল তোমারই ভেদ, অর্থাৎ বিভিন্ন মূর্তি ; এ জগতে সকলেই স্ত্রী সকলেই তোমার অংশরূপে বিদ্যমান। একমাত্র তুমিই মাতৃ-স্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, অতএব তোমার আর স্তুতি কি ? তুমি স্তব্যের পরে এবং উক্তির অর্থাৎ বাক্যের পরে অবস্থিতা (অথবা স্তব্যবিষয়ক পরাপরবাক্যরূপা যে স্তুতি, তাহা তোমার সম্বন্ধে একান্ত অসম্ভব)।

ব্যাখ্যা। পূর্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে—মায়ের প্রসন্নতা লাভ হইলেই সাধকের মুক্তিমার্গ উন্মুক্ত হয়। মা যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন সাধক এ জগৎকে কিরূপভাবে দর্শন করে, এ মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

হে দেবি—দ্যোতনশীলে ! **'জগৎসু সমস্ত বিদ্যা'** এ জগতে সমস্তই বিদ্যা। উপনিষৎ বলেন **'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা বিদ্যা'** যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই বিদ্যা 'জগৎসু'—অনন্ত জগতে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই বিদ্যা। মাগো ! যাহারা যথার্থ মুমুক্ষু হইয়াছে, যাহারা তোমার প্রসন্ন মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহারা সর্বত্র তোমার

বিদ্যাস্বরূপটিই দেখিতে পায়। জগতে অবিদ্যা নামে যাহা খ্যাত তাহাও যে বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, বিদ্যাই যে স্বল্পভাবে প্রকাশিত হইতে গিয়া, অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়, ইহা শুধু তাহারাই—তোমার তত্ত্বদর্শী সন্তানগণই উপলব্ধি করিতে পারে। তাই, তাহারা **'বিদ্যাঃ সমস্তাঃ'** বলিয়া এই সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি তোমারই চরণতলে প্রণত হইয়া পড়ে। প্রশ্ন হইতে পারে—সমস্তই যদি বিদ্যা, তবে শাস্ত্র অবিদ্যা শব্দে কাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই দেবতাগণ বলিলেন **'তব দেবি ভেদাঃ'**। যাহা, অবিদ্যা তাহা বিদ্যারূপিণী তোমারই ভেদ মাত্র—বিভিন্ন মূর্তি মাত্র। মাগো ! আমরা যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া বুঝিয়া লই, তাহা তোমারই বিভিন্ন মূর্তি। একা অদ্বিতীয়া সর্বভেদরহিতা তুমিই বিভিন্ন মূর্তিতে—বহুমূর্তিতে সমস্তরূপে—জগৎ-রূপে নিত্য অবস্থিতা। মা ! এ জগৎ তোমারই স্বগতভেদ। সুতরাং দেবতাদিগের নিকট সমস্তই বিদ্যারূপে[১] উদ্ভাসিত ; তাই তাঁহারা অবিদ্যারূপে বিদ্যাবিরোধিরূপে কিছুই দেখিতে পান না।

'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ' সমস্তরূপে জগৎরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহা স্ত্রী, অর্থাৎ তোমারই শক্তিমাত্র। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তুমিই পরমপুরুষ, আর সমস্তরূপে জগৎরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সমস্তই স্ত্রী—সে সমস্তই তোমার প্রকৃতি, তোমার শক্তি, তোমার ইচ্ছা, তোমার ব্যবহার। শক্তি যেরূপ শক্তিমানের সহিত অভিন্নভাবে সংস্থিত, ঠিক সেইরূপ এই প্রকৃতিরূপী জগৎ, পরমপুরুষ তোমার সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত। বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলন।

মা ! এ সমস্তই সকলা—তোমারই কলার অর্থাৎ অংশের সহিত নিত্য বিদ্যমান। সত্তারূপে চৈতন্যরূপে—অস্তি-ভাতিরূপে তোমারই কলা সর্বত্র বিদ্যমান। তাই দেবতাগণ বলিলেন—সমস্তরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহা সকলা। তোমার কলার সহিত বিদ্যমান না থাকিলে—তোমার সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত না হইলে, সমস্ত বলিতে কিছুই যে থাকে না। যদিও মা, কলা বলিতে—অংশ বলিতে তোমাতে কিছুই নাই, তুমি নিত্য পূর্ণ, তুমি অনংশ—তোমাতে অংশাংশী ভেদ নাই, তথাপি যতক্ষণ বিশিষ্ট প্রতীতি আছে, ততক্ষণ উহাকে অংশই বলিতে হয়। তাই শ্রুতিও এ জগৎকে তোমার একাংশে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মাগো ! এইরূপে যাহারা জগৎকে জগৎরূপে না দেখিয়া বিদ্যারূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, যাহারা এ সমস্তকে তোমারই ভেদরূপে তোমার প্রকৃতিরূপে তোমার কলারূপে অর্থাৎ অংশরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের নিকটই তোমার প্রসন্নময়ী-মাতৃ-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকে—**'ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ'**। মা তোমা কর্তৃক এ সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ।

সাধক ! এইবার প্রথম খণ্ডের লিখিত শক্তির কোলে সত্তাটির বিষয় স্মরণ কর। দেখ, জগৎময় একটিমাত্র অখণ্ড সত্তা রহিয়াছে। বৃক্ষ আছে, ফল আছে, ফুল আছে, আমি আছি, তুমি আছ, সে আছে, এই যে খণ্ড খণ্ড অস্তিগুলি, উহারা সেই এক অখণ্ড অস্তিরই পরিচয় প্রদান করে। সেই যে অখণ্ড সত্তা, তিনিই চিতিশক্তি, পুরুষ বা মা। ঐ সত্তাটি অজ্ঞেয়, অথচ 'জ্ঞ'স্বরূপ অগ্রাহ্য অথচ গ্রহীতৃস্বরূপ। যখন আমরা বিশিষ্টভাবে উহাকে বুঝিতে যাই, তখন ঐ অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই একটি শক্তি, অর্থাৎ স্ত্রীমূর্তি দেখিতে পাই। বৃক্ষ আছে—এস্থানে 'বৃক্ষটি' শক্তি, আর 'আছে' এইটি পুরুষ ; এইরূপ সর্বত্র। ঐ শক্তিটি কিন্তু পুরুষেরই শক্তি, অন্য কেহ নহে। সত্তা শক্তিমতী ; অথবা শক্তিই সত্তাময়ী। আচ্ছা এইবার দেখ, ঐ বৃক্ষ—ঐ নামরূপাকারে আকারিত শক্তি বা মা এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ জীব ! চারিদিকে মা ছাড়া আর কিছুই নাই ; বল—**ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ**। এইরূপ দেখিতে পারিলেই অর্থাৎ চিন্ময়ী মহাশক্তিকে এই অম্বারূপে—মা-রূপে দেখিতে পারিলেই ইহার প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। মাতৃ-প্রসন্নতা বুঝিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে

[১]যাঁহারা বিদ্যাশব্দের অষ্টাদশবিদ্যারূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। কারণ তাঁহাদের অর্থ ব্যাপ্য, আমাদের অর্থ ব্যাপক।

'ভুবি মুক্তিহেতুঃ'—ঐ মা-ই এ জগতে একমাত্র মুক্তির হেতু, ঐ মা-ই তোমায় কোলে করিয়া মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হইবে। তুমি ধন্য হইবে।

এইরূপ স্তব করিতে করিতে দেবতাগণ বিশ্বময় মাতৃ-মূর্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বলিতে হইল 'কা তে স্তুতি', ওগো ! তোমার আবার স্তুতি কি করিব ? সবই যে তুমি। তুমি ছাড়া কিছুই যে নাই ; সুতরাং তুমি 'স্তব্যপরা' স্তব্যের পরপারে অবস্থিতা। স্তুতির দ্বারা তোমার স্বরূপ বা আরোপিত গুণ বর্ণিত হয় না ; কারণ তুমি যে ইহার অনেক উপরে ; কেবল তাহাই নহে, স্তুতি করিতে হইলেই উক্তি বা বাক্যের প্রয়োজন ; কিন্তু তুমি যে, 'পরোক্তিং' উক্তির অর্থাৎ বাক্যেরও পরপারে অবস্থিতা অবাক্‌গোচরা—**'ন তত্র বাক্ গচ্ছতি।'** সুতরাং যে দিক দিয়াই যাই তোমার স্তুতি একান্ত অসম্ভব। তথাপি কিন্তু মা ! আমরা বাগ্‌বিশুদ্ধির জন্য তোমার স্বরূপ, তোমার মহিমা বালকের ন্যায় কথঞ্চিৎ কীর্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। তুমি ক্ষমা কর, মা ক্ষমা কর !

———○———

সর্বভূভা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি যখন সর্বস্বরূপা দ্যোতনশীলা স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী, তুমি যখন নিত্যস্তুতা, তখন তোমার এমন কি স্তব সম্ভব হইতে পারে, যাহাতে সেই স্তুতি পরমোক্তি অর্থাৎ যথার্থ বাক্যযুক্ত হইবে ?

ব্যাখ্যা। মাগো ! মনুষ্যপক্ষে, আরোপিত গুণবর্ণনার নাম স্তুতি। তোমাতে এমন কোন গুণের অভাব নাই, যাহার আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। দেবতাপক্ষে, স্বরূপবর্ণনাই স্তুতি। তোমার পক্ষে, তাহাও অসম্ভব ; কারণ তোমার স্বরূপ তুমি ব্যতীত আর কেহ জানে না, জানিতে পারে না, অথবা জানিবার জন্য দ্বিতীয় কেহ থাকে না। **'বেত্তাসি' 'বেদ্যঞ্চ' 'স বেত্তি বিশ্বং নহি সত্য বেত্তা'** তোমার স্বরূপবেত্তা দ্বিতীয় কেহই নাই। সুতরাং সর্বপ্রকারেই স্তুতি একান্ত অসম্ভব। তুমি সর্বস্বরূপা দ্যোতনশীলা, স্বভাবতঃই তুমি স্বর্গমুক্তিদায়িনী, স্বভাবতঃই তুমি নিত্যস্তুতা ; তোমার আবার স্তুতি কি হইতে পারে ? বাক্যমনের অগোচরা তুমি ; সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিতে যাইব, তাহা কখনও 'পরমোক্তি' হইতে পারে না।

———○———

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে দেবি নারায়ণি ! তুমি সর্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গ এবং মোক্ষদায়িনী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মাগো ! তোমার স্তব করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। তাই প্রণামের অভিনয় করিতেছি। যথার্থ প্রণাম যে কবে করিতে পারিব, তাহা তুমিই জান। কবে যে তোমাকে প্রণাম করিতে গিয়া, আর এ দেহ মন ইন্দ্রিয়ে প্রত্যাবর্তন করিব না, কবে যে তোমাকে প্রণাম করিতে গিয়া, তোমার পরম ধামে—কৈবল্যধামে স্থান লাভ করিব, তাহা তুমিই জান মা। যথার্থ প্রণাম না করিতে পারিলেও, আমরা প্রণামের অভিনয় করিতে চেষ্টা করিব তারপর তোমার যেদিন ইচ্ছা হইবে, সেইদিন যথার্থ প্রণত করাইয়া লইও।

মা, তুমি সর্বজীবের অন্তরে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা। যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি একদিকে জগৎসংস্কার এবং অন্যদিকে নির্গুণ আত্মার প্রতিচ্ছায়া পরিগ্রহপূর্বক সর্ব জীবের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বুদ্ধিরূপেও তুমি মা ! তোমাকে বুদ্ধিরূপে পাইবার জন্যই ত' ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় **'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'** বলিয়া তোমার নিকট ধী ভিক্ষা করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধি যখন সত্ত্বগুণ-প্রধান হয় —নির্মল হয় তখন ইহার একদিকে স্বর্গ অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য, এবং অন্যদিকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি-স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয় ! জীবন্মুক্ত সাধকগণ এই বুদ্ধিতে অবস্থান করিয়াই একদিকে স্বর্গভোগ, অন্যদিকে জগদতীত সত্তার—অপবর্গের আভাস সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাই, তুমি বুদ্ধিরূপে স্বর্গাপবর্গদায়িনী মা। তুমি নারায়ণী, প্রতি নরে— প্রতিজীবে এই বুদ্ধিরূপে তুমিই অবস্থান করিতেছ। নরসমূহ যাহাকে অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, সেই নারায়ণী তুমি। তুমি নারায়ণী তাই আমি নর। হে নারায়ণি ! তোমাকে

প্রণাম— কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। প্রণাম গ্রহণ কর মা, প্রণাম গ্রহণ কর !

———○———

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। তুমি কলা কাষ্ঠাদিরূপে (কাল-পরিচ্ছেদ-রূপে) জগতের পরিণাম সাধন করিয়া থাক। তুমিই এই বিশ্বের সংহারকারিণী শক্তি ; তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি কালমূর্তিতে নিয়ত বিশ্বের পরিণাম অর্থাৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছ। কলাকাষ্ঠাদি তোমার সেই অখণ্ড কালমূর্তির কল্পিত বিভাগ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, এইরূপে পল দণ্ড মুহূর্ত দিবস সপ্তাহ মাস ঋতু সংবৎসর যুগ কল্প প্রভৃতি, কতই না কল্পিত বিভাগ আছে। মা, তোমার কালমূর্তি অখণ্ড— অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, আমরা তাহার সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য, পূর্বোক্ত প্রকারে কলা-কাষ্ঠাদিরূপে কতই পরিচ্ছেদ করিয়াছি। সেই পরিচ্ছিন্ন কালরূপে তুমি এই জীব-জগতের নিয়ত পরিবর্তন সাধন করিতেছ। এই কালরূপে তুমি পরিণামের ভিতর দিয়া বিশ্বের উপরতি অর্থাৎ প্রলয় সাধন করিয়া থাক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি ঈশ্বরগণেরও প্রলয়কারিণী তুমি। তোমার নিকট বিশ্বের উপরতি অতি তুচ্ছ। মা তুমি অসীম-শক্তি-সম্পন্না হইয়াও প্রতিনরে নারায়ণী-মূর্তিতে— ব্যষ্টি মাতৃ-মূর্তিতে অবস্থান করিতেছ ; তুমি সমগ্র জগতের মা হইয়াও প্রতিনরের মা, তাই তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

———○———

সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, তুমি শিবা (মঙ্গলময়ী) তুমি সর্বাভীষ্টসাধিকা। তুমি শরণ্যা (আশ্রয়ণীয়া) তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মঙ্গল শব্দের অনেক অর্থ আছে। অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নাম মঙ্গল, সকলের যাহা মঙ্গল, তাহাই মঙ্গল্য (স্বার্থে য প্রত্যয়)। অথবা এ জগতে যত কিছু মঙ্গল আছে, তাহাদেরও যিনি মঙ্গল বিধান করেন, তিনিই সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা। লৌকিক মঙ্গল আটটি। ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, হিরণ্য, সর্পিঃ, আদিত্য, অপ এবং রাজা ; এই অষ্টবিধ মঙ্গলই সর্বমঙ্গল শব্দের অর্থ। মা আমার এই সকলেরও মঙ্গল-বিধানকারিণী ! অথবা সর্ব শব্দের অর্থ শিব ; তাহার মঙ্গলবিধায়িনী। এই সকল অর্থ ব্যতীত আমরা সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা শব্দের আর একটি অর্থ বুঝিয়াছি—সর্বই মঙ্গল, তাহার মঙ্গল-বিধায়িনী। সর্বরূপে যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, তাহা মিথ্যা হউক, ভ্রান্তি হউক, জড় হউক, তাহা যে চিৎ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে সাধক ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন তাহার নিকট সর্বই মঙ্গলরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। একমাত্র চিৎ বস্তুই ত' মঙ্গল, চিৎ ব্যতীত যাহা কিছু তাহা সমস্তই অমঙ্গল। চৈতন্যের বিকাশ থাকে বলিয়াই জীব জীবিত অবস্থায় মঙ্গলস্বরূপ ; তাই জীবিত মনুষ্যের নামের পূর্বে মঙ্গলসূচক শ্রী শব্দের প্রয়োগ হয়। গতপ্রাণ জীব যে অমঙ্গল-স্বরূপ, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, সর্ব যখন চিৎস্বরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখন সকলই মঙ্গলময় হয়। তখন আর অমঙ্গল বলিয়া কিছুই থাকে না। সে মঙ্গলের যিনি মঙ্গল বিধানকর্ত্রী,—যাঁহার মঙ্গলময় প্রকাশে 'সর্ব' প্রকাশিত তাঁহাকেই আমরা সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে বলিয়া আহ্বান করিতেছি। যাঁহার— যে সচ্চিদানন্দময়ীর অনুপ্রবেশে সর্বের মঙ্গলময় ভাব, তিনি সর্বমঙ্গলবিধায়িনী হইয়াও স্বয়ং মঙ্গলময়ী ; তাই দেবতাগণ শিবে বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। মাগো ! জীব যখন তোমাকে এইরূপভাবে সর্বাবস্থায় মঙ্গলদায়িনী বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই সর্বাভীষ্ট-সাধিকারূপে তোমার প্রকাশ হয়, জীবের অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। জীব তখন পূর্ণকাম হইয়া তোমাতে মিলাইয়া যায়।

মা ! তুমিই শরণ্য— জীবের একান্ত আশ্রয়ণীয়। ত্র্যম্বকে ! ত্রিনয়নে ! চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিরূপ ত্রিনেত্র লইয়া, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ প্রকাশ লইয়া, নিত্যই তুমি বিরাজ করিতেছ। আবার স্মৃতি, কল্পনা ও আশারূপ —ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ কালত্রয়দর্শী ত্রিনেত্রবিশিষ্ট হইয়া, তুমি নিত্যই বর্তমান রহিয়াছ। মা তুমি গৌরী, অতি

মনোহরা, অতি সুন্দরী, অতি সৌম্যা। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিস্বরূপা; তুমি ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপা হইয়াও স্বয়ং গুণময়ী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম!

ব্যাখ্যা। চৈতন্যময়ী মা! শক্তিই যে তোমার স্বরূপ, তাহা এই জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিক্ষণে তোমার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়মূর্তি দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমাকে ধরিবার বা বুঝিবার যদি কিছু থাকে, তাহা এই ত্রিবিধ প্রকাশ। তুমি সনাতনী, তুমি নিত্যা, অব্যক্তস্বরূপা হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়মূর্তিতে সর্বত্র উদ্ভাসিত রহিয়াছ। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে— মহাকালী হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হইয়াছে, মা সত্যই ত' তোমা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। এই ত্রিশক্তি বাস্তবিক বিভিন্ন তিনটি শক্তি নহে, একই মহতী চিতিশক্তির ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র। সেই শক্তির স্বরূপটি যে কি, তাহা একান্ত অব্যক্ত হইলেও, এই ত্রিবিধ স্পন্দন-দ্বারাই উহার সত্তা উপলব্ধিযোগ্য হয়। মাগো তোমার এই অব্যক্ত শক্তিস্বরূপটি যেরূপে ব্যক্তভাবাপন্ন হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ বলিলেন—তুমি গুণাশ্রয়া তুমি গুণময়ী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণকে আশ্রয় করিয়াই তোমার এই ত্রিবিধ স্পন্দন। অথবা তোমার স্বেচ্ছাকৃত এই ত্রিশক্তিই ত্রিগুণ আখ্যায় অভিহিত হয়। গুণত্রয় যখন তোমার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী হইয়া নারায়ণী মূর্তিতে আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখ। মা তোমাকে প্রণাম। মাগো! আমাদিগকে এই গুণময় অবস্থা হইতে তোমার সেই সনাতন স্বরূপে—যেখানে এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রিবিধ আবর্তন নাই, সেইখানে লইয়া চল মা, সেইখানে লইয়া চল!

শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি শরণাগত দীন এবং আর্তজনের পরিত্রাণপরায়ণা। তুমি সকলের আর্তিহরণকারিণী দেবী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা গো! যে দিন জীব তোমার চরণে শরণাগত, তোমার অভাবে দীন এবং তোমার বিরহে আর্ত হইতে পারে, সেই দিনই তোমার পূর্বোক্ত ত্রিশক্তিময়ী স্বরূপটির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেই দিন তুমিও মা সত্য সত্যই পরিত্রাণপরায়ণা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবের সকল আর্তি দূর করিয়া দাও তখন জীবের জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারার্তি, অনন্ত জীবনের কাতর ক্রন্দন চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

মা, তোমার চরণে শরণাগত হইতে পারিলেই জীব তোমার প্রথম শক্তির অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় স্বরূপটির অবধারণ করিতে পারে। তুমিই যে একমাত্র আশ্রয়, তোমার সত্তায়ই জগতের সত্তা, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সত্য সত্যই সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তোমার শরণাগত হয়, তোমার সত্ত্বগুণময় স্বরূপটির উপলব্ধি করিতে পারে।

তারপর জীবের দীনতা আসে। অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী তোমার—কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী তোমার লীলাবিলাস দর্শন করিলেই জীবের স্বকীয় দীনতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমি যে কত দীন, কত অভাবগ্রস্ত, জীব তাহা বুঝিতে পারে। 'আমার মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী', ইহা বুঝিতে পারার নামই তোমার দ্বিতীয় শক্তির অর্থাৎ রজোগুণময় স্বরূপের উপলব্ধি। নিজের দীনতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আসিলেই, মাতৃ-ঐশ্বর্য বোধ করা যায়। না না, মাতৃ-ঐশ্বর্যের অনুভূতি আত্ম-দীনতা প্রতীতি হেতু। মা জীব সন্তানগণকে তোমার চিৎস্বরূপটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্যই ত' তোমার রজোগুণময়ী এই ঈশ্বরী-মূর্তির বিকাশ।

তারপর আর্ত। তোমার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় স্বরূপটির উপলব্ধি করিতে হইলে জীবকে আর্ত হইতে হয়। এ জগতের কোন বস্তুতে যে আনন্দ নাই, আনন্দের খনি যে একমাত্র তুমি, ইহা বুঝিতে পারার বহির্লক্ষণই ত' জীবের আর্তভাব। তোমার অভাবজন্য যে বিরহবেদনা তাহাই ত' যথার্থ আর্তি। ঐরূপ আর্তভাব উপস্থিত

হইলেই জীব তোমার আনন্দ-স্বরূপটি বা তমোগুণময়ী মূর্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়, নিরানন্দের পরপারে চলিয়া যায়।

মা, যখন আমরা **'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ'** বলিয়া একান্ত নিরাশ্রয়বোধে তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লই— শরণাগত হই, অর্থাৎ আমি যে তোমারি একান্ত আশ্রিত, এ কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারি, তখনই তোমার সৎস্বরূপটি আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয় —আমরা সত্যপ্রতিষ্ঠ হই। তারপর ব্রহ্মাণ্ডময় তোমার অনন্ত ঐশ্বর্যবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া, যখন আমরা স্বকীয় দীনতা বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি, যখন উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার সেই ঐশ্বর্যসম্ভার লাভ করিবার জন্য লালায়িত হই, তখনই তোমার চিৎস্বরূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র তোমাকে প্রাণরূপে— চৈতন্য-রূপে দর্শন করিয়া আমরা প্রাণপ্রতিষ্ঠ হই। আর সর্বশেষে যখন এই জন্ম মৃত্যু, এই দেহ-ধারণ, এই চাঞ্চল্য যথার্থই প্রাণের ভিতর একটা আর্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তখনই দেখিতে পাই— তুমি আনন্দঘন মূর্তিতে নিত্যই উদ্ভাসিত রহিয়াছ। তোমাতে বা আমাতে আনন্দের অভাব বা চাঞ্চল্য কোনকালেই নাই। তুমি আমি নিত্য স্থির, নিত্য আনন্দময়। হে আমার মা, হে নারায়ণি, হে আর্তিহারিণী, তোমাকে প্রণাম। তুমি আমাদিগকে এইরূপে প্রথমে শরণাগত দীন এবং আর্ত করিয়া লও, তারপর সত্যে প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের প্রণাম সার্থক হউক। মা গো ! যতদিন আমাদের মধ্যে ঐ তিনটি লক্ষণ প্রকাশিত না হইবে, ততদিন ত' তোমার পরিত্রাণপরায়ণা মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার আশাই নাই ! তাই তুমি এ অকৃতী সন্তানকে তোমার আত্মপ্রকাশের যোগ্য করিয়া লও—শরণাগত দীনার্ত করিয়া লও।

———○———

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী ।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে ।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাণীরূপ ধারণপূর্বক কমণ্ডলুস্থিত কুশপূত বারি ক্ষরণ করিয়া থাক। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম। তুমি ত্রিশূল, চন্দ্র এবং সর্প ধারণ করিয়া মহাবৃষভে আরোহণপূর্বক মাহেশ্বরীস্বরূপে আবির্ভূত হও। হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম। তুমি ময়ূর-পুচ্ছ পরিশোভিতা মহাশক্তিধারিণী কৌমারীরূপে প্রকাশিত হও। হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি ব্রহ্মাণী। বিরাট মনরূপে এই বিশ্বকল্পনা তুমি ধারণা করিয়া রাখ। জীবভাবীয় ব্যষ্টি মন তোমার হংসযুক্ত বিমান। কৌশাম্ভঃ (কমণ্ডলুস্থিত কুশপূত বারি) ক্ষরণ করিয়া থাক। বিরাট কর্মাশয় হইতে যেরূপ সঙ্কল্প-শক্তির অনুপ্রেরণা কর, জীব-কর্মাশয় হইতে সেইরূপ কর্মেরই স্ফুরণ হয়। তুমি জীবকে যখন যেরূপ কর্মের সম্মুখীন কর, জীব তখন সেইরূপ কর্মে অভিমান করে। তোমার এই কৌশাম্ভঃক্ষরণ ব্যতীত জীবের কর্মপিপাসার নিবৃত্তি হয় না ! তুমি দেবী দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশরূপা নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা-গো ! তুমি মাহেশ্বরী মূর্তিতে ত্রিপুটিজ্ঞানরূপ ত্রিশূল, মনোরূপ চন্দ্র এবং কুলকুণ্ডলিনীরূপ অহি ধারণপূর্বক ধর্মরূপী মহাবৃষভে আরোহণপূর্বক আবির্ভূত হও। তুমি প্রতি নরেই এইরূপে আত্মপ্রকাশ কর, হে নারায়ণি তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

মা, তুমি ময়ূর-কুক্কুটবৃতা— ময়ূরপুচ্ছ অথবা শ্রেষ্ঠ ময়ূরপরিশোভিতা। (কুক্কুট শব্দের অর্থ পুচ্ছ অথবা শ্রেষ্ঠ)। মা, জীব যখন ময়ূরধর্মী হয়—কুটিলবৃত্তিরূপ ভুজঙ্গগুলিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন শ্রেষ্ঠ ময়ূর পরিশোভিত কৌমারীরূপে আবির্ভূত হইয়া, অমর-সৈন্যগণের পরিচালন ভার গ্রহণপূর্বক অসুরকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হও। জীবসন্তান তখন অসুরভীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। মা, তুমি স্বয়ং অনঘা—অঘরহিতা ; তাই তোমার দর্শনে জীবও অনঘ হয়—নিষ্পাপ হয়। ভেদ জ্ঞানের নামই অঘ, দ্বৈতপ্রতীতিই যথার্থ পাপ। মা, তোমার দর্শনে জীবের দ্বৈতপ্রতীতির বিলয় হয়। জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। জীবত্বরূপ পাপ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

———○———

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শার্ঙ্গধনুরূপ শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী, তুমি প্রসন্ন হও। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি বরাহরূপে ভীষণ মহাচক্র ধারণ এবং দংষ্ট্রাদ্বারা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ। হে শিবে, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি অতি উগ্র নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক দৈত্যকুলকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তুমি ত্রৈলক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, বৈষ্ণবী বারাহী এবং নারসিংহী, এই তিনরূপেই আমরা বিষ্ণুশক্তিরূপিণী তোমার বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মহাপ্রাণরূপিণী মহতী স্থিতিশক্তি তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শার্ঙ্গ ধনুঃ ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত নাদময় এই সংসারচক্রকে স্নেহময় প্রণবাকর্ষণে দিন দিন মোক্ষাভিমুখী করিতেছ। সূরিগণ অহর্নিশ তোমার এই বিশ্বব্যাপী পরমপদকে আকাশব্যাপী দৃক্‌শক্তির ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। সাধকগণও আচমনের সাহায্যে স্বকীয় ব্যষ্টিভাবটিকে তোমারই পরমপদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। তুমি নারায়ণী, প্রতি নর তোমারই একান্ত আশ্রিত ; তোমার চরণে কোটি প্রণাম। প্রসীদ—তুমি প্রসন্ন হও।

মা, তুমি যদি বারাহী-মূর্তিতে প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন এই বসুন্ধরাকে উদ্ধার না করিতে, অর্থাৎ অব্যক্ত—বিশ্ববীজকে ব্যক্ত অবস্থায় আনয়ন না করিতে, তবে এই বসুন্ধরা, এই চরাচর কতকাল যে অজ্ঞান তিমিরে সুষুপ্ত থাকিত, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? জীবসমূহ কামকর্মময় এই স্থূলভাবকে অবলম্বন করিয়াই যে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে মঙ্গলের দিকে— মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা তোমারই কৃপা। তুমি শিবা—মঙ্গলময়ী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মাগো ! এই বারাহীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই তোমার নারসিংহী মূর্তির স্বরূপটি আমাদের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠে। ওঃ ! সে কি উগ্ররূপ মা ! দৈত্যকুল নিহত হইল, হিরণ্যকশিপুর স্থূল দেহটি পর্যন্ত তুমি স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলে, ত্রিলোক অসুর-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

মা, একদিন তুমি প্রহ্লাদের প্রবল সত্যজ্ঞানের প্রভাবে জড় স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া স্বকীয় চৈতন্যময় স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত করিয়াছিলে। আর আজ এই জড়ত্বের যুগে, এই অনুভূতিহীন প্রাণহীন মৃত-কর্মানুষ্ঠানের যুগে, তুমি একবার সত্য মূর্তিতে প্রকটিত হও। জীবের জড়বুদ্ধিরূপ স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া চৈতন্যময় আত্মস্বরূপটি উদ্‌ভাসিত কর, জীবের সংশয় তিরোহিত হউক। মানুষ জড়ত্বের মোহ পরিত্যাগ পূর্বক চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হউক ; আবার সত্যের প্রাণের এবং আনন্দের প্রবাহ আসিয়া জগৎকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিউক। জগৎ আবার সত্য সত্যই দেবতাবৃন্দের ন্যায় তোমাকে নারায়ণী-মূর্তিতে সর্বত্র সর্বদা দর্শন করিয়া 'নমোঽস্তু তে' বলিয়া প্রণত হউক ! মা, সন্তানের এ আশা কতদিনে পূর্ণ হইবে ?

কিরীটিনী মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮ ॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি কিরীটধারিণী, সহস্র-নয়ন-পরিশোভিতা বৃত্রপ্রাণ-হরণকারিণী ইন্দ্রাণী। তুমি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি শিবদূতী-রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যসেনাগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি ভয়ঙ্করী এবং ঘোর নিনাদকারিণী। তুমি নারায়ণি, তোমায় প্রণাম। হে চামুণ্ডে ! তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা, তোমার বিভূষণ নরমুণ্ডমালা, তুমি মুণ্ডাসুর মথনকারিণী, তুমি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, নির্মল জ্ঞান-রত্নস্বরূপ কিরীট তোমার শিরোভূষণ ; তাই তুমি কিরিটিনী। আবার তুমিই মহাব্রজধারিণী। শ্রুতিও বলেন—'**মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্**'।

মা তুমি মহদ্‌ভয়রূপ বজ্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারই ভয়ে সূর্য উদিত হয় তোমারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তোমারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তোমারই ভয়ে মৃত্যু ধাবিত হয়, তোমারই প্রশাসনে এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। এই ত' মা তোমার বজ্রধারিণী মূর্তির স্বরূপ।

তুমি সহস্র নয়নোজ্জ্বলা। অসংখ্য নেত্র তোমার —বিশ্বতশ্চক্ষু তুমি মা, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণুটি পর্যন্ত তোমার সে চক্ষুতে—সে দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ! তোমার অগোচর কোথাও কিছু নাই। মা, তোমার স্নেহের সন্তান মনুষ্যগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সত্যচ্যুত হইয়া, অসত্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, তোমাকে লুকাইয়া কোন কাজ না করে। তুমি যে বিশ্বতশ্চক্ষুরূপে সর্বত্র অবস্থিত, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও তোমার সর্বপ্রকাশক দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে, এই কথাটা স্মরণ রাখিতে পারিলে, আর কেহ অসত্য পথে ধাবিত হইবে না, সকলেই সত্যপরায়ণ হইবে ; সুতরাং সকলেরই হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যাইবে।

মা, তুমি বৃত্রপ্রাণহারিণী ইন্দ্রাণী। অনাত্মবোধরূপী বৃত্রাসুর তোমারই বজ্রপ্রহারে নিহত। ব্রাহ্মণের অস্থিদ্বারা নির্মিত তোমার বজ্র। ব্রাহ্মণই মূর্তিমান্ ব্রহ্ম— জগতের একমাত্র ধর্তা। মা, এই ব্রাহ্মণের অস্থি না হইলে, তোমার বজ্র নির্মিত হয় না। ব্রাহ্মণের স্থূল শরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশটি পর্যন্ত নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত—বিশুদ্ধ। সুতরাং কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই যে ব্রাহ্মণগণ জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে ; তাঁহাদের ভৌতিক দেহের অস্থি পর্যন্ত অসুরভাবের বিনাশ করিতে সমর্থ— জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ। শুধু এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই কি তুমি ব্রাহ্মণের অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া অসুর নিধন করিয়াছিলে ? সত্যই মা ব্রাহ্মণের অস্থি ব্যতীত অসুরঘাতক বজ্র নির্মিত হয় না। তাই ত' জগতে অদ্যাপি একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অসুরঘাতনে সমর্থ। ব্রহ্মজ্ঞানের আচার্যরূপে— আসুরিক ভাবসমূহের দলনকারীরূপে এ জগতে একমাত্র ব্রাহ্মণই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। মা-গো ! ব্রাহ্মণই তোমার এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের গৌরবনিকেতন। তুমি যে মা, তাহা তোমার এই ব্রাহ্মণ-সন্তান দ্বারাই জগতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রাণী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি শিবদূতী। শুম্ভবধের প্রাক্কালে তুমি ঈশানকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া, জগতে শিবদূতী নামে আখ্যাত হইয়াছ। ভীষণ অসুর-সংগ্রামে তুমি অসংখ্য অসুর নিধন করিয়াছ। তোমার ঘোরামূর্তি দর্শনে ও ভয়ঙ্করনাদ শ্রবণে একান্ত সন্ত্রস্ত অসুরভাবসমূহ অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হয়। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি চণ্ডমুণ্ডের নিধনকারিণী চামুণ্ডা। তোমার দংষ্ট্রাকরালমুখমণ্ডলে দ্বৈতপ্রতীতিরূপ দৈত্যকুল প্রবিষ্ট হইয়া, সাধকের অদ্বয়জ্ঞানপ্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়। তুমি পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিনী পঞ্চাশৎমাতৃকাবর্ণরূপ নরশিরোমালা তোমার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি এইরূপে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী প্রভৃতি অষ্টশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া, আমাদের ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশরূপী অসুরকুলকে বিলয় করিয়া দাও। আবার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষাকেও বিমর্দিত করিয়া—সুদুর্লভ ঈশ্বরত্ব-লাভের প্রলোভনকেও বিদূরীত করিয়া, আমাদিগকে অদ্বয়তত্ত্বে—বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে উপনীত কর। মা, তোমার এই অষ্টবিধ শক্তির প্রকাশ জীবত্বের অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া, ঈশ্বরত্বের অষ্ট ঐশ্বর্যকে তৃণীকৃত করিয়া, আমাদিগকে মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে উপনীত করে। তুমি প্রতি নরে এইরূপভাবে স্নেহময়ী জননীরূপে আত্মপ্রকাশ কর ; তাই তুমি নারায়ণী ! তোমার চরণে কোটি প্রণাম। আশা আছে—একদিন তুমি সত্য সত্যই প্রতি জীবে এই নারায়ণী মূর্তিতে দেখা দিবে।

———o———

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহাঽবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। তুমি লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা ধ্রুবা মহারাত্রি এবং মহা-অবিদ্যা ; তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম। মা, তুমি মেধা সরস্বতী বরা ভূতি বাভ্রবী তামসী এবং নিয়তা, তুমি প্রসন্ন হও। হে ঈশে, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি লক্ষ্মী—প্রাণরূপিণী সৌন্দর্যরূপিণী,

সম্পদরূপিণী, তুমি লজ্জা— নিন্দিতকার্য-বৈমুখ্যরূপা, তুমি মহাবিদ্যা—কালী তারাদি দশমহাবিদ্যা, অথবা মহতী শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা—সত্যনিষ্ঠা, গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপা, তুমি পুষ্টি—পঞ্চকোষের পরিপূর্ণতা-রূপিণী, তুমি স্বধা— শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্যরূপা, তুমি ধ্রুবা —নিশ্চলা, তুমি মহারাত্রি—প্রলয়রূপা অজ্ঞানরূপা, তুমি মহা-অবিদ্যা—অনাত্মপ্রত্যয়রূপা, তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি, ব্রহ্মবিদ্যাধারণের সামর্থ্যরূপা তুমি সরস্বতী— বিশুদ্ধজ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি বরা— শ্রেষ্ঠা বরপ্রদা, তুমি ভূতি— সত্ত্বগুণস্বরূপা, তুমি বাভ্রবী—রজোগুণস্বরূপা, তুমি তামসী—তমোগুণ-স্বরূপা, তুমি নিয়তা— নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা। মা তুমি প্রসন্না হও। তুমি ঈশা—ঈশ্বরী, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী হইয়াও, প্রতি নরে বিশিষ্টভাবে নারায়ণী-মূর্তিতে বিরাজিতা। তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

———○———

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবী নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। হে দেবী ! তুমি সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী, এবং সর্বশক্তি-সমন্বিতা। তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে দুর্গে দেবী ! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া তোমার ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, এবং লক্ষ্মী লজ্জা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। 'প্রসীদ' বলিয়া কাতর প্রাণে তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়াছেন। এইবার 'সর্বস্বরূপে সর্বেশে' বলিয়া তোমার প্রসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। তুমি প্রসন্ন হইলে জীবের নিকট তোমার যে তিনটি স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়, এইবার তাহা স্মরণ করিয়া দেবতাগণ প্রণাম করিতেছেন।

মা, তুমি সর্বস্বরূপা। আমাদের পরিদৃশ্যমান এই যে সর্ব, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমরা যে বহুত্বের বা সর্বত্বের অনুভব করি, এই সর্বই তোমার প্রথম স্বরূপ। ইহাই তোমার স্থূলদেহ। যে সন্তান তোমার এই সর্বস্বরূপ মূর্তিকে সত্য সত্যই তোমার স্থূলদেহরূপে পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহারই নিকট তোমার দ্বিতীয় স্বরূপ সর্বেশ্বরী মূর্তিটি উদ্ভাসিত হয়। এই সর্বের—এই বহুত্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী ঈশ্বরীরূপে তুমি তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। ইহাই তোমার সূক্ষ্মশরীর। এইরূপে সন্তান তোমার ঈশ্বরী-মূর্তির সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া জীবত্বের—ক্ষুদ্রত্বের মোহ হইতে পরিত্রাণ পায়। তখন তুমি তোমার তৃতীয় মূর্তি—সর্বশক্তি-সমন্বিত-স্বরূপটি উদ্ভাসিত কর। সর্ব-রূপে যে শক্তি প্রকাশিত, এবং সর্বের সৃষ্টিস্থিত্যাদিকর্ত্রী-রূপে—সর্বেশ্বরীরূপে যে শক্তি প্রকাশিত, সে সমুদয় যেস্থানে সমন্বয় প্রাপ্ত হয় ; যেখানে শক্তিরূপে কিছুরই বিকাশ নাই, অথচ সর্বশক্তি যাহাতে সমন্বিত, তাহাই তোমার তৃতীয় স্বরূপ। সর্বরূপে যাহার প্রতীতি হয়, উহা যে শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা আমরা তোমার কৃপায় ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছি। মা ! এই সর্বশক্তি-সমন্বিত স্বরূপটিকেই তোমার কারণ শরীর বলা যায়। উহাই ব্রহ্ম পরমাত্মা নিরঞ্জন ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত হয়। তোমার এই তিনটি স্বরূপই যুগপৎ তুল্য সত্য। উপনিষৎ অর্থাৎ শ্রুতি-বাক্যসমূহ তোমার এই তিনটি স্বরূপের কথাই তুল্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাও ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তমরূপে তোমার ত্রিবিধ স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে যে আধুনিক মায়াবাদিগণ তোমার নির্গুণ স্বরূপটিমাত্র সত্য স্বীকার করিয়া, অপর স্বরূপ দুইটির মিথ্যাত্ব কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতেও কিছু ক্ষতি হয় নাই। সত্যই ত' মা তোমার নিরঞ্জনস্বরূপে জগৎ বলিয়া কিছু নাই ; সুতরাং জগদীশ্বর বলিয়াও কিছুই থাকিতে পারে না। আচার্য ভাষ্যকার এই নির্গুণ স্বরূপটিকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই প্রাণপণে অপর স্বরূপ দুইটির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মা তুমি আমাদের নিকট ত্রিবিধ স্বরূপেই তুল্য সৎ। **'ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী'** তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। আমার একার নহে ; **'নঃ'**—আমাদের সকলের ভয় দূর কর মা, সকলের ভয় দূর কর। জন্মমৃত্যুক্লিষ্ট অল্পজ্ঞ সংসার-ভয়ে ভীত নিরাশ্রয় জীবগণের ভয় হরণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থা ; মা ! তুমি দুর্গা—দুর্গতিহরা ; আমাদের এই জীবত্বরূপ দুর্গতি হরণ কর। তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

———○———

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্‌ ।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। মা, তোমার লোচনত্রয়-বিভূষিত এই মনোজ্ঞ মুখমণ্ডল আমাদিগকে সর্বভূত হইতে রক্ষা করুক। হে কাত্যায়নি ! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, ত্রিলোকপ্রকাশক ত্রিকালদর্শী নয়নত্রয়-ভূষিত কেবলানন্দস্বরূপ সর্বমনোহর তোমার মুখমণ্ডল আমাদিগকে সর্বভূত হইতে রক্ষা করুক। একমাত্র আনন্দস্বরূপ তুমিই যে স্থূলে সর্বরূপে সূক্ষ্মে সর্বেশ্বরীরূপে এবং কারণে সর্বশক্তি সমন্বিত নিরঞ্জন স্বরূপে নিত্যপ্রকাশিত, এই কথাটি জীব যখন তোমার কৃপায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার সর্বভূতের ধাঁধা কাটিয়া যায়। সর্ব যে ভূত এইরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হয়। ভূত বলিয়া যে পৃথক্‌ কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারে। আনন্দময়ী তুমিই যে সর্বভূতরূপে অভিব্যক্ত ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভূতের ভয় চিরতরে বিদূরিত হয়। ওগো ! তুমি আমাকে, আমাকে নয়—আমাদের সকলকে সর্বরূপ ভূত হইতে রক্ষা কর। একমাত্র আনন্দ বস্তুই যে সর্বরূপে প্রকটিত, ইহা আমাদের মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দাও। মা ! তুমি কাত্যায়নী, ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়ণীয়া। কাত্যায়ন ঋষি যেরূপ তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, মা, আমাদিগের প্রতিও তুমি সেইরূপ প্রসন্ন হও। তোমাকে প্রণাম।

———◦———

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্‌ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫ ॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥ ২৬ ॥
অসুরাসৃগ্‌বসা পঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্‌ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। হে ভদ্রকালি ! জ্বালা-করাল (অগ্নিশিখা-দ্বারা ভীষণ) অতি উগ্র এবং অশেষ অসুরনাশকারী, তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক। যাহার ধ্বনি জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দৈত্যকুলের তেজঃক্ষয় করিয়াছিল, হে দেবি ! তোমার সেই অনঃ অর্থাৎ মাতৃ-সদৃশী ঘণ্টা, আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পাপ হইতে রক্ষা করুক। অসুরগণের অসৃক্‌ এবং বসারূপ পঙ্কলিপ্ত তোমার করশোভিত খড়্গ আমাদের শুভদায়ক হউক। হে চণ্ডিকে ! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রে ত্রিশূল ঘণ্টাধ্বনি এবং খড়্গ, এই ত্রিবিধ অস্ত্রের নিকট হইতে পরিত্রাণ এবং মঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে। ত্রিপুটিজ্ঞান, অনাহত-নাদ এবং অনাত্মপ্রতীতি-বিলয়কারক প্রজ্ঞা, এই তিনটিই বিশেষরূপে অসুরভাবসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে, তাই উহাদের নিকট দেবতাগণ মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

মা ! তুমি স্বয়ং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তোমার অস্ত্রশস্ত্রসমূহও আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করুক। উহারাই ইতিপূর্বে অসুরভাবসমূহকে বিনষ্ট করিয়া জীবত্বের মহানিগড় হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করিয়াছে। উহারা যেন সমস্ত প্রারব্ধ-ক্ষয় পর্যন্ত ঠিক এইরূপেই আমাদিগকে অসুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। মা ! তুমি যখন স্বয়ং চণ্ডিকামূর্তিতে প্রকটিত হও, তখনই তোমার অস্ত্রশস্ত্র তোমার বিভিন্ন শক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অসুরকুলকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয় ; সুতরাং তোমার চণ্ডিকামূর্তিকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বিশেষভাবে প্রণত হইতেছি—'**চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্‌।**'

সাধক, এইরূপ অস্ত্রশস্ত্রের নিকট প্রার্থনা অস্বাভাবিক নহে। বৈদিক যুগের সত্যদর্শী সরলপ্রাণ ঋষিবৃন্দের হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনার ভাব স্বতঃই উদ্ভূত হইত। ইহাতে তাঁহারা সঙ্কীর্ণহৃদয় বা বদ্ধজীব বলিয়া পরিচিত হইতেন না। আজ কাল কি এক নিষ্কাম শব্দের সুর উঠিয়াছে, উহা তামসিক-প্রকৃতি জীবের অলসতারই সূচনা করিতেছে। নিষ্কাম যে কি বস্তু, যাঁহারা তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞের বা সকাম ব্যক্তির প্রার্থনাই হয় না। প্রার্থনায় এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, প্রার্থনায় জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, আবার প্রার্থনার ফলেই জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ, বন্ধন মুক্তি, সকল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা ভিক্ষা নহে। প্রকৃষ্টরূপ প্রার্থনা করিতে পারিলে, সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। যাহারা ঈশ্বরসত্তায় একান্ত বিশ্বাসবান ; যাহাদের ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অবিচলিত বিশ্বাস

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারাই প্রার্থনা করিতে সমর্থ।

ঠিক ঠিক প্রার্থনা করিতে পারিলে, উহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থনায় সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হয় না। প্রার্থনাই যথার্থ সাধনা ! কিন্তু এ সকল কথা—এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বমাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। মা, তুমি তুষ্ট হইয়া অশেষ রোগ দূর কর, আবার রুষ্ট হইয়া সকল অভীষ্ট বিনাশ কর। তোমাকে আশ্রয় করিলে মানুষের কোন বিপদ থাকিতে পারে না, যাহারা তোমার আশ্রিত, তাহারাই যথার্থ আশ্রয়প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ অন্যের আশ্রয়ণীয় হয়)।

ব্যাখ্যা। মা, তোমার তুষ্টি রুষ্টি উভয়ই আমাদের মঙ্গলদায়ক। যখন তোমার তুষ্টি হয়, অর্থাৎ নিত্যতুষ্টা তোমার তুষ্ট ভাবটি যখন আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, নিত্যপ্রসন্না মা, যখন তোমার প্রসন্নতা আমাদের প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে, তখনই আমরা অশেষরোগ হইতে মুক্ত হই। স্থূলদেহের রোগ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার অসাম্য-নিবন্ধন, আধিদৈবিক—শীতোষ্ণ-বাতবর্ষাদি নিবন্ধন এবং আধিভৌতিক—ব্যাঘ্রতস্করাদি দংশমশকাদি নিবন্ধন স্থূলদেহে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই স্থূলদেহের ত্রিবিধ রোগ বলিয়া কথিত হয়। সূক্ষ্মদেহের রোগ—মানসিক। ইষ্টবিয়োগ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিবশতঃ যে সকল মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই সূক্ষ্মদেহের রোগ। অতঃপর কারণ দেহের রোগ। অজ্ঞানতা—আত্মবিস্মৃতিই ইহার স্বরূপ। এই ত্রিবিধ রোগকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ অশেষ রোগ বলিয়াছেন। মা, তোমার প্রসন্নতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ববিধ রোগই নষ্ট হইয়া থাকে, তোমার তুষ্টি-মূর্তিটি প্রত্যক্ষ করিবার ইহাই ফল। মা, যাহারা এ সকল বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাদিগকে তুমি নিজমুখে বলিয়া দাও—এ সকল অর্থবাদ-বাক্য নহে, যথার্থই অশেষ রোগ দূর হইয়া যায়। সত্যসত্যই মানুষ যখন ভগবৎপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিতে পারে, বুঝিতে পারে তখন তাহার সর্ববিষয়ে শুভ হয়—অভ্যুদয় উপস্থিত হয়।

মা, তুমি রুষ্ট হইলে জীবের সকল কামনা, সকল অভীষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায় ; মন্ত্রে 'কামনা' এবং 'অভীষ্ট' একার্থবাচক দুইটি শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বর্তমান কাম্য বস্তুকে কামনা, এবং ভবিষ্যৎ কাম্য বস্তুকে অভীষ্ট বলা হয়। সে যাহা হউক, মানুষ যখন তোমার অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিতে থাকে—তোমার রোষরক্তনয়ন দেখিয়া ভীত হয়, তখনই তাহার যাবতীয় কাম্য এবং অভীষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে ইহা তোমার রোষের লক্ষণ বটে, তথাপি একটু ধীরভাবে দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, তুমি যখন রোষান্বিত হইয়া আমাদের কাম্য এবং অভীষ্ট বিনষ্ট করিয়া দাও, তখনই আমরা যথার্থ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। আমাদিগকে বহু কামনা, বহু অভীষ্ট এবং অতি ইচ্ছার সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তোমাকে রুষ্টা চণ্ডিকা মূর্তিতে প্রকাশিত হইতে হয়। আমাদের কাম্য ও অভীষ্টের বিনাশ না করিলে, আমরা চিরদিন এমনই জীবত্বের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতাম ! তুমি রুষ্টা মূর্তিতে আমাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কামনাগুলি বিদূরিত করিয়া না দিলে, আমরা মহামঙ্গল-স্বরূপ হিরণ্ময় মন্দিরের সন্ধানই পাইতাম না ; তাই বলিতেছিলাম, মা ! তোমার রোষ ও তোষ উভয়ই আমাদের পক্ষে যথার্থ মঙ্গলদায়ক। তাই বলিতে হয়, **'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং'** তোমাকে আশ্রয় করিতে পারিলে—তোমার শরণগত হইলে জীবের আর কোন বিপদই থাকে না। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টলাভ, রুষ্টিতে অভীষ্টনাশ ; উভয়পক্ষেই জীবের মঙ্গল। মা তুমি এই দ্বিবিধ ভাবে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াই সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য, এত মাধুর্য ! তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাদের বিপদ বলিয়া ত' কিছু থাকেই না, অধিকন্তু তাহারা অপরের আশ্রয়দাতা হয়। কত জীব তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া লয়। ইহাই তোমার বিশেষত্ব।

এই মন্ত্রে 'নরাণাং' পদটি নর এবং নারী উভয়েরই বোধক। একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়।

এতৎকৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। হে দেবি অম্বিকে! এই যে তুমি আপনাকে বহু মূর্তিতে প্রকটিত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহাসুরদিগের বিনাশ সাধন করিলে ইহা তুমি ব্যতীত আর কে করিতে পারে।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি একা অদ্বিতীয়া বিশুদ্ধবোধস্বরূপা হইয়াও বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া—ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী কৌমারী প্রভৃতি বহুমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, ধর্মবিরোধী অসুরভাবসমূহকে কদন করিয়া থাক। যাহারা ইহা স্বীকার করিতে পারে না, যাহারা কেবল তোমার নিরঞ্জন স্বরূপটি স্বীকার করিয়া, বহুধা প্রকটিত মূর্তিসমূহকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, যতক্ষণ জগৎ-প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তোমার বহুরূপকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। **'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'** বলিয়া উপনিষৎ তোমার সর্বরূপ বহুরূপ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠিদ্বারা তোমার পরিমাণ করিতে যাই বলিয়াই, তোমাতে একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয় করিতে পারি না। বাস্তবিক কিন্তু তুমি এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজিতা। **'কান্যা'**—অন্যা কা। তুমি ছাড়া আর কে আছে? কেহই নাই; থাকিতে পারে না। **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** ইহাই সত্য। এই অদ্বিতীয় সত্য বস্তু ব্যতীত আবার আগন্তুক নূতন কেহ আসিয়া আত্মমূর্তি বহুধা প্রকটিত করে না। সুতরাং একরূপেও তুমি; আবার বহুরূপেও তুমি মা। বিশেষত্ব এই যে, বহুরূপে প্রকটিত হইতে গিয়াও তোমার একত্বটি অক্ষুণ্ণই থাকে। ঘট সরা উদকুম্ভ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে ও নামে পরিচিত হইলেও, মৃত্তিকাত্ব সর্বত্র অক্ষুণ্ণই থাকে। আমাদের ক্ষীণ-বুদ্ধিতে একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয় মীমাংসিত না হইতে পারে, তুমি কিন্তু এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। **'একো বহুধা প্রকরোতি রূপম্।'** একজন সাধারণ যোগীপুরুষ যদি স্বেচ্ছায় আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়াও, নিজের একত্বটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন; আর জগদীশ্বরী তুমি সগুণরূপে প্রকটিত হইয়াও নির্গুণত্ব যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? তাই দেবতাগণ বলিলেন —**'অনেকৈরূপৈঃ আত্মমূর্তিং বহুধা কৃত্বা'** এক আত্মমূর্তি তুমিই অনেকরূপে প্রকাশিত হও। তুমি আত্মারূপে একা অদ্বিতীয়া, ঈশ্বররূপে স্বগতভেদময়ী বহুরূপা। তুমি ধর্মদ্বেষী মহা-অসুরদিগের কদন অর্থাৎ নিধন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। মা তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। মা, (একদিকে) বিদ্যা—সমস্ত শাস্ত্র ও বিবেকদীপসদৃশ সমস্ত আদ্যবাক্য এবং (অন্যদিকে) অন্ধকারময় মমত্বরূপ গর্ত, এই উভয়ত্র তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে সমর্থ।

ব্যাখ্যা। মা-গো এই বিশ্বকে বিদ্যা অবিদ্যারূপে ঊর্দ্ধাধোভাবে একমাত্র তুমিই পরিভ্রমণ করাইয়া থাক। একদিকে বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা তৎসাধনভূত শাস্ত্রসমূহ, এবং আত্মানাত্ম-বিবেকের পক্ষে দীপসদৃশ আদ্যবাক্যসমূহ অর্থাৎ বেদ— উপনিষৎ। অন্যদিকে অবিদ্যা— মমত্বরূপ মহান্ধকারময় গর্ত, অর্থাৎ পূর্ণ অজ্ঞান। একদিকে বিদ্যাপক্ষ— শাস্ত্র বিবেক উপনিষৎ, অন্যদিকে অবিদ্যা-পক্ষ মমত্বরূপ মহান্ধকারাচ্ছন্ন গর্ত। এই উভয়পক্ষেই **'কা ত্বদন্যা'** তুমি ছাড়া কে আছে? মা! তুমিই ত' অনাত্ম-পদার্থের দ্রষ্টা হইয়া তাহাতে মমত্ববুদ্ধি স্থাপনপূর্বক আত্ম-জ্ঞানহীন অন্ধকারময় গর্তে কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছ। আবার তুমি স্বয়ং আত্মা—স্ব-প্রকাশ-স্বরূপা হইয়াও তোমাকে পাইবার জন্য কত শাস্ত্র পাঠ, কত বেদ অধ্যয়ন এবং বিবেকখ্যাতির কতরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছ! মা-গো! একদিকে দেখিতে পাই, তুমি আত্মহারা অজ্ঞান শিশু, আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, তুমি আপনাকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য কতই অধ্যবসায়শীল পুরুষ! মা! তুমি সর্বপ্রকাশরূপিণী চিন্ময়ী, তোমাতে বিন্দুমাত্র আবরণ নাই; তবু এ ভ্রান্তি, এ কল্পিত বিশ্ব-ভ্রমণলীলা বড়ই বিচিত্র! মা, তুমি বিদ্যা অবিদ্যা উভয়েরই ঈশিতা—বিদ্যা অবিদ্যা উভয় হইতেই পৃথক, বাক্য মনের অগোচরস্বরূপ হইয়াও, বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে স্বয়ং ভ্রান্তবৎ এই বিশ্ব পরিভ্রমণলীলা সম্পাদন করিতেছ। একদিকে তুমি ঈশ্বররূপে সর্বভূতের হৃদয়দেশে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়ার

বশে সর্বভূতকে পরিভ্রমণ করাইতেছ, আবার অন্যদিকে জীবরূপে অজ্ঞের মতন সেই ভ্রমণযন্ত্রে স্বয়ং নিষ্পেষিত হইয়া হাহাকার করিতেছ। একদিকে উজ্জ্বল আলো —বিবেকদীপ, অন্যদিকে মহান্ধকার— মমত্ব-গর্ত। দুই দিকেই তোমার অভাব পরিস্ফুট। অথচ কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেহই নাই ; **'কা ত্বদন্যা'** তোমার অভাব কোথাও নাই। ধন্য মা তোমার এই আনন্দলীলা !

মাগো ! 'বিভ্রাময়তি' পদটির মধ্যে আমরা তোমার আর একটু বিচিত্র রহস্য দেখিতে পাই। তুমি স্বয়ং বিভ্রান্ত হইয়া—আত্মরূপ বিস্মৃত হইয়া, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, আবার সেই বহুরূপকেই বিভ্রান্ত করিয়া দাও —ভুলাইয়া দাও। নিজেই নিজেকে ভুলিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে নিপতিত হইয়া থাক, অথবা বিবেকের দীপ জ্বালিয়া নিজেকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। নিত্যজ্ঞানময়ী তুমি, তোমার এ লীলা বড়ই বিচিত্র।

সাধক ! এ স্থানে বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত একটি আত্ম-সম্বেদন-সঙ্গীতের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সত্য আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার প্রাণ !
কেন মা তোমার শুষ্ক বয়ান, কেন মা তোমার বদ্ধ ভান ?
কেন মা তোমার হতাশ বক্ষে বহিছে বিষাদ অশ্রুধার ?
তুমি যে মুক্ত বিরাট্ ব্রহ্ম, তুমি যে সত্য সারাৎসার।
কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় বন্ধন তোমার আর॥ ১॥

তুমি যে নিত্য মহান্ সত্য, তুমিই যে এই বিশ্ব-প্রাণ,
তুমি যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তুমি যে পূর্ণ মহাজ্ঞান।
আনন্দ তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব, তুমি গো জননি কামচার,
স্বেচ্ছায় তুমি হয়েছ ক্ষুদ্র, স্বেচ্ছায় বহিছ ত্রিতাপ-ভার॥ ২॥
(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

তুমি যে সূর্য, তুমি যে চন্দ্র, তুমিই ধরেছ বিশ্ব-সাজ,
তুমিই আবার দর্শকরূপে 'আমি' হয়ে বহু কর বিরাজ।
পুণ্য পূর্ণ পরম জ্যোতি তুমি গো সর্ব বিকাশকার,
তুমিই আবার তোমায় না দেখে, স্বেচ্ছায় হেরিছ অন্ধকার॥ ৩॥
(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

তোমারই আঁখির পলকমাত্র, ভাবিছ তুমি গো যুগান্তর,
স্বপ্রকাশ তুমি হ'য়ে প্রতিহত, হেরিছ কতই দেশান্তর,
কাল দিক্, মাগো, তোমারই ব্যাপ্তি, স্বেচ্ছায় অধীন তুমি গো তার।
স্বেচ্ছায় তুমি হয়েছ বদ্ধ, স্বেচ্ছায় বহিছ বিষাদ-ভার॥ ৪॥
(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

হে আমার প্রাণ ! জননি। তোমার স্বেচ্ছার খেলা সহে না আর,
দেখ্ চেয়ে মাগো, সন্তান তোর কল্পিত অভাবে দীনের সার।
স্নেহ-দয়াময়ী জননী আমার, দাঁড়াও স্বরূপে দাঁড়াও একবার,
মহামায়া তুমি মায়ায় তোমার, ডুবাও আমার আমিত্ব ভার॥ ৫
(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)[১]

———০———

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। মা। যেখানে রাক্ষসকুল, যেখানে উগ্রবিষ সর্পসমূহ, যেখানে অরিবৃন্দ যেখানে দস্যুবল, যেখানে দাবানল এবং যেখানে (বাড়বানল পূর্ণ) সমুদ্রমধ্য, সে সকল স্থানেও তুমি স্বয়ং অবস্থানপূর্বক এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ।

ব্যাখ্যা। মাগো ! কেবল যে তুমি এই বিশ্বকে পূর্বোক্তরূপে বিভ্রান্ত করিতেছ, তাহা নহে ; সর্বত্র স্বয়ং অব্যাহতভাবে অবস্থানপূর্বক ইহাকে যথাযোগ্য রক্ষাও করিতেছ ! রাক্ষসরূপী বিষয়ের প্রলোভন, উগ্রবিষ সর্পরূপী দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি, অরিরূপী কাম-ক্রোধাদি, দস্যুবলরূপী দম্ভ দর্প অভিমান, দাবানলরূপী শোক দুঃখাদি, এবং দুস্তরসমুদ্ররূপী সংসার— যে সকল স্থানে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই, যেখানে অজ্ঞানের পূর্ণ আবরণ, যেখানে আত্ম-অস্তিত্বনাশের পূর্ণ বিভীষিকা, যেখানে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল কৃষ্ণ-চ্ছায়া, সেখানেও ত' মা তুমি পরিপালিনী-মূর্তিতে—স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে প্রকটিত হইয়া স্নেহের সন্তান জীববৃন্দকে রক্ষা করিয়া থাক— বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক ! আবার স্থূল জগতেও পূর্বোক্ত রাক্ষস সর্প শত্রু দস্যু দাবানল এবং বাড়বানল-পূর্ণ দুস্তর-সমুদ্রমধ্য প্রভৃতি ঘোর বিপৎসঙ্কুল স্থানসমূহে নিপতিত তোমার স্নেহের সন্তানকে তুমি যে কি

[১]ঝিঁঝিট—একতালা ; অথবা ইমন্—একতালা বা চৌতাল।

অলৌকিক ভাবে কি বিস্ময়প্রদ উপায়ে রক্ষা করিয়া থাক, তাহা বারংবার দেখিয়া মূঢ় আমরা তোমায় বুঝিতে চাই না ; বুঝিলেও তোমার সত্তা মানিতে চাই না ; মানিলেও সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি যে সত্যই আছ, তুমি যে সত্যই জীবদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, ইহা আমরা নিঃসংশয়রূপে স্বীকার করিয়া লই না। আমরা স্বীকার না করিলেও তুমিই যে একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, তাহাতে কিন্তু কোন সংশয়ই নাই মা !

পক্ষান্তরে, যাহারা পূর্বোক্তরূপ বিপদে নিপতিত হইয়া আমাদের চক্ষুতে রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও যে তোমারই স্নেহময়-অঙ্কে চিররক্ষিত, ইহাতেও কোনরূপ বিচার বা সংশয়ের অবসর নাই। কারণ, **'তত্র স্থিতা ত্বং'** তুমি সেখানে অবস্থিতা। সেই বিপৎসঙ্কুল স্থানে—সেই বিনাশ-স্থানে ও কালে একমাত্র তুমিই রহিয়াছ ; সুতরাং জীবরূপা স্নেহের সন্তানগণ যদি বিপদে পড়িয়া সাধারণ দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়াও যায়, তাহাতেও তাহাদের কিছুই হানি হয় না। তোমারই শান্তিময় কোলে স্থান পায়। ওগো তুমি যে সর্বত্র অবস্থিতা মা, তুমি যে সর্বত্র রক্ষাকর্ত্রী জননী ! অতএব রক্ষা বা বিনাশ উভয় স্থলেই যে **'বিশ্বং পরিপাসি'** তুমি বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ ; ইহা ধ্রুব সত্য। যাহারা তোমাকে এই বিশ্বরক্ষাকারিণী মূর্তিতে সর্বত্র অবস্থিতা দেখিতে পায়, তাহারা কখনও কোন বিপদেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

'তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি' কথাটির মধ্যে একটি সাধনারহস্য নিহিত আছে, সাধকগণ অবহিত হইবেন। হিরণ্যকশিপুর আদেশে প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিপতিত প্রহ্লাদ ভগবানকে অনলবিহারী হৃদয়বিহারী প্রভৃতি নামে না ডাকিয়া বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি নামে ডাকিয়াছিলেন। আবার কুরুসভা মধ্যে দুঃশাসন কর্তৃক বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদীও ঐরূপ প্রাণনাথ প্রভৃতি নামে না ডাকিয়া দ্বারকাপতি প্রভৃতি নামে ভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন, উভয়ত্রই ভগবানের আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ প্রহ্লাদ এবং দ্রৌপদী **'তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি'** কথাটির রহস্য তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভগবান্ সর্বত্র বিরাজিত ঐ অগ্নিরূপেও তিনি ঐ বস্ত্ররূপেও তিনি, আর সর্বজীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত প্রাণপতিরূপেও তিনিই বিরাজিত। অতএব যেখানে যেরূপ বিপদে জীব নিপতিত হউক না কেন, সেইখানে এবং সেই বিপদরূপেও যে মা-ই উপস্থিত রহিয়াছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া মাকে স্মরণ করিতে পারিলেই জীব বিপদ হইতে অচিরকাল মধ্যে পরিত্রাণ পাইতে পারে ! মা যে সর্বদা সর্বত্র সন্নিহিতা, এই ভাবটি হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলে, আর কোনরূপ বিপদেই জীবকে বিচলিত হইতে হয় না।

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতি ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি-নম্রাঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। মা ! তুমি বিশ্বেশ্বরী ; তাই তুমি বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। বিশ্বই তোমার শরীর ; তাই তুমি বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বেশ্বরগণের বন্দনীয়া। যাহারা তোমার নিকট ভক্তিবিনম্র হয়, তাহারাও বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি যে পূর্বোক্ত রাক্ষসাদিরূপ মহাবিপদ হইতেও জীবগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়া থাক, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ওগো, তুমি যে বিশ্বেশ্বরী—এই বিশ্বের অধিপতি। যে যাহার অধিপতি, সে তাহাকে ত' রক্ষা করিবেই ; তবে দেবতাগণ **'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং'** কথাটি কেন বলিলেন—যাহারা তোমাকে বিশ্বেশ্বরী বলিয়া জানে, শুধু তাহারাই বুঝিতে পারে যে, একমাত্র তুমিই এই বিশ্বকে রক্ষা কর। আবার তুমিই যে এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, ইহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই ; কারণ, তুমি যে বিশ্বাত্মিকা। **'একোঽহম্ বহু স্যাম'** বলিয়া তুমিই যে বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। এই বিশ্বই যে তোমার শরীর ; সুতরাং ইহাকে ধারণ করাই তোমার স্বভাব।

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত অন্যায় হইবে না। তন্মতা-বলম্বিগণ বলেন—এই বিশ্বই ভগবানের শরীর। আমাদের এই স্থূল শরীর, এই মন বুদ্ধি আত্মা, এই সকলের সমষ্টি যেরূপ আমি ; ঠিক সেইরূপ এই ব্যক্ত বিশ্ব, বিরাট মন, সমষ্টি বুদ্ধি এই সকল সমন্বিত পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য বা লভ্য। সাধনা জগতে এই মতটি বিশেষ আদরণীয় এবং পরিগ্রাহ্য ! ইহা উপনিষদ্ বিরুদ্ধও নহে ! উপনিষদ্ও

অনেক স্থলে এই বিশ্বকে পরমাত্মার স্থূল শরীর বলিয়াছেন ; কিন্তু এই মতের একটি কথা বিশেষরূপ চিন্তনীয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এই পরিদৃশ্যমান জড় অংশকে একেবারে অচিৎ-তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। অচিৎ শব্দের অর্থ জড় হইলে উহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শ্রুতি এই জড় অংশকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন। অচিৎ শব্দে যদি চিৎ-এর স্বল্প প্রকাশরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, ঈষদর্থে নঞ্ সমাস করা যায়, তবে আর কোনরূপ সংশয়ের অবসর থাকে না।

সে যাহা হউক, মা তুমি বিশ্বেশবন্দ্যা। বিশ্বেশগণ —বিশ্বাধিপতিগণ—ঈশ্বরগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ নিয়ত তোমার বন্দনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্বতোভাবে তোমারই শরণাগত ; এবং তোমার শরণাগত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহারা বিশ্বাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব যাহারা **'ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ'** তোমাতে ভক্তিনত, তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ হয়। বিশ্ববাসিজনগণ তাহার আশ্রয় লাভ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও শান্তি লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়।

———○———

দেবী ! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। হে দেবী ! তুমি প্রসন্ন হও। যেরূপ এখন অসুরবধ করিয়া আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে সদ্যোমুক্ত করিলে, সেইরূপ নিত্য আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে পরিপালন কর। আর এই জগতের সমস্ত পাপ এবং উৎপাতের পরিণাম স্বরূপ মহা-উপসর্গসমূহ আশু প্রশমিত কর।

ব্যাখ্যা। মা ! তুমি প্রসন্ন হও ! তুমি যে আমাদিগের প্রতি নিত্যই প্রসন্না, ইহা আমাদিগকে সর্বতোভাবে বুঝিতে দাও। আর 'অধুনৈব' এইমাত্র যেরূপ অসুরদিগকে নিহত করিয়া আমাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, এইরূপ নিত্য—আবহমান কাল তুমি আমাদিগের, (নঃ)—আমি বলিতে যত আছে, এই বহু আমির— অজ্ঞান-কল্পিত আমিগুলির যে অরিভীতি — শত্রুভয় অর্থাৎ কামাদিরিপু কর্তৃক যে আচ্ছন্নভাব, তাহা বিদূরিত কর, আমাদিগকে পরিপালন কর।

মা ! একবার দেখ—তোমার স্নেহের সন্তান অরিভয়ে — কামাদিরিপুগণের উৎপীড়নে নিয়ত উৎপীড়িত। ঐ শোন মা, তাহারা অরির অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া, তোমাকে সুদুর্লভ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, কেহ বা তোমাকে নিষ্ঠুরা পাষাণী বলিয়া তিরস্কার করিতেছে, কেহ বা অরিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কঠোর সংযম ও নানারূপ যোগ কৌশলাদি অবলম্বন করিতেছে। মা শত্রুভয়ে ভীত তোমার এই সন্তানগণকে তুমি রক্ষা কর। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও —**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** আমার শরণাগত হইলেই শত্রুভয় প্রশমিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে—**'পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু'** সর্বজগতে পাপ নামক যে সংস্কার আছে, তাহাও আশু প্রশমিত কর। জীবের পাপবোধ কেন হয় ! 'আমি' কর্তা সাজিয়া কর্ম করে, তাই কর্মফলরূপ পাপ আমির সহিত জড়াইয়া যায়। (সাধারণ কথায় যাহাকে পুণ্য বলে, তাহাও এইরূপে পাপের অন্তর্গত।) মা ! জীব যদি তোমার শরণে আগত হয়, তবে অল্পদিনেই তাহার কর্তৃত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় ; সুতরাং পাপ বলিয়া, কর্মফল বলিয়া আর কিছুই থাকে না ; তাই ত' বলি মা, তোমার স্নেহের সন্তানগণকে বলিয়া দাও—'ঐ যে অহং, উহাই পাপ ; অহংবোধ ছাড়, অহং যে আমি— তোমাদের মা। আমি ছাড়া তুমি আবার অহং হইতে যাইও না। আমার দিকে লক্ষ্য রাখ, আমার শরণাগত হও, দেখিবে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের— জগতের যাবতীয় পাপ দূরীভূত হইয়া যাইবে।'

'উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্'। উৎপাত— উল্কাপাত, গন্ধর্বনগর দর্শন, ধূমকেতুর উদয়, পরিবেশ (সূর্যের চতুঃপার্শ্ববর্তী ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল) ইত্যাদি। এই উৎপাতসমূহের যে পাক, অর্থাৎ ফলপরিণতি, তজ্জনিত যে উপসর্গ—দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন অকালমৃত্যু প্রভৃতি, এইগুলি পাপেরই প্রত্যক্ষ ফল। অহংবোধে কার্য করিতে গিয়া বহির্মুখী জীববৃন্দ এইরূপ বিবিধ উপসর্গে নিপতিত হয়। মা, তুমি জগতের এই পাপ দূর কর ! এই উপসর্গ প্রশমিত কর ! আনন্দময়ীর সন্তান আবার আনন্দের সন্ধান পাইয়া—অমরত্বের সন্ধান পাইয়া

বিষম উপসর্গের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করুক!

———০———

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি ।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। হে দেবি ! হে বিশ্বার্তিহারিণী ! তুমি প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি ত্রৈলোক্যবাসী জীবগণের স্তুতিযোগ্যা। তুমি সকল লোকের প্রতি বরদায়িনী হও।

ব্যাখ্যা। তুমি দেবী দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশ-রূপিণী। তুমিই বিশ্বের যাবতীয় আর্তি হরণ করিয়া থাক, তোমাকে লাভ করিলেই জীবের সকল আর্তি বিদূরিত হয়, প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হওয়াই তোমার স্বভাব। অথবা যাহারা যথার্থ প্রণত হইতে পারিয়াছে, তাহারাই তোমার নিত্য-প্রসন্ন-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। মা আজ আমরাও তোমার চরণে প্রণত—প্রকৃষ্টরূপে নত হইতেছি, আমাদের আমিত্বের উচ্চশির তোমার চরণে অবনত হইয়াছে, তুমিই অবনত করাইয়া লইয়াছ ; সুতরাং এইবার 'প্রসীদ', এইবার তোমাকে প্রসন্ন হইতেই হইবে। মা ত্রিলোকবাসী সুর নর গন্ধর্ব, যাহার যেরূপ সাধ্য, নিজ নিজ বাগ্‌যন্ত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য সকলেই তোমার স্তব করিয়া থাকে, তাই তুমি **'ত্রৈলোক্য-বাসিনামীড্যে।'** তুমি সকলকেই বরদান কর, তাই তুমি **'লোকানাং বরদা'**। মা ! তুমি বরদায়িনী মূর্তিতে দাঁড়াও। আজ সন্তানগণ নির্ভয়ে অকপটে তোমার নিকট হইতে সত্য-বর গ্রহণ করিয়া ধন্য হউক জগৎ আবার সত্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত হউক।

———০———

দেব্যুবাচ।

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন— হে সুরগণ ! আমি বরদায়িনী। জগতের উপকারের জন্য তোমাদের যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাবৃন্দের স্তোত্র-পাঠের ফলে, মা আমার বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়াছেন, বরদায়িনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগন্মঙ্গলবিধায়ক বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। সাধক ! সত্যই এইরূপ হয়। এখনও —এই অবিশ্বাসের যুগেও এমন করিয়া সত্যই মা আসিয়া থাকেন, সত্যই সন্তানগণকে বরাভয় প্রদানে ধন্য করেন। সে বরে জগতের মঙ্গল সাধিত হয় ; কারণ, সন্তান যখন জগদাত্মায় একীভূত হইয়া যায়, তখন জগতের মঙ্গল সাধনাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না। তাই নিষ্কাম সাধকগণের তপস্যার ফল জগতের সকল লোকই অল্পাধিক লাভ করিয়া থাকে। নিষ্কাম সাধকগণের সাধনার ফলেই বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়।

এইরূপ নিষ্কাম কর্মীদিগের কর্মফল বিভাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রুতি বলেন— আত্মজ্ঞ-পুরুষদিগের যাহারা সুহৃৎ, তাহারাই তাঁহাদিগের সুকৃত গ্রহণ করে। যাহারা বিদ্বেষী, তাহারা দুষ্কৃত গ্রহণ করে, আর যাহারা পুত্রাদি উত্তরাধিকারী, তাহারা দায় অর্থাৎ ধন বিত্তাদি লাভ করে। উপনিষৎ অভ্যুদয়কামী জনগণকে আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের অর্চনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে বিশ্বমঙ্গল সাধন করিবার জন্য জগতে আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু সে অন্যকথা—

———০———

দেবাঊচুঃ।

সর্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী ।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। দেবতাগণ কহিলেন— হে অখিলেশ্বরী ! তুমি এখন যেরূপ আমাদের বৈরিকুল বিনাশ করিলে, এইরূপ ত্রিলোকের সর্ববাধা প্রশমিত কর।

ব্যাখ্যা। মা ! আর চাহিবার কিছু নাই, তুমি ত্রিলোকের সর্ববাধা প্রশমিত কর। হে অখিলেশ্বরি জননী ! কিছুদিন যাবৎ বিশ্বময় এ কি আর্তনাদ উঠিয়াছে —সর্বই বাধা। সর্বরূপ বাধাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তোমাকে লাভ করা যায় না, একি মর্মপীড়া-দায়ক বাণী শুনিতে পাই ! কার্যতঃ কিন্তু দেখিতে পাই —অতি অল্পলোকই সর্ব ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা ত' সর্বকে বাধা বলিয়াই কীর্তন করিবেন। আর যাঁহারা অকৃতকার্য হন, তাঁহারাও সর্বকেই

মাতৃ-লাভের অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করেন। সর্ব যে বাস্তবিক বাধা নহে, সর্বরূপে যে তুমিই বিরাজিত, এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ত' জীব তোমার সর্বাতীত স্বরূপটির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সর্বই যে মা, জীব ইহা যতক্ষণ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই এই সর্ব মাতৃ-লাভের অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকে। তাই বলি মা! জগতে আবার সত্যের প্রতিষ্ঠা কর,—একমাত্র তুমিই যে সর্বরূপে সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ, ইহা প্রত্যেক জীবহৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দাও। সর্ব যে বাধা নয়, মাতৃ-বক্ষ যে সর্বরূপেই সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, ইহা তোমার সন্তানগণের মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দাও। আবার সকলে সত্যপ্রতিষ্ঠ হউক! তোমার সত্তায় বিশ্বাস করুক! তোমার সত্তায় বিশ্বাস হইলেই, এই সর্ববাধা প্রশমিত হইয়া যাইবে। জগতের যাবতীয় অভাব অভিযোগ কাতর-ক্রন্দন বিদূরিত হইবে। জগৎ যথার্থ কল্যাণ লাভ করিবে।

———०———

দেব্যুবাচ।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥ ৩৭ ॥
নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে পুনরায় শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে, (তখন) আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্বক সেই অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাবৃন্দের প্রার্থিত ত্রৈলোক্যস্য সর্ববাধা-প্রশমনং বর প্রদানে উদ্যত হইয়া, মা এস্থলে অনেক রহস্য প্রকটিত করিলেন। দেবীমাহাত্ম্যে যে তিনটি রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, মা স্বয়ং এখানে তাহা পরিব্যক্ত করিলেন। দেবী-বাক্যরূপে এই অধ্যায়ে চতুর্দশটি মন্ত্র আছে। উহার তাৎপর্য-নির্ণয় বড়ই দুরূপ ব্যাপার। তবে যাঁহার বাক্য, তিনি যদি কৃপাপূর্বক সাধকগণের মোহাবরণ অপসৃত করিয়া দেন, তবেই উক্ত মন্ত্রগুলির রহস্য-নির্ণয় হইতে পারে। এস প্রিয় সাধকগণ! আমরা মাতৃ-চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক প্রার্থনা করি—'মাগো! তোমার এই রহস্যময় বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। আমরা যেন **'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'** ন্যায়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত না হই। জয় মা। তুমি উদ্‌ভাসিত হও।'

বৈবস্বত মনু—সপ্তম মনু। এক মনুর অধিকৃত কালকে মন্বন্তর কহে। একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ে এক মহাযুগ হয়। চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প বা একবার প্রলয় হয়। বর্তমান কল্পের নাম—শ্বেতবরাহ কল্প। এই কল্পের একাত্তরটি মহাযুগের মধ্যে সাতাইশটি অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি মহাযুগের সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; সম্প্রতি কলিযুগ চলিতেছে। ইহার আয়ু-পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর, তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। এস্থলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় কাল-গণনার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় করিতে গিয়া, চারি পাঁচ হাজার কিংবা দশ বিশ হাজার বৎসরমাত্র সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা একবার অনুগ্রহপূর্বক আমাদের পূর্বোক্ত প্রকার কালগণনা প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যাঁহারা বলেন—'ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে, ভারত চিরপরাধীন, চিরদাস ইত্যাদি', তাঁহারা একবার হিসাব করিয়া দেখিবেন—ভারতবর্ষের যে আয়ুঃ-পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে, তাহার নিকট দুই এক হাজার বৎসর, কত অল্প, কত ক্ষুদ্র, বিন্দু সদৃশ; সুতরাং ভারতের দুরবস্থা দর্শন করিয়া শঙ্কিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন হেতু নাই। কিছুদিন পরে এ দেশের এই শোচনীয় কাহিনী ঠাকুরমার রূপকথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদিও এ সকল কথা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহার আলোচনায় মঙ্গল আছে—অবসাদগ্রস্ত জনগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ, নূতন বল ও আশার সঞ্চার হয়। আরও একটা মহান্ উপকার আছে—জীবের অহঙ্কার নাশ হয়। অনন্ত কালসমুদ্রমধ্যে আমি কত ক্ষুদ্র, আমার সত্তাটুকু কত অল্প সময়ের জন্য, এইরূপ চিন্তায় জীবের অহঙ্কার হ্রাস পায়।

যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মা বলিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতিতম যুগে আবার শুম্ভ

নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে, এবং তিনিও নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। এস্থলে মা যে কালের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বর্তমান যুগই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই দেবীমাহাত্ম্য স্বারোচিষ অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরীয় উপাখ্যান। তৎকালাপেক্ষায় বর্তমান কাল সুদূর ভবিষ্যৎ। তাই মন্ত্রে 'উৎপৎস্যেতে' এই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদের উল্লেখ আছে। বর্তমান কালে অধিকাংশ মনুষ্যই শুম্ভ নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা মমতা কর্তৃক অভিভূত নির্জিত ! মা নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভসম্ভবারূপে আবির্ভূত হইয়া এই অসুরদ্বয়ের বিনাশ সাধন করিবেন।

নন্দগোপ— আনন্দময় ব্রহ্মাভিমুখী মন। 'গাঃ পাতি ইতি গোপঃ' গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহের পালন এবং রক্ষণ করে বলিয়া মনকে গোপ বলা হয়। এই মনরূপ গোপ যখন নন্দ অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ আত্মার অভিমুখী হয়, তখনই তাহার নাম হয় নন্দগোপ। সর্বতোভাবে আত্মাভিমুখী মনের আশ্রয়ে যে শক্তির বিকাশ হয়, অর্থাৎ যে প্রজ্ঞার প্রভাবে অস্মিতা মমতা বিনষ্ট হয়, তাঁহাকেই নন্দগোপগৃহে জাতা বলা হয়। ইনিই যশোদাগর্ভসম্ভবা। যশোদা—যশঃ দানকারিণী। মাতৃ-লাভের জন্য অধ্যবসায়শীল হইলেই মা আমার প্রথমে যশোদায়িনী মূর্তিতে জীবকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বসেন। তখন অজ্ঞাতসারে তাহার যশঃ চতুর্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে। সন্তান 'যশোদেহি' বলিয়া মায়ের নিকট আব্দার করে ; তাই মা যশোদারূপে প্রকটিত হইয়া নন্দাশক্তির পরিপুষ্টি বিধান করেন। এই যশোদার ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত আনন্দময় শক্তিই শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশ সাধন করেন, ইঁহারই নাম নন্দা শক্তি। ইনি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। বিন্ধ্যাচল— হৃদয়দেশ। হৃদয়স্থা আনন্দময়ী শক্তিকর্তৃকই অস্মিতা মমতার বিনাশ হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সুমেরু পর্বতকে মস্তক, বিন্ধ্যপর্বতকে হৃদয় এবং কুলপর্বতকে মূলাধাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

স্থূলকথা এই যে, মা বলিলেন, এই যুগেও জীব যখন বিশেষভাবে সত্যচ্যুত হইয়া পড়িবে, আমার সন্ধান না পাইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া পড়িবে, তখনই আমি জীবহৃদয়ে যশোদাগর্ভসম্ভবা নন্দাশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া, তাহাদের অহঙ্কার বিনাশপূর্বক তাহাদিগকে সত্যলোকে লইয়া আসিব। দ্বাপরযুগেও মা আমার শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া এই নন্দগোপগৃহজাতা যশোদাগর্ভ-সম্ভব নন্দাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ছিলেন, এবং কংস শিশুপাল প্রভৃতি অসুরকে বিনাশ করিয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মূর্তিরহস্যে এই নন্দাদেবীই বিষ্ণুশক্তিরূপে—লক্ষ্মী-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—**'কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃত চতুর্ভুজা। ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রীরুক্মাম্বুজাসনা'** ইত্যাদি। ইনি যে বিষ্ণুশক্তি তাহা মধুকৈটভ বধেও উক্ত হইয়াছে। সেই প্রথম চরিতে এই নন্দাশক্তি এবং রক্তদন্তিকা বীজের উল্লেখ আছে। রক্তদন্তিকার বিষয় পরবর্তী মন্ত্রেই পাওয়া যাইবে। যে শক্তি বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইয়া তখন মধুকৈটভকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই শক্তিই এই যুগে নন্দাশক্তিরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে নিহত করিবেন।

শুন— শক্তি বস্তুটি অনুভবগম্য কারণস্বরূপ। যখন উহা কার্যরূপে— দৃশ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সাধারণভাবে ঐ কার্যই শক্তিমানরূপে ব্যবহারের বিষয় হয়। দেখ—একটি বৃক্ষ। উহা স্বয়ংই একটি শক্তিমাত্র হইলেও, আমরা কিন্তু 'বৃক্ষের শক্তি', এইরূপই ব্যবহার এবং অনুভব করিয়া থাকি। বাস্তবিক এস্থলে শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদই নাই। ঠিক এইরূপ এক অখণ্ড মহতী শক্তি চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম যখন যেভাবে আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি সেইরূপ ভাবে বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত হইয়া থাকেন ইহাতে তাঁহার একত্বের কোনই হানি হয় না। তাই এ দেশের লোক তেত্রিশ কোটি দেবতা দর্শন করিয়াও অদ্বৈতবাদী। এই ধন্য দেশের জনগণ এমনই শক্তিবাদী ও চৈতন্যদর্শী যে, কোনও স্থানে কোনরূপ বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ দেখিলেই, তাহাকে একটা জড় শক্তিমাত্র না দেখিয়া, উহাকেই দেবতা বলিয়া, ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। অন্যদেশের লোক ইহার বৈজ্ঞানিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে না পারিয়া, হয়ত ইহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিবে ; তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। এই পৌত্তলিকগণই বিশ্বে সর্ব প্রথমে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে অদ্বয় জ্ঞানের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছিলেন। আবার এখন— এই পূর্ণ

অবিশ্বাসের যুগেও এ দেশের লোক নানা দেবতার পূজা করিয়াই অভীষ্টফল-লাভপূর্বক অদ্বয়জ্ঞানের যোগ্য অধিকারী হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এস্থলে পুনরায় সাধন-সমরের পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যদিও এই গ্রন্থে যাবতীয় দেব-দেবীর আধ্যাত্মিক রহস্যই বিবৃত হইয়াছে, তথাপি উহাদের বিশিষ্ট মূর্তির অপলাপ করা হয় নাই। এই নন্দা শক্তি প্রভৃতির বিশিষ্ট মূর্তি যে হইতেই পারে না, অথবা এখন আর এইরূপ মূর্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা যেন কেহই মনে না করেন। **'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'** এই সত্য বাক্যটির উপর লক্ষ্য রাখিলেই, মূর্ত অমূর্তবিষয়ক সংশয় বিদূরিত হইবে। মূর্তিরহস্য 'পূজাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

———○———

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে ।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥ ৩৯ ॥
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্ ।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥ ৪০ ॥
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। আবার আমি অতিভীষণ আকারে পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে নিহত করিব। সেই উগ্র বৈপ্রচিত্ত নামক অসুরগণকে ভক্ষণ করিয়া, আমার দন্তসমূহ দাড়িমী পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তখন স্বর্গে দেবতাগণ এবং মর্তলোকে মানবগণ সতত স্তব করিতে করিতে আমাকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্তন করিবে।

ব্যাখ্যা। বেদবিদ্-ব্রাহ্মণকে বিপ্র বলে—**'বেদপাঠাৎ ভবেদ্ বিপ্র'**। যাঁহাদের চিত্তে বেদ অর্থাৎ আত্ম-সম্বেদন প্রকাশ পায় তাঁহারাই বেদবিৎ তাঁহারাই বিপ্র, তাঁহাদের যে চিত্ত, তাহাই বিপ্রচিত্ত। এই বিপ্রচিত্তে যে ভাব বা বৃত্তি সকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণ বলা যায়। ইহাদিগকে নিধন করিবার জন্য মাকে অতি উগ্ররূপে প্রকটিত হইতে হয় ; কারণ আত্মসম্বেদন-সম্পন্ন পুরুষগণের চিত্ত অতিশয় বীর্যশালী, উহাদিগকে বিলয় করিতে হইলে মাকেও অতি উগ্ররূপে আবির্ভূত হইতে হয়।

ইতিপূর্বে যোগীদের নির্মাণ-চিত্তের বিষয় বলিয়া আসিয়াছি। যোগশাস্ত্রে একটি সূত্র আছে—**'নির্মাণ-চিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ'** আত্মবিৎ পুরুষগণ অস্মিতামাত্র হইতে নির্মাণ-চিত্তসমূহের সংগঠন করেন। অর্থাৎ চিত্ত-বিলয়ের পর আবার অভিনব চিত্ত নির্মাণ করেন। উদ্দেশ্য—বিশ্বহিত-লোকৈষণা। বিশ্বমঙ্গলের জন্য, যোগী পুরুষগণ যে অভিনব কর্মাশয় গঠন করেন, ইহাকেও বিপ্রচিত্ত অসুর বলা যায়। মা আমার যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া তাহারও বিলয় সাধন করেন। কারণ উহাও কৈবল্যের বিরোধী।

এই বিপ্রচিত্ত নামক অসুরদিগকে বিনাশ করিতে হইলে, মাকে, বিশেভাবে পরাপ্রকৃতির রজোগুণাত্মক চিৎপ্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। যিনি ইতিপূর্বে নন্দাশক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই আবার বিপ্রচিত্ত নামক ভীষণ অসুরগণের বিনাশ করিয়া রক্ত দন্তিকা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। দন্তই ভাবরাশিকে বিলয় করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যখন সেই অতি সূক্ষ্ম উচ্চতমবৃত্তিগুলি সংহারের অঙ্কে বিলয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন সত্যই মনে হয়—প্রলয়ঙ্করী মা যেন রক্তবর্ণ করাল দশন-পংক্তি বিস্তারপূর্বক ভাবসমূহকে গ্রাস করিতেছেন। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনও ঠিক এইরূপই দংষ্ট্রাকরাল মুখের মধ্যে সর্বভাবের বিলয় দেখিয়াছিলেন। গীতার সেই **'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ'**—প্রজ্বলিত অনলমধ্যে পতঙ্গসমূহের ন্যায় রাজন্যবর্গের বিলয় এবং এখানে দাড়িম কুসুম সদৃশ রক্তবর্ণদন্তসমূহের দ্বারা বৈপ্রচিত্ত অসুরকুলের ভক্ষণ, এই উভয় ঠিক একই ভাবের প্রকাশক।

এই সময় হইতে দেবতাগণ এবং মানবগণ নন্দা শক্তিকে রক্তদন্তিকা বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন। মা যখন যেরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যেরূপ কার্য সম্পন্ন করেন, দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ মাকে তখন সেইরূপ ভাবে ও নামে স্তুতি করিয়া থাকেন ; ইহাই স্বাভাবিক। ইনিই ইতিপূর্বে মধুকৈটভ বধের শক্তি ও বীজস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যদিও সেখানে বিপ্রচিত্তের প্রলয়রূপে

কিছু বলা হয় নাই, তথাপি বুঝিতে হইবে—বহুত্ব-স্পৃহার নাশই যাবতীয় চিত্তবিলয়ের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। বহুভাবের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হইলেই, অন্যান্য আসুরিক ভাবের বিলয় হয়। এই রক্তদন্তিকা দেবীর আবির্ভাবে বিপ্রচিত্ত নামক অসুর এবং যোগীগণের নির্মাণ-চিত্ত পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্মাণ-চিত্তের মূলেও যে ঐ বহুত্ব-স্পৃহা সূক্ষ্মভাবে থাকে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও উহা বন্ধনজনক নহে, তথাপি ভেদজ্ঞান ত' বটেই। সে যাহা হউক, এই বহুত্ব-স্পৃহার সম্যক্ বিলয় সাধন করিয়া সাধককে কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জনই নন্দাশক্তি মায়ের রক্তদন্তিকা-মূর্তিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি ।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥ ৪২ ॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্ ।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। পুনরায় যখন শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিবশতঃ পৃথিবী জলশূন্য হইবে, তখন আমি মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া অযোনিজারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব। যেহেতু তখন আমি শতনয়নে মুনিদিগকে নিরীক্ষণ করিব, সেই হেতু সেই সময় হইতে মনুষ্যগণ আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্তন করিবে।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্বে নন্দা শক্তি এবং রক্তদন্তিকা বীজরূপে প্রথম চরিতের রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইবার মধ্যম চরিতের রহস্য বর্ণনার উপক্রম হইতেছে। দেবী বলিলেন, 'আবার আমি আবির্ভূত হইব। যখন শতবর্ষ-ব্যাপী অনাবৃষ্টিবশতঃ জগৎ জলশূন্য হইবে, অর্থাৎ আনন্দময় পরমাত্মরসের অভাবে জীবজগৎ শুষ্ক প্রাণহীন সাধনার কঙ্কালমাত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, মুনিগণ সেই ধর্মের গ্লানিময় অবস্থায় মর্মপীড়িত হইয়া আমার স্তব করিবে, তখন অকস্মাৎ **'ভূমৌ সম্ভবিষ্যামি'** ভূমিতেই আমি প্রকটিত হইব—ভূমির অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থসমূহের জড়ত্বজ্ঞান তিরোহিত করিয়া চিৎসত্তার বা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিব। সেই সময়ে আমি মুনিগণকে—মননশীল সাধকগণকে শতনেত্রে নিরীক্ষণ করিব অর্থাৎ মননশীল সাধকগণ তখন আমাকে বিশ্বতশ্চক্ষুরূপে—বিশ্বব্যাপী দৃক্শক্তিরূপে দর্শন করিবে। সেই সময়ে মনুজগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্তন করিবে। মানুষ যখন যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই আমার দিব্যদৃষ্টি— স্নেহময় বিলোকন দেখিতে পাইবে, তাই শতাক্ষী নাম কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তখন ভূমিতে অর্থাৎ জড়পদার্থসমূহে বিশেষভাবে সত্যরূপে চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিব, সর্বত্র আমার সত্তা উদ্ভাসিত করিব, সেই হেতু মনুজগণ—মনুর সন্তানগণ সর্বত্রই আমার বিশিষ্ট প্রকাশ অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইবে।

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। হে সুরগণ ! তখন আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র লোককে ভরণ অর্থাৎ প্রতিপালন করিব। সেই সময় পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব।

ব্যাখ্যা। দেবী বলিলেন—হে দেবতাবৃন্দ ! সেই শতাক্ষী আমিই আবার শাকম্ভরী নামে প্রসিদ্ধ হইব। কারণ, সেই অনাবৃষ্টি-সময়ে আত্ম-দেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহদ্বারা অখিল লোককে ভরণ অর্থাৎ প্রতিপালন করিব।' নাগোজী ভট্ট এই শাকম্ভরী মূর্তির আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিয়াছেন—চত্বারিংশত্তম মহাযুগ। অর্থাৎ বর্তমান যুগ অপেক্ষায় একাদশটি মহাযুগ অতীত হইলে তবে সে কাল আসিবে। সে সময়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ শস্যাদির সম্পূর্ণ অভাব হইবে, তখন স্নেহবিহ্বলা মা স্বকীয় শরীরোৎপন্ন শাকের দ্বারা পুনরায় বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত জীব-সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন। সেরূপ দুঃসময় আরম্ভ হইবার এখনও বহু বিলম্ব। বর্তমানকালীয় জীবগণের অগণিত অধস্তন পুরুষদিগেরও সেরূপ বিপদাপন্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

সে যাহা হউক, আমরা ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আত্মদেহসমুদ্ভূত শাক শব্দে ক্ষিতিতত্ত্বের রস বা জীবনীশক্তি বুঝায়। ক্ষিতিই আত্মার দেহ ; তাহা হইতে সমুদ্ভূত যে প্রাণ-ধারক শাক অর্থাৎ জীবনী শক্তি, তাহাই আ-বৃষ্টিকাল জীবগণকে রক্ষা করিবে। তাৎপর্য এই যে, যতদিন বৃষ্টি না হইবে, অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্মপ্রজ্ঞার ধারায় সমগ্র বিশ্ব পরিপ্লাবিত না হইবে, (সাধক ! সমগ্র বিশ্ব শব্দে এখানে সমগ্র বুদ্ধি বুঝিয়া লইও) যতদিন জীব আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন মা শাকম্ভরী রূপে আত্ম-দেহ-সমুৎপন্ন প্রাণধারক শাকের দ্বারা জগতের পরিপোষণ করিবেন, অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করাইয়া ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবগণের হৃদয়ে শান্তির উৎস খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

শুন—খুলিয়া বলিতেছি, মা বলিলেন—জগতে এমন একটা সময় আসিবে, যখন অনাবৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহ্মরস-ধারার অভাবে জীবগণ অতিশয় দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া পড়িবে, যখন আর স্থূল জগতে আত্মরসের সন্ধান পাইবে না, আত্মাকে জগদাতীত অজ্ঞেয় বস্তু বলিয়া পরিত্যাগ-পূর্বক জীবগণ একান্ত বহির্মুখ হইয়া পড়িবে, তখন আমি শাকম্ভরীমূর্তিতে আবির্ভূত হইব। এই বিশ্বই যে আমার দেহ, ইহা জীবগণকে বুঝাইয়া দিব। তখন তাহারা আমার এই বিশ্বশরীরে প্রাণধারক শাকের সন্ধান পাইবে। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থই যে প্রাণময়—একমাত্র চৈতন্যবস্তুই যে এই বিশ্বের উপাদান, ইহা তখন অনায়াসে জীববৃন্দের উপলব্ধিযোগ্য হইবে। তখন তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই প্রাণধারক শাক দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ চৈতন্যের সন্ধান পাইয়া স্বয়ং পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

এক কথায় বলিতে পারা যায়—প্রাণহীন, জড়ত্বমুগ্ধ, সংসারসন্তপ্ত মনুষ্যদিগকে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠ করাই মায়ের শাকম্ভরীমূর্তির কার্য। জড়পদার্থে চৈতন্য দর্শনই শাকের দ্বারা জীবন রক্ষার রহস্য। যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম—মা শাকম্ভরীরূপে আমাদিগকে প্রাণপ্রতিষ্ঠ করাইয়া দেন। এই শাকম্ভরীই মধ্যম চরিতের শক্তিরূপে, বর্ণিত হইয়াছে। শাকের দ্বারা জীবগণকে ভরণ অর্থাৎ পোষণ করেন বলিয়াই মা এখানে ঐ নামে অভিহিতা। এই শাকম্ভরী শব্দের আর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে—কঠোপনিষৎ **'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতি ওদনং'** ইত্যাদি মন্ত্রে জীবগণকে অন্ন এবং মৃত্যুকে উপসেচন—ব্যঞ্জন অর্থাৎ শাকরূপে কীর্তন করিয়াছেন। শাক-স্থানীয় মৃত্যুকে যিনি ভরণ করেন, অথবা আত্মদেহ-সমুদ্ভূত শাকস্থানীয় মৃত্যু দ্বারাই যিনি জীবগণকে ভরণ করেন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুরূপ আহার্য দিয়াই যিনি জীবসন্তানকে পরিপুষ্ট করেন, তিনি শাকম্ভরী ; অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ আত্মাই শাকম্ভরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

———০———

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। সেই সময় আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে নিধন করিব। তখন হইতে আমার দুর্গাদেবী এই বিখ্যাত নাম প্রচলিত হইবে।

ব্যাখ্যা। মা বলিলেন, 'সেই শাকম্ভরী মূর্তিতেই আমি দুর্গম নামক অসুরকে নিধন করিয়া দুর্গাদেবী নামে বিখাত হইব ! যে আত্মতত্ত্ব বড়ই দুর্গম, যাহার উপলব্ধি নিতান্ত দুরূহ, শ্রুতি যাহাকে ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত দুর্গপথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্বকে সহজলভ্য করিয়া দিবার জন্যই আমি শাকম্ভরী শক্তিরূপে আবির্ভূত হইব। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া আত্মার সন্ধান দিব। তখন জীবের দুর্গ অর্থাৎ জীবত্বরূপ দুরবস্থা অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাই, সেই সময় হইতে সেই শাকম্ভরী আমিই দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হইব।

দুর্গ শব্দের উত্তর হননার্থক আ ধাতু হইতে দুর্গা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুর্গা শব্দের অর্থ—দুর্গতি হারিণী জননী। এই দুর্গাই মধ্যম চরিতের বীজ। দুর্গতি-হরণই ইহার উদ্দেশ্য। তাই মধ্যম চরিতের উপোদ্ঘাতে শাকম্ভরী শক্তি দুর্গাবীজের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থে **'দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি'** এই অংশটি নাই। প্রাচীন টীকাকারগণও উহার উল্লেখ করেন নাই। পুস্তকে না থাকিলেও আমরা কিন্তু প্রতি জীবেই মায়ের দুর্গাদেবীরূপে আবির্ভাব দেখিয়া

থাকি—যখনই জীব দুর্গত হয়, দুর্গম অসুরের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়, তখনই মা আমার দুর্গাদেবীরূপে আবির্ভূত হইয়া দুর্গম অসুরকে নিপাতিত করিয়া স্নেহের সন্তানের দুর্গতিহরণ করেন, এবং আত্মজ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দেন। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বহুপূর্বকাল হইতেই দুর্গাপূজার প্রচলন হইয়াছে। এখন এই অবিশ্বাসের যুগে—এই শ্রদ্ধাহীনতার যুগেও মানুষ দুর্গাপূজা করিয়া **'ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা, স্ত্রিয়োনরশ্চাপি পশুশ্চদুর্গা, যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং খলুসৈব দুর্গা, দুর্গা স্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ'** বলিতে বলিতে সর্বত্র দুর্গাস্বরূপ দেখিয়া ধন্য হয়, কিন্তু সে অন্য কথা—

———০———

পুনশ্চাহং যদা ভীমঃ রূপং কৃত্বা হিমাচলে ।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৪৭ ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। পুনরায় আমি যখন অতি ভয়ঙ্কররূপ ধারণপূর্বক হিমাচলে অবতীর্ণ হইয়া মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে ক্ষয় করিব তখন মুনিগণ বিনম্রমূর্তিতে আমার স্তব করিবে। তখন আমার ভীমাদেবী এই প্রসিদ্ধ নাম (প্রচলিত) হইবে।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীতন্ত্রের প্রমাণ-অনুসারে এই ভীমা অবতারের কাল—বৈবস্বত মন্বন্তরীয় পঞ্চাশত্তম চতুর্যুগ। সে কাল আসিতে এখন অনেক বিলম্ব। এই সবে অষ্টাবিংশ মহাযুগ চলিতেছে, এখনও একুশটি মহাযুগ অতীত হইলে, তবে ভীমা-আবির্ভাবের কাল উপস্থিত হইবে। আমরা কিন্তু মায়ের এই ভীমামূর্তিতে আবির্ভাব এ যুগেও মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিছুদিন অতীত হইল, পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে মা ভীমামূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক রাক্ষসপ্রকৃতি জীবের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। জড়ত্বে মুগ্ধ জীবগণ যখন একে অন্যের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখনই বুঝিতে পারি— মা আমার রাক্ষসী প্রকৃতিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ; এইরূপ জীবের বিনাশের জন্যই মাকে মধ্যে মধ্যে ভীমামূর্তিতে—ভয়ঙ্করীরূপে আবির্ভূত হইতে হয় ।

সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাই— মুনিদিগের পরিত্রাণের জন্যই এই ভীমাশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। মুনিগণ— মননশীল সাধকগণ যখন রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পড়েন তখনই মা এইরূপ ভয়ঙ্কর-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েন। 'হিমাচলে' মায়ের আবির্ভাব হয়। জড়ত্ব-বিমূঢ় জীবকেই হিমাচল বলা যায়। জীব যখন জড়ত্বে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে, জড়ের উন্নতি সাধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া লয়, তখনই মা ভীমামূর্তিতে প্রকটিত হইয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারী রাষ্ট্রবিপ্লব জল-প্লাবন প্রবল বাত্যা প্রবল ভূমিকম্প প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাক্ষস প্রকৃতি জীবগণের বিনাশ সাধন পূর্বক মননশীল সাধকগণকে রক্ষা করিয়া, জগতে আবার সত্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভীমামূর্তিতে আবির্ভাবের সময় বিশ্বহিতের জন্য ধৃত-ব্রত-মুনিগণ নম্রমূর্তিতে মায়ের স্তব করিয়া থাকেন। মা সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্বোক্তরূপ ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিত্যাগ করেন। তখন আবার প্রশান্ত মূর্তিতে—জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতের অশান্তি দূর করিয়া দেন।

———০———

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্‌পদম্ ॥ ৪৯ ॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্ ।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যখন অরুণাখ্য অসুর ত্রিলোককে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিবে, তখন আমি ত্রিলোকের হিতের জন্য অসংখ্য ষট্‌পদপরিবৃত ভ্রামরী রূপ ধারণ করিয়া, সেই অরুণ নামক মহাসুরকে বধ করিব। সেই সময় লোকসমূহ আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীতন্ত্রের বাক্য অনুসারে বুঝিতে পারা যায়— এই ভ্রামরী অবতারের কাল— বর্তমান মন্বন্তরীয় ষষ্টিতম যুগ। বর্তমান যুগ হইতে একত্রিংশৎ মহাযুগ অতীত হইলে সেই কাল উপস্থিত হইবে। সে সুদূর

ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানে সে কালের কল্পনাও করা যায় না। সে যাহা হউক এই মূর্তির স্বরূপ বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে—**'তেজোমণ্ডল দুর্দ্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ। চিত্রভ্রমর পাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে।'** অসংখ্য ভ্রমর পরিবেষ্টিত অথবা বিচিত্র ভ্রমর-পাণি এই মূর্তি অরুণ নামক অসুর হনন করিবেন।

এইবার আমরা ইহার আধ্যাত্মিক রহস্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব। আত্মজ্ঞান উদয়ের পূর্বাবস্থাকেই অরুণ নামক অসুর বলা যায়। যেরূপ সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণোদয় হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসূর্য উদয়ের পূর্বেই চিদাভাসরূপ অরুণের উদয় হয়। তাহা দেখিয়া যে সকল সাধক উহাকেই চরম জ্ঞান বলিয়া মনে করেন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা এই অরুণাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত। উত্তম চরিতে যাহা শুম্ভাসুর নামে আখ্যাত হইয়াছে, উহারই অপর নাম অরুণাখ্য অসুর। এই অরুণাসুর যথার্থই ত্রিলোকের উৎপীড়ক—ত্রিলোকের মহাবাধা—অতিশয় উৎপীড়ন সংঘটন করে। অহং আত্মা সাজিয়া অনেক কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব প্রভৃতি ব্যাপারসমূহের আশ্রয় হইয়া থাকে। তাই মা আমার ভ্রামরীরূপে ভ্রমবিনাশিনীরূপে আবির্ভূত হইয়া, চিদাভাসের আত্মত্বভ্রম বিনষ্ট করিয়া দেন। অন্নময়াদি ষাট্-কোষিক দেহের নাম ষট্‌পদ। এখানে পদ শব্দের অর্থ স্থান। অনাত্ম বস্তুতে আত্মত্বভ্রম এই ছয়টি স্থানেই প্রকাশ পায়। তাই চিন্ময়ী মা আমার ষট্‌পদ পরিবৃতারূপে ভ্রামরী নামে অভিহিতা হন। যখন পরমাত্মা মা স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া এই দুরপণেয় ভ্রমের বিনাশ সাধন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানাভাসরূপ ত্রিলোক উৎপীড়ক অরুণাসুরকে বিনাশ করেন তখন লোকসকল বিশুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধান পাইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভ্রমবিনাশিনী মাকে ভ্রামরী নামে নানাবিধ স্তব করিতে থাকে। তাই মন্ত্রে **'ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ'** এইরূপ দেবীবাক্যের উল্লেখ আছে। ঋষিচ্ছন্দে এই ভ্রামরীদেবীই উত্তম চরিত্রের বীজরূপে এবং ভীমাদেবী শক্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। যিনি ভীমাদেবীরূপে রাক্ষসী প্রকৃতিকে বিলয় করেন, তিনিই চিদাভাসরূপ অরুণাসুরকে বিনাশ করিয়া ভ্রামরী নামে অভিহিত হন। আনন্দপ্রতিষ্ঠাই উত্তম চরিতের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এইবার আমরা সংক্ষেপে পূর্বোক্ত মন্ত্র কয়েকটির সারমর্ম বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিব। প্রথম—নন্দা শক্তি, রক্তদন্তিকা বীজ, ইহা মধুকৈটভ-বধ—সত্য প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের সূত্র। দ্বিতীয়—শাকম্ভরীশক্তি, দুর্গা বীজ, ইহা মহিষাসুরবধ—প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদের সূত্র। এবং তৃতীয়—ভীমা শক্তি, ভ্রামরী বীজ, ইহা শুম্ভনিশুম্ভ বধ—আনন্দপ্রতিষ্ঠা বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সূত্র। দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণিত তিনটি রহস্যের এই তিনটিই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কেবল অতীত যুগেই যে এইরূপ বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল, তাহা নহে ; বর্তমান কালেও প্রত্যেক সাধকহৃদয়ে ঐরূপভাবে মায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার ভবিষ্যতেও যে মা আমার ঠিক এইরূপেই আত্মপ্রকাশ করিবেন, এইখানেই তাহার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বর্তমান সাধন-সমরে মা আমার যে সকল মূর্তিতে যে সকল অসুর নিধন করিলেন, ভবিষ্যতেও এইরূপই করিবেন ; যে সময়ে মূর্তিসমূহের নাম ও রূপের বিভিন্নতা এবং অসুরগণেরও নাম ও কার্য প্রণালীর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। পূর্বোক্ত কয়েকটি মন্ত্র হইতে এইরূপ তাৎপর্যই লক্ষিত হয়। ইহা একটু ভাবিবার বিষয়ও বটে। সুদূর ভবিষ্যৎকালে[1] সত্য সত্যই জীবসমূহ বর্তমান কালীয় জীব অপেক্ষা অধিক বিমূঢ় এবং অনেক বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হইবে। তখনকার আসুরিক বৃত্তিসকল যথার্থই বর্তমান কালাপেক্ষা আরও ভীষণতর হইবে। তখন অজ্ঞান এই জীবজগৎকে আরও আচ্ছন্ন করিবে। এইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার যখন অত্যন্ত ঘন হইবে, জ্ঞানময়ী মাও তখন অধিক সুলভা হইবেন। তাই, মন্ত্রেও দেখিতে পাই, ভবিষ্যৎ যুগে সর্বপ্রথমেই নন্দামূর্তিতে শুম্ভনিশুম্ভবধ। তারপর শাকম্ভরী মূর্তিতে

[1]বর্তমান কলিযুগের পর আবার সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতীত হইলে, দ্বিতীয়বার কলিযুগ আসিবে। এইরূপ একদশটি কলিযুগ অতীত হইলে যে কলিযুগ আসিবে তাহাতে নন্দাশক্তি—এইরূপ একবিংশতি কলিযুগ অতীত হইলে শাকম্ভরীশক্তি, এবং একত্রিংশ কলিযুগ অতীত হইলে ভীমাশক্তির আবির্ভাব হইবে। ইহা তন্ত্রের প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায়।

অনাবৃষ্টি হইতে স্বদেহোৎপন্ন শাকের দ্বারা দেশরক্ষা, দুর্গারূপে দুর্গমাসুর বধ, ভীমামূর্তিতে রাক্ষস নিধন পূর্বক মুনিদিগের রক্ষা এবং ভ্রামরীরূপে অরুণাসুর বধ। ইহাই মায়ের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতিঃ।

অনুবাদ। এইরূপ যখন দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়ন হইবে তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া অরি সংক্ষয় করিব।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয়
দেবীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দেবীর স্তুতি।

ব্যাখ্যা। ইহাই দেবীবাক্যের উপসংহার। দেবতাগণ ত্রৈলোক্যের সর্ববাধা প্রশমনরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মা সেই বর প্রদানে উদ্যত হইয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে সুদূর ভবিষ্যৎ কালেও যত প্রকার উৎপীড়ন হইবে, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। সর্বশেষে বলিলেন—'যখন যখনই অসুর উৎপীড়ন উপস্থিত হইবে, তখন তখনই এইরূপ আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অরিকুল বিনষ্ট করিয়া দিব। আত্মজ্ঞান লাভের পথে যত প্রকার বাধা—উৎপীড়ন আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, মাতৃ-চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানগণের সে সকল বাধাবিঘ্ন মা স্বয়ং স্বহস্তে বিদূরিত করিয়া দেন। ইহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র আশার বাণী ও ভরসার স্থল। গীতায় শ্রীভগবানও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। আত্মসমর্পণ-যোগীর সকল ভার একমাত্র মাতৃ-অঙ্কে বিন্যস্ত ; সুতরাং তাহারা সম্যক্ নিশ্চিন্ত, পূর্ণ আনন্দময়—মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্নশিশু। তাহাদের যত রকমের বাধাই উপস্থিত হউক না কেন, মা স্বয়ংই তাহা দূর করিয়া দেন, বর্তমান কালে ভবিষ্যৎকালে এবং অতীত কালে ইহার অন্যথা কখন হয় না, হইতে পারে না। এস সাধক, আমরাও '**শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তু তে**।।' বলিয়া মাতৃচরণে শরণাগত হই। মা আমাদিগকে সর্ববিধ অসুর-অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

মা এস্থলে '**অবতীর্যাহং**', বলিয়া যে অবতার-তত্ত্বের আভাস দিলেন, পরবর্তী অধ্যায়ে 'এবং ভগবতী' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা সম্যক্ ব্যক্ত হইবে।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
নারায়ণী স্তুতি সমাপ্ত।

ফলশ্রুতি

দেব্যুবাচ।

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্‌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই সকল স্তবের দ্বারা আমার স্তব করিবে, আমি নিঃসংশয়রূপে তাহার সকল বাধা প্রশমন করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া, মা সাধারণ ভাবে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই উপদেশগুলিকে আমরা ফলশ্রুতি নামে অভিহিত করিলাম। মায়ের প্রথম কথা **'এভিঃ স্তবৈঃ'**। মধুকৈটভ বধে ব্রহ্মার স্তব (ত্বং স্বাহা ইত্যাদি), মহিষাসুর-বধে শক্রাদি স্তুতি, দেবীদূত-সংবাদে নমস্তস্যৈ স্তুতি এবং শুম্ভবধের অবসানে নারায়ণী-স্তুতি, এই সকল স্তবকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে **'এভিঃ স্তবৈঃ'** বলা হইয়াছে।

মায়ের দ্বিতীয় কথা—সমাহিত। চিত্ত যদি সমাহিত অর্থাৎ আত্মস্থ হয়, তাহা হইলেই স্তবাদি পাঠের যথার্থ ফললাভ হইয়া থাকে। অবশ্য সম্যক্‌ভাবে আত্মস্থ হইলে, তখন আর স্তব হইতে পারে না ; সে অবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি ত্রিপুটী জ্ঞানেরও বিলয় হইয়া যায় ; এস্থলে সেরূপ সমাহিত অবস্থার কথা বলা হয় নাই। এখানে সমাহিত শব্দে বুঝিতে হইবে— মায়ের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা। মায়ের দিকে তাকাইয়া, চিত্তের বৃত্তি মাতৃমুখী করিয়া স্তুতিবাক্যসমূহের যথাযথ অর্থবোধ করিয়া, সেই অর্থানুযায়ী ভাবে ও রসে স্বয়ং ভাবুক ও রসিক হইয়া, যথাসাধ্য মাতৃমহত্ত্ব কীর্তন করিতে পারিলেই সমাহিত অবস্থায় স্তুতি পাঠ হইয়া থাকে। মহত্ত্ব-কীর্তন এবং নাম কীর্তন একই কথা। এমন কোন নাম নাই, যাহাতে মায়ের মহত্ত্ব কীর্তিত হয় না ! হরি কৃষ্ণ রাম দুর্গা শ্যামা শিব শঙ্কর প্রভৃতি যে কোন নাম উচ্চারণ করা যাউক না কেন, সেই নামের যথার্থ অর্থের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োগ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেক নামই মহত্ত্ব জ্ঞাপক। যদি নামের সঙ্গে সঙ্গে সত্যার্থ-জ্ঞানরূপ সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সকল নাম প্রাণময় ও মহত্ত্বময় হইয়া অভীষ্ট দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া থাকে ; সুতরাং যাঁহারা সাধক, তাঁহারা নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামানুযায়ী ভাবে ও রসে ভাবময় ও রসময় হইয়া থাকেন। তাই, সর্বাগ্রে মন্ত্রচৈতন্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা সাধকমাত্রেরই একান্ত আবশ্যক। মন্ত্রচৈতন্য না হওয়া পর্যন্ত স্তব স্তুতি পূজা জপ উপাসনা সকলই যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত হয়। প্রথম খণ্ডে মন্ত্রচৈতন্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যাঁহারা সমাহিত-চিত্তে স্তোত্রপাঠ করিতে পারেন, মা সত্য সত্যই তাঁহাদের সকল বাধা স্বয়ং প্রশমিত করিয়া থাকেন। কেন করিয়া থাকেন ? মনে কর, তুমি বলিতেছ— সমাহিত চিত্তে সত্যজ্ঞানে সরল প্রাণে বলিতেছ—**'ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং'** ঐরূপ বলিতে বলিতে অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ এবং পাপক্ষয়ের ভাব তোমার চিত্তে নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিবে। কার্যতঃ তাহাই সংঘটিত হইবে ; কারণ, চিত্তে যে ভাবটি সম্যক্‌রূপে আহিত হয় কিছুদিন পরে ফলরূপেও তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। চিত্তকে যেরূপ ভাবে গঠিত করা যায়, চিত্ত ঠিক সেইরূপ ফলই আনয়ন করে। এসকল বিষয় যুক্তির দ্বারা বুঝাইবারও কোন প্রয়োজন নাই ; যেহেতু ইহার ফল প্রত্যক্ষ। যখনই ঐরূপ অনুষ্ঠান করা যায় তখনই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারা যায়। শুধু বাক্যে জানিয়া রাখিলে হয় না, কার্যে করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়।

———০———

মধুকৈটভনাশঞ্চ মাহিষাসুর-ঘাতনম্‌ ।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ২ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসং ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্‌ ॥ ৩ ॥
ন তেষ্যাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্‌ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যাহারা একাগ্রচিত্তে অষ্টমী নবমী চতুর্দশীতে মধুকৈটভ-নাশ, মহিষাসুর-নিধন ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-রূপ আমার উত্তম-মাহাত্ম্য কীর্তন করে, অথবা যাহারা ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, তাহাদের কোনরূপ দুষ্কৃত, অথবা দুষ্কৃতজন্য কোন আপদ থাকে না ; এবং দারিদ্র্য কিংবা ইষ্টবিয়োগ উপস্থিত হয় না।

ব্যাখ্যা। পূর্ব মন্ত্রে শুধু স্তব পাঠের ফল পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রগুলিতে সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠের ও শ্রবণের ফল কীর্তিত হইল। অষ্টমী চতুর্দশী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ কীলক স্তোত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই সকল মন্ত্রে যে ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে, উহা অর্থবাদমাত্র নহে। যথার্থই এই সকল মন্ত্রোক্ত ফল লাভ হয়— যদি সাধক দেবী যে দুইটি কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে।

দেবী বলিলেন—'একচেতসঃ' এবং 'ভক্ত্যা'। প্রথমতঃ— এক যে বস্তু— যাঁহার কোনরূপ ভেদ নাই, চিত্তকে তাঁহার অভিমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। আর দ্বিতীয়তঃ—ভক্তির সহিত স্তোত্রাদি পাঠ করিতে হইবে। দেবীর বাক্যে অচল বিশ্বাস এবং দেবীর-অভিমুখে চিত্তবিন্যাস এই দুইটি থাকিলেই দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তনের বা শ্রবণের যাহা যথার্থ ফল, তাহা অবশ্যই লাভ হয়। দুষ্কৃতাদি যথার্থই দূরীভূত হইয়া যায়। বিশেষ কথা আমরা এযাবৎ দেবীর এই তিনটি চরিত্র যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই তত্ত্বটি স্থির রাখিয়া যদি কেহ চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করেন তবে তাঁহার নিকট মায়ের যথার্থ স্বরূপটি নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হইবে। তাহার নিকট দুষ্কৃত বলিয়া কিছু থাকিবে না। সুতরাং দুষ্কৃত জন্য আপদেরও সম্ভাবনা থাকিবে না। তারপর দারিদ্র্যের কথা। অভাব বোধের নাম দারিদ্র্য। যিনি **'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং'** সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অভাববোধ থাকিতেই পারে না। তাই মন্ত্রে **'ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং'** বলা হইয়াছে।

'ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্'—ইষ্ট বস্তুর সহিত বিয়োগ হয় না। একমাত্র প্রিয়তম পরমাত্মাই ত' যথার্থ ইষ্ট বস্তু। তাঁহার সহিত কখনও বিয়োগ সংঘটিত হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমাত্মার সহিত কাহারও বিয়োগ সম্ভাবনা নাই ; তবে আবার দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফলে ঐরূপ ইষ্ট-বিয়োগের অভাব বলায় কি লাভ হইল ? এ আপত্তি সত্য। উত্তর এই যে কখনও কাহারও বিয়োগ সংঘটিত হইতে পারে না, ইহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন।

একমাত্র আত্মাই সকলের ইষ্ট ! জ্ঞানী অজ্ঞান ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই একমাত্র ইষ্ট বস্তু আত্মা। যাঁহারা মনে করেন, কামিনী কাঞ্চনই তাঁহাদের ইষ্ট, তাঁহারাও একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, একমাত্র আত্মার প্রীতি সাধনের জন্যই মানুষ কাম কাঞ্চনে আসক্ত হয়। এ জগতে কেহই পার্থিব বস্তুর জন্য আত্মাকে চাহে না, আত্মার জন্যই পার্থিব বিষয়ের অন্বেষণ করে। তাই, বলিতেছিলাম— আত্মাই একমাত্র ইষ্টদেব। তাঁহার সহিত দেবীমাহাত্ম্যতত্ত্বাধিগামী সাধকের কস্মিন্ কালেও বিয়োগ ঘটে না, ঘটিতে পারে না।

আর সাধারণ অর্থে ইষ্টবিয়োগ শব্দে, পার্থিব প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুর অভাব বুঝিয়া লইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কারণ, দেবীমাহাত্ম্য তত্ত্বাধিগামী সাধকগণ মৃত প্রিয়জন, অথবা বিনষ্ট প্রিয়বস্তুকে ইচ্ছামাত্রেই স্বকীয় হৃদয়-পুণ্ডরীক মধ্যে দেখিতে পান। ছান্দোগ্য উপনিষদেও একথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কার্যতঃ তত্ত্বদর্শী সাধকগণের কোন অবস্থায়ই ইষ্টবিয়োগ হয় না।

আর যদি **'ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্'** বাক্যটির অর্থ করিতে গিয়া বল যে, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখ হয় না, সে ত' চমৎকার অর্থ। শ্রুতি বলেন **'তরতি শোকমাত্মবিৎ'** যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা শোক হইতে—ইষ্ট-বিয়োগজন্য দুঃখ হইতে চিরপরিত্রাণ লাভ করেন।

———○———

শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। শত্রু দস্যু রাজা শস্ত্র অনল এবং জলপ্লাবন হইতে তাহার (দেবীমাহাত্ম্য-পাঠকের) কখনও কোন ভয় থাকে না।

ব্যাখ্যা। সাধারণ অর্থে এইরূপ বটে। ভক্তির সহিত সমাহিত চিত্তে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে শত্রু দমন হয়, দস্যু দলন হয়, শস্ত্র অগ্নি জলপ্লাবনাদি বিপদ বিদূরিত হইয়া যায়। আবার অন্যদিকে দেখ— দেবীমাহাত্ম্য ঐরূপভাবে পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে সাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহার ফলে কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ কোনরূপে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, বিবেক-ধনহরণকারী মোহরূপ দস্যুগণ বিপন্ন করিতে পারে না।

যতদিন আত্মাসাক্ষাৎকার না হয় ততদিন প্রবল প্রারব্ধসংস্কারবশে সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেক সাধকই আশঙ্কা করেন—কবে কোন্ গুপ্ত সংস্কাররূপী দস্যু অতর্কিত আক্রমণে তাঁহার অতি কঠোর সাধনা-লভ্য জ্ঞানটুকু ভক্তিটুকু কিংবা সিদ্ধিটুকু কাড়িয়া লইবে ; এই যে দস্যুভীতি, ইহা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারীর পক্ষে উপহাস মাত্র। কারণ, তিনি দেখেন, আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই। সত্যদর্শি-সাধকগণের আবার ভয়ই বা কি, আর পতনই বা কি ?

তারপর রাজভয়ের কথা। ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তাহা হইতেও কোন ভয় থাকে না। মনের চঞ্চলতা, বিষয়াভিমুখিতা আত্মবিদ্‌গণের নিকট অর্থহীন বাক্য-স্বরূপ। আরে, মন চঞ্চলই থাকুক বা স্থিরই থাকুক, আত্মাভিমুখীই থাকুক অথবা বিষয়াভিমুখীই থাকুক, তাহাতে আত্মার কি ? 'আমি' ত' আত্মা মা। 'আমার' আবার রাজভয়—মনের চঞ্চলতার জন্য ভয় কি ? যাহারা 'আমাকে' চেনে নাই ধরিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই, তাহারাই বলে—মনের চঞ্চলতার জন্যই সাধন ভজন হইল না। আরে চঞ্চলতার ভিতর দিয়াই একটু সময়ের জন্য মাকে— আত্মাকে দেখ না ; সেই ক্ষণার্দ্ধ-কালেই যে জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

'ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ' এই বাক্যটি গীতার ঠিক সেই **'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ'** বাক্যের সহিত সমানার্থক। শস্ত্র অনল এবং জলৌঘ হইতে তাঁহার কোন ভয় নাই। গীতায় যাহা উপদেশ শিক্ষা ও শ্রবণ, দেবীমাহাত্ম্যে তাহারই প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি এবং আনন্দ।

———o———

যস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। অতএব সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য সর্বদা পাঠ ও শ্রবণ করিবে ; ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন—অতিশয় মঙ্গলজনক।

ব্যাখ্যা। অতএব কি ঐহিক সুখভোগার্থী, কি পারলৌকিক স্বর্গভোগার্থী, কি মুমুক্ষু, সকলেরই ভক্তিপূর্বক একাগ্রচিত্তে এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা উচিত। একবার পড়িয়া **'সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ'** বলিয়া পুস্তক তুলিয়া রাখিলে চলিবে না। দেবী বলিলেন —**'সদা পঠিতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ'** সর্বদা পড়িবে এবং শ্রবণ করিবে। বারংবার পঠন এবং শ্রবণ করিতে করিতে এই চণ্ডীতত্ত্ব তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে, তোমার জীবনের গতি আত্মাভিমুখী হইয়া, দেবীমাহাত্ম্য-প্রোক্ত সাধনা সকল তোমার জীবনেই অনুষ্ঠিত হইতেছে —দিনের পর দিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তখনই বুঝিবে— দেবী 'সদা' শব্দের প্রয়োগ করিয়া সাধকদিগকে কোথায় যাইতে বলিয়াছেন। ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। জাগতিক সর্ববিধ কল্যাণ এই দেবীমাহাত্ম্যের পাঠ বা শ্রবণ হইতে লাভ করা যায়। তাই মা বলিতেছেন—ইহাই স্বস্তিলাভের একমাত্র উপায়। ইহাতে কোন পাঠক এমন বুঝিবেন না যে, বেদ বেদান্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেবীমাহাত্ম্যেরই পাঠ ও শ্রবণ করিতে হইবে, নচেৎ কল্যাণ লাভ হইবে না ; কথা কিন্তু তাহা নহে। যদি কেহ যথার্থ কল্যাণকামী হইয়া কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে শাস্ত্র বেদ বেদান্তই হউক, অথবা দর্শন পুরাণাদিই হউক, তাহাতে কিছু হানি নাই। সকল শাস্ত্রই এক কথা বলিয়াছেন, কোন শাস্ত্রের সঙ্গে কোন শাস্ত্রের যে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারিলেই শাস্ত্র পাঠের সার্থকতা হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্র এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই বেদেরও একটি নাম ব্রহ্ম। বেদাদি শাস্ত্রেরও ব্যক্তিত্ব আছে। উহা চৈতন্যময় একজন। শাস্ত্ররূপিণী মা কৃপা করিয়া যখন শ্রদ্ধাবান্ পাঠকের হৃদয়ে সত্যার্থের প্রকাশ করেন, তখনই পাঠক শাস্ত্ররহস্য অবধারণ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যে, শাস্ত্রের সেই বিশিষ্ট কৃপালাভ করিতে হইলে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পূজাদি করিয়া শাস্ত্র পাঠ করা কর্তব্য।

শাস্ত্র বলিতে প্রথমেই শ্রুতি উপনিষৎ এই সব বুঝিও। অন্যান্য শাস্ত্রের তাৎপর্য যত বেশী শ্রুতির অনুগামী করিতে পারিবে, ততই সে সকল শাস্ত্রের গৌরব রক্ষিত হইবে। শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য কখনও উপাদেয় নহে। যাহাতে আপাততঃ বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান শাস্ত্র বাক্যগুলিকে শ্রুত্যনুযায়ী একার্থবাচী করিয়া লইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হওয়ার নামই পরম

স্বস্ত্যয়ন—পরম কল্যাণ। শাস্ত্রবাক্যসমূহের একার্থবাচকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সংশয়চ্ছেদরূপ পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই দেবীমাহাত্ম্যে ঐরূপ সর্বশাস্ত্র সমন্বয় বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাই, ইহার পাঠ ও শ্রবণ যথার্থই পরম স্বস্ত্যয়ন।

ব্যবহারিক জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুরু পুরোহিতগণ শিষ্য যজমানের শান্তি ও পুষ্টি কার্যের জন্য দেবীমাহাত্ম্য-পাঠ-রূপ স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

———০———

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্ ।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥ ৭ ॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তেন মম ।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। আমার এই মাহাত্ম্য মহামারীজনিত অশেষ উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাতকে প্রশমিত করে। যে আয়তনে আমার এই মাহাত্ম্য নিত্য সম্যক্ পঠিত হয়, সে আয়তন আমি কদাচ পরিত্যাগ করি না। আমার সান্নিধ্য সেখানে সর্বদাই থাকে।

ব্যাখ্যা। দেবীমাহাত্ম্য-পাঠে মহামারী এবং তজ্জন্য উপসর্গসমূহ প্রশমিত হয়। মহামারী শব্দের সাধারণ অর্থ—জনপদ-উৎসাদক ব্যাধি। উৎপাত এবং উপসর্গের বিষয় নারায়ণী-স্তুতিতে বলা হইয়াছে। স্থূলকথা এই যে, সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে, ত্রিবিধ উৎপাত, ত্রিবিধ উপসর্গ এবং মহামারী প্রশমিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক অর্থে মহামারী শব্দে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু বুঝা যায়। মৃত্যু-জন্য ভয় হইতেই নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, এই মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্মগ্রহণরূপ ভৌম-নরকভোগ—আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ অবশ্যম্ভাবী ; দেবীমাহাত্ম্য-পাঠ এবং শ্রবণ (আত্ম সাক্ষাৎকারের দ্বারা) এই সকল উৎপাত-প্রশমের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে।

যে আয়তনে অর্থাৎ গৃহে নিত্য এই চণ্ডীপাঠ হয়, সে গৃহে মা আমার নিত্যই সন্নিহিতা থাকেন। ইহা সাধারণ অর্থ। আধ্যাত্মিক ভাবে আয়তন শব্দের অর্থ ভোগায়তন ক্ষেত্র—দেহ। মা বলিলেন যে ভোগায়তন ক্ষেত্রে আমার মাহাত্ম্য সম্যক্ পঠিত হয় অর্থাৎ যে মানুষ সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করে আমি সে স্থান কখনও পরিত্যাগ করি না, আমার সান্নিধ্য সেখানে সর্বদাই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য-পাঠকের অন্তরে বাহিরে সর্বদাই মা বিরাজিত থাকেন। গীতার রাজগুহ্যযোগেও ঠিক এইরূপ কথাই আছে—**'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'**।

আচ্ছা মা, তুমি বলিলে—যেখানে চণ্ডীপাঠ হয় সেখানে তুমি নিত্য সন্নিহিতা ; আর যেখানে হয় না, তুমি কি সেখানে সন্নিহিতা নও ? শুন, আমি ছাড়া বাস্তবিক কোন আয়তনই নাই। সুতরাং কোন আয়তনই আমার অসন্নিহিত হইতে পারে না। তবে কথা এই যে, আমি যে সদা সন্নিহিত থাকি, ইহা তাহারাই বুঝিতে পারে, যাহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে। বুঝিতে পারিলে সাধক ! এই মন্ত্রের রহস্য !

———০———

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে ।
সর্ব মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ ॥ ৯ ॥
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্ ।
প্রতিচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। বলিদান পূজা যাগযজ্ঞাদি অগ্নিকার্য এবং মহোৎসব প্রভৃতিতেও আমার এই সমস্ত চরিতকথা পাঠ ও শ্রবণ করিবে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বলি পূজা হোমাদি যদি পূর্ববৎ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ আমার চরিতকথা পাঠ বা শ্রবণপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই আমি সেই সকল কার্য অতিশয় প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা। পূজা হোমাদি বৈধকার্যে এবং মহোৎসবাদি লৌকিক কার্যে এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা একান্ত কর্তব্য। ঐরূপ করিলে বৈধ এবং লৌকিক কার্যসমূহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। ইহা এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—বলিদান পূজা হোম প্রভৃতি বৈধকার্য এবং এবং মহোৎসবাদি লৌকিক কার্যগুলি যদি আমার দিকে—মায়ের দিকে

—আত্মার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবেই উহা সুসম্পন্ন এবং শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে। কারণ, **'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'**, আমিই সকল কর্মযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু। আমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্যের অনুষ্ঠান না করিলে, উহা শিবহীন যজ্ঞে পরিণত হয়। আমিই যে শিব। কর্মরূপে অনুষ্ঠানরূপে কর্মফলরূপে এবং কর্তারূপে আমিই যে নিত্য প্রকাশিত ইহা স্থির রাখিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সকল কার্যের মধ্য দিয়াই আমার চরিতকথার অনুশীলন হইয়া থাকে ; এবং তাহারই ফলে কর্মসকল সুসম্পন্ন হয়।

যাঁহারা জানেন যে, যাবতীয় কর্মদ্বারা একমাত্র আমারই পূজা হইয়া থাকে, তাঁহারাই জ্ঞানী বা বিধিজ্ঞ। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে 'জানতা' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে একটি আত্মসম্বেদনও আছে—**'যোগধ্যানজপার্চানিনামসংকীর্তনানি চ। অহংদেব-বিযুক্তাণি বিকলান্যাহ ব্রহ্মবিৎ।'** যোগ ধ্যান জপ পূজা নামসংকীর্তন, এ সকলের সহিত যতক্ষণ অহংদেব যুক্ত না হন, ততক্ষণ উহা বিকল, অর্থাৎ সামান্য ফলদায়ক। আর বৈধকর্মাদির অনুষ্ঠান-সময়ে যাঁহারা ঐরূপ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে 'অজানতা' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। দেবী বলিলেন—জানতা কিংবা অজানতা, এই উভয় অধিকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। কারণ, আমি ব্যতীত আর কাহারও যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকার নাই। আমি সকলের কর্ম প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন, মাত্র তাহারাই আমার এই প্রীতির সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ বুঝিতে পারেন। আর যাহারা অজ্ঞান, অর্থাৎ যাহারা আমার দিকে লক্ষ্যহীন হইয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা আমার প্রীতিপূর্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ দেখিতে পায় না। জ্ঞানিগণ যখন পত্র পুষ্প ফল জল হবিঃ প্রভৃতি আমার উদ্দেশে অর্পণ করেন তখন—সেই অর্পণ-কালেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে, সত্য সত্যই আমি ঐ সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং কর্মের অনুষ্ঠানকালেই তাঁহাদেরও তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আর অজ্ঞানগণ সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। সে যাহা হউক, উভয়ত্রই—আমার প্রীতির সহিত পরিগ্রহণ বিষয়ে কোন সংশয় নাই—**'প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা।'**

বলি সম্বন্ধেও দুই একটি কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাহারা মাংসপ্রিয়, তাহারা ছাগাদি বলি দিবে। তাহাদের পক্ষে উহাই বিহিত। উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বৃথা-মাংস-ভোজন হইতে সংযত করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐরূপ বলিদানের বিধান করিয়াছেন। রাজসিক পূজায় বলিদান নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, যাহারা মৎস্য-মাংস-পরিত্যাগী, যাহারা সর্বজীবে একই প্রাণের বিদ্যমানতা দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে ছাগাদি-পশু-বলিদান একান্ত অসম্ভব। পূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বলিদান রহস্য সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর সাধক নির্বিচারে পশু বলিদান করিতে পারেন। যাঁহারা নিজের পুত্রটিকেও নিষ্কম্প হৃদয়ে দেবীর উদ্দেশে বলিদানের সামর্থ্য রাখেন। সে যাহা হউক, এখানে মন্ত্রস্থ বলি শব্দের পূজোপহাররূপ অর্থ বুঝিয়া লইলেই সর্বসামঞ্জস্য হয়।

———○———

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী ।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১১ ॥
সর্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্য-সুতান্বিতঃ ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। শরৎকালে আমার যে বার্ষিকী মহাপূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিয়া মনুষ্য আমার প্রসাদে সকল বাধা হইতে মুক্ত এবং ধন্যধান্য-সুতান্বিত হয় ; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ব্যাখ্যা। এখনও ভারতের অধিকাংশ স্থানে শরৎকালে মহাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রকথিত ফললাভ খুব কম লোকেরই হয়। তাহার একমাত্র কারণ—ঐ সমাহিতভাবে এবং ভক্তির সহিত যথাযথভাবে মহাপূজার অনুষ্ঠান হয় না। প্রধান কথা দেবীবাক্যেই সংশয় থাকে—সত্যই যে মহাপূজায় চণ্ডীপাঠের ফলে সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়, সত্যই যে

মানুষ ধনধান্যসুতান্বিত হয়, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে না। এইরূপ সংশয় এবং অবিশ্বাস থাকে বলিয়াই, এ যুগের বৈধ কর্ম আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না।

শরৎকাল— ক্ষিতিতত্ত্বের বিশেষ প্রকট-কাল ! এদেশের ঋতুগুলিও বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রকটভাব সূচনা করে। প্রসঙ্গক্রমে তাহা এইস্থলে বলা হইতেছে। শরৎকাল— ক্ষিতিতত্ত্ব, বর্ষাকাল— অপ্‌তত্ত্ব, গ্রীষ্মকাল— তেজস্তত্ত্ব, বসন্তকাল—মরুৎতত্ত্ব এবং শীতকাল—ব্যোম-তত্ত্ব, হেমন্ত ঋতুর কার্তিক মাসটি শরৎ ঋতুর এবং অগ্রহায়ণ মাসটি শীতঋতুর অন্তর্গত। যখন যে তত্ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে তখন সেই তত্ত্বের ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে শরৎকালের কথাই বলিতেছিলাম। এই সময়ে ক্ষিতিতত্ত্বের অর্থাৎ ঘনীভূত জড়ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। যাঁহারা এই শরৎকালীয় মহাপূজার অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ জড়ত্বের আধিপত্যকালে চৈতন্যময়ী মায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হন— (যে পূজায় স্নপন পূজন বলিদান এবং হোমরূপ চারিটি অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে মহাপূজা কহে) মহাপূজার অঙ্গরূপে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সর্ববাধা হইতে অর্থাৎ আসুরিক বৃত্তির উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ও ধনধান্য-সুতান্বিত হন। প্রেমরূপ ধন, বিশ্বাসরূপ ধান্য অর্থাৎ খাদ্যসম্ভার এবং নির্মল বোধস্বরূপ পুত্র লাভ করেন। যাঁহারা মায়ের পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে চণ্ডী পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁদের প্রেমধনের অভাব হয় না। বিশ্বাসরূপ শস্যে বা খাদ্যসম্ভারে তাঁহাদের হৃদয়প্রাঙ্গণ নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে, এবং জ্ঞানময় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ সংসার নরক হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করে।

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে ।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। আমার এই মাহাত্ম্য এবং শুভ আবির্ভাব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, মনুষ্য যুদ্ধে পরাক্রম লাভ করে ও নির্ভীক হয়। আমার এই মাহাত্ম্য-শ্রবণকারী জনগণের রিপুক্ষয় হয়, কল্যাণলাভ হয় এবং কুল আনন্দিত হয়।

ব্যাখ্যা। দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর বিভিন্ন প্রকারের শুভ উৎপত্তি অর্থাৎ মঙ্গলজনক আবির্ভাব-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ সুরথ **'কথমুৎপন্না'** বলিয়া প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে গিয়া মহর্ষি মেধস্ নানারূপে দেবীর আবির্ভাব-বিবরণ বর্ণনা করিলেন। এই দেবীর উৎপত্তি-বিবরণ সমাহিত-চিত্তে পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে, যুদ্ধে পরাক্রম লাভ হয়, অর্থাৎ আসুরিক বৃত্তিদমনের উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ হয়। আর লাভ হয় নির্ভীকতা। আত্মাই একমাত্র অভয়। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ এই অভয়-স্বরূপ আত্মাকে লাভ করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। **'অভয়ং বৈ প্রদিপদ্যস্ব'**। 'হে বৎস ! তুমি অভয় অমৃতস্বরূপ আত্মাকে লাভ কর।' উপনিষৎকথিত এই অভয় বাণী দেবী-মাহাত্ম্যেও যে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে— এইটি দেখাইবার জন্যই লেখকের এত অধ্যবসায়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবী-মাহাত্ম্য-শ্রবণকারী জনগণের রিপুক্ষয় হয়। রিপুক্ষয় শব্দে কামক্রোধাদি রিপুগণের দমন বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল রিপুর প্রতি সাধকের যে স্বাভাবিক একটা বিদ্বেষভাব থাকে, তাহা দূরীভূত হয় সর্বত্র আত্মদর্শনের ফলে, রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া বিষয়সমূহ নির্বিচারে ভোগ করিবার সামর্থ্য জন্মে। **'কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে'**— কল্যাণ লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই যথার্থ কল্যাণ। আত্মজ্ঞান-লাভ হইলে, জন্মমৃত্যুরূপ অকল্যাণ চিরতরে দূরীভূত হইয়া যায়।

'নন্দতে চ কুলং' কুল নন্দিত হয়। যে কুলে আত্মজ্ঞপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কারণ, তাঁহাদের মুক্তিমার্গ সুগম হয়। আর অধস্তন পুরুষগণ আত্মজ্ঞ পুরুষের কৃপায় ও আশীর্বাদে পরমকল্যাণ লাভ করে। সাধারণের পক্ষে যাহা একান্ত দুর্লভ, সে কুলের পক্ষে তাহা অযত্নলভ্য ; তাই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কুলের পুরুষগণ সর্বদাই আনন্দিত থাকেন।

শান্তিকর্মাণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ ১৫ ॥
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। সর্বপ্রকার শান্তি কার্যে দুঃস্বপ্নদর্শনে এবং উগ্র পীড়া উপস্থিত হইলে, আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। তাহাতে উপসর্গ সকল উপশান্ত হয়, দারুণ গ্রহপীড়া বিদূরিত হয়, এবং মনুষ্যগণ দুঃস্বপ্ন দেখিলেও তাহা সুস্বপ্নরূপে পর্যবসিত হয়।

ব্যাখ্যা। দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণের ইহাই ফল। ইতিপূর্বে দুইটি মন্ত্রেও 'শ্রুত্বা' ও 'শৃণ্বতাং' শব্দে কেবল শ্রবণের কথাই বলা হইয়াছে। সাধক ! শ্রবণই ত' প্রথম এবং প্রধান সাধনা। যাহার শ্রবণ যত বিশুদ্ধ এবং সত্যাবগাহী, তাহার ফললাভ তত শীঘ্র এবং সুনিশ্চিত। শ্রুতিও শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়াছেন। শ্রবণ বিশুদ্ধ না হইলে, মনন বিশুদ্ধ হয় না, মনন ঠিক না হইলে, নিদিধ্যাসনের ফল ব্যর্থ হয়। সুতরাং শ্রবণ যাঁহার যত বিশুদ্ধ, ফলও তাঁহার তত সুনিশ্চিত। এই শ্রবণ ভাল হইবার উপায় কি ? সর্বপ্রথমেই শ্রোতার বিনীত ও শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্যক, তারপর যিনি বক্তা অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হওয়া আবশ্যক। যদি সৌভাগ্যবশে, বহু পুণ্যফলে এইরূপ যোগ্য বক্তা ও শ্রোতার মিলন সংঘটিত হয়, তবে সে স্থানে ফললাভ-বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। এই উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ যোগ্যতা না থাকিলে শ্রবণ বা সাধনা বিফল হইয়া থাকে। যেখানে বক্তা মূক এবং শ্রোতা বধির, সেখানে উভয়ই বিড়ম্বিত হয়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, শান্তি কর্মে দুঃস্বপ্ন দর্শনে উগ্র গ্রহপীড়ায় এই দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে হয়। দেখ জীব, তোমার নিয়তই শান্তির অভাব রহিয়াছে, প্রতিনিয়ত বিষয়চিন্তারূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছ, এবং ইন্দ্রিয়রূপী বিষয়লোলুপ গ্রহগণ[১] তোমাকে অহর্নিশ উৎপীড়িত করিতেছে। যদি তুমি যথার্থ শান্তিলাভ করিতে চাও, যদি দুঃস্বপ্ন হইতে বিমুক্ত হইতে চাও, যদি দারুণ গ্রহপীড়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, তবে **'মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম'** আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলেই মনন ও নিদিধ্যাসন হইবে। তখন তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইবে, তোমার নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ হইবে, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন এবং সংসার দুঃস্বপ্ন বিদূরিত হইবে। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণের ইহাই ফল।

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
দুর্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানং পঠনাদেব নাশনম্ ॥ ১৮ ॥
সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। যেহেতু আমার এই সমস্ত মাহাত্ম্যপাঠ আমার সান্নিধ্য-সম্পাদক, সেই হেতুই ইহা বালগ্রহ কর্তৃক অভিভূত বালকগণের শান্তি প্রদান করে, মনুষ্যগণের পরস্পর বিবাদ বিদূরিত করিয়া মিত্রতা সম্পাদন করে, দুর্বৃত্তগণের বলহানি এবং রাক্ষস ভূত পিশাচগণের বিনাশ সাধন করে।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে তৃতীয় মন্ত্রটি হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য প্রথমেই উহার উল্লেখ আবশ্যক। মা বলিলেন আমার মাহাত্ম্য আমার সন্নিধিকারক। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—যেখানে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ হয়, সেইখানেই মা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। মায়ের সান্নিধ্য হইলেই অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হইলেই যাবতীয় বিঘ্ন ও বিপদ বিদূরিত হয়। বাল শব্দের অর্থ শিশু অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহার প্রতি গ্রহগণের যে অভিভব বা আক্রমণ, তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশে অজ্ঞানজন্য যাবতীয় দুঃখ দূর হইয়া যায়।

'সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং' জীবের যে পরস্পর ভেদজ্ঞান, তাহা দূর হয় এবং মৈত্রীভাব উৎপন্ন হয়। কারণ, মানুষ তখন দেখিতে পায়—এক আমিই ত'

---

[১]বৃহদারণ্যক উপনিষদে গ্রহশব্দে ইন্দ্রিয়গণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রবি চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গ্রহের সহিত ইহাদের বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। কারণ রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য এবং জীবদেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য অভিন্ন।

সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজিত ; আত্মা মানুষমাত্রেরই প্রিয়তম। তিনি সর্বত্র বিরাজিত ; সুতরাং ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না। পরস্পর মৈত্রীভাব স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

তারপর দুর্বৃত্তগণের— অসচ্চরিত্রদিগের বলহানি হয়, অর্থাৎ অসদ্ভাবাপন্ন যে জীবপ্রকৃতি, তাহা একান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যতদিন দেহ থাকে, ততদিন জীবপ্রকৃতি থাকিবেই ; তবে বলহীন হইয়া যায়। আর রাক্ষসী বৃত্তি ও পৈশাচিক বৃত্তিসমূহ দূরীভূত হয়। ভূত-প্রকৃতি, অর্থাৎ ভূতের প্রতি যে আসক্তি—ভূত ও ভৌতিক পদার্থে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহাও বিলয়প্রাপ্ত হয়। **'রক্ষোভূত পিশাচানাং নাশনং'** কথাটির ইহাই তাৎপর্য।

———○———

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥ ২০ ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। উত্তম উত্তম পশু পুষ্প ধূপ গন্ধদ্রব্য এবং দীপাদি দ্বারা পূজা ব্রাহ্মণভোজন হোম অভিষেক এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান এই সকল কার্য সংবৎসরকাল প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইলে আমার যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, আমার এই সুচরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিলে সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। মা বলিতেছেন বাহ্য কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রবণের ফল বেশী। নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপচারের দ্বারা পূজা ব্রাহ্মণভোজন, অভিষেক এবং ভূরিদান প্রভৃতি বৈধকার্য নিয়মিতরূপে দীর্ঘকালব্যাপী অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যতটা শুদ্ধচিত্ত হয়—যতটা আমার স্বরূপ জানিতে পারে, যতটা আমার সমীপস্থ হইতে পারে, সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত আমার এই সুচরিত এই মাহাত্ম্য একবারমাত্র শ্রবণ করিলে মানুষ ততটা চিত্তশুদ্ধি, ততটা জ্ঞান ও ততটা সামীপ্য লাভ করিতে পারে। সদ্গুরুর মুখ হইতে অদ্বৈত জ্ঞানের রহস্য শ্রবণ করিলে অজ্ঞানান্ধ জীবের ক্ষণ-কালের জন্যও একটা প্রবুদ্ধ ভাব আসে। আমি কে, জগৎ কি, ঈশ্বর কাহাকে বলে, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে পাইলে আমার কি লাভ হইবে, ইত্যাদি তত্ত্ববিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান কেবল শ্রবণের ফলেই লাভ হয়। ঐ পরোক্ষ জ্ঞানই ত' মাতৃ-প্রীতির পরিচায়ক ! মা যেখানে আত্মপ্রকাশ করেন, সেখানে এইরূপ ভাবেই তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূজা হোমাদি কিংবা ভূরিদানাদি কার্য দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানের ফলে যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা শ্রদ্ধার সহিত একবারমাত্র সদ্গুরুবাক্য শ্রবণে সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয়, আচার্য শঙ্কর কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান অপেক্ষা, শ্রবণ মননাদির উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এখানে দেবী-বাক্য হইতেও সেই ভাবটিই প্রকাশ পাইতেছে। হ্যাঁ, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য প্রাণহীন কর্মকাণ্ডের দীর্ঘকাল অনুষ্ঠান অপেক্ষা, একবারমাত্র তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ শ্রবণের ফল যে অনেক বেশী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে ইহাও খুবই সত্য যে, এই কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান ধারণের উপযোগিনী ধী'র বিকাশ হয়। জিজ্ঞাসা হইতে পারে —কর্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্বক শুধু শ্রবণ মনন করিলে হয় না কি ? না, কর্মকাণ্ডই ত' শ্রবণ মননাদির সামর্থ্য জন্মায়। যখন কাহারও কর্মকাণ্ড পরিত্যাগের যথার্থ যোগ্যতা আসে, তখনও লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার যথাবিহিত কর্মানুষ্ঠান করা নিন্দনীয় ত' নহেই বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, কর্মকাণ্ডই এই হিন্দুজাতির একমাত্র বিশিষ্টতা। উহা বিলুপ্ত হইলে, অথবা উহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা জনসমাজে পরিব্যাপিত হইলে, অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ যে ম্লেচ্ছদেশে পরিণত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায় নহে। সাধক ! যদিও তুমি যথার্থই কর্মকাণ্ডের উপরে উঠিয়া থাক, তথাপি ঐ তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই প্রাণময় কর্মের অনুষ্ঠান কর। গীতায়ও ভগবান স্বয়ং ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কর্তব্যরূপে কিছু না থাকিলেও শুধু লোকস্থিতি রক্ষার জন্যও শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। দেশের পক্ষে উহাই যথার্থ মঙ্গলজনক। যাহা আছে, তাহাকে নষ্ট করিও না, রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। মৃতকর্মগুলিকে প্রাণময় কর, সত্য সত্যই কল্যাণ লাভ হইবে। কিন্তু এ অন্য কথা ঃ—

এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—মা বলিলেন,

'প্রীতির্মেক্রিয়তে' আমার প্রীতি করা হয়। মায়ের ত' অপ্রীতি কিছু নাই, তিনি নিত্য প্রীতা তাঁর আমার প্রীতি কি ? বাস্তবিক তাঁহাতে অপ্রীতি কিছুই নাই ইহা সত্য হইলেও, তিনি যে প্রীতা এই তত্ত্বটি মাত্র তাহারাই বুঝিতে পারে, যাহারা শ্রদ্ধার সহিত দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে।

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম ॥ ২২ ॥
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্য-নিবর্হণম্ ।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥ ২৩ ॥
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। আমার জন্মসমূহের অর্থাৎ আবির্ভাব-বিবরণসমূহের শ্রবণ এবং কীর্তন করিলে (মনুষ্যের) পাপ দূর হয়, আরোগ্য লাভ হয়, এবং (মনুষ্যগণ) ভূতসমূহ হইতে রক্ষা পায়। যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্যকুলের বিনাশবিষয়ক আমার চরিত-মহত্ত্ব শ্রবণ করিলে, মানুষের বৈরিকৃত ভয় থাকে না। (হে দেবতাগণ !) তোমরা আমার যে স্তব করিলে, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছিল, সেই সকল স্তোত্রপাঠ মানুষকে শুভা মতি প্রদান করে।

ব্যাখ্যা। ফলশ্রুতি বাক্যে এক প্রকারের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি এবং সংশয়াপন্ন লোকের পক্ষে এইরূপ পুনরুক্তির বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এস্থলে মন্ত্রের কয়েকটিমাত্র কথার অর্থ করিব। **'পাপানি হরতি'**—পাপ হরণ করে। অনাত্মবোধের নাম পাপ। যতক্ষণ আত্মাতিরিক্ত কোন কিছুর প্রতীতি থাকে, বুঝিতে হয়—ততক্ষণই পাপ আছে। এই মাতৃ-মহত্ত্ব এবং মাতৃ-স্বরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন করিলে সাধক **'আত্মৈবেদং সর্বং'** এই জ্ঞানে উপনীত হয়, সুতরাং তাহার সর্ব পাপ দূর হয়।

'আরোগ্যং প্রযচ্ছতি' পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ ভবব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ হয়। **'ভয়ং ন জায়তে'**, অভয় অমৃতস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়। **'রক্ষাং ভূতেভ্যঃ'** এই অংশের তাৎপর্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মা আরও বলিলেন—যদি কেহ সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইয়া, মাত্র স্তোত্রগুলি পাঠ ও শ্রবণ করে, তবে তাহারও শুভামতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী বুদ্ধি লাভ হয়।

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ ।
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহতোবাপি শত্রুভিঃ ॥ ২৫ ॥
সিংহ-ব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥ ২৬ ॥
অঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥ ২৭ ॥
সর্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা ।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ২৮ ॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা ।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। অরণ্যে কিংবা প্রান্তরে পতিত, দাবাগ্নি কর্তৃক পরিবৃত, অসহায় অবস্থায় দস্যু অথবা শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত, বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র বা বন্যহস্তী কর্তৃক অনুধাবিত, ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে বধ্য অথবা বন্ধনদশা প্রাপ্ত, মহাসমুদ্রমধ্যে পোতস্থ হইয়া ঝটিকা দ্বারা বিঘূর্ণিত, অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে শস্ত্রপাত মধ্যে নিপতিত, সর্ববিধ ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত, এবং রোগযাতনায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মানুষ যদি আমার চরিত স্মরণ করে, তবে (পূর্বোক্ত) সর্ববিধ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। (যেহেতু) আমার চরিত স্মরণ করিলে আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্রজন্তুগণ, দস্যুগণ, এবং বৈরিগণ দূর হইতেই পলায়ন করে।

ব্যাখ্যা। পূর্বে মায়ের চরিতকথা কীর্তনের ও শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে, এইবার স্মরণের ফল কথিত হইতেছে। শ্রবণ কীর্তনে অসমর্থ হইয়া যথার্থ কাতরভাবে মায়ের এই পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিতে পারিলেও, মানুষ পূর্বোক্ত বিপৎসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। সংসারে যে যে কারণে মানুষের কাতরতা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বলিতে গিয়া, মা এস্থলে অরণ্য প্রান্তর দাবাগ্নি দস্যু প্রভৃতি অনেক কথাই বলিয়াছেন—গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন—**'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য**

ভজস্ব মাম্'। এই মনুষ্যলোক অনিত্য এবং অসুখময় ! সংসারের অনিত্যতা এবং অসুখ প্রতিনিয়ত মনুষ্যগণকে কাতর করিয়া রাখে। সেই কাতর অবস্থায়ও যদি জীব ভগবানকে স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের ফলে কাতরতার হেতুভূত বিপদ হইতে পরিত্রাণ ত' অবশ্যম্ভাবী, অধিকন্তু ধীরে ধীরে জীব ভগবৎসত্তায়ও বিশ্বাসবান্ হয়। যেখানে এইরূপ আর্তজীবের কাতর ক্রন্দন, সেইখানেই মায়ের আমার সুপ্রকট আবির্ভাব।

দেখ জীব, তুমি কি সুখে আছ ! তোমার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াই মা এস্থলে 'অরণ্যে প্রান্তরে বাপি' ইত্যাদি বাক্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ! দেখ, তোমার সংসারটি অরণ্য কিংবা প্রান্তর সদৃশ কি না ? অসংখ্য বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়াও যথার্থই তুমি একা এই সংসার-প্রান্তরে পড়িয়া, সুখের আশা-মরিচিকায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত প্রতারিত হইতেছ। তারপর দেখ, তোমার চারিদিকেই অশান্তির দাবাগ্নি জ্বলিতেছে কি না ? যাহাকে তুমি শান্তি বলিয়া মনে করিয়া লও, একটু ধীর চিত্তে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমার সে শান্তিটুকুও অশান্তি-মিশ্রিত। দেখ, তোমার সাধুবৃত্তিগুলি বহির্মুখ-বিষয়-লোলুপ বৃত্তিরূপী দস্যুগণ কর্তৃক বিলুণ্ঠিত কি না ? দেখ, যাহাদিগকে তুমি মিত্র বলিয়া মনে কর, সেই কাম ক্রোধাদি মিত্ররূপী বৈরিগণ তোমার শান্তিনদীর উপকূল ভাঙিয়া দেয় কি না ? দেখ সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুরূপী দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি-নিচয় কর্তৃক তুমি প্রতিনিয়ত আক্রান্ত কি না ? দেখ, তুমি শূন্য—একা—অসহায় কি না ? ইহার উপর দেখ—রাজার ক্রোধ। যিনি ঈশ্বর, যিনি এই বিশ্বের রাজা, সকল আদেশ পালন করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান কিছুতেই করিতে পারিতেছ না ; সুতরাং তাঁহার নিকট তোমার উপস্থিত হইবার উপায় নাই। তাঁহারই আদেশে তুমি বধ্য—মরণের পথে অগ্রসর এবং বদ্ধ—সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ। আরও দেখ, এই সংসার-মহার্ণবে পতিত হইয়া তোমার জীবনপোত অদৃষ্টবায়ু দ্বারা নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। দেখ, তুমি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দারুণ সংগ্রামে প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হইতেছ। তারপর শারীরিক ব্যাধি এবং মানসিক আধি দ্বারা কতই যাতনা ভোগ করিতেছ। এইরূপে তুমি ঘোর সঙ্কটে নিপতিত। তোমার বর্তমান জীবন বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখ, সত্যসত্যই তুমি ঘোর সঙ্কটে নিপতিত। দেখিয়া আর্ত হও, কাতর হও, একবার আমাকে স্মরণ কর। যে মুহূর্তে স্মরণ করিবে সেই মুহূর্তেই তুমি সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে। পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর, পুনঃ পুনঃ এই সঙ্কটে পরিত্রাণের আস্বাদ পাইবে। যাহাদের জীবনে এখন পর্যন্ত পূর্বোক্ত সঙ্কটসমূহ উপস্থিত হয় নাই, তাহারা আমাকে স্মরণ করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু বৎস, আমি যে তোমাদিগকে বড় ভালবাসি ; তোমাদিগকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন করিয়া আমাকে স্মরণ করিবার সুযোগ প্রদান করি। আজ হউক, কাল হউক, কিছুদিন পরে হউক, নিশ্চয়ই তোমরা এই সুযোগ লাভ করিবে। সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিতে ভুলিও না। স্মরণ করিতে পারিলেই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ ও ক্রমে আমার দেখা পাইবে, ইহাই আমার শেষ বাণী।

———○———

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩০ ॥
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা ।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—চণ্ডবিক্রমশালিনী সেই ভগবতী চণ্ডিকা দেবী দেখিতে দেখিতে দেবতাগণের সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন এবং অরিকুল নিহত হওয়ায়, দেবতাগণও নির্ভয়ে যথাপূর্ব যজ্ঞভাগভোগরূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন।

ব্যাখ্যা। সত্য সত্যই মা আমার এইরূপ দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইয়া যান। মাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় প্রকাশিত হন, আবার আপন ইচ্ছায় অন্তর্হিত হইয়া যান। তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। তবে একটি কথা এই যে, মা যখন চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা-মূর্তিতে আবির্ভূত হন, তখনই জীব যথার্থ ধন্য হয় তাহার জীবত্বের অবসান হয়—বড় সাধের খেলার ঘর তিনখানি ভাঙ্গিয়া যায়, জীব তখন আপন স্বরূপের সন্ধান পাইয়া জীবত্বের মোহ হইতে চির পরিত্রাণ লাভ করে। তখন দেবতাগণও অসুর

উৎপীড়ন হইতে বিমুক্ত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণরূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করে— পরমাত্ম-সম্ভোগজনিত বিশিষ্ট আনন্দ ভোগের সুযোগ পাইয়া থাকে।

———০———

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি ।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুল-বিক্রমে ।
নিশুম্ভে চ মহাবীর্যে শেষা পাতালমাযযুঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। জগদ্বিধ্বংসী অতি উগ্র অতুল বিক্রমশালী দেবরিপু শুম্ভ এবং মহাবীর্য নিশুম্ভ যুদ্ধে দেবীকর্তৃক নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল।

ব্যাখ্যা। অনুচরবর্গের সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীকর্তৃক নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল। পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে—সপ্ত অজ্ঞানভূমিকাই সপ্ত পাতাল। জ্ঞানসূর্যের উদয় হইলে, অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয় ; সুতরাং আত্মস্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞানজন্য আসুরিক বৃত্তিসমূহ তৎসঙ্গে আপনা হইতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানেও দেবী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে শুম্ভ নিশুম্ভরূপী অস্মিতা ও মমতাকে বিলয় করিলেন, আর হতাবশিষ্ট আসুরিকভাবনিচয় আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাধক ! ঠিক এইরূপই হয়, যে মুহূর্তে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হয়, সেই মুহূর্তেই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজন্য যাবতীয় দ্বৈত প্রপঞ্চ সম্যক্ তিরোহিত হইয়া যায়। তারপর ব্যুত্থিত অবস্থায় আবার পূর্বাবধি অজ্ঞানের এবং তৎকার্যের কথঞ্চিৎ অনুবর্তন হয়। এইরূপ অনুবর্তন হইলেও জীবন্মুক্ততার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না ; জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যেরূপ জ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া জীব জগদ্‌ভোগ করে, আত্মজ্ঞান লাভের পর সেইরূপ অজ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া সাধক পূর্ববাধিত জগতে—অনাত্মবস্তুতে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। তারপর প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হইলে অর্থাৎ দেহাবসানে জীব কৈবল্যমুক্তি লাভ করে, চিরতরে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের আর উৎক্রান্তি বা আবর্তন হয় না। তাই শ্রুতি বলেন— **'ন স পুনরাবর্ততে, ন স পুনরাবর্ততে'**, তাঁহার পুনরাবর্তন হয় না, তাহার পুনরাবর্তন হয় না।

এই মন্ত্রে দেবরিপু মহোগ্র প্রভৃতি শুম্ভের যে কয়েকটি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে, ধীমান্ পাঠকদিগের নিকট ঐ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে এ সকলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

———০———

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। হে ভূপ ! সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে মহর্ষি মেধস মহারাজ সুরথকে অবতারতত্ত্বের ইঙ্গিত করিলেন। যদিও ইতিপূর্বে **'ইত্থং যদা যদা'** ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর অবতরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে বিশেষভাবে সুরথকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষি সেই দেবীবাক্যের পুনরুল্লেখ করিলেন —'জগৎ পরিপালনের জন্য দেবী পুনঃ পুনঃ সম্ভূত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন।' অবতারবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অবতার শব্দের অর্থ অবতরণ। বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবতরণ করেন। জীব যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধিস্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতেই আত্মার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। আত্মার এই বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হওয়াই যথার্থ অবতরণ বা অবতার। ইহাতে তাঁহার নির্গুণত্বের কিছুই হানি হয় না, তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ থাকিয়াও স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্যের ন্যায় নির্মল বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন

যিনি সমষ্টি বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত আত্মা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর, যিনি সত্যসঙ্কল্প সর্বকাম, যিনি প্রেমময় স্নেহময় দয়াময়, যিনি প্রভু বিভু নিয়ন্তা, তিনি যখন কোন ব্যষ্টি বুদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া বিশ্বমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তখনই তিনি অবতার আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন কোন দেশের অধিকাংশ লোক আসুরিক বৃত্তিদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, শান্তির আশায় জ্ঞানের পিপাসায় আকুল হইয়া, কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে থাকে, তখন সেই প্রার্থনার ফলে দয়ার আধার পরমেশ্বর কোনও জীববুদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ

করেন, আর যথার্থ পিপাসু জনসংঘ সেই সত্যদর্শীর সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য কৃতকৃত্য হইয়া যায়। ইহাই অবতার-তত্ত্বের যথার্থ রহস্য।

এই অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতা ও চণ্ডী উভয়ই প্রায় তুল্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। গীতা বলেন—**'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'** আর চণ্ডী বলেন—**'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্য-রিসংক্ষয়ম্'**। দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন, ইহাই গীতাকথিত অবতারের কার্য ; আর আত্মস্বরূপ-প্রকাশ ও অরিসংক্ষয়, ইহাই দেবী মাহাত্ম্য-কথিত অবতারের কার্য। প্রথমোক্ত অবতার কর্তৃক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, আর দেবীকথিত অবতার কর্তৃক আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা হইলেই যথার্থ ধর্মের রক্ষা ও জগতের পরিপালন হইয়া থাকে। যেখানে যত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, কোন না কোন রকমে তাঁহা দ্বারা এই সত্য রক্ষিত হইয়াছে। সকল অবতারই আমার চিন্ময়ী মা ; মা ব্যতীত আর কাহারও অবতারের সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যময়ী পরমেশ্বরীই ত' মানবশরীরে অবতাররূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। যিনি যথার্থ অহং, তিনিই ত' অবতীর্ণ হন ! তাই, ইতিপূর্বে মা আমার নিজমুখে বলিয়াছেন —**'অহং অবতীর্য'** আমি অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানরূপ অরিকুলের সংক্ষয় করিয়া থাকি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি —যাহারা যথার্থ পিপাসু, যথার্থ মুমুক্ষু তাহাদের হৃদয়ে মা আমার প্রথমেই অবতারে অবিচল বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

যদি কাহারও অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, অহৈতুক ভক্তি হয়, তবে তাহার শ্রেয়োলাভ সুনিশ্চিত। আচার্য শঙ্করেরও অবতারে বিশ্বাস ছিল ; তিনি গীতাভাষ্যের ভূমিকায় অবতারের কথা বলিতে গিয়া **'দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ ইব'** কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি দেহাদি সংঘাতরহিত, তিনি—সেই শুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমেশ্বর মায়া প্রভাবে দেহ বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। অন্যথা মায়িক জীববৃন্দ তাহার সন্নিহিতও হইতে পারে না। পরমাত্মাই জীবের কল্যাণের জন্য অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা অস্বীকার করিতে না যাইয়া বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেই জীবের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অবতারের মূর্তিটিই ঈশ্বর নহে, মূর্তিমাত্র আশ্রয় করিয়াই পরমাত্মা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা বুঝিতে হইবে। মূর্তিমাত্রে যেন কাহারও অবতার নিশ্চয় না হয়। যাহা অবতারের যথার্থ স্বরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে হয়।

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। (হে সুরথ !) তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করিতেছেন, তিনি এই বিশ্বের প্রসবকর্ত্রী, আবার প্রার্থনা করিলে তিনিই সন্তুষ্ট হইয়া (জীবকে) বিজ্ঞানরূপ ঋদ্ধি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা। মেধস বলিলেন—হে সুরথ ! মা এত সুপ্রকট হইয়াও যে অজ্ঞাত থাকেন, তাহার কারণ, **'তয়ৈ-তন্মোহ্যতে বিশ্বং'**—তিনিই এই বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তবে তিনি কি জীবের শত্রু ? মুক্তিদানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যিনি স্বেচ্ছায় জীবগণকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাঁহাকে শত্রু ভিন্ন আর কি বলা যায় ? না না, তিনি যে মা ! **'সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে'** — তিনিই ত' এই বিশ্বকে প্রসব করেন। মা কি কখনও সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন, বা করিতে পারেন ! তবে তিনি জীবকে দেখা দেন না কেন ? কেন দিবেন না ? **'সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি'**—মা যাচিতা হইলেই, তিনি তুষ্ট হইয়া জ্ঞানৈশ্বর্য প্রদান করেন, অর্থাৎ মাকে চাহিলেই তিনি দেখা দেন। যদি বল—আমরা ত' কত চাহিতেছি, কই দেখা ত' দেন না ! না, চাহিতেই পার না। আরও দুঃখের কথা এই চাহিতে যে পার না, এই কথাটিও বুঝিতে পার না। সত্যই বলছি—চাহিতে পারিলেই তিনি দেখা দেন। জীব ! যখন তুমি শুধু মায়ের জন্য মাকে চাহিতে পারিবে, সত্য সত্যই মায়ের দেখা পাইবে। মায়ের নিকট যাহা চাহিবে, মা নির্বিচারে তাহাই দিবেন। যখন আর কিছু চাহিবে না, শুধু মাকে চাহিবে, তখনই তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তোমায় বিজ্ঞানরূপ ঋদ্ধি—পরম সম্পৎ প্রদান করিবেন, যাহার প্রভাবে তুমি মাতৃ-লাভ করিবে, আত্মজ্ঞ হইবে, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ

করিবে। আবার বলি সাধক, শুধু চাহিতে পারিলেই মাকে পাওয়া যায়। ইহাই সুরথের প্রতি মহর্ষি মেধসের উপদেশ।

———○———

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥ ৩৫ ॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা ।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। হে মনুজেশ্বর ! প্রলয়কালে যিনি মহামারীস্বরূপা, সেই মহাকালী কর্তৃক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রলয়কালে তিনিই মহামারী, সৃষ্টিস্বরূপা, আবার স্থিতিকালে তিনিই ভূতবর্গকে রক্ষণ ও পালন করিয়া থাকেন ; অথচ তিনি স্বয়ং অজা (জন্মরহিতা) এবং সনাতনী (নিত্যা)।

ব্যাখ্যা। মেধস বলিতেছেন— হে মনুজেশ্বর সুরথ ! দর্শন কর— একমাত্র প্রলয়ঙ্করী মহামৃত্যুস্বরূপা মহাকালী এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতি জীব প্রতি পরমাণু প্রতিক্ষণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছায়ও মহামারীর দিকে—মৃত্যুর দিকে—ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখ—একটু জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ ধ্বংসযজ্ঞমাত্র। সূতিকা-গৃহস্থ-সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্যন্ত মহামারীস্বরূপা মহাকালীর বিরাট্ ধ্বংসযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে। জীবের যে বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা বা বয়ঃপরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই জানাইয়া দেয়। সৃষ্টি এবং স্থিতি, ধ্বংসেরই পূর্বায়োজন মাত্র। তাই মহামারী স্বরূপিণী কালিকেই **'সৈবসৃষ্টিঃ'** এবং **'সৈব স্থিতিং করোতি'** বলা হইয়াছে।

জীব ! তোমরা কে কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও। দেখ, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তিরূপে একই মহাকালী মূর্তি নিত্য প্রকটিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও একদিন **'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'** বলিয়া মহাকালরূপে অর্জুনকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই কালরূপী ভগবানই জীবের সাধ্য এবং উপাস্য, কালাতীত স্বরূপ সাধ্য নহে, উহা বাক্য মনের অগোচর স্বতোগম্য। মানুষ এই কালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই, কালবিজয়ী হয়, কালাতীত সত্তায় উপনীত হয়, মৃত্যুঞ্জয় হয়। এস, আমরা সকলেই জয় মা কালী বলিয়া মহাকালের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ি, মা আমাদিগকে বুকে করিয়া কালাতীত ক্ষেত্রে উপনীত হইবেন। আমরা মৃত্যুঞ্জয় হইব।

চিৎস্বরূপা মা সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়, এই ত্রিবিধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও স্বয়ং অজা—নিত্যা। এত বড় ব্যাপারের মধ্যেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষয়োদয় বা বিকার নাই। জীব ! ইঁহার হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বোধটা মহাকালীর শ্রীচরণে অর্পণ কর। আরে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তুমি মহাকালীর অঙ্কেই ত' নিয়ত অবস্থান করিতেছ ! তবে আর নূতন কি করিবে ! যাহা একান্ত সত্য, কেবল তাহাই স্বীকার করিতে ও বুঝিতে বলা হইতেছে। যদি পার—এইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে, তবে নিশ্চয়ই তুমি কালাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইবে। সাংখ্য যাঁহাকে জড়া প্রকৃতি বলেন, বেদান্ত যাঁহাকে মিথ্যাভূতা মায়া বলেন, বৈষ্ণব-শাস্ত্র যাঁহাকে লীলা-বিলাস বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র যাঁহাকে মহাকালী বলেন, তিনি— সেই একজন, যিনি কেবল চিৎস্বরূপ —কেবলানুভবনানন্দ-স্বরূপ, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেই বুঝিতে পারিবে—কিরূপে তিনি অজা এবং সনাতনী হইয়া, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপা হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি এবং মহামারী-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

———○———

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মী র্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৩৭ ॥
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপ-গন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সাবর্ণিক-মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ-নিশুম্ভবধ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। মানুষের অভ্যুদয়কালে তিনিই গৃহে বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মী, আবার অভাবকালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপে সর্বস্বনাশিনী হইয়া থাকেন। তিনি স্তুতা এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজিতা হইলে, বিত্ত পুত্র এবং মঙ্গলদায়িনী ধর্মবুদ্ধি প্রদান করেন।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয়
দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মানুষ যখন ঐহিক কিংবা পারলৌকিক অথবা উভয় প্রকারের অভ্যুদয় লাভ করে, তখন বুঝিতে হয়—'সৈব'—তিনিই—সেই চৈতন্যরূপিণী মা-ই লক্ষ্মী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন তিনি বুদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মী-মূর্তিতে জীবসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন, তখন অভাবনীয় উপায়ে চতুর্দিক হইতে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সম্পৎ কিংবা সাধন সামগ্রী উপস্থিত হইতে থাকে। আবার যখন অভাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তিনি সর্বস্বনাশিনীমূর্তিতে অলক্ষ্মীরূপে মানুষকে অঙ্কে ধারণ করেন তখন মানুষের চতুর্দিক হইতে বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্বত্রই মায়ের আমার মহাকালী-মূর্তি অব্যাহতা। অভ্যুদয়রূপেও মহাকালশক্তি, আবার বিনাশরূপেও তিনি। মহাকালচক্র যখন যেরূপভাবে আবর্তিত হয়, জীব তখন সেইরূপ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া থাকে। মা যখন যে মূর্তিতে যাহাকে কোলে করিয়া বসেন, তখন সে সেইরূপ ভাবেরই অভিনয় করিয়া থাকে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীব কালের—মহাকালীর অঙ্কেই অবস্থিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি উপায়ে এই মহাকালশক্তির প্রসন্নতা লাভ করা যায়। তাহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—**'স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপ-গন্ধাদিভিস্তথা'**, স্তব এবং পূজা, ইহাই মাতৃপ্রীতি লাভের অব্যর্থ উপায়। সকল উপাসনা-প্রণালীর মধ্যেই এই দুইটি অব্যাহত ভাবে অবস্থিত। বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত উপাসনা—উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন এই স্তব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যোগশাস্ত্র-কথিত ঈশ্বর প্রণিধান শব্দটি এই স্তব এবং পূজারই ইঙ্গিত করিয়া থাকে। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবেই ঐ দুইটির উপদেশ করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদসমূহও স্তুতি এবং হোমের আদেশ করিয়াছেন। উপনিষদের সারভূত গীতাশাস্ত্রেও স্বয়ং ভগবান্ স্তব এবং পত্রপুষ্পাদির অর্পণরূপ পূজার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে আমরা সর্বশাস্ত্রে স্তব এবং পূজা, এই দুইটিই ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গরূপ দেখিতে পাই। শ্রবণ মননাদি এবং যম নিয়মাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানই এই স্তব ও পূজার সম্যক্ সার্থকতা লাভের জন্য বিহিত এবং অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে যাহা আবহমান হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে—সেই স্তুতি এবং পূজাকে সাধনার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেই মায়ের প্রীতি হয়, এবং সাধকও অভীষ্ট লাভে ধন্য হয়। নিত্যতৃপ্তা মায়ের বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করিতে হইলে, এই দেবী-মাহাত্ম্য কথিত স্তুতি এবং পূজাকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে হয়।

মায়ের প্রীতি হইলে কি লাভ হয় ? ঋষি বলিলেন—বিত্ত পুত্র এবং ধর্মে শুভামতি। ইহা ব্যবহারিক জগতের ফল। আর আধ্যাত্মিক জগতে ভক্তিসম্পৎরূপ বিত্ত, নির্মল বোধরূপ পুত্র এবং ধর্মে শুভামতি অর্থাৎ ধী লাভ হয়—যাহার ফলে জীবন অনাদিকালের জীবত্ববন্ধন হইতে চিরতরে বিমুক্ত হইয়া যায়। তাই বলি, জীব ! তোমরা সকলে যথাশক্তি মায়ের স্তব এবং পূজা করিতে বিমুখ হইও না। জ্ঞান ভক্তি এবং কর্মের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোন অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

'কলিযুগে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান বৃথা' এইরূপ আপাত লোভনীয় বাক্যদ্বারা যাহারা সাধারণ জনগণকে প্রতারিত ও মোহিত করিতে প্রয়াস পায়, মা তাহাদিগের এই অসুরিক আক্রমণ হইতে সন্তানগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ।

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় ফলশ্রুতি সমাপ্ত।

উপসংহার

ঋষিরুবাচ।

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবী মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ।
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া॥ ১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন, হে মহারাজ ! এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দেবী এইরূপ প্রভাব সম্পন্নাই বটেন। সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এইবার গুরু ব্রহ্মর্ষি মেধস্ রাজা সুরথের নিকট দেবীমাহাত্ম্যের উপসংহার করিতেছেন। তিনি বলিলেন— হে ভূপ ! হে জড়ত্ববিজয়ী জীব, অতি পবিত্র— সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। বহুপুণ্যফলে ব্রহ্মর্ষিগণের আশীর্বাদে তুমি এই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অধিকার লাভ করিয়াছ ; তাই, তোমার নিকট দেবীর এই তিনটি চরিত যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। যাহারা অনধিকারী, যাহাদের এখনও পর্যন্ত গুরুবেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়-প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাদের নিকট ইহা বিশেষ ফলদায়ক না হইলেও, তোমার নিকট ইহা সম্যক্ ফলদায়ক হইবে বলিয়াই আশা করি। তুমি দেবীর এই অপূর্ব মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ইহার কোন অংশে সংশয়ান্বিত হইও না। ইহাতে অতিরঞ্জিত বা কল্পিত কিছুই নাই ; যাহা একান্ত সত্য, তাহাই যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী বিষ্ণুমায়া ; তিনি এইরূপ প্রভাব সম্পন্নাই বটেন ; সুতরাং তাঁহার অলৌকিক চরিত-মাহাত্ম্য বিষয়ে তুমি বিন্দুমাত্র সংশয়বুদ্ধি রাখিও না। এই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই তোমাদের মত জীবকে বিদ্যা দান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদানে মুক্তিমার্গে উপনীত করেন। আবার মুমুক্ষুগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় মুক্তিরূপেও ইনিই প্রকাশিত হন। **'এবংপ্রভাবা সা দেবী'**— মা আমার এইরূপ প্রভাব-সম্পন্নাই বটেন।

———০———

তা ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যেঽবিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে॥ ২ ॥
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ ৩ ॥

অনুবাদ। সেই দেবী কর্তৃক তুমি, এই বৈশ্য এবং অন্যান্য বিবেকী অথবা অবিবেকী, সকলেই মোহিত হইতেছে, অতীত কালে হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অতএব হে মহারাজ ! তুমি সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। তিনি আরাধিতা হইলেই মনুষ্যদিগের ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। বৎস সুরথ ! তুমি এবং এই বৈশ্য সমাধি, উভয়েই একদিন বলিয়াছিলে— **'যন্মোহোজ্ঞানিনোরপি'**। 'জ্ঞানী আমরা আমাদেরও মোহ কেন হয় !' কিন্তু আজ— এতদিনে নিশ্চই বুঝিতে পারিলে যে, সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া কর্তৃক কেবল তুমি এবং সমাধি নহে, অন্যান্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হইয়া থাকে, অতীত কালেও এইরূপ মুগ্ধ হইত, এবং ভবিষ্যৎকালেও এইরূপ মুগ্ধ হইবে। মা যে আমার মহাকালী ! ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এই তিনটি যে মায়েরই মূর্তি ! মা আমার এই ত্রিমূর্তিরূপে যতদিন আত্মপ্রকাশ করিবেন, অর্থাৎ স্মৃতি আশা ও কল্পনারূপে যতদিন জীব-বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইবেন, ততদিনই জীব মহামায়া কর্তৃক এইরূপ মোহিত হইবে। যাঁহাতে কোন কল্পিত বিভাগ নাই, যিনি অখণ্ড, যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে খণ্ডরূপে দর্শন করাই মোহের কার্য। এই মোহ তিনকালেই আছে, তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— **'মোহ্যন্তে মোহিতা মোহমেষ্যন্তি'** এই মোহই জগৎ-প্রপঞ্চের— সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বীজ। 'চক্ষু না বাঁধিলে লুকোচুরি খেলা চলে না' নিজস্বরূপের একটু বিস্মৃতিভাব না আসিলে, লীলাভিনয় সম্পন্ন হয় না ; তাই বিবেকী অবিবেকী সকলেরই এইরূপ মোহ অল্পাধিক আছে, ছিল এবং থাকিবে।

হে সুরথ ! অমাত্য এবং স্বজনগণ কর্তৃক হৃতসর্বস্ব হইয়াও তাহাদের প্রতি তোমার এই যে প্রবল আকর্ষণ, অপহৃত রাজ্যের জন্য এখনও তোমার এই কাতরতা, ইহাই তোমার মোহ। যদি যথার্থই এই অজেয় মোহ হইতে

পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে '**তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্**'—হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও, আর কোন উপায় নাই! শুধু মহামায়ার শরণ লও!

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন— 'যদি আমার এই দুরত্যয়া মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে আমার শরণাপন্ন হও।' 'আমার'—মায়ের শরণে—আশ্রয়ে আগত হও। এইরূপ শরণাগত হইতে পারিলেই মা আমার আরাধিতা হইয়া থাকেন। মা আরাধিতা হইলেই মায়ের প্রীতি তোমার উপলব্ধিযোগ্য হইবে। তখন তিনি তোমাকে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ এই তিনটি ফল প্রদান করিবেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপিণী মায়ের ত্রিবিধ মূর্তির নিকট হইতে তুমি ত্রিবিধ ফললাভ করিবে। মা প্রথম মূর্তিতে ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ করিবেন, তাহার ফলে তোমার বিষয়াসক্তি দূর হইবে; তখন পার্থিব ভোগ সকল আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে; ইহাই মায়ের প্রথম দান। দ্বিতীয় মূর্তিতে তিনি বিষ্ণু-গ্রন্থি- ভেদ করিবেন, তাহার ফলে বিশ্বময় প্রিয়তম-প্রাণসত্তা দর্শন করিয়া তুমি স্বর্গ অর্থাৎ দেবলোক সম্ভোগের অধিকারী হইবে। আর তৃতীয় মূর্তিতে তিনি রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া তোমাকে বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে — আত্মজ্ঞানে উপনীত করিবেন; তখন তমি অপবর্গলাভ করিবে। এইরূপে কেবল তুমি নও, পরমেশ্বরী মায়ের চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানমাত্রেই মায়ের নিকট হইতে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গরূপ তিনটি ফল লাভ করে।

শাস্ত্র যাহাকে চতুর্বর্গ বলিয়াছেন, তাহা এই তিনটিরই অন্তর্গত। ধর্ম এবং অর্থ ভোগের অন্তর্গত, কাম স্বর্গের অন্তর্গত, এবং অপবর্গ ও মোক্ষ একই কথা।

এই মন্ত্রে 'নৃণাং' এই পদটির প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে হইবে—মনুষ্যমাত্রেই এই ভোগাপবর্গের অধিকারী। আশঙ্কা হইতে পারে—তবে সকলেই ভোগাপবর্গের লাভ করিতে পারে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, সকলেই ত' পরমেশ্বরীর চরণে শরণাগত হয় না; মনে রাখিও সাধক, মাতৃ-চরণে যথার্থ শরণাগত সন্তানের ভোগাপবর্গ অবশ্যম্ভাবী।

———০———

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগঃ তমৃষিং সংশিত-ব্রতম্॥ ৪ ॥
নির্বিণ্ণোঽতি মমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে॥ ৫ ॥

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহামুনে (ক্রৌষ্টুকি) এইরূপ তাঁহার (মেধসের) বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃতরাজ্য অত্যন্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ এবং মমত্বহেতু অতি নির্বেদ প্রাপ্ত বৈশ্য, উভয়েই তীব্র-ব্রতধারী সেই মহাভাগ ঋষিকে (মেধস্‌কে) প্রণিপাত পূর্বক সদ্যঃ তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

ব্যাখ্যা। এইবার ব্রহ্মর্ষি গুরু মেধসের বাক্য শেষ হইল। প্রথমে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' বলিয়া দেবীমাহাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছিল, এক্ষণে আবার উপসংহারেও 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' বলিয়া উপাখ্যান শেষ করা হইতেছে। এ পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে সুরথ এবং মেধসঋষির বাক্য চলিয়াছে; মূলে কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষুরূপী মার্কণ্ডেয় কর্তৃক স্থূলাভিমানী বিশ্বরূপী জৈমিনির নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, সুরথ হৃতরাজ্য, সুতরাং অতি নির্বিণ্ণ; বৈশ্য মমত্বাকৃষ্ট, সুতরাং তিনিও অতি নির্বিণ্ণ—অতিশয় নির্বেদপ্রাপ্তদুঃখিত। একজন রাজৈশ্বর্যকামী, আর একজন মমত্ব-পরিহারকামী অর্থাৎ বিবেকান্বেষী; উভয়েই গুরুবাক্যে পরম শ্রদ্ধাবান্। ঋষি যেমন বলিলেন '**তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্**'। সদ্যঃ — অমনি— তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উভয়েই ঋষিচরণে প্রণাম পূর্বক তাঁহার আদেশ পালনের জন তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। আধ্যাত্মিকভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়—সুরথরূপী জীব সমাধিকে সহায় করিয়া বিনীতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুবাক্য শ্রবণ পূর্বক, মনন এবং নিদিধ্যাসনের জন্য যথাশক্তি অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে থাকে।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ, সুরথ রাজ্যার্থী অর্থাৎ কাঞ্চনাসক্ত, আর বৈশ্য স্ত্রী-পুত্রাদির মমতায় আকৃষ্ট অর্থাৎ কামিনীতে আসক্ত। বর্তমান জগৎ যে দুইটি বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্ত, সেই দুইটিই এই চণ্ডীর উপাখ্যান ভাগের প্রধান ভিত্তি। ঘটনাচক্রে উভয়ই বিতাড়িত, তথাপি সেই বিনষ্ট কাঞ্চন ও কামিনীর মোহে আচ্ছন্ন।

সৌভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুলাভ, দেবী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ এবং গুরুর আদেশানুসারে দেবীর চরণে সম্যক্ শরণাগত হইবার জন্য তপস্যা। ইহাই ধর্মজীবন লাভের সাধারণ ক্রম। অধিকাংশ মানুষ এইভাবেই ধর্মরাজ্যে উপনীত হয়। তবে যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই বিষয় বিরক্ত এবং সাধক, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত।

———০———

সন্দর্শনার্থমম্বয়া নদী-পুলীন-সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পর জপন্॥ ৬॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নি-তর্পণৈঃ॥ ৭॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ ৮॥
এবং সমরাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥ ৯॥

অনুবাদ। সেই রাজা এবং বৈশ্য, উভয়ে মাতৃ-দর্শনের জন্য নদী পুলিনে অবস্থানপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ-ফলদায়ক দেবীসূক্ত জপ, মৃত্তিকানির্মিত মূর্তি স্থাপন পূর্বক পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা দেবীর পূজা অগ্নি-তর্পণ (হোম) নিরাহারে ও অল্পাহারে তন্মনস্কভাবে (সমাহিত ভাবে) অবস্থান, এবং স্বগাত্র-রুধির সিক্ত বলিপ্রদান ; এইরূপভাবে তিন বৎসরকাল সংযতচিত্তে আরাধনা করিবার পর, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা-দেবী পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন এবং বলিলেন।

ব্যাখ্যা। এই চারিটি মন্ত্রে রাজা এবং বৈশ্যের তপস্যা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে **'সন্দর্শনার্থমম্বায়াঃ'** অম্বার —মায়ের দর্শন লাভ করিবার জন্য তাহারা উভয়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, বিবিক্ত দেশে নদীপুলিনে অবস্থানপূর্বক নিয়মিত ভাবে দেবীসূক্ত (অহংরুদ্রে ভির্বসুভিঃ ইত্যাদি) জপ, মৃণ্ময়ীমূর্তিপূর্বক পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা পূজা অগ্নিতর্পণ—হোম অল্পাহারে কিংবা নিরাহারে সমাহিত ভাবে অবস্থান এবং স্বগাত্র রুধিরসিক্ত উপহার প্রদান ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ একদিন দুইদিন নয় নিয়মিত তিন বৎসর কাল প্রাণপণ তপস্যা করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে এইরূপ বাহ্যপূজা-বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে ; সুতরাং তাহার পুনরালোচনা নিস্প্রয়োজন। এখানে কেবল মূর্তি-গঠন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে মূর্তিপূজার বিধান বহুল পরিমাণে উক্ত আছে। আবার ঐ সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, মৃৎশিলা ধাতু দারু প্রভৃতি দ্বারা মূর্তি গঠনপূর্বক পূজা করিলে কখনও ঈশ্বর লাভ হয় না ; কথাটা বিবেচ্য। যদি মাত্র মৃত্তিকাদি গঠিত মূর্তিকেই ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানে পূজা করা হয়, তবে সত্য সত্যই যথার্থ ঈশ্বর লাভ হয় না ; কিন্তু মূর্তিটিকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী মহতী শক্তির ঘনীভূত বিকাশরূপে বিরাট চৈতন্য সত্তার কেন্দ্ররূপে— আত্ম-প্রতিবিম্বরূপে পরিগ্রহপূর্বক পূজা করিলে, উহা কখনও নিষ্ফল হয় না। প্রাচীনকালে মনীষিগণ ঐরূপ ভাবে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করিয়াই অভিন্ন জ্ঞানে উপনীত হইতেন, এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জীবন্মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতেন।

কেহ কেহ বলেন, স্থূলবুদ্ধি মানবের জন্যই মূর্তিপূজার বিধান ! কথাটা সর্বাংশে সত্য নহে। মূর্তির যথার্থ রহস্য অবগত হইয়া, সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা করিতে একমাত্র আত্মজ্ঞ পুরুষগণই সমর্থ। তবে বর্তমান কালে এদেশের অধিকাংশ স্থানে যেরূপ ভাবে পূজাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা স্থূল বুদ্ধি কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই উপযুক্ত বটে।

শুন, ধেনুর সর্বাবয়বে দুগ্ধ থাকিলেও যেরূপ স্তন ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা যায় না, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তার বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশিষ্ট মূর্তির আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় না। যাঁহারা স্থূলাতিরিক্ত চৈতন্য-সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই মূর্তি-পূজার যথার্থ অধিকারী। যতদিন স্থূল দেহ আছে, যতদিন এই মাংসপিণ্ডের পূজার জন্য খাদ্য পানীয় বসন ভূষণাদির প্রয়োজন আছে, ততদিন মূর্তিপূজা থাকিবেই। অহর্নিশ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ যোগবাশিষ্ঠপ্রোক্ত পদার্থাভাবিনী এবং তূর্যগা ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই কোন না কোন প্রকারে মূর্তিপূজা করিয়া থাকে ; সুতরাং পূর্বোক্তরূপ অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা, উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক।

জড়জ্ঞানে পূজা করিয়াই কিছুদিন যাবৎ এদেশের জড়ত্ব আসিয়াছে। আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূর্তিপূজা করিতে পারিলেই, এদেশের এই জড়ত্বরূপ পাপ দূরীভূত হইয়া যাইবে। 'পূজাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে এবিষয় সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সুরথ ও সমাধি কেবল মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা সংযতাহারে এবং নিরাহারে তন্মনস্কভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। আহার শব্দের অর্থ বিষয়গ্রহণ। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের আহরণ করার নাম আহার।' এইরূপ আহার যখন সংযত হয়, অর্থাৎ 'ঈশাবাস্য' করিয়া—সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিষয় গ্রহণ করা হয়, তখনই তাহাকে যতাহার— সংযতাহার বলা যায়। আর ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াহরণ হইতে সম্যক্ নিবৃত্তির নাম নিরাহার। তন্মনস্ক শব্দের অর্থ সমাহিত ভাব। তৎশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। তাঁহাতে মনের সম্যক্ বিলয় হইলেই সাধকের তন্মনস্ক অবস্থা হয়। স্থূল কথা—সুরথ ও সমাধি দেবীসূক্তপাঠরূপ মন্ত্রজপ এবং প্রতিমাপূজারূপ বহিরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধিও অনুশীলন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, সাধনার যাহা প্রাণ যাহা না থাকিলে সাধনাই হয় না, তাহারও সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছিলেন—**'দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্'**— স্বগাত্ররুধিরসিক্ত উপহার মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বগাত্ররুধির শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রাণ। এইরূপ অর্থ আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে। উপনিষৎও প্রাণকে আঙ্গিরস বলিয়াছেন। অঙ্গের রস বলিয়াই প্রাণের একটি নাম আঙ্গিরস। অঙ্গের রস এবং স্বগাত্ররুধির ঠিক একই অর্থের প্রকাশক। সে যাহা হউক, সুরথ সমাধি স্বকীয় বিশিষ্ট প্রাণটিকে ধরিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সাধক ! যতদিন সম্যক্‌রূপে প্রাণসমর্পণ না হয় ততদিন বলি অর্থাৎ পূজার উপহারগুলি ঠিক এইরূপ স্বগাত্র-রুধিরসিক্ত করিয়া, অর্থাৎ প্রাণময় করিয়া—প্রাণের প্রতিনিধি করিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে হয়। অদ্যাপি এতদ্দেশের পূজা প্রণালীতে একটি বিধান প্রচলিত আছে— **'অর্চিতং অর্চিতায় দদ্যাৎ'**— পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজার উপচারগুলিকে প্রথম গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া পরে অর্পণ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানকালে উহা একটি অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র কার্যটির ভিতরে যে এত বড় একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, ইহা হয়ত অনেকেই অনুধাবন করেন না। উপচারগুলিকে নিজগাত্রাসৃগুক্ষিত করিবার জন্যই ঐরূপ বিধান। স্বগাত্র-অসৃক দ্বারা উক্ষিত (সিক্ত) না হইলে— অঙ্গের রসদ্বারা অর্থাৎ প্রাণদ্বারা সঞ্জীবিত না হইলে, উহা মাতৃ-চরণে সম্যক্ অর্পিত হয় না। দীয়মান পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচারগুলিতে স্বকীয় প্রাণের সত্তা দর্শন করিয়া—সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তবে অর্পণ করিতে হয়। আরে, আমাদের ব্যষ্টি প্রাণ সমষ্টি মহাপ্রাণে সম্মিলিত হয় না বলিয়াই ত' মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। সাধনা সফল হয় না ! কিন্তু পত্রপুষ্পাদিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপচারগুলিকে এইরূপ সত্যময় ও প্রাণময় করিয়া মহাপ্রাণরূপিণী মায়ের চরণে অর্পণ করিতে আরম্ভ হইলে, সত্য সত্যই একদিন জীবের ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকুই মহাপ্রাণে মিলাইয়া যায় ; জীব তখন মাতৃ-লাভে ধন্য হয়। রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণ সমর্পণের অনুশীলনরূপতপস্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ তিন বৎসর কাল সংযতভাবে তপস্যা করিবার পর জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবী বরদায়িনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

মন্ত্রে 'ত্রিভির্বর্ষৈঃ' এইরূপ উল্লেখ আছে। আধ্যাত্মিকভাবে ইহার অপূর্ব সমাধান পরিলক্ষিত হয়। বর্ষ শব্দের অর্থ কেবল সম্বৎসর পরিমিত কাল নহে, উহার অর্থ স্থানও হইতে পারে। ত্রিবর্ষে অর্থাৎ তিনটি স্থানে পূর্বোক্তরূপ উপাসনা করিতে হয়। এক মনোময় ক্ষেত্রে এক প্রাণময় ক্ষেত্রে এবং অন্য জ্ঞানময় ক্ষেত্রে। এই তিনটি ক্ষেত্রে, উপাসনা করাই ত্রিবর্ষব্যাপক তপস্যা। ঐরূপভাবে আরাধিত হইলেই মা আমার পরিতুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী ও চণ্ডিকারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহার ফলে সাধকের ত্রিবিধ গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়। কিরূপভাবে সাধনা করিলে অচিরে অভীষ্ট লাভ হয়, তাহা বিশেষভাবে দেখাইবার জন্যই এস্থলে সুরথ ও সমাধির উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

———○———

দেব্যুবাচ

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে ভূপ ! হে কুলনন্দন ! তোমাদের যাহা প্রার্থনীয়, আমার নিকট হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবে। আমি পরিতুষ্টা হইয়া তাহাই প্রদান করিতেছি।

ব্যাখ্যা। মা আজ বরদায়িনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সুরথ ও সমাধিকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। পরবর্তী মন্ত্রে বরের বিষয় বর্ণিত হইবে। মা এস্থলে সুরথকে ভূপ এবং বৈশ্যকে কুলনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ঐ দুইটি সম্বোধনের দ্বারাই উভয়ের অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্বসূচনা করিলেন। ভূ অর্থাৎ জড়পদার্থ সমূহের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই সুরথকে ভূপ বলা হইল। আর বৈশ্যের সম্বোধন কুলনন্দন —কুলের আনন্দদায়ক। যে কুলে ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সত্য সত্যই সেই কুলের উর্ধ্বতন এবং অধস্তন পুরুষগণ অচিরে মুক্তিলাভের আশায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥ ১১ ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তখন রাজা সুরথ জন্মান্তরে অস্খলিত রাজ্য, এবং ইহজন্মে স্বকীয় সামর্থ্যে শত্রুবল-নিধনপূর্বক স্বরাজ্য-লাভ প্রার্থনা করিলেন। আর সেই প্রাজ্ঞ—বিষয়-বিরক্ত বৈশ্য পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমত্ব এবং দেহাদিতে অহংবোধরূপ অজ্ঞান বিনাশক আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।

ব্যাখ্যা। সুরথ—জীবাত্মা ; সে যতই জ্ঞান লাভ করুক, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি ভোগাভিমুখেই থাকে। তাই, সে মায়ের নিকট বর্তমান জীবনে শত্রুবল নিধনপূর্বক অপহৃত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি, এবং জন্মান্তরেও নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিল। ইতিপূর্বে ইন্দ্রিয় এবং বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি কর্তৃক নির্জিত হইয়া জীব আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, এইবার সে সেই ইন্দ্রিয় এবং বৃত্তিসমূহের উপর আধিপত্য প্রার্থনা করিল। আর যেন বিষয়েন্দ্রিয়কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে না হয়। উহারা সম্যক্ নির্জিত হইয়া নিরঙ্কুশভাবে বিষয় ভোগের উপকরণস্বরূপ হইয়া থাকুক। এইরূপ কেবল ইহজন্মে নয়, জন্মান্তরেও যেন এইরূপ নিষ্কণ্টকভাবে আত্মরাজ্য ভোগ করিবার সামর্থ্য লাভ হয় ! ইহাই সুরথের প্রার্থনা। আর সমাধি— সে পূর্ব হইতেই 'নির্বিণ্ন' বিষয়-বিরক্ত ; সুতরাং 'জ্ঞানং বব্রে' আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করি। যাহার প্রভাবে অহং মমত্বরূপ সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ঠিক এইরূপই হয়। সাধক যখন মাকে পায়, তখন তাহার মন চায় অব্যাহত ভোগ ; আর প্রাণ চায় চিরশান্তিময় অপবর্গ—আত্মায় সম্যকরূপ আত্মহারা হওয়া। মায়ের দর্শন পাইলে সাধকের এইরূপ ভোগ এবং অপবর্গ উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই মন্ত্রে সুরথের রাজ্য প্রার্থনা, এবং সমাধির জ্ঞান-প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কপটনিদ্রা উপাখ্যানেও ঠিক এইরূপ ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায়। মনোরূপী দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে বসিয়া ভোগরূপ নারায়ণী সেনাদল লাভ করিয়াছিল, এবং প্রাণরূপী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে উপবেশন করিয়া জীবনতরণীর কর্ণধাররূপে স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। একজন ভগবৎ ঐশ্বর্যে মুগ্ধ এবং আর একজন ভগবৎ মাধুর্যে—প্রেমে মুগ্ধ। বাস্তবিক এই উভয় ভাব নিয়াই জীবত্ব ! প্রেম এবং আত্মজ্ঞান যে একই কথা, ইহা পূর্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এস্থলে সুরথের যে পুনরায় জন্মান্তরের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সংশয়ের অবসর নাই ; কারণ, উহা স্থূলজন্ম নহে, সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ ও মনুষ্য-লাভ। জীবমাত্রেরই উহা বাঞ্ছনীয়।

জীব ! তুমিও এইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মায়ের নিকট ঐ দুইটিই প্রার্থনা করিতেছ। ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান। ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব (সর্বশক্তিমত্তা) এবং বিশুদ্ধবোধ, এই উভয়ই জীবমাত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা। সুতরাং তুমি বুঝিতে পার অথবা নাই পার, সকল অবস্থার ভিতর দিয়া তুমিও একটু একটু করিয়া মায়ের নিকট উহাই প্রার্থনা

করিতেছ। মাও তোমাকে জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করাইয়া পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিয়া সেই ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান লাভের যোগ্য অধিকারী করিয়া তুলিতেছেন।

সত্য সত্যই দেখ সাধক, তোমার অন্তরে মা বরাভয়দায়িনীরূপে স্মিতমুখে ভোগাপবর্গ দান করিবার জন্য আকুল-নয়নে অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি পুত্র, তুমি মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সরলপ্রাণে মা বলিয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রার্থনা কর, পুত্র যেমন করিয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা করেন, ঠিক তেমন করিয়া প্রার্থনা কর, তুমিও সুরথ সমাধির ন্যায় ভোগাপবর্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

———०———

দেব্যুবাচ।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতেঃ স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকোনাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে নৃপতে! অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি স্বরাজ্য লাভ করিবে, এবং রিপুদিগকে নিহত করিয়া সেই রাজ্যটি অস্খলিতভাবে ভোগ করিতে পারিবে। আর মৃত্যুর পর সূর্যদেব হইতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণিক মনু নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

ব্যাখ্যা। সাধক! একবার হৃতরাজ্য সুরথের অবস্থা স্মরণ কর, তিনি কত দুরবস্থার ভিতর দিয়া, কত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া গুরুর কৃপায় মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। মা তাহাকে অস্খলিত স্বরাজ্যপ্রাপ্তিরূপ বর প্রদান করিলেন। স্বরাজ্য অর্থে এখানে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির উপর আধিপত্য বুঝিতে হইবে। পূর্বে 'আমি' বলিতে—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দাস, দেহাভিমানবিশিষ্ট একটা 'আমি' বুঝাইত। এখন 'আমি' বলিলেই, মাকে মনে পড়িয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাই স্বরাজ্য লাভ। ইহাই মায়ের প্রথম দান। আর অতিরিক্ত দান মনুত্ব। তাই, মা বলিলেন— 'হে সুরথ! তুমি ভবিষ্যতে সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক মনু নামে মন্বন্তরাধিপতি হইবে—সমষ্টি-মানব-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।' এই মনুচৈতন্য লাভ করিতে হইলে সূর্যের পুত্র হইতে হয়, অর্থাৎ বিরাট্ প্রাণসত্তায় মিলাইয়া যাইতে হয়, এবং সবর্ণা শক্তির—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রীর অঙ্কস্থিত হইতে হয়। সাধকবৃন্দ এইরূপ মনুত্ব লাভ করিয়া মানব জাতির উপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, তাহার ফলেই মনুজগণ দিন দিন জ্ঞানৈশ্বর্য লাভের জন্য লালায়িত হয়। মনুষ্যগণের পিতৃস্থানীয় মনুর কৃপায়ই মনুষ্যজাতি উন্নতি লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একটি উদ্ভট শ্লোকের অবতারণা করা যাইতেছে।

উপাসনা চেন্মহতামুপসনা, যয়া মনন্যাধিকমেতি মানবঃ।
ধরার্থিনে যৎ সুরথায় তারিণী, মনুত্বমত্যন্তসুখং দদৌ স্বয়ম্॥

যদি উপাসনা করিতে হয়, তবে মহতের উপাসনা করাই উচিত। (পক্ষান্তরে মহত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের) যেহেতু মহতের উপাসনা করিলে মানুষ অভীষ্টের অতিরিক্ত বস্তুও লাভ করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত এই রাজা সুরথ। তিনি রাজ্যার্থী হইয়া মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারিণী—মা আমার তাহাকে প্রার্থিত রাজ্য ত' প্রদান করিলেনই ; অতিরিক্ত দিলেন মনুত্ব—অত্যন্ত সুখময় পদ।

এ জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—মানুষ প্রথমতঃ কোন সাংসারিক অথবা দৈহিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। তাহার ফলে মানুষের সেই তুচ্ছ অভাব অভিযোগগুলি ত' দূরীভূত হয়ই, অধিকন্তু মায়ের কৃপায় জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি অনুত্তম বহু লাভের যোগ্যতাও অর্জিত হয়। সাধনা-পথের ইহাই বিশেষত্ব। বালক-যোগী ধ্রুবের ঠিক এইরূপ হইয়াছিল।

———০———

বৈশ্যবর্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। হে বৈশ্যবর্য! তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে আমি তাহাই দিলাম। তোমার জ্ঞান লাভ হইবে, তাহার ফলে তুমি সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা। মা সমাধিকে মোক্ষফলপ্রদ আত্মজ্ঞান লাভের বর প্রদান করিলেন। মা আমার কল্পতরু। তাঁহার নিকট সত্যজ্ঞানে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নির্বিচারে তাহাই প্রদান করেন। সুরথকে রাজ্য এবং সমাধিকে জ্ঞান

দান করিলেন।

নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি এবং সগুণ ব্রহ্মে বিচরণ, এই উভয়ই জীবন্মুক্তির লক্ষণ। জীব ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম, এই তিনটি স্বরূপে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার সমার্থ্যকে জীবন্মুক্তি বলে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও **'ত্রয়ং যদা বিন্দতে'** ঠিক এইরূপ কথাই আছে। ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম, এই ত্রিবিধ স্বরূপে স্বৈর-বিচরণকারী মানুষকেই জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষের যতদিন স্থূল দেহ থাকে, ততদিন তাঁহাতে কখনও জীবভাব, কখনও ঈশ্বরভাব আর কখনও বা নিরঞ্জন-স্বরূপে স্থিতি, এই তিনটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা জীবন্মুক্তির বিশিষ্ট আনন্দে নিয়ত অবস্থান করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, অথবা ঐরূপ বিশিষ্ট আনন্দ ভোগের বিশেষ সামর্থ্য রাখেন, তাঁহারা জীবিত কালেও অধিকাংশ সময় কেবল নিরঞ্জন স্বরূপেই অবস্থান করিতে অর্থাৎ জ্ঞানের ষষ্ঠ সপ্তম ভূমিকায় অবস্থায় করিতে যত্নবান হন।

এখানে একটি বিশেষ স্মরণীয় বিষয় এই যে —জীবন্মুক্ত পুরুষমাত্রই যে একান্ত নিবৃত্তি-পরায়ণ হইবেন, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে নাই ; তাহা হইতেও পারে না। প্রারব্ধ-বৈচিত্র্যবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের কর্ম-প্রণালী বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহাই সম্ভব। বেদান্তশাস্ত্র সনক সনন্দাদি এবং জনক যাজ্ঞবল্ক্য বামদেবাদি ঋষির দৃষ্টান্ত দ্বারা এই নিবৃত্তি প্রবৃত্তিমূলক কর্মবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে শমদমাদিরূপ কতকগুলি বিষয়ে অধিকাংশ জীবন্মুক্তই প্রায় তুল্যরূপ হইয়া থাকেন।

———০———

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥ ১৬ ॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনু ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে দেবীমাহাত্ম্যম্ সমাপ্তম্।

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—এইরূপে দেবী তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, সুরথ ও সমাধি কর্তৃক ভক্তির সহিত সংস্তুত হইয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ দেবীর নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ পূর্বক ভবিষ্যতে সাবর্ণিক নামক মনু হইবেন।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবী মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ঠিক এইরূপই সমাধি-সহায় জীব সদ্‌গুরুর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে স্তব পূজাদিরূপ এবং প্রত্যাহার ধারণা ধ্যানাদি সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া, মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ করে—সত্যে প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মা জীবকে ভোগাবর্গরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। যতদিন স্থূলদেহ থাকে ততদিন এইরূপ দেখিতে দেখিতে মা আমার অন্তর্হিত হইয়া যান ; কিন্তু আবার ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার স্নেহময় আনন্দময় স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়।

মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে দেবীর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ সূর্যতনয় সাবর্ণিকমনুরূপে অষ্টম-মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন। বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। যখন সুরথ ও সমাধি মায়ের নিকট বরলাভ করিয়াছিলেন, তখন স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মন্বন্তর চলিতেছিল ; তৎকাল অপেক্ষায় সেকাল সুদূর ভবিষ্যৎ বলিয়াই মন্ত্রে দেবীবাক্যে—**'ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি'** এই ভবিষ্যৎকাল বোধক ক্রিয়াপদের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্বন্তরে যিনি সুরথ ছিলেন, অষ্টম মন্বন্তরে তিনিই সাবর্ণিক মনুরূপে—স্নেহময় পিতৃরূপে তৎকালীন মানব জাতির কল্যাণ সাধনে নিরত থাকিবেন। অষ্টম মনু, সাবর্ণিক প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক রহস্য গ্রন্থারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা কেবল সুরথ সমাধির উপাখ্যান নহে। সাধক মাত্রই এইরূপে মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। ইহাতে অসম্ভবতা কিংবা অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। বরং ইহাই একান্ত সম্ভব ও একান্ত স্বাভাবিক। মাকে লাভ করিবার জন্য একমাত্র মাতৃ-কৃপাই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংসারী বা সন্ন্যাসীর বিচার নাই। মায়ের রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার ! অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাক্ হইয়া মাকে ভজনা করিতে পারে—শরণাগত

হইতে পারে। মাতৃ-চরণে শরণাগত হইলে জীবের মাতৃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী !

ভগবদ্‌গীতায় যেখানে পরিসমাপ্তি, দেবীমাহাত্ম্যের সেইখানে আরম্ভ। সাধক সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চরণে—এক অদ্বিতীয় অভয়পদে যথার্থ শরণাগত হইবার পর যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই এই দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** এইখানে সাধন-সমরের আরম্ভ, এবং **'ন স পুনরাবর্ততে'** এইখানেই সাধন-সমরের শেষ।

এস, এইবার আমরা সকলে বৈদিক যুগের সত্যদর্শী ঋষিদিগের ন্যায় পবিত্রকণ্ঠে সরল-প্রাণে সমস্বরে গান করি—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥
ওঁ পূর্ণম্। ওঁ পূর্ণম্। ওঁ পূর্ণম্॥

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
রুদ্রগ্রন্থিভেদ নাম তৃতীয় খণ্ড।

—o—

—o—

॥ সমাপ্ত ॥

—o—

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা।

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনি**

(১২) 1851 **গীতা রসামৃত**

(১৩) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৪) 1444 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১৫) 395 **গীতা-মাধুর্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৬) 1455 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (লঘু আকারে)

(১৭) **সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য**

(১৮) 954 **শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)**

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১৯) **শ্রীরামচরিতমানস** (অখণ্ড সংস্করণ, অর্থসহ)

কোড নং

(২০) 275 **কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 **সর্বসাধনার সারকথা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 **অমৃত-বিন্দু**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(২৮) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(২৯) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩০) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩১) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩২) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৩) 1603 **উপনিষদ্**

কোড নং

(৩৪) 1604 পাতঞ্জলযোগ

(৩৫) 312 সহজ সাধনা
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের সহজতম দিগ্-দর্শন।

(৩৬) 903 আদর্শ নারী সুশীলা
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৭) 1415 অমৃত-বাণী
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৩৮) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৩৯) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

(৪০) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪১) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

(৪২) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

(৪৩) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

(৪৪) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪৫) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৬) 1140 ঈশ্বর-লাভের বিবিধ উপায়

(৪৭) 1303 সাধকদের প্রতি

(৪৮) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৪৯) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৫০) 1581 গীতার সারাৎসার

(৫১) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৫২) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫৩) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫৪) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫৫) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৫৬) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৫৭) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৫৮) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব

(৫৯) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৬০) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৬১) 469 মূর্তিপূজা

(৬২) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৬৩) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

(৬৪) 1742 শরণাগতি

কোড নং

(৬৫) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন
(৬৬) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৬৭) 1043 নবদুর্গা
(৬৮) 1096 কানাই
(৬৯) 1097 গোপাল
(৭০) 1098 মোহন
(৭১) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৭২) 1292 দশাবতার
(৭৩) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৭৪) 1652 নবগ্রহ
(৭৫) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৭৬) 1495 ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৭৭) 1496 পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৭৮) 1659 শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৭৯) 1854 ভাগবত রত্নাবলী
(৮০) 1880 হনুমানচালীসা (লঘু আকারে)
(৮১) 1881 হনুমানচালীসা (অর্থসহ)
(৮২) 1852 রামরক্ষাস্তোত্র
(৮৩) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৮৪) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৮৫) 1743 শ্রীশিবচালীসা
(৮৬) 1785 ভাগবতের মণিমুক্তা
(৮৭) 1787 মহাবীর হনুমান
(৮৮) 1786 মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্
(৮৯) 1795 মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৯০) 1784 প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৯১) 1797 স্তবমালা
(৯২) 1835 সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(৯৩) 1834 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(৯৪) 1839 কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(৯৫) 1838 জীবন যাপনের শৈলী
(৯৬) 1853 আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(৯৭) ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব
(৯৮) স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৯৯) জয় শিব শংকর
(১০০) শ্রীরাম
(১০১) সীতাপতি রাম
(১০২) রাজা রাম

——○——